স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ

স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহিগণ

ভাষান্তর ঃ

স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীশ্রীমায়ের ১৫১ তম শুভ জন্মতিথি
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪১০
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩
IMIC

ISBN 81-8040-468-4

অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

স্বামীজীর জীবন ও বাণী হলো আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপিত মানুষদের কাছে জীবন-বেদ স্বরূপ। তাঁর মতো এক মহামানবের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন—তাঁর শিষ্য, শিষ্যা ও গুণগ্রাহী বন্ধু-বান্ধবগণ—তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে যে সব স্মৃতিসঞ্চয়ন রেখে গেছেন তার মধ্যে সন্ধান মেলে এমন অনেক কিছু তত্ত্ব ও তথ্যের, যার মূল্য তাঁর মূল জীবনীগ্রন্থ বা রচনাবলীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। এ পর্যন্ত এ ধরনের বহু তথ্যবহুল রচনার সন্ধান পেয়ে অদ্বৈত আশ্রম তাঁদের 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরেজি পত্রিকায় তা বহুদিন থেকে প্রকাশিত করে আসছিলেন এবং স্বামীজীর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেগুলি সংকলিত করে 'Reminiscenecs of Swami Vivekananda' নামে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থটি অচিরেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এ পর্যন্ত তার বেশ কয়েকটি সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণও প্রকাশিত হয়েছে।

এই রকম একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থের বাংলা ভাষান্তর প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। অদ্বৈত আশ্রম গ্রন্থটির শেষ সংস্করণে যেকয়টি রচনা সংকলিত করেছেন আমরা সেগুলির বাংলা অনুবাদ তো এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেইছি, অধিকন্তু মিস কেট স্যানবর্নের 'Abandoning An Adopted Farm' (নিউইয়র্ক, ১৮৯৪) গ্রন্থ থেকে নেওয়া তাঁর স্বামীজী সম্পর্কিত স্মৃতিচারণটি (যা ঐ গ্রন্থের ৭-১৪ পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত ছিল) সহ 'বেদান্তকেশরী' (জানুয়ারি ১৯৩৮) পত্রিকায় প্রকাশিত কে. এস. ঘোষের স্মৃতিকথাটি এবং ফ্র্যাঙ্ক রোডহ্যামেলের অমূল্য রচনাটি যেটি প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৫-এ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্যমণ্ডলী রচিত স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৭ম সংস্করণ, ২০০১, পৃঃ ৫১৬) প্রকাশিত হয়েছে—তার অনুবাদগুলিও সংযোজিত করেছি। অদ্বৈত আশ্রমও মূল

ইংরেজি গ্রন্থের নতুন সংস্করণে এই তিনটি রচনা অন্তর্ভুক্ত করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

আশা রাখি, এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা মহলে সবিশেষ সমাদৃত হবে।

উদ্বোধন কার্যালয়
১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর
১৫১তম পুণ্য জন্মবার্ষিকী

ইংরেজি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকার বঙ্গানুবাদ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এই স্মৃতিকথা সমূহের অনেকগুলিই প্রকাশিত হয়েছে। যথাযথ অনুমতি নিয়ে সেইগুলি কৃতজ্ঞতাসহকারে এখানে আনুপূর্বিক সংযোজিত হয়েছে। ভগিনী ক্রিস্টিনের স্মৃতিকথাগুলির সর্বস্বত্ব আলমোড়ার বশীশ্বর সেন মহাশয়ের অধিকারে সংরক্ষিত ছিল।

এই সব স্মৃতিকাহিনীর রচয়িতাদের সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করার মতো কোন ভাষা না খুঁজে পেয়ে, তাঁদেরকে 'তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগ্রাহিগণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন শিষ্য, কেউ বন্ধু, কেউ বা তাঁর গুণগ্রাহী। সর্বশেষ লেখক (রীভস্ ক্যালকিন্স) কিছুটা যেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন*, তবু তাঁর লেখাটি এখানে অন্তর্ভুক্তির দাবি রাখে এজন্য যে এটিতে তাঁর এমন একটি ছবি ফুটে উঠেছে, যা সাধারণত আমাদের কাছে পরিচিত নয়। লেখাগুলি আগে আগে যে ভাবে ছেপে বেরিয়েছে, ঠিক সেভাবেই এখানে মুদ্রিত হয়েছে। সুন্দরাম আয়ারের দ্বিতীয় প্রবন্ধের কয়েকটি অনুচ্ছেদে স্বামীজীর মাদ্রাজ অভিভাষণের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছিল, যা এখানে অধিকন্তু বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে।

একই কারণে আরও কিছু লেখা একইভাবে ছোট করা হয়েছে এবং বাদ দেওয়া অংশটি তিনটি বিন্দু (...) দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

যদিও এইসব স্মৃতিকাহিনীগুলি যথেষ্ট আকর্ষণীয়, তথ্যসমৃদ্ধ এবং শিক্ষামূলক, তথাপি পাঠকদের আমরা জানিয়ে রাখি যে প্রকাশক এইসব লেখায় যে সব মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে সবসময়ে যে একমত, তা নয়। যেমন বালগঙ্গাধর তিলকের বিশ্বাস ছিল, স্বামীজী নাকি এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন যে গীতায় সন্ন্যাসবাদের কোন কথা নেই, অথবা রীভস্ ক্যালকিন্সের অপবাদমূলক কথা যে স্বামীজী তাঁর বক্তৃতায় আগে থেকে লেখা ভাষণগুলি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ বলে যেতেন—এসব স্পষ্টতই অসত্য এবং এসব কথার দ্বারা স্বামীজীর জীবন ও বাণীর কোন শিক্ষার্থীই যেন বিভ্রান্ত না হন। অবশ্য এ ধরনের ত্রুটির সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁর জীবন-সংক্রান্ত এ ধরনের তথ্যমূলক ত্রুটিগুলি আমরা পাদটিকার মাধ্যমে সংশোধনের প্রয়াস পেয়েছি।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি আশাকরি একটি সময়োপযোগী প্রকাশনা হিসেবে সমাদৃত হবে।

মায়াবতী — প্রকাশক

১ মে, ১৯৬১

---

* প্রথম সংস্করণের সর্বশেষ লেখক ছিলেন রীভস্ ক্যালকিন্স।

ইংরেজি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার বঙ্গানুবাদ

এই সংস্করণে গ্রন্থটি আদ্যন্ত সংশোধিত হয়েছে এবং ভগিনী দেবমাতা, মড স্টাম, মিসেস এস. কে. ব্লজেট এবং স্বামী সদাশিবানন্দের লেখা চারখানি আখ্যান সংযোজিত হয়েছে।

১ মার্চ, ১৯৬৪

ইংরেজি গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকার বঙ্গানুবাদ

বহুদিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাওয়ায়, এই গ্রন্থটির এক নতুন সংস্করণ প্রকাশের জন্য দাবি এবং চাহিদা দুইই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সাহিত্যের আগ্রহী পাঠকপাঠিকা মহলে বেড়ে উঠছিল। আমরা এই সংস্করণ প্রকাশনার সুযোগ নিয়ে ভগিনী ক্রিস্টিনের আরও কিছু স্মৃতিকথা, যা বছর দুয়েক আগে, প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী সংস্করণে এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, তা সংযোজিত করে দিয়েছি।

এই গ্রন্থের সঙ্গে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে। যদিও, সঠিক অর্থে, এগুলিকে স্মৃতিকথা বলে আখ্যায়িত করা যায় না, তবু ভগিনী অ্যালবার্টা স্টার্জেসকে লেখা জোসেফিন ম্যাকলাউডের পত্রগুলিতে তাঁর ওপর স্বামীজীর প্রভাবশক্তির তীব্রতা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মযজ্ঞের বহুবিধ তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই পত্রগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌতির কিশোর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। ইংলণ্ডের রামকৃষ্ণ-বেদান্তকেন্দ্র মূল পত্রগুলি আমাদের হস্তান্তরিত করায়, প্রবুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন সংখ্যায় সেগুলি আগে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা আশাকরি, এই সব নতুন নতুন কয়েকটি রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি স্বামীজীর গুণগ্রাহী, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসারিগণের কাছে সমাদৃত হবে।

মায়াবতী — প্রকাশক

১৫ এপ্রিল, ১৯৮৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত Reminiscences of Swami Vivekananda, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩-র বাংলা অনুবাদের নির্দেশ এবং প্রেরণা দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। ১৯৮৪-১৯৮৬, এই দুই বছর অনুবাদের কাজ চলে। কিন্তু নানা কারণে বইটি ইনস্টিটিউট থেকে শেষপর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। লোকেশ্বরানন্দজীর নির্দেশ ছিল অমূল্য এই গ্রন্থটি যথাসম্ভব চলতি ভাষায় অনুবাদ করতে হবে যাতে সাধারণ পাঠকও স্বামীজীর ভাবের দ্বারা সহজে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই যথাসম্ভব ঝরঝরে ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্মৃতিনিবন্ধগুলির মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর স্মৃতিকথাটি প্রথমে বাংলাতেই রচিত হয় এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বাংলা ১৩৩৪ সালে 'স্বামীজীর কথা'-য় এই স্মৃতিকথাটি উদ্বোধন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। মূলত ঐ নিবন্ধেরই একটি অংশের ইংরেজি অনুবাদ পরে ১৯২২-এর ডিসেম্বর এবং ১৯২৩-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের 'বেদান্ত-কেশরী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে 'বেদান্তকেশরী'-তে প্রকাশিত অংশটুকুরই অনুবাদ দেওয়া হয়েছে এবং অনুবাদকালে শুদ্ধানন্দজীর মূল রচনার কাঠামোটিই চলিত ভাষায় ঢেলে সাজানো হয়েছে যাতে অন্যান্য নিবন্ধগুলির ভাষার সঙ্গে তার একটা পারম্পর্য ও সংহতি রক্ষা হয়। হরিপদ মিত্রের প্রবন্ধটি সম্পর্কেও ঐ-একই কথা। প্রবন্ধটি 'স্বামীজীর কথা'-য় প্রথম স্মৃতিকথা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতিকথা উদ্বোধন প্রকাশিত এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। 'রেমিনিসেন্সেস্'-এর অন্তর্ভুক্ত বর্তমান নিবন্ধটি অবশ্য 'বেদান্তকেশরী'-তে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বক্তব্যের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও দুটি প্রবন্ধ হুবহু এক নয়। অনুবাদের সময় জায়গায় জায়গায় মন্মথবাবুর বাংলা প্রবন্ধটির সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

— স্বরাজ মজুমদার

— মিতা মজুমদার

সূচীপত্র

লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১
বাল গঙ্গাধর তিলক	২২
হরিপদ মিত্র	২৪
জি. এস. ভাটে	৫৩
কে. সুন্দররাম আয়ার	৫৯
কে. সুন্দররাম আয়ার	৭৫
কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী	১০৬
এ. শ্রীনিবাস পাই	১১৫
এস. ই. ওয়াল্ডো	১২৪
সিস্টার দেবমাতা	১৩৪
কর্ণেলিয়া কোঙ্গার	১৪৬
মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে	১৫৫
হেনরি জে. ভ্যান হাগেন	১৬৪
সিস্টার ক্রিস্টিন	১৬৮
জোসেফিন ম্যাকলাউড	২৮৩
কনস্টান্স টাউন	৩০৬
মেরি সি. ফাঙ্কি	৩১৩
মাদাম ই. কালভে	৩২৩
মড স্টাম	৩৩০
ভগিনী নিবেদিতা	৩৩৯

লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
এরিক হ্যামন্ড	৩৭০
ই. টি. স্টার্ডি	৩৭৫
টি. জে. দেশাই	৩৭৭
স্বামী বোধানন্দ	৩৮৪
স্বামী বিমলানন্দ	৩৮৯
স্বামী শুদ্ধানন্দ	৪০০
কামাখ্যা নাথ মিত্র	৪১৬
মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪২৩
মিসেস এস. কে. ব্লজেট	৪৪৫
ইডা অ্যানসেল	৪৫০
ক্রিসটিনা অ্যালবার্স	৪৭২
ইসাবেল মার্গেসন	৪৭৪
বিরজা দেবী	৪৭৭
রীভস্ ক্যালকিন্স	৪৮৩
স্বামী সদাশিবানন্দ	৪৯০
কেট স্যানবর্ন	৫১৭
কে. এস. ঘোষ	৫২২
ফ্র্যাঙ্ক রোডহ্যামেল	৫২৯
পরিশিষ্ট	৫৪২

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে মানুষ যেন ততই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, জগৎ যেন তাঁর মহিমা আগের চেয়ে আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছে। তবে এটাও ঠিক, যে-প্রজন্ম তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, শুনেছেন তাঁর কণ্ঠস্বর, সেই প্রজন্মের মানুষও কালের স্রোতে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন। স্বামীজীর সমসাময়িক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আমার মনে হয়, দেশবাসীর কাছে তাঁদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। তাঁদের উচিত ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, জগদ্বরেণ্য এই মহাপুরুষ সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি অনাগত কালের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখা। বিবেকানন্দের জীবনের যে ঘটনাগুলি প্রায় সকলেরই জানা, সেগুলির পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর শিষ্যদের লেখা চার খণ্ডের[১] জীবনীতেই সে উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়েছে। আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শীরা যেটা করতে পারেন তা হলো এই, স্বামীজী সম্বন্ধে একান্ত ব্যক্তিগত যে স্মৃতি তাঁদের মানসপটে এখনও অম্লান সেই ছবিগুলিকে সকলের সামনে মেলে ধরা। তার ফলে স্বামীজীর জীবনের অনেক অজানা ছোটখাট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা আমরা জানতে পারব, জানতে পারব তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সেই সব খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে সংসারের আর পাঁচজন মানুষের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করেছিল। স্বামীজীর যখন অল্প বয়স, যখন তাঁকে বিশেষ কেউ চিনতেন না, তখন থেকেই আমি তাঁকে জানি, কারণ আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আবার যখন তিনি আমেরিকা থেকে ফিরলেন, যখন তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাতির একেবারে মধ্যগগনে, তখনও তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি। ঐ সময় তিনি বেশ কয়েকটা দিন আমার কাছে ছিলেন এবং কলেজ ছাড়ার পর থেকে এ-কবছর তাঁর জীবনে যা কিছু ঘটে গেছে, সবই তিনি তখন আমায় প্রাণ খুলে

---

১ স্বামীজীর জীবনী (ইংরেজিতে) এখন দু-খণ্ডে প্রকাশিত। তাঁর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য, যা পরে আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি যুক্ত করে এবং কিছু ঘটনা বাদ দিয়ে নূতন খণ্ড দুটি প্রকাশ করা হয়েছে। —প্রকাশক

বলেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা বেলুড় মঠে, তাঁর স্থূল দেহ যাওয়ার দিন কয়েক আগে। তাঁর সম্বন্ধে যেকটি কথা লিখছি, সে সব অন্য কারও কাছ থেকে নয়, তাঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা।

বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যখন স্বামী বিবেকানন্দের ওপর পড়লো, তখন ভারতবর্ষের এক অদ্ভুত, দিশেহারা অবস্থা। একদিকে বিদেশী শাসনের বিষময় ফল, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ, এই দুয়ে মিলে ভারতীয়দের জীবন, চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদের বাহ্যিক চাকচিক্যে দেশের মানুষ তখন এমনই বিমোহিত যে জাতীয় জীবনের সনাতন আদর্শগুলিকেও একেবারে ভুলে মেরে দিল। ভারতবর্ষে তৎকালীন প্রগতিবাদী আন্দোলনগুলির অধিকাংশই ছিল মেকি ও অবাস্তব। অতীতের আদর্শনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতার বদলে জাতীয় জীবনের সর্বত্রই দেখা গেল এক ধরনের কৃত্রিম ভাবোচ্ছাস ও তামসিক আত্মতুষ্টির মনোভাব। সনাতন আদর্শ ও মূল্যবোধের নিশ্চিত শক্ত জমির ওপর আমরা এতকাল দাঁড়িয়েছিলাম; কিন্তু পাশ্চাত্য জড়বাদের দমকা হাওয়ায় আমরা সেখান থেকে ভেসে চললাম এবং সেই বায়ু তরঙ্গে আন্দোলিত হতে থাকলাম। আমাদের প্রাচীন আর্যরা অনুভব করেছিলেন যে, কোনও কিছু পেতে গেলে যে মূল্য দিতে হয়, তা হলো ত্যাগ ও আত্মনিবেদন। কিন্তু নব্য ভারতবাসী মনে করল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আত্মসমর্পণের কোনও প্রয়োজন নেই। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ভারতের শৌখিন সমাজ সংস্কারকের দল তা-ই বিলাসবহুল জীবন যাপন করেই দেশ উদ্ধারের কাজে মেতে উঠলেন। বড় বড় সমস্যাগুলি তলিয়ে বিচার না করে, তাদের গভীরে প্রবেশ না করে, ওপর-ওপর দেখেই তাঁরা সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলেন। যাঁরা সাজিয়ে-গুছিয়ে বেশ ভালো বলতে পারতেন, বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের আবেগ ও অনুভবকে সাময়িকভাবে খানিকটা নাড়া দিলেও তাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারেন নি, কারণ তাঁদের আবেদন-নিবেদনের মধ্যে তেমন জোর ছিল না। ফলে হলো কি—আমাদের যা ছিল তা খুইয়ে বসলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রাপ্তিযোগ কিছু ঘটল না, আর ভবিষ্যতেও যে ঘটবে তার ইঙ্গিতটুকুও মিলল না। সমাজ সংস্কারকরা যে সচেতনভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করেছেন তা হয়তো নয়। কিন্তু এটা ঠিক, দেশের সাধারণ মানুষ প্রতারিত হলেন এবং হীরে ফেলে তাঁরা কাঁচ তুলে নিলেন। সর্বত্রই তখন এক ধরনের নির্বিকার আত্মতুষ্টির ভাব, শাশ্বত জীবনধারা ও সনাতন আদর্শ-বিধ্বংসী প্রতীচির নব্য দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো

মনোবলের একান্ত অভাব। চরিত্রের এই দুর্বলতা সমাজদেহের সর্বত্রই সোচ্চার হয়ে উঠছিল।

হতাশার গাঢ় অন্ধকারে দেশ যখন এইভাবে অবসন্নপ্রায়, ঠিক তখনি সকলের দৃষ্টির অন্তরালে, সুকঠোর সাধনার সমাপ্তিতে ভারতের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। অতীতের কয়েকজন অবতার-পুরুষের মতো তিনিও প্রায় নিরক্ষর ছিলেন বলা যায়। মন্দিরে সামান্য পূজারীর কাজ করতেন, কিন্তু পরে এই কর্মটুকু করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। তাঁর রকমসকম দেখে অজ্ঞ লোকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তখন পরম জ্ঞানলাভের সাধনায় নিরত। আচার-আচরণে তারই প্রতিফলন হতো। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর কিন্তু তিনি সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে লাগলেন এবং বিশেষভাবে আকর্ষণ করলেন একদল উৎসাহী শুদ্ধসত্ত্ব যুবকদের, যাঁরা তাঁরই কাছ থেকে জীবনের পথনির্দেশ প্রার্থনা করেছিলেন এবং সঙ্কল্প করেছিলেন তাঁর শিক্ষা ও আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বহু উপদেশ সংগৃহীত হয়ে ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে বটে, কিন্তু সেসব থেকে তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের অতি সামান্য আভাসই মেলে। এ বিষয়ে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। বহু যুগের ব্যবধানে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জগতে তাঁর মতো একজন দেবমানবের আবির্ভাব ঘটে। আমি ধন্য কারণ তাঁর শ্রীমুখের বাণী শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। যখন তাঁর কথা শুনেছি তখনও মনে হয়েছে, আর এখনও অনুভব করছি—বহু সুকৃতির ফলে মানুষ এমন দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। পরমহংসদেব ঘরোয়া বাংলায় কথা বলতেন। কথার মধ্যে একটু তোতলামির ভাব ছিল, কিন্তু তাতেই যেন কথাগুলি আরও মধুর শোনাত। সেই কথামৃতের তরঙ্গে ভেসে উঠত তাঁর অতলান্ত অধ্যাত্ম অনুভূতির মণিমুক্তা, নিরন্তর স্ফুরিত হতো উপমা ও প্রতীকের অনবদ্য দ্যুতি, প্রতিফলিত হতো তাঁর অপূর্ব পর্যবেক্ষণ-শক্তি, গভীর রসবোধ, দিব্য উদার প্রেম এবং অনন্ত জ্ঞান—এবং এই সবকিছুই শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

পরমহংসদেবের ব্যক্তিত্বের অমোঘ আকর্ষণে যেসব নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হয়েছিলেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হন, ছিলেন তাঁদেরই একজন। চোখে পড়ার মতো অসাধারণত্ব তখন তাঁর মধ্যে কিছুই ছিল না। যেমন আর পাঁচজন যায়, তেমনি

তিনিও পরমহংসদেবের কাছে যেতেন। পড়াশুনাতেও যে সাংঘাতিক কিছু একটা ছিলেন, তাও নয়; আবার পেশাগত ব্যাপারে কোন পদক বা খেতাব পাওয়ার মতো যোগ্যতা ও প্রতিভা যে তাঁর ছিল, তেমন কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়নি। কিন্তু তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ দেখামাত্রই নরেন্দ্রকে চিনতে পেরেছিলেন, সকলের মধ্য থেকে নির্ভুলভাবে বেছে নিয়েছিলেন, দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত। বলেছিলেন—'নরেন্দ্র হলো সহস্রদল পদ্ম।' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, জগতকে পথ দেখাতে, মানুষকে নেতৃত্ব দিতে, বিপুল শক্তি নিয়ে যাঁরা জগতে অবতীর্ণ হন, নরেন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। পরমহংসদেব জাগতিক জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতার ধার ধারতেন না। নেতৃত্ব বলতে তিনি ধর্মজগতে নেতৃত্বের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু যে মানুষের মুখ দেখে নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন তা-ই নয়, তিনি অতুলনীয় যোগশক্তিরও অধিকারী ছিলেন। বিবেকানন্দের ওপর তাঁর সেই শক্তির প্রয়োগ আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি। পরমহংসদেব তখন কলকাতার কয়েকমাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ সেই সময়ে পরমহংসদেবের কাছে খুব যে নিয়মিত যেতেন, তা নয়। একবার তিনি বেশ কয়েক সপ্তাহ না যাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ এতটাই ব্যাকুল হয়েছিলেন যে, জনে জনে তিনি নরেনের খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। শেষে আর থাকতে না পেরে নরেন্দ্রর এক বন্ধুকে ধরে বসলেন, সে যেন অবিলম্বে নরেন্দ্রকে ধরে আনে। পরমহংসদেব নিজের মুখে বলেছেন, নরেন্দ্র এলে তিনি তাঁর সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলতে চাইলেন। তাই হলো। ঘরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র—তৃতীয় কেউ নেই। নরেন্দ্র ঘরে ঢুকতেই তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'ওরে, তোকে আমি দেখতে চাইছি, আর তুই এমনি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস?' এই বলতে বলতে তিনি নরেন্দ্রর কাছে এসে আলতো করে তাঁর বুকে আঙুল দিয়ে একটু টোকা দিলেন। বিবেকানন্দের ভাষায় সেই মুহূর্তে একটা চোখ-ধাঁধানো আলোর বন্যায় যেন আমি ভেসে গেলাম, অনুভব করলাম আমি যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছি। তখন ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলাম, "ওগো তুমি আমার একি করলে? আমার যে বাপ-মা আছেন।" পরমহংসদেব তখন তাঁর পিঠ চাপড়ে তাঁকে শান্ত করে বললেন ঃ "তবে এখন থাক, একবারে কাজ নেই, কালে হবে।"

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পর নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যের সংখ্যা খুব কম ছিল; তিনি খুব দেখে শুনে বেছে তবেই শিষ্য করতেন এবং প্রত্যেকের জীবন কঠোর, নিরবচ্ছিন্ন,

আপসহীন সংযমের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। হাতে-কলমে করে ধর্মজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভের চেষ্টা কর—এই ছিল তাঁর ভাব। বিবেকানন্দ সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু হাটের মাঝে ঢাক পিটিয়ে তা বলে বেড়ান নি। নরেন্দ্র এবং অন্যান্য শিষ্যদের তিনি সর্বদা কড়া নজরে রাখতেন। নানান ব্রত পালন এবং কঠিন তপশ্চর্যার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন তাঁদের। পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পরেও সংযম ও সাধননিষ্ঠার সেই ধারায় এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। বিবেকানন্দ মাঝে মাঝেই গুরুগম্ভীর অথচ সুললিত সুরে মন্ত্র[১] এবং স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। নির্ভুল ও সুরেলা এই আবৃত্তির ভঙ্গি তিনি কাশীতে থাকার সময়ই রপ্ত করেছিলেন। বন্ধুদের অনুরোধে গাওয়া তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠের অপূর্ব গান আমিও শুনেছি। বক্তা হিসেবে তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল তেজোদৃপ্ত কিন্তু মধুর।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুহুর্মুহু সমাধি হতো। কোনরকম ঈশ্বরীয় উদ্দীপন হলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ হতেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের একটি ঘটনার কথা বলি। কেশবচন্দ্র সেনের দলের সঙ্গে সেইবার আমিও স্টীমারে পরমহংসদেবকে দর্শন করতে গিয়েছি। স্টীমারটি কেশববাবুর জামাই কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের, পরমহংসদেবকে সেই স্টীমারে ওঠানো হলো। সাধারণ মানুষ পরমহংসদেবকে কালী সাধক বলেই জানেন। কিন্তু তিনি নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানেও একই রকম তন্ময় হয়ে যেতেন। কেশববাবুর সঙ্গে আগে এই বিষয়ে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে, অনেক আলাপ-আলোচনাও হয়েছে। স্টীমারে উঠে পরমহংসদেব কেশব সেনের কাছে বসলেন। কেশববাবু তাঁর মুখোমুখি। সেদিনের সেই জলবিহারের আসরে পরমহংসদেবই ছিলেন প্রবক্তা, আর আমরা সব শ্রোতা। কখনও কেশববাবু, কখনও বা অন্য কেউ তাঁকে সংক্ষেপে দু-একটি প্রশ্ন করছিলেন আর তিনি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে, অপূর্ব উপমাসহায়ে কথার মালা গেঁথে শ্রোতাদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছিলেন। আমরা সকলেই রুদ্ধশ্বাসে তাঁর কথামৃত পানে মশগুল। ক্রমে এক সময়ে নিরাকার ব্রহ্মের কথা উঠল। 'নিরাকার' শব্দটি কানে যাওয়া মাত্রই পরমহংসদেব নিজে দু-তিনবার 'নিরাকার', 'নিরাকার' উচ্চারণ করলেন, আর তারপরই একেবারে সমাধিস্থ। সমাধিতে প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর দেহ টানটান শক্ত হয়ে গেল, পেশী ও স্নায়ুগুলি নিথর, নিস্পন্দ—কোনও আক্ষেপ বা বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই!

১ অন্য মতে, তিনি মারাঠী উচ্চারণ পছন্দ করতেন এবং আবৃত্তির ঐ ভঙ্গিটিই আয়ত্ত করেছিলেন—প্রকাশক।

কেবল কোলের ওপর রাখা হাতের আঙুলগুলি ঈষৎ বাঁকানো। কিন্তু আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল তাঁর শ্রীমুখখানিতে। আধখোলা ঠোঁটের ভিতর কুন্দ দাঁতের ঝিলিক, মুখে অপরূপ দিব্য মৃদু হাসি; অর্ধনিমীলিত দুটি চোখের আকাশে যেন দুটি কালো তারার ইশারা, অপার্থিব সুধারসে ঢলঢল দিব্য শ্রীমূর্তি! অবাক বিস্ময় ও নীরব শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা কিছুক্ষণ তাঁর সেই অনির্বচনীয় রূপসুধা পান করতে লাগলাম। তারপর শুরু হলো কেশববাবুর দলের প্রখ্যাত গায়ক-ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গান। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তিনি একটি স্তোত্র গাইলেন। গানের সুর কানে যেতেই পরমহংসদেব ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত আনমনা থাকার পর জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চেয়ে আবার আগের কথার খেই ধরে বলতে শুরু করলেন। তাঁর সমাধি প্রসঙ্গে কেউ কিছু বললেন না, তিনি নিজেও সে বিষয়ে কোনও কথা তুললেন না।

অন্য একবারের কথা। পরমহংসদেব বায়না ধরলেন আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখবেন। তাঁর রীতিই ছিল ঐ রকম; কোনও বিষয়ে ঝোঁক চাপলে তিনি তখন একেবারে সরল শিশুটি হয়ে যেতেন—এক মুহূর্তও তর সইত না। তাঁর সেই সময়কার কোনও কোনও অবস্থা দেখলে ভীষণভাবে মনে পড়ে যেত শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, যেখানে বলা হয়েছে শিশুসুলভ সরলতা এবং লীলাচাঞ্চল্য মুক্তপুরুষ এবং জ্ঞানীর অন্যতম লক্ষণ। যাই হোক, যথাসময়ে গাড়ি পাঠানো হলে পরমহংসদেব কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর থেকে আলিপুর এসে পৌঁছলেন। চিড়িয়াখানায় ঢুকেই সঙ্গীরা তাঁকে নানারকম জীবজন্তু, মাছ ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন। কিন্তু পরমহংসদেব সেসব তাকিয়েও দেখলেন না। তাঁর শুধু এক কথা—"আমাকে সিংহের কাছে নিয়ে চল। আমি সিংহ দেখব।" তাই হলো। তাঁকে সিংহের খাঁচার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ কেশরীকে দেখেই তাঁর ভাবান্তর হলো। "আহা! সাক্ষাৎ মায়ের বাহন!" অস্ফুটস্বরে এই কটি কথা উচ্চারণ করেই তিনি সমাধিস্থ হলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ ধরে না ফেললে তিনি নিশ্চিত পড়ে যেতেন। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে থাকার পর ধীরে ধীরে তাঁর মন বাহ্যভূমিতে নেমে এলে ভক্তেরা তাঁকে সমস্ত চিড়িয়াখানাটা ঘুরে দেখবার অনুরোধ করলেন। সে কথা শুনে তিনি বললেনঃ "পশুরাজকেই দর্শন করলাম। আর কি দেখব?" বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সেই গাড়িতে চড়ে তিনি তক্ষুনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন।

যে দুটি ঘটনার কথা বললাম তাতে আপাতদৃষ্টিতে এই কথাই মনে হওয়া

স্বাভাবিক যে, দুটি ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দুটি প্রেরণা পরমহংসদেবের সমাধির কারণ হিসাবে কাজ করেছিল। প্রথমটির বেলায় তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপিত করেছে বাক্য-মনের অতীত নিরাকার পরব্রহ্মের কথা; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি সমাধিস্থ হলেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ দেখে। উদ্দীপনার হেতু দুটি আপাতবিরুদ্ধ মনে হলেও লক্ষণীয় এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর মন একই রকমভাবে ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রেরণার ফলশ্রুতি অদ্বয় বিমূর্ত ব্রহ্মের উপলব্ধি এবং দ্বিতীয় প্রেরণা মায়ের বাহনের প্রতীকী রূপের আন্তর সত্য অনুভবের দ্বারা জগন্মাতার উপলব্ধিতে পর্যবসিত হলো। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর মনের সুতীক্ষ্ণ একমুখীতা, একটি বিশেষ অধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তদাকারাকারিত হয়ে যাওয়ার প্রবণতাটি লক্ষণীয়। এই সময় তাঁর সামনে থেকে দৃশ্যমান জগৎসংসার একেবারে মুছে যায় এবং তার ফলেই তিনি সমাধিস্থ হন। সমাধিস্থ অবস্থায় তোলা পরমহংসদেবের কোনও ছবিতেই ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা সেই জ্যোতির্ময় দেবতনুর প্রকৃত-রূপটি ফুটে ওঠেনি।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ যখন পরমহংসদেবের কাছে হাতেকলমে সাধনপ্রণালী শিখতেন সেই সময় তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা হলো তিনি নিরন্তর সমাধিতে লীন হয়ে থাকবেন। সেই অভিলাষের কথা শুনে পরমহংসদেব বললেন, তাঁর ঐ সাধ এখন পূর্ণ হওয়ার নয়, কারণ জগতে ধর্মভাব প্রসারের জন্য তাঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। কিন্তু বিবেকানন্দও ছাড়বার পাত্র নন। ফলে, এই কথাবার্তার পর একদিন ধ্যানে বসে তিনি সমাধিস্থ হন। পরমহংসদেবের কানে সে খবর গেলে তিনি বললেন ঃ "থাক কিছুক্ষণ ঐ ভাবে"। বিবেকানন্দ পরে বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। যখন সময় হলো, গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করে সত্য ও জ্ঞানের জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে তিনি সাগর পাড়ি দিলেন এবং পাশ্চাত্যের সামনে সগৌরবে ঘোষণা করলেন—জ্ঞানের আলো প্রাচ্য থেকেই আসে।

সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য পরিব্রাজক হয়ে বিবেকানন্দ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘ আট বছরের[১] ঐ পরিব্রাজক জীবনে তিনি যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিনি অনেকদিন ছিলেন। পেশাদার সাধুদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে ঐ সময়েই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়। সেখানকার তেলেগু ও তামিল

১ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যাওয়ার অনেক পরে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের শুরু। তাই তাঁর ভ্রমণকাল আট বছরের কম হবে।—প্রকাশক।

ভাষাভাষী মানুষের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। ঐ মাদ্রাজ অঞ্চলেই সর্বপ্রথম তাঁর চারপাশে এক গুণমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দ যখন বিহারে, ঐ প্রদেশে তখন দারুণ উত্তেজনা চলছে। সর্বত্র একটা থমথমে ভাব। কারণ ব্রিটিশ সরকারের তল্পিবাহকদের নজরে পড়েছে, কিছুদিন যাবৎ কে বা কারা যেন আমগাছের গায়ে সিঁদুর আর শস্যবীজ দিয়ে মাখা মাটির তাল লেপে দিয়ে যাচ্ছে। সব জেলাতেই প্রায় একই দৃশ্য। কথায় বলে ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। নাটকীয়ভাবে যাঁরা নিজেদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অছি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, এদেশের সেই সরকারেরও তাই হলো। তাঁরা এর মধ্যে একটা অশুভ ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে রাজ্যময় অজস্র গোয়েন্দা-পুলিশ এবং সাদা-পোশাকের টিকটিকি ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য—স্থানীয় মানুষের মতলবটা কি, তা খুঁজে বার করা। ধূর্ত গোয়েন্দার দল অনেক মাথা খাটিয়ে মাটির তালের সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের আগে যে ধরনের চাপাটির চল হয়েছিল তার একটা মিল খুঁজে পেল। শুরু হয় তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং পুলিশি আপ্যায়ন! সেই মধুর আচরণে শঙ্কিত হয়ে গ্রামের সরল মানুষ পুলিশের কাছে এজাহার দিল যে, কে বা কারা ঐ অলক্ষুণে মাটির তাল ফেলে যাচ্ছে, তা তারা কিছুই জানে না। গ্রামের মানুষকে দিয়ে কিছু কবুল করাতে না পারায় পুলিশ পড়ল মহা মুশকিলে। এইবার তাদের সব সন্দেহ গিয়ে পড়ল রমতা সাধুদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে সাধুদের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। কিন্তু এখনকার মতো সে সময় কোনও অর্ডিনান্স বা ঐ ধরনের বিধি চালু ছিল না, যার জোরে যাকে-তাকে অনির্দিষ্টকাল আটক রাখা যায়। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে শেষমেশ তাই নিরপরাধ সাধুদের ছেড়ে দিতে হলো। যাই হোক, পরে প্রকাশ পেল সিঁদুররাঙা ঐ কাদার তাল আসলে সৌভাগ্যের চিহ্ন। বেশি আম ফলবে বা শস্যের ভাল ফলন হবে, এই বিশ্বাসেই চাষিরা গাছের গায়ে ওগুলো লাগিয়েছিল। ঐ সময়ে বিবেকানন্দ প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অথবা কোনও গ্রাম্য মেঠো পথ ধরে চলতে শুরু করতেন। কেউ যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভিক্ষে দিত তো ভাল, নইলে যতক্ষণ পা চলে ততক্ষণ হাঁটতেন। গরমে অসহ্য হয়ে উঠলে পথের ধারে কোনও গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। রোজকার মতো একদিন সকালে আপনমনে তিনি হেঁটে চলেছেন। এমন সময় পিছন থেকে মনে হলো কে বা কারা যেন চিৎকার করে তাঁকে থামতে বলছে! বিবেকানন্দ ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, ইউনিফর্মপরা দাড়িওয়ালা এক অশ্বারোহী পুলিশ অফিসার ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সদলবলে তাঁর দিকেই

এগিয়ে আসছেন। কাছে এসেই অফিসার মহোদয় বাজখাঁই পুলিশি কণ্ঠে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বিবেকানন্দের সরল উত্তর ঃ "দেখতেই তো পাচ্ছেন খাঁ সাহেব, আমি সাধু।" 'সাধু' শুনেই সাব-ইনস্‌পেক্টরটি খেঁকিয়ে উঠলেন ঃ 'সাধু? সব বেটা সাধুই বদমায়েস। এখন ভালোয় ভালোয় চলে এস তো বাছাধন, তোমায় শ্রীঘরে চালান করার ব্যবস্থা করে দিই।' ধর্মপুত্র হিসেবে ভারতীয় পুলিশের যথেষ্ট সুনাম। তাই সে যদি কাউকে 'বদমায়েস' আখ্যা দেয় তো তাকে বদমায়েস হতেই হবে! কার ঘাড়ে কটা মাথা যে পুলিশের কথায় প্রতিবাদ করে! জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার কথায় বিবেকানন্দ মৃদুকণ্ঠে অফিসারটিকে প্রশ্ন করলেন ঃ "কতদিনের জন্য, খাঁ সাহেব?" উত্তর এল ঃ "তা কি করে বলব? দু-সপ্তাহ হতে পারে, আবার এক মাসও হতে পারে।" খাঁ সাহেবের আরও কাছে গিয়ে একান্ত অনুনয়ের সুরে বিবেকানন্দ বললেন ঃ "মাত্র একমাস? খাঁ সাহেব, দোহাই আপনার, পারেন না ছ-মাস, কি নিদেনপক্ষে তিন চার মাসের মতো আমাকে জেলে রেখে দিতে?" এ হেন আশ্চর্য আবদার খাঁ সাহেব বাপের জন্মে কখনও শোনেন নি। তিনি তাই আড় চোখে বিবেকানন্দের দিকে তাকালেন; হতাশা এবং বিরক্তিতে তাঁর থুতনিটা ঝুলে পড়ল। একটু সন্দেহের সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেন, এক মাসের বেশি জেলে থাকতে চাও কেন?" যেন খুব গোপন কিছু বলছেন এমনভাবে ফিসফিস্ করে বিবেকানন্দ বললেন ঃ "দূর দূর! এই বিরক্তিকর ভবঘুরের জীবন কাটানোর চেয়ে জেলে থাকা অনেক, অনেক বেশি আরামের। সকাল থেকে রাত অবধি হাঁটতে হাঁটতে পা যেন আমার বাঁকা হয়ে যায়; তাও রোজ খাবার জোটে না! উপোস তো লেগেই আছে। এর চাইতে জেলের ঘানি টানা ঢের সোজা। সেখানে তবু দু-বেলা দু-মুঠো পেটভরে খেতে পাব। খাঁ সাহেব, সত্যি সত্যি যদি আমাকে মাস কয়েক জেলে পুরে রাখতে পারেন তো আপনাকে আমি পরম হিতৈষী বন্ধু বলে স্বীকার করে নেব।" খাঁ সাহেবের উৎসাহে কে যেন এক বালতি জল ঢেলে দিল! যারপরনাই বিরক্ত ও হতাশ হয়ে তিনি বিবেকানন্দকে বলে উঠলেন—যাও, ভাগো।

পুলিশের সঙ্গে বিবেকানন্দের দ্বিতীয়বার ঠোকাঠুকি হয় খোদ কলকাতাতেই। তিনি তখন শহরের উপকণ্ঠে কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে একত্র থেকে সাধনভজন, স্বাধ্যায় এবং সাধ্যমতো মানুষের সেবা করে দিন কাটাচ্ছেন। সেই সময় হঠাৎ একদিন এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। অফিসারটির সঙ্গে তাঁদের পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তখন গোয়েন্দা-বিভাগের

সুপারিণ্টেনডেণ্ট, কর্মদক্ষতার জন্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে খেতাব ও পদকও পেয়েছেন। বিবেকানন্দকে একদিন দেখে তিনি তো আনন্দে আত্মহারা! বিবেকানন্দকে তিনি সেদিন রাত্রিতে তার বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। যথাসময়ে সেই সি. আই. ডি সুপারের বাড়িতে এসে বিবেকানন্দ দেখলেন, ঘরে আরও অনেক ব্যক্তি উপস্থিত। অবশেষে একে একে তাঁরা সকলে বিদায় নিলেও বিবেকানন্দ লক্ষ্য করলেন গৃহকর্তা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করছেন না। বরং তিনি একথা-সেকথা নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলাপ শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু তাঁর গলার স্বর আশ্চর্যরকম পাল্টে গেল। বিবেকানন্দের দিকে ক্রূর দৃষ্টি হেনে, চাপা গলায় তিনি বললেন ঃ "এবার ভালোয় ভালোয় আসল ব্যাপারটা খুলে বল তো চাঁদ! আমি তোমাকে বেশ ভালরকম চিনি; গাঁজাখুরি গপ্প বলে আমাকে তুমি ধাপ্পা দিতে পারবে না। বাইরে তোমরা ধর্ম ধর্ম করে বেড়ালেও, আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ আছে, আসলে তোমারা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ।" বিবেকানন্দ তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ "এসব আবোল তাবোল কি বলছেন আপনি? কোন্ ষড়যন্ত্র, কেনই বা ষড়যন্ত্র, আর ওসবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কি?" এই কথায়, ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ অফিসারটি বললেন, "আমিও তো ঠিক সেটাই জানতে চাইছি। সরকারের বিরুদ্ধে যে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র তোমরা চালাচ্ছ, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত; আর এও জানি তুমি হলে গিয়ে সেই দলের পাণ্ডা। ঝেড়ে কাশো দেখি ভায়া। কথা দিচ্ছি, তাহলে আমি তোমাকে রাজসাক্ষী করে নেব।" "তা সবই যদি জানেন তো বাড়িঘর তল্লাসি করে আমাদের গ্রেফতার করছেন না কেন?"—এই কথা বলে বিবেকানন্দ উঠে পড়লেন এবং আস্তে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বিবেকানন্দের তখন বয়সও অল্প, তার ওপর ব্যায়ামকরা ইস্পাতের মতো শরীর। তুলনায় পুলিশ অফিসারটি রোগাপটকা এবং ল্যাগবেগে। তাঁর ওপর বোমার মতো ফেটে পড়ে বিবেকানন্দ এবার বললেন ঃ "মিথ্যে অছিলায় ডেকে এনে আপনি আমার ও আমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ করছেন। অবশ্য এটাই আপনার পেশা! কিন্তু জেনে রাখবেন, মানে-অপমানে অবিচল থাকার শিক্ষাই আমি পেয়েছি। তা যদি না হতো, যদি সত্যিই আমি অপরাধী বা ষড়যন্ত্রী হতুম, তাহলে টুঁ শব্দটি করার আগে, এই মুহূর্তেই আমি আপনার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতাম; কেউ আমাকে ঠেকাতে পারত না। কিন্তু সেসব কথা থাক। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি চললুম।" এই বলে দরজা খুলে

বিবেকানন্দ বেরিয়ে গেলেন আর জাঁদরেল পুলিশ অফিসারটি ভয়ে কেঁচো হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। বলা বাহুল্য, সেদিনের ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি বিবেকানন্দ এবং তাঁর অনুগামীদের আর কখনও ঘাঁটাতে সাহস পাননি।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক জীবনের আর একটি ঘটনা আমাকে বলেন। তবে বড় করুণ সে কাহিনী। পরিব্রাজক জীবনের সেই পর্বে বিবেকানন্দের সঙ্কল্প ছিল, সারাদিন শুধু হাঁটবেন। পিছন ফিরে তাকাবেন না অথবা কারও কাছে ভিক্ষাও চাইবেন না। কেউ যদি উপযাচক হয়ে কিছু দেয় তবেই তিনি পথচলা থামিয়ে তা গ্রহণ করবেন। সেই সময় এমনও গেছে যে পুরো চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টা তাঁকে উপবাসী থাকতে হয়েছে। একদিন সন্ধ্যার মুখে কোনও এক ধনীর আস্তাবলের পাশ দিয়ে চলেছেন, পরপর দু-দিনের অনাহারে শরীর দুর্বল, অবসন্ন। আস্তাবলের এক সহিস রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। বিবেকানন্দকে দেখে সে প্রণাম করে এবং জিজ্ঞাসা করে ঃ 'সাধুবাবা, আজ কি আপনার কিছুই খাওয়া হয়নি?' বিবেকানন্দ বললেন ঃ "ঠিকই বলেছ ভাই, আজ সারাদিন কিছুই খাইনি।" একথা শুনে সহিসটি তাঁকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে হাত-পা ধোওয়ার জল দিল। তারপর পরম যত্নে সে তার নিজের রাতের খাবারটিই তাঁকে খেতে দিল—কয়েকটা চাপাটি আর একটু ঝাল চাটনি। তবে বিবেকানন্দ তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে ঝাল খেতে যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ এমন বহু দিনই গিয়েছে ভাতের সঙ্গে যেদিন শুধু কয়েকটি লঙ্কাই তাঁর জুটত। আমি নিজের চোখেই দেখেছি, এক মুঠো বিষ-ঝাল কাঁচা লঙ্কা তিনি তৃপ্তি ভরে কচমচ করে চিবিয়ে খাচ্ছেন। যাই হোক, খিদের মুখে বিবেকানন্দ তো সেই চাপাটি ঝাল চাটনি দিয়ে খেয়ে নিলেন। কিন্তু খাওয়ার অনতিবিলম্বেই তাঁর পেটে এমন অসহ্য জ্বালা শুরু হলো যে প্রাণ যায় আর কি! যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সেই নিদারুণ দৃশ্য দেখে সহিসটি পাগলের মতো নিজের মাথা চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ 'হায় হায়, এ কী করলাম! শেষে কি না আমি সাধু হত্যা করলাম?' যতদূর মনে হয়, একেবারে খালি পেটে অতটা ঝাল চাটনি পড়াতেই ঐ রকম জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। যা হোক, ঠিক তখনই একটি লোক মাথায় ঝুড়ি নিয়ে ঐ রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিল। সহিসের কান্না শুনে সে থমকে দাঁড়ায়। তাকে দেখে বিবেকানন্দের জিজ্ঞাসা ঃ তোর ঝুড়িতে কি আছে, বাবা? লোকটি বললে—'তেঁতুল'। তেঁতুলের কথা শুনে উল্লসিত বিবেকানন্দ বললেন ঃ "আরে, যা চাইছিলাম, তা-ই!" সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তেঁতুল জলে

গুলে ঢকঢক করে খেয়ে নিলেন তিনি। ঐ তেঁতুলজল খাওয়ার পরই আস্তে আস্তে তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণা কমতে শুরু করল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি আবার চলতে আরম্ভ করলেন।

দুর্গম হিমালয়ে চলার পথে বিবেকানন্দ অনেক মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু কোনও বিপদ, কোনও বাধাই তাঁকে দমাতে বা টলাতে পারেনি। দুর্জয় সাহসে ভর করে, অফুরন্ত প্রাণশক্তি সম্বল করে একের পর এক চূড়ান্ত সংযমের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিতিক্ষামূলক যেসব ব্রত তিনি গ্রহণ করতেন, তার প্রতিটি পর্যায় ছিল ধ্যান, ঈশ্বর-নির্ভরতা, অটুট আত্মসংযম আর নিরন্তর সহ্য শক্তির অগ্নিপরীক্ষা। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় যখন তিনি সুদূর আমেরিকায় পৌঁছলেন তখন সম্পদ বলতে তাঁর ছিল বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি, অদম্য মনোবল এবং অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তি। শেষের গুণ দুটি তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভারত-পরিক্রমার দান। আমেরিকায় তাঁরই দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত গণ্যমান্য এক ব্যক্তি মিথ্যে কুৎসা রটিয়ে আমেরিকানদের চোখে তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সবরকম বাধাবিঘ্নের পাহাড় অতিক্রম করে বিবেকানন্দ শেষ পর্যন্ত শিকাগো ধর্মমহাসভায় পৌঁছে গেলেন এবং সেখানেই পেলেন স্বীকৃতির জয়মাল্য। স্মরণীয়, ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব ঐ সম্মেলনে সম্ভবত বিবেকানন্দই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। একজন হিন্দু সন্ন্যাসী—এছাড়া তাঁর অন্য কোনও পরিচয় ছিল না। ইউরোপ এবং আমেরিকা তখনও তাঁর গুরুর নাম শোনেনি। আবার দেশে-বিদেশে মস্ত পণ্ডিত, ধর্মগুরু বা নেতা বলেও তখন তাঁর কোনওরকম খ্যাতি ছিল না। এক কথায়, একজন অখ্যাত, অশ্রুত যুবক হিসাবেই ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রবেশ। জগতের সকল ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন এই মহাসম্মেলনে। ধার্মিক ও বিদ্বান প্রতিনিধিরা এসেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। বাস্তবিক এর চেয়ে বিদগ্ধ, উন্নাসিক, তথা আবেগবর্জিত সমাবেশের কথা কল্পনাই করা যায় না। প্রত্যেকেই প্রবীণ এবং খ্যাতিমান, কারও কারও আবার জগৎজোড়া নাম; আপন আপন ধর্মশাস্ত্রে তাঁদের সুগভীর পাণ্ডিত্য। অধিকাংশই বিশ্বের নানা ধর্মসংগঠন ও সম্প্রদায়ের মাথার মণি। এই মহাসম্মেলন বা পার্লামেন্ট কোন ভোটে জিতে আসা রাজনীতিবিদদের সমাবেশ ছিল না। বহু বছরের অভ্যাস, আত্মসংযম এবং ধ্যানধারণার ফলে যাঁদের জীবনবোধ পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ, যাঁরা অন্যের কথায় মোটেই ভোলেন না, দেশবিদেশের এমন-সব বাছাইকরা সেরা সেরা মানুষ নিয়েই শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা,

প্যাগোডা, সিনাগগের নির্মল প্রশান্তি ছেড়ে বিশ্বের দরবারে আপন আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই সমবেত হয়েছিলেন। সেদিক থেকে প্রাচ্যের অজ্ঞাতকুলশীল তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কোনও তুলনাই চলে না। কোনও যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ধর্মমহাসভায় অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পাননি; বরং বলা চলে, তাঁকে যেন কতকটা অনুগ্রহ করেই সম্মেলনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেদিনের সেই মহতী জগৎসভায় তুফান তুললেন নামগোত্রহীন অনাহূত এই বিবেকানন্দ-ই! অতঃপর মাথায় পাগড়ি এবং গেরুয়া আলখাল্লা-পরা ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী রাতারাতি কিভাবে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলির শিরোনাম হয়ে উঠেছিলেন, কিভাবে আমেরিকার নারী-পুরুষ তাঁকে একটুখানি দেখবার আশায়, একটি কথা শোনার আকাঙ্ক্ষায় সর্বত্র ভিড় করতেন—সেসব কথা আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস। সিজারের সংক্ষিপ্ত, বিজয়গর্বে দৃপ্ত সেই বিখ্যাত উক্তিটি সামান্য রদবদল করে এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারেঃ বিবেকানন্দ গেলেন, দেখা দিলেন, বললেন এবং জয় করলেন। বাস্তবিক, অপরিচিতির অন্ধকার থেকে মানুষটি যেন এক লাফে খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গেলেন! সত্যিই এটা কি দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার বা অভূতপূর্ব ঘটনা নয় যে, সেদিনের সেই ধর্মমহাসভায় অনেক রথী-মহারথীর উপস্থিতি সত্ত্বেও কেবল একটি নামই পৃথিবীর মানুষ আজ মনে রেখেছে—এবং সেই নামটি বিবেকানন্দ? সত্যি কথা বলতে কি, সব ধর্মের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা ঐ সভায় উপস্থিত থাকলেও বিবেকানন্দের জুড়ি কেউ ছিলেন না। বয়সে নবীন হলে কি হয়, যে কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শের দ্বারা বিবেকানন্দের চেতনা পরিমার্জিত হয়েছিল এবং যে অনন্য আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা অন্যান্যদের নাগালের বাইরে ছিল। এমন একজন গুরুর পদপ্রান্তে বসে তাঁর শিক্ষা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁর মতো মহাপুরুষ বহু শতবর্ষের মধ্যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হননি।

বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম এই ভারতবর্ষ। দারিদ্র যে কী ভয়ানক, ক্ষুধার জ্বালা যে কী নিদারুণ নির্মম হতে পারে, বিবেকানন্দ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন; আর বুঝেছিলেন বলেই তিনি এই দেশের সবচাইতে হতভাগ্য নিপীড়িত মানুষগুলির খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন, হতে পেরেছিলেন তাদের ব্যথার ব্যথী। সনাতন আর্যঋষিদের শাশ্বত প্রজ্ঞার উৎসমুখ থেকে তিনি জ্ঞানসুধা আহরণ করেছিলেন, যার ফলে নির্ভীক হৃদয়ে প্রবল বীর্যবত্তায় বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছিলেন। ধর্মমহাসভায় তাঁর কণ্ঠস্বর যখন দুন্দুভির মতো

বেজে উঠল, শ্রোতাদের হৃদস্পন্দন গেল বেড়ে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, কারণ তখন তাঁর কম্বুকণ্ঠে উদ্গীত সেই স্বর যা দীর্ঘকাল নীরব থেকেও কখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি এবং পুনরায় যা নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত। বস্তুত, ঐ জগৎসভায় বিবেকানন্দের চেয়ে মহত্তর পরিচয়পত্র নিয়ে কেউ গিয়েছিলেন কি? প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ বলিষ্ঠ শরীর, সুন্দর মুখমণ্ডল, দীপ্র দীঘল চোখ, আর এমন গম্ভীর অথচ সুললিত কণ্ঠস্বরের অধিকারীই বা আর কে ছিলেন? এক কথায়, বৈদিক ভারতের প্রজ্ঞা ও অধ্যাত্মশক্তি, আর্যদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও সমমর্মিতা সেদিন যেন বিবেকানন্দের মধ্যে শরীরী হয়ে উঠেছিল। অমিত তেজে মুহুর্মুহু ঝলসে উঠছিলেন তিনি, আর সেই দিব্যশক্তির নিরন্তর বিচ্ছুরণে চারপাশের শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত, বিমুগ্ধ।

বিবেকানন্দের আগে একাধিক ব্যক্তি প্রাচ্যের বার্তা নিয়ে পাশ্চাত্যে গিয়েছেন। তাঁরা সকলেই যে বাগ্মী, কৃষ্টিবান এবং ধর্মজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁদের কেউই বিবেকানন্দের মতো পাশ্চাত্যবাসীর মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেননি। তাঁদের প্রায় সকলেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এক ধরনের হীনমন্যতার সুর। প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তাঁরা উন্নততর মনে করেছেন এবং শ্রদ্ধায় নতজানু হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন পাশ্চাত্যকে শিক্ষা দেবার মতো ধৃষ্টতা তাঁদের নেই, তাঁরা এসেছেন শুধু শিখতে। অল্পবিস্তর সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখধাঁধানো বাহ্যিক ঠাটবাট দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ সবের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম স্বামী বিবেকানন্দের না ছিল সেই দুর্বলতা, না ছিল কোন সংশয়। তিনি জানতেন এমন এক দেশ থেকে তিনি এসেছেন যে দেশ অধিকাংশ জগদ্গুরুর জন্মভূমি। পশ্চিমের চাকচিক্য বা জৌলুসের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্মোহ, নিরাসক্ত; তাঁর কণ্ঠে তাই সতত অনুরণিত হয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। আর তার ফলেই একদিকে যেমন বহু মানুষ তাঁর শিক্ষার আলোয় নিজেদের নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন, অন্যদিকে লক্ষ্য করা গেল তাঁর গুণমুগ্ধদের মধ্যে এক ধরনের অগভীর ভাবাবেগ। একদিকে যেমন অপরিণত ও ভাবপ্রবণ যুবতীদের কাছ থেকে তাড়া তাড়া প্রেমপত্র আসতে লাগল, অন্যদিকে তেমনই চতুর্দিক থেকে এলো রকমারি সাহায্যের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি। সকলেই তাঁকে একটু সেবা করতে পারলে যেন কৃতার্থ হন—এই ভাব। এক দাঁতের ডাক্তার জানালেন, যখনই প্রয়োজন হবে তিনি বিনা পয়সায় বিবেকানন্দের দাঁত পরিষ্কার করে দেবেন। এক নখ-প্রসাধক আবার তাঁকে উপহার দিলেন নখকাটার এক

সেট শৌখিন যন্ত্রপাতি, যে জিনিস ভারতীয় সন্ন্যাসীর কোনও কাজেই লাগে না। এই সময়ে মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেবার একটি ভাল প্রস্তাবও বিবেকানন্দের কাছে আসে। কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, কারণ তাঁর তখনকার ব্রত অনুযায়ী কোনওভাবেই অর্থ উপার্জন বা জমানো চলত না। প্রস্তাবে সম্মত হলে অবশ্য দেশে ফিরে বিবেকানন্দের মঠ প্রতিষ্ঠার কাজের অনেকটা সুরাহা হতো।[১]

আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া তিনি ঘরোয়া ক্লাসও নিতেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এবং বিবেকানন্দের কাছে অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভ করতে আগ্রহী এমন কিছু পুরুষ ও মহিলা এই ধরনের ক্লাসে আসতেন। বিদেশে বিবেকানন্দের শিষ্য-শিষ্যারা সংখ্যায় যে খুব বেশি ছিলেন তা নয়, কিন্তু অনেকের মনেই তিনি নতুন ভাবনার বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই সকলের হৃদয়ে তাঁর অনিন্দ্য ব্যক্তিত্বের অমোঘ ছাপ পড়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার পাশ্চাত্যে যান, তখন তিনি এক অজ্ঞাত তরুণ সন্ন্যাসী। কিন্তু দেশে ফেরার আগেই তামাম আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই যখন স্বদেশে ফিরলেন, সর্বত্রই ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে প্রাচীন আর্যধর্মের প্রবক্তা ও আচার্যরূপে অভিনন্দন জানালো। মাদ্রাজে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কলকাতায় যে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তার কয়েকজন উদ্যোক্তা, কি ভেবে তা তাঁরাই জানেন, স্বামীজীকে অনুষ্ঠানের খরচের একটি বিল পাঠিয়ে দেন। একদিন আমার কাছে সেই ঘটনার কথা বলতে বলতে বিবেকানন্দ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন ঃ "সংবর্ধনায় আমার কি প্রয়োজন? লোকগুলো ভেবেছে, আমেরিকা থেকে আমি পকেটভর্তি টাকা এনেছি, আর সেই টাকা নিজের ঢাক পেটানোয় খরচ করব! ওরা আমাকে কি ভাবে? আমি কি সার্কাসের জোকার, না আহাম্মক?" ঐ ব্যাপারে বিবেকানন্দ স্বভাবতই অত্যন্ত বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ ভারতে ফিরে এলে উৎসাহী যুবকেরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেবার জন্য তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করে তাঁরা দেশের নানা প্রান্তে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য

১ প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী লেকচার ব্যুরোর প্রস্তাবে রাজি হয়ে কিছুকাল আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—প্রকাশক।

দেশগুলিতেও বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে এবং তাঁর পুণ্যস্মৃতি জাগিয়ে রাখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকাতেও বেলুড় মঠের কয়েকটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মুখে শুনেছি, পরমহংসদেব ব্রহ্মচর্য এবং চারিত্রিক পবিত্রতাকে ধর্মজীবনের মেরুদণ্ড বলে মনে করতেন। বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে তো বটেই, তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও যাঁরা এই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও এই দুটি গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি সন্ন্যাসীই পবিত্রচেতা, প্রত্যেকের জীবনই নির্মল; প্রত্যেকেই শিক্ষিত, মার্জিত এবং সাধ্যমতো মানুষের সেবায় নিয়োজিত। তাঁদের এই নীরব, নিঃস্বার্থ সেবার দৃষ্টান্তে দেশের মানুষ অবশ্যই উপকৃত হচ্ছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাওয়ার আগে তাঁকে আমি শেষ দেখি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। সেবার দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। একদিন বিকেলে খবর পেলাম রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মহাসমাধিতে লীন হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে (কাশীপুর) উদ্যানবাটীর পথে যাত্রা করলাম। উত্তর কলকাতার এই কাশীপুরেই পরমহংসদেব তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে দেখি, বারান্দার সামনে ধবধবে সাদা বিছানায় পরমহংসদেব শুয়ে আছেন। তাঁর খাটখানি ঘিরে কয়েকজন ভক্ত মেঝেতে বসে। তাঁদের মধ্যমণি বিবেকানন্দ। কোনও মতে চোখের জল সামলে ছলছল দুটি চোখ মেলে বসে আছেন। পরমহংসদেবের ভাগবতী তনু তাঁর ডান দিকে ফিরে শায়িত। মৃত্যুর অখণ্ড নীরবতা এবং অসীম শান্তির চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। নৈঃশব্দ্য গাছের পাতায় পাতায়, শান্তির স্পর্শ সায়াহ্নের ম্লান আলোয়, ভাসমান মেঘের ভেলায়, আকাশের নীলিমায়। সর্বত্র এক সুমহান প্রশান্তি বিরাজিত। এই মহান মৃত্যুর সান্নিধ্যে আমরা যখন সকলেই অভিভূত ও নির্বাক হয়ে বসে আছি, ঠিক সেই মুহূর্তে বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ল। এ সেই 'পুষ্পবৃষ্টি' যার কথা আর্য ঋষিরা বলে গিয়েছেন। যখনই কোনও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ দেহত্যাগ করে অমৃতলোকের যাত্রী হন, তখনই দেবতারা এইরকম বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ফুল ঝরিয়ে দেন আকাশ থেকে। পরমহংসদেব যখন স্থূল শরীরে ছিলেন, তখন তাঁকে দর্শন করার দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি; আবার তাঁর দেহাবসানে ধ্যানতন্ময় সৌন্দর্যে বিভাসিত তাঁর মুখপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্যও আমার হলো।

বিবেকানন্দের সঙ্গে আবার দেখা হয় ঐ ঘটনার এগারো বছর পরে, ১৮৯৭

খ্রীস্টাব্দে। তখন তিনি প্রাচ্যে যেমন, পাশ্চাত্য জগতেও তেমনই বিখ্যাত। ইতোমধ্যে বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, বহু লোকের সঙ্গে মিশেছেন। আমি তখন লাহোরে। একদিন শুনলাম তিনি শৈলশহর ধরমশালায় আছেন। পরে সেখান থেকে তিনি জম্মু যান, অতঃপর জম্মু থেকে আসেন লাহোরে। লাহোরে তখন বিবেকানন্দকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তাঁর থাকবার জন্য একটি বাড়িও ঠিক করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ লাহোরে উপস্থিত হওয়ার দিন আমি রেলস্টেশনে ছিলাম। ট্রেন থামতেই দেখি, প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে সেনাবাহিনীর এক ইংরেজ অফিসার নেমে এসে কামরার দরজাটি খুলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠিক পরমুহূর্তেই প্ল্যাটফর্মে অবতরণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অফিসারটি তাঁকে অভিবাদন করেই চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁকে থামিয়ে করমর্দন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সৌজন্যমূলক দু-একটি কথাও বললেন। বিবেকানন্দকে পরে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমাকে বলেন, ঐ ইংরেজ অফিসারটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। ট্রেনের কামরায় উঠে ভদ্রলোক বলেন তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল। এবং ইংল্যাণ্ডে তিনি তাঁর (বিবেকানন্দের) কিছু বক্তৃতা শুনেছেন।

বিবেকানন্দ এবার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছিলেন, কারণ জম্মুর ভক্তরাই উদ্যোগ করে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে দিয়েছিলেন। যা হোক, সেই রাতেই দুই শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমার বাড়ি চলে আসেন। সেই রাতে এবং পরবর্তী দিনে-রাতে যখনই সময়-সুযোগ পেয়েছি, তখনই আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করেছি। এবং সেই সময়ে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসার গভীরতা লক্ষ্য করে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। তাঁর আধ্যাত্মিক আকুতির সঙ্গে ক্ষুরধার বুদ্ধির নিখুঁত মিলন ঘটেছিল। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির সমাধান-সূত্রও খুঁজে বার করেছেন। বাস্তবিক সব বিষয়েই তাঁর এক দৈবী-অন্তর্দৃষ্টি ছিল।

বিবেকানন্দ বলতেন ঃ "ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। অবিচল, দৃঢ়, লাগাতার সংগ্রামের শক্তি এদের নেই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জনসাধারণের উপর।" একদিন বিকেলে চিন্তান্বিত মুখে আমার কাছে এসে তিনি বললেন ঃ "দেখুন, আমি জেলে গেলে দেশের যদি এতটুকু

মঙ্গল বা উপকার হয় তো এই মুহূর্তে আমি কারাবাসের জন্য প্রস্তুত।" তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত! বিশ্ববাসীর দেওয়া জয়মুকুট এখনও তাঁর মাথায় জ্বলজ্বল করছে! অথচ সে সবের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে দেশের কল্যাণের জন্য কারাজীবন বরণ করে ধন্য হওয়ার কথা তিনি ভেবে চলেছেন। এই আত্মোৎসর্গের চিন্তায় তিনি পুলকিত। এই ত্যাগের বিনিময়ে তিনি শহিদের মর্যাদা কামনা করেন নি, কারণ কোনওরকম লোকদেখানো ভাব ছিল সম্পূর্ণ তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। কষ্টের বিনিময়ে দেশের দুঃখমোচনের কথাই কেবল তিনি ভাবছিলেন। অসহযোগ বা আইন-অমান্য আন্দোলনের কথা তখনও কেউ শোনেনি। তবুও রাজনীতির সঙ্গে যাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেই বিবেকানন্দের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে অনাগত ঘটনাপ্রবাহের ছায়া।

জাপানে গিয়ে জাপানিদের দেশপ্রেম দেখে তিনি মুগ্ধ। ওদের দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে উৎসাহে উদ্দীপনায় তাঁর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠত। তিনি বলতেন ঃ "দেশই ওদের ধর্ম। ওদের জাতীয় স্লোগান হলো 'দাই নিপ্পন্ বনজাই'—অর্থাৎ মহান জাপান দীর্ঘজীবী হোক! দেশ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। দেশের সম্মান ও সংহতি রক্ষার জন্য ওরা যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।"

একদিন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক (প্রয়াত বক্সী জয়শী রাম) বিবেকানন্দ ও আমাকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। পাঞ্জাবের শৈলশহর ধরমশালাতে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলে তিনি ধূমপানের জন্য বিবেকানন্দকে একটি নতুন সুন্দর হুঁকো এনে দেন। কিন্তু ঐ হুঁকোয় তামাক খাওয়ার আগে বিবেকানন্দ গৃহস্বামীকে বললেন ঃ "দেখুন, জাতের বিচার থাকলে আপনার হুঁকো আমাকে না দেওয়াই ভাল, কারণ আমি জাতপাতের বাইরে; কালই যদি কোনও ঝাড়ুদার আমাকে তার হুঁকোয় তামাক সেজে দেয়, আমি সানন্দে তা গ্রহণ করব।" বিবেকানন্দের কথা শুনে গৃহস্বামী সবিনয়ে জানান, স্বামীজী তাঁর হুঁকোয় ধূমপান করলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাঁর পরিব্রাজক-জীবনেই। সেই সময়ে তিনি দরিদ্রতম এবং তথাকথিত নীচজাতির লোকের দেওয়া খাবার খেয়েছেন—এমন লোকের দেওয়া, উঁচুজাতের মানুষ যাদের স্পর্শ করার কথা ভাবতেও পারেন না। শুধু তাই নয়, তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে কোনওরকম

ছদ্মবিনয় এবং হীনমন্যতার ভাব ছিল না, ছিল না লেশমাত্র ভীরুতা। লাহোরে বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সগর্বে মাথা উঁচিয়ে, নাক ফুলিয়ে, তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন ঃ "নিজের জন্য যাঁরা গর্ববোধ করেন, আমি তাঁদেরই একজন।" বিবেকানন্দের এই সগর্ব ঘোষণার মধ্যে অসার অহঙ্কারের কণাটুকু ছিল না। এই গর্ব এক মহান উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার প্রকাশ, আবার দেশ ও জাতিকে যা উচ্ছন্নে নিয়ে গেছে, সেই কপট বিনয় বা দীনহীনভাবের প্রতি ঘৃণার অভিব্যক্তিও।

গুডউইনকে আমি দেখেছি। জীবনের একটি পর্বে এই তরুণ ইংরেজ সন্তানটি গোল্লায় যেতে বসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে গুডউইন তাঁর একনিষ্ঠ ও পরম অনুগত ভক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি সুদক্ষ স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, অতি দ্রুত ও নির্ভুল নোট নিতে পারতেন। বিবেকানন্দের অধিকাংশ বক্তৃতা তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর স্বভাবটি ছিল শিশুর মতো সরল। কারও সামান্য ভাল ব্যবহার, কি ভালবাসা পেলে তিনি একেবারে গলে যেতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকজন বিদেশিনী শিষ্যার সঙ্গেও পরে আমার পরিচয় হয়। যেমন শ্রীমতী ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড এবং প্রতিভাময়ী আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবল, যাঁকে বিবেকানন্দ একটি সুন্দর, সার্থক নাম দিয়েছিলেন—নিবেদিতা। ভারতের কল্যাণযজ্ঞে তিনি নিবেদিত—তাই এই নাম, নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতাকে আমি প্রথম দেখি কাশ্মীরের শ্রীনগরে। পরে লাহোরে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। তারও পরে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কলকাতায়। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে তিনি একাধিকবার এসেছেন। আমি তাঁকে লাহোরের বস্তিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি। আর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম রামলীলা। রামলীলা তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তিনি নানা প্রশ্ন করতেন, সব কিছু জানতে চাইতেন। প্রথম যখন তিনি ভারতবর্ষে এলেন তখন তাঁর স্বাস্থ্য চমৎকার। তারপর কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরও দ্রুত ভাঙতে শুরু করল। ভারতের সেবায় নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে গেলেন তিনি। প্রখর চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং সাহিত্য-প্রতিভার স্থায়ী সাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর অপূর্ব গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায়।

বিবেকানন্দের কথাবার্তা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, আলোকপ্রদ এবং সেই সঙ্গে আকর্ষণীয়; আর তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অসাধারণ ও অসীম। তাঁর চিন্তা

এবং আলাপ-আলোচনার অনেকটাই জুড়ে থাকত তাঁর মাতৃভূমি। তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর সুগভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যে অনুভূতির আলোকপ্রদ ব্যাখ্যা তাঁর অজস্র বক্তৃতায় ছড়িয়ে আছে। আবার তাঁর দেশপ্রেম তাঁর ধর্মচিন্তার মতোই গভীর ছিল। ইংরেজ ও আমেরিকান শিষ্যমণ্ডলীর ওপর স্বামী বিবেকানন্দের যে কি আশ্চর্য প্রভাব ছিল তা যাঁরা চোখে দেখেন নি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না। যে সরল মুসলমান বাবুর্চিটি আলমোড়ায় ভগিনী নিবেদিতা ও বিবেকানন্দের অন্যান্য শিষ্যাদের রান্নাবান্না করত, ব্যাপারটা তাকেও অবাক করেছিল। লাহোরে সে একদিন আমাকে বলে ঃ "ঐ মেমসাহেবরা স্বামীজীকে যে রকম ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, আমাদের মধ্যে 'মুরিদ' রাও (শিষ্যরা) 'মুর্শিদ'-কে (ধর্মগুরুকে) তেমনটি করে উঠতে পারে না।" বাস্তবিক, পরনে তো ঐ একটা গেরুয়া আলখাল্লা আর পায়ে মোটা ভারতীয় চটি! কিন্তু তাতেই তাঁকে দেখামাত্র তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যেরা সসম্ভ্রমে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন এবং সাগ্রহে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তাঁর এই শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কলকাতায় বসবাসকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল-জেনারেল এবং তাঁর স্ত্রী-ও ছিলেন। বিবেকানন্দের সামান্য কোনও ইচ্ছাকেই তাঁরা আদেশ বলে মনে করতেন এবং তা পালন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করতেন না। কিন্তু এত সব কিছু সত্ত্বেও বিবেকানন্দ যেমন, তেমনই ছিলেন—সহজ, নিরহঙ্কার, মহান পুরুষ; সকল বিষয়ে আগ্রহী, স্পষ্টবক্তা, গুরুগম্ভীর। হিন্দুধর্মের আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য বিবেকানন্দ এক বিশিষ্ট, প্রখ্যাত ইংরেজ মহিলার সমালোচনা করেছিলেন। সেই মহিলা একবার আলমোড়ায় এসে বিবেকানন্দের কাছে জানতে চান, তাঁর দোষটা কোথায়। উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ "দেখ, তোমরা ইংরেজরা আমাদের দেশ অধিকার করেছ, আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছ; নিজেদেরই ঘরে আমাদের গোলাম বানিয়ে ছেড়েছ। এদেশের ধনসম্পদ নিজেদের দেশে চালান করছ। এত করেও তোমাদের আশা মেটেনি। আমাদের থাকার মধ্যে আছে শুধু ধর্ম। এবার সেদিকেও তোমরা হাত বাড়িয়েছ! আমাদের ধর্মও অধিকার করে তোমরা আমাদের ধর্মগুরু হতে চাইছ!" ভদ্রমহিলা স্বামীজীর কথার উত্তরে বিনীতভাবে জানালেন, তিনি শুধুই এক শিক্ষার্থী, আচার্য সাজার ধৃষ্টতা তাঁর নেই। তাঁর ঐ কথায় বিবেকানন্দ নরম হলেন। পরে ঐ ভদ্রমহিলা এক সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং স্বামীজী সেখানে সভাপতিত্ব করেন।

পরের বছর কাশ্মীরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলো। ঝিলমের বুকে আমাদের

হাউসবোট দুটি পাশাপাশি নোঙর করা থাকত। কলকাতা ফেরার পথে দিনকয়েকের জন্য তিনি আমার লাহোরের বাড়িতে ছিলেন। এই সময়েই তিনি বুঝতে পারেন তাঁর মৃত্যুর দিন আসন্ন। নির্বিকার চিত্তে তিনি আমাকে বলেন ঃ "আর তিন বছর বাঁচব। এখন একমাত্র ভাবনা—এই সময়ের মধ্যে আমার যেসব পরিকল্পনা আছে সেগুলো বাস্তবায়িত করতে পারব কি না।" ঠিক প্রায় তিন বছর পরেই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন। মহাসমাধির অল্প কয়েকদিন আগে তাঁকে শেষবারের মতো দর্শন করি বেলুড় মঠে। সেই দিনটি ছিল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্য আবির্ভাব-দিবস। নাম-সংকীর্তন যখন তুঙ্গে উঠেছে, তখন দেখলাম ভাবে মাতোয়ারা স্বামী বিবেকানন্দ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছেন, আর মঠের সেই পবিত্র রজ মুঠো মুঠো নিয়ে নিজেরই মাথায় রাখছেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন কোনও ভাবনা নেই যা তিনি ভাবেন নি। এমন কোনও দিক নেই যা নিয়ে তিনি চিন্তা করেন নি এবং তাঁর সেই ভাব-সম্পদ তিনি স্বদেশ তথা গোটা বিশ্বকেই উজাড় করে দিয়ে গেছেন। জগৎ তাঁকে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ এবং পরাশান্তির প্রবক্তাদের অন্যতমরূপে চিরকাল স্মরণ করবে। ইতোমধ্যে তিন মহাদেশের মানুষ তাঁর বাণী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। দেশবাসীর হাতেও তিনি তুলে দিয়েছেন অমূল্য উত্তরাধিকার। সেই উত্তরাধিকার অমিত বীর্যের, অফুরন্ত প্রাণশক্তির, অদম্য ইচ্ছাশক্তির। ভারতের সামনে আজ নতুন ভবিষ্যৎ। নতুন প্রভাত আসন্ন। নব-অরুণোদয়ের প্রাক্-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অভীঃ মন্ত্রের আচার্য বীর বিবেকানন্দ যেন ঘোষণা করছেন ভারতবর্ষের নবযুগের আবির্ভাবের—যখন সে আবার জগৎসভায় তাঁর শ্রেষ্ঠ আসনখানি অধিকার করে নেবে।

(প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ এবং এপ্রিল ১৯২৭)

বাল গঙ্গাধর তিলক

শিকাগো বিশ্বমেলায় বিখ্যাত সেই ধর্মমহাসভা আরম্ভের কিছুদিন আগের ঘটনা। সে বোধহয় ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কথা। বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে পুনায় ফিরছি। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে এক সন্ন্যাসী আমার কামরায় উঠলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন গুজরাটী ভদ্রলোক—তাঁরা সন্ন্যাসীকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন। তাঁরাই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর বললেন পুনায় তিনি যেন আমার বাড়িতেই থাকেন। যথাসময়ে পুনায় পৌঁছে সন্ন্যাসী মহারাজ আমার বাড়িতেই আট-দশদিন থাকেন। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর একমাত্র পরিচয় তিনি সন্ন্যাসী। পুনায় তিনি কোনও জনসভায় ভাষণ দেননি। তবে আমাদের বাড়িতে প্রায়ই অদ্বৈততত্ত্ব ও বেদান্ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। সামাজিক মেলামেশা তিনি এড়িয়ে চলতেন। কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর থাকার মধ্যে ছিল একখানি মৃগচর্ম, দু-একটা কাপড়, আর একটি কমণ্ডলু। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় কেউ না কেউ তাঁকে ট্রেনের টিকিট কেটে দিতেন।

মহারাষ্ট্রে মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা না থাকায় স্বামীজী খুব আশা করতেন, প্রাচীন বৌদ্ধযুগের যোগীদের মতো এই অঞ্চলের উচ্চবর্ণের কিছু বিধবা মহিলা ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করবেন। আমার মতো স্বামীজীরও সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, ত্যাগ নয়, নিষ্কাম কর্মই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মবাণী—গীতা আমাদের সকলকে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নির্লিপ্তভাবে কর্ম করার কথাই বলেছেন।

সেই সময়ে আমি হীরাবাগের ডেকান ক্লাবের সদস্য ছিলাম। ঐ ক্লাবে সাপ্তাহিক অধিবেশন বসত। স্বামীজী একবার আমার সঙ্গে ওখানকার একটি সভায় যান। সেদিন সন্ধ্যায় কাশীনাথ গোবিন্দনাথজী (এখন প্রয়াত) একটি দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভাষণ শেষে সকলেই যখন চুপচাপ বসে আছেন, স্বামীজী উঠে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ঝরঝরে ইংরেজিতে গোবিন্দনাথজীর বক্তব্য বিষয়ের অন্য দিকটি নিয়ে আলোচনা করলেন। সেদিন উপস্থিত সকলেই

স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলেন। স্বামীজী তার পরে পরেই পুনা ত্যাগ করেন।

তারপর দু-তিন বছর[১] কেটে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরেছেন। শুধু শিকাগো ধর্মমহাসভাতেই নয়, পরে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তাঁর বিরাট সাফল্যের দরুন তাঁর নাম তখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে; আর তিনিও শিহরণ-জাগানো মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় প্রতিটি অভিনন্দনের উত্তর দিয়ে চলেছেন। সেই সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের ছবি দেখে পূর্বপরিচিত সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে গেল। আমার মনে হলো—আমার বাড়িতে যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন, নিঃসন্দেহে ইনিই তিনি। আমার অনুমান যথার্থ কি না যাচাই করার জন্য স্বামীজীকে একটি চিঠি দিলাম। লিখলাম, কলকাতায় ফেরার পথে তিনি যদি একবার পুনায় নামেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হই। যথাসময়ে স্বামীজীর কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেলাম। কোনওরকম ভণিতা না করেই তিনি জানিয়েছেন যে আমার অনুমানই ঠিক এবং তখন তিনি পুনায় আসতে পারছেন না বলে দুঃখিত। চিঠিটি এখন বেপাত্তা। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে 'কেশরী' মামলার নিষ্পত্তির পর যখন অনেক গোপন ও সাধারণ চিঠিপত্র পুড়িয়ে ফেলতে হয় তখনই নিশ্চয় এই চিঠিখানিও নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকবে।

অতঃপর একবার কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় গেলে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেলুড় মঠ দর্শনে যাই। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। চা খাওয়ান। কথাবার্তার মধ্যে স্বামীজী একটা মজার মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমি যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বাংলা দেশে তাঁর কাজ করি আর তিনি যদি মহারাষ্ট্রে গিয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তো বেশ হয়। তিনি বললেন ঃ "নিজের জায়গায় প্রভাব বিস্তার করা তত সহজ নয় যতখানি দূরাঞ্চলে।"

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি ১৯৩৪)

---

১ প্রকৃতপক্ষে তারও বেশি, কারণ স্বামীজী দেশে ফেরেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে।

হরিপদ মিত্র

হে পাঠক, আমার স্মৃতির দু-এক পাতা যদি পড়তে চাও তো একটু অপেক্ষা করে, প্রথমত পূজনীয় স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগে ধর্ম সম্বন্ধে আমার বোধাবোধ, বিদ্যা-বুদ্ধি, স্বভাব-প্রকৃতি কি রকম ছিল, তার আভাস একটু জানা দরকার; নাহলে তাঁর সঙ্গে বসবাস ও কথাবার্তা বলার যে কত দাম, তা বুঝতে পারবে না। প্রথম জ্ঞানোদয় থেকে এনট্রান্স পাশ করা পর্যন্ত (৫-১৮ বছর) ধর্মাধর্ম কিছুই বুঝতাম না; কিন্তু চতুর্থ ক্লাসে উঠতে না উঠতেই, ইংরেজি শিক্ষার ছিটেফোঁটা গায়ে লাগতে না লাগতেই, হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনাস্থা জন্মাল। তবুও মিশনারি স্কুলে আমাকে পড়তে হয়নি। (যা হোক) এনট্রান্স পাশ করার পর প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা (আমার পক্ষে) একেবারে অসম্ভব হলো। তারপর কলেজে পড়বার সময়, অর্থাৎ উনিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে ফিজিকস্ (Physics), কেমিস্ট্রি (Chemistry), জিওলজী (Geology), বটানি (Botany) প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র একটু-আধটু পড়লাম এবং হাক্সলে, ডারউইন, মিল, টিনডল, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য বিদ্বানদের সঙ্গে সম্বন্ধও একটু-আধটু হলো। ফলে জ্ঞানের বদহজমে যা হয়—ঘোর নাস্তিক হলাম। কিছুতেই বিশ্বাস নেই, ভক্তি কাকে বলে জানি না এবং তখনকার—আমি যে একটা হাত-পা-বিশিষ্ট অতি গর্বিত কিম্ভূতকিমাকার জীববিশেষ ছিলাম, এ কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। তখন সব ধর্মেই দোষ দেখতাম ও সকলকেই নিজের চাইতে হীন মনে করতাম—এ ভাবটা অবশ্য মনে মনে থাকত; প্রকাশ্যে কিন্তু অন্যরকম দেখাতাম।

খ্রীস্টান মিশনারিরা এই সময়ে আমার কাছে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। অন্য ধর্মের নিন্দাবাদ এবং দাঁও-প্যাঁচের (কথার মারপ্যাঁচের) সঙ্গে অনেক তর্ক-যুক্তি করে অবশেষে তাঁরা বোঝালেন যে, বিশ্বাস ছাড়া ধর্মরাজ্যে কিছুই হবে না। খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস করাটা প্রথমেই দরকার, তবেই তার নূতনত্ব ও অন্য সব ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যাবে। অদ্ভুত গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে কথায় কিন্তু পাষণ্ডের মন গললো না। পাশ্চাত্য বিদ্যার কৃপায় শিখেছি, "প্রমাণ ছাড়া কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।" মিশনারি প্রভুরা কিন্তু বললেন, "প্রথমে বিশ্বাস, পরে প্রমাণ।" কিন্তু মন বুঝবে কেন? সুতরাং কথার জোরে তাঁরা কোনও

মতে বিশ্বাস জন্মাতে পারলেন না। তখন তাঁরা বললেন, "বাইবেল মন দিয়ে সমস্তটা পড়া দরকার, তা হলেই বিশ্বাস হবে।" আচ্ছা, তাই করলাম। সৌভাগ্যক্রমে এই ব্যাপারে ফাদার রিভিংটন, রেভারেণ্ড লেট্ওয়ার্ড, গোরে ও বোমেণ্ট প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্বান এবং ভক্ত-মিশনারির সাহায্যও পেলাম। কিন্তু কোনওভাবে খ্রীস্টধর্মে বিশ্বাস জন্মাল না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, "আমার অনেক উন্নতি হয়েছে, ঈশার-ধর্মে বিশ্বাসও হয়েছে, কিন্তু জাত যাওয়ার ভয়ে খ্রীস্টান হচ্ছি না।" তাঁদের ঐ কথার ফলে ক্রমে অবিশ্বাসের ওপরও সন্দেহ জন্মাতে লাগল। অবশেষে এই স্থির হলো যে, তাঁরা আমার দশটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ সমাধানের পর আমার সই নেবেন। এইভাবে যখন দশম প্রশ্নের (সন্তোষজনক) উত্তরে আমি সই দেব, তখনই আমার হার হবে এবং তাঁরা আমাকে ব্যাপটিসম্ (Baptism) দেবেন বা তাঁদের ধর্মে অভিষিক্ত করবেন। বলা বাহুল্য, তিনটের বেশি প্রশ্নের সমাধান হওয়ার আগেই কলেজ ছেড়ে আমি সংসারে প্রবেশ করলাম। সংসারে ঢোকার পরেও সব ধর্মগ্রন্থই পড়ি; কখনও বা চার্চে, কখনও বা ব্রাহ্মমন্দিরে, কখনও বা দেবালয়ে যাই। কিন্তু কোন্ ধর্ম সত্য, কোন্ ধর্মই বা অসত্য, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টিই বা মন্দ কিছু বুঝতে পারলাম না। অবশেষে সিদ্ধান্ত করলাম, পরলোক আছে কি না, আত্মা অমর কিংবা মর—এসব কথা কেউই জানে না। তবে যে কোনও ধর্মেই হোক না কেন দৃঢ় বিশ্বাস করতে পারলে ইহজন্মে অনেকটা সুখ-শান্তি থাকে। আর সেই বিশ্বাসটা মানুষের অভ্যাসেই দৃঢ় হয়ে থাকে। তর্ক, বিচার বা বুদ্ধির দ্বারা ধর্মের সত্যাসত্য বোঝবার কারও ক্ষমতা নেই। ভাগ্য অনুকূল—প্রচুর মাইনের চাকরিও জুটল। তখন আমার অর্থেরও অনটন নেই, দশজন লোকেও ভাল বলে; সুখী হতে গেলে সাধারণ মানুষের যা প্রয়োজন তার কিছুরই অভাব থাকলো না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মনে সুখ-শান্তির উদয় হলো না। কি একটা অভাবের ছায়া প্রাণে সর্বদাই লেগে রইল। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলে যেতে লাগলো।

বেলগাঁ—১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দু-ঘণ্টা হলো সন্ধ্যে হয়েছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উকিলের সঙ্গে আমার বাসায় উপস্থিত হলেন। উকিল বন্ধুটি বললেন, "ইনি একজন বিদ্বান বাঙ্গালী সন্ন্যাসী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।" ফিরে দেখলাম—প্রশান্তমূর্তি, দু-চোখ থেকে যেন বিদ্যুতের আলো বের হচ্ছে, গোঁফদাড়ি কামানো, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় বাহানা চটিজুতো,

মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সেই অপরূপ মূর্তি স্মরণ হলে এখনও যেন তাঁকে চোখের সামনে দেখি। দেখে আনন্দ হলো—তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। কিন্তু তখন তার কারণ বুঝিনি। কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশাই কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটা ছাড়া আর হুঁকো নেই, আপনার যদি আমার হুঁকোয় তামাক খেতে আপত্তি না থাকে, তাহলে তাতেই তামাক সেজে দিতে বলি।" তিনি বললেন, "তামাক, চুরুট—যখন যা পাই, তখন তাই খেয়ে থাকি, আর আপনার হুঁকোয় খেতে কিছুই আপত্তি নেই।" তামাক সেজে দিলাম। তখন আমার বিশ্বাস, গেরুয়া-বেশধারী সন্ন্যাসী মাত্রেই জুয়াচোর! ভাবলাম ইনিও কিছু প্রত্যাশা করে হয়তো আমার কাছে এসেছেন। তাছাড়া, উকিল বন্ধুটি মারাঠী ব্রাহ্মণ, ইনি বাঙালী। বাঙালীদের মারাঠী ব্রাহ্মণের সাথে মিল হওয়া শক্ত; তাই বোধহয় আমার বাড়িতে থাকার জন্য এসেছেন। মনে মনে এইরকম নানা তোলপাড় করে তাঁকে আমার বাসায় থাকতে বললাম ও তাঁর জিনিসপত্র আমার বাসায় আনব কি না জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আমি উকিলবাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখেই তাঁর কাছ থেকে চলে এলে তাঁর মনে দুঃখ হবে, কারণ তাঁরা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন, অতএব আসার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাবে।" সে রাতে বড় বেশি কথাবার্তা হলো না; কিন্তু দু-চার কথা যা বললেন, তাতেই বেশ বুঝলাম, তিনি আমার চেয়ে হাজারগুণ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন, তবুও টাকাকড়ি ছোঁন না এবং সুখী হওয়ার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমার থেকে সহস্রগুণ সুখী। মনে হলো, তাঁর কিছুরই অভাব নেই, কারণ স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছাই নেই। আমার বাসায় থাকবেন না জেনে আবার বললাম, "যদি চা খাওয়ার আপত্তি না থাকে, তাহলে কাল সকালে আমার সঙ্গে চা খেতে এলে সুখী হব।" তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং উকিলটির সঙ্গে তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন। রাতে তাঁর বিষয় অনেক ভাবলাম; মনে হলো—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনও দেখিনি। মনে করতাম, যার পয়সা নেই তার মরণ ভাল; বাস্তবিক নিস্পৃহ সন্ন্যাসী জগতে অসম্ভব, কিন্তু সে বিশ্বাসে সন্দেহ উপস্থিত হয়ে এতদিনে তা শিথিল করল।

পরদিন ১৯ অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ। সকাল ছটায় উঠে স্বামীজীর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল। কিন্তু স্বামীজীর দেখা নেই। আর অপেক্ষা না করে আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী যেখানে

ছিলেন সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে মহাসভা। স্বামীজী বসে আছেন এবং কাছে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। স্বামীজী কারো সঙ্গে ইংরেজিতে, কারো সঙ্গে সংস্কৃতে এবং কারো সঙ্গে হিন্দুস্থানিতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই একেবারে দিচ্ছেন। আমার মতো কেউ কেউ হাক্সলের দর্শনকে প্রামাণ্য মনে করে, তাঁরই যুক্তি অবলম্বন করে স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাউকে ঠাট্টাচ্ছলে, কাউকে গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়ে সকলকেই নিরস্ত করছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করে অবাক হয়ে বসে শুনতে লাগলাম—ভাবতে লাগলাম, ইনি কি মানুষ, না দেবতা? কাজেই তাঁর সব কথা ঠিক ঠিক মনে নেই। যা মনে আছে তারই কয়েকটি লিখছি।

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্র সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলো বুঝি না। আমাদের ঐ সব মন্ত্রোচ্চারণের কিছু ফল আছে কি?"

স্বামীজী উত্তর দিলেন ঃ "অবশ্যই উত্তম ফল আছে; ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে ঐ কটি সংস্কৃত মন্ত্র তো ইচ্ছে করলে অনায়াসেই বুঝে নিতে পার, তবুও নাও না। এ কার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝতে পার, যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বস, তখন ধর্ম-কর্ম করছ মনে কর, না কিছু পাপ করছ মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করছ মনে করে বস, তাহলে উত্তম ফল লাভ করতে তাই যথেষ্ট।"

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বললেন, "ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নয়, অমুক পুরাণে এইরকম লেখা আছে।" স্বামীজী উত্তর করলেন ঃ "যে কোনও ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়।" এবং এই কথার সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, "হাইকোর্টের রায় নিম্ন আদালত খণ্ডন করতে পারে না।"

এইভাবে নটা বেজে গেলে, যাঁদের অফিস বা কোর্টে যেতে হবে, তাঁরা চলে গেলেন। কেউ বা তখনো বসে রইলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার ওপর পড়ায়, আগের দিনের চা খেতে যাওয়ার কথা স্মরণ হওয়ায় বললেন, "বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করে যেতে পারিনি, মনে কিছু করো না।" পরে আমি তাঁকে আমার বাসায় এসে থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বললেন, "আমি যাঁর অতিথি, তাঁর মত করতে পারলে আমি তোমারই কাছে থাকতে প্রস্তুত।" উকিলটিকে বিশেষ বুঝিয়ে স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে আমার

বাসায় এলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি বই। স্বামীজী তখন ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানা বই পড়তেন। পরে বাসায় এসে দশটার সময় চা খাওয়া হলো; তারপরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চেয়ে খেলেন। আমার নিজের মনে যে সমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সেসব তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সহসা ভরসা হচ্ছে না বুঝতে পেরে তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দু-কথাতেই বুঝে নিলেন।

ইতঃপূর্বে 'টাইমস্' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন্ ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝে ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখেছিলেন। সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঠিক মিলে যাওয়ায়, আমি তা যত্ন করে রেখেছিলাম। তাই তাঁকে পড়তে দিলাম। পড়ে তিনি বললেন ঃ "লোকটা গোলমালে পড়েছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়তে লাগলো। খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে—"ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান, একই সঙ্গে দুই-ই হতে পারেন না"—এই তর্কের মীমাংসা হয়নি; মনে করলাম এ সমস্যাপূরণ স্বামীজীও করতে পারবেন না। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ "তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়েছ দেখছি। (কিন্তু এটা কি জান না), প্রত্যেক জড়পদার্থে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি (Centripetal and Centrifugal অর্থাৎ কেন্দ্র অভিগামী ও কেন্দ্রবিমুখ) কাজ করে? যদি দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির (opposite forces) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহলে দয়া ও ন্যায় Opposite (বিপরীত) হলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয়? All I can say is that you have a very poor idea of your God (আসল কথা কি জানো—ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুবই সীমিত)।" আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস—Truth is absolute (সত্য নিরপেক্ষ এবং আত্যন্তিক।) সমস্ত ধর্ম কখনো এককালে সত্য হতে পারে না। তিনি সেসব প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ "আমরা যে বিষয়ে যা কিছু সত্য বলে জানি বা পরে জানব, সে সবই আপেক্ষিক সত্য বা Relative Truths, Absolute Truth (অথবা নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির (পক্ষে) অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute হলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির কাছে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত থাকে বলে সেগুলি সবই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং কাছ থেকে Photograph (ফটো) নিলে একই সূর্যের ছবি নানারকম দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের—তদ্রূপ। আপেক্ষিক সত্যগুলি (Relative Truths) নিত্য সত্যের (Ab-

solute Truth-এর) সম্বন্ধে ঠিক ঐ ভাবে অবিস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই তাই নিত্য সত্যের আভাস বলেই সত্য।"

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় ঈষৎ হেসে বললেন, "রাজা হলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন। বিশ্বাস কি কখনো জোর করে হয়? অনুভব না হলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোনও কথা প্রসঙ্গে তাঁকে 'সাধু' বলায় তিনি বললেন, "আমরা কি সাধু? এমন অনেক সাধু আছেন যাঁদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।"

"সন্ন্যাসীরা এ রকম অলস হয়ে কেন সময় কাটান? অন্যের সাহায্যের ওপর কেন নির্ভর করে থাকেন? সমাজের হিতকর কোনও কাজকর্ম কেন করেন না?" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বললেন ঃ "আচ্ছা, বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করছ। তার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করছ; বাকি অন্য কতকগুলি লোককে আপনার ভেবে তাদের জন্য খরচ করছ। তারা সেজন্য, না তোমার করা উপকার মানে, না যা ব্যয় কর তাতে সন্তুষ্ট! বাকি (অর্থ) যকের মতো প্রাণপণে জমাচ্ছ। তুমি মরে গেলে অন্য কেউ তা ভোগ করবে, আর হয়তো, আরো টাকা রেখে যাওনি বলে গাল দেবে। এই তো গেল তোমার হাল! আর আমি, ওসব কিছু করি না। খিদে পেলে পেট চাপড়ে, হাত মুখে তুলে দেখাই। যা পাই, তাই খাই, কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতরে কে বুদ্ধিমান?—তুমি না আমি?"

আমি তো শুনে অবাক, এর আগে আমার সামনে এ রকম স্পষ্ট কথা বলতে তো কারো সাহস দেখিনি!

আহারাদি করে একটু বিশ্রামের পর আবার সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হলো এবং সেখানে অনেক বাদানুবাদ ও কথাবার্তা চললো। রাত নটার সময় স্বামীজীকে নিয়ে আবার আমার বাসায় ফিরলাম। আসতে আসতে বললাম, "স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হয়েছে।"

তিনি বললেন ঃ "বাবা, তোমরা যে রকম utilitarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করে বসে থাকি, তাহলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠো খেতে দেবে? আমি এই রকম গল গল করে বকি, লোকের শুনে আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যেসব লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন করে, তারা বাস্তবিক সত্য জানবার ইচ্ছায় ওরকম করে না। আমিও বুঝতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাকে সেইরকম উত্তর দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, স্বামীজী, সব প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কি ভাবে?"

তিনি বললেন ঃ "ঐ সব প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নতুন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ একই ধরনের প্রশ্ন করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়েছি।" রাতে আহার করতে বসে আবার কত কথা বললেন। পয়সা না ছুঁয়ে দেশভ্রমণ করতে গিয়ে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটেছে, সে সব বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে মনে হলো—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করেছেন! কিন্তু তিনি সেসব যেন কত মজার কথা, এই রকমভাবে হাসতে হাসতে সব বলতে লাগলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোনও জায়গায় লঙ্কা খেয়ে এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খেয়েও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না'—এই বলে অন্যের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিশের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভৃতি, যা শুনলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়, সেই সব ঘটনা তাঁর পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

রাত অনেক হয়েছে দেখে তাঁর বিছানা করে দিয়ে আমিও ঘুমাতে গেলাম, কিন্তু সে রাতে আর ঘুম হলো না। ভাবতে লাগলাম, এত বছরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস, স্বামীজীকে দেখে ও তাঁর দু-চারটি কথা শুনেই সব দূর হলো! আর জিজ্ঞাসা করবার কিছুই নেই। ক্রমে যত দিন যেতে লাগলো, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরদেরও তাঁর প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হলো যে, তাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হতে হতো।

২০ অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ। সকালে উঠে স্বামীজীকে নমস্কার করলাম। এখন সাহস বেড়েছে, ভক্তিও হয়েছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বর্ণনা আমার কাছে শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই শহরে আজ (নিয়ে) তাঁর চারদিন থাকা হলো। পঞ্চম দিনে তিনি বললেন, "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে এক দিনের বেশি থাকতে নেই। শিগ্‌গিরই আমার যাওয়ার ইচ্ছা।" কিন্তু আমি ওকথা কোনওমতেই শুনব না, তর্ক করে তা বুঝিয়ে দেওয়া চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর স্বামীজী বললেন, "এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে মায়া-মমতা বেড়ে যায়। আমরা বাড়ি-ঘর, আত্মীয়, বন্ধু ত্যাগ করেছি। মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার যত উপায় আছে, তা থেকে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।"

আমি বললাম, "আপনি কখনো মুগ্ধ হবার লোক নন।" শেষে আমার

অত্যন্ত আগ্রহ দেখে আরো দু-চার দিন থাকতে রাজি হলেন। ইতোমধ্যে আমার মনে হলো, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহলে আমরাও তাঁর কথা শুনতে পাব এবং অন্য লোকেরও কল্যাণ হবে। অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু বক্তৃতা দিলে হয়তো নাম যশের ইচ্ছা হবে, এই বলে তিনি কোনওমতেই রাজি হলেন না। তবে জানালেন, সভায় প্রশ্নের উত্তর দিতে (Conversational Meeting) তাঁর কোনও আপত্তি নেই।

একদিন কথা প্রসঙ্গে (চার্লস ডিকেন্স-এর লেখা) 'Pickwick Papers' থেকে দু-তিন পাতা মুখস্থ বললেন। বইটি আমি অনেকবার পড়েছি, বুঝলাম— বই-এর কোন্ জায়গা থেকে তিনি আবৃত্তি করলেন। শুনে আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হলো। ভাবলাম, সন্ন্যাসী হয়েও সামাজিক বই থেকে কি করে এতটা মুখস্থ করলেন? আগে বোধ হয় অনেকবার ঐ বই পড়েছেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "দু-বার পড়েছি—একবার স্কুলে পড়ার সময় ও আজ পাঁচ-ছ মাস হলো আর একবার।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তবে কেমন করে মনে থাকে? আমাদের কেন থাকে না?"

স্বামীজী বললেন ঃ "একান্ত মনে পড়া চাই; খাদ্যের সারভাগ থেকে তৈরি রেতের অপচয় না করে আবার তা assimilate বা অঙ্গীভূত করা চাই।"

আর একদিন দুপুরে স্বামীজী একাকী বিছানায় শুয়ে একখানি বই পড়ছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এমন সজোরে হেসে উঠলেন যে, আমি এই হাসির বিশেষ কোনও কারণ আছে ভেবে তাঁর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম বিশেষ কিছুই হয়নি। তিনি যেমন বই পড়ছিলেন, তেমনি পড়ছেন। প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, তবু তিনি আমায় দেখতে পেলেন না। বই ছাড়া অন্য কোনও দিকে তাঁর মন নেই। পরে আমাকে দেখে ভিতরে আসতে বললেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি শুনে বললেন, "যখন যে কাজ করতে হয়, তখন তা একমনে, একপ্রাণে, সমস্ত ক্ষমতার সঙ্গে করতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ, পূজা-পাঠ যেমন একমনে করতেন, তাঁর পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করতেন। এমন মাজতেন যে সোনার মতো দেখাত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সব ধর্মে চুরি করতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, 'এটা আমাদের', 'ওটা

অন্যের' ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমাকে না জানিয়ে আমার আত্মীয়-বন্ধু কেউ আমার কোনও জিনিস ব্যবহার করলে তো সেটা চুরি করা হয় না। তারপর পশুপাখি আমাদের কোনও জিনিস নষ্ট করলে, তাকেও তো চুরি বলি না।"

স্বামীজী বললেন ঃ "অবশ্য, সর্ব অবস্থায়, সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলে গণ্য হতে পারে এমন কোনও জিনিস বা কাজ নেই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিসই মন্দ এবং প্রত্যেক কাজই পাপ বলে গণ্য হতে পারে। তবে যাতে অন্য কারো কোনও প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যা করলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোনও রকম দুর্বলতা আসে, সে রকম কাজ করবে না। সেটাই পাপ এবং তার উল্টোটাই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোনও জিনিস কেউ চুরি করলে তোমার দুঃখ হয় কি না? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানবে। এই দুদিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি একটি প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তাহলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে কোনও মন্দ কর্ম করতেই তোমার বাধবে না। আবার পাপ-পুণ্য না থাকলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকতে হলে তার নিয়মকানুন পালন করা চাই। বনে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে নাচ, ক্ষতি নেই—কেউ তোমাকে কিছু বলবে না; কিন্তু শহরে ঐরকম করলে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে তোমাকে কোনও নির্জন স্থানে বন্ধ করে রাখাই উচিত।"

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হলেও তাঁর কাছে বসে থাকা, মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গ রস চলছে; বালকের মতো হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই বলছেন, সকলকে হাসাচ্ছেন; আবার তখনই এমন গম্ভীরভাবে জটিল সব প্রশ্নের ব্যাখ্যা শুরু করতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে ভাবতো—এঁর ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সব সময়েই তাঁর কাছে লোকে শিক্ষা নিতে আসতো। সব সময়েই তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। তার ভিতর নানা লোকে নানা ভাব নিয়েও আসতো—কেউ বা তাঁকে পরীক্ষা করতে, কেউ বা খোশগল্প শুনতে, কেউ বা তাঁর কাছে এলে অনেক ধনী বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে বলে, আবার কেউ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হয়ে তাঁর কাছে দু-দণ্ড জুড়োবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করবে বলে। কিন্তু তাঁর এমন আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তক্ষুনি তা বুঝতে পারতেন এবং তাঁর সঙ্গে সেইমতো ব্যবহার

করতেন। তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টির হাত থেকে কারো এড়াবার বা কিছু গোপন করার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোনও সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াবে বলে ঘন ঘন স্বামীজীর কাছে আসতে লাগলো এবং সাধু হবে, এই ভাব প্রকাশ করতে থাকলো। সে আবার আমার এক বন্ধুর ছেলে। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশি বেশি আসে? ওকে কি সন্ন্যাসী হতে বলবেন? ওর বাপ আমার বন্ধু।"

স্বামীজী বললেন ঃ "ওর পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দেবার ভয়ে সাধু হবার ইচ্ছা। আমি ওকে বলেছি, এম. এ. পাশ করে সাধু হতে এসো। এম. এ. পাশ করা বরং সহজ, সাধু হওয়া তার চেয়েও কঠিন।"

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক সন্ধ্যায় তাঁর কথা শুনতে যেন সভা বসে যেত, এত বেশি লোকসমাগম হতো। ঐ সময় একদিন আমার বাসায় একটা চন্দনগাছের তলায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, জন্মেও তা ভুলতে পারবো না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলতে হবে। তাই সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি। এখন নিজের কথা আর একটু বলবো।

কিছুকাল আগে আমার স্ত্রী-র ইচ্ছা হয়, গুরুর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করার। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাকে বলেছিলাম; "এমন লোককে গুরু করো, যাঁকে আমিও ভক্তি করতে পারি। গুরু বাড়ি ঢুকলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হবে না। কোনও সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহলে দুজনেই মন্ত্র নেব, নাহলে নয়।" সে-ও তা মেনে নেয়। স্বামীজী আসায় তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তা হলে তুমি শিষ্যা হতে ইচ্ছা কর কি?" সে-ও সাগ্রহে বললো, "উনি কি গুরু হবেন? হলে তো আমরা কৃতার্থ হই।"

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করবেন?" স্বামীজী প্রার্থনা জানাবার আদেশ করলে আমাদের দু-জনকে দীক্ষা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম।

তিনি বললেন ঃ "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল। গুরু হওয়া বড় কঠিন। শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয়। (তাছাড়া) দীক্ষার আগে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অন্তত তিনবার দেখা হওয়া দরকার।" এইসব নানা কথা বলে তিনি

আমাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন। যখন দেখলেন, আমি কোনও রকমেই ছাড়বার নই, তখন অগত্যা রাজি হলেন এবং ২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে আমাদের দীক্ষা দিলেন। তখন আমার ভারি ইচ্ছা হলো, স্বামীজীর ফটো তুলে নিই। কিন্তু তিনি সহজে স্বীকৃত হলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে ২৮ তারিখে ফটো তোলাতে সম্মত হলেন এবং ফটো নেওয়া হলো। ইতঃপূর্বে তিনি একজনের আগ্রহ সত্ত্বেও ফটো তুলতে দেননি বলে আমাকে দু-কপি ফটো তাকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আমি সে কথা সানন্দে স্বীকার করলাম।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বললেন, "তোমার সঙ্গে জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে আমার কিছুদিন থাকার ইচ্ছা আছে। কিন্তু শিকাগোয় ধর্মসভা হবে, যদি সেখানে যাওয়ার সুবিধে হয় তো সেখানেই যাব।" আমি চাঁদার লিস্ট করে টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভেবে যেন রাজি হলেন না। সে সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ না করা। আমি অনেক অনুরোধ করে তাঁর মারহাট্টি জুতোর বদলে এক জোড়া জুতো ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়েছিলাম। ইতঃপূর্বে কোলাপুরের রানী অনেক অনুরোধ করেও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাতে না পেরে শেষমেশ দুখানি গেরুয়া কাপড় পাঠিয়ে দেন। স্বামীজীও তা গ্রহণ করে যে কাপড় পরেছিলেন, সেগুলো সেখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, "সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।"

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়তে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বুঝতে না পারায় পরিশেষে তাতে বোঝবার বড় কিছু নেই মনে করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। স্বামীজী গীতা নিয়ে আমাদের একদিন বোঝাতে লাগলেন। তখন দেখলাম, কি অদ্ভুত গ্রন্থ! তাঁর কাছে যেমন গীতার মর্ম গ্রহণ করতে শিখেছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verne)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁর কাছেই পড়তে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ওষুধ খেতাম। সে কথা জানতে পেরে একদিন তিনি বললেন ঃ "যখন দেখবে কোনও রোগ এত প্রবল হয়েছে যে শয্যাশায়ী করেছে আর ওঠবার শক্তি নেই, তখনই ওষুধ খাবে, নতুবা নয়। Nervous debility (স্নায়বিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐসব রোগের হাত থেকে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশি লোককে

মারেন। আর ঐ রকম সর্বদা রোগ রোগ করেই বা কি হবে? যত দিন বাঁচো আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ এসেছে, তা আর করো না। তোমার আমার মতো দু-একটা মরলে পৃথিবীও নিজের কেন্দ্র থেকে দূরে যাবে না বা জগতেরও কোনও বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হবে না।"

এই সময়ে আবার অনেক কারণে অফিসের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে আমার বড় একটা বনতো না। তাঁরা সামান্য কিছু বললে আমার মাথা গরম হতো এবং এমন ভাল চাকরি পেয়েও একদিনের জন্য সুখী হইনি। তাঁকে এ সমস্ত কথা বলায় তিনি বললেন ঃ "কিসের জন্য চাকরি করছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাচ্ছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হলেই যখন চাকরি ছেড়ে দিতে পার, কেউ বেঁধে রাখেনি, তখন 'বিষম বন্ধনে পড়েছি' ভেবে দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন? আর একটা কথা, বল দেখি, যার জন্য বেতন পাচ্ছ, অফিসের সেই কাজগুলো করে দেওয়া ছাড়া, তোমার ওপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করার জন্য কখনও কিছু করেছ কি? কখনও সেজন্য চেষ্টা করনি, অথচ তারা তোমার ওপর সন্তুষ্ট নয় বলে তাদের ওপর বিরক্ত! এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ? জেনো, অন্যের প্রতি আমাদের যে ভাব, সেটাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করলেও তাদের ভিতরে আমাদের প্রতি ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই আমরা জগতে প্রকাশিত দেখি। 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা'—এ-কথা যে কতদূর সত্য কেউই জানে না। আজ থেকে মন্দটি দেখা একেবারে ছেড়ে দিতে চেষ্টা কর। দেখবে, যে পরিমাণে তুমি তা করতে পারবে, সেই পরিমাণে তাদের ভিতরের ভাব এবং কাজও বদলে গেছে।"

বলা বাহুল্য, সেই দিন থেকে আমার ওষুধ খাবার বাতিক দূর হলো এবং অন্যের ওপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নতুন পৃষ্ঠা খুলে গেল।

একবার স্বামীজীর কাছে ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ঃ "লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে যা সহায়ক হয় তাকেই ভাল, আর যা তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাকেই আমরা মন্দ বলি। উঁচু-নিচু জায়গা সম্পর্কে আমাদের যে রকম ধারণা, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও ঠিক সেইরকম। যত ওপরে উঠবে তত দুই-ই এক হয়ে যাবে। চাঁদে পাহাড় ও সমতল দুই-ই আছে—লোকে বলে; কিন্তু আমরা সবই এক দেখি—এও ঠিক সেইরকম।"

স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—যে যা-কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তার উপযুক্ত উত্তর তক্ষুনি তাঁর ভিতর থেকে এমন যোগাত যে, মনের সন্দেহ চিরতরে দূর হয়ে যেত।

আর একদিনের কথা—কলকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়ে স্বামীজী এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে, তা বলবার নয়। বার বার বলতে লাগলেন, "এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!" কেন—জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "দেখছ না, অন্যান্য দেশে কত poor house, work house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতি বছর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন থাকায় অনাহারে লোক মরতে কখনো শোনা যায়নি। আমি এই প্রথম কাগজে একথা পড়লাম যে, দুর্ভিক্ষ ছাড়াও অন্য সময়ে কলকাতায় অনাহারে লোক মরে।"

ইংরেজি শিক্ষার কৃপায় আমি দু-চার পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করতাম। মনে হতো, ঐভাবে যৎসামান্য যা কিছু দান করা যায়, তাতে তাদের কোনও উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পেয়ে, তা মদ-গাঁজায় খরচ করে তারা আরো অধঃপাতে যায়, লাভের মধ্যে দাতার কিছু বাজে খরচ বেড়ে যায়। সেজন্য আমার মনে হতো, (অনেক) লোককে কিছু কিছু দেওয়ার চেয়ে একজনকে বেশি দেওয়া ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ "ভিখারি এলে যদি সাধ্য থাকে তো যা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটা পয়সা; তার জন্য সে কিসে খরচ করবে, সৎব্যয় হবে কি অপব্যয় হবে, এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাবার দরকার কি? আর সত্যিই যদি সেই পয়সা গাঁজা খেয়ে ওড়ায়, তাহলেও তাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ ছাড়া লোকসান নেই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাকে দয়া করে কিছু কিছু না দিলে, সে তা তোমাদের কাছ থেকে চুরি করে নেবে। তার চেয়ে দু-পয়সা ভিক্ষা করে গাঁজা টেনে সে চুপ করে বসে থাকে, তা কি তোমাদেরই ভাল নয়? অতএব ঐ রকম দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নেই।"

প্রথম থেকেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের ওপর ভারি চটা দেখেছি। সব সময় সবাইকে, বিশেষত যুবকদের, সাহসে বুক বেঁধে সমাজের এই কলঙ্কের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং উদ্যোগী হতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এমন অনুরাগও কোনও মানুষের দেখিনি। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফেরার পর যাঁরা স্বামীজীর প্রথম

দর্শন পেয়েছেন, তাঁরা জানেন না, সেখানে যাওয়ার আগে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করে, কাঞ্চন মাত্র স্পর্শ না করে কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন! তাঁর মতো শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি, নিয়মাদির দরকার নেই—কোনও লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেন ঃ "দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনোই থাকে না; একটু সুযোগ পেলেই নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেজন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা দরকার। সন্ন্যাসীরও সেই মনের ওপর দখল রাখার জন্য নিয়মে চলতে হয়। সকলেই ভাবেন, মনের ওপর তাঁদের খুব দখল আছে, কিন্তু কার কতটা কর্তৃত্ব, তা একবার ধ্যান করতে বসলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের ওপর চিন্তা করবো মনে করে বসলে দশ মিনিটও একটানা ঐ বিষয়ে মন স্থির রাখা যায় না। সকলেই মনে করেন, তাঁরা স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করে স্ত্রীকে আধিপত্য করতে দেন মাত্র। মনকে বশে রেখেছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করে কখনো নিশ্চিন্ত থেকো না।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললাম, "স্বামীজী, দেখছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে হলে অনেক লেখাপড়া জানা দরকার।"

তিনি বললেন ঃ "নিজে ধর্ম বোঝবার জন্য লেখাপড়ার দরকার নেই। কিন্তু অন্যকে বোঝাতে হলে প্রয়োজন আছে। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সই করতেন 'রামকেষ্ট' বলে। কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁর মতো কে বুঝেছিল?"

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীরা কখনোই গোলগাল হাসিখুশি হন না। একদিন হাসতে হাসতে তাঁর দিকে কটাক্ষ করে ঐ কথা বলায় তিনিও কৌতুক করে উত্তর দিলেন ঃ "এটাই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খেতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। (কিন্তু) তোমরা একদিন না খেলেই সব অন্ধকার দেখবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তা বাস্তবিক ধর্মই নয়, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলে জেনো।"

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটা গান আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস'। তাছাড়া শোনবার আমার অবসরই বা কোথায়? তাঁর কথা ও গল্পই আমাদের মোহিত করেছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সব বিভাগেই, যেমন—Chemistry, Phys-

ics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁর বিশেষ দখল ছিল এবং ঐ সব বিষয়ের সব প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দু-চার কথায় বুঝিয়ে দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক প্রশ্নগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বোঝাতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য, একই দিকে গতি দেখাতে তাঁর মতো অদ্বিতীয় ক্ষমতা আর কারো দেখিনি।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি ঝাল ও ঝাঁঝালো জিনিস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় একদিন বলেছিলেন, "পরিব্রাজক অবস্থায় সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানারকম দূষিত জল পান করতে হয়; তাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ কাটানোর জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি খেয়ে থাকে। আমি তাই এত লঙ্কা খাই।"

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন; তিনিও তাঁদের খুব ভালবাসতেন। অসামান্য ত্যাগী হওয়া সত্ত্বেও রাজা-রাজড়ার সঙ্গে অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, এ কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হতো না। কোনও কোনও নির্বোধ লোক এ জন্য তাঁকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ত না।

এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় একদিন তিনি বললেন ঃ "হাজার হাজার গরিব লোককে উপদেশ দিয়ে সৎ কাজ করতে পারলে যে ফল হবে, একজন রাজাকে সেইদিকে আনতে পারলে তার চেয়ে কত বেশি ফল হবে, ভাব দেখি। গরিব প্রজার ইচ্ছা থাকলেও সৎ কাজ করার ক্ষমতা কোথায়? কিন্তু রাজার হাতে হাজার হাজার প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা আগে থেকেই রয়েছে, কেবল তা করার ইচ্ছা নেই। সেই ইচ্ছাটা যদি কোনওভাবে তার ভিতর একবার জাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীন সব প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম নেই, ধর্ম প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়—এই কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলতেন, "Test of pudding lies in eating; অনুভব কর, তা না হলে কিছুই বুঝবে না।"

কপট সন্ন্যাসীদের ওপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলতেন, "ঘরে থেকে মনের উপর অধিকার স্থাপন করে তবে বাইরে যাওয়া ভাল; নাহলে নতুন অনুরাগটুকু কমবার পর প্রায়ই গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে যেতে হয়।"

আমি বললাম, "কিন্তু ঘরে থেকে সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে

সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যেসব কাজ ধর্মলাভের প্রধান সহায়—আপনি যা বলেন, তা যদি আমি আজ থেকে করতে থাকি, তাহলে কাল থেকে আমার চাকর ও অধীনস্থ কর্মচারীরা এবং দেশের লোকও আমাকে একদণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না।"

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাপ ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলে বললেন, "কখনো ফোঁস করা ছেড়ো না আর কর্তব্য পালন করছ মনে করে সব কাজ করো। কেউ দোষ করে, দণ্ড দেবে। কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়ে কখনো রাগ করো না।" পরে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বললেন ঃ "এক সময় আমি এক তীর্থস্থানের পুলিশ ইনস্পেক্টরের অতিথি হয়েছিলাম। লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁর বেতন একশো পঁচিশ টাকা, কিন্তু দেখলাম তাঁর বাসার খরচ মাসে দু-তিনশো টাকা হবে। যখন বেশি জানাশোনা হলো, জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার তো আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি—চলে কি করে? তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থানে যেসব সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু আপনার মতো নন। সন্দেহ হলে তাঁদের কাছে কি আছে না আছে, তল্লাস করে থাকি। অনেকের কাছ থেকে প্রচুর টাকাকড়ি বের হয়। যাদের চোর সন্দেহ করি, তারা টাকাকড়ি ফেলে পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অন্য ধরনের ঘুষঘাস কিছু নিই না'।"

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন 'অনন্ত' (Infinity) নিয়ে কথাবার্তা হয়। স্বামীজী যা বলেছিলেন সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য। তিনি বললেন, "There can be no two infinities." (একই সঙ্গে দুটো অনন্ত—এ হতে পারে না।) আমি 'সময়' অনন্ত (Time is infinite) ও 'আকাশ' অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বললেন, "আকাশ অনন্ত—এটা বুঝলাম, কিন্তু সময় অনন্ত—এটা বুঝলাম না। যা হোক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ কথা বুঝি, কিন্তু দুটো জিনিস অনন্ত হলে কোনটা কোথায় থাকে? আর একটু এগোও, দেখবে—সময়ও যা, আকাশও তাই; আরও এগোলে বুঝবে, সব পদার্থই অনন্ত এবং সেই সব অনন্ত পদার্থ মূলে এক, সেখানে দুই নেই।"

এইভাবে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বয়েছিল। ২৭ তারিখে বললেন, "আর থাকব না; রামেশ্বর যাব মনে করে অনেকদিন হলো এই দিকে চলছি। যদি এইভাবে এগোতে থাকি, তাহলে এই জন্মে আর রামেশ্বর পৌঁছান হবে না।" আমি অনেক অনুরোধ করেও

আর রাখতে পারলাম না। ২৭ অক্টোবর মেল ট্রেনে তিনি মরমাগোয়া যাত্রা করবেন স্থির হলো। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে যে মোহিত করেছিলেন, তা বলা যায় না। টিকিট কিনে তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। বললাম, "স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাউকে আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করিনি, আজ আপনাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হলাম।"

স্বামীজীর সঙ্গে আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা যাওয়ার আগে; সেইবারকার দেখার কথা অনেকটা বললাম। দ্বিতীয়—যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত এবং আমেরিকা যান, তার কিছু আগে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাঁর দেহত্যাগের ছ-সাত মাস আগে। এই কয়বারে তাঁর কাছে যা কিছু শিখেছিলাম, তার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। কারণ বেশ কিছু ঘটনা আমার একান্ত ব্যক্তিগত, আবার অনেক কথা ভুলেও গেছি। যা মনে আছে, তার ভেতর সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলো জানাতে চেষ্টা করব।

বিলেত থেকে ফিরে এসেই তিনি হিন্দুদের জাতিবিচার সম্বন্ধে ও কোনও কোনও সম্প্রদায়ের ব্যবহারের ওপর তীব্র কটাক্ষ করে যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে দিয়েছিলেন, তা পড়ে আমি মনে করেছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশি কড়া হয়েছে। তাঁর কাছে সে কথা প্রকাশও করেছিলাম। শুনে তিনি বললেন ঃ "যা কিছু বলেছি, সমস্ত সত্য। আর যাঁদের সম্বন্ধে ঐ রকম ভাষা ব্যবহার করেছি, তাঁদের কাজের তুলনায় তা বিন্দুমাত্রও বেশি কড়া নয়। সত্য গোপন করার তো কোনও কারণ দেখি না। তবে ঐ রকম সমালোচনা করেছি বলে মনে করো না যে, তাঁদের ওপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেউ কেউ যেমন ভেবে থাকেন, কর্তব্যবোধে যা করেছি, তার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও কথার একটাও সত্য নয়। আমি রেগেও ঐ কাজ করিনি এবং করেছি বলেও দুঃখিত নই। এখনও যদি ঐ রকম কোন অপ্রিয় কাজ করা কর্তব্য বলে মনে হয়, তাহলে নিঃসঙ্কোচে করব।"

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত আগে কিছু বলেছি। আর একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা ওঠায় বললেন ঃ "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেন্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম করে লুকোবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য, কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেউ সন্ন্যাসী হলেই তার ঈশ্বরের মতো ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরে ভাল খেলে দোষ, বিছানায় শুলে দোষ, এমন কি জুতো বা ছাতা পর্যন্ত তার ব্যবহার করার জো নেই। কেন,

তারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হলে তার আর গেরুয়া পরার অধিকার নেই—এও ভুল। এক সময়ে একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাঁর ভাল পোশাকের ওপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।”

স্বামীজী বলতেন ঃ “দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্মের বেলায়ও তাই। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা না একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বোঝে না, এতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, তার চোখ দিয়ে, তারই মতো করে, প্রত্যেকে জগৎটাকে দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বলে বুঝেছে বা যা জেনেছে, সেটা ছাড়া আর কোনও সত্য থাকতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হোক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়েই হোক, ঐ রকম ভাব কোনও মতে মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়।

“জগতের কোনও বিষয়েই সকলের ওপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে মানুষের নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও নানা ধরনের হয়। তিব্বতে এক স্ত্রীলোকের বহু স্বামী থাকার প্রথা আছে। হিমালয়ে বেড়াবার সময় আমার ঐ রকম এক তিব্বতী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ঐ পরিবারে ছ-জন পুরুষ এবং ছ-জনের একটি মাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে আমি একদিন তাদের ঐ কু-প্রথা সম্বন্ধে বলায় তারা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, ‘তুমি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে লোককে স্বার্থপরতা শেখাতে চাচ্ছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এইরকম ভাবা কি অন্যায় নয়?’ আমি তো শুনে অবাক!

“এ কথা সকলেই জানেন, চীন দেশে যার নাক এবং পা যত ছোট, সেই তত সুন্দর। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারেও ঐ রকম। ইংরেজ আমাদের মতো সুগন্ধী চালের ভাত ভালবাসে না। এক সময়ে কোনও এক জায়গার জজসাহেব অন্যত্র বদলি হওয়ায় সেখানকার কয়েকজন উকিল, মোক্তার তাঁর সম্মানার্থে ভাল ভেট পাঠিয়েছিলেন। তার ভিতর কয়েক সের সুগন্ধী চালও ছিল। জজসাহেব সেই চালের ভাত খেয়ে ভাবলেন—চালগুলো নির্ঘাৎ পচা। উকিলদের সঙ্গে পরে দেখা হলে বলেন—‘You ought not to have given me rotten rice.’ (তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে উপহার দেওয়া ভাল হয়নি।)

"কোনও এক সময়ে ট্রেনে যাচ্ছিলাম। সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বললাম, 'সুভাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খুব ভাল তামাক ছিল, তাঁদের দেখতেও দিলাম। তাঁরা একটু শুঁকেই বললেন, 'এ তো অতি দুর্গন্ধ! একে তুমি সুগন্ধ বলছ?' এইভাবে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সব ব্যাপারেই সমাজ, দেশ ও কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।"

স্বামীজীর এইসব কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে আমার বিলম্ব হয়নি। আমার মনে হলো, আগে শিকার করতে আমি কতই না ভালবাসতাম। কোনও পশু বা পাখি দেখলে কতক্ষণে তাকে মারব, সেজন্য প্রাণ ছটফট করত। মারতে না পারলে অত্যন্ত কষ্ট হতো। এখন ঐ রকম প্রাণিবধ একেবারেই ভাল লাগে না। সুতরাং কোনও জিনিস ভাল বা মন্দ লাগা—এটা একটা অভ্যাসের ব্যাপার।

নিজের মত বজায় রাখতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্মমতের ক্ষেত্রে তার আবার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটা গল্প বলতেন ঃ "এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হলেন। কাজেই, শত্রুর হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পাওয়া যায়, তা স্থির করার জন্য সেই রাজ্যে এক মহাসভা ডাকা হলো। সভায় ইঞ্জিনিয়ার, ছুতোর, মুচি, কামার, উকিল, পুরুত-ঠাকুর প্রভৃতি সভাসদরা সকলেই উপস্থিত হলেন। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'শহরের চারিদিকে বেড়া দিয়ে একটা বড় খাল খোঁড়া হোক।' ছুতোর বলল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।' চামার বলল, 'চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নেই, চামড়ার বেড়া দাও।' কামার বলল, 'ও সব কাজের কথা নয়, লোহার দেওয়ালই ভাল; ভেদ করে গুলিগোলা আসতে পারবে না।' উকিল বললেন, 'কিছুই করার দরকার নেই; আমাদের রাজ্য নেবার অধিকার শত্রুদের নেই, শুধু এই কথাটি তাদের তর্কযুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যাক।' পুরোহিত বললেন, 'তোমরা সকলেই বাতুলের মতো প্রলাপ বকছ। হোম কর, যাগ-যজ্ঞ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করতে পারবে না।' এইভাবে রাজ্য বাঁচাবার কোনও উপায় স্থির না করে তারা নিজের নিজের মত নিয়ে মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করলো। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব।"

গল্পটি শুনে আমারও মানুষের মনে একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটা কথা মনে পড়লো। স্বামীজীকে বললাম, "স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সঙ্গে

আলাপ করতে বড় ভালবাসতাম। একদিন একটা পাগল দেখলাম, বেশ বুদ্ধিমান; ইংরেজিও একটু-আধটু জানে। তার চাই কেবল জল খাওয়া! সঙ্গে একটা ভাঙা ঘটি। যেখানে জল পায়—খাল হোক, হোউজ (ছোট জলাশয়) হোক, নতুন একটা জলের জায়গা দেখলেই সেখানকার জল খেত। আমি তাকে এত জল খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলল, 'Nothing like water, sir!' (মশাই, জলের মতো কোনও জিনিসই নেই!) তাকে আমি একটা ভাল ঘটি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, কিন্তু সে কোনওমতে নিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, 'এটি ভাঙা ঘটি বলেই এতদিন আছে। ভাল হলে অন্যে চুরি করে নিত'।"

স্বামীজী গল্প শুনে বললেন ঃ "সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের সেটা চেপে রাখার ক্ষমতা আছে। পাগলের তা নেই। পাগলের সঙ্গে আমাদের এইটুকুই যা প্রভেদ। রোগে, শোকে, অহঙ্কারে, কামে, ক্রোধে, হিংসায় বা অন্য কোনও অত্যাচার বা অনাচারে দুর্বল হয়ে মানুষ ঐ সংযমটুকু হারালেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপতে পারে না। আমরা তখন বলি, ও ব্যাটা খেপেছে, এই আর কি!"

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, এ কথা আগেই বলেছি। একদিন ঐ প্রসঙ্গ উঠলে তাঁকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের নিজ দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের প্রতি সমদৃষ্টি অবলম্বন করে সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা উচিত। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তা ইহজন্মে ভুলতে পারব না। তিনি বলেছিলেন, "যে নিজের মাকে ভাত দেয় না, সে আবার অন্যের মাকে কি পুষবে?" আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করতেন। বলতেন ঃ "সেসব দোষ সংশোধন করবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলে সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সেসব ঘোষণা করার দরকার কি? ঘরের গলদ যে বাইরে দেখায়, তার মতো গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street. (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়।)"

খ্রীস্টান মিশনারিদের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁরা আমাদের দেশে

কত উপকার করেছেন ও করছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনে তিনি বললেন ঃ "কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নি। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দেবার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রদ্ধা গেলে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। এ কথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করে কি তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর একটা কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করতে চান, তাঁর তাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী কাজ করা চাই। অধিকাংশ মিশনারি মুখে এক, কাজে আর এক। আমি কপটতার ওপর ভারি চটা।"

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলেছিলেন। তার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখলাম ঃ

"সব প্রাণীই সর্বদা সুখী হওয়ার চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকই সুখী। কাজকর্মও সকলে অনবরত করছে; কিন্তু তার অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখাই যায় না। এই রকম বিপরীত ফল উপস্থিত হওয়ার কারণ কি, তাও সকলে বোঝার চেষ্টা করে না। সেইজন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্পর্কে যে রকম বিশ্বাস হোক না কেন, কেউ যদি ঐ বিশ্বাসের জোরে নিজেকে যথার্থ সুখী বলে অনুভব করে তাহলে তার ঐ মত পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা কারো উচিত নয় এবং করলেও তাতে সুফল হয় না। তবে মুখে যে যাই বলুক না কেন, যখন দেখবে কারো শুধু ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শোনার আগ্রহই আছে, তার কোনও কিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নেই, তখনই জানবে যে, কোনও একটা বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়নি।

"ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। কিন্তু পরজন্মে সুখী হবো বলে ইহজন্মে দুঃখ ভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই জন্মে, এই মুহূর্ত থেকেই সুখী হতে হবে। যে ধর্ম দ্বারা সেটি সম্ভব হবে, সেটিই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করে। (অবশ্য) যদি ঐ সুখকেও কেউ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে চিরকাল সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকতে পারে, তাও মন্দ নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ রকম লোক দেখা যায়নি। সচরাচর এটাই দেখা যায়, যারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তারা নিজেদের চাইতে ধনবান, বিলাসী লোকদের বেশি সুখী মনে করে দ্বেষ করে থাকে এবং তাদের

বহুব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগের ঠাটবাট দেখে স্বয়ং সেগুলি ভোগ করার জন্য লালায়িত হয় এবং শেষপর্যন্ত অসুখী হয়ে থাকে। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করে, পৃথিবীতে আর জয় করার দেশ রইল না ভেবে দুঃখিত হয়েছিলেন। সেইজন্য বুদ্ধিমান মনীষীরা অনেক দেখে-শুনে, বিচার করে অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কোনও একটা ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হতে পারে।

"বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি সব বিষয়েই মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেইজন্য তাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া দরকার, না হলে কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হবে না, কিছুতেই তারা ঐ ধর্মের অনুষ্ঠান করে যথার্থ সুখী হতে পারবে না। নিজের নিজের প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত নিজেকেই ভেবেচিন্তে, দেখে, ঠেকে, বেছে নিতে হবে। এছাড়া অন্য উপায় নেই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরুর উপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে মাত্র।

"কর্ম সম্বন্ধেও জানা দরকার যে, কোনও না কোনও প্রকার কর্ম না করে কেউই থাকতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এই রকম কোনও কর্মই নেই। ভালটা করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করতেই হবে। আর সেজন্য কর্ম থেকে যেমন সুখ আসবে, তেমনি কিছু না কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসবেই আসবে। তা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না নেবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিষয়-ভোগজনিত আপাত সুখলাভের আশাটাও ছাড়তে হবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করে কর্তব্যবুদ্ধিতে সব কাজ করে যেতে হবে। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। গীতায় ভগবান অর্জুনকে তারই উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর'।" ...

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে যেসব ঘটনাবলীর কথা লেখা আছে, তাদের যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হতো না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যা ভগবদ্গীতায় লেখা আছে, তা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি না।" উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তা বড় সুন্দর। তিনি বললেন ঃ "গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীনকালে এখনকার মতো ইতিহাস লেখা বা বইপত্র ছাপার এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্য তোমাদের

মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতায় বলা ঘটনা যথাযথ ঘটেছিল কি না, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাবার কারণ দেখছি না। কেননা, যদি কেউ—শ্রীভগবান সারথি হয়ে অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন—এটা অকাট্য প্রমাণ দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে, তাহলেও কি তোমরা গীতাতে যা কিছু লেখা আছে, তা বিশ্বাস করবে? সাক্ষাৎ ভগবান তোমাদের কাছে মূর্তিমান হয়ে এলেও তোমরা তাঁকে পরীক্ষা করতে ছুট ও তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে বল। তখন গীতা ঐতিহাসিক কি না, এ বৃথা সমস্যা নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলো যতটা সম্ভব জীবনে ফুটিয়ে তুলে কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলতেন, 'আম খা, গাছের পাতা গুণে কি হবে?' আমার মনে হয়, ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation —অর্থাৎ মানুষ যখন কোনও এক অবস্থা বিশেষে পড়ে তার থেকে উদ্ধার পাবার পথ খুঁজতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোনও ঘটনার সঙ্গে তার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলছে দেখতে পায়, তখনই সে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলে বিশ্বাস করে এবং ধর্মশাস্ত্র ঐ অবস্থার উপযোগী যে উপায়ের কথা বলেছেন, তাও সাগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে।"

স্বামীজী একদিন শারীরিক ও মানসিক শক্তি অভীষ্ট কাজের জন্য সঞ্চিত ও সুরক্ষিত রাখা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তা অতি সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ "অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাবে? The sum total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity—অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভেতরে নানাভাবে প্রকাশের যে শক্তি আছে তা সীমিত। সুতরাং ঐ শক্তির বেশির ভাগ একভাবে প্রকাশিত হলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করতে হলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেই জন্যই ধর্মপথের পথিকদের প্রতি বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করে ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা সংযমের উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়।"

স্বামীজী গ্রামবাংলার মানুষের কিছু কিছু অভ্যাস ও আচরণের ওপর বড় একটা খুশি ছিলেন না। যেমন একই পুকুরে স্নান করা, কাপড় কাচা, আবার সেই পুকুর থেকেই খাওয়ার জল আনা—এসব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "যাদের মস্তিষ্ক মলমূত্রে পরিপূর্ণ, তাদের আশা-

ভরসা আর কোথায়? আবার ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকদের পরচর্চা—ওটা অত্যন্ত খারাপ। শহরের লোকেরাও যে পরচর্চা করে না, তা নয়। তবে তাদের সময় কম, আর শহরে খরচ বেশি, কাজেই খাটুনিও বেশি। ঐ খাটুনির পর বড়ে টেপা, তামাক খাওয়া ও পরনিন্দার সময় আর থাকে না। নাহলে, শহুরে ভূতগুলো ঐ বিষয়ে পাড়াগেঁয়ে ভূতের ঘাড়ে চড়ে বেড়াত।"

স্বামীজীর এক একদিনের এইসব কথাবার্তা ধরে রাখতে পারলে এক একটা বই হয়ে যেত। একই প্রশ্নের বার বার একইভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁর রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই নতুনভাবে নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে এমনভাবে বলতেন যে, তা সম্পূর্ণ নতুন বলে লোকের বোধ হতো এবং তাঁর কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তিবোধ দূরে থাকুক, সকলের আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বেড়ে যেত। বক্তৃতা করা সম্বন্ধেও তাঁর ঐ রীতি ছিল। ভেবেচিন্তে বলবার বিষয়গুলি (points) লিখে তিনি কোনওকালে বক্তৃতা করতে পারতেন না। বক্তৃতার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হাসি-ঠাট্টা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। বক্তৃতায় কি যে বলবেন তা তিনি নিজেই জানতেন না। আমরা যে কয়েকটি দিন তাঁর সংস্পর্শে থেকে ধন্য হয়েছিলাম, সেই কয়েকটি দিনের কথাবার্তার বিবরণ আরো যতটা পারি লিখে যাচ্ছি।

আগেই বলেছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে হিন্দুধর্মকে বোঝাতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাতে স্বামীজীর মতো আর কাউকে দেখা যায়নি। সে বিষয়ে দু-চারটি কথা। তবে এ কথা বুঝতে হবে, আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাই লিখছি। যদি এতে কোনও রকম ভুলচুক থাকে তো সে আমার বোঝার দোষ, স্বামীজীর ব্যাখ্যার নয়।

স্বামীজী বলতেন ঃ "চেতন-অচেতন, স্থূল-সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধেয়ে চলেছে। প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখতে লাগলো, তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক জিনিস মনে করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল, পরে বিচার করে স্থির করলো ঐ সমস্ত জিনিসগুলি তেষট্টিটা মূলদ্রব্য (element) থেকে এসেছে।

"ঐ মূলদ্রব্যগুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্রদ্রব্য (Compound) বলে এখন অনেকের সন্দেহ হচ্ছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছবে, তখন সব জিনিসই যে এক বস্তুর অবস্থাভেদ মাত্র, তা বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (heat, light and electric-

ity) আলাদা আলাদা জিনিস বলে সকলে জানতো। এখন প্রমাণিত হয়েছে, ঐগুলো সব এক, এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলোকে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন ভাগে ভাগ করলো। তারপর দেখতে পেল যে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, অন্য সব চেতন প্রাণীর মতো চলাফেরার শক্তি নেই—এই যা। তখন কেবল দুটি শ্রেণী রইলো—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও অল্পবিস্তর চৈতন্য আছে।[১]

"পৃথিবীতে যে উঁচু-নিচু জমি দেখা যায়, তাও সর্বদা সমতল হয়ে একভাব ধারণ করার চেষ্টা করছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উঁচু জমিগুলো ধুয়ে গিয়ে গহ্বর সব পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোনও জায়গায় রাখলে তা ক্রমে চারপাশের জিনিসগুলোর মতো সমান উষ্ণভাব ধারণ করতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইভাবে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণ (Conduction, Convection and radiation) ইত্যাদি উপায়ে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

"গাছের ফল, ফুল, পাতা, শিকড়—আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখলেও বাস্তবিক তারা যে এক, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। ত্রিকোণ কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলে এক সাদা রং রামধনুর সাতটা রং-এর মতো পৃথক পৃথক বিভক্ত দেখায়। সাদা চোখে দেখলে একই রং, আবার লাল বা নীল চশমার ভেতর দিয়ে দেখলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

"ঠিক সেই রকম, যা সত্য, তা এক। মায়ার জন্য আমরা আলাদা আলাদা দেখি। অতএব, দেশ ও কালের অতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্য অবলম্বনে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যকে ধরতে পারে না, দেখতে পায় না।"

এইসব কথা শুনে বললাম, "স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেললাইন সমান্তরালভাবে রাখলে দেখায় যেন তারা ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে। তারই নাম vanishing point। মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical delusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হচ্ছে। Calcs-

---

১ স্বামীজী যখন এই কথাগুলি বলেন তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রচারিত তড়িৎ-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ (Response to Inorganic Matter to Electric Currents), এই অপূর্ব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি।

par নামক পাথরের নিচে একটা রেখাকে double refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উড পেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবিয়ে রাখলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা ওপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সব প্রাণীর চোখগুলো আলাদা আলাদা ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাকেই আরো বড় দেখে, কেননা তাদের চোখের লেন্স-এর শক্তি অন্যরকম। অতএব আমরা যা স্বচক্ষে দেখি, তাই যে সত্য, তারও তো প্রমাণ নেই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ 'সত্য, সত্য' করে পাগল, কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute Truth) মানুষের বোঝবার ক্ষমতা নেই। কারণ ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য, এটা সে বুঝবে কি করে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বোঝবার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute ভগবান বা জগৎকারণকে মানুষ কখনোই বুঝতে পারবে না।"

স্বামীজী তার উত্তরে বললেন ঃ "তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বলে কারো নেই, একথা কি করে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান বলে দু-রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বলো, বাস্তবিক তা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হলে তা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়! দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানতা থেকে আসে।"

আমি বললাম, "স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান বলে দুটি জিনিস থাকে, তাহলে আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাবছেন, তাও তো মিথ্যাজ্ঞান হতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলছেন, তাও তো সত্য হতে পারে?"

স্বামীজী বললেন ঃ "তুমি ঠিকই বলেছ। আর সেই জন্যই 'বেদে' বিশ্বাস থাকা চাই। পুরাকালে আমাদের মুনিঋষিরা সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করে যা বলে গেছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করে বলবার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারব, ততক্ষণ কেমন করে বলবো—কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা অসত্য? শুধু দুটো ভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে, এ কথা বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল বলে মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলকাতায় কেনাবেচা করলে, উঠে দেখ—বিছানায় শুয়ে আছ! যখন

সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন ‘এক’ ছাড়া ‘দুই’ দেখবে না এবং আগের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে পারবে। কিন্তু এসব অনেক দূরের কথা। হাতেখড়ি হতে না হতেই রামায়ণ, মহাভারত পড়বার ইচ্ছা করলে চলবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়। হাতে কলমে করতে হবে, তবেই এর সত্যাসত্য বুঝতে পারবে। এ কথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল Hydrogen (উদজান) আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) নিয়ে ‘জল কই’ বললে কি জল হবে? না, তাদের একটা শক্ত জায়গায় রেখে electric current (তড়িৎ-প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নয়) হলে তবেই জল দেখতে পাবে ও বুঝবে যে, জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস থেকে উৎপন্ন। অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করতে গেলেও, সেই রকম ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বছরের অভ্যাসের তো কথাই নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। এক মুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হলো, আর বললে কি না, ‘কই, আমি তো সব এক দেখছি না!’ ”

বললাম; “স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) এসে পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাওয়ার নয়, তবে আর চেষ্টা, আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে, তখন আমারও হবে।”

স্বামীজী বললেন ঃ “তা নয়। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কিন্তু অনেক কারণে ঐ সব কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখান যায়, আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত, রাতও কাটান যায়। এটা নিজের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে।”

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। তিনি বলেন ঃ “সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুই ভাগে বিভক্ত। মানুষের স্থান, সৃষ্ট চেতন বস্তুসমূহের মধ্যে, সবার ওপরে। কোনও কোনও ধর্মমত অনুসারে, ঈশ্বর তাঁর আদলে মানুষকে গড়েছেন। আবার কারো কারো মতে, মানুষ ল্যাজবিহীন বাঁদর বিশেষ। কেউ আবার বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনা-শক্তি আছে; তার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশি। যাই হোক, মানুষ

যে প্রাণিনির্বিশেষ এবং প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, তা বোঝার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করে এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান করতে লাগলেন; আর অন্য দিকে আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষের উষ্ণ হাওয়ায় আর উর্বরা ভূমিতে শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য সময় মাত্র ব্যয় করে কৌপীন পরে প্রদীপের মিটমিটে আলোয় বসে আদা-জল খেয়ে বিচার করতে লাগলেন—'এমন জিনিস কি আছে, যা জানলে সব জানা যায়?' (What is that by knowing which everything will be known?) তাঁদের মধ্যে অনেক রকমের মানুষ ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় পৌঁছচ্ছেন এবং এক কথাই এখন বলতে আরম্ভ করেছেন। দুই দলই বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি বস্তুর প্রকাশ মাত্র। কাল এবং আকাশও (Time and Space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক ধারণা বা ভাবনা যা সূর্যের গতি অনুসারেই নির্ধারিত হয়, ভেবে দেখলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য তো অনাদি নয়। এমন সময় অবশ্য ছিল যখন সূর্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আসবে যখন সূর্য থাকবে না। এটা নিশ্চিত। তাহলে অখণ্ড সময় একটা অনির্বচনীয় ভাব বস্তুবিশেষ ছাড়া আর কি? আকাশ বা অবকাশ বললে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষই বুঝি। কিন্তু তা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এমন অবকাশও থাকা-সম্ভব যেখানে কোনও সৃষ্ট বস্তুই নেই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মতো অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ মাত্র। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা থেকে কিভাবে এল? সাধারণত আমরা কর্তা ছাড়া কর্মের কথা ভাবতেই পারি না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোনও কর্তা আছেন। কিন্তু তাহলে সৃষ্টিকর্তারও তো সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক! তা থাকতে পারে না। অতএব, আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ মাত্র। যা অনন্ত তা তো বহু হতে পারে না। তাই (পৃথিবী, সৌরজগৎ এবং তারও বাইরে) যত পদার্থ আছে, সে সমস্তই সেই অনন্ত এক সত্তার বিচিত্র প্রকাশ। স্বরূপত তারা এক।"

এক সময় আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "স্বামীজী, মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস, যা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তা কি সত্য?" তিনি বলেছিলেন ঃ "সত্য না হওয়ার

তো কোনও কারণ দেখি না। তোমাকে কেউ করুণস্বরে, মিষ্ট ভাষায় কোনও কথা জিজ্ঞেস করলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোনও কথা বললে তোমার রাগ হয়। তেমনি বিভিন্ন বিষয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীরাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না, তার মানে কি?"

এইসব কথা শুনে আমি বললাম, "স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝতে পারছেন। এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলে দিন।"

স্বামীজী বললেন ঃ "প্রথমে মনটাকে বশে আনতে চেষ্টা কর, তা যে উপায়েই হোক। পরে সব আপনিই হবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; জেনে রাখ যে, ঐটেই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (Highest ideal)। কিন্তু ঐ চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ছাড়া তা অনুভবের অন্য উপায় নেই।"

(স্বামীজীর কথা থেকে)

জি. এস. ভাটে

স্বামী বিবেকানন্দকে বেলগাঁওয়ে আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে পাওয়া আমার জীবনের এক বিরল সৌভাগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা। যতদূর মনে পড়ে, সেটা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের কথা—স্বামীজীর প্রথমবার মাদ্রাজ যাওয়ার ছ-মাস আগের ঘটনা। সেবার মাদ্রাজে গিয়ে তিনি আগের চেয়ে আরও ভালভাবে জনসাধারণের সাথে পরিচিত হলেন এবং শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন—এটা বেশ মনে আছে। বিখ্যাত হওয়ার আগে ভারতের খুব কম লোকই স্বামীজীকে চিনতেন, জানতেন। তাই আমার মনে হয়, বেলগাঁওয়ে থাকাকালীন অখ্যাত স্বামীজীর দিনযাপনের যে ছবিটি সময়ের ব্যবধানে ধূসর হয়েও এখনও আমার মনে জেগে রয়েছে, তার কিছু কিছু স্মৃতিকণা লিপিবদ্ধ করে রাখলে বিবেকানন্দ-অনুরাগী পাঠক খুশিই হবেন।

কোলাপুরের রাজার 'খানগী কারভারী' বা ব্যক্তিগত সচিব শ্রীযুক্ত গোলভালকার-এর কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে স্বামীজী কোলাপুর থেকে বেলগাঁওয়ে এসেছিলেন। কোলাপুরে আসার সময়ও অনুরূপভাবে তিনি ভাবনগরের দরবার থেকে কোলাপুরের দরবারের নামে একটি চিঠি করিয়ে এনেছিলেন। বেলগাঁওয়ে আসার পথে স্বামীজী বোম্বাইয়ে থেকেছিলেন কি না ঠিক বলতে পারব না, তবে এটা স্পষ্ট মনে আছে, একদিন সকাল ছটা নাগাদ আমার বাবার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত গোলভালকার-এর একটি চিঠি নিয়ে তিনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। স্বামীজীর চেহারার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্যরকম স্বাতন্ত্র্য ও নজর-কাড়া ব্যাপার ছিল যে প্রথম দর্শনেই তাঁকে বেশ অসাধারণ মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল এই মানুষটি ঠিক আর পাঁচজনের মতো নন। অবশ্য একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তখন কি আমার বাবা, কি আমাদের পরিবার বা ঐ ছোট শহরের লোকজন, কেউই নবাগত তরুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে ভবিষ্যৎ যুগনায়ক, যুগাচার্য বিবেকানন্দকে আবিষ্কার করতে পারেন নি।

স্বামীজী যে দিন আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এলেন, সে দিন থেকেই পরপর ছোটখাট এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটতে লাগল যার ফলে তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটাই আমূল পাল্টে গেল। প্রথমেই ধরা যাক তাঁর পোশাকের কথা। যদিও তিনি গেরুয়াই পরতেন, তবু অন্যান্য সন্ন্যাসীদের পোশাকের সাথে

তাঁর পোশাকের কোনও মিল ছিল না। তিনি 'বেনিয়ান' বা ফতুয়া পরতেন। সন্ন্যাসীরা সচরাচর দণ্ড ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি নিতেন কতকটা ছড়ির মতো লম্বা লাঠি। সন্ন্যাসীদের মতো তিনিও একখানি ঝোলা নিতেন। কিন্তু তাঁর সেই ঝোলায় থাকত একটা কমণ্ডলু, একটি পকেট-সাইজের গীতা, আরও দু-একখানা বই (বইগুলির নাম আজ আর ঠিক মনে নেই—তবে খুব সম্ভব, সেগুলি ছিল উপনিষদ্)। স্বামীজী জলের মতো ইংরেজি বলতেন। হিন্দিও খুব ভাল বলতে পারতেন। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা মারাঠি বলে তিনি আমাদের সঙ্গে হিন্দির চেয়ে ইংরেজিই বেশি বলতেন। আমরা তো অবাক! কারণ এর আগে ইংরেজি-জানা সাধু আমাদের চোখে পড়েনি, চোখে পড়েনি ফতুয়া-পরা কোনও সাধু। আমরা জানতাম 'সাধু' মানেই বুঝি খালি গা। আর যদি স্বামীজীর বুদ্ধি, মেধা ও পাণ্ডিত্যের গভীরতার কথা ধরি, তাহলে বলব ঐ রকমটি জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যেও দুর্লভ।

চমকের পর চমক! আর এখানেই শেষ নয়। প্রথম দিন খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন একটু পান ও সুপুরি পাওয়া যায় কি না। ঠিক সেই দিন বা তার পরদিন তিনি একটু দোক্তা চাইলেন। ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখুন! আমাদের মতো সাধারণ লোকের ধারণা, সন্ন্যাসী এইসব জাগতিক ছোটখাট কামনা-বাসনার বহু ঊর্ধ্বে। তাই সচরাচর যা হয়, আমরাও ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম—একি রে বাবা! এ আবার কোন্ ধরনের সন্ন্যাসী! বিস্ময়ের ধাক্কা কাটতে না কাটতেই স্বামীজী নিজেই জানালেন, তাঁর অব্রাহ্মণ শরীর; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থদের মতো পান, তামাকও খান। এ কী উল্টোপাল্টা কাণ্ডরে বাবা! স্বামীজী অচিরেই আমাদের ভুল ভেঙে দিলেন, সন্ন্যাস সম্পর্কে ধারণাটাই পাল্টে দিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন পান-সুপুরি খাওয়া বা তামাক চিবানোটা সন্ন্যাসীর পক্ষে এমন কিছু দোষের নয়। কি করে তাঁর অভ্যাস হলো, সে কথাও স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কথা শোনার পর আমাদের সব বিরূপতা চলে গেল।

স্বামীজী বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে আসার আগে তিনি ছিলেন একেবারে অন্য মানুষ। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপ্তিমান স্নাতক, রাতদিন হৈ-চৈ আর আনন্দ নিয়েই মেতে থাকেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-কটাক্ষে ও শিক্ষায় তাঁর জীবনের গতি ও দৃষ্টিভঙ্গি—দুটিই পাল্টে গেল। কিন্তু সব গিয়েও পান-তামাকের মতো দু-একটি অভ্যাস রয়েই গেল। তবে ঐগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় ভেবে স্বামীজী তা নিয়ে আর মাথা ঘামান নি।

খাওয়াদাওয়া সম্পর্কে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি আমিষাশী না নিরামিষাশী, স্বামীজী বললেন, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনও বাছবিচার নেই কারণ তিনি পরমহংস সন্ন্যাসী; এ ব্যাপারে সাধারণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁদের একটু পার্থক্য আছে। পরমহংসদের নিয়ম হলো, শ্রদ্ধার সঙ্গে যে যা দেবে তাই খেতে হবে; সে যদি অন্য ধর্মাবলম্বীও হয়, তার দেওয়া ভিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। আবার কেউ কিছু না দিলে তাঁকে উপবাসী থাকতে হয়। অহিন্দুর কাছ থেকে ভিক্ষা নিয়ে খেতে তাঁর কোনও আপত্তি আছে কি না, এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, প্রয়োজনে বহুবারই তিনি মুসলমানদের হাতে খেয়েছেন।

স্বামীজী খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন এবং সংস্কৃত পঠনপাঠনের যে প্রাচীন ধারা পণ্ডিতমহলে প্রচলিত, তার সাথেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি যখন প্রথম আমাদের বাড়ি এলেন সেই সময়টায় আমি খুব 'অষ্টাধ্যায়ী' পড়ছি। তখন আমার বয়সও কম। কিন্তু সেই ছোটবেলাতেই আমি তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। 'অষ্টাধ্যায়ী'র যে অংশগুলি মুখস্থ করতে তখন আমার কালোঘাম ছুটে যাচ্ছে, স্বামীজী অবলীলায় সেই অংশগুলি আবৃত্তি করে যেতেন। যতদূর মনে পড়ে, একদিন বাবা আমায় বললেন ঃ তুমি অষ্টাধ্যায়ী-র যে অংশগুলো এখন পড়ছ, তার থেকে কিছু কিছু স্বামীজীকে আবৃত্তি করে শোনাও দেখি। বাবার কথামতো মুখস্থ বলতে লাগলাম। কিন্তু এমনই কপাল, জায়গায় জায়গায় আমার ভুল হতে লাগল আর স্বামীজী তক্ষুনি হাসিমুখে ভুলগুলি সংশোধন করে দিতে লাগলেন। স্বামীজীর ব্যাপারস্যাপার দেখে আমি এতটাই স্তম্ভিত যে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণাটাই একেবারে বদলে গেল। এই ঘটনার পর আর একদিন যখন আমাকে 'অমরকোষ' থেকে কিছু অংশ বলতে বলা হলো তখন আমি ভাবলাম, চালাক হওয়ার চেষ্টা না করে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ; কারণ সঠিক বলতে পারব কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আমিও সে কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম। আমার কথা শুনে পিতৃদেব তো একেবারে খাপ্পা! তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে কারণ ছেলে হয়ে আমি তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারলাম না। কিন্তু তিনি রাগ করুন আর যাই করুন, আমি আর নতুন করে বিপদে পড়তে চাইনি। নবাগত অতিথির সামনে হাস্যাস্পদ হওয়ার চেয়ে সাময়িকভাবে বাবার বিরাগভাজন হওয়া আমার কাছে ঢের ভাল মনে হলো।

স্বামীজী আসার পর দু-একদিন বাবা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করলেন

এবং শেষে সিদ্ধান্তে এলেন যে, তাঁর অতিথিটি শুধু যে সাধারণের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের তাই নন, তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নিজের ধারণাকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মতামত যাচাই করার উদ্দেশ্যে বাবা তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। তাঁরাও স্বামীজীকে দেখে, তাঁর সাথে কথা বলে, একবাক্যে রায় দিলেন—হ্যাঁ, ইনি নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ মানুষ। তখন তাঁরা সবাই পরামর্শ করে ঠিক করলেন, শহরের সব জ্ঞানি-গুণী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একত্র করে স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাঁরা দিলেনও তাই।

স্বামীজী বেলগাঁও-এ আছেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে রোজই তাঁর কাছে লোকের ভিড় শুরু হলো; প্রতিদিনই তাঁকে ঘিরে বৈঠক বসতো। সে সময় যেটি আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করেছিল, তা হলো তাঁর গভীর রসবোধ ও মনের স্বাভাবিক প্রসন্নতা। কি সাধারণ দর্শনার্থীদের সাথে আলোচনার সময়, কি তপ্ত তর্ক-বিতর্কের সময়—স্বামীজী কখনও তাঁর প্রসন্নতা হারাতেন না। সর্বদা খোশ মেজাজে থেকে তিনি সকলের সব প্রশ্নের চটপট উত্তর দিতেন। কেউ তাঁকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কিছু বললে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তার সমুচিত পাল্টা জবাব দিতেন। কিন্তু তাঁর বলার ধরনটি এমনই ছিল যে তাঁর কথায় কেউ আঘাত পেত না। একদিনের এক মজার ঘটনা বলি। তা থেকেই বোঝা যাবে তর্ক-বিতর্কের সময়েও তাঁর মাথা কি অসম্ভব ঠাণ্ডা থাকত। ঐ সময়ে বেলগাঁওয়ে একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, শহরে যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি সর্বাধিক। দৈনন্দিন জীবনে আর পাঁচজন হিন্দুর মতোই, কিন্তু অতিশয় গোঁড়া, যেমনটি—আমার ধারণা—শুধু দক্ষিণ ভারতেই দেখা যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ঘোর সংশয়বাদী এবং তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার অন্ধ সমর্থক। অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ জীবনযাপন করা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাসের পিছনে কোনও যুক্তি নেই; ধর্মের সামাজিক স্বীকৃতির মূলে আছে মানুষের সংস্কারগত কিছু বিশ্বাস এবং পরিচিত কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও অভ্যাস। এইসব মনগড়া ধারণা নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতে এসে তিনি মহা ফ্যাসাদে পড়লেন; অস্বস্তির সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর প্রতিপক্ষ মহা শক্তিমান। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানে তাঁর যা অধিকার তার চাইতে স্বামীজীর জ্ঞান ছিল অনেক বেশি। আর ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ব্যাপারে দুজনের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। ফলে আলোচনা ও তর্ক-বিচারের সময় ঐ ভদ্রলোক একাধিকবার মেজাজ

খারাপ করে ফেললেন। ঠিক অভদ্র আচরণ না করলেও স্বামীজীর প্রতি তাঁর ব্যবহারে কিছু কিছু অসৌজন্য প্রকাশ পেতে লাগল। আমার বাবা আর স্থির থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু মৃদু হেসে তাঁকে বাধা দিয়ে স্বামীজী বললেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তিরিক্ষি মেজাজ তাঁর মনে কোনও রেখাপাত করেনি। এর কারণ ব্যাখ্যা করে (পরে) তিনি বলেছিলেন—এইসব পরিস্থিতিতে অশ্ব-প্রশিক্ষকের কৌশল অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। উঠতি বয়সের অশিক্ষিত ঘোড়াকে বশে আনতে হলে ঝানু প্রশিক্ষকের প্রথম লক্ষ্য হলো যে কোনওভাবে তার পিঠে সওয়ার হওয়া। একবার চড়ে বসতে পারলে তার একমাত্র কাজ চেপে বসে থাকা, সে আর তখন অন্য কোনও দিকে মন দেয় না। বুনো ঘোড়াও ছাড়ার পাত্র নয়। ক্রমাগত সে তার পিঠ থেকে সওয়ারকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। সওয়ার তবুও গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। এই রকম চলতে চলতে ঘোড়াবাবাজী যখন তার অসংহত শক্তিটাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে, যখন তার প্রতিরোধের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখনই শুরু হয় প্রশিক্ষকের আসল কাজ। তখন সে ঘোড়াটিকে বুঝিয়ে দেয় ঃ আমি তোমার প্রভু, আমার কথামতোই তোমায় চলতে হবে; তোমার এতটুকু বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করব না। দমহারা, অবসন্ন ঘোড়াটিও তখন তার প্রভুর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। আর তখনই প্রশিক্ষণের কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যায়।

এই কথা বলে স্বামীজী মন্তব্য করলেন ঃ আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের সময় ঘোড়সওয়ারের কৌশলই অনুসরণীয়। তোমার প্রতিপক্ষ ভাল-খারাপ, ঠিক-বেঠিক, যা বলে বলুক—তাকে বলতে দাও, বাধা দিও না। যেই দেখবে বলতে বলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তার তূণের সব বাণ শেষ, তখনই তার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার কর। দেখবে, তখন তুমি যা বলবে, সে তা-ই করবে। তোমার সব কথাই তখন সে সানন্দে মেনে নেবে। খামকা জোর করে চুপ করিয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাতে কাউকে স্বমতে আনা যায় না। কিন্তু যদি ঘোড়সওয়ারের কৌশল অবলম্বন করা যায়, তাহলে প্রতিপক্ষ স্বেচ্ছায় তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে।

গোঁড়া, অসহিষ্ণু তর্কভূষণের দল স্বামীজীকে দেখলেই কেঁচো হয়ে যেতেন। আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরেও তাই হলো। সব জ্ঞানি-গুণীরাই তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে হার মানলেন। অবশ্য এটা ঠিক যে বাক-যুদ্ধে জয়ী হওয়াই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে তিনি

চেয়েছিলেন দেশটা একটা প্রচণ্ড নাড়া খাক। হিন্দুধর্ম যে মরতে বসেনি এবং সে-সত্য যে দেশ এবং জগতের সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে—এই চেতনাটা তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, বেদান্তের অমূল্য সত্যগুলিকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার সময় এসেছে।

বেদান্ত সম্পর্কে স্বামীজীর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল—এটা আমি তখনই লক্ষ্য করেছি। গতানুগতিক বৈদান্তিক ধারণা এবং তাঁর চিন্তার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তিনি প্রায়শই দুঃখ করে বলতেন, দীর্ঘকাল ধরে বেদান্ত বিশেষ একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হয়েই রইল যেন এটি তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি! এই অনুদার, সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ফলেই বেদান্ত যে জীবনদায়ী শাশ্বত প্রেরণার উৎস, লোকে তা ভুলতে বসেছে। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, বেদান্তের একটা বিশেষ বিপদ হলো, ঘোর কাপুরুষও এর নীতি বা আদর্শের বুলি আওড়াতে পারে। কিন্তু মুখে বললে কি হবে, জীবনে তাকে ফুটিয়ে তোলা একমাত্র বীরের পক্ষেই সম্ভব। তিনি আরও বলতেন, বেদান্ত হলো পেটরোগার কাছে গুরুপাক মাংস—হজম করা অতীব শক্ত!

অহিংসা ও অপ্রতিরোধ নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলতেন, এই নীতি মেনে চলার অর্থ এই, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য তোমার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সচেতনভাবে তুমি প্রতিরোধ করা থেকে বিরত আছ। কোনও সবল মানুষ যদি তাঁর দুর্বল ও দুর্বিনীত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় শক্তিপ্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবেই দাবি করতে পারেন তাঁর এই আচরণের পিছনে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি ঠিক এর বিপরীত হয়, যদি তিনি শক্তিমান না হন, অথবা বাস্তবিক তাঁর প্রতিপক্ষই অধিকতর বলবান হন, সেক্ষেত্রে প্রতিরোধের অভাব দেখলে লোকে তাঁকে কাপুরুষ বলেই সন্দেহ করবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, এই হলো তার সার কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও সংশয় দেখা দিয়েছিল, স্বজনবধের জন্য নিজের অপরাজেয় শৌর্য, বীর্য ও শক্তি প্রয়োগে অনীহা ছাড়াও সম্ভবত তার অন্য কারণও ছিল। সেইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ আপন সখা অর্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে স্বধর্মে উদ্বোধিত করলেন; আর সেই যে দীর্ঘ উদ্বোধনের প্রচেষ্টা তারই চিরন্তন সংলাপ অষ্টাধ্যায়ী গীতার ছত্রে ছত্রে।

(প্রবুদ্ধ ভারত, জুলাই ১৯২৩)

কে. সুন্দররাম আয়ার

স্বামী বিবেকানন্দকে আমি প্রথম দর্শন করি ত্রিবান্দ্রমে। সে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের কথা। সৌভাগ্যবশত তখনই তাঁকে নানাভাবে দেখার ও জানার সুযোগ আমার হয়েছিল। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের চারধাম অর্থাৎ কেদার-বদরী, দ্বারকা, পুরী ও রামেশ্বরম তীর্থে গমন ও ঐ সব তীর্থস্থানে তপস্যা করা এবং তীর্থদর্শনকালে ধর্মপ্রাণ হিন্দু গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাধুকরী করে খাওয়ার রেওয়াজ সন্ন্যাসীদের মধ্যে যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। সেই ধারা ও পরম্পরা অনুযায়ী স্বামীজীও তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের ত্রিবান্দ্রমে এসে পৌঁছলেন। ত্রিবান্দ্রমে যেদিন স্বামীজী প্রথম আমার কাছে এলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে এক মুসলমান গাইড (পথপ্রদর্শক) ছিলেন, যার ফলে আমার বারো বছরের মেজো ছেলেটি স্বামীজীকেও মুসলমান বলে ভুল করেছিল। সে আমার কাছে এসে সেই রকমই খবর দেয়। অবশ্য আমার পুত্রকেও (সে এখন প্রয়াত) খুব দোষ দেওয়া চলে না, কারণ স্বামীজীর পোশাক আশাক মোটেই দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো ছিল না। যাই হোক, আমি তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে গেলাম এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেই যখন বুঝতে পারলাম তিনি কত উঁচুদরের সন্ন্যাসী, তখনই তাঁকে যথোচিতভাবে আমার অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে প্রণাম নিবেদন করলাম।

প্রথম আলাপেই স্বামীজী আমাকে তাঁর মুসলমান সঙ্গীটির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন কোচিন রাজ্যের সরকারি পিওন। কোচিন রাজ্যের দেওয়ানের তৎকালীন সচিব শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. রামাইয়া (বি.এ.), যিনি একসময় বিশাখাপত্তনম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ভদ্রলোকটিকে স্বামীজীর সঙ্গে ত্রিবান্দ্রমে পাঠিয়েছিলেন, কারণ নিজের সুখসুবিধা বা আরামের কোনও পরোয়াই স্বামীজী করতেন না। আগে থেকে পরিচয়পত্র লিখিয়ে নিয়ে ত্রিবান্দ্রমে একটু ভালমতো থাকার আগাম ব্যবস্থা করতেও তাঁর আপত্তি ছিল। গত দু-দিন তিনি একটু দুধ ছাড়া আর কিছুই প্রায় খাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমান সঙ্গীটি ভালমতো খেয়ে দেয়ে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করার কথা তাঁর মনেও ওঠেনি।

কয়েক মিনিট কথা বলেই বুঝলাম, স্বামীজী এক বিরাট শক্তিমান পুরুষ।

কথায় কথায় যখন জানতে পারলাম, এরনাকুলাম ছাড়ার পর থেকে তিনি প্রায় উপবাসী আছেন, তখন জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কি ধরনের খাবার ভালবাসেন?" স্বামীজী বললেন ঃ "আপনার যা খুশি তা-ই দেবেন। আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের পছন্দ-অপছন্দ কিছু নেই।"

দুপুরের খাবার তৈরি হতে তখনও কয়েক মিনিট বাকি। সেই ফাঁকে আমাদের মধ্যে আরো কিছু কথাবার্তা হলো। স্বামীজী বাঙালী জানতে পেরে একসময় আমি বলে বসলাম, বাংলাদেশে অনেক বড় বড় লোক জন্মেছেন; তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন। কেশববাবুর কথা উঠতেই স্বামীজী আমার কাছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম করলেন এবং দুটি একটি কথার মধ্য দিয়ে তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের ছবিটি তুলে ধরলেন। আমার বিস্ময় চরমে উঠলো যখন তিনি বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় কেশব নিতান্তই শিশু! স্বামীজীর কাছ থেকে আরো জানতে পারলাম যে, শুধু কেশব নন, সমসাময়িক বিখ্যাত বহু বাঙালীই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে পরিপুষ্ট এবং কেশবচন্দ্র জীবনের শেষ পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তার ফলে তাঁর নিজের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় এক ইতিবাচক রূপান্তর ঘটে। জানলাম, শুধু শিক্ষিত বাঙালীরাই নয়, বহু ইউরোপীয় ভদ্রলোকও শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যাকুল ছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে দেব-মানবরূপেই দেখতেন; জানলাম বাংলাদেশের তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা সি. এইচ. টনির মতো পণ্ডিতও ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন, যাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র, প্রতিভা, উদারতা এবং অন্যকে ঈশ্বরলাভের জন্য অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেছেন।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে স্বামীজীর জন্য রান্না হয়ে গেল। বলতে গেলে প্রায় দু-দিনের অনাহারের পর স্বামীজী সেদিন একটু ভাল করে খাওয়াদাওয়া করলেন। খেতে খেতেও স্বামীজী অনেক কথা বললেন।

সেই সময়ে আমি ত্রিবাঙ্কুরের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মাকে তাঁদের প্রাসাদে গিয়ে পড়াতাম। রাজকুমার তখন এম. এ. পড়েন। বি.এ. পড়ার সময়েও আমি তাঁকে পড়িয়েছি। মাদ্রাজ সরকারই আমাকে ঐ কাজে বহাল করেন। কিন্তু স্বামীজীর উপস্থিতি, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁর অনুপম বাণী ও চিন্তার ঝরনাধারায় তখন আমি এমনই উদ্দীপিত যে, সেদিন আর রাজকুমারকে পড়াতে যেতে পারলাম না।

খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীজী কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। তারপর সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে আমি গেলাম অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার বাড়ি। রঙ্গাচারিয়া তখন ত্রিবান্দ্রম কলেজে রসায়নের অধ্যাপক। পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানী হিসাবে তখনই তাঁর খ্যাতি শুধু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নয়, সারা দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর আমার মতো তিনিও তখন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধীনে কাজ করছেন। যাই হোক, অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি নেই, কোথাও গিয়েছেন। অগত্যা আমরা গাড়ি করে ত্রিবান্দ্রম ক্লাবে গেলাম। ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত অনেকের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সুন্দরম পিল্লাই, এম. এ (এখন প্রয়াত), জনৈক ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকার এবং আমার বন্ধু নারায়ণ মেনন—খুব সম্ভব সে এখন ত্রিবাঙ্কুরের একজন দেওয়ান-পেশকার। একটু পরে অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া এলে তাঁর সঙ্গেও স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। সেদিনের সব মুখগুলি, বিশেষ করে নারায়ণ মেনন আর ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকারকে আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। স্পষ্টভাবে ঐ দুজনকে মনে রাখার পিছনে আছে সেদিন সন্ধ্যার একটি ছোট্ট ঘটনা। ঘটনাটিকে ছোট্ট বললুম বটে, কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনাটিই স্বামীজীর চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক আমার কাছে তুলে ধরেছিল। ঐ ঘটনায় দেখা গেল, কি অসাধারণ তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি—তাঁর চারপাশে কি ঘটছে সবই তিনি লক্ষ্য করেন, কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না এবং সবকিছুকেই তিনি সুচারুভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এটাও দেখলাম, তাঁর চরিত্রে যেমন নম্রতা ও সুদুর্লভ মাধুর্য রয়েছে, তেমনই আছে ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি এবং জুতসই জবাব দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা। সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধুবর নারায়ণ মেনন একটু আগে আগেই ক্লাব থেকে চলে গেলেন। বিদায় নেওয়ার সময় তিনি ঐ ব্রাহ্মণ দেওয়ান-পেশকারকে নমস্কার করলে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণরা যেভাবে শূদ্রদের আশীর্বাদ করে থাকেন, পেশকার মশাইও ঠিক সেই ভঙ্গিতে তাঁর বাঁ হাতটি একটু তুলে মেননকে প্রত্যভিবাদন করলেন। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর অনেক সদস্য ক্লাবে এলেন, আবার চলেও গেলেন। অবশেষে রইলাম আমরা পাঁচজন—স্বামীজী, দেওয়ান-পেশকার, পেশকার মশাই-এর ভাই, অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া আর আমি। পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে যখন বিদায় নিচ্ছি, তখন দেওয়ান-পেশকার স্বামীজীকে বিনম্র নমস্কার জানালেন। উত্তরে স্বামীজী প্রতিনমস্কার না করে, সন্ন্যাসীদের সনাতন রীতি অনুযায়ী শুধু 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বললেন। এতে পেশকার মশাই তো রেগে আগুন! কারণ তিনি আশা করেছিলেন, যেভাবে তিনি স্বামীজীকে সম্মান দেখালেন, স্বামীজীও সেইভাবে

তাঁকে সম্মান দেখাবেন। (পেশকার মশাইয়ের মনের ভাব বুঝে) স্বামীজী দৃপ্তভঙ্গিতে তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "নারায়ণ মেনন যখন আপনাকে নমস্কার করলেন তখন তো আপনি ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত ঢংটিই বজায় রাখলেন। তবে আমিও যদি সন্ন্যাসীদের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আপনাকে প্রত্যভিবাদন করি, তাহলে আপনিই বা চটবেন কেন?"

স্বামীজীর এই কথায় কাজ হলো। পরের দিন ভদ্রলোকের ভাই এসে গত রাতের অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমাদের কাছে এক রকম ক্ষমা প্রার্থনা করে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী অল্প কিছুক্ষণের জন্যেই ক্লাবে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনই যে ঐ স্বল্প সময়েই সকলের মন কেড়ে নিয়েছেন। ত্রিবান্দ্রমের হিন্দু সমাজটি আকারে ছোট হলেও প্রকৃতিতে ছিল সাড়ে বত্রিশভাজা, গোটা দক্ষিণ ভারতের নানা জাতি ও বর্ণের সমন্বয়ে এক বিচিত্র জগাখিচুড়ি! এঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানি-গুণী, নামকরা লোক, তাঁরা প্রায় সকলেই ত্রিবান্দ্রম ক্লাবের সদস্য ছিলেন; যার ফলে ক্লাবটি হয়ে উঠেছিল ত্রিবান্দ্রমের বিচিত্র হিন্দু সমাজের একটি সান্ধ্য সংস্করণ। সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী সকলের সঙ্গেই সহজভাবে কথা বললেন। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে মনে ধরেছিল রঙ্গাচারিয়াকেই, কারণ ঐ অধ্যাপকের মধ্যে তিনি এমন কতকগুলি গুণ দেখেছিলেন যেগুলিকে তিনি নিজেও সব চাইতে বেশি মূল্য দিতেন—যেমন সব বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্য, অলোকসামান্য বাগ্মিতা অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, অন্যের সাথে তর্কে আপন মত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা এবং অন্যের চিন্তার ত্রুটির দিকটি ধরিয়ে দেওয়ার শক্তি, আবার তারই তলায় বর্তমান একটি ভাবপ্রবণ সুকোমল মন যা মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, প্রকৃতি এবং শিল্পকলার মধ্যে যা কিছু সুন্দর ও সুরম্য, তাকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করার জন্য নিত্য উন্মুখতা।

অধ্যাপক সুন্দরম পিল্লাইয়ের একটি মন্তব্যে স্বামীজী বিরক্ত হয়েছিলেন। অধ্যাপক বলেছিলেন—'দ্রাবিড়' জাতির লোক হিসাবে তিনি নিজেকে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত মনে করেন। পরে স্বামীজী বলেছিলেন, অধ্যাপক পিল্লাই পণ্ডিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতি বর্ণের সঙ্কীর্ণতার কাছে বিনাবিচারে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ ভারতে ঘোরার সময় একশ্রেণীর অবিবেচক ছাপোষা মানুষের মধ্যেও তিনি ঐ ধরনের বিরক্তিকর মানসিকতা লক্ষ্য করেছেন।

স্বামীজী পরের দিন রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আগেই বলেছি, রাজকুমার তখন আমার তত্ত্বাবধানে এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তিনি আমার কাছে স্বামীজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি স্বামীজীর সঙ্গেই গিয়েছিলাম এবং ওঁদের দুজনের কথাবার্তা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, পরিব্রাজক জীবনে অনেক দেশীয় রাজার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয় হয়েছে; অনেক রাজদরবারেও তিনি গিয়েছেন। সে কথা শুনে রাজকুমার সাগ্রহে স্বামীজীর অভিজ্ঞতার বিষয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন। স্বামীজী বললেন, এ পর্যন্ত যে কয়েকজন দেশীয় রাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে রাজ্যশাসন ক্ষমতা, দেশপ্রেম, উৎসাহ এবং দূরদৃষ্টির বিচারে বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়ই তাঁকে সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছেন। আর ছোট রাজ্য হলেও খেতড়ির রাজার মধ্যেও অনেক মহৎ গুণ তিনি দেখেছেন এবং বিশেষ প্রীত হয়েছেন। তারপর থেকে যতই তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে এগিয়েছেন, ততই দেশীয় রাজা ও সামন্ত রাজাদের অপশাসন ও নৈতিক অধঃপতনের ছবিই তাঁর কাছে উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

একথা শুনে রাজকুমার জানতে চান তাঁর কাকা অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজাকে স্বামীজী দেখেছেন কি না। স্বামীজী তখনও পর্যন্ত মহারাজার সঙ্গে দেখা করার ফুরসত পাননি। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই ঘটনার ঠিক দু-দিন পরেই দেওয়ান শঙ্কর সুব্বায়ার ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সঙ্গে স্বামীজীর দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মহারাজা স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান, তাঁর কোথাও কিছু অসুবিধা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন যে, ত্রিবান্দ্রমে বা ঐ রাজ্যের অন্যত্র থাকাকালীন তাঁর যখন যা প্রয়োজন দেওয়ানজীই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। মাত্র দু-তিন মিনিটের মধ্যেই কথাবার্তা শেষ করতে হলো বলে যদিও স্বামীজী সেদিন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, তবুও মহারাজার সহৃদয় আচরণ ও মহানুভবতা তাঁকে স্পর্শ করেছিল।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি। এখন আবার রাজকুমারের সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। স্বামীজী কিছুদিন মহীশূরের প্রয়াত মহারাজার অতিথি হয়েছিলেন। তাই রাজকুমার ঐ মহারাজা সম্পর্কে স্বামীজীর কি ধারণা জানতে চাইলে স্বামীজী যা বললেন তার মর্ম এই ঃ অধিকাংশ দেশীয় রাজাদের মতো তিনিও প্রায় পারিষদদের হাতের পুতুল

বনে গিয়েছিলেন। তাঁর না ছিল নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলার ক্ষমতা, না ছিল তেমন কোনও অভিপ্রায়। ফলে যা ঘটা উচিত নয়, তাই ঘটতে লাগলো।

নাম-ধাম গোপন রেখে এখানে একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। সেদিন স্বামীজীর মুখে এটি শুনেছিলাম। স্বামীজী একবার বেশ ঝুঁকি নিয়ে মহারাজকে তাঁর একজন প্রিয় ঘনিষ্ঠ পারিষদকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দেন—কারণ, মহারাজের প্রীতিভাজন হলেও ঐ ভদ্রলোক সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে সঙ্গত অসঙ্গত যে কোনও কারণেই হোক (সম্ভবত অসঙ্গত কারণেই), বিরূপ ধারণা ছিল। স্বামীজীর প্রস্তাব শুনে মহীশূর অধিপতি এক অদ্ভুত উত্তর দিলেন। তিনি বললেন যে, স্বামীজী, এ যাবৎ তাঁর দেখা মহৎ মানুষদের মধ্যে এমন একজন চিহ্নিত ব্যক্তি যিনি দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য এক মহান ব্রত পালনের অঙ্গীকার নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি যেন প্রাসাদের নোংরা রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামান। তাছাড়া প্রাসাদে খোলাখুলি কথা বলা বা সভাসদদের কটাক্ষ করা, বিশেষত মহারাজের প্রীতিভাজন কোনও ব্যক্তি বা আমলাকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলা, খুবই বিপজ্জনক। এতে স্বামীজীর প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে। এই ঝুঁকি নেওয়া তাঁর উচিত নয়।

ওপরের এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, স্বামীজী এবং মহীশূরের রাজা পরস্পরকে কতটা বুঝতেন। এই প্রসঙ্গ শেষ হলে স্বামীজী খুব আন্তরিকতার সঙ্গে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার পড়াশুনা কেমন চলছে? আর আপনার জীবনের লক্ষ্যই বা কি? রাজকুমার বললেন ঃ দেখুন, স্বামীজী, রাজপরিবারের একজন এবং ত্রিবাঙ্কুর মহারাজের একান্ত অনুগত প্রজা হিসাবে ইতোমধ্যেই রাজ্যের অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ নিয়ে আমি ভাবতে শুরু করেছি। যতদূর পারি তাদের কল্যাণ করব—এই আমার সঙ্কল্প।

স্বামীজীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মতো রাজকুমারও তাঁর ব্যক্তিত্ব, চেহারা ও চোখমুখের গড়ন দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার ওপর তিনি ছিলেন শৌখিন ফটোগ্রাফার। স্বামীজীর অনুমতি নিয়ে তিনি চমৎকার একখানি ছবি তোলেন এবং নিজের হাতে স্বামীজীর সেই ছবি বড় করে প্রিণ্ট করে মাদ্রাজ মিউজিয়ামে সেখানকার পরবর্তী শিল্পকলা প্রদর্শনীর জন্য পাঠিয়ে দেন।

সেদিন রাজকুমারের কাছ থেকে ফিরে আসার সময় স্বামীজী আমাকে বললেন যে, রাজকুমারের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যা সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবে না। অর্থাৎ

ইঙ্গিতে হয়তো আমাকে স্বামীজী এই কথাই বলতে চাইছিলেন যে, রাজকুমার ইতোমধ্যেই গ্রাজুয়েট হয়েছেন; এখন তাঁকে উপদেশ-নিষেধের বন্ধনে বেঁধে না রেখে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো চলতে দেওয়াই ভাল। বাস্তবিক তাই হচ্ছিল। রাজকুমারকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে না রেখে আমরা তাঁকে তাঁর নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করছিলাম মাত্র। বছরখানেক পর রাজকুমার নিজে থেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দেন।

দ্বিতীয় দিন পুরোটাই এবং তৃতীয় দিনের বেশিরভাগ সময় আমি স্বামীজীর সঙ্গে বেশ একান্তে কাটিয়েছিলাম। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য শুধু অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া এসেছিলেন। সে যাই হোক, জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমি যে বেশ গোঁড়া হিন্দু, স্বামীজী এটি লক্ষ্য করেছিলেন। এবং হয়তো সেই কারণেই বেশির ভাগ সময়ে তিনি এমন সুরে কথা বলতেন যাতে আমার ভাব ও বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। তবে এটা ঠিক, মাঝে মাঝেই তিনি নিষ্প্রাণ দেশাচার ও লোকাচার-সর্বস্বতার তীব্র নিন্দা করতেন। কুড়ি বছর আগের এইসব ঘটনা ও কথাবার্তার বিবরণ আমি লিখে রাখিনি, কারণ ডায়েরি রাখার অভ্যাস আমার নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো স্মৃতিই আজ আমার একমাত্র সম্বল এবং মুখ্যত সেই কারণেই এই লেখায় হয়তো আগের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা আগে এসে যেতে পারে। যখন স্বামীজীর কাছাকাছি আমি ছাড়া আর কেউ থাকতেন না, তখন প্রায়ই আমাদের মধ্যে মনোজ্ঞ সব আলোচনা হতো। আবার কখন-কখন অন্যান্য দর্শনার্থী এলেও আলাপ-আলোচনা বেশ জমে উঠত। সেই সময় চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে উত্তর ভারতের এক মহা পণ্ডিত ও শক্তিমান সাধু আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। সেই সংবাদ পেয়ে দলে দলে দর্শনার্থী আসতেন তাঁকে প্রণাম করে পুণ্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষায়।

বিজ্ঞান মানুষের বিশ্বাসের ওপর মাত্রাতিরিক্ত দাবি করে—সে চায় নিঃশর্ত আনুগত্য। এই স্ববিরোধী অসঙ্গত দাবির বিরুদ্ধে একদিন স্বামীজী সোচ্চার হলেন। তিনি বলেন ঃ "ধর্মে যদি কুসংস্কার থেকে থাকে, তবে বিজ্ঞানও কুসংস্কারমুক্ত নয়।" পরীক্ষা করে দেখা গেছে জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেয় ও বিবর্তনবাদের যে তত্ত্ব প্রচার করে, সেগুলি সন্তোষজনক তো নয়-ই, সম্পূর্ণও নয়; তার মধ্যে ঢের ফাঁক রয়ে গেছে। অথচ অনেকেই বলে থাকেন যে, বিশ্বের সব রহস্যই তাঁরা ধরে ফেলেছেন। অজ্ঞেয়বাদ মানুষের চিন্তাধারাকে অনেকটা প্রভাবিত করতে পেরেছে ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় অধ্যাত্ম-

বিজ্ঞান তথা যোগের সূত্র ও সত্যগুলিকে উপেক্ষা করে সে নিজের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয়ই দিয়েছে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান তো মানুষের মনের অতীন্দ্রিয় দিক ও তার গতি-প্রকৃতির কোনও তলই পায়নি। অথচ মজার ব্যাপার, ইউরোপীয় বিজ্ঞান যেখানে থমকে গেছে, সেখানে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান এগিয়ে এসে ব্যাখ্যা করে, দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, হাতেনাতে শিখিয়ে দিয়েছে, অতিজাগতিক অস্তিত্ব ও অনুভূতির রাজ্যের উচ্চতর সত্যগুলিকে কিভাবে আয়ত্ত করা যায়, জীবনে ফুটিয়ে তোলা যায়। একমাত্র ধর্ম, বিশেষত ভারতীয় ঋষিদের সনাতন ধর্মই মানবমনের সূক্ষ্ম ও গোপন ক্রিয়াকলাপের রহস্য ভেদ করে মানুষকে তার জাগতিক কামনা-বাসনার শতক-বন্ধনের বহু ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে সেই 'একং সৎ' বা পরম একের উপলব্ধিতে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। ধর্মই তাকে বুঝিয়ে দেয় যা কিছু দেখি, শুনি, জড়ের অধীন সবই সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তার সীমিত, সঙ্কুচিত প্রকাশ মাত্র।

লৌকিক ও অলৌকিকের তথা স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—দুই-ই বন্ধনের কারণ। উভয়েই মানুষকে ইন্দ্রিয়ের দাসে পরিণত করে। যিনি ঐ দুয়ের পারে যেতে পারেন, একমাত্র তিনিই, মনুষ্যজীবনের যা চরম লক্ষ্য, সেই দুর্লভ মুক্তির অধিকারী হন। মানবীয় বা দৈব সবরকম জাগতিক অসারতা ও তুচ্ছতার অনেক ঊর্ধ্বে তখন তিনি বিরাজ করেন।

জাতিভেদ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ততদিনই বজায় থাকবে যতদিন তাঁরা নিষ্কাম কর্ম করবেন এবং নিজেদের বিদ্যা-জ্ঞান-ভক্তি আপামর জনসাধারণের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দেবেন। স্বামীজীর মুখের কথাগুলি এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন ঃ "ব্রাহ্মণরা ভারতের জন্য অনেক মহৎ কাজ করেছেন, এখনো করছেন এবং আমার নিশ্চিত ধারণা, দেশের মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতেও তাঁদের মহত্তর ভূমিকা নিতে হবে।"

মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা এবং বিয়েথার ব্যাপারে শাস্ত্রে যেসব ব্যবহার ও বিধিনিষেধ আছে সেগুলি পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না স্বামীজী। এসব ব্যাপারে কারো হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন, মেয়েরা এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ সকলেই সংস্কৃত শিখে প্রথমে ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হোক এবং মুনি-ঋষিদের উপলব্ধ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি নিজ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলুক। এইভাবে আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও নিজেদের সঠিক প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা হলে

নিজ অভিজ্ঞতার আলোয় সমাজে তাদের ভূমিকা কি হবে, সেই প্রশ্নের সমাধানের ভার তারা নিজেদের হাতেই নিতে পারবে; তারা নিজেরাই তখন নিজেদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে—এই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস।

এদেশের মানুষের বিদেশে যাওয়া উচিত কি না, আমি এই প্রশ্ন করলে স্বামীজী বললেন—পশ্চিমের দেশগুলোর এখনও যা অবস্থা তাতে ওসব দেশে বেদান্ত প্রচার না করতে পারলে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পক্ষে তা বাসযোগ্য হবে না। কারণ তাদের আহার-বিহারের সংযম ও সনাতন জীবন ধারায় পবিত্রতার ধারণার সঙ্গে ওখানকার জীবন মোটেই খাপ খাবে না। এই সংযম ও পবিত্রতাই এইসব ব্যক্তিদের যুগ যুগ ধরে ভগবদকৃপার ধারক ও বাহক করে রেখেছে। অবশ্য যেসব হিন্দুদের জাত যাবার ভয় নেই বা যারা ছোঁয়াছুঁয়ির ধার ধারেন না, তাদের কথা আলাদা। তারা সাগর পাড়ি দিলে কার কি আপত্তি থাকতে পারে?

আমার কাছে স্বামীজীর থাকার তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে ত্রিবাঙ্কুরে এক অতি বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত এস. রামা রাও-এর কাছে জরুরি খবর পাঠালাম। শ্রীযুক্ত রামা রাও আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি তখন ত্রিবাঙ্কুরের ভাষাশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা। বন্ধু হলেও আমি তাঁকে বরাবরই খুব শ্রদ্ধা করি, শ্রদ্ধা করি তাঁর চরিত্র, শিক্ষাদীক্ষা, পবিত্রতা ও তাঁর অকপট ঈশ্বর-অনুরাগের জন্য। বন্ধুবর রামা রাও এখনও জীবিত। রামা রাও তো স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্বলন্ত ভক্তি দেখে একেবারে বিমুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি স্বামীজীকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, স্বামীজী কৃপা করে রাজি হয়েছিলেন। ভিক্ষাপর্ব সারা হলে দুজনেই একসাথে ফিরে আসেন এবং স্বামীজী আবার তাঁর অমূল্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুরু করেন।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, একবার রামা রাও স্বামীজীকে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ব্যাপারটা কি, তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করলে স্বামীজী তাঁর চরিত্রধর্মী, ওজস্বিনী ভাষায় একটি গল্প বলতে শুরু করেন। গল্পটি অনেকটা 'কৃষ্ণ-কর্ণামৃত'-এর বিখ্যাত কবি লীলা-শুকের উপাখ্যানের মতোই। গল্পের শেষ দিকটা স্বামীজী এমন প্রাণ দিয়ে বলেছিলেন, যা আজ একুশ বছর পরও এতটুকু ভুলিনি, যার রেশ কুম্ভকোণমের প্রয়াত শিল্পী সরভ শাস্ত্রিয়ারের বাঁশির মধুর, অনবদ্য সুরের মতো এখনো কানে লেগে রয়েছে। গল্পের শেষে আছে, নায়ক বৃন্দাবনে এসে এক শেঠের দুলালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ কন্যার ভালবাসার পরিবর্তে তার কপালে এমন নিগ্রহ আর লাঞ্ছনা জুটলো যে,

অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে সে স্বহস্তে নিজের চোখদুটি উপড়ে ফেলে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাস্থল বৃন্দাবনে অবশিষ্ট জীবন সে অবিরত কৃষ্ণধ্যানে নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। নায়কের চোখ উপড়ে ফেলার ঘটনাটি বর্ণনা করে স্বামীজী উপসংহার টানলেন এই বলে যে, "চঞ্চল, অসংযত ইন্দ্রিয়দের বশে এনে ভগবানের দিকে মনের গতি ফেরাতে হলে, যদি দরকার পড়ে তো, এমন চরম উপায়ও আমাদের অবলম্বন করতে হবে।"

তৃতীয় কি চতুর্থ দিন স্বামীজীর অনুরোধে মাদ্রাজের তদানীন্তন অ্যাকাউনট্যান্ট-জেনারেলের সহকারী মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের (এখন প্রয়াত) খোঁজ নিলাম। জানা গেল ভট্টাচার্যমশায় ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট'-এর অফিসে তহবিল তছরূপ হওয়ার অভিযোগ ওঠায় তদন্তের ভার নিয়ে তখন ত্রিবান্দ্রমেই আছেন। সেই থেকে স্বামীজীও প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভট্টাচার্যমশায়ের সঙ্গেই কাটাতে লাগলেন। দুপুরের খাওয়াদাওয়াও তাঁরা একসঙ্গে সারতেন। একদিন আর থাকতে না পেরে অন্য এক অতিথির সামনেই আমি অনুযোগ করে বসলাম। তিনি আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও থাকুন, এটি আমার মনঃপূত নয় লক্ষ্য করে স্বামীজী এমন একটা মোক্ষম উত্তর দিলেন যা শুধু তাঁর মুখেই সাজে। তিনি বললেন ঃ "দেখুন, আমরা বাঙালীরা একটু ঘরকুনো, নিজেদের মধ্যে গলা-জড়াজড়ি করে থাকতেই ভালবাসি।" তিনি আরো বললেন—ভট্টাচার্যমশায় একে তাঁর সহপাঠী (স্কুল অথবা কলেজের), তায় আবার কলকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র। সেদিক থেকে তাঁর ওপর ভট্টাচার্যমশায়ের দাবি একটু বেশিই বলা যেতে পারে।

একটু থেমে স্বামীজী আবার বললেন, বহুদিন তিনি মাছটাছ খাননি। কারণ এই দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে তিনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের বাড়িতেই বেশি উঠেছেন, আর তাঁদের তো আমিষ আহার নিষিদ্ধ। তাই বাঙালী রসনার উপযুক্ত বস্তুর সন্ধান যখন মিলেছে, তখন তা তিনি সদ্ব্যবহার করতে চান। স্বামীজীর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আমিষ খাওয়া সম্পর্কে আমার তীব্র অপছন্দের কথা বলে ফেললাম।

স্বামীজী উত্তরে বললেন, প্রাচীনকালে ভারতে ব্রাহ্মণেরাও মাংস খেতেন, এমনকি তাঁদের গো-মাংসেও অরুচি ছিল না। তাছাড়া যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে বা অতিথিদের জন্য 'মধুপর্ক' তৈরি করতেও তাঁদের গরু এবং অন্যান্য পশুবধ

করতে হতো বৈকি! প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলেই মাছ-মাংস খাওয়ার চলন ধীরে ধীরে কমে গেছে, যদিও একথা সত্য যে হিন্দু শাস্ত্রের ঝোঁক বরাবর নিরামিষের দিকেই একটু বেশি।

স্বামীজীর মতে, জাতীয় শক্তির অবক্ষয়, হিন্দুজাতি ও হিন্দুরাজ্যগুলির ক্রমিক হীনবীর্যতা এবং পরাধীনতার অন্যতম প্রধান কারণ মাংস আহারের প্রতি উপেক্ষার ভাব তথা নিরামিষ ভোজন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানান যে, ইদানীং বাঙালীদের মধ্যে নানারকম আমিষ খাদ্যের চল হয়েছে। তবে, হ্যাঁ, এক পাল ভেড়া মারার আগে তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনিয়ে তাঁকে দিয়ে জন্তুগুলোর গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে নেয়। আর তো বিবেকের দংশন নেই! ব্যস্, এবার কর জবাই।

কথাবার্তার মাধ্যমে স্বামীজীকে যতটুকু বুঝেছিলাম, তাতে মনে হয়েছে, তাঁর ধারণা, আজকের দুনিয়ায় ক্ষমতা ও নিজের নিজের প্রাধান্য বিস্তারের যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলছে, সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরেই হোক কি তার বাইরেই হোক, তার মধ্যে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে গেলে হিন্দুদের মাছ-মাংসের মতো বলদায়ক খাদ্য খেতেই হবে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের নিয়মরীতি আমরা মেনে চলতাম। তাই স্বামীজীর সিদ্ধান্তের পুরোপুরি বিরোধিতা করলাম। একমাত্র বৈদিক ধর্মই প্রকৃতির সাথে মানুষকে একাত্ম হতে শিখিয়েছে; এই ধর্মই শিখিয়েছে ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা অথবা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষার মতো তুচ্ছ বিষয়ের কাছে মানুষ যেন নতিস্বীকার না করে, এসবের ঊর্ধ্বে তার যাওয়া উচিত। 'সর্বজীবে দয়া' একটি মহান বাণী; দীর্ঘকাল ধরে এটি হিন্দুদের আচরিত অনন্য সম্পদ হয়ে আছে; দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের জীবনে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট—তাকে কখনো ভ্রান্ত, সেকেলে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার বিশ্বাস নিরামিষ খেয়েই মানুষ নৈতিকতার দিক থেকে অনেক বড় হতে পারে, আর দেশের শক্তি বা জাতির পুনরুত্থানের মতো তুচ্ছ বিষয়গুলিকে কখনোই অহিংসা, ন্যায় ও মানবিকতার নীতির ওপরে স্থান দেওয়া যায় না। এইসব বিষয়ে স্বামীজীর মত অবশ্য আমি খুব ভাল করেই জানতাম; তাই পরে যখন শুনলাম তিনি আমেরিকায় মাংস খেতেন, তখন মোটেই অবাক হইনি। আর আমার ধারণা, এইসব খাদ্যাখাদ্য নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ ও কুৎসা রটানো হয়েছিল সেগুলিকে তিনি নীরবে উপেক্ষা করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় স্বামীজী দেওয়ান শঙ্কর সুব্বিয়ার-এর সঙ্গে দেখা করতে

গেলেন। আগে থেকেই বলাকওয়া ছিল। সেদিনও কেমন করে যেন আবার ঐ আমিষ আহারের প্রসঙ্গ ওঠে। এ ব্যাপারে আমার যা মত, দেওয়ানজীরও দেখলুম ঠিক সেই মত। উপরন্তু তিনি বললেন, পুরাকালে যাগযজ্ঞে কখনোই পশুবলি হতো না, পশুমাংসও ব্যবহৃত হতো না। এই নিয়ে সামান্য কিছু মতপার্থক্য দেখা দিলে দেওয়ানের জামাই এ. রামিয়ার (তিনি তখন ওঁর সচিবের কাজ করতেন) স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, প্রাচীন ভারতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে পশুমাংসের ব্যবহার ছিল। সেই সন্ধ্যায় দেওয়ানের সঙ্গে স্বামীজীর ভক্তি-প্রসঙ্গেও কিছু আলোচনা হয়েছিল। অবশ্য কেমন করে যে ঐ প্রসঙ্গ উঠেছিল আর স্বামীজীই বা ঐ বিষয়ে ঠিক কি কি বলেছিলেন তা আমি বেমালুম ভুলে গেছি।

দেওয়ানজী তাঁর সময়ের বিশিষ্ট বিদ্বান ও বিদগ্ধ মানুষদের অন্যতম ছিলেন এবং ঐ আটান্ন বছর বয়সেও তিনি নিত্য বিভিন্ন বিষয়ের কিছু না কিছু বই পড়তেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজী তাঁকে দেখে তেমন মুগ্ধ হননি। আবার দেওয়ানজীও স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য বেশি সময় দিতে পারেন নি। আমরা ওখান থেকে ফিরে আসার সময় দেওয়ানজী কথা দিলেন যে, স্বামীজীর যে কোনও ইচ্ছা বা প্রয়োজন মেটাতে তিনি চেষ্টার কসুর করবেন না এবং স্বামীজী ঐ রাজ্যের যেখানেই যান না কেন, তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সব বন্দোবস্ত করে দেওয়া হবে। স্বামীজীর অবশ্য কোনও কিছুর প্রয়োজন ছিল না; তাই তিনি কিছুই চান নি।

ইতঃপূর্বে এক দর্শনার্থীর উল্লেখ করেছি যিনি একদিন সকালে এসে কথাবার্তায় স্বামীজীকে উঠতে দেননি, ফলে রোজকার মতো সেদিন আর তাঁর বন্ধু মন্মথবাবুর কাছে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ভদ্রলোকের নাম পিরাবি পেরুমল পিল্লাই, ত্রিবান্দ্রম হুজুর অফিসের সহকারী দেওয়ান বা পেশকার। শ্রীযুক্ত পিল্লাই সেদিন সম্ভবত ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের প্রচলিত ধর্মমত ও ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান যাচাই করতে এসেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি অদ্বৈত বেদান্তের খুঁত বার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই পিল্লাইমশায় বুঝতে পারলেন স্বামীজী এমন এক আচার্য যাঁর বিদ্যাবুদ্ধি জরিপ করার কাজে বৃথা সময় নষ্ট না করে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করে নেওয়াই মঙ্গল এবং বুদ্ধিমানের কাজ। স্বামীজী ও পিল্লাই যখন কথা বলছিলেন তখন আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম স্বামীজীর মানুষ চেনার কী দুর্লভ ক্ষমতা! এই ক্ষমতার

পরিচয় আমি আরো একবার পেয়েছিলাম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। স্বামীজী তখন একটানা ন-দিন মাদ্রাজের 'ক্যাসল্ কার্নান'-এ ছিলেন। স্বামীজীর এই বিশেষত্ব দেখেছিলাম, তিনি মুহূর্তের মধ্যে আত্মম্ভরী দর্শনার্থীর জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় বুঝে নিতেন। তারপর তার পেটে যা সইবে সেইমতো এবং ততটুকুই তাকে প্রেরণা ও উপদেশ দিতেন। তাই পিল্লাইমশাই-এর বক্তব্য শেষ হলে স্বামীজী 'ললিত বিস্তর' থেকে বুদ্ধের বৈরাগ্যসূচক কয়েকটি শ্লোক এমন সুমধুর স্বরে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন যে সেই দৈবী সুরের ঝংকারে ভদ্রলোকের হৃদয় দ্রবীভূত হলো। যুদ্ধং-দেহি ভাব চলে গিয়ে তাঁর দু-চোখে তখন ভাবের ঘোর, তখন তিনি নীরব শ্রোতায় পরিণত! শ্রোতার মন প্রস্তুত বুঝে স্বামীজীও সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন, এক নাগাড়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বলে চললেন বুদ্ধের অকুণ্ঠ ত্যাগ, নিরলস সত্যানুসন্ধান, সাধনার শেষে বোধিলাভ এবং দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে অক্লান্তভাবে সেই জ্ঞান বিতরণের মর্মস্পর্শী ইতিহাস। যেমন প্রেরণাদায়ক, তেমনই বলিষ্ঠ তাঁর বলার ভঙ্গি; তিনি যেন শ্রোতার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য বুদ্ধের একটি ছবি এঁকেছিলেন। স্বামীজী যখন থামলেন, পিল্লাই তখন ভাবে বিহ্বল। বিদায় নেবার আগে স্বামীজীকে বারবার প্রণাম করে গদগদ স্বরে তিনি বললেন ঃ আপনি আমার মনটাকে আজ রাগ-দ্বেষ-হিংসা-অহংকার ক্লিষ্ট জগতের শত তুচ্ছতার বহু ঊর্ধ্বে তুলে দিয়েছেন, স্বামীজী। আপনার মতো মানুষ আমি কখনো দেখিনি। আর আজ যা শোনালেন, তাও আমি কখনো ভুলব না।

সেদিন তো বটেই, তার পরেও কয়েকদিন তাঁর মুখে নানান বিষয়ে আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ফলে ঐ সব বিষয়ে স্বামীজীর মতামতও বিশেষভাবে জানতে পেরেছি। সেসব বহু কথা আজ আমি ভুলে গেছি। কিন্তু তবুও দুটি বিষয় এই মুহূর্তে মোটামুটি পরিষ্কারভাবে আমার মনে আসছে। তার প্রথমটি হলো, একবার আমি তাঁকে প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ দেবার অনুরোধ করলে স্বামীজী সোজা বলে দিলেন, তিনি আগে কখনো কোনও জনসভায় ভাষণ দেন নি; অতএব তিনি লোক হাসাতে পারবেন না। সে কথা শুনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাই যদি হয়, তাহলে মহীশূরের মহারাজা যে আপনাকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন, সেখানে সেই বিশাল বিদগ্ধ জনমণ্ডলীর সামনে আপনি কিভাবে দাঁড়াবেন, স্বামীজী?

এর উত্তরে স্বামীজী যা বললেন তা শুনে তখন আমার মনে হয়েছিল, তিনি

যেন ইচ্ছা করেই আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, ঈশ্বর যদি তাঁকে (স্বামীজীকে) তাঁর বাণীবাহক তথা যন্ত্রহিসাবে ব্যবহার করে জগতে সত্য, পবিত্রতা ও ধর্মের আদর্শকে উজ্জীবিত করতে চান, তাহলে তিনি প্রয়োজনমতো শক্তি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবেন।

আমি বললাম ঃ বলেন কি! এই ধরনের কোনও দৈব হস্তক্ষেপ যে ঘটতে পারে, তা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।

আসলে হয়েছে কি, হিন্দুধর্মের মূল সত্যগুলির প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকলেও হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি তখনও আমার পড়া হয়ে ওঠেনি। ফলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও তার তাৎপর্য সম্বন্ধে যেমন আমার কোন জ্ঞান ছিল না, তেমনি ছিল না নিজস্ব কোন উপলব্ধিও। তাই দৈব হস্তক্ষেপের ব্যাপারে স্বামীজী যা বললেন তার অন্তর্নিহিত সত্যটি আমার পক্ষে ধারণা করা কঠিন ছিল। কিন্তু স্বামীজীর কথার তীব্র কশাঘাতে আমার সম্বিৎ ফিরলো। আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ মুখে তো সনাতন হিন্দুধর্মের কথা খুব বলেন, আচার-বিচারেও তো দেখছি খুবই নিষ্ঠা; কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনি একজন ঘোর নাস্তিক, সন্দেহবাদী। না হলে এই কথা কখনো মুখে আনতে পারতেন না যে, ভগবান এই করতে পারেন, আর এই করতে পারেন না। তার বিরাট জগৎ-ব্যাপার। কে তাঁর শক্তির ইতি করতে পারে!

আর একবারও আমার সঙ্গে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে স্বামীজীর কিছু মতভেদ হয়েছিল। স্বামীজীর মতে ব্রাহ্মণের গায়ের রং কালো হলে বুঝতে হবে সেখানে বর্ণসংকর ঘটেছে অর্থাৎ দ্রাবিড় রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে। স্বামীজীর বক্তব্য শুনে আমি বললাম—দেখুন, মানুষের গায়ের রং-এর কোনও স্থিরতা নেই। দেশের জলহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা—এসবের ওপরও গায়ের রং অনেকটা নির্ভর করে। যেমন, মনে করুন, যে দিনরাত বাইরে বাইরে ঘোরে, রোদে-জলে কাজ করে, তার চাইতে যে বাড়ির মধ্যেই বেশিটা সময় কাটায় তার গায়ের রং ফরসা হতে বাধ্য। স্বামীজী আমার মত উড়িয়ে দিয়ে বললেন, আরে রাখুন আপনার রোদ-জল; ব্রাহ্মণরাও আর পাঁচটা জাতের মতোই বর্ণসংকর। যাঁরা মনে করেন, ব্রাহ্মণদের রক্ত বিশুদ্ধ, তাঁরা ভ্রান্ত। তাঁদের ঐ বিশ্বাসের বাস্তব ভিত্তি নেই। আমি সি. এল. ব্রেস এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের মত তুলে ধরে স্বামীজীর অভিমত খণ্ডনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হলো না। স্বামীজী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

স্মৃতিকথা ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে, অতএব এবার আমাকে থামতে হয়। তবে শেষ করার আগে একটা কথা বলতেই হবে যে, স্বামীজী যে কদিন আমাদের কাছে ছিলেন, তার মধ্যেই তিনি আমাদের সকলের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই তিনি এমন সহজ, মধুর কোমল ও আন্তরিক ব্যবহার করতেন, তার আর কী বলবো! আমার ছেলেরা সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে ঘুরঘুর করতো। একজন তো এখনো কথায় কথায় বলে—স্বামীজীর দিব্যি! আমাদের বাড়িতে থাকাকালীন স্বামীজীর সব খুঁটিনাটি, তাঁর মনোহর ব্যক্তিত্বের নানা দিক, সবই সে সানন্দে স্মরণ করে। স্বামীজী বেশ কিছু তামিল শব্দ শিখেছিলেন। আমাদের বাড়ির রাঁধুনী-বামুনটির সঙ্গে তামিল ভাষায় কথা বলে তিনি খুব মজা পেতেন। এককথায় তিনি এমন সহজভাবে আমাদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন যে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম তিনি আমাদের অতিথি। তিনি যেদিন চলে গেলেন, মনে হলো গোটা বাড়িটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর স্বামীজী যখন তাঁর বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমাদের বাড়ি থেকে বেরঁতে যাবেন, ঠিক সেই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো যেটি না বললে স্মৃতিচারণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাইরে স্বামীজীর জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে, স্বামীজী এবং ভট্টাচার্যমশাই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছেন—ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ হাজির হলেন পণ্ডিত বজ্ঞীশ্বর শাস্ত্রী। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে কঠিনতম যেটি, সেই সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন শাস্ত্রীজী। বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্মভাবের জন্য সকলেই তাঁকে বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি ত্রিবাঙ্কুরের বড় রাজকুমারের কাছ থেকে বৃত্তিও পেতেন। আমারই অনুরোধে রাজকুমার শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছে আমার ছেলের সংস্কৃত পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। স্বামীজী এতদিন আমার বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, এর মধ্যে একটিবারও তিনি এদিকে আসতে পারলেন না—আর এখন, ঠিক তাঁর বিদায় নেবার মুহূর্তে, শাস্ত্রীজী আমাকে ধরে বসলেন, যেমন করে হোক, কয়েক মিনিটের জন্যেও অন্তত স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে।

শাস্ত্রী মশাই-এর কথায় জানা গেল, ইতঃপূর্বে তিনি শুনেছিলেন, উত্তর ভারতের এক মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী আমাদের বাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় এতদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন নি। স্বামীজীর সঙ্গে

একটু কথা বলার জন্য ব্যাকুল, শাস্ত্রীজী এই ব্যাপারে আমাকে একান্ত অনুরোধের সুরে বললেন, স্বামীজী যেন অনুগ্রহ করে মিনিট কয়েক পরে যাত্রা করেন। সব শুনে স্বামীজী রাজি হলেন এবং শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সাত-আট মিনিট সংস্কৃতে কথা বললেন। সে সময় আমি সংস্কৃত জানতাম না। তাই দুজনের মধ্যে কি কথা হলো তা কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে শাস্ত্রীজীর মুখে শুনেছিলাম, তিনি ব্যাকরণের এক অতি জটিল, দুরূহ বিষয় নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ঐ স্বল্পকালের আলোচনার মধ্যেই স্বামীজী সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের দ্ব্যর্থহীন পরিচয় দিয়েছিলেন।

আমাদের কাছে স্বামীজীর ন-দিন বাসের যে ইতিবৃত্ত, তা এইখানেই শেষ হলো। আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে সে যেন ছিল ন-দিনের নন্দিত এক অপার বিস্ময়, যার প্রভাব কোনদিনও মুছে যাবার নয়। স্বামীজীর আকাশচুম্বী ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনুপম কর্মময় জীবন যে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে এ কথা অবশ্যই বলা যায়; তার তাৎপর্য আজ পুরোপুরি বোঝা না গেলেও সুদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় তা মানুষের বোধগম্য হবে। কিন্তু যাঁরা ভাগ্যবান, যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখবার ও জানবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের কাছে স্বামীজী হলেন অধ্যাত্ম জগতের সেইসব বিরল জ্যোতিষ্কের একজন, যাঁদের শাশ্বত প্রভায় এই পুণ্যভূমি চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হে পাঠক, যা লিখলাম, যতটুকু লিখলাম—তা যে খুবই কম, তা জানি। এও জানি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হৃদয়নিধি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমার এই রচনা কতটুকুই বা নতুন কথা বলতে পেরেছে, নতুন কি-ই বা আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে তাঁর সম্পর্কে! তবু সব দৈন্য, সব সীমাবদ্ধতার কথা মেনেও বলবো, ব্যক্তিগত স্মৃতির এইসব টুকরো টুকরো কথার মালা গাঁথতে গিয়ে হৃদয় অপার আনন্দে ভরে গেছে। সে-ও কি আমার কম লাভ?

(দ্য লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ,
প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ড, পরিশিষ্ট ১)

কে. সুন্দররাম আয়ার

শ্রী এম. সি. আলাসিঙ্গা পেরুমলের কথা দিয়ে আমি আমার এই লেখা শুরু করছি। তিনি ছিলেন প্যাচেয়াপ্পা কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাইস্কুলটির প্রধান শিক্ষক। কন্যাকুমারী ও রামেশ্বরম দর্শনের পর ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে স্বামীজী যখন প্রথম মাদ্রাজে এলেন, তখন থেকেই সদা-উৎসাহী এক গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসেবে স্বামীজীর চরণে আলাসিঙ্গার আত্মসমর্পণ এবং জগতের সামনে স্বামীজীর বাণী প্রচারের প্রতিটি পর্যায়ের সঙ্গে প্রগাঢ় অনুরাগ ও আগ্রহের সাথে তাঁর নিজেকে যুক্ত করার ব্যাপারটি আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়েই রইলো। গুরুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভক্তি, অবিচল নিষ্ঠা ও সেবার ভাবের মধ্যে আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে এমন এক অমল সৌন্দর্যের জ্যোতি দেখেছিলাম, যার স্মৃতি বহু দুঃখের মুহূর্তেও আমায় আশা, আনন্দ আর সান্ত্বনা যুগিয়েছে। আমাদের অধঃপতিত হিন্দুসমাজে আজও যে এমন শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের জন্ম হতে পারে, যাঁর হৃদয় স্বামীজীর মতো ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভালাবাসায় পূর্ণ, এটি আমার কাছে বাস্তবিক এক আবিষ্কার! ভারত উপমহাদেশে, বিশেষত এই দক্ষিণ ভারতে, তাঁর মতো আমি আর একটিও দেখিনি। দক্ষিণ ভারতে বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলনের এবং স্বামীজী-নির্দেশিত সব রকমের কর্মযজ্ঞের তিনিই ছিলেন মুখ্য হোতা ও প্রাণস্বরূপ।

আলাসিঙ্গাকে আমরা ভালবেসে বলতাম 'আচিঙ্গা'। মাদ্রাজে স্বামীজীর সংবর্ধনা যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য 'আচিঙ্গা' কী কঠোর পরিশ্রমই না করেছিলেন! সবদিকেই ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি যাতে তাঁর প্রিয় স্বামীজীর অভ্যর্থনায় কোথাও এতটুকু খুঁত না থাকে। কাজে নেমে প্রথমেই আলাসিঙ্গা একটি অভ্যর্থনা সমিতি খাড়া করলেন এবং সমিতিতে বেছে বেছে এমন লোকজন নিলেন যাঁরা শুধু শোভা না হয়ে সত্যি সত্যিই তাঁর কাজে আসবেন। ডক্টর সুব্রহ্মণ্য আয়ারের নেতৃত্বে গঠিত এই সমিতিতে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার, পি. আর. সুন্দর আয়ার, সি. নানজুন্ডা রাও, ভি. সি. শেষাচারী, কর্নেল অল্‌কট্ এবং শিকাগোর ডক্টর ব্যারোজ (যিনি খ্রীস্টধর্মের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তখন ভারতে এসেছিলেন)। পাশ্চাত্যে স্বামীজী যেভাব প্রচার করেছেন সেই চিরস্মরণীয় কর্মকীর্তির একটা আভাস

সাধারণ মানুষকে দেওয়ার জন্য সমিতি দু-তিন ধরনের লিফলেট ছাপিয়ে শহরময় বিলি করেন; তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সাংবাদিকরা তাঁর সম্পর্কে যে অভিমত দিয়েছিলেন, সেইসব লেখা থেকে উদ্ধৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এছাড়া স৴মিতির উদ্যোগে এগমোর রেলস্টেশন থেকে ক্যাস্‌ল কার্নান পর্যন্ত রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেকগুলো বিজয়তোরণ তৈরি করা হয় এবং মাদ্রাজ শহরের চতুর্দিকে পোস্টারের মাধ্যমে স্বামীজীর আগমনবার্তা সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে গত কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজগুলি কলম্বো থেকে শুরু করে রামেশ্বরম, রামনাদ, শিবগঙ্গা, মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী ও কুম্ভকোণমে স্বামীজীকে যে বিপুল হার্দিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে, তার রিপোর্ট ছাপছিল এবং তার ফলেও স্বামীজী সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে একটা গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ে গ্রামের অখ্যাত ছোট ছোট রেলস্টেশনেও বহু লোক তাঁকে একনজর দেখার জন্য ভিড় করে আসত। স্বামীজী মাদ্রাজ শহরে আসছেন জেনে দূর মফস্বল থেকে দলে দলে লোক এই শহরে আসতে লাগলেন। তাঁদের একটাই উদ্দেশ্য, একটাই লক্ষ্য। সনাতন হিন্দুধর্মের এই নবীন ঋষি, যিনি তমসাচ্ছন্ন জগৎটাকে একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছেন, তাঁকে একবার দু-চোখভরে দেখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য যেসব যুবক শহরে এসেছিল, তারাও স্বামীজীর দর্শন পাওয়ার আশায়, তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার আগ্রহে এবং দেশবাসীর প্রতি তাঁর বাণী মনে গেঁথে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজেই থেকে গেল।

বস্তুত সব বর্ণ, সব সম্প্রদায়ের আবালবৃদ্ধবনিতাই মর্মে মর্মে এই সত্য উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, স্বামীজী তাঁর মাতৃভূমির প্রতি, অতীত ও বর্তমানের চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ, আচার্য ও গুরুকুলের প্রতি যে প্রাণঢালা সেবার অর্ঘটি সাজিয়ে দিয়েছেন, ইতঃপূর্বে এমনটি আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁরা এও বুঝতে পারলেন যে, স্বামীজী শুধুমাত্র একজন দৈবীপুরুষ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে ভারতের ধর্মীয় বার্তাবাহক মাত্র নন, তিনি একজন নির্ভেজাল দেশপ্রেমিকও বটে; তিনি স্বদেশ এবং দেশবাসীকেও সভ্য জগতের চোখে পরম শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন। তাই মাদ্রাজ শহরের ঘরে ঘরে অনিবার্যভাবে তখন একজনই আলোচনার বস্তু, একটাই আলোচনার বিষয়—স্বামীজী, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহান ত্যাগ ও কর্মব্রত এবং সর্বোপরি তাঁর রোমাঞ্চকর সাফল্য। প্রত্যেকেই তাই অধীর আগ্রহে, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁর পদধ্বনি

শোনার আশায় প্রহর গুনতে লাগলেন। ঠিক এই সময় মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকা তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করলে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা একেবারে তুঙ্গে উঠলো। বাস্তবিক, আমার এখনও মনে পড়ে, সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষ কয়েকটি লাইন তখন শহরের শিক্ষিত মানুষের মুখে মুখে ফিরত। তাতে বলা হয়েছিল—এমন কে আছেন যিনি এই বিশ্বমানবের বিশ্বজোড়া কর্মযজ্ঞে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, সেই কর্মকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে চাইবেন না?

স্বামীজী আসার ঠিক আগের দিন তাঁর একান্ত অনুরাগী দুই বিদেশী ভক্ত, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার, স্বামীজীর গুণমুগ্ধ বন্ধু সিংহলবাসী বৌদ্ধ মিঃ হ্যারিসনের সঙ্গে মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন। রেলস্টেশন থেকে তাঁদের ক্যাস্‌ল কার্নানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সম্মানার্থে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যান্যদের মধ্যে কর্নেল অল্‌কট্‌ও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অল্‌কট্‌ সাহেব আমাকে যা বলেছিলেন তা শুনে মনে হয়েছিল তিনি স্বামীজীর একজন অনুরাগী ও অকৃত্রিম বন্ধু। সে ধারণা আমার আরো দৃঢ় হয় 'থিয়সফিস্ট' (Theosophist) পড়ে। ঐ পত্রিকার একটি লেখায় একবার দেখেছিলাম, ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী প্রথমবার মাদ্রাজে এসে থিয়সফিস্টদের মূল কেন্দ্র অ্যাডয়ারে গিয়েছিলেন এবং তখন কর্নেল অল্‌কট্‌ ও তাঁর সহযোগীরা নাকি স্বামীজীকে খুব আদর-আপ্যায়ন করেন। কিন্তু পরের দিনই স্বামীজী এলে তাঁর মুখ থেকে যা শুনলাম এবং মাদ্রাজে তাঁর প্রথম ভাষণে তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি যেভাবে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন, তা দেখে-শুনে আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কিন্তু আপাতত ঐ প্রসঙ্গ থাক। যথাসময়ে, যথাস্থানে ঐ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।

বাড়ির এক কোণে শামিয়ানা ইত্যাদি টাঙিয়ে তখনকার মতো একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে স্বামীজী জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। আমরা সকলে সেই মঞ্চের ওপরেই আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছিলাম এমনকি মিসেস সেভিয়ারও। তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে তিনি বসে বসেই স্বামীজীর লণ্ডনে থাকার সময়কার কিছু কথা, বিশেষ করে মিঃ স্টার্ডির বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটি সভা বা সেখানে তাঁর দেওয়া একটি ভাষণের কথা বলতে শুরু করলেন।

অল্‌কট্ সাহেব মিসেস বেসান্তের দৃষ্টান্ত দিয়ে মিসেস সেভিয়ারকে বললেন ঃ আপনি চেয়ারে বসে বসেই স্বামীজীর সম্বন্ধে যা জানেন আমাদের সকলকে বলুন। আর আপনি কেমন করে স্বামীজীর শিষ্যা হলেন সে কথা জানতেও আমরা খুব উৎসুক।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সেভিয়ার বললেন, তিনি অ্যানি বেসান্ত নন; মিসেস বেসান্ত সুপণ্ডিত এবং সুবক্তা, যে কোন বিষয়ের ওপরই তিনি বলুন না কেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনবেন। কিন্তু তিনি অতি সাধারণ এক মহিলা! উপস্থিত সবাইকে কিছু বলে আনন্দ দেওয়ার মতো আকর্ষণীয় অথবা গুরুত্বপূর্ণ কথা তাঁর ভাণ্ডারে নেই। কর্নেল অল্‌কট্ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একেবারে চুপ করে গেলেন। ওদিকে নবাগত অতিথিদের সাথে অল্পবিস্তর পরিচিত হওয়ার পর থেকেই বাইরের আগন্তুকদের ভিড়ও ক্রমে কমতে লাগলো। একসময় সকলে সেই রাতের মতো যে যাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন।

রাত ফুরোতেই এলো বহু প্রতীক্ষিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রভাত—আজ স্বামীজী আসবেন। সকাল থেকে দলে দলে অসংখ্য মানুষ ছুটে চলেছেন রেলস্টেশনের দিকে। ক্যাস্‌ল কার্নান যাওয়ার পথের দুধারেও উদ্‌গ্রীব মানুষের জটলা। স্টেশনের ভিতরে যেমন, বাইরেও তেমনই, অজস্র লোক—যেন জনসমুদ্র। সকলেরই প্রাণের আশা, স্বামীজীকে একটিবার চোখের দেখা দেখবেন। গতকাল রাতে আমার প্রতিবেশী শ্রী আর.ভি. শ্রীনিবাস আয়ার আমাদের বাড়িতে এসে বলে গিয়েছেন, আমি যেন তাঁর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করেই এগমোর স্টেশনে যাই। শ্রী আয়ারকে আমি বেশ কয়েক বছর ধরেই চিনি। কারণ আমরা একই সঙ্গে কুম্ভকোনম কলেজে পড়াতাম। পরে তিনি রাজস্ব দপ্তরে বদলি হয়ে গেলেও আমাদের দুজনের প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হতো। শ্রীআয়ারের ইউরোপীয় দর্শন খুব ভাল করে পড়া ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় ব্যাপারে বা ধর্মজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানার কোনও আগ্রহ তাঁর ছিল না। তাই স্বামীজীর অভ্যর্থনায় তাঁর যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা জেনে যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনই মনে মনে খুব খুশিও হয়েছি। স্টেশনে যাওয়ার পথে তিনি বললেন ঃ সনাতন হিন্দু দর্শন ও ধর্মের আচার্য ও প্রবক্তা হিসাবে যে স্বামীজী অসামান্য গৌরব অর্জন করেছেন, তাঁকে দেখতে তিনিও উৎসুক।

ট্রেন লেট ছিল। প্রত্যেকেই অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন—ট্রেন কখন আসে। অবশেষে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, সকলকে আনন্দ-স্রোতে

ভাসিয়ে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালো। স্বামীজী ট্রেন থেকে নামলেন। সঙ্গে তাঁর দুই গুরুভাই ও এক শিষ্য। শিষ্যটি একদা উত্তর ভারতের কোনও এক রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন এবং তখনই স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হন। ওঁরা সব কলম্বোয় স্বামীজীকে আনতে গিয়েছিলেন; সঙ্গে নিয়েছিলেন কয়েকটি গেরুয়া—যাতে সেখানেই ইউরোপীয় পোশাক ছেড়ে স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসীর কাপড়জামা পরে নিতে পারেন। স্বামীজীর সঙ্গে মিঃ গুডউইন-ও ছিলেন। গুডউইন ছিলেন জাতিতে ইংরেজ। স্বামীজী আমেরিকায় যেসব বক্তৃতা দিতেন সেগুলি শর্টহ্যাণ্ডে (সাংকেতিক ভাষায়) লিখে রাখার জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি আর পারিশ্রমিক নিতে রাজি হলেন না; তখন থেকে তিনি কাজটিকে স্বামীজীর সেবা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে নিজেকে সারা জীবনের মতো স্বামীজীর পায়ে বিকিয়ে দিয়েছেন। গুডউইনকে দেখে আমরা তো অবাক! কে বলবে একজন ইংরেজ? পোশাক পরিচ্ছদ সব এদেশী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মতো!

ট্রেন থেকে নামার পর স্টেশনেই কয়েকজনের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। স্বামীজীর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে তিনি কিছুদিন ত্রিবান্দ্রমে আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। সেটা স্বামীজীর প্রথমবার মাদ্রাজে আসার আগের ঘটনা। তখন তাঁর সাথে কত ঘুরেছি, প্রাণখুলে কত কথাই না বলেছি! তাই স্টেশনে তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু স্টেশনে এমন প্রচণ্ড ভিড় যে দু-একজন অতি বিশিষ্ট দর্শনার্থী ছাড়া আর কারো পক্ষে স্বামীজীর দেখা পাওয়া ছিল নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। সে যাই হোক, সাহস অবলম্বন করে, কনুইয়ের গুঁতো দিতে দিতে আমি ঠিক ভিড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে একসময়ে স্বামীজীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁর গাড়িতে ওঠার ও শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার আগে, ঐ ক্ষণিক অবসরের মধ্যেই আমি তাঁর সঙ্গে দু-একটা কথা সেরে নিলাম। তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আমাকে চিনতে পারছেন কি না। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, একবার যাকে তিনি দেখেন, তার মুখ কখনোই ভোলেন না। ত্রিবান্দ্রমে আমাদের বাড়িতে তিনি যে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেকথাও বললেন। এই সময়ে ডঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ার স্বামীজীকে আমার নামটা বললেন। আমার পুরানো বন্ধু ও কুম্ভকোণম কলেজের অধ্যাপক এম. রঙ্গাচারিয়া কুম্ভকোণম থেকেই স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। এবার আমরা দুজনেই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে ক্যাস্‌ল কার্নান পর্যন্ত গেলাম। শোভাযাত্রা

কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম, সমুদ্রের কাছে রাস্তার ধারে বেশ কিছু ছাত্র অনুনয় বিনয় করছে—স্বামীজীর গাড়ি থেকে সব ঘোড়া খুলে দেওয়া হোক, তারা নিজেরাই অন্তত কিছুটা পথ স্বামীজীর গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে। আর শেষ পর্যন্ত করলোও তাই। এই যে ঘোড়ার বদলে ছেলেদের গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়া, আমাদের ভারতীয় রুচি ও ভাবধারায় এটি কেমন যেন বিশ্রী ও বিসদৃশ ঠেকে। ঐ দিনই পরে স্বামীজীর কাছে আমি ঐ প্রসঙ্গটি তুলতেই মনে হলো যেন তিনিও ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ করেন নি। স্বামীজী বললেনঃ ছেলেদেরও আমি আমার মনের ভাব জানিয়ে দিয়েছি।

কুম্ভকোণম থেকে আসার পথে চিঙ্গলেপুট রেলস্টেশনে 'মাদ্রাজ মেল' (Madras Mail) পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক স্বামীজীর সঙ্গ নিয়েছিলেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীর একান্ত সাক্ষাৎকার নেওয়া। তা, সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছিলেন এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তরের আকারে প্রকাশিত ঐ সাক্ষাৎকারের বিবরণটি খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল। লেখাটিতে একদিকে আমেরিকা সম্পর্কে স্বামীজীর অনেক মন্তব্য এবং ঐ দেশে তাঁর কাজকর্মের বিস্তৃত বিবরণ যেমন ছিল, তেমনই ছিল ভারতে তাঁর ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর সুনির্দিষ্ট আভাস। পরে শ্রীরঙ্গাচারিয়া আমাকে বলেন, প্রশ্নগুলি রিপোর্টারের বকলমে তিনি নিজেই করেছিলেন এবং স্বামীজী সহজভাবে সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত অথচ চোখাচোখা উত্তর দিয়েছিলেন। 'মাদ্রাজ মেল'-এর প্রতিনিধি শুধু শর্টহ্যাণ্ডে উত্তরগুলি লিখে নিয়ে তাঁর কাজ সেরেছিলেন।

অনেক দিনের কথা তো! আজ আমার এইটুকুই মনে আছে, স্বামীজী বলেছিলেন...আমেরিকায় পুরুষরা দিনরাত ব্যবসা আর টাকাকড়ির পিছনে ছোটে; তাই ওদেশে মেয়েরাই সমাজের সর্বেসর্বা। তারা শিক্ষাদীক্ষার সবরকম সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্রমাগতই সুসংস্কৃত করে তোলার চেষ্টা করে এবং আত্মবিকাশের প্রয়াসী হয়। তাঁর বক্তৃতায় এবং ক্লাসে মেয়েদেরই ভিড় হতো বেশি। স্বামীজী আশা করতেন, আমেরিকার চেয়ে ইংল্যাণ্ডেই তাঁর পরিশ্রম বেশি ফলপ্রসূ হবে। তিনি একটু রহস্য করে বলতেন, ইংরেজরা যদিও একটু 'মাথা মোটা' এবং সেই কারণে নতুন কোনও ভাব নিতে তাদের একটু সময় লাগে, কিন্তু একবার কোনও আদর্শের দ্বারা যদি তারা ঠিক ঠিক প্রভাবিত হয়, তবে তাকে রূপ দিতে গিয়ে কখনো তারা পিছু হটে না।

ক্যাস্‌ল কার্নানে পৌঁছেই স্বামীজী তাঁর কয়েকজন গুরুভাইয়ের সঙ্গে হাসি-

হৈচৈ, আনন্দ আর ঘরোয়া কথাবার্তায় একেবারে মেতে গেলেন। সত্যিই তো, কতদিন পর আজ এই প্রাণের আলাপ! ভাগ্যবান যাঁরা সে দিন ক্যাস্‌ল কার্নানের ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে এই গভীর ভালবাসা ও সহজ, সরল, আন্তরিক ব্যবহার দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামীজীরা খেতে বসলেন। খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীজী একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য দোতলার হলঘরে চলে গেলেন। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে অভিনন্দনের পর অভিনন্দন গ্রহণ করে, অজস্র সংবর্ধনার উত্তর দিয়ে এবং পরিস্থিতির চাপে প্রায় সর্বত্রই কিছু না কিছু অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ করে তিনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এই বিশ্রামটুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পাশ্চাত্যে দীর্ঘ তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমেই মূলত স্বামীজীর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেওয়া, বেদান্ত ও ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের বিভিন্ন দিক সেখানকার জিজ্ঞাসু জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা এবং নিজের শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করা—এসবই একই সঙ্গে করতে হয়েছে। তাঁর সহযোগীরা তাঁর এই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন হন; তাঁর শরীর যে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, সেটি তিনি নিজেও অনুভব করেছিলেন। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, দেশে ফেরার পর ঐ অপরিসীম ক্লান্ত অবসন্ন দেহেও তিনি কিভাবে সকলের সব দাবি মিটিয়ে, তাঁর মহান গুরুর আদর্শে ভারতের আধ্যাত্মিক উজ্জীবনের মহান ব্রতকে সফল করতে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; তিলে তিলে উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেকে।

'আচিঙ্গা' অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া আর আমাকে আগে থেকে বলে রেখেছিলেন, স্বামীজী এসে পৌঁছলে আমরা যেন তাঁর (স্বামীজীর) সঙ্গে বসে ঠিক করে নিই মাদ্রাজে তিনি কবে, কোথায় এবং কি কি বিষয়ের ওপর বলবেন। কারণ সাধারণ মানুষ তাঁর কথা শোনবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে আছে। আচিঙ্গা বলেছিলেন, মাদ্রাজে স্বামীজীর কর্মসূচী এমনভাবে তৈরি করা চাই যাতে সাধারণ মানুষের সেই পিপাসা মেটে এবং তাঁরা স্বামীজীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন ভারতবর্ষের সবকিছুই একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এখনো আশা আছে।

অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়ার পরের দিনই কুম্ভকোণম ফিরে যাওয়ার কথা। তাই

কথাবার্তা বলে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা আজকেই নিতে হবে। তাই আমরা ওপরে গেলাম। ততক্ষণে স্বামীজীর বিশ্রাম হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি তিনি একটা ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে আছেন। আমরা কাজের কথা পাড়তেই স্বামীজী বললেন, বক্তৃতার বিষয়গুলি যেন আমরা প্রথমে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করে নিই, তারপর তাঁকে জানিয়ে দিলেই চলবে। তারপর যা করার তিনি করবেন।

স্বামীজীর আদেশ মতো পরামর্শ করে আমরা স্থির করলাম, প্রথমে মাদ্রাজের জনসাধারণের তরফ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হবে এবং তার উত্তরে স্বামীজী যা বলবেন সেটিই হবে মাদ্রাজে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য ভাষণ। এছাড়া স্বামীজী পরপর আরো চারটি বক্তৃতা দেবেন। তাতে তিনি জগতের প্রতি ভারতের বাণী এবং জাতীয় জীবনে ভারতীয় ঋষিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সবিস্তারে বলবেন। তাছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় ও অধ্যাত্ম-জীবনের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস কিভাবে হতে পারে সে সম্পর্কেও তিনি দিগ্‌দর্শন করাবেন। আমরা স্বামীজীর আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি এইভাবে সাজিয়েছিলাম ঃ (১) আমার সমরনীতি, (২) ভারতের সাধক, (৩) দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত, এবং (৪) ভারতের ভবিষ্যৎ। এই চারটি বিষয় ছাড়াও আচিঙ্গার বিশেষ অনুরোধে ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে 'ভারতে আমার কর্মোদ্যোগের কয়েকটি দিক' সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, আমরা যেমন যেমন চেয়েছিলাম, সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি ঠিক সেইভাবেই হয়েছিল এবং পূর্বনির্ধারিত প্রত্যেকটি বিষয় স্বামীজী তাঁর নিজস্ব ভাব, ভাষা এবং ভঙ্গিতে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলাই তিনি ক্যাস্‌ল কার্নানে জিজ্ঞাসু দর্শনার্থীদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হয়েছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় কি তার পরের দিন দুপুরে ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব পরের দিনই, স্বামীজীর গলায় একটু গান শোনার ইচ্ছা হলো রঙ্গাচারিয়ার আর আমার; তাঁর গানের কথা আমরা এত শুনেছি! আমাদের মনের কথা খুলে বললাম তাঁকে। অনুরোধ করলাম 'অষ্টপদী' গাইতে। স্বামীজীর সেদিন বাইরে কোনও কাজ ছিল না। তাছাড়া একটু বিশ্রাম নেওয়ার ফলে তাঁকে খুব ঝরঝরে, শান্ত অথচ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। খুব খোশ মেজাজে ছিলেন তিনি। তাই বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং জয়দেবের একটি রাগাশ্রয়ী

গান ধরলেন। ঐ রাগ আমরা এই অঞ্চলে ইতঃপূর্বে কখনো শুনিনি। স্বামীজীর সে দিনের সেই গানের সুললিত, মনোমুগ্ধকর সুরের স্মৃতি কোনও দিন ভোলবার নয়। সেদিন তিনি তাঁর বহুমুখী অপার্থিব ব্যক্তিত্বের একটি সহজ, সাবলীল, আনন্দময় রূপ আমাদের সামনে মেলে ধরেছিলেন।

স্বামীজী প্রথম যেদিন ক্যাস্‌ল কার্নানে এসে উঠলেন, সেই দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত ঐ বাড়িতে অষ্টপ্রহর ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ দর্শনার্থীদের ভিড় লেগেই থাকতো। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই আসতেন। বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরচারিণী মহিলারাও সেখানে এমনভাবে আসতেন যে, দেখলে মনে হতো তাঁরা মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন। তাঁদের ভক্তিভাব চরমে উঠত যখন তাঁরা স্বামীজীর সামনে যাওয়ার অনুমতি পেতেন। স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁরা এমন ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন যেন তিনি আমাদের 'অবতার' বা 'আচার্যদের'-ই একজন, কৃপা করে তাঁর সন্তানদের দর্শন দিতে এসেছেন। ক্যাস্‌ল কার্নানের সামনে দিনভর, এমনকি সন্ধ্যা হওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কাতারে কাতারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন—এই মহাপুরুষ নির্ঘাৎ শৈব সন্ত সম্বন্ধস্বামীর অবতার। সাধারণ মানুষও সে কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। স্বামীজী হয়তো ক্যাস্‌ল কার্নানের ভিতর একটু পায়চারি করছেন—দূর থেকে তাঁকে এক পলক দেখা গেল। অথবা তিনি হয়তো কোনও সভায় বক্তৃতা দিতে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন—তাঁকে দেখা মাত্রই উৎসুক জনতা আভূমি প্রণত হতেন। সে এমনই এক বিরল দৃশ্য যা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। আমাদের কাছে এ দৃশ্য একেবারে নতুন। আমাদের এখানকার বড় বড় মঠের মোহন্তরাও তো কালেভদ্রে মন্দিরে অথবা তাঁদের প্রিয় শিষ্যদের বাড়িতে যান, দেখেছি। এমনকি তাঁরা যখন বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মঠের সামনের পথ দিয়ে 'বিশ্বযাত্রা' তথা শোভাযাত্রা করেও যান, তখনো কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিনি; দেখিনি পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় অনুলিপ্ত এমন স্বতঃস্ফূর্ত গণপূজা। এর থেকেই দেশ বা একটা জাতির আকাঙ্ক্ষার স্পন্দনটি ধরতে পারা যায়, বোঝা যায় কোন্ আদর্শের প্রতি তার হৃদয় সমর্পিত। মোদ্দা কথা এই, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা এবং অসার বাসনা ত্যাগ করলে তবেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। আর একবার সেই পরম আশ্রয় লাভ করলে এই ভৌতিক জগতে বার বার আসা এবং সহস্র রকমের দুঃখভোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, মেলে পরম মুক্তি।

মাদ্রাজে স্বামীজীর পদার্পণের তৃতীয় দিনটি ছিল একটু বিশেষ ধরনের চিহ্নিত, নিবিড় প্রত্যাশার-তবকে মোড়া এক ঐতিহাসিক দিন। কারণ ঐ দিন মাদ্রাজবাসীরা স্বামীজীকে ভিক্টোরিয়া হলে এক বিশাল সংবর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাদ্রাজের সব শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ, বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে সে দিন যে আগ্রহ ও উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল—তা কল্পনাতীত। চারটে নাগাদ স্বামীজী ক্যাস্‌ল কার্নান থেকে বেরলেন। তাঁর অনুরোধে অধ্যাপক রঙ্গাচারিয়া আর আমি দুজনেই তাঁর গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু গাড়ি চলবে কোথা দিয়ে? ভিক্টোরিয়া হল-এর সামনে তো কথাই নেই, যেসব রাস্তা আর অলিগলি দিয়ে ঐ হলে যাওয়া যায়, সে সবই লোকাকীর্ণ। সে যে কী দৃশ্য, তা বর্ণনা করা আমার সাধ্যে কুলোবে না। আর তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া সম্ভবও নয়।

ঐ ভিড়ের মধ্য দিয়ে ধীর গতিতে স্বামীজীর গাড়ি এগোতে লাগলো। আর আমি অপলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম স্বামীজীর চোখদুটি। নিজের সৌভাগ্যের কথা ভেবে এত আনন্দ হচ্ছিল, কি বলবো! তাঁকে দেখছি, আর এ পর্যন্ত তিনি যা-যা করেছেন সেইসব কৃতিত্বের কথা স্মরণ করছিলাম; সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা দিয়ে আঁকার চেষ্টা করছিলাম বৈদিক ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাব্য রূপরেখাটি। আমার তখন বিশেষভাবে মনে হচ্ছিল, প্রাচীন ঋষিদের প্রতিনিধি নবীন এই দেবদূতের পায়ে ভারতবর্ষ একবার যখন শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসভরে তার মাথা নুইয়েছে, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আর কোনও ভয় নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বামীজীর উপস্থিতিতে সেই মুহূর্তে সকলের অন্তর যে প্রত্যাশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল, আজ পঁচিশ বছর পর বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে কি বলা যাবে, সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে? যা ঘটা উচিত ছিল, আর যা ঘটছে—সেই দুয়ের মধ্যে কি যথেষ্ট ব্যবধান নেই? হয়তো আছে কিন্তু তবুও আমি নিশ্চিত, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ স্বামীজীর জ্বালাময়ী বাণী, তাঁর অগ্নিবীণার ঝংকার, যে কর্মধারা তিনি নিজের হাতে শুরু করে দিয়ে গেছেন, তা কালক্রমে আরো সংহত হয়ে আমাদের আত্মচেতনা এবং আত্মবিশ্বাসকে জাগাবেই জাগাবে এবং মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার যে অভ্রান্ত পথনির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন সেই দিব্যতার দিকে আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাবো। অগ্রগতির ধারা বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু তা অনিবার্য ও সুনিশ্চিত।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই হল-এর সামনে সমবেত বিপুল জনতা একযোগে চিৎকার করে উঠলো—"খোলা জায়গায় সভা হোক।" কিন্তু আগে

থেকেই ঠিক ছিল, হল-এর ভিতরেই স্বামীজীকে অভিনন্দন জানানো হবে (তাই আমরা সকলে হল-এ প্রবেশ করলাম)। হল একেবারে ঠাসা, তিলধারণেরও জায়গা নেই। হলে ঢুকতেই চোখে পড়লো স্যার ভি. ভাষ্যম আয়েঙ্গার মঞ্চে সভাপতির আসনে বসে স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করছেন। স্বামীজী গিয়ে তাঁর পাশে বসতেই সভার কাজ শুরু হলো। শ্রী এম. ও. পার্থসারথি আয়েঙ্গার মানপত্র পাঠ করলেন। সকলের দৃষ্টি তখন স্বামীজীর ওপর নিবদ্ধ। সকলেই তখন হৃদয়ের দুয়ার খুলে স্বামীজীর অমৃতনিস্যন্দী কণ্ঠস্বর আর গভীর সব উপলব্ধির কথা শুনবেন বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, সেইসব মর্মভেদী কথা যা পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল; সেইসব দেববাণী যা শুনে সেখানকার সব অবস্থার, সব স্তরের মানুষই নিরন্তর উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত হয়েছেন।

কিন্তু ওদিকে 'খোলা জায়গায় সভা' হোক এই দাবি নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান জনতার চিৎকার-চেঁচামেচি এমন চরমে উঠলো যে হলের ভিতরে সভার কাজ চলাই দায়। ছাত্র এবং যুবকদের যে বিশাল সমাবেশ বাইরে হয়েছিল তার সব দিক থেকেই ঐ দাবি উত্তাল হয়ে উঠলো। তরুণদের মনঃক্ষোভে বিচলিত স্বামীজীর পক্ষে তখন মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। তিনি ঘোষণা করলেন, যে অগণিত উৎসাহী যুবকেরা হল-এর বাইরে তাঁর কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, তাদের তিনি কখনোই নিরাশ করতে পারবেন না (এখনই তিনি বাইরে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করবেন)। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হল-এর সব লোক পিলপিল করে বাইরে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান উত্তাল জনসমুদ্রে দু-একটি ছোট্ট ঢেউ তুলে মিশে গেল। স্বামীজীও বাইরে এলেন এবং অভাবনীয় সেই প্রাপ্তির আনন্দে যুবকের দল উল্লাসে ফেটে পড়লো। তাদের তুমুল হর্ষধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। স্বামীজী সব দেখেশুনে বুঝতে পারলেন, এই হট্টগোলে তাঁর কণ্ঠস্বর সকলের কাছে পৌঁছবে না। কারণ তাঁর কণ্ঠস্বর যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, স্বরক্ষেপ যতই সুনিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোবদ্ধ হোক না কেন, গ্ল্যাডস্টোন, ব্রাইট বা ও-কনেল-এর মতো পঞ্চাশ হাজার লোকের সামনে গলা দিয়ে ঢাকের বাদ্যি বাজাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

অগত্যা, স্বামীজী একটি ঘোড়ার গাড়ির মাথায় উঠে সেখান থেকে, তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে 'গীতার ভঙ্গিতে' বক্তৃতা শুরু করলেন। গীতার

অনুষঙ্গ এনে স্বামীজী হয়তো এই ইঙ্গিতই দিতে চাইছিলেন যে, ধর্মের গ্লানিতে জগৎ যখন যোগভ্রষ্ট হয়েছিল তখন অধোগামী মানুষকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন রথারূঢ় হয়ে আবার যোগের কথা শুনিয়েছিলেন, তিনিও যেন ঠিক তেমনই আজ ঘোড়ার গাড়ি থেকে প্রেরণাময় বাণীর পাঞ্চজন্য বাজিয়ে জাতির নব অভ্যুদয়, নবযুগের সূচনা করতে চলেছেন। 'গীতার ভঙ্গি' কথাটি শ্রোতাদের খুবই মনঃপূত হয়েছিল।

স্বামীজী ভাষণ শুরু করতেই জনসাধারণ এমন বেসামাল হয়ে পড়লো, তাদের আবেগ আর উচ্ছ্বাস এমন প্রবল আকার ধারণ করলো যে, থেকে থেকেই তাদের চিৎকার চেঁচামেচির শব্দে স্বামীজীর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছিল। স্বামীজীও তাই তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে প্রকাশ করলেন। তবু তারই মধ্যে তিনি হিন্দুধর্মের মূল সত্যগুলি তুলে ধরলেন। বললেন—মানুষ যাতে দুর্জয় সংসার-সমুদ্র ও জীবন-রহস্য অতিক্রম করে শাশ্বত সত্য, আনন্দ ও অদ্বয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারে তার জন্য ভারতবর্ষ চিরকাল নির্ভীকতা, ত্যাগ ও প্রেমের বাণী শুনিয়ে এসেছে। স্বামীজী আর কিছু বলতে পারলেন না। উপস্থিত শ্রোতাদের ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন যে, তাঁদের উৎসাহে যেন ভাঁটা না পড়ে; দেশের জন্য তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞে এবং বিশাল এই জাতির পুনরুজ্জীবনের কাজে তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করেন।

মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল 'আমার সমরনীতি'। বক্তৃতার আগেই কথাপ্রসঙ্গে আমাকে এবং আরো কয়েকজনকে বলেছিলেন—আর নয়, এবার তিনি ঝেড়ে কাশবেন। আমেরিকায় ও অন্যত্র থিয়সফিক্যাল সোসাইটি তাঁর প্রতি যে আচরণ করেছে, সেসব কথা সর্বসমক্ষে তিনি ফাঁস করে দেবেন।

স্বামীজীকে তাঁর কয়েকজন বন্ধু বলে দিয়েছিলেন যে, কর্নেল অল্‌কট্‌ চতুর্দিকে গাবিয়ে বেড়াচ্ছেন—থিয়সফিক্যাল সোসাইটি নাকি আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচারের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে; সোসাইটি যদি আগে থেকে 'গুহ্যতত্ত্ব' বা 'সনাতন জ্ঞান' প্রচার করে জমি তৈরি করে না রাখতো, তাহলে স্বামীজী ওদেশে বেদান্ত ধর্ম ও দর্শনের সত্য এবং আদর্শের যেটুকু প্রচার করতে পেরেছেন, তার এক কণাও পারতেন না।

মাদ্রাজে এসে স্বামীজী তাঁর এক গুরুভাইয়ের মুখ থেকেও একটি অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনলেন। বৃত্তান্তটি একটি চিঠি নিয়ে। কলকাতায় তাঁর এক বৌদ্ধ বন্ধু

মাদ্রাজের এক প্রসিদ্ধ থিয়সফিস্টের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলন শুরু হওয়ার আগে স্বামীজী (যখন তিনি প্রায়-কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমেরিকায়, সেই সময়ে) মাদ্রাজী ভক্তদের কাছে একটি তার করে জানিয়েছিলেন। যাত্রা করার সময় যে-টাকা তাঁর কাছে ছিল এখন তা প্রায় নিঃশেষিত, হাতে আছে সামান্যই, দুই-একদিন পরে উপবাস ছাড়া উপায় থাকবে না; তাছাড়া আসন্ন শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার মতো গরম কাপড়েরও একান্ত অভাব তাঁর। এই নিদারুণ সঙ্কটের খবর পেয়ে মাদ্রাজের সেই থিয়সফিস্ট নেতাটি কলকাতার বহুপরিচিত বৌদ্ধ প্রচারককে লিখেছিলেন—'শয়তানটা এবার মরবে, ওদের হাড় জুড়োবে।' চিঠিটি এখন বেলুড় মঠে সংরক্ষিত।

স্বামীজী আমাদের জানালেন, আমেরিকায় যেখানেই তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেখানেই থিয়সফিস্টরা তাঁর বেদান্ত প্রচার পণ্ড করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষিত গণ্যমান্য বহু আমেরিকান থিয়সফিস্টদের ওপর হাড়ে-চটা ছিলেন। বিশেষত 'মহাত্মা' নিয়ে থিয়সফিস্টদের যত উৎকট, উদ্ভট, হাস্যকর কল্পনা ও গল্পবাজী—এসব তাঁরা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁদের ধারণা হলো, স্বামীজীও বোধ হয় বিশ্বাসপ্রবণ সহজ-সরল সাধারণ মানুষের মনে সাড়া তুলে থিয়সফিস্টদের মতো লোক-ঠকানো, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আজগুবি কোনও মত প্রচার করতেই আমেরিকায় এসেছেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রচার চালাতে লাগলেন যে, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত তাঁর নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তি, বুদ্ধি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেওয়া। এটিকে লক্ষ্য বলে গ্রহণ করলে সকলের উচিত বিবেকানন্দকেও একঘরে করা।

এই ধরনের অকারণ বিদ্বেষ, ভিত্তিহীন অপপ্রচার ও বাধাবিঘ্নের পাহাড় ঠেলে পথ করতে হয়েছিল স্বামীজীকে। এর ওপর ছিল খ্রীস্টান মিশনারিদের প্ররোচনা। তাঁরা চেষ্টা করেছেন আমেরিকার মানুষ যাতে স্বামীজীকে কোনও রকম স্বীকৃতি না দেয় এবং বেদ-বেদান্তের আদর্শ ও রীতিনীতি প্রচারে তাঁকে কোনওরকম সাহায্য না করে, উৎসাহ না দেয়। শিকাগো ধর্মমহাসভার অন্যতম প্রতিনিধি ব্রাহ্মনেতা (প্রতাপচন্দ্র) মজুমদার সম্পর্কে স্বামীজী বলেন, তিনিও খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই তিনি

মজুমদার মশাইকে চিনতেন এবং বিশেষ সম্মান করতেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকই মিশনারিদের সঙ্গে কোমর বেঁধে স্বামীজীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটিয়েছেন, স্বামীজীর বৈদিক ধর্ম প্রচারের প্রয়াসকে যতদূর পেরেছেন তাচ্ছিল্য করেছেন, বলে বেড়িয়েছেন—ওসব বেদ-ফেদ আজকাল ভারতে চলছে না; শিক্ষিত, বুদ্ধিমান লোকের তো বটেই, সাধারণ মানুষের মন থেকেও বৈদিক ধর্ম একেবারে মুছে গিয়েছে। এবং এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভারতে শেষমেশ একটা ধর্মই থাকবে, এবং তা হলো খ্রীস্টধর্ম।

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি খ্রীস্টান সাপ্তাহিকের দুটি সংখ্যা স্বামীজী আমাকে দেখিয়েছিলেন। অনেকদিন আগের কথা বলে পত্রিকার নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে সম্ভবত 'দি উইটনেস'-ই হবে। ঐ কাগজে মিশনারিরা ভারতে মজুমদারের প্রচারের কাজে সাহায্য করার জন্য একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার আবেদন ছেপেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, মজুমদারও ভারতে যিশুখ্রীস্টকে প্রচার করবেন এবং খ্রীস্টধর্মকে তার চূড়ান্ত জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কোনও ধর্মীয় নেতা বা নেতাদের এই ধরনের জঘন্য ব্যবসাদারী মনোভাবকে স্বামীজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও অনুরূপ আচরণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা যায় না। মাদ্রাজে প্রথম বক্তৃতায় স্বামীজী তাঁর এক 'দেশবাসীর' তথা 'ভারতের এক সংস্কারপন্থী দলের নেতার' ভূমিকার উল্লেখ করেছিলেন। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি মজুমদার ছাড়া আর কেউ নন।

স্বামীজীর কয়েকজন মাদ্রাজী বন্ধু ও অনুরাগী ভক্ত বক্তৃতার আগে স্বামীজীকে বলেছিলেন—স্বামীজী, বিদেশে, বিশেষ করে আমেরিকায় যাঁরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করেছেন, আপনার সব প্রচেষ্টাকে বানচাল করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন, তাঁদের কথা এই প্রকাশ্য সভায় না বলাই ভাল। বিশেষ করে, আপনি থিয়সফিক্যাল সোসাইটি বা তার প্রতিষ্ঠাতাকে আক্রমণ করে কিছু বলবেন না, কারণ সোসাইটির বেশ কিছু সদস্য সত্যি সত্যিই আপনাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করেন এবং বিদেশ থেকে ফিরেছেন বলে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে তাঁরা আজ দলে দলে মফস্বল থেকে এখানে এসে সমবেত হয়েছেন।

কিন্তু স্বামীজী আপন প্রতিজ্ঞায় অনড়। তিনি জ্বলন্ত ভাষায় বিদেশে যা যা

ঘটেছিল, কী যন্ত্রণা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, সবই দ্বিধাহীন চিত্তে বলে 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের' ধ্বজাধারীদের মুখোশ খুলে দিলেন। ...

মাদ্রাজ আসার চতুর্থ দিন (ষষ্ঠ) সন্ধ্যায়, অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার, স্বামীজী তাঁর পূর্বনির্ধারিত চারটি বক্তৃতার প্রথমটি দিয়েছিলেন। ঐদিন সকালে তিনি ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতেও একটি ভাষণ দেন। অবশ্য সকালের ঐ বক্তৃতা আমার শোনা হয়নি, তাই সে সম্বন্ধে কিছু বলতে পারব না। পরের দিন, অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি বুধবার, তিনি 'সোশ্যাল রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' দেখতে যান; সেখানেও আমি যেতে পারিনি। পরে অবশ্য আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম—ওখানে কি হলো? তাতে তিনি বললেন—ওখানে তেমন বিশেষ কিছুই বলেন নি। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী জাতিধর্মের পুনর্বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি বিষয়ে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও ঐ সংস্কারের ব্যাপারে সমিতির কর্মকর্তাদের একরোখা মনোভাবকে তিনি বড় একটা উৎসাহ দেন নি।

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি ৮ ফেব্রুয়ারির কয়েকটি ঘটনার কথা একটু বলে নিতে চাই। দিন তারিখগুলো সব আমার জানা আছে। যতদূর সম্ভব ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক পারম্পর্য রক্ষা করে বলে যাব। ঐ দিন দুপুরের দিকে অধ্যাপক লক্ষ্মী নারাসু, শ্রী এন. কে. রামস্বামী আয়ারকে সঙ্গে নিয়ে হঠাৎ ক্যাস্‌ল কার্নানে এলেন। নারাসু বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী হিসাবে অনেকেরই সুপরিচিত ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এবং উন্নত চরিত্রের মানুষ বলে তাঁকে আমিও বরাবরই খুব শ্রদ্ধা করতাম। তবে তাঁর সঙ্গীটিকে চিনতাম না। পরে জেনেছিলাম ভদ্রলোক 'The Awakener of India' নামক একটি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশক এবং নারাসু সেই কাগজের সম্পাদক ও মুখ্য (হয়তো বা একমাত্র) লেখক। কিছুটা অনিয়মিতভাবে কয়েকটা সংখ্যা বেরোবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'Awakener' প্রকাশিত হওয়ার কিছুকাল আগেই স্বামীজীর সহায়তায় বা তাঁর নির্দেশে মাদ্রাজ থেকে তাঁর অনুগামীরা 'The Awakened India' বা 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করতে থাকেন, পরে এটি আলমোড়ায় স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল এবং এখনো সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়। পাছে এই কাগজটির সঙ্গে তাঁর পত্রিকাটিকে লোকে গুলিয়ে ফেলে সেইজন্যই রামস্বামী তাঁর পত্রিকাটির নাম রেখেছিলেন 'Awakener'।

আয়ার এবং নারাসু দুজনেরই মনোভাব ছিল এই যে, আমেরিকায় স্বামীজী যে কাজ করে এসেছেন এবং তাঁরই নির্দেশে মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' মারফত যে প্রচারকার্য শুরু হয়েছে তা এখনো ফলপ্রসূ হয়নি। তমোগুণী ভারতের যুগযুগব্যাপী মোহনিদ্রার অবসান ঘটিয়ে তার মধ্যে নতুন কর্মোদ্যমের প্রেরণা সঞ্চার করতে পারেনি তারা। কিন্তু তাঁদের 'Awakener of India' স্বল্পায়ু হলেও মানুষের চেতনা জাগাতে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। থিয়সফি নিয়ে মাদাম ব্ল্যাভ্যাটস্কির ভাবনাচিন্তাকে ঐ পত্রিকাটি বিদ্রূপ করে বলতো 'ব্ল্যাভ্যাট্স্কোসফি'। তাঁর লেখা ও মতামতের তীব্র সমালোচনা করে আদ্যন্ত আক্রমণাত্মক যেসব লেখা ঐ পত্রিকায় ছাপা হতো তার কিছু কিছু এখনো আমার মনে আছে।

দোতলার পাশের একটি ঘরে ঢুকতেই দেখি শ্রী নারাসু, শ্রী আয়ার ও অন্যান্যরা বসে আছেন। আর আচার্যরা যেমন 'ব্যাখ্যাসনে' বসে শাস্ত্র পাঠ করেন, স্বামীজীও ঠিক সেই ভঙ্গিতে তাঁদের সামনে, একটু দেয়াল ঘেঁষে, কিন্তু ঠেসান দিয়ে নয়, বসে আছেন। লক্ষ্মী নারাসু শান্তভাবে চুপচাপ বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি খুবই আত্মসচেতন, বিশেষ করে তাঁর শক্তি সম্পর্কে। ঘরে ঢুকছি এমন সময় নারাসুর সঙ্গী ভদ্রলোকটিকে বলতে শুনলাম ঃ "স্বামীজী, আমরা আপনার সঙ্গে দর্শন ও ধর্মের কিছু সমস্যা নিয়ে একটু খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। বিশেষকরে আলোচনা করতে চাই বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে, যে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। এসব নিয়ে কথা বলার জন্য কখন আপনি আমাদের একটু সময় দিতে পারবেন?"

আমি ঘরে এসে বসার পর স্বামীজী আমাকে কাছে ডাকলেন। স্বভাবসুলভ হাসিতে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমাকে দেখিয়ে তিনি শ্রী আয়ারকে বললেন ঃ "ইনি আমার বন্ধু সুন্দররামন, সারা জীবন বেদান্ত চর্চা করে কাটিয়েছেন। ইনিই আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবেন। আপনার যা বলার আছে ওঁকেই বলুন।" স্বামীজীর মুখে এই কথা শুনে রামস্বামী আয়ার খুবই চটে গেলেন। ঠিক ঘৃণা না হলেও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়েই পরক্ষণে স্বামীজীর দিকে ফিরে তিনি বললেন ঃ "আমরা আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি, অন্য কারো সঙ্গে নয়।" স্বামীজী এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। ইতোমধ্যে ঘরে আরও অনেকে এসে পড়লেন এবং প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিল। কিন্তু স্বামীজী দেখলাম যেখানটিতে বসেছিলেন, ঠিক

সেখানেই স্থির হয়ে বসে রইলেন। আমি কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম, তাই পরে সেখানে কি ঘটেছিল তা বলতে পারব না।

ঐ দিনই বিকালে আমি আবার ক্যাস্‌ল কার্নানে গেলাম। দুপুরে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে স্বামীজী তখন দোতলার পিছনের ঘরে বসেছিলেন। স্বামীজীর মুখোমুখি হতেই দেখলাম তাঁর সেই মধুর, কমনীয়, শান্তরূপ। মনে হচ্ছিল, তাঁর মুখখানি অপাপবিদ্ধ শিশুর সারল্য আর দেবদূতের পবিত্রতায় মণ্ডিত। এই অবস্থায় যাঁরা একবার স্বামীজীকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন, তাঁরা স্বামীজীর ঐ রূপটির কথা, তাঁর আশ্চর্য আকর্ষণের কথা কখনো ভুলতে পারবেন না। স্বামীজী যখন ত্রিবান্দ্রমে ছিলেন তখনই তাঁর এই রূপটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

একটু আগে স্বামীজীর দুপুরের ঘুমের কথা বলেছি। এই ঘুমের পর তার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা যেত, এখন সে বিষয়ে কিছু বলবো। তখন তিনি যেন একেবারেই বদলে যেতেন। সর্বদাই তাঁর কাছে লোকজন আসতেন, তিনি তাঁদের কথা শুনতেন, নিজেও বলতেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলতে চলতে হঠাৎ এক সময় দেখা যেত, স্বামীজীর চোখদুটি একেবার স্থির হয়ে গেছে। চোখদুটি খোলা অথচ নিস্পন্দ! দেখে মনে হতো, তাঁর মন যেন অন্য কোনও জগতে চলে গিয়েছে, তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না, চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারেও তিনি এতটুকু সচেতন নন। আবার যখন তাঁর মন পার্থিব স্তরে নেমে আসত, তখনও দেখে মনে হতো, কিছুক্ষণ আগেও চারপাশের এই জগৎ সম্পর্কে তাঁর বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না। এতক্ষণ যে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন সে কথাও বলা যাবে না, আবার জেগে ছিলেন সে কথাও বলা চলে না। ক্যাস্‌লে থাকতে একদিন ঐ রকম অদ্ভুত অবস্থার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা, স্বামীজী, এটা আপনার কি হয়? স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমি অতশত বুঝিনে বাপু।' আমি ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে আর পীড়াপীড়ি করিনি। আমি জানি না এই অবস্থাটি তাঁর চতুর্দিকের কর্মব্যস্ত ও কোলাহলের একঘেয়ে জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মস্থ হয়ে থাকার ব্যাপার কি না। অনেকে অবশ্য ভাবতে পারেন স্বামীজীর ঐ ঘোর-ঘোর ভাবের অবস্থাটি আর বিশেষ কিছুই নয়, ঘুমের আগে স্বাভাবিক ঢুলুনি মাত্র। কিন্তু আমার কাছে এইসব ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। তার কারণ আমি স্বামীজীকে ঐ অনির্বচনীয় অবস্থার মধ্যে ডুবে যেতে এবং তার থেকে ব্যুত্থিত হতে বহুবার দেখেছি। মনে পড়ে তাঁর সেই নিশ্চল, স্থাণুবৎ, নিমগ্ন হয়ে বসার ভঙ্গিটি।

কতক্ষণ তিনি ঐ একভাবে বসে আছেন! দৃষ্টি স্থির, চোখের পাতা এতটুকু কাঁপছে না। আহা, সে কী দৃশ্য! সবকিছু দেখেশুনে আমার এই প্রত্যয় হয়েছে, ঐ সব মুহূর্তে স্বামীজী একটা দেহাতীত অবস্থার মধ্যে চলে যেতেন, যে অবস্থার ইঙ্গিত 'বাসিষ্ঠ মহারামায়ণ'-এর একটি কাহিনীতে পাওয়া যায়।

সেই দিনই বিকেল চারটে নাগাদ সালেম জেলার তিরুপ্পাত্তুর [বর্তমানে উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত] থেকে শৈবদের পাঁচ-ছয়জনের এক প্রতিনিধি দল স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। যতদূর মনে পড়ে, স্বামীজী আগের ঘরটিতেই বসেছিলেন। ভক্তদের ভিতর কোনও ব্রাহ্মণ-প্রতিনিধি ছিলেন না। অবশ্য তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না, কারণ প্রথম থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, অন্তত আমার তো তাই মনে হয় যে, ঐ অঞ্চলের তৎকালীন জেলা মুনসেফ, শ্রীনল্লাস্বামী পিল্লাই তাঁদের শিখিয়ে পড়িয়ে স্বামীজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীপিল্লাইকে আমি বেশ ভালভাবেই চিনতাম। আমাদের দুজনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও ছিল। সেই বছরই শেষের দিকে তিনি আবার 'সিদ্ধান্তদীপিকা'-র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হয়েছিলেন। পত্রিকাটি অবশ্য বছর কয়েক হলো বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া 'শৈব-সিদ্ধান্ত-মহাসভা' নামে একটা ধর্ম আন্দোলনও তিনি শুরু করেছিলেন যার প্রভাবে এখানে ওখানে বেশ কিছু শৈবসভা গড়ে ওঠে। মহাসভা ও স্থানীয় শৈবসভাগুলি আজও যথারীতি তাদের বার্ষিক সম্মেলন ও উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে।

নল্লাস্বামী শৈব মত ও সিদ্ধান্তের গোঁড়া সমর্থক হলেও ঐ মত শুধু ভারতবর্ষই নয়, গোটা পৃথিবীর মানুষই যাতে গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য তিনি সিদ্ধান্তের নীতি ও শিক্ষাগুলিকে আরও উদার, আরও সহজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার মনে হয়েছে, এখনও মনে হয়, দেশে-বিদেশে স্বামীজীর কাজকর্ম ও তাঁর অভাবনীয় সাফল্য নল্লাস্বামীকে খুব উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছিল। তিনি চাইতেন শৈবধর্মের চিরাচরিত ধারাটি অব্যাহত থাকুক এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ঐ ভাবের প্রসার হোক।

স্বামীজী অদ্বৈতবাদী ছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই তিরুপ্পাত্তুরের প্রতিনিধিদলটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে তাঁরা ঐ পুরুষসিংহকে তাঁর স্বভূমিতেই পরাস্ত করতে পারেন এবং অদ্বৈতবাদের কয়েকটি মৌল প্রশ্ন তুলে তাঁকে যারপরনাই নাজেহাল করতে পারেন। প্রতিনিধিদলটির যিনি নেতা তাঁর হাতে ছিল বহু প্রশ্ন-সংবলিত একটি কাগজ। তিনি স্বামীজীকে বললেন—

আপনাকে আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। স্বামীজী মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে তাঁর সম্মতি জানালেন এবং দলনেতাকে প্রশ্ন করতে বললেন।

ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন ছিল ঃ 'অব্যক্ত কিভাবে ব্যক্ত হন?'

প্রশ্ন শোনামাত্রই স্বামীজী নির্দ্বিধায় ঝটিতি উত্তর দিলেন। উত্তর তো নয়, আকাশ থেকে যেন বাজ পড়লো! আর নিমেষেই তার্কিকরা কুপোকাত! তাঁদের বিচারবুদ্ধি, স্নায়ু সব যেন কেমন অবশ হয়ে গেল।

মনে পড়ছে, ঠিক এই রকমই একটা প্রশ্ন একদিন ক্যাস্‌ল কার্নানের এক প্রশ্নোত্তর সভায় একজন মধ্যপন্থী ব্রাহ্মণ যুবক স্বামীজীকে করেছিলেন। মনে হয়, যুবকটি তখন কলেজে পড়তেন। এখন অবশ্য তিনি মাদ্রাজ পৌরসভার একজন সক্রিয় সদস্য। সে যাই হোক, তাঁকেও স্বামীজী প্রায় একই ভাষায় একই উত্তর দিয়ে অভিভূত করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ " 'কেমন করে', 'কেন' অথবা 'কি কারণে'—এসব প্রশ্ন ব্যক্ত জগৎ সম্বন্ধে খাটে; কিন্তু যে সত্তা অবিকারী ও কার্য-কারণ সম্পর্কের বহু ঊর্ধ্বে, যে ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল জগৎ এবং জন্ম-মৃত্যুর ছকে বাঁধা আমাদের সাংসারিক জীবনের কোনও নিয়মই খাটে না, সেই অব্যক্তের বেলায় এসব প্রশ্ন অবান্তর। এ প্রশ্ন প্রশ্নই নয়। ঠিক ঠিক প্রশ্ন করুন, যুক্তিসহ প্রশ্ন করুন, আমি আলবৎ উত্তর দেব।"

স্বামীজীর এই শাণিত উত্তর শুনে শৈব সিদ্ধান্তবাদীদের মুখে আর কোন কথা নেই। তাঁরা একচোটেই বুঝে নিলেন এমন একজনের কাছে তাঁরা এসেছেন যিনি যে কোনও জটিল দার্শনিক প্রশ্ন সহজেই সমাধান করে দিতে পারেন। তাঁরা এও অনুভব করলেন, এমন এক মহান আচার্যের কাছে এসে তাঁর সঙ্গে অর্থহীন কূট তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার চেয়ে বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কাছে নতজানু হওয়াই উচিত। এইসব ভাব ক্রমাগত মনে উঠতে থাকায় অনেক মাথা খাটিয়ে যেসব প্রশ্ন তাঁরা তৈরি করে লিখে এনেছিলেন, সেসব হঠাৎ যেন তাঁরা ভুলেই গেলেন। জাদুকরের লাঠি তখন ভেলকি শুরু করে দিয়েছে। ফলে এই কিছুক্ষণ আগেও যাঁরা স্বামীজীকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাই এখন বোধ করলেন বুঝি কোন অলৌকিক, অসাধারণ শক্তিবলে স্বামীজী তাঁদের হৃদয়মন জয় করে নিয়েছেন।

ওঁদের হাবভাব দেখে স্বামীজী নিমেষের মধ্যে বুঝে ফেললেন পরিস্থিতি কোনদিকে মোড় নিয়েছে। তারপর যা ঘটলো তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভব। তিনি যেন খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগলেন। এবং

কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে অন্য মানুষ! কোথায় গেল তর্কসিদ্ধ বেদান্তকেশরীর আকাশফাটানো গর্জন, তাঁর বজ্রগম্ভীর আবেগদীপ্ত কণ্ঠস্বর? কোথায় বা গেল তাতারী চোয়ালে ধরা তাঁর 'যুযুধান প্রকৃতি'-র ছবিটি? সবকিছুর রূপান্তর ঘটে গেল হঠাৎ। তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও বাল্যবন্ধু বা দীর্ঘদিন অদর্শনের পর ঘরে ফিরে-আসা ভাইয়ের সঙ্গে মধুর আলাপ করছেন—সেই বন্ধু বা ভাইয়ের কল্যাণই তাঁর একান্ত কাম্য। এমন ভালবাসা দিয়ে, এত নরম করে তিনি প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করছিলেন যে শৈব সিদ্ধান্তীদের তো বটেই, অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হলো। ঐ সময় তিনি মোটামুটি এই কথাগুলিই বলেছিলেন ঃ দুঃস্থকে সেবা করা, ক্ষুধার্তকে পেটভরে খাওয়ানো, দুঃখীকে সান্ত্বনা দেওয়া, পতিত ও নির্বান্ধব মানুষকে সাহায্য করা এবং পীড়িত ও দুর্বলের শুশ্রূষা করাই ঈশ্বরকে পাবার ও তাঁর সেবা করার শ্রেষ্ঠ উপায়।

স্বদেশের দুঃখী, অসহায় মানুষগুলিকে সেবা করার জন্য স্বামীজী এমন কাতর অনুনয় করছিলেন যে তিরুপ্পাত্তুরের শৈব ভক্তেরা তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। বহু প্রতীক্ষার পর আজ যেন তাঁরা এমন একজন মানুষকে কাছে পেয়েছেন যিনি দেবলোক থেকে তাঁদের জন্য শুধু আনন্দ আর শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন, এমন একজনকে যাঁর মধ্যে কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, যিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কথা বলতে জানেন, এমন এক যুগশ্রেষ্ঠ আচার্যকে যিনি তাঁদের অন্তরটি তন্ন তন্ন করে দেখে নিয়ে সেখানে যে শূন্যতা রয়েছে সেটি ভরিয়ে দেওয়ার জন্য, তাঁদের দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন জীবনের চরম ও পরম সত্যের রত্নপেটিকা। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এলে তাঁরা স্বামীজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। লক্ষ্য করে দেখলাম, নতুন জ্ঞানের আলোয় তাঁদের মুখচোখ জ্বলজ্বল করছে; জীবনের নতুন পথনির্দেশ খুঁজে পেয়ে আজ তাঁরা যেন ধন্য, কৃতকৃতার্থ।

এবার আমরা মাদ্রাজে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রসঙ্গে আসি। যেদিন বক্তৃতা হওয়ার কথা সেই দিনই সকালে ডঃ সুব্রহ্মণ্য আয়ারের বিশেষ আমন্ত্রণে আমি তাঁর লুজ চার্চ রোডের বাড়িতে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করলাম। ওপর তলায় একটি ঘরে স্বামীজী তখন বসেছিলেন। তিনি আমাদের খুলেই বললেন যে ধর্মসংস্কার ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের একটা বিশাল পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আছে। এমনভাবে সেই পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে যাতে দেশ অধ্যাত্মভাবে ভেসে

যায় এবং দেখতে হবে যে নতুন ভাবটি যেন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান এবং আর সব মত ও পথের মানুষকে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর একই পতাকাতলে টেনে এনে সমন্বিত করে, একই জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যে পৌছতে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে। স্বামীজী বললেন, অবশ্য ধর্মকে একটা সার্বভৌম ও সর্বজনীন ভাব-ভূমির ওপর দাঁড় করাতে পারলে তবেই এটি সম্ভব। সেদিন স্বামীজী সম্পূর্ণ নতুন রীতির একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও আমাদের বলেছিলেন। তিনি বললেন ঃ মন্দিরের সামনে একটা বড় হলঘর চাই। সেখানে সব ধর্মের শ্রেষ্ঠ ঋষি ও অবতারদের প্রতিমূর্তি থাকবে, আর ঠিক তার পিছনে খোলা আকাশের তলায় একটি স্তম্ভ থাকবে। তার গায়ে শুধু 'ওঁ' খোদাই করা থাকবে। ধর্মসংস্কার ও মন্দিরের পরিকল্পনা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনও আলোচনা সেদিন সেখানে হয়নি। তবে এখানে গৃহস্বামীর অতিথি-আপ্যায়নের চেষ্টার কথা একটু না বললে অন্যায় হবে। তিনি স্বামীজীর জন্য প্রচুর লাড্ডু, অন্যান্য মিষ্টি এবং রকমারি মশলাদার খাবার তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। স্বামীজী কিন্তু সেসব নামেমাত্র খেলেন। বলা বাহুল্য, ডঃ আয়ার কফির ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী সৌজন্যবশত কফির পেয়ালাটি দু-একবার ঠোঁটে ঠেকালেন। স্বামীজী বোধহয় কস্মিনকালেও ভোজনপটু ছিলেন না, অন্তত আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। তিনি যখন আমার কাছে ত্রিবান্দ্রমে ছিলেন, তখনও দেখেছি, দিনে একবার সামান্য কিছু মুখে দিতেন আর রাত্রে অল্প একটু দুধ। খাওয়া বলতে ঐ পর্যন্ত।

ক্যাস্‌ল কার্নানে স্বামীজী ফিরে এলে দিনের বেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটতে দেখিনি। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও অবিরাম দর্শনার্থীর ভিড় লেগেই ছিল। তাঁদের মধ্যে অভিজাত বংশের মহিলারাও স্বামীজীর পাদবন্দনা করার জন্য ও তাঁর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য অবিরত আসা-যাওয়া করছিলেন। সেদিনের দর্শনার্থীদের মধ্যে কোয়েম্বাটোরের এক যুবকও ছিলেন। তিনি লংম্যানস থেকে প্রকাশিত রাজযোগের ওপর স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি পড়ে বই-এর নির্দেশ অনুযায়ী কিছু কিছু যোগাভ্যাস করতেন। স্বামীজীর কাছে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি জানালেন যে, যোগাভ্যাসের সময় তাঁর মনে হয় শরীরটা যেন ক্রমশই হালকা হয়ে যাচ্ছে। তিনি স্বামীজীকে আরও বললেন যে, তাঁর বন্ধুবান্ধব, বিশেষ করে পণ্ডিতেরা, তাঁকে গুরুর নির্দেশ ছাড়া যোগাভ্যাস করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নিজে নিজে যোগসাধন করার অনেক বিপদ। ভুলক্রটি হলে সাধকের বিশেষ ক্ষতি হয়। এমনকি মাথা পর্যন্ত বিগড়ে যেতে পারে।

স্বামীজী চুপ করে সব শুনলেন। তারপর বললেন ঃ ও সব কথায় কান দিও না। যেমন করছ তেমনি করে যাও। মনে রেখো, সমাধির স্তরে তোমাকে উঠতেই হবে। এক একটা স্তর অতিক্রম করবে আর দেখবে তোমার সাধনপথের সব বিঘ্ন কেমন কেটে যাচ্ছে। এই সাধনে কোথাও কোনও বিপদের ভয় নেই। আর যদি কখনো কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আমি তো আছিই।

স্বামীজীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ছেলেটি বাড়ি ফিরে গেল। তার আর কিছু বলার বা জানার ছিল না। পাশ্চাত্যে এবং ভারতে স্বামীজীর বেদান্ত প্রচার নিয়ে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায়নি।

সন্ধ্যাবেলায় ভিক্টোরিয়া হল-এ স্বামীজী তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দিলেন। বিষয় ঃ 'ভারতের সাধক'। হল একেবারে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। ঐ দিনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বক্তৃতা মঞ্চে 'মাদ্রাজ মেল'-এর সম্পাদক মিঃ এইচ. বোশাম্পের উপস্থিতি। (এখন তিনি প্রয়াত) ঘটনাটিকে উল্লেখযোগ্য বলার হেতু এই যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনও ইউরোপীয়ান সাহেব মাদ্রাজে স্বামীজীর কোনও সভায় আসেন নি। আবার তিনি যদিও এলেন, কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতার মাঝখানেই উঠে চলে গেলেন। এটা হয়তো একটা নিছক কাকতালীয় ব্যাপার, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম, স্বামীজী যখন গোপী-গীতার বিখ্যাত একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছিলেন, ঠিক তখনই মিঃ বোশাম্প মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন। শ্লোকটির ভাবার্থ এই ঃ কৃষ্ণের অনন্ত রসসুধামণ্ডিত একটি চুম্বন পেলেই জীবের সব দুঃখের অবসান হয় এবং তাঁর প্রতি টান প্রতিনিয়ত বেড়েই চলে। যাই হোক, আমার বিশ্বাস, শ্লোকে আপত্তিকর এমন কিছুই ছিল না যাতে ব্রিটিশদের সৌজন্যবোধে আঘাত লাগতে পারে। সম্পাদক মশাই-এর উঠে যাওয়ার হয়তো অন্য কোনও কারণ ছিল।

১২ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার, আমি দুবার স্বামীজীকে দর্শন করি। একবার সকালে আর একবার দুপুরে। সকাল থেকেই ক্যাস্‌ল কার্নানে শামিয়ানার তলায় লোকের ভিড় উপচে পড়ছিল। স্বামীজী এসে যখন মঞ্চের ওপর তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসলেন, তখন লোকে উৎসাহ উদ্দীপনায় যেন একেবারে ফেটে পড়লো। আমেরিকায় থাকতে তিনি কিভাবে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কিভাবে জুতসই জবাবগুলি তাঁর শ্রীমুখ থেকে বিদ্যুতের মতো চকিতে ঝলসে উঠতো এবং শ্রোতারা তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, জীবন ও জগতের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁর গভীর অনুভবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কতখানি স্তম্ভিত হতেন, সেসব তথ্য

কাগজপত্রে আমরা অনেক পেয়েছি। আমরা এও পড়েছি, যাঁরা বেকায়দায় ফেলার মতলব নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন, স্বামীজীর হাতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা কী নাকালটাই না হতেন। যুক্তি, বিচার এবং জ্ঞানের তলোয়ার সন্ন্যাসীর হাতে কী নৈপুণ্যের সঙ্গে ঘোরে, যথার্থ জিজ্ঞাসুর প্রতি তাঁর কি কোমল, সহৃদয় আচরণ—সেসবই আজ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ উপস্থিত! তাঁর সামনে তাঁর গুণমুগ্ধ বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলী। দেখা গেল তাঁর সম্বন্ধে আমরা যা শুনে এসেছি তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

ভাবতে খারাপ লাগে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আর শোনা কথাগুলির অধিকাংশই আমি ভুলে গেছি। কিন্তু একটা ছবি এখনো মনে পড়ে। প্রশ্নোত্তরের সেই আসরে একজন অল্পবয়সী ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন। মহিলাটির ব্যবহার অতি চমৎকার। চেহারাটিও বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। থেকে থেকেই বেদান্ত বিষয়ে তিনি নানা প্রশ্ন করছিলেন। যেমন, আত্মোপলব্ধি বলতে কি বোঝায়? মায়া কি এক এবং অখণ্ড সেই সত্তার সঙ্গে এই বিশ্বের কি সম্পর্ক? ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, স্বামীজীও অকৃপণ ধারায় তাঁর জ্ঞানরাশি ঢেলে দিচ্ছিলেন। উপস্থিত সকলেই, বিশেষ করে ঐ বিদেশিনী, স্বামীজীর উত্তরে খুবই পরিতৃপ্ত হন। তাঁরা সকলেই যেন সেদিন এক নতুন জ্ঞানের আলোয় উদ্বুদ্ধ হলেন। বিদায় নেওয়ার আগে ঐ ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন যে তিনি খুব শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন এবং ওখানে গিয়ে আবার বস্তিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করবেন। এও বললেন ঃ আমার খুব ইচ্ছে, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু জানি না, সে সৌভাগ্য আমার হবে কি না। তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখা হবেই। এখন কটা দিন এখানে একটু বিশ্রাম নেব। তারপর রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেব। সে কাজটা চুকে গেলেই, আমার আবার লণ্ডনে ফিরে যাবার ইচ্ছে।

বিদেশিনীকে যাতে সকলে একটু যাওয়ার পথ ছেড়ে দেয়, সেইজন্য স্বামীজী নিজেও উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। মহিলাটি তাঁকে অভিবাদন করে যতক্ষণ পর্যন্ত না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন ততক্ষণ স্বামীজী একভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পরে শুনলাম, ঐ ভদ্রমহিলা বিকালে আবার এসেছিলেন। এবার তাঁর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রমহিলার বাবা মাদ্রাজে খ্রীস্টান মিশনারিদের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে একটু নিভৃতে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, তাই মেয়ের সঙ্গে এসেছেন। যদি কোনমতে একটু দেখা হয়। তা, স্বামীজী তাঁর আশা পূর্ণ

করেছিলেন। সেদিন তিনি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেছিলেন। তাঁরা চলে গেলে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, স্বামীজী এই অমানুষিক পরিশ্রম করার শক্তি আপনি কোথা থেকে পান? এর উত্তরে স্বামীজী যা বললেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—অন্তত তাঁদের কাছে, যাঁরা ভাবগ্রাহী। তিনি বললেন ঃ "এ দেশ এমনই যে এখানে ভগবানের কাজ করে কেউ কখনো ক্লান্ত হয় না।"

মধ্যপন্থী ছাত্রটি এবং তার প্রশ্নের কথা আগেই বলেছি। তিরুপ্পাত্তুরের শৈব প্রতিনিধিরা স্বামীজীকে বোকা বানাবার জন্য প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিলেন, ছাত্রটিও অবিকল সেই একই প্রশ্ন তুললেন। আমার বিশ্বাস, সেদিনের সেই তরুণ প্রশ্নকর্তাটি আজ জনস্বার্থ-সচেতন সুনাগরিকে পরিণত; বর্তমানে তিনি মাদ্রাজ পৌরসভার এক সক্রিয় জনপ্রতিনিধি। যদি কোনও দিন এই লেখাটি তাঁর চোখে পড়ে, আশাকরি তিনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। স্বামীজী সেদিন তাঁকে কি বলেছিলেন তা যতখানি পেরেছি স্বামীজীর মুখের ভাষাতে ইতোমধ্যেই লিপিবদ্ধ করেছি। স্বামীজীর উত্তর শুনে ছেলেটি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। অবশ্য এ রকম অভিজ্ঞতা, তাঁকে যাঁরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতেন, তাঁদের কোনও না কোনও সময়ে নিশ্চয় হয়েছে—আমার তো হয়েছেই।

ছেলেটি বেদান্তের একটি মূল প্রশ্নই তুলেছিল। বেদান্তে সম্ভবত একটু অন্যভাবে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু স্বামীজী নতুন আলোকে, তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতেই প্রশ্নটির মীমাংসা করে দিলেন—যদিও শ্রীশঙ্করাচার্যের ভাষ্যে অনুরূপ মীমাংসার ইঙ্গিত আছে। স্বামীজীর উত্তরের কথা আগেই বলেছি, তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ করলাম না। ছেলেটি স্বামীজীর উত্তর শুনে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে থাকার পর বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো ঃ "এ্যাঁ, কি বললেন, স্যার?' স্বামীজীকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করায় জনতার মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন ওঠে। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, ঘটনাটি ঐখানে ঐভাবেই শেষ হয়।

এরপর আর একটা মজার ঘটনা ঘটে। জনৈক বৈষ্ণব পণ্ডিত সংস্কৃতে স্বামীজীকে বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু কূট প্রশ্ন করেন। আমি তখন সংস্কৃতে অজ্ঞ। তাই প্রশ্নটি যে কি তা বুঝতে পারিনি। এবং সেই হেতু ঐ বিষয়ে এখন আমি কিছুই বলতে পারবো না। তবে এটা কিন্তু দেখলাম, স্বামীজী ধৈর্য ধরে পণ্ডিতের সব কথা শুনলেন এবং শেষমেশ শ্রোতাদের ইংরেজিতে বললেন, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন নানারকম মতবাদের শুকনো কচকচি ও টীকা-টিপ্পনী নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করার মতো বাজে সময় তার হাতে নেই। স্বামীজীর এই কথা

শুনে পণ্ডিত বললেন—আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে আপনি দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী।

স্বামীজী ফের ইংরেজিতেই জবাব দিলেন এবং তাঁর সে সময়কার কণ্ঠস্বর আজও আমার কানে গমগম করে বাজছে। তিনি বললেন ঃ "পণ্ডিতজীকে আপনারা বলে দিন, যতক্ষণ আমার এই দেহ আছে, ততক্ষণ আমি দ্বৈতবাদী, কিন্তু তার পরে নয়। অর্থহীন কোন্দল মানুষের জীবন বিষময় করে তোলে, তার মনকে বিভ্রান্ত করে, অবসন্ন করে—এমনকি তাকে সংশয়ী ও নাস্তিক পর্যন্ত করে তোলে। সর্বনাশা বিবাদ আর সংশয়ের মূল উপড়ে ফেলবো বলেই এই দেহ-ধারণ।"

স্বামীজী থামলে পণ্ডিতমশাই তামিল ভাষায় বললেন ঃ "তাহলে স্বামীজীর কথায় এটাই প্রমাণিত হলো, তিনি অদ্বৈতবাদী।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন ঃ "বেশ ভাল কথা, তা-ই না হয় হলো।" ঘটনাটির ওখানেই ইতি।

স্বামীজীর এই সভা সম্পর্কে এবার আর একটি ঘটনার কথা বলবো যার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমি যুক্ত ছিলাম। ইতঃপূর্বে আমি বোর্ড অফ রেভিনিউ-এর সচিব আর. ভি. শ্রীনিবাস আয়ারের কথা বলেছি। স্বামীজীর মাদ্রাজ আসার দিন যাঁর সঙ্গে আমি এগমোর রেলস্টেশনে গিয়েছিলাম। একদিন আমরা দুজনে স্বামীজীর প্রসঙ্গেই কথা বলছি—বিশেষ করে পাশ্চাত্য এবং আমেরিকা থেকে ফিরে ভারতে তাঁর ধর্মপ্রচারের কথা। আলোচনার মধ্যে শ্রী আয়ার এক সময় বললেন ঃ পূর্বজন্মের স্মৃতি যখন কারোরই থাকে না, তখন গত জন্মের আর এই জন্মের অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আর তাই যদি হয়, তাহলে মুক্তি ও তার উপায় সম্বন্ধে বেদান্তের উপদেশ নিয়ে আমাদের কি লাভ? কর্মফল অনুযায়ী পুনর্জন্ম হয়—একথা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ এ জীবনটা খেয়ে-পরে, আনন্দ করে কিভাবে কাটানো যায়, সেইটুকু শেখা বা শেখার চেষ্টা করাই তো যথেষ্ট। দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার ছাত্রদের কাছে চিন্তার বিষয় হিসাবে বেদান্তের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এর কোনও মূল্য নেই। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন, তাঁর হয়ে আমি যেন স্বামীজীকে দু-একটি প্রশ্ন করে উত্তরগুলো জেনে নিই। তাঁর প্রশ্ন আর স্বামীজীর উত্তর এখানে দেওয়া হলো।

প্রথম প্রশ্ন ঃ আমাদের যখন আগের আগের জন্মের কথা কিছুই মনে নেই,

তখন আমরা খামকা কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদ মানবোই বা কেন? আর দৈনন্দিন জীবনে ওসবের কি মূল্য, তাৎপর্যই বা কি? ঐ দুটি তত্ত্ব কিভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করে আত্মোপলব্ধির পথে নিয়ে গিয়ে মুক্তি এনে দিতে পারে?

উত্তর ঃ আমাদের এই জীবনেই যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তার সবকিছুই কি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের মনে থাকে? থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আমরা একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করে এমনভাবে চলি যেন তারা আমাদের জীবন ও ভাগ্য প্রভাবিত করছে। তা-ই যদি হয়, তবে অতীত ও বর্তমান জীবনের ঘটনাবলীর যোগসূত্রটি স্বীকার করে নিয়ে কেনই বা আমরা বেদ ও গুরুর নির্দেশমতো চলে দুঃখসর্বস্ব সংসারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করবো না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ এই জীবনের সর্ব অবস্থায়, সকল সময়েই আমাদের একটা আমিত্ব বোধ থাকে (যা আমাকে আর পাঁচজন, আর পাঁচটা জিনিসের থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শেখায়)। কিন্তু যখন বর্তমান জীবনের প্রেক্ষাপটে পূর্বজন্মের কথা ভাবতে চেষ্টা করি, তখন সেখানে তো আমার 'আমি' বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে খুঁজে পাই না। এর কি ব্যাখ্যা?

উত্তর ঃ আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করা সম্ভব, তবে তার জন্য আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট সাধনক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না।

স্বামীজীর উত্তরগুলি শুনে আমি বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। কারণ পাশ্চাত্যে দেওয়া স্বামীজীর বক্তৃতা ও লেখা এবং ভারতে লেখা তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমার যে ধারণা হয়েছিল তার ভিত্তিতেই এর আগে আমি একদিন শ্রীনিবাস আয়ারকে মোটামুটি এই কথাগুলি বলেছিলাম। যা হোক, স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর কয়েকজন আমাকে বললেন স্বামীজী নাকি আমার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি কৌশলে এড়িয়ে গেছেন! আমি তাঁদের বললাম— আমি কিন্তু আশানুরূপ উত্তরই পেয়েছি। বেদান্ত হচ্ছে হাতেনাতে করে দেখার ধর্ম; কেবলমাত্র তত্ত্বের কচকচি নয়।

পরে শ্রীনিবাস আয়ারের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে সব কথা জানালাম। তিনি বললেন ঃ খুব একটা সঙ্গত প্রশ্নই করেছিলাম। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীজী কোনও উত্তরই দিলেন না। যে সত্য যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে পারলাম

না, তা বুঝতে গেলে আমাদের জীবনের ধারাটি একেবারে পাল্টে ফেলতে হবে—একি একটা কথা হলো? যাই হোক, কর্মে পরিণত বেদান্তের প্রবক্তাই ব্যাপারটি ভাল বোঝেন; আমরা এইভাবে ক্ষান্ত হলাম।

দুপুর একটা নাগাদ ওপরের বড় হলঘরটিতে আমি আবার স্বামীজীর দর্শন পেলাম। অন্যদিনের মতোই দর্শনার্থীরা আসছিলেন, যাচ্ছিলেন। বলার মতো তেমন কোনও ঘটনা তখনও ঘটেনি। অবশেষে মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল কে. পি. শঙ্কর মেনন এলেন। উনি পরে ত্রিবান্দ্রম হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। মনে হলো শ্রী মেনন স্বামীজীকে আগে থেকেই চিনতেন। উনি এসে স্বামীজীর সঙ্গে একই সোফায় বসলেন। আমিও ওঁদের সামনে একটি চেয়ারে বসে ওঁদের কথা শুনতে লাগলাম।

মালাবারের লোকদের উৎকট শুচিবাই নিয়ে স্বামীজী প্রথমে কিছু বললেন। বললেন—এমনকি রাস্তাঘাটে চলার সময়েও তথাকথিত অস্পৃশ্যদের দেখে, ওদের ঐ "সরে যাও, সরে যাও" হাঁকডাক এত জঘন্য লাগে যে বলার নয়। এরপর স্বামীজী হঠাৎ মালাবারের জাতিভেদ ও বিবাহপ্রথার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, নায়াররা অনায়াসেই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে পারে, কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে, বা বলা যায় বহু যুগ ধরেই নাম্বুদরি ব্রাহ্মণেরা নায়ার পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। মনুস্মৃতি অনুযায়ী পরপর সাত পুরুষ ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই অব্রাহ্মণরাও জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারে। সেদিক থেকে বলা যায়, নায়াররা মনুর শর্ত পূরণ করেছেন। মালাবারের গোটা সমাজব্যবস্থা ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মাঝে মধ্যে ছেদ পড়লে মোটের ওপর ওদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক সম্বন্ধ সাতগুণ সাতপুরুষব্যাপী।

স্বামীজীর কথায় শঙ্কর মেনন এতদূর উৎসাহিত হলেন যে দেখে মনে হলো, ঐ প্রস্তাবটি যাতে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হবেন। ঠিক সেই সময় সি. শঙ্করণ নায়ারের প্রবেশ। শ্রী (এখন স্যার) নায়ার তখনই মাদ্রাজের উকিল ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বিখ্যাত। স্বামীজীর কাছে আসতেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সোফায় বসানো হলো; শ্রী মেনন সোফা ছেড়ে আমার মতোই একটি চেয়ারে বসলেন। শ্রীনায়ার স্বামীজীকে বললেন—আপনি যখন লণ্ডনে ছিলেন তখন একদিন আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি নেই শুনে ফিরে আসি।

স্বামীজী এর উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই শ্রীমেনন, শ্রীনায়ারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ "স্বামীজী বলছেন আমরা নায়াররা অতি অবশ্যই নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে পারি। কারণ মনুস্মৃতিতে বিধান আছে যে ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষ ব্রাহ্মণকুলে জন্মালে শূদ্রও ব্রাহ্মণের মর্যাদা পেতে পারে।"

শঙ্করণ নায়ার মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটি বুঝে নিলেও তখন ঐ রকম একটা অস্বস্তিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা স্পষ্টতই তাঁর ছিল না। হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, আমি একজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ, ঠিক আমারই সামনে এই মুহূর্তে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা শোভন হবে না। তিনি এও ভেবে থাকতে পারেন যে, ঐ রকম বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলে, তার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে; আর তাই যদি হয়, লোকে সেটা অনেকদিন মনে রাখবে। আবার ঐ সব তর্কবিতর্ক ভবিষ্যতে ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়—এই প্রবন্ধে যেমন কিছু কথা লিপিবদ্ধ হলো। তাছাড়া তাঁর মতো ধীর, স্থির ও বিচক্ষণ মানুষের পক্ষে এটি ভাবা কিছুই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয় যে মালাবারের গোঁড়া হিন্দু সমাজকে নিজেদের মধ্যে কয়েক মিনিট আলোচনা করেই একেবারে পালটে দেওয়া যাবে না। সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-বিপ্লবের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান সময়সাপেক্ষ এবং তার জন্য চাই ভিন্ন পরিবেশ ও দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা। এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে একটা কর্মসূচী নিলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। (শঙ্করণ নায়ার তাই ঐ প্রসঙ্গে আদৌ কোনও মতামত দিলেন না) অল্প কিছুক্ষণ থেকে তিনি শঙ্কর মেননের সঙ্গে বিদায় নিলেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৩ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, স্বামীজী প্যাচেয়াপ্পা হল-এ 'ভারতীয় জীবনে বেদান্ত'—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। এত লোক যে পিঁপড়ে গলার জায়গা ছিল না। ঐ দিন আমি মঞ্চের ওপর বসেছিলাম। আমার পাশে ছিলেন শ্রী জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, যিনি পরে 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। বক্তৃতার এক জায়গায় সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বললেন ঃ "অষ্টপ্রহর শুধু 'গীতা' 'গীতা' বলে চেঁচালেই চলবে না। যাদের শরীর জীর্ণ, পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করতে করতেই যাদের শক্তি, সাহস, সামর্থ্য সব অকালেই ঝরে যাচ্ছে, তারা না পারবে গীতার উপদেশ ঠিকমতো বুঝতে, না পারবে গীতার শিক্ষাকে জীবনে রূপ দিতে। যাও, মাঠে গিয়ে ফুটবল খেল, পেশি গড়ে তোল, শক্তিমান হও—তারপর গীতা পড়লে ঠিক ঠিক তার অর্থ বুঝতে পারবে।"

সুব্রহ্মণ্য আয়ার এই সুযোগ ছাড়লেন না। স্বামীজী তখনও মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। কিন্তু সবকিছু ভুলেই গভীর আবেগের সঙ্গে তামিলে বলে উঠলেন ঃ "ঠিক এই একই কথা আমি কতবার বলেছি, কিন্তু কেউ আমার কথায় কর্ণপাতও করেনি। এখন স্বামীজী সেই একই কথা বলছেন আর সেই কথা শুনে আপনারা আনন্দে ফেটে পড়ছেন!"

এক সময় শ্রী জি. সুব্রহ্মণ্য আয়ার অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ও 'সদাচারের' যাবতীয় নিয়ম তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। কিন্তু তাঁর এক মেয়ে বাল্যবিধবা হলে তিনি এমন প্রচণ্ড আঘাত পান যে তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পালটে যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন; তাঁর সমাজচেতনার মধ্যে এলো এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তিনি উপলব্ধি করলেন, হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির সঙ্গে দুঃখযন্ত্রণা আর দম্ভ যেন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; এসবই মানুষ যুগ যুগ ধরে সহ্য করে এসেছে, অদম্য শক্তি নিয়ে, শান্ত হৃদয়ে এখনো করছে; করছে এই বিশ্বাসে যে, 'শ্রুতি' আর 'স্মৃতি' এই যে দুঃখকষ্টের বোঝা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় তার উদ্দেশ্য পরিণামে তাকে অপার আধ্যাত্মিক আনন্দের অধিকারী করে, সংসার বন্ধন থেকে চিরমুক্ত করে দেওয়া। স্বামীজী তাই যখন তাঁর এবারের বক্তৃতায় সকলকে 'শক্তিমান' ও 'অভীঃ' হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছিলেন, বলছিলেন যে ঐ দুটি বস্তু ছাড়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব, তখন সুব্রহ্মণ্য আয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলেন।

স্বামীজীর কথায় স্বভাবতই শ্রোতারাও উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজী বললেন ঃ "হে মানব, বিশ্বাস কর, তুমি দেহ নও, মনও নও। স্বরূপত তুমি আত্মা। শক্তি অর্জনের জন্য প্রথমেই চাই এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এলেই ক্রমশ তুমি উপনিষদের তত্ত্বগুলি উপলব্ধি ও ধারণা করতে পারবে।"

স্বামীজী তাঁর এই বক্তৃতায় জাতিভেদ প্রথার বাস্তব ভিত্তি ও মূল্য নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ বলেন। তিনি বললেন ঃ জাতিভেদ প্রথা হলো জীবন সমস্যা সমাধানের একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। তিনি আরও বললেন যে, ভারতবর্ষেই যে শুধু জাতিভেদ প্রথা চালু আছে তা নয়, পৃথিবীর যেসব দেশ তিনি দেখেছেন, সর্বত্রই এর অস্তিত্ব আছে। স্বামীজীর এই শেষের কথাগুলি শুনে সুব্রহ্মণ্য আয়ারের উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাস কিছুটা মিইয়ে যায়।

স্বামীজীর চতুর্থ এবং শেষ বক্তৃতা হলো ১৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার। বিষয় ঃ

'ভারতের ভবিষ্যৎ'। সেদিনের মতো জনসমাগম এবং উৎসাহী শ্রোতা আর কোনও দিন দেখিনি। আর স্বামীজী সেদিন বললেনও বটে! আমার মনে হয় ঐটিই বোধহয় তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। ভাষণ দিতে দিতে স্বামীজী সেদিন পিঞ্জরমুক্ত সিংহের মতো মঞ্চটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং তাঁর মেঘমন্দ্র কণ্ঠনাদ চতুর্দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে একটি ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। সেদিন তিনি একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন যা আমি কখনো ভুলব না। আর ঐ কথাটি গভীরভাবে অনুধ্যান করলে বোঝা যায় তিনি কতখানি দূরদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। স্বামীজী বললেন ঃ শান্তি, ধর্ম, ভাষা, সরকার—সব নিয়েই একটা জাতি গড়ে ওঠে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি হলো ভিত, যার ওপর জাতির সমস্ত কাঠামোটা দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্মই হলো ভারতীয় জীবনের মূল সুর। ধর্মের ভিত্তিতেই ভারতের জাতীয় জীবন ঠিক ঠিক গড়ে উঠতে পারে।

পরদিন সোমবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি। স্বামীজী জাহাজে কলকাতা রওনা হলেন। তাঁর বহু অনুরাগী, ভক্ত এবং বন্ধুবান্ধব জাহাজঘাটায় তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক তাঁকে একবার পুনা যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং তিনিও প্রথমে ভেবেছিলেন সেখানে যাবেন। কিন্তু তাঁর দেহ-মন তখন একটু বিশ্রাম চাইছিল। আর তিনি হিমালয়ের কোলে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকতেন।

জাহাজঘাটায় যাওয়ার পথে সমুদ্রতটে আর্য-বৈশ্য সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী (তাঁরা স্থানীয় মানুষের কাছে 'কোমট্টিস' নামেই পরিচিত) স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পুণ্য মাতৃভূমির সেবার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে একটি মানপত্র দেন।[১] স্বামীজীও বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের দেওয়া সম্মান গ্রহণ করে, তাঁদের সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিলেন।

এরপর স্বামীজী জাহাজে উঠলেন, তাঁর পিছু পিছু অনেক ভক্ত ও অনুগামীও; শেষ পর্যন্ত তাঁরা রইলেন তাঁর সঙ্গে। এঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ঈশ্বরপ্রেরিত এই মহাপুরুষকে বিদায় দিতে হবে—এটি ভাবতে, আমরা যাঁরা তাকে ছায়ার মতো ঘিরেছিলাম, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিদারুণ কষ্ট হচ্ছিল।

আমি স্বামীজীকে বললাম ঃ আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে, যদি কৃপা করে আমাকে এক মিনিট সময় দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন।

---

১ রাজামাহ্রীর শ্রী সুব্বা রাও ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে মানপত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বামীজীর হাতে তুলে দেন।

দু-এক পা এগিয়ে আমরা একটু ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালাম। তারপর আমি স্বামীজীকে বললাম ঃ স্বামীজী আমার দুটি প্রশ্ন আছে। স্বামীজী বললেন ঃ বলে ফেলুন।

আমার প্রথম প্রশ্ন ঃ "স্বামীজী, আমেরিকা ও জড়বাদী পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে আপনি যে বাণী প্রচার করে এসেছেন, আপনার কি মনে হয়, তাতে কোনও স্থায়ী ফল হয়েছে, অথবা তাদের বিশেষ কোনও মঙ্গল হয়েছে?" স্বামীজীর উত্তর ঃ "তেমন কিছু নয়। তবে এদিকে সেদিকে যে বীজ আমি ছড়িয়ে এসেছি, কালে তা বিকশিত হয়ে অন্তত কিছু লোকেরও মঙ্গল করবে।"

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ "আপনাকে আমরা আবার কবে কাছে পাব? আবার আপনি কবে দক্ষিণ ভারতে আসবেন?" স্বামীজীর উত্তর ঃ "নিশ্চিত থাকুন, আমি আবার আসব। এখন ফিরে গিয়ে হিমালয়ে কয়েকটি দিন চুপচাপ বিশ্রাম। আর ঠিক তারপরই হিমবাহের মতো প্রচণ্ড বেগে ফেটে পড়ব গোটা দেশটার মাথার ওপর।"

কিন্তু দেখা গেল, তা হওয়ার নয়। তাই স্বামীজীর দর্শন আর পেলাম না। আমি শেষবারের মতো দেখেছিলাম তাঁর অতলস্পর্শ অসাধারণ দুটি চোখ, দেখেছিলাম তাঁর মুখমণ্ডলের দিব্য দ্যুতি, শেষবারের মতো দেখেছিলাম সেই মানুষটিকে—যাঁকে আমি জগতের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ আচার্য, প্রকৃত মহাপুরুষ, ভারতবাসী তথা সমগ্র মানবজাতির কাছে ঈশ্বরপ্রেরিত আলোকদূত বলে গণ্য করি। জয়, বিবেকানন্দের জয়!

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)

কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী

স্বামী বিবেকানন্দকে আমি প্রথম দর্শন করি ত্রিবান্দ্রমে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে। সেটি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তাঁর শিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেওয়ার আগের কথা। সেই সময় তাঁর সান্নিধ্যে বেশ কিছুদিন থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার। শিকাগো থেকে ফেরার পথে স্বামীজী কলম্বোয় নামেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি; সেখান থেকে কয়েকদিন বাদে মাদ্রাজে। এই মাদ্রাজেও তাঁর সঙ্গ করার সৌভাগ্য হয় আমার। স্মরণীয় ও পবিত্র সেই সান্নিধ্য আমার গোটা জীবনটাকেই পালটে দিয়েছিল। এখানে সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণ করাই আমার উদ্দেশ্য। ...

কোচিন থেকে স্বামীজী এসেছিলেন ত্রিবান্দ্রমে। আমি ও আমার বাবা অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারও তখন সেখানে। কোচিন থেকে আসার সময় বাবাকে দেওয়ার জন্য একটি পরিচয়পত্র স্বামীজী সঙ্গে করে এনেছিলেন। বাবা তখন ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমার মার্তণ্ড বর্মার গৃহশিক্ষক। ত্রিবাঙ্কুরের রাজার অনুরোধে মাদ্রাজ সরকারই বাবাকে ঐ কাজে বহাল করেন। ওদিকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমিও ত্রিবান্দ্রমে মহারাজার কলেজে ইণ্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছি। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই স্বামীজীর পবিত্র সান্নিধ্য-লাভের সৌভাগ্য হলো আমার।

স্বামীজীর খ্যাতি তখনো ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু তখনই হিন্দুধর্ম এবং আধ্যাত্মিক ভাব জগতে প্রচার করার এক সুতীব্র ইচ্ছা তাঁর মধ্যে জেগেছে। একদিন সকালে বাড়িতে আছি, এমন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই স্বামীজী এলেন (আমরা কেউই স্বামীজীকে চিনতাম না—আমি তো নয়ই)। কিন্তু দেখলাম রাজকীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, লম্বা, সুদেহী এক পুরুষকে—আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! জ্যোতির্ময় তাঁর মুখ, মাথায় কমলা রঙের পাগড়ি, গায়ে একই রঙের ঢিলেঢালা জামা যা পা পর্যন্ত নেমে এসেছে, আর একটি গেরুয়া কাপড় টানটান করে কোমরে বাঁধা।

স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ‘‘অধ্যাপক সুন্দররামন কি বাড়ি

আছেন? তাঁর নামে একটি চিঠি আছে।" কী কণ্ঠস্বর! আহা, গম্ভীর অথচ ঘণ্টাধ্বনির মতো মধুর! রোমাঁ রোলাঁ ঠিকই বলেছেন, "তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল ভায়োলন-চেলোর মতো সুন্দর; গম্ভীর অথচ এতটুকু রুক্ষতা ছিল না তাতে। সেই স্বর যা শুধু বক্তৃতামঞ্চকেই কাঁপিয়ে দিত না, মনেও ঝড় তুলতো। একবার বলা শুরু করলে শ্রোতাদের হৃদয়কে যেন পিয়ানোর সুরের ঝরনাধারায় তিনি ডুবিয়ে দিতে পারতেন, স্পর্শ করতে পারতেন তাঁদের আত্মাকে।"

আমার তখন কতই বা বয়স! বছর চোদ্দ হবে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ছেলেমানুষের সরল বুদ্ধিতে মনে হলো, ইনি নির্ঘাৎ একজন মহারাজা। তাই তাঁর হাত থেকে চিঠিখানি নিয়েই এক দৌড়ে ওপরে বাবার কাছে গিয়ে বললাম ঃ "বাবা, এক মহারাজা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।[১] তিনি নিচে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আর, হ্যাঁ এই চিঠিখানি আপনাকে দিয়েছেন।"

আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন, "রামস্বামী, তুই এত সরল কি বলবো! আরে বোকা, রাজা-মহারাজারা কি তোর-আমার মতো সাধারণ লোকের বাড়িতে আসেন?" আমি তবুও বললাম ঃ "আপনি একবার গিয়েই দেখুন। আমি নিশ্চয় করে বলছি, উনি মহারাজা।" বাবা নিচে নেমে বিনীতভাবে স্বামীজীকে নমস্কার করে তাঁকে ওপরতলায় নিয়ে গেলেন। স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বাবা নিচে এসে আমাকে বললেন ঃ উনি সত্যিই এক মহারাজ; তবে ছোটখাটো কোনও রাজ্যের রাজা নন। ওঁর অসীম সাম্রাজ্য অন্তর্জগতে, সর্বোচ্চ আত্মার জগতে।"

সেইবার স্বামীজী একটানা ন-দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময়ে অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বাবা তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম নবরাত্রি' নামক প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন।[২] আমি এখানে সংক্ষেপে শুধু সেই কথাগুলি বলবো যেগুলি ত্রিবান্দ্রমে আমাদের বাড়িতে থাকার সময় স্বামীজী বিশেষভাবে আমাকেই বলেছিলেন এবং যা আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল ও অম্লান।

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' আমাদের কলেজে পাঠ্য ছিল। একদিন সকালে সংস্কৃত ঐ কাব্যগ্রন্থটি পড়ছি, এমন সময় স্বামীজী ঘরে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি পড়ছ?" বললাম ঃ "কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গটি পড়ছি।"

---

১ এই বইয়ের ৬১ পৃঃ বিবরণটি অন্যরকম আছে।

২ কে. সুন্দররাম আয়ার-এর প্রথম প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

তিনি বললেন ঃ "মহাকবি যেখানে হিমালয়ের বর্ণনা দিয়েছেন, সেই অংশটা তুমি আমাকে আবৃত্তি করে শোনাতে পার?" স্বামীজীর আদেশে আমি তখনই দক্ষিণ ভারতীয় ঢঙে সুর করে সুললিত, গীতিময় সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করে গেলাম। স্বামীজী প্রসন্ন হলেন। মৃদু হেসে আমাকে বললেন ঃ "তুমি কি জান, এই ধ্যানগম্ভীর পবিত্র হিমালয়ের কোলে আমি বহু দিন কাটিয়েছি এবং সেখান থেকেই আমি আসছি?" আমি আনন্দে উৎফুল্ল হলাম। স্বামীজীর প্রতি আগ্রহ যেন আরও বেড়ে গেল। স্বামীজী প্রথম স্তবকটি আমাকে আর একবার আবৃত্তি করতে বললেন। করলাম। শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "এর অর্থ কি বুঝেছ, বলো দেখি?" যা জানি তাই বললাম। স্বামীজী বললেন ঃ "ভালই বলেছ। তবে যা বললে, তা-ই যথেষ্ট নয়।" এই বলে স্বামীজী নিজেই তাঁর সেই অতুলনীয়, সুরেলা, পরিশীলিত কণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলেন ঃ

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধাবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

এরপর স্বামীজী শ্লোকটিকে অপূর্বভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ "শ্লোকটির দুটি শব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, 'দেবতাত্মা' আর 'মানদণ্ড'। কবি বলতে চাইছেন, এই বিরাট হিমালয় প্রকৃতির খেয়ালে গড়ে ওঠা শুধুমাত্র একটা প্রাচীর নয়; এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে দৈবী ভাব আর পবিত্রতা জমাট বেঁধে আছে। এই গগনচুম্বী শৈলমালা শুধু যে ভারতবর্ষ এবং তার সনাতন সভ্যতাকে উত্তর মেরুর শৈত্যপ্রবাহ থেকে রক্ষা করছে তা-ই নয়, বহিঃশত্রুর সর্বনাশা আক্রমণের হাত থেকেও যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে আসছে। সেখানেই শেষ নয়। হিমালয় উপহার দিয়েছে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মতো নদনদী, যারা গিরিরাজের বরফগলা জলে সংবৎসর পুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের প্রাণপ্রবাহকে চিরকাল সচল, সজীব ও অব্যাহত রেখেছে (এই হলো 'দেবাতাত্মা')। আর 'মানদণ্ড' বলতে কবি জোরের সঙ্গে এই কথাই বলতে চাইছেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা শ্রেষ্ঠ পদবাচ্য এবং এই সভ্যতার কষ্টিপাথরেই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের অন্যান্য সভ্যতার উৎকর্ষ যাচাই করে দেখতে হবে। স্বদেশপ্রেমের কী উত্তুঙ্গ ধারণাই না কবির ছিল!"

স্বামীজীর কথা শুনে আমি মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত। সে কথা আজও ভুলিনি। সেই হিরণ্ময় বাণী আজও আমার হৃদয়ের গভীরে সমভাবে দীপ্যমান।

ঐ ন-দিনের কোনও একদিন হবে, বাবাকে আর আমাকে তিনি বললেন ঃ "দেশাত্মবোধ নিছক একটা ভাবাবেগ বা ভাবালুতা নয়। ঠিক ঠিক দেশপ্রেম বলতে দেশবাসীকে সেবা করার আন্তরিক ইচ্ছা বোঝায়। সারা ভারতবর্ষ আমি পায়ে হেঁটে ঘুরেছি, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও অজ্ঞতা নিজের চোখে দেখেছি। আর এসব দেখার ফলে আমার বুকের ভিতর এক নিদারুণ যন্ত্রণার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যতক্ষণ না তাদের এই নরকযন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। কর্মের দোহাই যেন কেউ না দেয়। কারণ কর্মদোষেই যদি ওরা কষ্ট পায়, তাহলে আমাদেরও উচিত এমন কর্ম করা যাতে ওদের দুঃখকষ্ট দূর হয়। (আমি স্পষ্ট বলছি) যদি ঈশ্বরলাভ করতে চাও তো মানুষের সেবা কর। যদি নারায়ণের কাছে পৌঁছতে চাও, দরিদ্রনারায়ণের সেবা কর—কোটি কোটি নিরন্ন ভারতবাসীর মুখে অন্ন তুলে দাও।"

স্বামীজীর চিন্তার এই বীজ থেকেই পরবর্তী কালে বিকশিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ মহীরুহ। তাঁর সেদিনের ঐ কথা শুনে আমাদের মন-প্রাণ জুড়িয়ে গিয়েছিল। সমাজসেবার একটা গভীর প্রেরণা আমরা ঐ কথাগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম, সেবা ও আধ্যাত্মিকতা তাঁর দৃষ্টিতে দুটি পৃথক বস্তু ছিল না এবং সেইজন্য দুটিই তাঁর সমান প্রিয়। পরবর্তী কালে একটি বিখ্যাত চিঠিতে[১] স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন ঃ "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে একমাত্র ভগবান বিদ্যমান এবং যে একমাত্র ভগবানের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার বিশেষ উপাস্য দেবতা হলো পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির সর্বজীবের দরিদ্র-নারায়ণ!" ঠিক যেন রন্তিদেবের কথার প্রতিধ্বনি।

স্বামীজী আর একদিন আমাকে বলেছিলেন ঃ "তুমি এখনো খুবই ছোট। আমার আশা এবং ইচ্ছা, বড় হয়ে তুমি 'প্রস্থানত্রয়', অর্থাৎ উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র আর ভগবদ্গীতা, খুব ভাল করে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়বে (কারণ চরম তত্ত্বজ্ঞানের এই তিনটিই উৎস)। অবশ্য ইতিহাস, পুরাণ এবং আগম শাস্ত্র—এইগুলিও মন দিয়ে পড়া চাই। সত্যি বলতে কি, এদের তুল্য গ্রন্থ দুনিয়ার কোথাও পাবে না।" স্বামীজী আরও বলেছিলেন ঃ "সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষের মনেই 'কোথা থেকে', 'কোথায়', 'কেন' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানার একটা

১ আলমোড়া থেকে ৯ জুলাই, ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মেরি হেলকে লেখা চিঠি।

অদম্য ক্ষুধা আছে। মনে রেখো আমাদের যত ধর্মগ্রন্থ আছে সেগুলিকে মন্থন করে মাত্র চারটি শব্দে দাঁড় করানো যায়। এই চারটি মূল শব্দ হলো ঃ অভয়, অহিংসা, অসঙ্গ ও আনন্দ। এদের ভুলো না; কালে এদের তাৎপর্য তোমার কাছে প্রতিভাত হবে।"

তাঁর এসব কথা সম্যক উপলব্ধি করার মতো বয়স তখনও আমার হয়নি। কিন্তু কথাগুলি সেদিন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে গেঁথে নিয়েছিলাম আর সমস্ত জীবন ধরেই সেগুলির পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে যে নয় দিন স্বামীজী আমাদের বাড়িতে ছিলেন, সেই কয়দিনই সুযোগ পেলেই আমি তাঁর কাছে ঘুরঘুর করতাম। কেবল যে তাঁর স্নেহের টানেই ছুটে ছুটে যেতাম, তা নয়; তাঁর মধ্যে এমন একটা দারুণ আকর্ষণী শক্তি ছিল যা আমাকে চুম্বকের মতো তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যেত। স্বামীজীর সঙ্গে বাবা ধর্ম ও দর্শনের যেসব জটিল প্রশ্ন নিয়ে প্রায়শই আলোচনা করতেন, সেসব ছিল আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু তবুও প্রেম ও করুণায় পূর্ণ তাঁর চোখদুটির এমনই আকর্ষণ, ভাবগম্ভীর অথচ মিষ্টি এমনই অসাধারণ তাঁর গলার স্বর, আর এত রাজকীয় তাঁর চালচলন যে, তাঁর সদাহাস্যময় উপস্থিতির সান্নিধ্যে থাকলে এমনিতেই মনটা আনন্দে ভরে যেত। তিনি আমাকে টুকটাক আরও অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু ষাট বছর আগে শোনা সেসব কথা বিশেষ মনে নেই। শুধু তাঁর যেসব কথা অবিস্মরণীয় এবং আমার স্মৃতির ফ্রেমে চির উজ্জ্বল সেগুলিই তুলে ধরলাম।

...১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির শুরুতে স্বামীজী মাদ্রাজে এলে সেখানকার মানুষ স্বামীজীকে যে বিপুল সংবর্ধনা দিয়েছিলেন তার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন রোমাঁ রোলাঁ। হ্যাঁ, একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেই বলছি, রোলাঁর বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্যি। রোমাঁ রোলাঁ লিখছেন, "কয়েক সপ্তাহ ধরে মাদ্রাজ শহর যেন তাঁর প্রত্যাশায় একেবারে টানটান হয়েছিল। তাঁর সম্মানে সে তৈরি করেছিল সতেরোটি বিজয়তোরণ এবং আয়োজন করেছিল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় চব্বিশটি সংবর্ধনা সভার। তার দৈনন্দিন জীবনের যত কিছু কর্মব্যস্ততা ঐ ন-দিনের জন্য যেন একেবারে শিকেয় তুলে রেখে সে অনন্য এক মহোৎসবে মেতে উঠেছিল।

"দেশবাসীর সেই অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও আগ্রহের উত্তরে তিনি ভারতবর্ষকে দিলেন তাঁর পরম বাণী, যে বাণী শঙ্খধ্বনি হয়ে দিকে দিকে রাম-

শিব-কৃষ্ণের দেশ ভারতবর্ষের পুনরভ্যুদয় ঘোষণা করলো। অমৃতত্বের বাণী শুনিয়ে তিনি সকলকে বললেন—তোমরা আত্মা, সেই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বীরের মতো জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাও। যথার্থ একজন সেনানায়কের মতোই তিনি তাঁর 'সমরনীতি' ব্যাখ্যা করে দেশের সকল মানুষকে বললেন ঃ ওঠো, জাগো।"

স্বামীজীর কথা শোনার জন্য যাঁরা পাগল হতেন এবং যাঁরা তাঁর কট্টর অনুরাগী, আমি তাঁদেরই একজন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমি কুম্ভকোণম কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে মাদ্রাজ ল-কলেজে আইন পড়ি। আমাদের সময় আইন কলেজে পড়াশোনার খুব একটা চাপ ছিল না। প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঁচটা থেকে সাতটা, এই দু-ঘণ্টাই আমাদের ক্লাস হতো। আইন কলেজের ছাত্র এবং যারা ডাক্তারি পড়তো, এই দুটি দলের বরাবরই সব ব্যাপারে খুব আগ্রহ ও উৎসাহ; তাদের মধ্যে ভয়ডর বিশেষ ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন মাদ্রাজ আসবেন, সেদিন আমি ও আমার বন্ধুরা সবাই মিলে এগমোর স্টেশনে গেলাম। গিয়ে দেখি, স্বামীজীর জন্য দুই-ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে; শোভাযাত্রা করে তাঁকে সমুদ্রের ধারে ক্যাস্‌ল কার্নানে নিয়ে যাওয়া হবে। স্বামীজী সেখানেই ন-দিন ছিলেন। যা হোক, স্টেশনে গিয়ে দেখি জনসমুদ্র! স্বামীজীর ট্রেনটি চোখে পড়ামাত্রই উল্লসিত জনতা জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। ট্রেন থেকে নেমে স্বামীজী ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে পথ করে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান ঘোড়ার গাড়ির দিকে যেতে লাগলেন। শোভাযাত্রা বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর আমি এবং আরও কয়েকজনে মিলে জেদ ধরলাম, স্বামীজীর গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে দেওয়া হোক, আমরা নিজেরাই তাঁর গাড়ি টেনে নিয়ে যাব। তা-ই হলো। ঘোড়া খুলে দেওয়া হলো এবং আমরা অনেকেই পরম উৎসাহভরে তাঁর গাড়িটি ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম। ক্যাস্‌ল কার্নান পর্যন্ত বেশ অনেকটা পথ সেদিন স্বামীজীর গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমরা যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম। বাস্তবিক, আমাদের প্রাণের একটি একান্ত সাধ সেদিন মিটেছিল। তিনি আমাদের চোখে মানুষ ছিলেন না। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন 'ভারতাত্মা', 'ঈশ্বরের দূত'।

স্বামীজী মাদ্রাজে ন-দিন ছিলেন; অধিকাংশ সময় আমি তাঁর সঙ্গেই থাকতাম। দিনভর কত যে মানুষ তাঁকে দর্শন করতে আসতেন তার ইয়ত্তা

নেই। অনেকে শান্ত হয়ে বসে চুপচাপ তাঁর কথা শুনতেন। আবার কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করতেন। স্বামীজীর অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু ও অনুরাগী স্বামীজীর সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বেদান্ত প্রচারের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু যখন যে আলোচনাই হোক না কেন, আমি তাঁর কাছ থেকে নড়তাম না। মাদ্রাজে এসে দেখামাত্রই তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়েছিল ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ত্রিবান্দ্রমে আমাদের বাড়িতে থাকার কথা। যখনই তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসে থাকতে দেখতেন, তখনই তাঁর চোখদুটি আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠতো আর ঠোঁটে ফুটে উঠতো এক দিব্য হাসি—সেই দৃষ্টি আর সেই হাসি জীবনে ভুলব না।

আমার বাবা, অধ্যাপক কে. সুন্দররাম আয়ারও সেই সময়ে মাদ্রাজে ছিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে তাঁরও বহুবার দেখা হয়। "স্বামীজীর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় নবরাত্রি"[১] (বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩) নামক দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি সেই স্মৃতিকথা লিখে রেখেছেন।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের বিবেকানন্দ আর ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করে আমি নিজেই অবাক হয়েছি। ১৮৯২-এর বিবেকানন্দকে দেখলে মনে হতো, ভাগ্যের সাথে তাঁর একটা বোঝাপড়া বাকি আছে কিন্তু কখন, কোথায় কিভাবে যে সেই বোঝাপড়াটা হবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত নন। কিন্তু পাঁচ বছর পর অর্থাৎ ১৮৯৭-এ তাঁকে দেখে মনে হয়েছে, সেই বোঝাপড়া শেষ। জীবনের ব্রত সম্পর্কে তিনি এখন নিঃসংশয় এবং কৃতনিশ্চয় তাঁর সাফল্য বিষয়েও। এরপর তিনি আর কোথাও থামেন নি বা পিছন ফিরে তাকান নি। নির্ভীক চিত্তে, দৃঢ় পদবিক্ষেপে তিনি ভাগ্যনির্ধারিত পথে শুধুই এগিয়ে গেছেন। আর মাঝে মাঝে অনুগামীদের আদেশ-নির্দেশ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি জানতেন তাঁর আদেশ অনুগামীরা মাথা পেতে নেবেন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজীর গান শোনা—সে আমার আর এক অভিজ্ঞতা। স্বামীজীর যে অতি চমৎকার গানের গলা, সেটি ১৮৯২ সালে, যখন তাঁকে আমি প্রথম দেখি, তখনই টের পেয়েছিলাম। পরে অবশ্যই জেনেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর গান শুনতে শুনতে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ক্যাস্‌ল কার্নানে যে ন-দিন তিনি ছিলেন, তার মধ্যেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে কয়েকটি অষ্টপদী তিনি আমাদের গেয়ে শোনান। তাঁর গান শুনে বুঝলাম

১ প্রবন্ধটির অংশ বিশেষ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে এই পদগুলি একটু অন্য ঢঙে গাওয়া হয়। কিন্তু এই বাহ্য! আসল কথা হলো, তাঁর কণ্ঠের লালিত্য ও মাধুর্য আমার মনের গভীরে এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে।

এক সন্ধ্যায় অদ্ভুত এবং বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটলো। দর্শনার্থীদের ভিতর থেকে এক গোঁড়া পণ্ডিত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজীকে সোজাসুজি অভাবনীয় একটি প্রশ্ন করে বসলেন। প্রশ্নটি করলেন তিনি সংস্কৃতে। বললেন ঃ "আমি জেনেছি, আপনি ব্রাহ্মণ নন; আর শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অব্রাহ্মণের সন্ন্যাস নেওয়ার কোনও অধিকার নেই। আপনি তাহলে কি করে গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হলেন, জানতে পারি কি?"

পণ্ডিতের সাথে তর্ক করতে স্বামীজীর প্রবৃত্তি হলো না। শুধু তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার জন্য তির্যক ভঙ্গিতে স্বামীজী বললেন ঃ "প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাহ্নিক করার সময় যাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, আমি সেই চিত্রগুপ্তের বংশধর। অতএব ব্রাহ্মণের যদি সন্ন্যাসে অধিকার থাকে তো আমার অধিকার তাঁদের চেয়ে বেশি বই কম নয়।" এই বলে স্বামীজী এবার তাঁর প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। তিনি বললেন ঃ "আপনি সংস্কৃতে প্রশ্ন করলেন বটে, কিন্তু আপনার উচ্চারণে এমন একটা ভুল লক্ষ্য করলুম যা ক্ষমার অযোগ্য। পাণিনি এই ধরনের অশুদ্ধ উচ্চারণের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন—'ন ম্লেচ্ছিতং বৈ, নাপভাষিতং বৈ' (অশুদ্ধ উচ্চারণ করে শব্দের অমর্যাদা করা অনুচিত)। অতএব যে প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, সে তর্কে আপনার কোন অধিকার নেই।"

পণ্ডিত দেখলেন মহা বিপদ! তিনি বুঝলেন উপস্থিত সকলেই স্বামীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন এবং তাঁর আগড়ম-বাগড়ম প্রশ্নে সকলেই রুষ্ট হয়েছেন। অতএব তিনি মানে মানে সরে পড়লেন।

মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা ছিল 'আমার সমরনীতি'। বক্তৃতাটি আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। সে স্মৃতি কখনো ভোলার নয়। ... সেসব কথা শুনতে শুনতে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল, শিহরণ খেলে যাচ্ছিল সর্বাঙ্গে, বারবার ভিজে উঠছিল চোখ। শুধু আমারই নয়, শ্রোতাদের অনেকেরই সেদিন ঐ এক অবস্থা। স্বামীজী আমাদের এতটাই উদ্দীপিত করেছিলেন যে সেদিন সেখানে সেই মুহূর্তেই আমরা কয়েকজন ভারতবর্ষের মানুষের অজ্ঞতা, দুঃখ এবং দারিদ্র যথাসাধ্য দূর করার শপথ নিলাম।

মাদ্রাজে স্বামীজী 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা' এই বিষয়ে যে

বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন, আমি সেটিও শুনেছি। শুনেছিলাম সেই বক্তৃতাটিও যার বিষয় ছিল 'ভারতের মহাপুরুষ'। শেষের বক্তৃতাটিও আমাকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল।

শেষ করার আগে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে উত্তর ভারতের তীর্থদর্শনে বেরিয়ে কলকাতার কাছাকাছি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠে কয়েকঘণ্টা কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মঠে থাকতে পেরে অপার আনন্দ পেয়েছিলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে হয়েছিল। মঠেরই একজন সাধু কৃপা করে আমাকে সমস্ত মঠটি ঘুরিয়ে দেখালেন; তারপর, স্বামীজী যে ঘরে তাঁর জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটিয়েছিলেন, সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সাধারণত ঐ ঘরে দর্শনার্থীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সন্ন্যাসী মহারাজ বললেন ঃ "আপনার ক্ষেত্রে আমরা সানন্দে নিয়মের ব্যতিক্রম করেছি। আপনি স্বামীজীর কৃপাধন্য। কত অল্প বয়সেই তাঁর পূত সান্নিধ্যে এসেছেন! তাছাড়া, আপনার বাবার মতো আপনি নিজেও তো আজীবন রামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ও ভক্ত!"

অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে নিঃশব্দে সেই দেবমন্দিরে ঢুকলাম। দূরে পূতসলিলা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আর সমস্ত ঘরটিতে এক পবিত্র, ভাবগম্ভীর প্রশান্তি জমাট বেঁধে আছে। সমস্ত দেহ-মন দিয়ে সেই ঘনীভূত পবিত্র ভাবের স্পর্শ অনুভব করতে থাকায় আমার চোখদুটি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এলো, আর সেই বাষ্পাকুল দৃষ্টিপটে ফুটে উঠলো বাইরের অপূর্ব বৈরাগী দৃশ্য যা প্রাণভরে দেখতে লাগলাম। তারপর একটু ধ্যানে বসলাম। স্বামীজীর কথা, ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের অতুলনীয় সেবায় আর সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিকতার প্রচারে তাঁর জীবনদানের কথাই ধ্যানে ভাববার চেষ্টা করছিলাম। স্বামীজীর ঐ ঘরে যতক্ষণ ছিলাম, কেবলই মনে হচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাকে 'জ্ঞানদীপ' বলেছেন, সবার অলক্ষ্যে আমার প্রাণে কে যেন সেই দিব্যচেতনার অনির্বাণ প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

(প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ১৯৫৩)

এ. শ্রীনিবাস পাই

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। স্বামীজী তখনো শিকাগো ধর্মমহসভায় যাননি, তবে যাবেন-যাবেন করছেন, আর আমি তখন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।[১] যদিও তিনি তখন বিখ্যাত হননি, তবুও তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এবং তাঁর কথা ও উপদেশ শোনার জন্য তখনই বহু মানুষ, বিশেষত ছাত্র সম্প্রদায়, তাঁর কাছে আসতে শুরু করেছেন। সেইসব ঘরোয়া আলোচনাসভায় তদানীন্তন হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না; তবে সেখানে ছাত্র, শিক্ষক, মাঝারি গোছের পদস্থ কর্মচারী এবং উকিল—এঁরা সব আসতেন দেখতাম। কিন্তু ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত স্বামীজী আমেরিকা থেকে যখন দেশে ফিরলেন তখন তাঁর মুখের কথা এবং বক্তৃতা শোনার জন্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ শয়ে শয়ে ছুটতো তাঁর কাছে।

যে সময়ের কথা এখন বলছি সেটা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজী তখন মাদ্রাজের ডেপুটি এ্যকাউনটেন্ট-জেনারেল শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বাড়িতে আছেন। ভট্টাচার্য মশাই-এর বাড়িটা ছিল মেরিনার দক্ষিণপ্রান্ত ছাড়িয়ে অল্প দূরে। স্বামীজীর কথা শুনতে প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে আমি ঐ বাড়িতে যেতাম। গিয়েই ঘরের মেঝেতে বিছানো কার্পেটের ওপর বাবু হয়ে বসতাম, চেষ্টা করতাম স্বামীজীর যতটা কাছাকাছি বসা যায়। তামাক খেতে খেতে স্বামীজী নানারকম প্রসঙ্গ করতেন। আহ্, তাঁর কথা শুনতে কী ভালোই যে লাগতো, তা কেমন করে বোঝাই!

তখনকার দিনে মাদ্রাজের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে সনাতন হিন্দু দর্শন ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান এখনকার তুলনায় নিতান্তই কম ছিল। তাছাড়া ধর্ম ও দর্শনের ওপর সহজবোধ্য তেমন কোনও ভাল বইপত্রও তখন ছিল না। তখন মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, হাক্সলে, লেসলি স্টিফেন এবং হেকেল-ই ছিলেন আমাদের চোখে সাক্ষাৎ ভগবান। দর্শন, রাজনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

---

১ স্বামীজী সম্পর্কে এই রচনাটি আমার ও আমার অনুজের ব্যক্তিগত স্মৃতির ওপর ভিত্তি করে লেখা। লেখার আগে আমি তার নোটগুলির সঙ্গে আমার নিজের নোটগুলি মিলিয়ে দেখেছি। —লেখক

তাঁদের কথাই আমাদের কাছে বেদবাক্য ছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের ধারালো, যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা যেদিন শুনলাম সেদিন আর আমাদের বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। অবশ্য তাঁর কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঠিক ঠিক বোঝবার বা হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা বা প্রস্তুতি কোনওটাই তখন আমাদের ছিল না। তাছাড়া (স্পেন্সার, মিল প্রমুখ) ইউরোপীয় লেখকরা আমাদের মতো অনেক ছাত্রের মনের ভেতর এমন প্রভাব ফেলেছিলেন যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই শক্ত ছিল।

আধুনিক বিবর্তনবাদ প্রসঙ্গে স্বামীজী একদিন আমাদের বুঝিয়ে বললেন— ওসব কথা কপিল মুনি কবেই বলে গেছেন! আর একবার ব্যক্তি-ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক-ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বললেন, অজ্ঞেয়বাদীই হন আর নাস্তিকই হন, আসলে কারো বক্তব্যই নেতিবাচক নয়; কেন না তাঁকে ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করতেই হচ্ছে, অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্যে একটি মূল বা নিত্য তত্ত্ব যে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান, এটি তাঁদের স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে। ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও জানালেন, গোঁড়া খ্রীস্টানদের মত একেবারেই অযৌক্তিক, কোনওমতেই তা সমর্থন করা যায় না। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দুম করে একটা আত্মার জন্ম হলো, আর তারপরেই হয় তার অনন্ত নরকভোগ, নয়তো মুক্তি! এ যেন কতকটা 'একমুখওয়ালা লাঠি!'

গভীর তত্ত্বমূলক কথা ছাড়াও স্বামীজী অনেক সময় আমাদের নানান মজার মজার গল্পও বলতেন। বলতেন তাঁর কলেজ জীবনের কথা—কেমন করে তিনি এবং সহপাঠীরা কোনও কোনও অধ্যাপককে নিয়ে মজা করতেন, কেমন করে তাঁরা একবার ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কলেজের বাইরে গিয়ে তামাক খেয়েছিলেন, ইত্যাদি। 'চমকপ্রদ' কিছু কাহিনীও তিনি আমাদের শুনিয়েছিলেন এবং সেসব আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। তিনি এক অন্ধ মানুষের কথা বলেছিলেন, যাঁর স্মৃতি এবং শ্রবণশক্তি দুই-ই ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ। স্বামীজী যখন খুব ছোট, সেই সময় একবার দৃষ্টিহীন সেই ব্যক্তি স্বামীজীর গান এবং কিছু কথা শুনেছিলেন। এই ঘটনার অনেক বছর পর এক রাতে একটি বাড়িতে বসে স্বামীজী গান গাইছেন। এমন সময় ঘটনাক্রমে ঐ অন্ধ ব্যক্তিটিও সেখানে হাজির হন। স্বামীজীর গান শোনামাত্রই তিনি বলে উঠলেন ঃ আরে, গলাটা যেন খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে! আচ্ছা ভাই, বলুন তো, আপনার যখন খুব অল্প বয়স তখন অমুক সালে, অমুক জায়গায়, আমি কি একবার আপনার গান শুনেছিলাম?

তিনি আরো বলেছিলেন, ঐ অন্ধ ব্যক্তিটি রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হাততালি দিতেন, আর তালির শব্দ শুনেই বলে উঠতেন "আমার ডান দিকে ফাঁকা জায়গা" অথবা "আমার বাঁদিকে একটা মস্ত বাড়ি" ইত্যাদি।

স্বামীজী আরও একটা গল্প বলেছিলেন—এক 'জাদুকরের'। যদ্দূর মনে পড়ছে, লোকটি মুসলমান। তার কিছু 'সিদ্ধাই' বা লোকে যাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলে, সেসব ছিল। একবার এক ইউরোপীয়ান সাহেবের ইচ্ছা হলো তিনি জাদুকরের শক্তি যাচাই করে দেখবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক সন্ধ্যায় সেই সাহেব তাঁর খোলা গাড়িতে কলকাতার রাস্তায় বার হলেন—সঙ্গে জাদুকর। গাড়ি চলছে, এমন সময়ে সাহেবকে উদ্দেশ্য করে জাদুকর বললো ঃ "এখন বলুন স্যার, আপনার কি চাই; যা চাইবেন, তা-ই আপনাকে এনে দেব।" মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করে সাহেবটি বললেন ঃ "বেশ তো, আমাকে এক বোতল শ্যাম্পেন এনে দাও দেখি।" সাহেব জানতেন, গাড়িতে তো নয়ই, ধারে-কাছে কোথাও ঐ তরল বস্তুটির নামগন্ধও নেই। সাহেবের মনোবাঞ্ছা জানামাত্র জাদুকর শূন্যে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার ভঙ্গি করলো আর পর মুহূর্তেই দেখা গেল তার হাতে এক বোতল শ্যাম্পেন। জাদুকর 'এবার দেখুন' বলে রাস্তার ডানদিকে সারিবদ্ধ দোকানগুলোর দিকে চেয়ে হাতটা নাড়াতেই সে দিকের আলোগুলো সব একসাথে নিভে গেল। অথচ আশ্চর্য, বিপরীত সারির সব আলো ঠিক আগেরই মতো জ্বলছে। পথচারী আর দোকানের লোকজন হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় খুবই অবাক হলো। কিন্তু তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই জাদুকরের অঙ্গুলি হেলনে পরক্ষণেই ডানদিকের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠলো।

ইউরোপীয়রা 'কালা-আদমী' বা 'নেটিভ' বলে সময়ে সময়ে ভারতীয়দের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র ও অপমানজনক ব্যবহার করতো। সেইসব কথা উঠলে স্বামীজী একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। আগে তাঁর গলার স্বর পালটে যেত। অবশ্য যে কোনও আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়েরই তাই হতো। একদিন অনুরূপ প্রসঙ্গ উঠলে আবেগজড়িত কণ্ঠে স্বামীজী আমাদের একটি ঘটনা বলেছিলেন। একবার, খুব সম্ভব কলকাতাতেই, এক সলিসিটর জনৈক ভারতীয় ব্যারিস্টারকে খুব অপমান করেন। ঐ রূঢ় ও বর্বরোচিত ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে নামকরা ভারতীয় আইনজীবী ও মক্কেলরা এককাট্টা হয়ে এক সভা ডাকেন এবং ঐ সলিসিটরকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। এই পর্যন্ত বলেই

স্বামীজী তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলটি ঠোঁটের দিকে রহস্য করে ঘুরিয়ে বলে উঠলেন, "আর তার ফলে, পরের দিন থেকে সেই বেয়াড়া বদরাগী উকিলের নিজের বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া আর কোনও গতি রইল না।"

জি. এ. নটেসান এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত 'Swami Vivekananda's Speeches and Writings'-এ মুণ্ডিত মস্তক স্বামীজীর যে ছবিগুলি আছে তা থেকে স্বামীজীর চেহারার একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। কিন্তু তাঁর চোখদুটির মধ্যে যে কী অসীম শক্তি নিহিত ছিল, কোনও ছবি, কোনও বর্ণনাই তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান আমাদের দিতে পারে না। কোলরিজের বিখ্যাত কবিতার সেই প্রাচীন নাবিকের (Ancient Mariner) মতো স্বামীজীও শুধু তাঁর দুটি চোখ দিয়ে সকলকে 'ধরে রাখতে' পারতেন।

স্বামীজীর কণ্ঠস্বরেও একটা অদ্ভুত জাদু ছিল। প্রথমদিকে অ্যানি বেসান্তের যে রকম মিষ্টি, রিনরিনে গলা ছিল, ঠিক সে রকম নয়—কিন্তু তার চেয়েও নরম, দরদী আর মধুর; অনেকটা মিঃ নর্টনের গলার মতো। একবার যে শুনেছে, সে-ই মুগ্ধ হতো। স্বামীজী গানও গাইতেন চমৎকার। এক সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছে বসে তাঁর কথা শুনছি, ঠিক এমনি সময় ফুটফুটে ছোট্ট একটি মেয়ে, খুব সম্ভব ভট্টাচার্য মশাই-এরই মেয়ে, টলমল করতে করতে ঘরে এলো। স্বামীজী শিশুটিকে সাদরে কোলে তুলে নিয়ে একটি পাঞ্জাবী গান গাইতে লাগলেন। গান শেষ হলে বললেন, লোকে বলে এটি গুরু নানকের রচনা। গানটির পিছনে যে ইতিহাস আছে, তা-ও তিনি বললেন। ঘটনাটি এই রকম—সন্ধ্যারতির সময় গুরু নানক এক মন্দিরে গেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা কিছুতেই তাঁকে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে দিল না। নানক আর কি করবেন! তিনি মন্দিরের বাইরে থেকেই এই গানটি গাইতে লাগলেন। গানটিতে নানকজী আকাশকে একটি রুপোর থালার সঙ্গে তুলনা করেছেন আর বলেছেন, সেই জ্যোতির্ময় আধারে নক্ষত্রপুঞ্জ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণন প্রদীপের আলো বা 'নিরাজন' যা দিয়ে বিরাটের আরতি হচ্ছে এবং স্নিগ্ধ সান্ধ্য বাতাস যেন সুগন্ধী ধূপ ইত্যাদি। স্বামীজীর ঐ বর্ণনা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়া সুরের একটি কবিতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিল। সেই কবিতার প্রথম দুটি লাইন ঃ

The Turf shall be my fragrant Shrine,
My Temple, Lord, that arch of Thine.

[তৃণাচ্ছাদিত ভূমি হলো মোর সুরভিত দেবালয়
আমার মন্দির, হে প্রভু, তোমারই তোরণ দ্বার।]

সচরাচর বাঙালীদের যেমন মোটাসোটা, গোলগাল দেখা যায়, স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু সে রকম ছিলেন না। তাঁর শরীর বেশ গড়াপেটা ও মজবুত ছিল। গায়ের রং ছিল বাদামী, একটু তামাটে ধরনের।

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহার ছিল খুবই সহজ সরল, অকৃত্রিম; সামাজিক আদব কায়দার ধার তিনি বড় একটা ধারতেন না। সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এই যে, তাঁরা খুব রাশভারী এবং গম্ভীর হবেন, মেপে মেপে দুটি-একটি কথা বলবেন এবং তাঁদের মেজাজ সর্বদা এক সুরে বাঁধা থাকবে। কিন্তু এই ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর ছবিটি মেলে না। কেউ তাঁকে আজেবাজে কোন প্রশ্ন করলে অথবা অকারণ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শুধু নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টা করলে স্বামীজী তাঁকে কঠোর ভাষায় দাবড়ানি দিতেন। তখন তাঁর একেবারে, যাকে বলে 'জনসনিয়ান' মেজাজ (একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে)। এটি স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফেরার পরের ঘটনা। বেশ গরম সেদিন। সকালে বহুক্ষণ ধরে স্বামীজী ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। অধিবেশনের শেষদিকে এক দাম্ভিক গোছের যুবক বেশ বিজ্ঞের মতো স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করে বসলো ঃ "আচ্ছা স্বামীজী, বলতে পারেন, জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন?" আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে স্বামীজীর জলদগম্ভীর জবাব ঃ "অজ্ঞতাই দুঃখের মূল কারণ।" ব্যস্, ঐখানেই প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ। আর একবার শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলে বসলেন, স্বামীজী, দর্শনের একটি বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা শঙ্করাচার্যের মতের সঙ্গে মিলছে না। এর উত্তরে স্বামীজী বললেন ঃ "বেশ তো, শঙ্করাচার্য একজন মানুষ ছিলেন, আর আপনিও একজন মানুষ। বিষয়টির মীমাংসা আপনি ভেবেচিন্তে নিজেই করে নিন না।"

আর একবার এক গোঁড়া পণ্ডিত নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য স্বামীজীর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে এসেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে স্বামীজী পরে বলেছিলেন ঃ "যে নিজে সংস্কৃতে 'জ্ঞান' শব্দটি সঠিক উচ্চারণ করতে পারে না, সে এসেছে আমার সংস্কৃত উচ্চারণের খুঁত ধরতে! কতদূর স্পর্ধা!"

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা থেকে ফিরে মাদ্রাজে এলেন, তখন সেখানকার মানুষ তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেয়। তাঁকে স্বাগত জানাতে লোকও হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু মাদ্রাজে তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি 'বক্তৃতা' হিসাবে যে খুব একটা সফল হয়েছিল তা বলা যায় না। অবশ্য তার জন্য দায়ী জনতার বাঁধনহারা উৎসাহ। আমার ধারণা এক প্রকাণ্ড সার্কাসের তাঁবুর[১] মধ্যে প্রথমে

১ কে. সুন্দররাম আয়ারের মতে ভিক্টোরিয়া হলে। এই বইয়ের ৮৬-৮৭ পৃঃ তার উল্লেখ আছে।

সভার বন্দোবস্ত হয়েছিল। কিন্তু বিরাট ঐ জনতার পক্ষে তাঁবুটি পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে স্বামীজীকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ির মাথায় চড়ে—স্বামীজীর ভাষায় 'গীতার ভঙ্গি'-তে—সেই বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা শুরু করতে হলো। যতদূর সম্ভব গলা চড়িয়ে এবং হাবেভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। অতিরিক্ত বিশৃঙ্খলা ও কোলাহলের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী তাঁর ভাষণ শেষ করতে বাধ্য হলেন। ভিক্টোরিয়া হল-এ স্বামীজীর পরবর্তী বক্তৃতাটি দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'The Sages of India' বা ভারতের মহাপুরুষগণ। যেমন বিষয়, তেমনই বলা! দুই-ই শ্রোতাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বক্তৃতার যেখানে তিনি রাসলীলা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের ভালবাসার কথা বলছিলেন, সেই অপার্থিব প্রেমের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর মুখের ভাব, বিশেষ করে তাঁর চোখদুটি যে কী সুষমামণ্ডিত হয়েছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়; সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যা সকলের ভিতরটা তোলপাড় করে দিচ্ছিল।

পুরনো ক্যাপার হাউস হোটেলের কাছাকাছি এবং এখনকার কুইন মেরি কলেজের ধারে কাছে, মেরিনায় একটা প্যাণ্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে বসেই সকালের দিকটায় স্বামীজী দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, কারো কোনও প্রশ্ন থাকলে তার উত্তরও দিতেন। হিন্দু সমাজের নেতা, বড় বড় আমলা, উকিল ও সাধারণ মানুষ তাঁর কাছে শয়ে শয়ে আসতে থাকেন, ফলে আমরা ছাত্ররা তাঁর কাছে যেন ঘেঁষতেই পারতাম না। একদিন সকালে এক ইউরোপীয় মহিলা (সম্ভবত প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারি) এসে সন্ন্যাসীদের কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের নিন্দা করে বলতে লাগলেন—একটি মহৎ প্রবৃত্তিকে (সুনিয়ন্ত্রিত হলেই তা মহৎ) নিগ্রহ করলে অর্থাৎ জোর করে ইন্দ্রিয় সংযম করতে গেলে হিতে বিপরীত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রমহিলার বক্তব্য শেষ হলে স্বামীজী সন্ন্যাসীর ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক তাৎপর্য ব্যাখা করে বুঝিয়ে দিলেন (ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে অবশ্য মনে হলো না তিনি ব্যাপারটা খুব একটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন)। আর ঠিক তারপরেই ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে কতটা পরিহাসের সুরে স্বামীজী বললেন, 'ম্যাডাম, আপনাদের দেশে আইবুড়োদের দেখলে সকলেই ভয় পায়; কিন্তু এখানে দেখুন, আমি তো অবিবাহিত, এরা আমাকে পুজো করছে।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একদিন স্বামীজী বেশ খোলা মেজাজে কথাবার্তা বলতে বলতে নিজের জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন ঃ "আমার ত্রিশ বছর বয়স হলো। কিন্তু আজ পর্যন্ত নারী কি বস্তু তা আমি জানি না।"

একবার এক সভায় একদল অল্পবয়সী ছাত্রকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের প্রথম কর্তব্য নিজেদের শরীরটাকে মজবুত করে গড়ে তোলা। তোমরা দৈহিক বলে বলীয়ান হও, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হও। তিনি আরও বলেছিলেন ঃ "তোমাদের বাঁ হাতে গীতা থাকুক, ক্ষতি নেই। কিন্তু ডান হাতে যেন ফুটবল থাকে।" ঐ একই বিষয়ে আর একবার তিনি বলেছিলেন, যারা শারীরিকভাবে দুর্বল, তারাই সহজে প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে; কিন্তু যারা শক্তিমান ও তেজীয়ান, তাদের লোভ জয়ের সামর্থ্য, আত্মসংযমের ক্ষমতা রোগাপ্যাংলা দুর্বল মানুষগুলোর চেয়ে অনেক বেশি।

নিজেকে দেখিয়ে একদিন তিনি বলেছিলেন ঃ "এই গেরুয়ার নিচে এক ওস্তাদ ('ওস্তাদ' অর্থাৎ ব্যায়ামবীর বা ব্যায়ামশিক্ষক) আছে হে, বুঝলে!"

১৮৯৭-এ আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ মেরিনার বিখ্যাত সেই বাড়ি ক্যাস্‌ল কার্নানে উঠেছিলেন। আমি যখন প্রথম মাদ্রাজে আসি তখন ঐ বাড়ির নাম ছিল আইস হাউস। তারপর বিলিগিরি আয়েঙ্গার মশাই (এখন প্রয়াত) বাড়িটি কিনে বিচারপতি কার্নানের নামানুসারে বাড়িটির নাম রাখেন ক্যাস্‌ল কার্নান। বাড়ির ভিতরে এক মজার গোলকধাঁধা ছিল আর আমাদের অল্পবয়সী ছাত্রদের মধ্যে কারও কারও প্রিয় খেলা ছিল ঐ গোলকধাঁধার মধ্যে ঢুকে হারিয়ে যাওয়া।

ওহ্, সেসব কী দিনই না গেছে! মনে পড়ে আমাদের মতো কয়েকজন ছাত্রের মাঝে মধ্যেই ক্যাস্‌ল কার্নানে নিমন্ত্রণ থাকতো। আমরাও স্বামীজীর কাছে বসে একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতাম। স্বামীজী খুব খেতে পারতেন, আর খেতেনও বেশ আনন্দ করে। একদিন তাঁকে প্লেটে আইসক্রিম দেওয়া হয়েছে। সেই দেখে তাঁর কী আনন্দ! মজা করে বললেন ঃ "দেখ, এই বস্তুটি ছাড়া আমি দুনিয়ার আর সব কিছুই ত্যাগ করতে পারি।" কখন-কখন স্বামীজীর বন্ধুরা ব্যাঙ্গালোর থেকে টুকরি করে ফল পাঠাতেন। আসামাত্রই সেইসব ঝুড়ি খোলা হতো এবং শুরু হয়ে যেত 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'। উপস্থিত সকলের সঙ্গে স্বামীজী নিজেও সেই ফল খেতেন।

কখন-কখন খুব ভোরে স্বামীজী ক্যাস্‌ল কার্নানের মুখোমুখি সমুদ্রে নেমে স্নান করতেন। কয়েজন ছাত্রও তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতির ঘরে স্বামীজীকে ঘিরে মাঝে মাঝে আড্ডা বেশ জমে উঠতো। সেখানে নানাধরনের আলোচনা হতো। স্বর্গত দেওয়ান বাহাদুর আর. রঘুনাথ রাও এবং আরও কয়েকজন সমাজ-সংস্কারক সেখানে নিয়মিত আসতেন। সেই দলে আমাদের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক এ. সুব্বা রাও ছিলেন। সুব্বা রাও ছিলেন একজন সাচ্চা সমাজ-সংস্কারক এবং অজ্ঞেয়বাদী। স্বামীজী সংস্কারবাদীদের কাউকে কাউকে ভর্ৎসনা করে তাঁদের মত ও পথের ত্রুটি কোথায় তা দেখিয়ে দিতেন। একদিন সুব্বা রাও প্রাচীন ঋষিদের চিন্তাশক্তি ও দর্শন নিয়ে কটাক্ষ করলে স্বামীজী বলে উঠলেন যে, সুদীর্ঘ আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে ঋষিরা কী প্রগাঢ় অনুধ্যান ক্ষমতা ও মানসিক শক্তি আয়ত্ত করেছিলেন তা শ্রীরাওয়ের মতো মানুষের ধারণার বাইরে। তিনি আরও বললেন ঃ "আপনাকে যদি ঋষিদের মতো মাত্র আধ মিনিট চিন্তা করতে বলা হয়, আপনার এই পঞ্চভৌতিক দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

এক সন্ধ্যায় ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য সমিতিতে 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' এই নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার মধ্যে হঠাৎ দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও-এর গম্ভীর মন্তব্য ঃ "আমি তো বরাবর ঠিক এই কথাই বলে আসছি যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে কোনও জাতি, কোনও সম্প্রদায়, এমনকি কোনও মানুষ কখনো বড় হয়নি।" দেওয়ান বাহাদুরের কথা শুনে কয়েকটি ফচকে ছাত্র মুচকি হেসেছিলো।

স্বামীজী তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাও আমাদের বলেছিলেন। বিশেষ করে বলেছিলেন 'অহংকে' সমূলে উৎপাটিত করার জন্য তাঁর আপাত অর্থহীন সুকঠোর সাধনার কথা এবং এমন কিছু কিছু আচরণের কথা যার তাৎপর্য বহু মানুষ, বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা বুঝে উঠতে পারবে না। আমেরিকার সাধারণ শ্রোতাদের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "ওদের কাছে আমার গুরুদেবের সাধন-পদ্ধতির গুহ্য কথা খুলে বললে কি আর রক্ষে ছিল? তাহলে আমাকে তো বটেই, তাঁকেও ওরা হাতের কাছে যে নর্দমা পেত সেখানেই ছুঁড়ে ফেলে দিত।"

সাধারণ মানুষের ওপর হিন্দু ও খ্রীস্টধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "আপনারা যদি আমার মতো ইউরোপ-

আমেরিকার বস্তিগুলোয় একবার ঘুরতেন তো দেখতে পেতেন সেখানকার মানুষগুলি যেন পশুর পর্যায়ে নেমে এসেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের সাধারণ দেশবাসীদের তুলনা করলে তফাতটা কোথায় বুঝতে পারতেন, আর তাহলে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আপনাদের সব সন্দেহ, সংশয় নিমেষে দূর হয়ে যেত।"

(বেদান্ত কেশরী, মে ১৯২৭)

এস. ই. ওয়াল্ডো

স্বামী বিবেকানন্দের মাদ্রাজী শিষ্যেরা যখন স্থির করলেন তাঁরা টাকা তুলে স্বামীজীকে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের আসন্ন শিকাগো বিশ্বমেলায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠাবেন, তখন তাঁরা সঠিক জানতেন না ধর্মমহাসভা ঠিক কবে থেকে শুরু হবে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কয়েক মাস আগেই স্বামীজী শিকাগো পৌঁছে গেলেন। তখন বসন্তকাল। সেখানে গিয়ে স্বামীজী যখন জানতে পারলেন, আরও কতদিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে তখন তিনি খুবই চিন্তিত ও বিরক্ত হলেন; কারণ এমনিতেই যথেষ্ট অর্থ নিয়ে তিনি যাত্রা করেন নি, আর শিকাগোয় এসে দেখলেন তাঁর তহবিল প্রায় নিঃশেষিত। বস্তুত খরচপত্রের ব্যাপারে তিনি যেসব ভ্রমণসঙ্গীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন, তাঁদের ভুল পরামর্শে কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর পকেট হালকা হয়ে এল। এই অচেনা-অজানা বিদেশ-বিভুঁইয়ে তাঁর ব্রত সফল হওয়ার আগে পর্যন্ত এই যে দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময়, এতগুলি দিন তিনি যে কিভাবে নিজের খরচ চালাবেন, সেটাই হয়ে দাঁড়ালো এক মস্ত সমস্যা। তিনি বস্টনে গিয়ে পড়লেন এবং প্রায় ঠিকই করে ফেললেন—আর না, ঢের হয়েছে; এবার ভালয় ভালয় দেশে ফিরে যাব। কিন্তু না, তাঁর এমনই আকর্ষণ, তাঁর এমনই মধুর ব্যক্তিত্ব যে, অবিলম্বেই তাঁর বেশ কিছু বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী জুটে গেল; আত্মবিশ্বাসে আবার তিনি জ্বলে উঠলেন।

হার্ভার্ড কলেজের এক অধ্যাপক ও তাঁর পরিবারের সকলেই স্বামীজীকে খুব আদর-যত্ন করেছিলেন। হার্ভার্ডের ঐ অধ্যাপক[১] স্বামীজীকে বললেন—আসন্ন ধর্মমহাসভায় বলার উদ্দেশ্যেই যখন আপনি এতদূর এসেছেন, তখন আপনার ঐ লক্ষ্যে অবিচল থাকুন। সহৃদয় ঐ বন্ধুর সুপরামর্শেই স্বামীজী শিকাগোয় ফিরে যান এবং এরপর যাঁরাই ধর্মমহাসভায় তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন তাঁদের হৃদয়পটে স্বামীজীর অভূতপূর্ব সাফল্যের স্মৃতি আজও অম্লান। তাঁর সুরেলা কণ্ঠে প্রথম কয়েকটি শব্দ উচ্চারিত হওয়ামাত্রই সভাগৃহ করতালির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। সে যেন একটা ঝড়! অথচ আশ্চর্য, সেই ছিল স্বামীজীর জীবনের প্রথম বক্তৃতা! সেদিনের সভায় উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার মধ্যে একজনও এই সত্যটি আঁচ করতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ।

---

১ আসলে ঐ অধ্যাপক অন্যত্র থাকতেন, কিন্তু স্বামীজীকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। —প্রকাশক

যেমন ঝরঝরে চোস্ত ইংরেজিতে তাঁর অনর্গল বলা, তেমনই সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত তাঁর বাচনভঙ্গি। এসব দেখেশুনে সকলেই ধরে নিয়েছিলেন স্বামীজী নিশ্চয় একজন অসাধারণ অভিজ্ঞ বক্তা। কোনও সন্দেহ নেই, সেদিন তাঁর ভিতর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তা ও শক্তিই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল!

ধর্মমহাসভা সাঙ্গ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্বামীজীর কাছে বহু লোভনীয় সব প্রস্তাব আসতে লাগলো। তিনিও তখন ভারতে তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইদের আর্থিক সাহায্য পাঠানোর জন্য এমনই ব্যাকুল যে, শেষপর্যন্ত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের (লেকচার ব্যুরোর) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে একের পর এক বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি অনুভব করলেন, এই কাজ, এই জীবিকা তাঁর জন্য নয়। একে তো পাঁচমিশালি শ্রোতাদের সামনে মন খুলে প্রাণের কথাগুলি বলতে না পারার ব্যথা, অন্যদিকে বিরামহীন ছোটাছুটির ঝক্কি—এ দুটোই ধ্যানপ্রবণ বিবেকানন্দের কাছে বোঝার মতো মনে হতে লাগলো। পরবর্তী কালে যে বিবেকানন্দকে আমরা দেখেছি, এই সময়ের বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অনেক তফাত। তাঁর দু-চোখে তখন কত স্বপ্ন, কী নিবিড় ধ্যানতন্ময়তা, কী আত্মসমাহিত ভাব! মাঝে মাঝেই ভাবনার গভীরে তিনি এমন ডুবে যেতেন যে, চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পর্কে যেন তাঁর কোনও হুঁশই থাকতো না। কিন্তু ধীরে ধীরে পাশ্চাত্যের বহির্মুখী চিন্তাতরঙ্গের নিরন্তর অভিঘাতে, অগণন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং তুমুল বৌদ্ধিক সংঘর্ষের ফলে বিবেকানন্দের ভিতর জেগে উঠলো এক স্বতন্ত্র শক্তি যা তাঁকে এই জগতের বাস্তব ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কেও অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক করে তুললো।

কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী 'লেকচার ব্যুরো'-র সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এতে তাঁর দারুণ আর্থিক ক্ষতি হলো বটে, কিন্তু বিনিময়ে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর স্বাধীনতা। এবার তিনি নিউইয়র্কের পথে পা বাড়ালেন। শিকাগোর এক বন্ধুর অনুপ্রেরণায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি এই ব্যস্তসমস্ত, কর্মচঞ্চল মহানগরীতে এসে পৌছান। কিছুদিন পাশ্চাত্যে থাকার ফলে স্বামীজী নিজেও এটি নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, আমেরিকার অনেকেই সনাতন ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসু; তিনি আশা করেছিলেন, নিউইয়র্কে এই রকম কিছু মানুষের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হবে।

নিউইয়র্কে এসে স্বামীজী কয়েকটি বক্তৃতা দিলেও পাকাপাকিভাবে কোনও

কাজ শুরু করতে পারেননি। না পারার কারণ, তাঁর তখন থাকার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। কখনো এ বন্ধুর বাড়ি, কখনো ঐ বন্ধুর বাড়ি—এইভাবেই চলছিল। ঐ বছরই গ্রীষ্মকালে স্বামীজী নিউ ইংল্যাণ্ডের গ্রীন একারে গিয়ে দুই-এক সপ্তাহ কাটান। গ্রীন একারে তখন মিস ফার্মারের উদ্যোগে একটি সম্মেলন বা আলোচনাচক্রের তোড়জোড় চলছে। পরে সেখানে ডঃ লিউইস্ জি. জেনস্-এর পরিচালনায় তুলনামূলক ধর্মশিক্ষার একটি স্কুলও গড়ে ওঠে এবং সেই সুবাদেই পরে 'গ্রীন একার কনফারেন্স'-এর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ডঃ জেনস্ খুব উদারভাবের মানুষ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি বহু বছর ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি পদেও বৃত ছিলেন।

নিউ ইংল্যাণ্ড থেকে স্বামীজী নিউইয়র্কে ফিরলেন। তখন শরৎকাল। সেখানেই একদিন এক বন্ধুর বাড়ির বৈঠকখানায় ভাষণ দিতে গিয়ে ডঃ জেনস্-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। প্রথম আলাপেই স্বামীজী যে প্রতিভাধর এবং অসামান্য চরিত্রের মানুষ ডঃ জেনস্ তা বুঝতে পেরেছিলেন। আলাপ হওয়ামাত্রই তিনি ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। কালে দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং সে অন্তরঙ্গতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

ব্রুকলিনে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা ১৮৯৪-এর ৩০ ডিসেম্বর। বক্তৃতাটি হয়েছিল পাউচ ম্যানসনে। অসাধারণ বক্তৃতা। ধর্ম বিষয়ে উৎসাহী বহু বিদগ্ধ মানুষ যাঁরা সেদিনের বক্তৃতা শুনেছিলেন তাঁরা মুগ্ধ ও চমৎকৃত না হয়ে পারেন নি। ফলে ঐ একই জায়গায় এবং ব্রুকলিনের অন্যত্রও স্বামীজীকে পরপর বেশ কয়েকটি ভাষণ দিতে হয়। বাস্তবিক, তখন থেকেই আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে স্বামীজীর প্রকাশ্য কর্মযজ্ঞের শুরু। এই সময়ে তিনি নিজের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করে সেইখানেই প্রতি সপ্তাহে কয়েকটি ক্লাস নিতেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যেমন তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হলো, অন্যদিকে তাঁর মুখ থেকে ভারতের সনাতন শিক্ষা ও উদার পূর্ণাঙ্গ দর্শনের বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল মানুষ দলে দলে তাঁর ক্লাসে এসে জুটতে লাগলেন। তাঁদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা পরমতসহিষ্ণু ভারতাত্মার সেই সর্বজনীন মহৎ অভীমন্ত্র শোনার—যা উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে বলে—মুক্তিতে সকলেরই অধিকার এবং সব ধর্মমতই সত্য, কারণ তা মানুষকে ক্রমাগতই উচ্চ থেকে উচ্চতর অধ্যাত্ম উপলব্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

নিউইয়র্কে স্বামীজী ঐ সময়ে খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। একখানি ছোট

ঘর, সেখানেই তাঁর সবকিছু। ঐ ঘরখানিতেই তিনি ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন। প্রথম প্রথম বক্তৃতায় তিন-চারজনের বেশি লোক হতো না। কিন্তু ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগলো, এমন আশ্চর্যরকমভাবে বাড়তে লাগলো যে, ঘরে আর লোক ধরে না। একেবারে উপচে-পড়া ভিড়। কিন্তু ঐ 'ঠাঁই-নাই-ঠাঁই-নাই' অবস্থাতেই ঘরটিকে ছবির মতো সুন্দর দেখাত। স্বামীজী সর্বদা মেঝেতেই বসতেন, অধিকাংশ শ্রোতাও তা-ই; কেউ কেউ আবার জায়গার অভাবে মার্বেল-এ মোড়া ড্রেসিং টেবিলের ওপর চড়ে বসতেন। সোফার হাতল, এমনকি ঘরের কোণের ওয়াশস্ট্যাণ্ডটিও রেহাই পেত না। এককথায়, যে যেখানে পারতেন বসে পড়তেন। দরজা খোলাই থাকত; ঘরে যাঁদের জায়গা হতো না বা যাঁরা পরে আসতেন, তাঁরা হল-এ অথবা সিঁড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসতেন। আহা! প্রথমদিকের সেই ক্লাসগুলির কথা মনে পড়লে আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে। স্বামীজীর সেসব কী মন মাতানো, প্রাণ-কাড়া কথা, কী তার আকর্ষণ! যাঁদের একবার ঐ ক্লাসে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা কি সেই সুখস্মৃতি জীবনে ভুলতে পারবেন? সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করলেও মজ্জাগত আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য স্বামীজীর মুখ-চোখ দিয়ে ঠিকরে বের হতো। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার কী অদম্য উৎসাহ তাঁর! আর স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণীর মতো অনিরুদ্ধ তাঁর কথার প্রবাহ অনুগত ছাত্রছাত্রীদের চেতনার কোন্ সুদূর রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। সমস্ত অসুবিধা ভুলে রুদ্ধশ্বাসে তাঁরা স্বামীজীর প্রতিটি কথা শুনে যেতেন।

এই রকম সাদামাঠা ঘরোয়াভাবেই স্বামীজী নিউইয়র্কে বেদান্ত প্রচারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন। আমার তো মনে হয়, ক্রমবর্ধমান যে ভাবান্দোলন ভবিষ্যতে বৃহত্তর রূপ নেবে, তার সূচনাটি সঠিক ও যথোপযুক্তই হয়েছিল। স্বামীজী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনও পয়সা নিতেন না। তবে তাঁরা স্বেচ্ছায় কিছু চাঁদা তুলতেন; তাই দিয়ে বাড়িভাড়া মেটানো হতো। কিন্তু তাতেও যখন কুলাতো না, তখন স্বামীজী হল ভাড়া করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন লৌকিক দিক নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাতে পয়সা-কড়ি যা উঠতো, তা তিনি ক্লাস চালাবার কাজে খরচ করতেন। তিনি বলতেন, হিন্দু আচার্যরা শিক্ষার্থীদের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করেন; শুধু তা-ই নয়, অক্ষম, দুঃস্থ ছাত্র বা শিষ্যদের সর্বতোভাবে সাহায্য করাকে তাঁরা পরম কর্তব্য বলে মনে করেন। শিষ্যের মঙ্গলের জন্য সম্ভাব্য সবরকম ত্যাগই তাঁরা হাসিমুখে স্বীকার করেন।

ক্লাস শুরু হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তা চলে একটানা

জুন পর্যন্ত। ছোট আকারে শুরু হলেও দিন দিন ছাত্রছাত্রীর ভিড় এমন বাড়তে থাকে যে, অবিলম্বে পুরো একতলার বৈঠকখানা আর তাঁর আশেপাশের জায়গাগুলিও ক্লাসের জন্য নিয়ে নিতে হয়। প্রায় প্রতি সকালেই এবং প্রায়শই সন্ধ্যায় আমাদের ক্লাস হতো। মাঝে মধ্যে রবিবারেও স্বামীজীর বক্তৃতা হতো। এছাড়া যাঁদের কাছে স্বামীজীর বক্তব্য বিষয় একেবারে নতুন এবং কিছুটা খটমট ঠেকতো, যাঁরা আলোচ্য ঐ বিষয়গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা চাইতেন, তাঁদের জন্য স্বামীজী প্রশ্নোত্তরের বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

দীর্ঘ চার মাস একনাগাড়ে বক্তৃতা দেওয়া এবং ক্লাস নেওয়ার পর জুন মাসে স্বামীজী তাঁর এক বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করে পাইন বনের নির্জনতায় কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে পার্সি, নিউ হ্যাম্পসায়ার-এ চলে গেলেন। তবে নিউইয়র্ক থেকে যাওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন ঃ তোমরা, যারা বেদান্ত সম্বন্ধে আরও জানতে চাও, আমার সঙ্গে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক বা সহস্রদ্বীপোদ্যানে দেখা করতে পার। যদি অত দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে পার, তাহলে আমি তোমাদের সাধন সম্পর্কে আরও বিশেষ কিছু উপদেশ ও নির্দেশ দিতে পারি।

স্বামীজীর ক্লাসে যাঁরা নিয়মিত আসতেন, তাঁদের একজনের সহস্রদ্বীপোদ্যানে একটি কটেজ ছিল। তিনি স্বামীজীকে তাঁর অতিথি হয়ে সেখানে গিয়ে থাকবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন—ওখানে গিয়ে আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ যারা সংসারের আর পাঁচটা কৌতূহল থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করে বেদান্তের তত্ত্ব আয়ত্ত করার আকুলতা নিয়ে তিনশো মাইল পাড়ি দিয়ে সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাবে, বুঝবো তাদেরই ঠিক ঠিক আগ্রহ আছে এবং তারাই আমার চেলা হওয়ার উপযুক্ত। স্বামীজী অবশ্য এটা কখনোই ভাবেন নি, এত কষ্ট স্বীকার করে বহু ছাত্রছাত্রী সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাবেন। কিন্তু কেউ গেলে তাকে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

জুন মাসের মাঝামাঝি আমরা ছ-জন কি আটজন সহস্রদ্বীপোদ্যানের ছোট্ট বাড়িটিতে সমবেত হলাম। স্বামীজীও তাঁর প্রতিশ্রুতিমতো ২০ জুন সেখানে পৌঁছলেন এবং থাকলেন একটানা সাত সপ্তাহ। আরও কয়েকজন ছাত্রছাত্রী অবশ্য পরে এলেন এবং গৃহকর্ত্রীকে ধরে আমাদের সংখ্যা দাঁড়ালো বারোয়। স্বামীজীর দেবদুর্লভ সান্নিধ্যে ঐ সাতটা সপ্তাহ থাকার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরা এক অভাবনীয় আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ পেয়ে মনে-প্রাণে ধন্য হয়ে

গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি তাঁদের কাছে চির অক্ষয়, চিরপবিত্র। নিউইয়র্ক থেকে একান্ত অনুগামী ও ভক্তের যে ছোট দলটি সেণ্ট লরেন্সের বুকে ভাসমান ঐ দ্বীপে স্বামীজীর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, সানন্দে যাঁরা তাঁর নিত্য সেবা করতেন, তাঁর বাণী শুনতে শুনতে সকরুণ কৃতজ্ঞতায় যাঁদের হৃদয় দ্রবীভূত হতো, কৃতকৃতার্থ হয়ে যেতেন যাঁরা, তাঁদের কাছে ঐ সময়টি যে কি দিব্য আনন্দ ও প্রশান্তি বয়ে আনতো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। স্বামীজীও আমাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। এক দিব্যভাবের আবেশে তন্ময় ও অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি আমাদের সবকিছু শেখাতেন। আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এতটাই ব্যগ্র ছিলেন যে, রোজ সকালে ঘর-গেরস্থালীর কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁর তর সইত না। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাতের কাজ সেরে আমরা তাঁকে ঘিরে বসতাম, আর একনাগাড়ে দু-ঘণ্টা, কখনো বা তিন ঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী আমাদের বোঝাতেন। ঐ সব কথা তখন আমাদের কাছে একেবারে নতুন ও দুর্বোধ্য; উপদেশগুলি সেই কারণে হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের বেশ দেরি হতো। কিন্তু তার জন্য স্বামীজীর ধৈর্যে বা উৎসাহে কোনও দিন ভাঁটা পড়তে দেখিনি।

বিকেলের দিকে স্বামীজী আমাদের কাছে যেন আরও সহজ হয়ে যেতেন, আরও সহজভাবে কথা বলতেন। আমরা প্রায়শ একসঙ্গে বেরিয়ে অনেকদূর হেঁটে আসতাম। সন্ধ্যা হলে আমরা সবাই ওপরতলার বারান্দায় গিয়ে বসতাম। সেখান থেকে চোখে পড়ত দূরের বিশাল বিস্তীর্ণ নদী আর তার মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত দ্বীপগুলির এক অপূর্ব মনোরম দৃশ্য। মনে হতো বুঝি পটে আঁকা ছবি দেখছি। আর আমাদের কটেজের ঠিক নিচ থেকে শুরু হয়েছে গাছপালায় ভরা ঘন জঙ্গল। হাওয়ায় যখন গাছের মাথাগুলো দুলতো, বারান্দা থেকে আমাদের মনে হতো, হ্রদের জলে যেন কাঁপন লেগেছে আর তার বুক থেকে জেগে ওঠা সবুজ ঢেউগুলি সেণ্ট লরেন্স নদীর নৃত্যরতা নীল জলে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। বারান্দা থেকে কোনও বাড়িঘর দেখতে পেতাম না; শুধু চোখে পড়তো দূরবর্তী দ্বীপের একটি হোটেল আর ঝিকিমিকি নদীর জলে তার আলোর ঝলকানি। ধ্যানতন্ময়, স্তব্ধ প্রকৃতির মাঝে কেবল আমরা ক-জন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান আচার্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার পক্ষে এর থেকে উপযুক্ত পরিবেশ আর কি হতে পারতো!

সান্ধ্য আসরে স্বামীজী যে সরাসরি আমাদের উদ্দেশ্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা

বলতেন, তা নয়। বরং তাঁকে দেখলে মনে হতো, জ্বলন্ত, অগ্নিময়ী ভাষায় তিনি যেন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলে চলেছেন। তেজের সঙ্গে এমন অনায়াসে অনর্গল তিনি কথাগুলি বলে যেতেন যা শ্রোতাদের চিত্তে চিরদিনের জন্য অগ্নির অক্ষরে লেখা হয়ে যেত। পাছে তাঁর চিন্তার স্রোত কেটে যায়, পাছে ঐ অমূল্য কথার একটিও অনবধানতাবশত হারিয়ে ফেলি, সেই ভয়ে আমরা চিত্রার্পিতের মতো বসে শুধু তাঁর কথাগুলি শুনে যেতাম। শ্বাসটি ফেলতাম, তাও কত হিসেব করে!

বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর আমাদের কাছে বলা তাঁর কথার প্রকৃত অর্থ ধীরে ধীরে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হতে লাগলো। আমরাও এখন থেকে তাঁর শিক্ষা মনে-প্রাণে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করায় স্বামীজী আমাদের প্রত্যেককেই কৃপা করে দীক্ষা দিলেন। এখন থেকে সনাতন ভারতের রীতি অনুযায়ী আমাদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তিনি হলেন আমাদের গুরু বা ধর্মপিতা, আর আমরা তাঁর শিষ্য-শিষ্যা। প্রতিষ্ঠিত হলো অধ্যাত্মলোকের মুক্তিপ্রদ সেই বন্ধন যার স্থান বাবা-মা আর সন্তানের যা সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তার চাইতেও অনেক ওপরে। এটা হয়তো একটা কাকতালীয় ব্যাপার, কিন্তু তবু এটা সত্যি যে সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যারাও সংখ্যায় ছিলেন ঠিক বারো।

আমাদের দীক্ষা হয়েছিল সূর্যোদয়ের মুহূর্তে। গ্রীষ্মের সেই সকালটি ছিল অতি সুন্দর। দীক্ষার ব্যাপারটি এত সাদামাঠা, অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ছোট এক-টুকরো হোমের আগুন, সুন্দর কিছু ফুল, আর গুরুদেবের একান্ত গুহ্য কিছু উপদেশ—এই তিনটি জিনিসই ছিল সেদিনের বিশেষত্ব যা আমাদের দৈনন্দিন ক্লাসগুলির থেকে দীক্ষার দিনটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিল। মনের মধ্যে ছবিটি এখনো ভাসছে—যেন এই সেদিনের ঘটনা! সহস্রদ্বীপোদ্যানে যাঁরা ব্রহ্মচারিণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের দেহ গেছে। তৃতীয়জন এখন ভারতে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের যে স্বপ্ন দেখতেন, সেই স্বপ্ন, সেই ব্রত সফল করার কাজে তিনি এখন ব্যাপৃত আছেন, অবশিষ্ট যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই বিগত দশ বছর ধরে একনিষ্ঠভাবে বেদান্ত কাজে নিরত।

আগস্ট মাসে স্বামীজী ফ্রান্সে যান। সেখান থেকে পরে ইংল্যাণ্ডে; উদ্দেশ্য ছিল সেখানে একটি বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করা। অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও

ছাত্রছাত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে আবার তিনি নিউইয়র্কে আমাদের মধ্যে ফিরে এলেন। আবার শুরু হলো তাঁর ক্লাস নেওয়া। সপ্তাহে নটি করে ক্লাস, আর প্রতিটি ক্লাসেই এত ভিড় হতো যে, ঘরে আঁটতো না। এই সময়ে কপালগুণে আমরা একজন অসাধারণ স্টেনোগ্রাফার পেয়ে গিয়েছিলাম। স্বামীজীর জীবন এবং চিন্তা তাঁকে এতদূর মুগ্ধ করেছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বামীজীর অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কুশলী স্টেনোগ্রাফার রূপান্তরিত হন একনিষ্ঠ সেবক ও গুণমুগ্ধ ভক্তে। তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে অক্লান্ত, নিরলসভাবে স্বামীজীর সেবা করতেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এবং পরে ভারতেও গিয়েছেন এবং ঐ সব দেশে স্বামীজীর অমূল্য কথাবার্তা এবং ভাষণগুলি একমাত্র তাঁরই চেষ্টায় লিপিবদ্ধ হয়ে রক্ষা পেয়েছে। নিউইয়র্কে তাঁর পরিশ্রমের ফলে আমরা 'রাজযোগ', 'ভক্তিযোগ' এবং 'কর্মযোগ'-এর মতো তিন-তিনটি অমূল্য গ্রন্থ পেয়েছি। অবশ্য এছাড়াও রবিবার স্বামীজী যে বক্তৃতা দিতেন সেইগুলি নিয়েও কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। এ ব্যাপারেও তাঁর অবদান যথেষ্ট। নিউইয়র্কে 'জ্ঞানযোগ' বিষয়ে বক্তৃতা স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বক্তৃতাগুলির অন্যতম হলেও তা ছাপার অক্ষরে বার হয়নি। 'জ্ঞানযোগ' নামে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্বামীজীর ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষে দেওয়া বক্তৃতাগুচ্ছই স্থান পেয়েছে।[১]

নিউইয়র্কে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী স্বামীজীর শিষ্য হলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন তাঁদের কারো কারো দীক্ষা হয়। ঐ বছরই মার্চে স্বামীজী বস্টন, ডেট্রয়েট এবং শিকাগোয় বক্তৃতা দিতে যান। ম্যাসাচুসেটস্-এর কেমব্রিজেও তিনি বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার মধ্যে ছিল 'হার্ভার্ড অ্যাড্রেস' নামে একটি বিখ্যাত বক্তৃতা যেটি পরে পুস্তিকার আকারে ছাপা হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষে অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

এপ্রিলের মাঝামাঝি স্বামীজী ইংল্যাণ্ডে গেলেন এবং একটানা বেশ কয়েকমাস ওদেশের নানা জায়গায় বক্তৃতা করে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষাশেষি ভারতে ফিরে যান। স্বামীজী ইংল্যাণ্ডে থাকতেই প্রথমে স্বামী সারদানন্দ এবং পরে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী অভেদানন্দ ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং স্বামীজীর কাজে সাহায্য করতে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন

---

১ ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বইটির কথাই এখানে বলা হয়েছে। অদ্বৈত আশ্রম 'জ্ঞানযোগ'-এর ওপর যে বইটি প্রকাশ করেছেন, তাতে স্বামীজীর নিউইয়র্কের ভাষণগুলিও আছে।
—প্রকাশক

ভারতে ফিরে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গী হলেন তাঁরই চিরবিশ্বস্ত স্টেনোগ্রাফার গুডুইন এবং কয়েকজন ইংরেজ শিষ্য-শিষ্যা। ভারতবর্ষে ফিরে স্বামীজী একদিকে যেমন দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অন্যদিকে সমান উৎসাহে বক্তৃতাদিও দিতে লাগলেন। ভারতবর্ষে দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই আজ বই ও পুস্তিকার আকারে পাওয়া যায়।

দু-বছরেরও বেশি অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। বেলুড় মঠে শান্ত পরিবেশে তাই তিনি চুপচাপ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হন। এই বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন ছিল। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী আবার ইংল্যাণ্ডে পাড়ি দিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশি দিন থাকলেন না; চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিউইয়র্কে অল্পদিন থেকে তিনি ক্যালিফর্ণিয়ায় যান। সেখানকার জলহাওয়ার গুণে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হতে থাকায় লস এ্যাঞ্জেলস্ থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তিনি এই সময়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এইভাবেই তাঁর বেদান্ত প্রচারের শুভারম্ভ হয়েছিল। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে ক্যালিফর্ণিয়ায় আসেন। বেদান্ত প্রচারের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল স্বামীজীর এক বন্ধু তাঁকে ক্যালিফর্ণিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে বিশাল একটি জমি উপহার দিয়েছিলেন। মাউন্ট হ্যামিলটন-এর ওপর বিখ্যাত যে লিক অবজারভেটরি আছে, ঐ জমি সেই মানমন্দির থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে। ঐখানে পরে 'শান্তি আশ্রম' গড়ে ওঠে। সানফ্রান্সিসকোয় বেদান্ত প্রচারের দায়িত্ব যাঁর ওপর ন্যস্ত, সেই স্বামীজী প্রতিবছর ঐ আশ্রমে এসে মাস কয়েক নির্জনবাস করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ক্লাসের যেসব ছাত্রছাত্রী বেশ কিছুদিন নির্জনে ধ্যান-ধারণায় কাটাতে চান, তাঁরাও আসেন। বড় বড় গাছের তলায় গুটিকয়েক কাঠের ঘর আছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগ তাঁবুতেই থাকেন।

নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের পুনরাগমন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। শিকাগো ও ডেট্রয়েটে পুরনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে, অল্প কয়েকদিন ঐ দুটি জায়গায় থেকে, তবে তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন। নিউইয়র্কে পৌঁছে স্বামীজী যখন দেখলেন শেষ পর্যন্ত বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব একটি বাড়ি হয়েছে, তখন তাঁর কি আনন্দ! ইস্ট ৫৮ নং স্ট্রীটের ঐ বাড়িতে স্বামীজী সাত সপ্তাহ কাটান। এই সময়ে তিনি কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু বক্তৃতা-ফক্তৃতা যেন তাঁর আর মোটেই ভাল লাগছিল না। পুরনো বন্ধু ও

শিষ্যদের দেখার জন্যই বরং তিনি অনেক বেশি ব্যাকুল হয়েছিলেন। তাই বেশিরভাগ সময়ই তিনি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই কাটাতেন, নয়তো বা সাধন বিষয়ে উপদেশ-নির্দেশ দিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের স্বর্ণাভ সেই দিনগুলি যেন আবার ফিরে এল। আর তাতে গুরু এবং শিষ্য, উভয়পক্ষই খুশি। কিন্তু হাতেগোনা সুখের সেই দিনগুলি যেন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল।

সে বছর প্যারিস প্রদর্শনীতে একটি ধর্মসম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা স্বামীজীকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় আগস্ট মাসেই স্বামীজীকে নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করতে হয়। যে শহরে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন—কত বক্তৃতা, কত অধ্যাত্মচেতনার বীজ অকৃপণ হাতে ছড়িয়েছেন—সেই নিউইয়র্কে আর কোনও দিন তিনি ফিরে আসেন নি। অত শীঘ্র জীবনদীপ নিভে না গেলে হয়তো তিনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসতেন; কিন্তু তা তো হবার নয়!

প্যারিসে গিয়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ-পরিচয় হয়, অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও। যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য স্বামীজী এই সময় ফরাসী ভাষাটা চমৎকার রপ্ত করে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সে কিছুদিন থেকে একদল বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজী মিশরের পথে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য, নীলনদের জলপ্রপাত দেখা। স্বামীজী যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় তখন খবর এল, দেশে তাঁর এক বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি ভারতের পথে যাত্রা করেন।

পাশ্চাত্যে যাঁরা স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই স্বামীজীর আর কোনও দিন দেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে চির-জাগরূক হয়ে থাকবে। তিনি আমাদের হৃদয়ে নিত্য বিরাজমান। আমাদের যে পরম কল্যাণ তিনি করে গেছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সে কথা আমরা কোনও দিনও ভুলে যাব না। এই রকম একজন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা, তা বলে বোঝান যায় না। ঠিক ঠিক 'মহাত্মা' বলতে যা বোঝায় স্বামীজী তা-ই ছিলেন এবং যে মহান কর্মব্রত তিনি উদ্‌যাপন করে গেছেন, তার প্রভাব তাঁর স্বদেশবাসীর জীবনে তো বটেই, তাঁর ইউরোপ ও আমেরিকার বন্ধুদের জীবনেও চির-অক্ষয় হয়ে থাকবে। ধন্য স্বামী বিবেকানন্দ! জয় হোক আপনার!

(প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯০৬)

সিস্টার দেবমাতা

রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে। তখনো মিশন সুনির্দিষ্ট কোনও রূপ পায়নি; সবার অলক্ষ্যে শুধু একদল ভবঘুরে সন্ন্যাসীর মনের ভিতর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা হিসাবেই ভবিষ্যৎ মিশনের অব্যক্ত বীজটি পুষ্ট হচ্ছিল। সেই ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীর দল সেই লগ্নে যেন একটি নির্দেশের প্রতীক্ষা করছিলেন, অথচ তাঁরা যে প্রতীক্ষমান সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। বেশ কয়েক বছর পর ঐ দলের একজন আমাকে বলেছিলেন ঃ "আগে যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম আমাদের সামনে সুকঠিন সংগ্রামের দিনগুলি পড়ে আছে, তাহলে কঠোর আত্মনিগ্রহ করে, না খেয়ে দেয়ে দূর দূর দেশ পরিভ্রমণ করে এমন করে শরীরটাকে পাত করতাম না। আমরা ভেবেছিলাম গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী অনাসক্ত, সহজ, সরল সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করাই আমাদের কর্তব্য।"

কিন্তু করণীয় যে আরও অনেক কিছুই আছে সে-ইঙ্গিত প্রথম পান স্বামী বিবেকানন্দ। এটিও আমি জেনেছি আগের সূত্র থেকেই। হিমালয়ের কোলে নির্জন অরণ্যে শুকনো ডালপালা দিয়ে বাঁধা কুঠিয়ায় যেদিন তিনি মরণাপন্ন, সেই সময়ে তাঁর কানে যেন কার শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ঃ "এখন তোমার মৃত্যু হবে না। জগতের জন্য তোমাকে বিরাট কাজ করতে হবে।" অশরীরী এই বাণীর কথা স্বামীজী তাঁর সঙ্গী দুই গুরুভাইকে বলেন। আর তাঁদেরই একজন ঘটনাটি আমাকে বলেন। স্বামীজী বা তাঁর গুরুভাইরা কেমন করে বুঝলেন যে ওটি দৈববাণী? তার উত্তর এই—কালই তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

দৈববাণী যখন সবেমাত্র ফলতে শুরু করেছে, আমার জীবনপথের বৃত্তটিও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই এক মোড় নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিবেকানন্দ-ভাব-জগতের কক্ষপথ স্পর্শ করলো। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের গোটা জুন মাসটাই আমি, আমার মা ও বোনের সঙ্গে বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে শিকাগোয় কাটাই। ভেবেছিলাম, শরৎকালে ধর্মমহাসভা শুরু হলে আবার আমরা শিকাগোয় ফিরে আসবো এবং সব দেখেশুনে জাপান ও প্রাচ্যের পথে রওনা হয়ে যাবো। কিন্তু পথে ঘটলো বিপদ। পরিবারের একজনের মৃত্যুর ফলে ওহিওর ছোট একটি শহরে আমরা

চাটকে যাই। ঐ শহরে পৌঁছবার পর পরই সুইডেনবার্গ সম্প্রদায়ের এক ধর্মযাজক আমাদের একদিন সৌজন্যমূলক নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। শহরে আমরা নতুন—বোধহয় সেই কারণেই নিমন্ত্রণ। সে যাই হোক, আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম এবং ধর্মযাজক নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর মুখখানি উৎসাহ, উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করছে। পরে শুনলাম ধর্মমহাসভা থেকে তিনি সবেমাত্র ফিরেছেন। ফলে সেদিন তাঁর মুখে ধর্মমহাসভার প্রসঙ্গ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা ছিল না।

ধর্মমহাসভার বিভিন্ন অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে প্রতিনিধিদের কে কেমন বলেছেন, সেসব কথাও তিনি আমাদের বললেন। সব বলার পর তিনি বললেন ঃ "জ্ঞানই বলুন, বাগ্মিতাই বলুন, কিংবা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বেই বলুন—একজন বক্তা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। বাছাবাছা দু-তিনজন রোমান ক্যাথলিক প্রতিনিধি ছাড়া তাঁর সাথে অন্য কারো তুলনাই চলে না।" এই পর্যন্ত বলে তিনি থামলেন। কিন্তু কে সেই সৌম্য, অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুপণ্ডিত বক্তা, তাঁর নাম কি, তিনি কোন্ দেশ ও ধর্মের প্রতিনিধি—সেসব কিছুই জানালেন না। খুবই কৌতূহলী হয়ে তাই প্রশ্ন করলাম ঃ "আপনি কার কথা বলছেন, কে তিনি?" যাজক মশাই শান্তভাবে বললেন ঃ "তিনি হিন্দু—তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ।"

ভারতাত্মার বাণী শোনার জন্য আমার মনের জমি যেন তৈরি হয়েই ছিল। কারণ ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে ইতোমধ্যেই আমার অল্পবিস্তর পরিচয় হয়েছে। এডুইন আর্নল্ড-এর 'লাইট অফ এশিয়া' পড়ে আমি ভগবান বুদ্ধের মহান জীবন ও বাণীর কথা জেনেছি। মোহিনী চ্যাটার্জীর ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদও আমি একাধিকবার পড়েছি, বিশেষ করে বাইবেলের সঙ্গে গীতার কোনও কোনও বাণীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তিনি যে পাঠ-নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলিও। তাছাড়া গতবছর শীতে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ইংরেজিতে ম্যাক্সমূলার অনূদিত উপনিষদ্‌গুলি পড়েছি। জায়গায় জায়গায় দাগ দেওয়া জীর্ণ সেই বইটি এখনো আমার কাছে আছে। এইভাবেই আমার মনটি ধীরে ধীরে প্রাচ্যের চিন্তায় অনুভাবিত ও অনুরঞ্জিত হচ্ছিল।

শরৎকালে আমরা আবার নিউইয়র্কে ফিরে এলাম। কিছুদিনের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে শীতও এসে গেল, আমরাও নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু

সুইডেনবার্গ সম্প্রদায়ের ঐ যাজকের কথা কিছুতেই আমার মাথা থেকে গেল না। একদিন ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ দিয়ে হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে যখন 'হল অফ দ্যা ইউনিভ্যার্সাল ব্রাদারহুড'-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, তখন ঐ বাড়ির জানালায় একটা সাদামাঠা বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো— ''আগামী রবিবার বিকেল তিনটেয় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা। বিষয়—'বেদান্ত কি?' এবং পরবর্তী রবিবার স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয়—'যোগ কি?' ''

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের বিশ মিনিট আগে হলে পৌঁছে গেলাম। তখনই দেখি হলটি অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে। হলটি অবশ্য এমনিতে খুব বড় ছিল না—একটা লম্বা সরুগোছের ঘর, তার একদিকে একটা লোক চলাচলের পথ এবং সেখান থেকে শুরু করে অপর প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চগুলি পরপর পাতা। হলের একদিকে একটি নিচু মঞ্চ। তার উপর পড়বার ডেস্ক এবং একটি চেয়ার পাতা। আর হলের পিছনে একটি মাত্র সিঁড়ি। হলটি দোতলায়। তাই বক্তা ও শ্রোতা সবাইকেই ঐ একই সিঁড়ি দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হতো। ঘড়িতে যখন তিনটে তখন দেখি হল কানায় কানায় ভরে গেছে। সিঁড়ি, জানলার চৌকাঠ, রেলিং—কোথাও বাদ নেই। এমনকি একতলার প্রবেশপথেও বহু লোকের জটলা—এই আশায় যে, যদি বক্তৃতার মৃদু প্রতিধ্বনিও বাতাসে ভেসে আসে, যদি দু-একটি কথাও শোনা যায়!

ঠিক এমনি সময়ে সিঁড়িতে যেন কার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ধীর, শান্ত পদবিক্ষেপে কেউ যেন ওপরে উঠে আসছেন। আর কী আশ্চর্য! মুহূর্তের মধ্যে শ্রোতাদের সব কলগুঞ্জন থেমে গেল। রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। তাঁর বাণীর তরঙ্গপ্রবাহে আমার স্মৃতি, স্থান-কাল-পাত্রের যত আপেক্ষিক চেতনা, সব মুহূর্তে কোথায় ভেসে গেল! অসীম শূন্যতার মধ্যে কেবলমাত্র একটি কণ্ঠস্বরই যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আমার তখন মনে হলো হঠাৎ যেন আমার সামনে একটা বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছে, আর তার ভিতর দিয়ে আমি এমন এক রাজপথে এসে পড়েছি যার প্রতিটি ধূলিকণায় অনন্ত প্রাপ্তির ইশারা। সে পথের শেষ কোথায় জানি না; কিন্তু সেই অনন্ত সম্ভাবনা, সেই প্রতুল প্রতিশ্রুতি জ্যোতির অক্ষরে লেখা ছিল তাঁর বাণীমন্ত্রে, তাঁর অপ্রমেয় ব্যক্তিত্বে, যিনি সে-পথের সন্ধান দিলেন। অনন্তের বার্তা নিয়ে ঐতো, তিনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন!

একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম আমি। কিন্তু সব একেবারে চুপচাপ হয়ে যেতে

সংবিৎ ফিরে এলো। চেয়ে দেখি হল একেবারে ফাঁকা। সকলেই চলে গেছেন—আছেন কেবল স্বামীজী এবং মঞ্চের কাছাকাছি আর দুজন। পরে জেনেছিলাম, ওঁরা স্বামীজীর দুই উৎসাহী, অনুগত শিষ্য—মিস্টার ও মিসেস গুডইয়ার। সভায় মিস্টার গুডইয়ার ঘোষকের কাজ করতেন।

যাই হোক, এরপর নিউইয়র্কে দু-দফায় স্বামীজীর সমস্ত ক্লাসে এবং বক্তৃতায় আমি উপস্থিত থেকেছি; কিন্তু কখনো তাঁর ব্যক্তিগত, ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমার হয়নি। কোথায় যেন অদৃশ্য একটা বাধা ছিল! বাধার মূলে কি ছিল? আমার লাজুক স্বভাব? বিদেশীর প্রতি স্বাভাবিক সংকোচ? না কি আমার দিদির গোঁড়ামি? বস্তুত, প্রাচ্য বিষয়ে আমার আগ্রহ বা আমার পড়াশুনা দিদি মোটেই সুনজরে দেখতো না। প্রায়ই সে বলতো, তাঁর ইচ্ছা "দেশের ধর্মচিন্তার মধ্য থেকেই যেন আমি মুক্তির পথ খুঁজে পাই।"

বক্তৃতাদি প্রথম প্রথম ওপরের ঘরে শুরু হলেও দিন দিন ভিড় বাড়তে থাকায় সভা অচিরেই নিচের তলায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি সামলানো গেল না। শেষে স্বামীজী একটা অন্য বাড়ি ভাড়া করে, সেখানেই বক্তৃতা দিতে লাগলেন। বাড়িটা খুব একটা পরিচ্ছন্ন ছিল না। বরং কাছাকাছি আর পাঁচটা মেস-বাড়ির মতোই ম্যাড়মেড়ে ও একঘেয়ে। কিন্তু তাহলে কি হয়, ঐ হতশ্রী বাড়িটিতে স্বামীজীর ক্লাসে যে কত বিচিত্র মানুষের সমাগম হতো তা বলার নয়। সেখানে নবীন-প্রবীণ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ—সবরকম মানুষই আসতেন। বক্তৃতা শুনে চলে যাওয়ার সময় কোনও কোনও কৃপণ-চূড়ামণি যেমন রসিকতা করে চাঁদার বাক্সে দুই-এক আধলা ফেলে যেতেন, তেমনি আবার যাঁরা দিলখোলা দরাজ মনের মানুষ, তাঁরা একটি বা কখনো দু-ডলারও দিয়ে যেতেন। দিনের পর দিন সকলে একই জায়গায় আসতাম। তাই, কথাবার্তা বা অন্যভাবে মেলামেশা না থাকলেও পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর একটি ক্লাসও বাদ দিতেন না। আমরা স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ'-এর বক্তৃতাগুলি মন দিয়ে শুনলাম, শুনলাম 'জ্ঞানযোগ'-এর কথাও। 'রাজযোগ' ও 'কর্মযোগ'ও বাদ গেল না। স্বামীজীর কৃপায় সে পথেও আমরা বিচরণ করলাম। বাস্তবিক, আমরা খুব আক্ষেপ করতাম এই বলে—'যোগ' মাত্র চার রকমের হলো কেন? ছয় বা আট রকমেরও তো হতে পারতো! তাহলে আমাদের কী মজাটাই না হতো। আমরা আরও বেশি স্বামীজীর ক্লাস করার সুযোগ পেতাম!

আমাদের মধ্যে তখন এক অদম্য জ্ঞানের স্পৃহা। আমরা কোনও একটি

বিশেষ মতবাদ বা শাস্ত্রের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলাম না। তাই সকালে হয়তো কোনও একটি বক্তৃতা শুনতে গেলাম, বিকেলে আর একটি; কখন-কখন আবার সন্ধ্যায় তৃতীয় একটি বক্তৃতা শুনতে যেতাম। এইভাবে একের পর এক দর্শন, অধ্যাত্মবিদ্যা ও জ্যোতিযশাস্ত্রের ওপর আমাদের বক্তৃতা শোনার পালা চলতো। আমাদের বহুমুখী আগ্রহ দেখে যে কারোর মনে হতে পারে, আমাদের মনটা ছিল সরষের মতো ছড়ানো, অবিন্যস্ত; কিন্তু সত্যি বলতে কি আমাদের সকলেরই মন স্বামীজীর পায়ে বাঁধা পড়েছিল। সত্যিকারের আনুগত্য বলতে যা বোঝায় তা একমাত্র তাঁর প্রতিই ছিল, কারণ তাঁর মধ্যে আমরা এমন একটি শক্তির প্রকাশ দেখেছিলাম যা অন্য কোনও আচার্যের ভিতর ছিল না। আমাদের চিন্তা, ধর্মবিশ্বাস, প্রত্যয় এ সবকিছুর রূপকার ছিলেন একমাত্র তিনিই। আর এই নির্ভেজাল সত্যটা আমার আইরিশ কুকুরটিও বুঝতো। স্বামীজী যখন তার মাথায় হাত রেখে বলতেন—তুই হলি একজন সত্যিকারের 'যোগী'—তখন সেও একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তো, আর তার সারা শরীর যেন আনন্দে থরথর করে কেঁপে উঠতো।

স্বামীজী যেখানে বক্তৃতা দিতেন, সেখানেই তাঁর কথা শোনার জন্য তাঁর অনুগত দলটি ছুটে যেতেন। এ ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল দেখবার মতো। তাঁরা এমনই নাছোড়বান্দা যে স্বামীজী যদি কখনো আকারে ইঙ্গিতে বলতেন—অমুক দিন ছুটি আছে বা অন্য কোনও কারণে ক্লাস বন্ধ রাখতে হবে, তাহলে তাঁরা তারস্বরে আপত্তি করতেন। হয়তো একজনকে দেখিয়ে স্বামীজীকে বলতেন ঃ এই দেখুন, 'ইনি' প্রাণভরে শুধুমাত্র আপনার কথা শোনার আশাতেই নিউইয়র্কে ছুটে এসেছেন। আবার অন্য আর এক ব্যক্তিকে নির্দেশ করে বলতেন ঃ আর ওঁর কথাটাও একবার ভেবে দেখুন, স্বামীজী। উনি শীঘ্র শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন; আপনার কোনও ক্লাস বাদ যাক, এটা উনি চান না। এইসব নানা অজুহাত দেখিয়ে তাঁরা স্বামীজীকে একটু দম ফেলারও অবসর দিতেন না। ফলে সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে ক্লাস নিতেই হতো। স্বামীজীর ক্লাস করার ব্যাপারে যাঁদের উৎসাহ সর্বাধিক তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা খাতা নিয়ে ক্লাসে আসতেন। আর স্বামীজীর প্রতিটি কথাই তাঁরা পেনসিল দিয়ে খসখস করে খুব দ্রুত লিখে নিতেন। আমি নিশ্চিত যে, পরে যদি কেউ নিউইয়র্কে 'নব্য চিন্তা', দর্শন বা অধ্যাত্মবিদ্যার কেন্দ্রগুলিতে একবার খোঁজ নিতেন, তবে দেখতে পেতেন সবখানেই অল্পবিস্তর বেদান্ত ও যোগের হাওয়া বইছে।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে শীতের শেষ দিকে এবং সারা বসন্তকাল স্বামীজী একনাগাড়ে অক্লান্তভাবে ক্লাস নিতে লাগলেন। আমরাও প্রবল উৎসাহে ক্লাস করে যেতে লাগলাম। তখন আমাদের আর অন্য কোনওদিকেই দৃষ্টি ছিল না; স্বামীজীর শিক্ষা ও বাণীর মর্মমূলে প্রবেশ করাই তখন আমাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীজীর শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই তখন আমাদের জীবন গড়ে উঠছিল, সঞ্চালিত হচ্ছিল প্রতি মুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাস; তাঁর বাণীই প্রেরণা হয়ে আমাদের অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছিল।

কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত ক্লাসের পর ক্লাস, বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলার পর হঠাৎই যেন খেলা ভাঙ্গার দিন এগিয়ে এল। তখন আর মাত্র একটি ক্লাস ও একটি বক্তৃতা বাকি। দেখতে দেখতে কখন যেন শেষ ক্লাসটিও ফুরিয়ে গেল। বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল মনের আকাশ। দরজার কাছে রাখা বাক্সে শেষ পূজার নৈবেদ্যটুকু দিয়ে নীরবে একের পর এক আমরা ঐ জীর্ণ মলিন বাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলাম।

তখনও অবশ্য শেষ রবিবাসরীয় বক্তৃতাটি বাকি। সেটি হয়েছিল ম্যাডিসন স্কোয়ার কনসার্ট হল-এ, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের ঠিক পিছনে। দোতলায় বেশ বড়সড় হল। আর ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনটিও ছিল বিরাট। যেসব অনুষ্ঠানের জন্য অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন হতো—যেমন গাড়ির প্রদর্শনী, সাইকেল প্রতিযোগিতা বা ঘোড়ার খেলা—সেসব তখন ঐ বাগানেই হতো। বাড়িটিকেও তখন খুব বিশাল মনে হতো। কিন্তু পরে নিউইয়র্ক শহর আকারে-আয়তনে বাড়তে থাকায় বাড়িটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। কনসার্ট হলে নানারকম বক্তৃতা তো হতোই, তাছাড়াও বিভিন্ন ক্লাস এবং গানবাজনার দলও হামেশা হলটিকে ব্যবহার করতো। ঐ হল-এ ঠিক কত লোক ধরতো তা আমি বলতে পারব না। তবে স্বামীজীর সমাপ্তি-ভাষণের দিন হলটি কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল; এমনকি দাঁড়াবার মতো একটু বাড়তি জায়গাও সেদিন ছিল না।

আমার ধারণা ঐ দিনই স্বামীজী 'মদীয় আচার্যদেব' শীর্ষক বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। মঞ্চের লাগোয়া দরজা দিয়ে তিনি যখন হল-এ প্রবেশ করলেন, তখন তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ! তখন তাঁর স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের কিছু যেন অভাব, যেন কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি বলতে এসেছেন! বেশ কয়েক বছর পর মাদ্রাজে এসে আমি এর উত্তর খুঁজে পাই, জানতে পারি নিজের গুরুদেব সম্পর্কে কিছু বলতে তিনি সর্বদাই সংকোচ বোধ করতেন।

প্রথম দিকে পরিব্রাজক অবস্থায় যখন তিনি দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি কাউকে নিজের গুরুর নাম পর্যন্ত বলতেন না কারণ তাঁর ধারণা ছিল গুরুর কথা বলার যোগ্যতা তখনো তিনি অর্জন করেননি। কেবল একবার মাদ্রাজে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি দেখে তিনি আর থাকতে পারেন নি; বলে ফেলেছিলেন ঃ "ইনিই আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।" ঐ কটি কথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারায় তাঁর অশ্রু ঝরতে থাকে। তখন আমি না বুঝলেও, এটা ঠিক, এই কারণেই সেদিন বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে তাঁকে এমন দ্বিধাগ্রস্ত লাগছিল।

যাইহোক, সেদিন দীর্ঘ ভূমিকার পর স্বামীজী তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন এবং শুরু করামাত্রই একেবারে মেতে গেলেন। ভাবে তন্ময় হয়ে মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি সিংহবিক্রমে পায়চারি করতে লাগলেন। সেদিন তাঁর বক্তৃতায় একই সঙ্গে অপূর্ব বাগ্মিতা ও প্রগাঢ় অনুভবের যুগ্ম প্রবাহ মিলে খরস্রোতা নদীর মতো বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর মনঃপ্রাণ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে তাঁরা স্থাণুবৎ! বক্তৃতা শেষ হলে অনেকেই চুপচাপ হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আমার কথা কি বলবো! একেবারে উত্থানশক্তিরহিত। স্বামীজীর আঁকা শ্রীরামকৃষ্ণের অপার্থিব দিব্য ছবিটি তখন আমার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে বসেছে। আমি বিহ্বল, অভিভূত! সেদিনই অন্তরে অন্তরে পেলাম বিরাটের আহ্বান এবং সে ডাকে আমিও সাড়া দিলাম।

সেই রবিবারই স্বামীজীর প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। বেশ কিছুদিন ধরেই এক রবিবারের বক্তৃতা পরের রবিবার পুস্তিকা আকারে বিক্রি হয়ে আসছিল। কিন্তু এই প্রথম কর্মযোগ সম্পর্কে দেওয়া বক্তৃতাগুলি একত্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। বইটি একটু ঘনভাবে ছাপা এবং পাতলা হলেও আকারে বড়। পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য বইটির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। তা যাক। পারিপাট্যের বিচারে প্রথম সংস্করণটি নয়ন-মনোহর না হলেও, তখনকার কর্মীরা বইটির জন্য যথেষ্ট গর্ব অনুভব করতেন।

স্বামীজীর নিউইয়র্কে প্রচারের কাজ সমাপ্ত হয় একটি সভার মাধ্যমে। সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একজনের বাড়িতে। তারপর জুন মাসে একদল শিক্ষার্থীর সঙ্গে তিনি সহস্রদ্বীপোদ্যানে চলে যান। সেখান থেকে ইউরোপের পথে পাড়ি দেন আগস্টে। এইভাবে আমাদের শোনার পালা শেষ হলো; শুরু হলো স্মরণ-মনন এবং নিদিধ্যাসনের নতুন অধ্যায়। স্বামীজী চলে যাওয়ার পর যতই আমরা

তাঁর উপদেশগুলি দৈনন্দিন জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি, ততই আমাদের এই অনুভব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে যে, এক প্রবল ধূমকেতু কিছুদিনের জন্য পাশ্চাত্যের আকাশ উদ্ভাসিত করে পুনরায় তার আপন কক্ষপথে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে, পিছনে রেখে গিয়েছে আলোর এক গতিশীল রেখা যার প্রভায় এখনো চতুর্দিক উজ্জ্বল।

নিউইয়র্কে যাঁরা স্বামীজীর ক্লাস এবং বক্তৃতা শুনতে আসতেন, অচিরেই তাঁদের পরিচয় হতো এক লম্বা, সুঠাম, সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রমহিলার সঙ্গে। সর্বদা কর্মতৎপর এই মহিলার সঙ্গে আমাদেরও শীঘ্র আলাপ হলো। জানতে পারলাম ওঁর নাম মিস এলেন ওয়াল্ডো, র‍্যলফ ওয়াল্ডো এমার্সনের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। এও জানলাম ভদ্রমহিলা অতীব বিদুষী এবং কৃষ্টিবান, দর্শন নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। স্বামীজী তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'হরিদাসী'। অত্যন্ত চরিত্রানুগ নাম, সন্দেহ নেই! কেন না সত্যিই ওয়াল্ডো ঈশ্বরের দাসী ছিলেন। তিনি অবিরাম অক্লান্তভাবে স্বামীজীর সেবা করতেন। স্বামীজীর জন্য রান্নাবান্না তো করতেনই, তার সঙ্গে ছিল বই সম্পাদনা ও প্রুফ দেখার কাজ, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া, ডিকটেশন নেওয়া, ছাত্র পড়ানো এবং অতিথি আপ্যায়ন। এক কথায় তাঁকে সবদিকই সামলাতে হতো।

স্বামীজী নিউইয়র্কে এসে এমন তীব্র বর্ণ-বিদ্বেষের মুখে পড়লেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং ধর্মপ্রচারের কাজ শিকেয় ওঠবার জোগাড়! সে এমনই সংকট যে ভালো জায়গায় একটা বাড়ি পাওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। যেখানেই বাড়ির খোঁজে যান, সেখানেই গৃহকর্ত্রীদের এক কথা, এক অজুহাত—এমনিতে স্বামীজীকে ঘর ভাড়া দিতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু সমস্যা অন্যত্র; কোনও এশীয়কে থাকতে দিলেই অন্য বাসিন্দারা সঙ্গে সঙ্গে সরে পড়বেন। এইসব কারণে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে স্বামীজীকে এমন একটি জায়গায় বাড়ি ভাড়া করতে হলো যেখানে না ছিল তাঁর উপযুক্ত পরিবেশ, না ছিল তাঁর প্রতিবেশী হওয়ার মতো উপযুক্ত মানুষ। এই রকম অপরিচ্ছন্ন একটি বাড়িতে একরাত কাটানোর পর স্বামীজী মিস ওয়াল্ডোকে বলেন ঃ "এখানকার খাবারদাবারগুলো বড্ড নোংরা; আমার খাবারটা কি তুমি রেঁধে দিতে পারবে?" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মিস ওয়াল্ডো গৃহকর্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁর রান্নাঘরটি ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে আসেন। এবং পরদিন সকালেই তিনি নিজের বাসনপত্র, রান্নার সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় খাবার জিনিস নিয়ে স্বামীজীর ভাড়াবাড়িতে হাজির হন।

ওয়াল্ডো থাকতেন ব্রুকলিনের শেষপ্রান্তে। সেখান থেকেই নিত্য তিনি স্বামীজীর কাছে আসতেন। তাঁর যাতায়াতের একমাত্র বাহন ছিল টিকিয়ে টিকিয়ে চলা ছ্যাকড়া গাড়ি। একবার ঐ গাড়িতে চাপলে নিউইয়র্ক ৩৮ নং স্ট্রীটে স্বামীজীর বাড়ি পৌঁছতে তাঁর পুরো দু-ঘণ্টা লাগতো। কিন্তু তিনি সেসব গ্রাহ্যই করতেন না। প্রতিদিন সকাল আটটায় বা তারও কিছু আগে তিনি বাড়ি থেকে রওনা দিতেন; ফিরতে ফিরতে রাত নটা-দশটা বেজে যেত। ছুটির দিনে যাত্রাটা উল্টে যেত। অর্থাৎ স্বামীজীই সেদিন ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে ওয়াল্ডোর বাড়ি যেতেন এবং সেদিনের রান্নার ভারটা নিজেই নিতেন। মিস ওয়াল্ডোর সাদামাঠা বাড়িটি খুব চুপচাপ, নির্ঝঞ্ঝাট এবং খোলামেলা হওয়ায় সেখানে গেলে স্বামীজীর ঠিক ঠিক বিশ্রাম হতো। সেখানে গিয়ে তিনি একটা সহজ মুক্তির স্বাদও পেতেন। মিস ওয়াল্ডোর রান্নাঘরটা ছিল বাড়ির একদম ওপরতলায় আর তার ঠিক সামনেই খাওয়ার ঘর। ঘরটিতে খুব আলো-হাওয়া ঢুকত, আর ছোট ছোট টবে লাগানো নানান বাহারী গাছের শোভায় ঘরটি সবুজ হয়ে থাকতো। স্বামীজীর মাথায় প্রায়শই নতুন কিছু রান্নার খেয়াল চাপতো। বিশেষ করে যেদিন তিনি সাহেবী কায়দায় কোনও পদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন, সেদিন এঘর থেকে ওঘরে এমনভাবে ছোটাছুটি করতেন যে দেখে মনে হতো ছোট একটি শিশু যেন মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে।

মিস ওয়াল্ডো পরে আমাকে বলেছিলেন ঃ ‘‘কি আশ্চর্য দেখুন, স্বামীজীর এত কাছে থাকা সত্ত্বেও কোনও দিন সন্ন্যাস নেওয়ার কথা আমার মনে ওঠেনি। তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে যাওয়ার কথাও তেমন করে কোনও দিন ভাবিনি। আমার কেবলই মনে হতো, আমেরিকাই যেন ঠিক ঠিক আমার জায়গা। অথচ এমন কিছুই ছিল না যা আমি তাঁর জন্য না করতে পারতাম। স্বামীজী যখন প্রথম নিউইয়র্কে এলেন, তখন সব জায়গায় তিনি তাঁর কমলালেবু রং-এর আলখাল্লাটি পরে যেতে চাইতেন। ব্রডওয়ের মতো জায়গায়, ভেবে দেখুন, ঐ রকম আগুনের মতো উজ্জ্বল কোট পরা একজন লোকের পাশে পাশে হেঁটে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। স্বামীজী তো সদাশিব। তাঁর তো কোনওদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই! মরণ হতো আমার! তিনি যখন আপন মনে রাজার মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার আগে আগে হেঁটে যেতেন, তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমার দম প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। তখন রাস্তার প্রতিটি মানুষ আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকাতো আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো, ‘এরা আবার কারা? কোথা থেকে এল?’ শেষে আমি অনেক

বলা-কওয়ার পর রাস্তাঘাটে বেরোবার সময় তিনি হালকা রং-এর পোশাক পরতে রাজি হয়েছিলেন।"

একদিন সকালে স্বামীজী দেখেন মিস ওয়াল্ডো কাঁদছেন। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি হয়েছে এলেন? কাঁদছ কেন?" ওয়াল্ডো বললেন ঃ "আমার মনে হয়, আমি কিছুতেই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। অন্য কেউ আপনাকে বিরক্ত করলেও আপনি ঠিক আমাকেই বকেন।" সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ "অন্য লোকদের বকবো কি করে? আমি তো তাদের ভাল করে জানি না। আর ওদের কিছু বলতে পারি না বলেই তো তোমায় এত বকাঝকা করি। তা যদি আপনার জনকেই বকতে না পারি তো আর কাকে বকবো বল?" ব্যস, ঐ কথা শোনামাত্র চোখের জল মুছে ফেললেন ওয়াল্ডো । এই ঘটনার পর থেকে মিস ওয়াল্ডো স্বামীজীর একটু বকুনি খাওয়ার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই তিরস্কারই স্বামীজীর ভালবাসার প্রকাশ।

মিস ওয়াল্ডো আমাকে বলেছেন, এ তাঁর নিজের জীবনেরই ঘটনা। রোমাঁ রোলাঁর মতে অবশ্য ঘটনাটি আর এক শিষ্যের জীবনে ঘটেছিল। হয়তো উভয়ের ক্ষেত্রেই ঐ ঘটনা ঘটেছে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তো খুবই স্বাভাবিক।

আচার্যদের সম্বন্ধে মিস ওয়াল্ডোর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। কারণ পরম সত্যের খোঁজে দীর্ঘকাল তিনি অনেকের কাছেই গিয়েছেন। কিন্তু কারও মধ্যেই তিনি আপন আদর্শের পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পাননি। প্রত্যেকের ভেতরই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা তাঁর চোখে পড়েছে। স্বামীজী সম্পর্কেও প্রথম দিকে তাঁর আশাভঙ্গের আশঙ্কা ছিল, তাঁর ভয় ছিল একদিন না একদিন এই হিন্দু সন্ন্যাসীর চরিত্রের কোনও খুঁত হয়তো তাঁর নজরে পড়বে। তাই স্বামীজীর প্রতিটি আচার-আচরণ তিনি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন; দেখতেন, কোনও দোষ বা দুর্বলতা খুঁজে পাওয়া যায় কি না। একদিন তিনি স্বামীজীর মধ্যে তেমন-কিছু পেয়ে গেলেন।

একদিন মিস ওয়াল্ডো এবং স্বামীজী নিউইয়র্কের একটি বাড়ির বৈঠকখানায় বসেছিলেন। স্বামীজী যে সময়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখনকার সেই নিউইয়র্কের সঙ্গে এখনকার নিউইয়র্কের অনেক পার্থক্য। তখনকার দিনে নিউইয়র্কের রাস্তার দু-ধারে দেখা যেত সারি সারি বাদামি রং-এর পাথরের বাড়ি। বাড়িগুলো এতই একঘেয়ে এবং একই ধরনের যে, একবার এক বিখ্যাত বিদেশী শিল্পী তো বলেই বসলেন ঃ "আচ্ছা, তোমরা কি করে তোমাদের বাড়ি

খুঁজে পাও বল দেখি? নিজের বাড়ি ঢুকছো ভেবে তোমরা তো প্রতিবেশীর বাড়িতেও ঢুকে পড়তে পার, তাই না?"

এই অপ্রশস্ত উঁচু বাড়িগুলোর একতলায় একটা করে সরু অথচ লম্বা বৈঠকখানা থাকতো। ঘরের একদিকে থাকতো ভাঁজ করা যায় এমন উঁচু দরজা, আর একদিকে থাকতো দুটো বড় বড় জানলা; আর দুয়ের ঠিক মাঝে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু বিশাল এক আয়না। মনে হলো আয়নাটি যেন স্বামীজীর খুব মনে ধরেছে। কারণ বারবার তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখছেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে খুব চিন্তান্বিতভাবে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করছেন। উদ্বিগ্ন ওয়াল্ডোর দৃষ্টি স্বামীজীকে অনুসরণ করতে থাকে। স্বামীজীর কাণ্ড দেখতে দেখতে তিনি ভাবতে লাগলেন ঃ "হিন্দু সন্ন্যাসী, এতদিনে তুমি ধরা পড়লে! তোমার তো দেখছি বেশ ভালরকমই অহংকার আছে!" মিস ওয়াল্ডো যখন মনে মনে এই রকম ভাবনার জাল বুনে চলেছেন, এমন সময় বিদ্যুদ্বেগে স্বামীজী তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন ঃ "কী আশ্চর্য, দেখ এলেন! আমার চেহারাটা আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারছি না। আয়নায় এতবার করে নিজেকে দেখছি, কিন্তু যেই মুখ ফেরাচ্ছি অমনি আমাকে যে কেমন দেখতে সেটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছি।"

'রাজযোগ' বইটির কাজ স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকায় থাকতে থাকতেই শেষ হয়। বই-এর অধিকাংশ স্বামীজী মুখে বলে যেতেন, আর মিস ওয়াল্ডো লিখে নিতেন। এই লেখার কাজটুকু করে ওয়াল্ডো বিশেষ এক ধরনের তৃপ্তি পেতেন এবং সেই সুখস্মৃতির ঝাঁপি তিনি আমাদের কাছে মাঝে মাঝেই খুলে ধরতেন। স্বামীজীর খাবারদাবার তৈরি করে, রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে প্রতিদিন তিনি বাড়ির পিছনদিকের যে ঘরে স্বামীজী থাকতেন, সেখানে চলে আসতেন। ঘরে ঢুকে দোয়াত-কলম সাজিয়ে তিনি সোজা লেখার টেবিলে বসে পড়তেন। তারপরই শুরু হয়ে যেত স্বামীজীর বলা, আর তাঁর ঝড়ের বেগে একটানা লিখে যাওয়া। থেকে থেকে স্বামীজী এমন তোড়ে বলতেন যে ওয়াল্ডোর কলমের কালি শুকোতে পেত না। কখন-কখন কোনও একটি সূত্রের সংস্কৃত শব্দের জুতসই ইংরেজি প্রতিশব্দ না পেয়ে স্বামীজী পনের কুড়ি মিনিট চুপচাপ আত্মগতভাবে বসে থাকতেন। কিন্তু মিস ওয়াল্ডোর নিস্তার ছিল না। তাঁকে দোয়াতে কলমটি ডুবিয়ে তৈরি থাকতেই হতো, কারণ ঠিক কোন্ মুহূর্তে ভাব-মন্দাকিনী কল-কল-নিনাদে পুনঃপ্রবাহিত হবে, কে জানে!

পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেলে সেটি ছাপানোর দায়িত্ব পড়লো মিস ওয়াল্ডোর ওপর। কিন্তু বই তিনি চট্ করে প্রকাশ করতে পারলেন না; বরং এর জন্য তাঁকে অনেক দুঃখ, অনেক মর্মবেদনা সহ্য করতে হয়েছিল। স্বামীজীর আর এক একনিষ্ঠ ভক্ত পাণ্ডুলিপিখানি মিস ওয়াল্ডোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে লণ্ডনে চলে যান এবং সেখান থেকেই বইটি প্রকাশ করেন। তিনি ভেবেছিলেন ইংল্যাণ্ড থেকে বইটি প্রকাশিত হলে স্বামীজীর কাজের খুব সুবিধা হবে। কাজে-কাজেই তখনকার মতো 'রাজযোগ'-এর মার্কিন সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। পরে অবশ্য শব্দপঞ্জি এবং অন্যান্য কিছু তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে বইটি আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(প্রবুদ্ধ ভারত, এপ্রিল এবং মে ১৯৩২)

কর্ণেলিয়া কোঙ্গার

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কলম্বিয়া প্রদর্শনীর সময় শিকাগোতে যে ধর্ম্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয় তার কিছু আগেই বিভিন্ন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের স্থানীয় সভ্যরা অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণাবশেই ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধিদের স্ব-গৃহে অতিথিরূপে পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই দলে আমার দিদিমা, মিসেস জন. বি. লায়ন-ও ছিলেন। আমার দাদু দর্শন খুব ভালবাসতেন, কিন্তু গোঁড়ামি একেবারে দেখতে পারতেন না। আমার দিদিমা সেইকথা মনে রেখেই ধর্ম্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের বলেছিলেন, যদি তাঁরা উদারমনা একজন প্রতিনিধিকে তাঁদের বাড়িতে পাঠান তো খুব ভাল হয়।

আমাদের বাড়ির ঠিকানা ছিল ২৬২ মিশিগান অ্যাভেনিউ। পুরনো ধাঁচের কাঠের ফ্রেম দেওয়া জলপাই রং-এর বাড়ি, কিন্তু ছবির মতো সুন্দর। সামনের দিকে লাল ফুলে ভরা জেরানিয়াম গাছগুলি কাঠের বাক্সে পরিপাটি করে সাজানো থাকতো। দাদু আর দিদিমা এমনিতেই ছিলেন খুব অতিথিপরায়ণ। সেবার গ্রীষ্মে তাই আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি। বিশ্বমেলার আকর্ষণ ও উত্তেজনায় মফস্বল থেকে আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা সব একেবারে ঝেঁটিয়ে এলেন। ফলে, আমরা যখন খবর পেলাম ধর্ম্মমহাসভার মহামান্য অতিথি অমুক দিন সন্ধ্যায় আসবেন, তখন আমাদের বাড়িতে এত লোক যে দিদিমা তাঁর বড় ছেলেকে এক বন্ধুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন, আর ছেলের ঘরখানি নতুন অতিথির জন্য রেখে দিলেন। আমরা শুধু এইটুকু জানতাম, একজন অতিথি আসছেন এবং আমাদের ফার্স্ট প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের একজন সদস্য মাঝরাতে তাঁকে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবেন। কিন্তু তিনি কে, বা কোন ধর্মের প্রতিনিধি—সেসব কথা আমরা কিছুই জানতাম না।

সে যাই হোক, রাত গভীর হতে একে একে বাড়ির সবাই যে যাঁর মতো শুয়ে পড়লেন। ঘুম নেই কেবল দিদিমার চোখে; তিনি ঠায় জেগে রইলেন কখন তাঁর অতিথি আসবেন সেই প্রতীক্ষায়। অবশেষে এক সময়ে দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। দিদিমা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। সেদিন তাঁর দরজার সামনে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর পরনে লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা, কোমরে গৈরিক চাদর জড়ানো, মাথায় একই রং-এর পাগড়ি। দিদিমার চোখে অপার বিস্ময়! তাঁর বিস্ময়ের কারণ, এর আগে সম্ভবত তিনি

কোনও ভারতীয়কে দেখেন নি। যাইহোক, দিদিমার আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। স্বামীজীকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর নির্দিষ্ট ঘরটি দেখিয়ে দিলেন। এরপর নিজে গেলেন শুতে। কিন্তু মনে রইলো একটা দুশ্চিন্তা। দিদিমার দুশ্চিন্তার কারণ আমাদের বাড়িতে সেই সময় এমন কিছু অতিথি ছিলেন যাঁদের নিবাস আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে। এবং দক্ষিণেরই লুইসিয়ানা নামক রাজ্যের 'বেয়ু টেশ' অঞ্চলে আমাদের আখের ক্ষেত ছিল। ঐ সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। বর্ণবিদ্বেষী ঐ দক্ষিণীরা সাদা চামড়ার লোক ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মেলামশা পছন্দ করতেন না। এবং তাঁদের উদ্ভট ধারণা, যারা শ্বেতাঙ্গ নয় তারা সকলেই মানসিক ও সামাজিক বিচারে অতীতের নিগ্রো ক্রীতদাসদের সমগোত্রীয়। যদিও দিদিমার কোনও বর্ণবিদ্বেষ ছিল না এবং ভারতীয়রা যে আমাদের মতোই আর্যবংশোদ্ভূত সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল।

পরের দিন সকালে দাদু ঘুম থেকে উঠলে দিদিমা তাঁকে সমস্যার কথাটি জানালেন এবং বললেন ঃ স্বামীজী এবং আমাদের দক্ষিণী বন্ধুদের একসঙ্গে রাখাটা খুব সুবিধে হবে কি না তুমি ভেবে দেখ। যদি সে রকম বোঝ, স্বামীজীকে আমাদের অতিথি হিসাবে বাড়ির কাছে যে নতুন অডিটোরিয়াম হোটেলটি হয়েছে, সেখানেও রাখতে পারো।

প্রাতরাশের প্রায় আধঘণ্টা আগে ফিটফাট হয়ে দাদু খবরের কাগজ পড়বেন বলে লাইব্রেরিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্বামীজীকে প্রথম দেখলেন এবং জলখাবার দেওয়ার আগেই দিদিমার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ "তোমায় সত্যি বলছি এমিলি, আমাদের সব অতিথি যদি এখান থেকে চলেও যান, তাহলেও আমার বিন্দুমাত্র আসে যায় না। এ যাবৎ আমাদের বাড়িতে যত লোক এসেছেন তাঁদের মধ্যে ভারতবর্ষের এই মানুষটি সর্বোত্তম। এত বুদ্ধি, এত আকর্ষণ আমি আর কারও মধ্যে দেখিনি। যতদিন খুশি উনি এখানে থাকুন।"

দু-জনের মধ্যে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সেই শুরু। কালে সেই সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তারই আভাস মেলে স্বামীজীর কথায়। একদিন স্বামীজী 'শিকাগো ক্লাবে' দাদুর বন্ধুদের সামনে বলে ওঠেন ঃ এ পর্যন্ত এখানে আমার যত মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্রীস্টসদৃশ ব্যক্তি হলেন মিস্টার লায়ন!' স্বামীজী শান্তভাবেই মন্তব্যটি করেন, কিন্তু দাদু পড়লেন মহা অস্বস্তিতে।

দিদিমার কাছে স্বামীজী খুব সহজ ছিলেন; তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতেন নিজের

মাকে। দিদিমা ছিলেন এমনিতে ছোটখাট মানুষ। কিন্তু সবসময় সোজা, টানটান হয়ে চলতেন। সেই চলনে একটা অকৃত্রিম, নীরব আভিজাত্য ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠত। দিদিমার উপস্থিত বুদ্ধি ও রসবোধও ছিল দেখবার মতো। গম্ভীর মুখে এমন মজা করতেন যে, স্বামীজীও তা উপভোগ করতেন। আমার মা ছিলেন বেশ সুন্দরী। আমার যখন ছ-বছর বয়স তখন বাবা মারা যাওয়ায় আমাকে নিয়ে মা দাদু-দিদিমার কাছে চলে আসেন। সেই থেকে আমরা একসঙ্গেই থাকতাম। দিদিমা এবং মা ধর্মমহাসভার অধিকাংশ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী সেখানে এবং পরে অন্যত্র যেসব বক্তৃতা দেন, তা-ও তাঁরা শুনেছেন। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে মা খুবই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মান হয়ে থাকতেন। মনে আছে, সান্ত্বনা দিয়ে স্বামীজী মাকে সেই দুঃখ অতিক্রম করতে সাহায্য করতেন। পরবর্তী কালে মা স্বামীজীর বই পড়তেন এবং তাঁর উপদেশ অনুসারে চলার চেষ্টা করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বলতে, আমাদের বাড়িতে তাঁর অতিথি হয়ে আসার ছবিটিই আমার মনে স্পষ্টভাবে ধরা আছে। সে ছবি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের। কী দীপ্তিমান চোখ! কী মধুর কণ্ঠস্বর! কী প্রাণখোলা হাসি! আর তাঁর উচ্চারণে সেই সামান্য মার্জিত আইরিশ টানটুকু? আর খুব মনে পড়ে, তিনি আমাকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক মজার মজার গল্প বলতেন। তার মধ্যে যেমন সেখানকার বাঁদরের লম্ফঝম্প, ময়ূর ও উজ্জ্বল সবুজ টিয়ার ঝাঁকের সশব্দে উড়ে যাওয়ার বর্ণনা ছিল, তেমনি ছিল সারি সারি বটগাছ, রাশি রাশি সুগন্ধি ফুল, রং-বেরং এর তরতাজা ফলমূল ও সবজিতে ঠাসা হাট-বাজারের দুরন্ত হাতছানি। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হতো যেন রূপকথার গল্প শুনছি। কিন্তু ভারতবর্ষে শত শত মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার পর আজ আমি বুঝেছি, তিনি আমার কাছে যেসব গল্প করতেন, তা তাঁর শৈশবের স্মৃতির রং-এ রাঙানো। স্বামীজী বাড়ি ফিরলেই আমি তাঁর কোলে উঠে পড়তাম আর বলতাম ঃ "স্বামীজী, আমাকে আর-একটা গল্প বলুন।" মনে হয়, স্বদেশ ছেড়ে এতদূরে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি দেশে এসে, একটি শিশুর আদর-আবদারে তিনি যেন অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তিবোধ করতেন। এমনিতে আমাকে তিনি খুবই প্রশ্রয় দিতেন, খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু তবুও, শিশুরা খুব অভিমানী হয় কি না! তাই মনে পড়ে, এক-এক সময় দৌড়ে তাঁর ঘরে যাওয়ামাত্রই বুঝতে পারতাম তিনি ভীষণভাবে একা থাকতে চাইছেন, কোনও গোলমাল তখন তাঁর অভিপ্রেত নয়। এখন বুঝি তিনি তখন ধ্যান করতেন।

মনে পড়ে, তিনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করতেন—অধিকাংশই স্কুলে কি পড়েছি, কি শিখেছি সেইসব কথা। আর একদিন স্কুলের বইগুলো দেখতে চাইলেন। দেখালাম। একটা ম্যাপ ছিল। সেটি খুলে একটি গোলাপি রং-এর জায়গা দেখিয়ে তিনি বললেন ঃ এই দেখ, ভরতবর্ষ। তারপর তিনি ভারতের কত কথাই বললেন। ভারতের ছোট ছোট মেয়েরা আমেরিকার মেয়েদের মতো লেখাপড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না বলে তিনি খুব দুঃখ পেতেন। দীর্ঘকাল পরে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দের মুখ থেকে যখন শুনলাম স্বামী বিবেকানন্দ নিজে কলকাতায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তখন আমার যে কতখানি আনন্দ হয়েছিল তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আমার দিদিমা স্থানীয় নারী-হাসপাতালের অধ্যক্ষা ছিলেন। স্বামীজী খুব আগ্রহ নিয়ে ঐ হাসপাতালটি ঘুরে ফিরে দেখেন এবং ওখানে শিশুমৃত্যুর হার ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি যাবতীয় তথ্য জানতে চান। এই ঘটনা থেকেও বোঝা যায়, আমেরিকায় এসে তিনি কত কি শিখেছিলেন। আর এই সমস্ত উদ্যোগের পিছনে ছিল তাঁর একটাই চিন্তা—এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে দেশের মানুষকে টেনে তোলা যায়। শুনেছি, পরে কলকাতায় একটি প্রসূতি সদনও খোলা হয়। আহা, এ খবর শুনলে আমার দিদিমা যে কত খুশিই হতেন।

তাঁর পাগড়িটি আমার কাছে ভারি বিস্ময়ের বস্তু ছিল। মনে হতো যেন টুপির এক অদ্ভুত সংস্করণ! খুবই মজার জিনিস মনে হতো। হয়তো তার কারণ এই, মাথায় পরার আগে প্রত্যেকবার পাগড়িটি নতুন করে বাঁধতে হতো। আমি তাঁর কাছে বায়না ধরতাম—কেমন করে জড়িয়ে-পেঁচিয়ে আপনি এটা বাঁধেন, একটু দেখাবেন? বলা বাহুল্য, শিশুর আবদার তিনি হাসিমুখে মেনে নিতেন।

আমেরিকার লোকেরা রান্নায় তেল-ঝাল-মশলা কম দেয়। ফলে ভারতীয় খাবারের মতো তা অত মুখরোচক হয় না। এই নিয়ে প্রথম প্রথম দিদিমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তাঁর ভয় ছিল বাড়িতে রাঁধা ঐ-সব খাবার হয়তো স্বামীজীর বিস্বাদ লাগবে। আমাদের বাড়িতে পা দিয়েই স্বামীজী জানিয়ে দিয়েছিলেন, আশ্রয়দাতার গৃহের নিয়মরীতি মেনে চলার শিক্ষাই তিনি পেয়েছেন, আহারের ক্ষেত্রেও সেই কথা। বাস্তবিক, আমরা যা খেতাম, তিনিও তা-ই খেতেন।

দিদিমা বেশ ঘটা করে টেবিলে স্যালাড সাজাতে ভালবাসতেন। তাঁর এক বান্ধবী, লুইসিয়ানার মিসেস ইলহেনি, তাঁকে যে 'টাবাসকো সস্' দিয়েছিলেন,

অন্যান্য মশলার সঙ্গে সেই সস-ও তিনি স্যালাড তৈরির সময় ব্যবহার করতেন। খাওয়ার সময় একদিন স্বামীজীকে সেই সসের বোতলটি দিয়ে দিদিমা বললেন ঃ "স্বামীজী, ইচ্ছে হলে দু-এক ফোঁটা এই সস আপনি মাংসে মেশাতে পারেন।" দিদিমার কথা শেষ হতে না হতেই স্বামীজী দরাজ হাতে ঐ ঝাল চাটনি তাঁর খাবারের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর ঐ কাণ্ড দেখে আমাদের দম যেন বন্ধ হয়ে গেল। বলে উঠলাম ঃ "সর্বনাশ, আপনি এ কি করলেন! ওটা যে বিষ ঝাল!" আমাদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে কেবল একটু মুচকি হেসে, বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগলেন। ঐ ঘটনার পর থেকে দিদিমা সর্বদা ঐ সসের একটি বোতল স্বামীজীর খাওয়ার টেবিলে রেখে দিতেন।

কোনও এক শুক্রবার বিকালে আমার মা স্বামীজীকে 'সিম্ফনি কনসার্ট' শোনাতে নিয়ে গেলেন। সেই তাঁর প্রথম সিম্ফনি কনসার্টে যাওয়া। বাজনা শুরু হলো; স্বামীজীও খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। কিন্তু মা লক্ষ্য করলেন, স্বামীজীর মাথাটি একপাশে হেলে আছে, আর তার মুখে-চোখে যেন এক কৌতুকী জিজ্ঞাসা। অনুষ্ঠান শেষে মা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আপনার ভাল লেগেছে তো?" স্বামীজীর উত্তর ঃ "হ্যাঁ, খুব চমৎকার লাগলো।" মার কিন্তু মনে হলো, স্বামীজী যেন কথাটা ঠিক মন থেকে বললেন না। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি ভাবছেন স্বামীজী?" তখন তিনি বললেন ঃ "দেখুন, দুটি জিনিস আমাকে বড় অবাক করেছে। প্রথমত, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, অনুষ্ঠানসূচীতে কেন ছাপা রয়েছে যে, শনিবার সন্ধ্যায় আজকের অনুষ্ঠানেরই পুনরাবৃত্তি হবে। কই, ভারতবর্ষে তো এ রকম হয় না। সেখানে ভোরের রাগ, দুপুরের রাগ, সন্ধ্যার রাগ—সব আলাদা আলাদা। তাই ভাবছি, আজ বিকালে যে সুর আপনাদের ভাল লাগল, আগামিকাল রাতেও যদি সেই একই সুর বাজানো হয়, তাহলে সেটা কি আপনাদের কানে একই রকম শ্রুতিমধুর ঠেকবে? আমার তো মনে হয়—না। আর একটা অদ্ভুত জিনিস, আপনাদের সঙ্গীতে মূর্ছনার একান্ত অভাব এবং বিভিন্ন স্বরের মধ্যে বড্ড বেশি ফাঁক। আপনার দেওয়া সরেস সুইস পনিরে যেমন অসংখ্য ছিদ্র থাকে, এও যেন অনেকটা তেমনি। অবশ্য, আমার কানে যেমন লেগেছে সে কথাই বললাম।"

স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, তখন শ্রোতারা তাঁকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যেতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, স্বামীজী ভারতে যে কাজ করতে চান সেই কাজে একটু সাহায্য করা। তাঁর তো কোনও মানিব্যাগ ছিল না! তাই রুমালে

বেঁধেই সেইসব টাকাপয়সা তিনি নিয়ে আসতেন, আর বাড়িতে ফিরেই ছোট ছেলের মতো গর্বভরে সেগুলি দিদিমার কোলে ঢেলে দিতেন। দিদিমার কাজ ছিল সেই অর্থ ঠিকঠাক করে রাখা। তিনি স্বামীজীকে বিভিন্ন রকমের খুচরো পয়সা; কোন্‌টার কত মূল্য, এইসব চিনিয়ে-বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কি করে সেগুলো গুণে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখতে হয়, তাও শিখিয়েছিলেন। স্বামীজীকে দিয়ে এক রকম প্রায় জোর করেই তিনি বক্তৃতায় পাওয়া নগদ টাকার হিসাব দিনের দিন লিখিয়ে রাখতেন, আর তাঁর ব্যাঙ্কে ঐ অর্থ স্বামীজীর জন্য জমিয়ে রাখতেন। যাঁরা বক্তৃতার পর অর্থ সাহায্য করতেন তাঁদের বদান্যতায় স্বামীজী অভিভূত হতেন। তিনি ভাবতেন—যারা ভারতবর্ষ কোনও দিন চোখেই দেখেনি, তারাই সেই দেশের মানুষের জন্য হাসিমুখে অর্থ দিচ্ছে!

একদিন তিনি দিদিমাকে ডেকে বললেন ঃ আমেরিকায় এসে একটা মস্ত প্রলোভনে পড়ে গেছি, বুঝলেন? ঠিক এত বড় প্রলোভনের মুখোমুখি আর কখনো হইনি। এই কথা শুনে দিদিমা একটু মজা করে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কে সেই ভাগ্যবতী, স্বামীজী" দিদিমার কথা শুনে স্বামীজী হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন ঃ "না, না, কোনও মেয়ে নয়; আমি ভাবছি একটি সঙ্ঘ গড়ার কথা।" তারপর স্বামীজী বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা কিভাবে পরিব্রাজক অবস্থায় একাকী ঘুরে বেড়ান এবং ধারে কাছে কোনও গ্রাম চোখে পড়লে শান্তভাবে একটি গাছের তলায় বসে অপেক্ষা করেন, যদি কোনও আর্ত বা জিজ্ঞাসু উপদেশ নিতে আসে। স্বামীজী বললেন—কিন্তু আমেরিকায় এসে বুঝলুম, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করলে তা কত বেশি ফলপ্রসূ হয়।

যাই হোক, একটি সুপরিচালিত সঙ্ঘের স্বপ্ন দেখলেও স্বামীজী তখনো ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, ভারতের কাছে তথা ভারতবাসীর কাছে কি ধরনের প্রতিষ্ঠান গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাবে। তাঁর কাছে পাশ্চাত্যের যেসব জিনিস ভাল মনে হতো, সেগুলিকে কিভাবে ভারতের উন্নয়নে কাজে লাগানো যায় তা নিয়েও তিনি বিস্তর চিন্তা করতেন। বেলুড় মঠ এবং তার বহুমুখী সেবার কাজ যে স্বামীজীর ঐ সময়কার চিন্তারই ফলশ্রুতি, সেটি আমার কাছে স্পষ্ট।

আগেই বলেছি স্বামীজীর উচ্চারণে চমৎকার একটু আইরিশ টান ছিল। মনে আছে, স্বামী শঙ্করানন্দকে যখন সে কথা বলি, তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন। আমার দাদু স্বামীজীকে এই নিয়ে ঠাট্টাও করতেন। স্বামীজী বলতেন ঃ আমার অত্যন্ত

প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন একজন আইরিশ। তিনি ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের স্নাতক। হয়তো তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার-সূত্রে এই 'টান'-টুকু আমি পেয়েছি।

স্বামীজী আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর মা ঠিক করলেন ভারতীয় তথা প্রাচ্য দর্শন নিয়ে তিনি কিছু পড়াশোনা করবেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন, একটু পড়াশোনা করে ভিতটা শক্ত করে নিতে না পারলে স্বামীজীর শিক্ষার মর্ম পুরোপুরি বুঝে ওঠা যাবে না। তাই পরের শীতে মিসেস পিক যখন শিকাগোয় ক্লাস শুরু করলেন, মা তখন সেখানে যেতেন। সেই সময়েই মা হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেন যে কুচি কুচি করে ছেঁড়া যে কোনও চিঠির টুকরো হাতের মুঠোয় ধরলে পত্র লেখকের শারীরিক ও মানসিক চেহারাটা নিমেষের জন্য তাঁর মনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে। প্রায় একবছর পর স্বামীজী যখন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আবার শিকাগোয় আসেন, তখন মা তাঁকে তাঁর ঐ অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানান। সব শুনে স্বামীজী বললেন যে, তাঁর নিজেরও ঐ ক্ষমতা ছিল। ছোটবেলায় ঐ ক্ষমতা দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে তিনি খুব মজা পেতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর তিনি তাঁর ঐ প্রবণতা ঘুচিয়ে দিয়ে একদিন বলেছিলেন ঃ "মানুষের মঙ্গলের জন্যই কেবল এই শক্তি খরচ করবি। অন্য কোনও কারণে এই শক্তি ব্যবহার করিস না। যে হাতের এত ক্ষমতা সেই হাতের স্পর্শে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব করাও সম্ভব। এই শক্তি দিয়ে তুই মানুষকে সুস্থ করে তোল।"

দ্বিতীয়বার শিকাগোয় এসে স্বামীজী আমাদের বাড়িতে অল্প কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন নিজের রুচি অনুযায়ী খেলে আর দিনের বেশির ভাগ সময় ধ্যান-জপে কাটাতে পারলে তাঁর ধর্মশিক্ষা-দানের কাজে অনেক বেশি সুবিধা হবে। তাছাড়া, স্বাধীনভাবে থাকলে যাঁরা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আসবেন সেইসব ধর্মজিজ্ঞাসুর সঙ্গে তিনি স্বচ্ছন্দে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলতে পারবেন। এইসব কথা ভেবেই দিদিমা তাঁকে সাধারণ কিন্তু বেশ আরামদায়ক ছোট একটি ফ্ল্যাট খুঁজে দিয়েছিলেন। তবে আমি সে ফ্ল্যাটটি দেখেছি কি না মনে পড়ছে না।

স্বামীজীর আকর্ষণীয় ও অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ বহু মহিলাই যেনতেন প্রকারে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতেন। একে তো তিনি তখনো যুবক, তার ওপর অটল আধ্যাত্মিকতা এবং প্রখর বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে তাঁকে বড়ই উদাসীন ও অনভিজ্ঞ মনে হতো। ঐ সব কারণে দিদিমা বড়ই চিন্তিত হতেন। তাঁর ভয়, পাছে স্বামীজীর কোনও বিপদ হয়, পাছে কোনও

অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর অবস্থায় তিনি পড়েন। স্বামীজীকে এ ব্যাপারে তিনি একটু-আধটু সতর্কও করে দিতেন। তাঁর ঐ উদ্বেগ স্বামীজীকে স্পর্শ করতো, আবার তিনি এতে একটু মজাও পেতেন। একদিন তিনি দিদিমার হাতদুটি ধরে বললেন ঃ "মিসেস লায়ন, প্রিয় আমেরিকান জননী আমার, আমার জন্য আপনি ভয় পাবেন না। এটা সত্যি আমাকে প্রায়ই বটগাছের তলায় শুয়ে, কোনও দয়ালু চাষির দেওয়া দু-মুঠো অন্ন খেয়ে দিন কাটাতে হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও একই রকম সত্য যে, এই আমিই আবার কোনও মহারাজার অতিথি হয়ে বিশাল প্রাসাদে দিনের পর দিন বাস করি আর যুবতী দাসী ময়ূর-পাখা দিয়ে আমাকে সারারাত বাতাস করে। আমার জীবনে অনেক প্রলোভন এসেছে। ওতে আমি বিলক্ষণ অভ্যস্ত। আপনি আমাকে নিয়ে বৃথা চিন্তা করবেন না।"

স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে আমার মনে হলো, মায়ের ছোট বোন অর্থাৎ আমার ছোট মাসী ক্যাথারিনের [মিসেস রবার্ট ডব্লিউ হ্যামিল] সঙ্গে একবার কথা বললে তো বেশ হয়। স্বামীজীর কথা তাঁর হয়তো কিছু মনে থাকতে পারে। দেশে ফিরে তাই আমি মাসীকে জিজ্ঞাসা করলাম—স্বামীজীর কথা তোমার কিছু মনে আছে কি? যদি থাকে তো বল, আমার লেখার সঙ্গে তা যোগ করে দেব।

স্বামীজী যখন আমাদের বাড়িতে অতিথি তখন মাসীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। নিজের নতুন সংসার, থাকেনও অন্যত্র। তাই ঘনঘন বাপের বাড়ি আসা হতো না। তা সত্ত্বেও জানলাম, আমার মতো তাঁরও স্বামীজীর কথা খুবই মনে আছে। তবে স্বামীজীর কোনও বক্তৃতা তিনি শোনেন নি।

আমার মাসী এবং মেসো দুজনেই তখন যাকে বলে একেবারে 'তরুণ বুদ্ধিজীবী'। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু তরুণ অধ্যাপক, কয়েকজন তরুণ সাংবাদিক এবং অনুরূপ কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের নিত্য ওঠাবসা ছিল। রবিবারের এক সান্ধ্য আড্ডায় মাসী তাঁদের কাছে স্বামীজীর গুণাবলী এবং অসাধারণত্বের কথা বলায় তাঁরা মন্তব্য করলেন ঃ আধুনিক বিজ্ঞানী এবং মনস্তত্ত্ববিদরা এক মুহূর্তে ওঁর ধর্মবিশ্বাসের 'মুখোশ খুলে' দিতে পারেন। ওঁদের প্রতিক্রিয়া দেখে মাসী বললেন ঃ "বেশ, যদি আগামী রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে এখানে আনতে পারি, আপনারা সবাই আসবেন তো?" সকলেই রাজি হলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে এক ঘরোয়া নৈশভোজের আসরে স্বামীজী তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। সেই আসরে ঠিক কোন্ কোন্ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, তা

মাসী আমাকে বলতে পারলেন না। তবে এইটুকু তাঁর স্মরণে আছে, সেদিন সন্ধ্যায় নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক জমে উঠেছিল। মাসী আমাকে বলেছেন, প্রাচ্যের প্রচলিত সব ধর্মগুলি যেমন স্বামীজীর নখদর্পণে ছিল, তেমনি অসাধারণ ছিল বাইবেল ও কোরান সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান। আবার সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানও ছিল বিস্ময়কর। যাই হোক, সেদিনের ঐ সান্ধ্য বৈঠক শেষে অবিশ্বাসী, বুদ্ধি-অভিমানীর দল একে একে স্বামীজীর সঙ্গে করমর্দন করে তাঁদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং জানান যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে স্বামীজীর মতেরই জয় হয়েছে। স্বামীজীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব নিয়ে তাঁরা সেদিন যে যাঁর বাড়ি ফিরে যান।

আমাকে যখন স্বামী শঙ্করানন্দের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি মনে মনে খুব সঙ্কুচিত হয়েছিলাম। সঙ্কুচিত এই ভেবে যে, আমার এইসব তুচ্ছ ছেলেমানুষী স্মৃতি কি ছাপার যোগ্য? কাউকে আমার এই স্মৃতিকথা পড়তে দিলে তাঁর মূল্যবান সময়ের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়, এই কথা ভেবে আমার নিজেকে খুব অপরাধী ও ছোট মনে হচ্ছিল। কিন্তু স্বামী শঙ্করানন্দ উদার চিত্তে কৃপা করে আমাকে যা বললেন তা আমি কোনও দিনও ভুলব না। তিনি বললেন—প্রত্যেক মহাপুরুষই যেন একটি মহার্ঘ রত্ন, যার অনেকগুলি দিক থাকে। প্রত্যেকটি দিকই মূল্যবান, কারণ তা মহান চরিত্রের একটি বিশেষ ভাব আমাদের কাছে উন্মোচিত করে। তিনি আরও বললেন, আমি নাকি বিবেকানন্দ-জীবনের তেমনই একখানি অমূল্য প্রেক্ষিত উপহার দিতে এসেছি, যা এতদিন তাঁদের অজানা ছিল। প্রথমবার ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় গিয়ে আমাদের বাড়িতে স্বামীজী যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য এতকাল তাঁদের হাতে ছিল না; সেই অভাব আজ দূর হলো।

অতএব, বহুমুখী বিবেকানন্দ-জীবনের একটি ক্ষুদ্র 'প্রেক্ষিত' উপহার দিয়েই আমি আমার বিবেকানন্দ স্মৃতি-তর্পণ সাঙ্গ করছি। আচার্য বা ধর্মগুরু হিসাবে স্বামীজীকে আমি আমার জীবনে কখনো পাইনি। দীর্ঘ বাষট্টি বছর তাঁকে আমার মনের গভীরে ভালবাসা দিয়ে লালন করেছি বন্ধুরূপে, তুলনারহিত প্রাণবন্ত এক বন্ধুরূপে, যাঁকে আমি শৈশবে আমাদের বাড়িতে কয়েকদিনের অতিথি হিসেবেই শুধু দেখেছি।

(প্রবুদ্ধ ভারত, মে ১৯৫৬)

মার্থা ব্রাউন ফিঙ্কে

কলকাতা দিয়েই আমার ভারত-দর্শন শুরু। সেটা নভেম্বরের গোড়ার দিকের কথা, সালটা ১৯৩৫। তার অনেক আগেই অবশ্য পৃথিবীটা ঘুরে দেখবো বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। আমেরিকা থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিক বরাবর চলতে চলতে কয়েকটি দেশের ভিতর দিয়েই এলাম; কিন্তু কোথাও আমার নিজেকে ট্যুরিস্ট-এর বেশি কিছু মনে হয়নি। শুধু ভারতবর্ষ অর্থাৎ কলকাতার মাটিতে পা দিয়েই মনে হলো, না—আমি তীর্থ যাত্রী। তীর্থযাত্রী হিসেবে কলকাতায় পৌঁছে পরেরদিনই গঙ্গার ওপারে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি-মন্দিরে আমার অন্তরের প্রণামটি নিবেদন করবো বলে ছুটলাম। মঠে গিয়ে অতিথি ভবনের দোতলাতে দেখা হলো স্বামীজীর একান্ত অনুগত বন্ধু মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গে। মঠের বেশ কয়েকজন সাধুরও দর্শন পেলাম। তাঁরা প্রত্যেকেই যখন শুনলেন স্বামী বিবেকানন্দকে আমি চাক্ষুষ দর্শন করেছি, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তখন বহুযুগ আগের সেইসব কথা শোনার জন্য তাঁদের ব্যাকুলতা এবং আগ্রহ লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত হলাম। আমার জীবনে তাঁর সান্নিধ্যের প্রভাব অপরিসীম সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যের কাছেও কি তার কোনও মূল্য থাকতে পারে? তাঁরা অবশ্য আমাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, পুরনো দিনের সেইসব কথা তাঁদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। আজ থেকে সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আগে ঐ মহান পুরুষকে মাত্র দু-দিন দর্শনের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল, সেই স্মৃতিকথা আজ তাই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ বছর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে শিকাগোয় যে বিশ্বমেলা অনুষ্ঠিত হয়, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ধর্মমহাসভাটি ছিল সেই অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গ এবং স্বামী বিবেকানন্দ নামধারী এক অজ্ঞাত, অখ্যাত তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী ঐ মহাসভায় যোগ দিতেই ভারতবর্ষ থেকে ছুটে গিয়েছিলেন। সেই মহাসভায় তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত বিশ্বজনীন বাণীর কথা, উপস্থিত শ্রোতাদের ওপর তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবের কথা আজ সর্বজনবিদিত।

ধর্মমহাসভা চুকে গেলে স্বামীজী ভাবলেন তাঁর অনুরাগী বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে তিনি এবার স্বাধীনভাবে কাজ করবেন এবং সেইমতো একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের [লেকচার ব্যুরো] সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গোটা আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোর কর্মসূচী হাতে নিলেন। পূর্ব আমেরিকার শহরগুলি থেকে বক্তৃতা শুরু করে নভেম্বর মাসে তিনি ম্যাসাচুসেটস্-এর নরদ্যাম্পটন শহরে পৌঁছলেন।

ক্যালভিন কুলিজের জন্মস্থান নরদ্যাম্পটন একটু সেকেলে ধাঁচের হলেও বড় সুন্দর শহর। নিউইয়র্ক এবং বস্টনের মাঝামাঝি কানেক্টিকাট উপত্যকার পাহাড়ী ঢালে এই নরদ্যাম্পটন, যার অদূরে মাউন্ট টম এবং মাউন্ট হলিয়োক-এর বুক চিরে এক পাহাড়ী নদী উচ্ছ্বাসভরে বয়ে চলেছে। বর্ষার সময় শহরের নিচু মাঠ-ঘাট জলে ডুবে চকচক করে। দক্ষিণ দিগন্তে চোখে পড়ে হলিয়োক-এর বেগুনি-নীল চূড়াগুলির স্বপ্নাভ রূপরেখা। লম্বালম্বা বিশাল এলম্ গাছগুলি প্রহরীর মতো পথের দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। জায়গাটিকে দেখলে মনে হয় যেন সে ঘুমিয়ে আছে। শুধু একদল ছাত্রছাত্রীর কলকলানিই ক্ষণিকের জন্য তাকে জাগিয়ে তোলে। স্মিথ কলেজ নামে মেয়েদের যে কলেজটি এখানে আছে, সেটিই এখানকার বুদ্ধিজীবীদের প্রধান আড্ডা। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য সোফিয়া স্মিথ এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শরৎকালে আমি এই স্মিথ কলেজেই ভর্তি হই। এক বিচারে তখন আমি বাঁধনহীন অপরিণত অষ্টাদশী। কিন্তু তলায় তলায় মন এবং আত্মবিষয়ে ঔৎসুক্য তখনই আমার মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। গোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্ট পরিবারের কঠোরতম বিধিনিষেধের মধ্যে মানুষ হওয়ায়, বাড়ি ছেড়ে আমি কলেজে ভর্তি হব, এটা বাবা-মার খুব একটা মনঃপূত হয়নি। তাঁরা চাননি 'স্বাধীন চিন্তা'-র হাওয়া লেগে তাঁদের মেয়ে উচ্ছন্নে যাক। তাঁদের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক একথাই বা বলা যায় কি করে, বিশেষত যখন জোর গুজব রটেছে যে, আমারই এক বান্ধবী গত বছর ভাসার কলেজে ভর্তি হয়ে 'নাস্তিক' বনে গেছে!

কলেজের ছাত্রীনিবাসে সকলের জায়গা না হওয়ায় আমি ও আরও তিনজন নতুন ছাত্রী কলেজের কাছাকাছি বাদামি রং-এর চৌকো একটি বাড়িতে থাকতাম। যিনি আমাদের দেখাশোনা করতেন সেই ভদ্রমহিলার কড়া শাসন সত্ত্বেও তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং রসবোধের জন্য আমরা সকলেই তাঁকে বেশ পছন্দ

করতাম। কলেজে বিখ্যাত মনীষীদের বিশেষ ধরনের বক্তৃতাদি লেগেই থাকতো এবং ঐসব বক্তৃতায় আমাদের উপস্থিতি একেবারে বাধ্যতামূলক ছিল।

নভেম্বরের কলেজ বুলেটিনে দেখলাম স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ওখানে দুটি সান্ধ্য বক্তৃতা দেবেন। আমরা তাঁর বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুধু এইটুকুই জানতাম, তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী। সদ্য-সমাপ্ত শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় তাঁর সাফল্যের বার্তা তখনো আমাদের কানে পৌঁছায়নি। এই সময়ে একটি দারুণ খবর জানাজানি হয়ে গেল ঐ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমাদের বাড়িতেই থাকবেন, আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার এই, আমরা তাঁকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইচ্ছেমতো প্রশ্ন করতে পারবো। এই প্রসঙ্গে আমাদের গৃহকর্ত্রীর উদার মনোভাবের কথা না বলে পারছি না। ভেবে দেখুন, তখনকার দিনে কালো চামড়ার অমন একজন মানুষকে তিনি তাঁর বাড়িতে ঠাঁই দিলেন যাঁকে দেখলে হোটেলওয়ালারাও নির্দ্বিধায় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিত! এই ঘটনার কত বছর বাদে, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে, বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিউইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় একটু আশ্রয়ের জন্য ঘুরেছেন। কিন্তু আশ্চর্য! কোথাও আশ্রয় পাননি।

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি ভারতবর্ষের নাম শুনে আসছি। তাছাড়া, এমন একজনের সঙ্গে আমার মার বিয়ের কথা প্রায়-পাকা হয়ে গিয়েছিল যিনি শেষ পর্যন্ত মিশনারি হয়ে ভারতবর্ষে চলে যান। এও দেখতাম, আমাদের চার্চ মিশনারি অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেও ভারতীয় 'জেনানা'দের জন্য প্রতি বছরই বাক্সভর্তি কিছু না কিছু উপহার পাঠানো হতো। ভারত সম্পর্কে কত আজগুবি কথাই যে তখন শুনেছি! গরমের দেশ ভারতবর্ষের পথেঘাটে নাকি সাপ কিলবিল করে বেড়ায়, আর ওখানকার 'অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন পৌত্তপুলিকরা কাঠ, পাথর এসব পুজো করে।' আশ্চর্য! এখন ভাবতেও লজ্জা লাগে, আমার মতো বই-এর পোকা ভারতবর্ষের কথা, তার গৌরবময় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের কথা, প্রায় কিছুই জানতো না! পড়ার মধ্যে পড়েছিলাম উইলিয়াম কেরীর জীবনী। গোয়ার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের কথাও অবশ্য শুনেছি। কিন্তু এ সবই খ্রীস্টান মিশনারিদের চোখ দিয়ে দেখা বা জানা। আপনাদের হয়তো মনে থাকতে পারে, তখনো 'কিম' প্রকাশিত হয়নি। এমতাবস্থায় একজন খাঁটি ভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া, সে তো রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার!

তা সেই সৌভাগ্যসূচক বহু-প্রত্যাশিত দিনটি এল। অতিথিকে আপ্যায়ন করার জন্য একটি ছোট ঘর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি এলেন এবং আসামাত্রই সমস্ত বাড়িটাই যেন জেগে উঠলো। এমনি মহিমময় দিব্য উপস্থিতি তার। স্বামীজীর পরনে ছিল কালো 'প্রিন্স্ অ্যালবার্ট' কোট, কালো প্যান্ট, আর তাঁর সুডোল মাথায় সুবিন্যস্ত এক হলুদ পাগড়ি। কিন্তু তাঁর সমগ্র মুখের অভিব্যক্তিতে এমন এক অতীন্দ্রিয়লোকের ইশারা, এমন গভীর আলোকবর্ষী তাঁর দৃষ্টি, এমন তেজস্বী এবং জ্যোতির্ময় তাঁর চেহারা, যা বর্ণনার অতীত। তাঁকে দেখামাত্রই আমরা যেন সব বোবা হয়ে গেলাম; কারোর মুখেই আর কথাটি সরে না। আমাদের গৃহকর্ত্রী অবশ্য ঘাবড়াবার পাত্রী নন। তিনি বেশ সহজভাবেই স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। স্বামীজীর ঠিক পাশেই আমি বসেছিলাম; ভক্তির প্রাবল্যে আমি তখন বাক্যহারা!

সেই সান্ধ্য বক্তৃতায় স্বামীজী কি বলেছিলেন আমার কিছুই মনে নেই। শুধু মনে পড়ে মঞ্চে উপবিষ্ট তাঁর রাজকীয় চেহারার ছবিটি—পরনে লাল আলখাল্লা, গেরুয়া কোমরবন্ধনী এবং মাথায় হলুদ পাগড়ি। আর মনে পড়ে তাঁর ঝরঝরে ইংরেজি বলা আর নিখুঁত স্পষ্ট উচ্চারণ। ভাষার ওপর এমনই আশ্চর্য দখল যে তাঁর কোথাও এতটুকু আটকাচ্ছিল না। তবে মনে হয় সেদিন তাঁর বক্তব্য আমার মনের গভীরে প্রবেশ করেনি; অবশ্য এও হতে পারে, সময়ের ব্যবধানে সেদিনের শোনা কথা স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে। অথচ আশ্চর্য, তাঁর বক্তৃতার পরেই যে আলোচনা-পর্ব শুরু হয়েছিল, তার কথা কিন্তু আমার সুন্দর মনে আছে।

স্বামীজীর বক্তৃতা উপলক্ষে সেদিন আমাদের সেই গৃহে গণ্যমান্য অনেকেই এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যেমন আমাদের কলেজের প্রেসিডেন্ট, দর্শন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য বিষয়ের আরও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি ছিলেন নরদ্যাম্পটন-এর গির্জাগুলির বেশ কিছু ধর্মযাজক এবং একজন প্রখ্যাত লেখক। কথাবার্তা শুরু হলো আর আমরা মেয়েরা ঘরের এক কোণে চুপটি করে বসে সাগ্রহে তাঁদের সেই আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলাম। ঐ আলোচনার খুঁটিনাটি বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল খ্রীস্টধর্ম এবং কেন খাঁটি ধর্ম বলতে একমাত্র খ্রীস্টধর্মকেই বোঝায়। আলোচনার বিষয়বস্তু যে স্বামীজী ঠিক করেছিলেন তা নয়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি একা আর

তাঁর মুখোমুখি কালো কোট-পরিহিত, কতকটা যেন রুক্ষস্বভাব কয়েকজন ভদ্রলোক এক সারিতে উপবিষ্ট। মনে হচ্ছিল, স্বামীজীকে যেন তাঁরা তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছেন। বাস্তবিক, এ এক অসম যুদ্ধ। কারণ আমাদের দেশের চিন্তাবিদদের বাইবেল কণ্ঠস্থ থাকতে পারে, তাঁরা সকলেই ইউরোপীয় দর্শন, কাব্য এবং সমালোচনা সাহিত্যে যথেষ্ট পারঙ্গম হতে পারেন; কিন্তু তাঁরা এটা কি করে আশা করলেন, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন হিন্দু খ্রীস্টধর্ম নিয়ে বিতর্কে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবেন? আমরা কেউই ভাবিনি স্বামীজী তাঁর নিজের শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও এই প্রতিপক্ষদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন। কিন্তু আমাদের ভয়-ভাবনা, বিচার নস্যাৎ করে দিয়ে সেদিন যা ঘটলো তার প্রতিক্রিয়া আমার একান্ত ব্যক্তিগত হলেও আমার এমন ক্ষমতা নেই তার তীব্রতাকে এতটুকু বাড়িয়ে বলি।

বাইবেলের উদ্ধৃতির উত্তরে স্বামীজী বাইবেল থেকেই আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি শুধু বাইবেলের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, ইংরেজ দার্শনিক ও লেখকদের ধর্মবিষয়ক রচনা থেকেও অনর্গল উদ্ধৃতি দিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও টমাস গ্রে-র [তাঁর বিখ্যাত 'এলিজি' থেকে নয়] পঙ্‌ক্তিগুলি তিনি এমন স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করছিলেন যে মনে হচ্ছিল ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

আচ্ছা, তর্কযুদ্ধে স্বদেশের মানুষ আমার সহানুভূতি পেলেন না, পেলেন স্বামীজী—এটা কি করে সম্ভব হলো? আবার স্বামীজী যখন ধর্মকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে তার বৃত্তটিকে এমনভাবে সম্প্রসারিত করে দিলেন যাতে সমগ্র মানবসমাজ তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, তখন বদ্ধ ঘরের মধ্যে যে মুক্তির হাওয়া বয়ে গেল তাতেই বা কেন আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম? আমি কি তাঁর বাণীর মধ্যে আমার আকুল ইচ্ছার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েই অমন উল্লসিত হয়েছিলাম, নাকি তাঁর ব্যক্তিত্বের অমোঘ আকর্ষণেই অমনটি করেছিলাম? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানি, তাঁর জয়ে মনে হয়েছিল—এ যেন আমারও জয়।

বেলুড় মঠের এক সন্ন্যাসী কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর চোখে স্বামীজী হলেন মূর্তিমান প্রেম। সেই রাতে কিন্তু আমার চোখে স্বামীজী ছিলেন শক্তির প্রতিমূর্তি। আমার জীবনের পরবর্তী অভিজ্ঞতাও সেই কথাই বলে।

আমাদের শিক্ষাজগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী যে খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল

সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট বিশ্বাস ও জ্ঞানবুদ্ধির বাইরেও যে সত্য থাকতে পারে সেটা কখনো ভাবতে পারতেন না। এই ধরনের কূপমণ্ডূকতা যাঁদের একমাত্র সম্বল তাঁরা কেমন করে *'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'*—এই উদার বাণী গ্রহণ করবেন? মাত্র কিছুদিন আগে শিকাগোতে খ্রীস্টান মিশনারিদের বিদ্বেষ-বিষ হজম করে স্বামীজীর খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই একই বিদ্বেষ এখানকার বিদ্বৎ সমাজের প্রতিনিধিদের মনোভাবেও প্রতিফলিত হতে দেখে স্বামীজী রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন। স্বামীজী ঠিকই করেছিলেন; কারণ প্রেম যাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না, তাঁরাও শক্তের ভক্ত। শক্তি প্রয়োগ করে ঐক্যমতে পৌঁছনো যায় না বটে, কিন্তু দুর্বিনীতকে স্তব্ধ করে দেওয়া তো চলে। স্বামীজীও ঠিক তা-ই করলেন।

সেদিনের আলোচনা শুরু হলো যথেষ্ট ভদ্র এবং সুন্দরভাবেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সৌজন্য ও বিনয়ের মুখোশটি সরে গেল। খ্রীস্টধর্মের ধ্বজাধারীরা যুক্তি-তর্কে তাঁদের পরাজয় অনিবার্য বুঝে ক্রমশ গরম হতে লাগলেন; তাঁদের কথায় ঝরে পড়লো তিক্ততা ও আক্রোশের সুর। সত্যি সত্যিই সেদিন তাঁরা স্বামীজীর কাছে বাক্‌যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হলেন। স্বামীজীর হয়ে সেদিন মনেপ্রাণে যে গর্ব বোধ করেছিলাম, যে আনন্দের শিহরণ সেদিন আমার ভিতর জেগেছিল, তা আজও অনুভবে পাই।

পরদিন সাতসকালে স্নানঘর থেকে হুড়হুড় করে জল ঢালার শব্দ এবং অজানা, অশ্রুত ভাষায় গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণের সুর শুনে আমরা কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটা কি জানার জন্যে, মনে হচ্ছে, আমরা কয়েকজন দরজার কাছে কান পেতে শোনার চেষ্টাও করেছিলাম। প্রাতরাশের সময়ে ঐ মন্ত্রের অর্থ জানতে চাইলে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি প্রথমে কপালে ও পরে বুকে জল ঢালি, আর প্রতিবার সর্বজীবের কল্যাণের জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করি।' কথাটা শোনামাত্র যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। কারণ, সেই সময়ে আমিও প্রতিদিন সকালে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম। কিন্তু আমি প্রার্থনা করতাম প্রথমত নিজের মঙ্গলের জন্য, পরে আমাদের পরিবারের অন্যান্য সকলের জন্য। কিন্তু কই, গোটা বিশ্বটাই যে আমার পরিবার, নিজের মঙ্গলচিন্তার আগে তার মঙ্গলকামনাই যে আমার কর্তব্য, সেকথা তো কখনো আমার মনে ওঠেনি!

সকালে খাওয়াদাওয়ার পর স্বামীজী বললেন ঃ চল না সব, কাছে পিঠে একটু হেঁটে আসা যাক। সেই প্রস্তাব মতো আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাজার

মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে হাঁটছেন, আর তাঁর দুপাশে দুজন দুজন করে আমরা চার ছাত্রী গর্বভরে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছি। কিছুক্ষণ এইভাবে চুপচাপ চলার পর সলজ্জভাবে আমরা স্বামীজীর সঙ্গে দু একটি কথা বলার চেষ্টা করলাম। স্বামীজীও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠলো এক মধুর হাসি, যে হাসির আলোয় তাঁর সুন্দর দাঁতগুলি চিকচিক করে উঠলো।

পথ চলতে চলতে স্বামীজী আমাদের যা বলেছিলেন তার মধ্যে শুধু একটি কথাই আমার মনে আছে। খ্রীস্টানদের মতবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন—উঠতে বসতে খ্রীস্টানরা যে 'যিশুর রক্তের' উল্লেখ করেন তা আমার অত্যন্ত জঘন্য লাগে।

কথাটি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ আমি নিজেও খ্রীস্টানদের অতিপরিচিত একটি প্রার্থনা সঙ্গীতকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতাম। স্তোত্রটি এই—'ইম্যানুয়েলের রুধির ভরা উচ্ছ্বসিত ফোয়ারা' ইত্যাদি। কিন্তু ঘৃণা করলে কি হবে, চার্চের চিরাচরিত মতবাদকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করার স্পর্ধা আমার ছিল না। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, স্বাধীনতাপ্রিয় মহামানবের চিন্তাতরঙ্গের দিব্যস্পর্শে যে মুহূর্তে আমার নবজাগরণ ঘটে, সেই লগ্নেই আমার 'স্বাধীন চিন্তা'র শুরু।

বেড়াতে বেড়াতে এবার আমি ভারতবর্ষের পবিত্র সনাতন শাস্ত্র বেদের প্রসঙ্গ তুললাম যার কথা তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমাদের শুনিয়েছেন। আমার কৌতূহল দেখে স্বামীজী বললেন, আমি যেন নিজে নিজেই বেদ পড়ার চেষ্টা করি এবং সম্ভব হলে মূল সংস্কৃতেই। সেখানে, সেই মুহূর্তেই স্থির করলাম—সংস্কৃত আমাকে শিখতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সঙ্কল্প আমি রক্ষা করতে পারিনি। যখন নিজের দিকে তাকাই এবং বাহ্য ফলাফলের বিচার করি, তখন মনে হয়, বীজ হিসাবে আমি ভালোই ছিলাম; কিন্তু চারপাশের কাঁটাগাছের নিষ্পেষণে ভেতরের সারবস্তু বিকশিত হতে পারলো না।

তবে একটা মজার কথা বলি, স্বামীজীর উপদেশমতো সংস্কৃত শিখে বেদ পড়া না হলেও তাঁর কথা একেবারে বিফলে যায়নি। কেন, তা বলছি। কিছুদিন পর গরম পড়লে ভারী সুন্দর ছোট একটি গার্ণসী বাছুর আমাদের বাড়িতে আনা হয়। বাবার কাছ থেকে বাছুরটি পেয়ে আমি আদর করে তার নাম রাখলাম 'বেদ'। দুর্ভাগ্যবশত অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই বাছুরটি মারা গেল। বাবা বললেন, ওর নামই ওর কাল হয়েছে!

স্বামীজীর দ্বিতীয় বক্তৃতাটির কথা কিছুই আমার স্মরণে নেই। তার পরই সেই মহাপুরুষ আমাদের এখান থেকে অন্যত্র চলে যান। তাঁর সঙ্গে আর আমার কখনো দেখা হয়নি। যদিও আমাদের দেশের বহু জায়গায় তিনি এরপর ঘুরেছেন, কিন্তু আমি সেসব খবরাখবর ঠিক মতো রাখতে না পারায় তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। এমনকি, তিনি যে দুবছর পরই আবার আমেরিকায় এসেছিলেন, সেই খবরটা পর্যন্ত আমি জানতাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, ঐ যে তাঁর মাত্র দু-দিনের দুর্লভ উপস্থিতি, সেটিই আমার সমগ্র জীবনকে সম্পূর্ণ অন্য এক চেতনার রং-এ রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

স্বামীজীর নরদ্যাম্পটন আসার সংবাদ এমন বিস্তারিতভাবে এবং আবেগ দিয়ে বাড়িতে লিখেছিলাম যে বাবা রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন। তিনি প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে, পিতৃ-পিতামহের ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে আমি স্বামীজীর শিষ্যা হতে চলেছি। এই নিয়ে পরে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হলো, তিনি আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও করলেন। কিন্তু যেহেতু আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, আমি চাইনি, আমাকে নিয়ে তাঁর কোনও উদ্বেগ হোক। আমি নিজেই একেবারে চুপ করে গেলাম। আমি কি ভাবছি না ভাবছি, কোন্ নতুন খাতে আমার চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে এইসব আলোচনা একেবারেই বন্ধ করে দিলাম। মনের কথা মনেই থেকে গেল।

আজ মাঝে মাঝে ভাবি, এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে, অন্ধের মতো পথ হাতড়িয়ে জীবনের কত সময়ই না বৃথা নষ্ট করেছি। অথচ হাতের কাছে তো স্বামীজীর আদর্শ ছিল যা অনুসরণ করলে এতদিনে হয়তো লক্ষ্যে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু না, "গতস্য শোচনা নাস্তি"। অজর, অমর, অবিনশ্বর আত্মার পক্ষে হা-হুতাশ করা সাজে না। আসল কথা হলো সঠিক পথে এসে দাঁড়ানো।

মিশরে বহু হাজার বছরের পুরনো পাথুরে কফিনের ভেতর থেকে কিছু শস্য বীজ পাওয়া গেছে, সে সংবাদ হয়তো অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, বীজগুলি এখনো নষ্ট হয়নি; মাটিতে পুঁতলে এখনই সেগুলি থেকে গাছ বেরুতে পারে। ভারতবর্ষ থেকে আসা ঐ মহাত্মার ধূসর স্মৃতিও বীজাকারে যেন এতকাল আমার হৃদয়ভূমিতে নিষ্প্রাণ পড়েছিল। কিন্তু গত বছর লক্ষ্য করলাম, সেই মহাবীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে, আর আজ সেই টানেই আমার ভারততীর্থে ছুটে আসা। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, দায়িত্ব আর বহু সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মাঝের বছরগুলিতে আমার অন্তর নিরন্তর এমন একটা আলোর

সন্ধান করে ফিরেছে, যা আমার চির-অভিপ্রেত। বহু মত পরীক্ষা করে দেখেছি যদি কোথাও আমার প্রার্থিত জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান মেলে। কিন্তু না, প্রতিবারই হতাশ হয়েছি। যা চেয়েছি তা কোথাও পাইনি। সর্বত্রই দেখেছি আচারসর্বস্বতা আর গোঁড়ামি। আমার কাছে ওগুলি অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। আমার মুক্ত-স্বভাব, নিয়মের ঐ বজ্রবাঁধনে যে হাঁপিয়ে ওঠে।

অবশেষে, স্বামীজী যে বিশ্বজনীন ধর্মের কথা বলেছেন, সেই তত্ত্বেই দেখলাম আমার প্রাণ জুড়ালো, মিটলো বহুকালের তৃষ্ণা। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই যে ঈশ্বর আছেন, স্বরূপত আমরা সকলেই যে ঈশ্বরের অংশ—এইটি অনুভব করতে পারলে জানার আর কি বাকি থাকলো? ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে, স্বামীজীর শিক্ষার আলোকে নিষ্ণাত হয়ে, বহু-অভিলষিত ধন হাতে পেয়ে মনে হচ্ছে, এতদিনে আমি যেন আমার নিজের ঘরটিতে ফিরে এসেছি।

(প্রবুদ্ধ ভারত, সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

হেনরি জে. ভ্যান হাগেন

অন্ধকার থেকে হঠাৎ কেউ প্রখর আলোয় এলে তার চোখদুটি মুহূর্তের জন্য এমন ধাঁধিয়ে যায় যে, তখন চারপাশের অন্য কোনও কিছুই তার চোখে পড়ে না। যেন কিছুক্ষণের জন্য চোখের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম, আমাদের অন্তর-উদ্ভাসিত-করা অবর্ণনীয় আনন্দকে প্রকাশ করতে বলা হলে আমরা তার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাই না। সেই লাগসই শব্দ অনুসন্ধানের চেষ্টাও যেন অন্ধকারে প্রার্থিত বস্তু হাতড়ানোর মতো। বস্তুত, প্রকৃত আনন্দ অনুভব করা সম্ভব হলেও তার বর্ণনা দেওয়া দুঃসাধ্য। আমার জীবনের অবিস্মরণীয় আনন্দের স্মৃতিকে ব্যক্ত করতে গিয়েও সেই অনুভূতিই হচ্ছে। যে আনন্দের, যে অভিজ্ঞতার কথা বলতে যাচ্ছি তার পর যদিও বেশ অনেকগুলি বছর কেটে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে সেসব যেন এই সেদিনের ঘটনা!

আজ সন্ধ্যায় আমরা যাঁর জন্মোৎসব পালন করছি সেই মহান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। অমর্তলোকের অমর সঙ্গীত 'ভগবদ্‌গীতা' পাঠ করে ভারতবর্ষের ওপর আমার ভালবাসা জন্মেছিল। তাই বন্ধুরা আমার কানে নানা মন্ত্র দিলেও সেদিন শুধুমাত্র একজন ভারতীয়কে দেখার লোভেই আমি স্বামীজীর ক্লাসে গিয়েছিলাম; তাঁর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ ততখানি ছিল না। যাই হোক, স্বামীজীর অপেক্ষায় তো বসে আছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন। দেখলাম, যেমন রাজকীয় চেহারা, তেমনি ব্যক্তিত্বপূর্ণ তাঁর চালচলন। দেখে মনে হচ্ছিল, সবকিছুই যেন তাঁর হাতের মুঠোয়, অথচ নিজের বাসনা বলতে কিছুই নেই। এক ঝলক দেখেই বুঝলাম, ইনি একজন খুব বড় মাপের মানুষ, হৃদয়টি যাঁর ভালবাসায় ভরপুর হয়ে আছে।

এইবার কিন্তু সত্যি সত্যিই আমি তাঁর কথা শোনার জন্য ব্যাকুল হলাম। তিনিও বক্তৃতা শুরু করলেন। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আমি দৃঢ় সংকল্প

করলাম—এঁর সমস্ত বক্তৃতা আমি শুনবো এবং ক্লাসেও প্রত্যেকদিন হাজির থাকবো। আর ক্লাসে আসার আগে মনের মধ্যে যে বিরূপ ভাব ছিল, তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে, তাঁর কণ্ঠের মোহিনী শক্তির স্পর্শে সেসব কোথায় ভেসে গেল। তারপর যা ঘটলো, পাতার পর পাতা লিখেও সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, সুস্বাদু অথচ পুষ্টিকর খাবার পেলে ক্ষুধার্ত যেমন খুশি হয়, তৃষ্ণার্ত যেমন ঠাণ্ডা জল পেলে তৃপ্ত হয়, ঠিক তেমনি সত্যকে জানার যে অদম্য আগ্রহ আমার মধ্যে ছিল, তা মিটেছিল এই মহাপুরুষের শিক্ষায়। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপম বেদান্ত ব্যাখ্যা শোনার পর এ কথা বলতে পারি, আজ পর্যন্ত বেদান্তের চেয়ে উচ্চতর এবং মহত্তর কোনও তত্ত্ব বা দর্শনের সন্ধান আমি পাইনি যা মানুষের মনের সম্ভাব্য সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের, জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব জিজ্ঞাসার; দ্ব্যর্থহীন উত্তর এবং স্পষ্টতর ব্যাখ্যা দিয়েছে।

স্বামীজী শুধু যে বক্তৃতা সভায় কিংবা ক্লাসেই তাঁর মূল্যবান উপদেশগুলি দিতেন তা নয়, রাস্তায় চলতে চলতে, সেন্ট্রাল পার্কে বেড়াতে বেড়াতেও তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠতো পারমার্থিক সত্যের সেই ধ্রুব সুর। আমাদের মধ্যে অনেক সময় ছোট ছোট সুন্দর যেসব আলোচনা হতো তা এখনো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। একবারের কথাই বলিঃ স্বামীজীকে আমি দুঃখ করে বলেছিলাম, তাঁর মহান শিক্ষা যদি আরও অনেকে নিতে পারতেন তো বেশ হতো। সঙ্গে সঙ্গেই পরিণামদর্শী স্বামীজীর উপযুক্ত উত্তর এলো। তিনি বললেন ঃ 'আমি চাইলে আরও হাজার হাজার লোক আমার বক্তৃতা-সভায় সমবেত হতো। কিন্তু তাতে কি লাভ? হুজুগে লোকের ভিড়ে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন খাঁটি জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর যাদের মধ্য দিয়েই আমার প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠতে পারে। সারা জীবন খেটে যদি একটা লোককেও আমি মুক্তির পথে এগিয়ে দিতে পারি তো জানবো, ভস্মে ঘি ঢালিনি, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।' এই কথা শুনে মনে হলো যে করেই হোক আমাকে স্বামীজীর ছাত্র হতেই হবে।

স্বামীজীর আচরণ ও ব্যক্তিত্বের এমনই একটি মাধুর্য ছিল যে, তাঁর সঙ্গে যেসব ছাত্রছাত্রী থাকতো তাদের সকলের মধ্যেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতো যে তার প্রতি স্বামীজীর যে দরদ, যে সহানুভূতি, যে মনোযোগ তা একটু বিশেষ ধরনের—তার কোনও তুলনাই হয় না। ছাত্রদের ছোটখাট সব অভাব-অভিযোগ এবং নানা প্রশ্ন স্বামীজী সর্বদা মন দিয়ে শোনার জন্য তৈরি থাকতেন। ফলে

অচিরেই তারা তাঁর একান্ত উৎসাহী ও বিশ্বস্ত অনুগামী হয়ে উঠতো। গুরু ও শিষ্য উভয়েই এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়ে যেতেন। প্রেমের এই বন্ধনই তো যে কোনও শিক্ষকের প্রকৃত সাফল্যের চাবিকাঠি। আর এই ব্যাপারে স্বামীজী যে কতটা সফল হয়েছিলেন তা অবর্ণনীয়! তাঁর মহান কর্মের ফলস্বরূপ যে সাহিত্য আজ গড়ে উঠেছে তার সাথে বিদ্বৎসমাজের প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। আর সেইসব অমূল্য সৎ সাহিত্যগ্রন্থের প্রভাবে কত অধ্যাপক, ধর্মযাজক ও সাধারণ মানুষের জীবনধারা পাল্টে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

তাঁর উপদেশ আমাদের হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি বহন করে এনেছিল—সেই মানসিক প্রশান্তি যার সঙ্গে ছিল আর্য ঋষিদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং আমাদের জীবনে আজ যার একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি আমেরিকার এক বিজ্ঞানী বলেছেন, শৌখিন, বিলাসবহুল, বস্তুতান্ত্রিক জীবনের পিছনে ছুটতে গিয়ে আমরা অকালেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি, অযথা শক্তিক্ষয় করছি; এক কথায় বাঁচার নামে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করছি। ধনসম্পদের তীব্র লালসা মেটাতে গিয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করতে গিয়ে, স্নায়ুর চাপে ভুগে ভুগে আমাদের মানসিক শান্তি ধূলিসাৎ হচ্ছে। সুস্থ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের কোনও চেষ্টাই নেই। এই অভিশপ্ত জীবনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বেদান্ত দর্শনের শিক্ষাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলার চেয়ে হিতকর পথ আর কি হতে পারে? উন্মত্তের মতো কেবল ইতস্তত ছুটে বেড়ানো অথবা জড়বুদ্ধির মতো বিমর্ষ হয়ে চুপচাপ বসে থাকা—এর কোনওটাতেই শান্তি নেই। পাশ্চাত্য জীবন থেকে যে শান্তি বহুকাল আগে বিদায় নিয়েছে সে শান্তি আবার ফিরে আসবে শুধু সত্ত্বগুণের সূত্র ধরে, সাত্ত্বিক জীবনযাপনের মাধ্যমে। বেদান্ত আমাদের শিখিয়েছে—প্রশান্ত ও নির্লিপ্ত জীবনযাপনের নামই সাত্ত্বিক জীবনযাপন।

স্বামীজী আমাদের খুব সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আমরা যেন অযথা শক্তিক্ষয় না করি। সহজাত প্রবৃত্তির বশে অন্য দেশ জয়ের চেষ্টা না করে, মতানৈক্যের দরুন ক্রোধ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে স্বজন বধ না করে আমরা যেন আমাদের জীবনীশক্তিকে আত্মজয়ের কঠোর সাধনায় নিয়োগ করি। স্বামীজী আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার চেয়ে উঁচু আদর্শ, মৌলিক চিন্তা আর কোন্ মহত্তম মানুষ জগতের সামনে প্রচার করতে পারেন? স্বামীজী বলতেন ঃ 'যে আত্মজয় করেছে, যে নিজেকে জয় করেছে, সে জগৎ জয় করেছে। এইটি

সত্য জেনে কখনো এ সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ো না।' স্বামীজী আরও বলতেন ঃ 'মন্দিরে বা শাস্ত্রে বৃথাই তুমি তাঁকে খুঁজে মরছো। তোমার নিজের হাতেই তোমার মুক্তির চাবিকাঠি। হা-হুতাশ না করে নিজেকে শক্ত করো, নিজেকে বাড়িয়ে তোলো।'

আজ যদিও শারীরিকভাবে তিনি আমাদের মধ্যে নেই, অভীষ্ট কাজ শেষ করে পরম শান্তির রাজ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন, তবুও আমাদের স্মৃতিতে তিনি চিরভাস্বর হয়ে আছেন। তিনি চিরঅম্লান তাঁর মহান কর্মের মধ্যে, তিনি চিরজীবী আমাদের হাতে তুলে দেওয়া তাঁর বাণীমন্ত্রে। প্রকৃত মহান, সফল এক আচার্যের মতোই আমাদের পরম সত্যকে লাভ করার উপায় বলে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সে তো গেল একটা দিক—তাঁর মহানুভবতা এবং জ্ঞানের দিক। কিন্তু জানলেই তো হলো না। সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করা চাই, না হলে সবই বৃথা। আর এইখানেই আমাদের দায়িত্ব এসে পড়ে। এসে যায় কর্তব্যের দিকটি। যিনি যত বেশি সত্যকে জানেন, তাঁর দায়িত্বও তত বেশি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে আমরা সত্যকে ধরে চলতে পারি, আমাদের সেই সত্যাভিমুখী অভিযাত্রায় সাহায্য করার জন্য আজ নানা দিকে বেদান্ত সোসাইটি গড়ে উঠেছে। সেখানে, একদিকে বক্তৃতা এবং অন্যদিকে নিয়মিত ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। সকল অজ্ঞানতা দূর করে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য স্বামীজীর গুরুভ্রাতারা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসি-শিষ্যরাও আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত। আমরা যত বড় পরাক্রমশালী জাতিই হই না কেন, কিছু পাবার আশায় স্বামীজী আমাদের কাছে আসেননি। বরং আমাদের ভাণ্ডারে যা ছিল না, সেই সত্য এবং প্রজ্ঞা দান করবেন বলেই তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য, বেদান্তের সত্যকে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা। স্বামীজীর অমূল্য শিক্ষা যে আমরা বিফলে যেতে দিইনি তা প্রমাণ করার ঐ একটিমাত্রই পথ।

(প্রবুদ্ধ ভারত, জুন ১৯১১)

সিস্টার ক্রিস্টিন

(স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি)

বহু যুগ পর পর আমাদের মধ্যে এমন এক মহাপ্রাণ আবির্ভূত হন যাঁকে কোনওমতেই এই পৃথিবীর মানুষ বলা চলে না। তিনি সম্পূর্ণভাবেই অদৃশ্য অন্যলোকের বাসিন্দা; যেন পথ চলতে চলতে হঠাৎই এই ধূলিধূসরিত মাটির পৃথিবীতে এসে পড়েছেন। এহেন অমৃতপথযাত্রী যখন বেদনাদীর্ণ এই ধরণীতে নেমে আসেন, তখন নিয়ে আসেন তাঁর আপন ভুবনের দীপ্তি, শক্তি ও দিব্য মহিমা। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন—তিনি এ জগতের নন। তিনি জানেন—তিনি এক আগন্তুক। তীর্থযাত্রী মাত্র। রাত ফুরালেই চলে যাবেন।

তাঁর চারপাশে যারা থাকে, তিনি তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নেন। তাদের সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথী। কিন্তু এই নিবিড় একাত্মতা সত্ত্বেও তিনি কখনও আত্মবিস্মৃত হন না। ভোলেন না তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। তাঁর দেবত্ব সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন। তাঁর অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ এই মহাবাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—আমি মহামহিমময়, সর্বব্যাপী, অখণ্ড আত্মা। তিনি জানেন, যে অনির্বচনীয় দিব্যধাম থেকে তাঁর অবতরণ, সেখানে সূর্য, চন্দ্র কিছুই নেই; তার প্রয়োজনও নেই, কেননা সেই ধ্রুবলোক নিত্য জ্যোতির্ময়, যিনি সকল আলোর উৎস। তিনি এও জানেন তিনি কালাতীত। একদা যখন সব দেবশিশুরা আনন্দে গান গেয়ে উঠেছিলেন—তারও বহু আগে থেকেই তিনি আছেন। তিনি নিত্য-বর্তমান।

ঠিক অমনই একজনকে আমি চাক্ষুষ দেখেছি, তাঁর বাণী স্বকর্ণে শুনেছি এবং আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-ভক্তি সবই তাঁর পাদপদ্মে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছি। তিনি এমনই একজন যাঁর সাথে কারও তুলনা চলে না। তিনি অতুলনীয় কারণ বিচারের সাধারণ মাপকাঠি ও আদর্শের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি। অন্যেরা বড় জোর উজ্জ্বল; কিন্তু তিনি জ্যোতির্ময়। কারণ, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে সত্তা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকার শক্তি তাঁর ছিল। সাধারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত এবং তাকে পর্যায়ক্রমে, ধীরে ধীরে সেই জ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়।

কিন্তু তিনি এই সাধারণ নিয়ম দ্বারা নির্দিষ্ট নন। অন্যেরা বড় হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব আপেক্ষিক। কারণ সমশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তুলনামূলকভাবেই তাঁদের মহত্ত্ব নিরূপিত হয়। অন্যেরা সমাজের আর পাঁচজনের চাইতে তুলনামূলকভাবে অনেক ভাল, অনেক প্রতিভাবান, অনেক শক্তিধর হতে পারেন এ কথা সত্য। এ কথাও অনস্বীকার্য একজন যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র, সত্যবান এবং একনিষ্ঠ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁদের কারও তুলনা চলে না। তাঁর দৃষ্টান্ত তিনিই। তিনি অনুপম। সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র। এ জগতের মানুষ ছিলেন না তিনি। ঊর্ধ্বলোক থেকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর মতো জ্যোতিরাত্মার মর্তে আগমন। তাই এটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল—এই ধরণীতে তিনি ক্ষণিকের অতিথি। ধন্য সেই দেশ যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ধন্য তারা যারা তাঁর সমসাময়িক ছিলেন আর মহা ভাগ্যবান তারা যারা তাঁর পদপ্রান্তে স্থান পেয়েছিলেন।

গুরুদেব এবং তাঁর বাণী

একটা সময় থাকে যখন আমাদের জীবনটা একঘেয়ে ছকে বাঁধা থাকে; অগভীর ঘোলা জলের নদীর মতো, মন্দাক্রান্তা ছন্দে বয়ে চলে তো চলেই! আহার, নিদ্রা আর অর্থহীন প্রলাপ—এই সে জীবনের সার। চিরাচরিত চিন্তা আর অসার ভাবকে কেন্দ্র করেই জীবনটা ঘুরপাক খায়। শোক, তাপ, বিপর্যয় এসে মাঝে মাঝে আমাদের স্তব্ধ করে দিয়ে যায় বটে, কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যেই। তারপর আবার যে সেই! কারণ আমরা স্থির থাকতে পারি না। সুখ বা দুঃখ দুয়ের কোনওটাই জীবনের এই ঘুরন্ত নাগরদোলাকে থামাতে পারে না। কিন্তু একথা ধ্রুবসত্য—এ-ই জীবনের সব নয়, সব হতে পারে না। কারণ এইভাবে দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরতে আমরা এ জগতে আসিনি। একদিন এই বোধ আমাদেরও আসে, আর যখনই আসে তখনই এক নিদারুণ অতৃপ্তি পেয়ে বসে আমাদের। আমরা যন্ত্রণায় ছটফট করি। বুঝতে পারি না সমগ্র জীবন ধরে আমরা কি অন্বেষণ করছি! জীবন-বাসর সাজিয়ে এ কার, কিসের প্রতীক্ষা?

তারপর একদিন আসে সেই শুভদিন, সেই বহুবাঞ্ছিত মাহেন্দ্রক্ষণ যখন দারুণ বিস্ময়কর কিছু ঘটে যায় এমন কিছু, যার জন্য জন্ম জন্ম ধরে আমাদের শবরীর প্রতীক্ষা, এমন কিছু যা বারোমেসে ভ্যাপসা জীবনের গ্লানি থেকে মুক্ত

করে আমাদের সমগ্র জীবনপ্রবাহকে এক নতুন খাতে বইয়ে দেয়। জীবনধারার সেই অভূতপূর্ব তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে কেউ চলে যায় দূর কোনও এক অচিন দেশে, যেখানে সব নতুন মানুষ। তাঁদের রীতি-নীতি, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি—সবই আলাদা; কিন্তু এমন মানুষ যাঁদের দেখামাত্রই পরম আপনার বোধ হয়, এমন অদ্ভুত মানুষ, যাঁরা জানেন জীবনের উদ্দেশ্য কি! স্বভাবতই, পরম প্রাপ্তির এই লগ্নে আমাদের সব অস্থিরতা চিরতরে ঘুচে যায়। আমরা শান্ত হই।

বহু, বহুজন্ম পর, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ, সংগ্রাম এবং ছোটখাটো জয়ের পর আসে অভিপ্রেত সিদ্ধি। কিন্তু ক্রমোন্নতির এই সূক্ষ্ম ধারাটি বুঝতে বেশ সময় লাগে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য এই—একটা ছোট বীজই কালে বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়। সমতল জমির প্রান্তে মাত্র কয়েক ফুট উঁচু তটভূমিই বিশাল নদীর গতিপথ নির্ধারণ করে, দেয় সে উত্তরবাহিনী হয়ে মেরু-সাগরে পড়বে কি দক্ষিণবাহিনী হয়ে কৃষ্ণসাগর অথবা ক্যাসপিয়ান সাগরে পড়বে। ঠিক তেমনি ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের এক হিমেল রাতে ডেট্রয়েট শহরের ইউনিটেরিয়ান চার্চে একটি বৃক্তৃতা শোনার জন্য যখন পথে বেরিয়েছিলাম, তখন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না এই যাত্রাই আমার জীবনের জয়যাত্রা, এই যাত্রাই আমার জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণভাবে পালটে দেবে এবং সেই পরিবর্তনের মূল্যায়ন আমার অতিপরিচিত গতানুগতিক বিচারের মাপকাঠিতে অসম্ভব! সত্যি বলতে কি, বক্তৃতা শুনতে শুনতে কান যেন পচে গিয়েছিল। একঘেয়েমির চূড়ান্ত! কটা বক্তৃতা যে প্রাণে বেজেছে তা হাতে গোনা যায়। সবই শোনা কথা—এবং সেসব কথা মনে কোনও উচ্চভাব জাগায় না। বিশেষ করে সেবার শীতে ডেট্রয়েটে যেসব বক্তা এসেছিলেন, তাঁরা একেবারে অসম্ভব পীড়াদায়ক এবং ক্লান্তিকর। তাঁদের কথাবার্তা এতটাই হতাশ করেছিল যে আর নতুন কিছু শোনার আশা আমরা প্রায় জলাঞ্জলিই দিয়েছিলাম বলা চলে। বক্তৃতার কথায় তখন যেন আমরা আঁতকে উঠতাম। তাই নিতান্ত অনিচ্ছা নিয়েই এবং শুধুমাত্র বান্ধবী মেরি. সি. ফাঙ্কির অনুরোধেই সেদিন আমি 'ভারতীয় সন্ন্যাসী Vivekananda'-র বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। ফাঙ্কি ছিল নিরতিশয় আশাবাদী। সে কখনও হতাশ হতো না। আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে সে তার বিশ্বাস আঁকড়ে থাকত—একদিন না একদিন 'আকাঙ্ক্ষিত বস্তু' মিলবেই।

মনের এই অবস্থা নিয়েই আমরা ভারতীয় সন্ন্যাসীর ভাষণ শুনতে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের পূর্ব পূর্ব কোটি জন্মেও আমরা এ রকম একটা

সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিইনি। নিতে পারিনি। কারণ মিনিট পাঁচেক বক্তৃতা শোনার পরই আমরা মনে-প্রাণে অনুভব করলাম, যে পরশমণির সন্ধানে এতকাল ব্যাকুল হয়ে ফিরেছি, সেই অমূল্যধন আমাদের চোখের সামনে! আমাদের দুজনার হৃদয়ের ভারই যেন একসঙ্গে নেমে গেল। দুজনের মুখেই ফুটে উঠল একই অভিব্যক্তি ঃ 'ভাগ্যিস এসেছি, নইলে ...।'

যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের চেহারার কথা খুব শুনেছেন, তাঁরা হয়তো আমার এই কথায় খুব অবাক হবেন—স্বামীজীর যে জিনিসটি আমায় প্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল, সেটি তাঁর রূপ নয়। চেহারা নয় সেটি মন। পাশ্চাত্যের মানুষ সাধারণত ভাবেন সাধু-সন্ত এবং আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হলেই বুঝি হাড়-জিরজিরে হবেন। কিন্তু তেজোদৃপ্ত, ওজস্বী, ভারতীয় সন্ন্যাসী যখন বক্তৃতামঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন দেখা গেল—সে ধারণা সর্বৈব সত্য নয়। দীর্ণ-শীর্ণ চেহারার সাধু সকলেই কল্পনা করতে পারেন। কিন্তু এমন সাধুর কথা কে শুনেছে যাঁর দেহে বজ্রের শক্তি? বাস্তবিক, এই অনন্য সাধারণ পুরুষের ভেতর থেকে এমন মহাতেজ ক্ষরিত হচ্ছিল যে উপস্থিত সকলেই একেবারে কুঁকড়ে গেলেন। সেই দুর্নিবার তেজের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় সাধ্য কার? স্বামীজী বক্তৃতামঞ্চে আসার সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তেই সকলে এই শক্তির স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। পরে অবশ্য আমরা এই শক্তির খেলা দেখে ধন্য হয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, স্বামীজীর মন, চিন্তা, এককথায় তাঁর অন্তর্জগতের আকর্ষণটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি। কি আশ্চর্য মননশীলতা! কি অভাবনীয় সব চিন্তা! এমন কোনও শব্দ আমার জানা নেই যা দিয়ে তাঁর সেই মনের ব্যাপ্তি, দীপ্তি, বা অলোকসামান্যতার সামান্যতম আভাসও দিতে পারি! অন্যেও কি তা পারেন? পারেন না। কারণ, তাঁর মন আর পাঁচজনের, এমনকি যাঁরা প্রতিভাবান বলে সুখ্যাত, তাঁদের সকলের মনের চেয়েও এতটাই উচ্চভূমিতে বিরাজ করত যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁর মনের গঠনটিই ছিল একবারে আলাদা। সেই অনন্য মনের চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট, এত বলিষ্ঠ এবং এতটাই অতীন্দ্রিয় যে তা কোনও স্থূল দেহীর মস্তিষ্কপ্রসূত বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাঁর চিন্তার এই যে অভিনবত্ব, অসাধারণ সূক্ষ্ম মানসিক ভাবতরঙ্গের নিরন্তর প্রক্ষেপণ—তা সত্ত্বেও বলবো, তাঁর সবকিছুই আমার বড় আশ্চর্যরকমভাবে আপনার বলে বোধ হয়েছিল। যেন এসব কিছুর সাথে আমি বহুকাল পরিচিত। নিজের মনেই তাই বলে উঠলাম, 'এই মনটি আমার খুব চেনা।'

তরল সোনা সংহত সূর্যরশ্মির আভায় যেমন রক্তবর্ণ হয়ে উঠে, স্বামী বিবেকানন্দও সেই প্রদীপ্ত, সমুজ্জ্বল রূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন। সুদূর ভারত থেকে আগন্তুক এই প্রচারকের বয়স এখনও তিরিশ ছোঁয়নি। কালাতীত তারুণ্যের প্রতীক যেন, অথচ আশ্চর্য, শাশ্বত প্রজ্ঞায় প্রবীণ! ভারতের সনাতন বাণী—আত্মার কথা, যা আমাদের প্রকৃত পরিচয়, সেই মহা সত্য আমরা তাঁরই মুখ থেকে প্রথম শুনলাম।

তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন, মনে হচ্ছে ঝলমলে বহুরঙবিশিষ্ট সুন্দর একখানি কাশ্মীরী শাল বুনছেন, আর শ্রোতারা চিত্রার্পিত হয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর সেই শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখে যাচ্ছেন। কত রকমের সুতোই না তাঁর হাতে। কখনো কৌতুকের সুতোটি ধরে টান দিচ্ছেন, কখনও বিষণ্ণতার, কখনও আশার, উচ্চ আদর্শের, আবার কখনও বা গম্ভীর তত্ত্বের। কিন্তু যে রঙের সুতোই টানুন না কেন, পোড়েনে, অর্থাৎ সব কথার ভিতরেই অনুস্যূত হয়ে আছে ভারতীয় অধ্যাত্ম জগতের শুদ্ধতম চিন্তা মানুষের দেবত্ব, তার অন্তর্নিহিত নিত্য শুদ্ধ স্বরূপের কথা। এই শুদ্ধত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করার বস্তু নয়। এই শুদ্ধত্ব নিত্য সত্য। 'তত্ত্বমসি'। তুমিই সেই। তুমি এখনই সেই সত্তায় সত্তাবান হয়ে আছ। এবং শুধু সেই সত্তাটিকে উপলব্ধি করা ছাড়া তোমার আর করণীয় কিছুই নেই। সেই উপলব্ধি তোমার এই মুহূর্তে, এক নিমেষেই হতে পারে, আবার দশলক্ষ বছরও লাগতে পারে। কিন্তু— 'সত্যের সেই স্বর্ণশিখরে সকলেই একদিন না একদিন পৌঁছবে'—এই বাণীকে সঙ্গত কারণেই আত্ম-দর্শন বলা হয়। এই তত্ত্বের সারাৎসার এই ঃ আমরা নিজেদের অসহায়, খণ্ডিত, সীমিত ভেবে দুঃখকষ্ট পাই; অথচ জানিনা আমরা অজয়, অমর, অবিনাশী আনন্দের সন্তান। আমরা দেবশিশু।

প্রাচীন আচার্যদের মতো তিনিও নীতি-শিক্ষামূলক বেশ কয়েকটি গল্প বললেন। কিন্তু গল্প যাই হোক, প্রতিপাদ্য একটাই—মানুষের স্বরূপ। আমরা আসলে নিজেদের যা ভাবি, তা আমরা নই। আমরা নিজেদের খাটো করে দেখি। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন আমরা কি, আমরা কে? তিনি নানা রূপকের মধ্য দিয়ে এই সত্যই তুলে ধরলেন—আমাদের পায়ের তলায় সোনার খনি, কিন্তু আমরা নিজেদের গরিব ভেবে মরছি! আমাদের দুরবস্থা সেই সিংহ-শাবকের মতো, যে ভেড়ার পালের মধ্যে জন্মে নিজেকে ভেড়াই ভাবত। ফলে নেকড়ে দেখলেই সে ভয়ে ভ্যা ভ্যা করত! নিজের সত্যিকারের পরিচয় সে জানতো না। একদিন একটা সিংহ ঐ শাবকটিকে ভেড়ার পালের মধ্যে ভ্যা

ভ্যা করতে দেখে অবাক হয়ে গেল। সিংহটি বুঝল তাকে দেখেই শাবকটি ভয়ে ঐ রকম চিৎকার করছে। তখন সে সিংহ-শাবকটিকে কাছে ডেকে বলল : 'তুই ভেড়া নোস্। তবুও ভয়ে ঐ রকম ভ্যা ভ্যা করছিস কেন? তুই তো সিংহ। তোর আবার আমাকে দেখে ভয় কি?' তখন সিংহ-শাবকটি বুঝতে পারল—তাই তো! আমি তো ভেড়া নই! আমি সিংহ! যেই না এই কথা বোঝা, অমনি বন কাঁপিয়ে সে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল।

ইউনিটেরিয়ান চার্চে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে স্বামীজী সেদিন অধ্যাত্মজগতের মহান সত্যগুলি এমন স্বরে অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, যে স্বর আগে কেউ কখনও শোনেনি। অশ্রুতপূর্ব সেই কণ্ঠ নানাভাবে ছন্দিত হয়ে তাঁর মনের নিগূঢ় ভাবগুলি ব্যক্ত করছিল। কখনও তাঁর কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর এমনভাবে ঝংকৃত হচ্ছিল যার দোলা লাগছিল শ্রোতাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে—তাদের বুকের ভেতরটা থেকে থেকেই মোচড়ে উঠেছিল। যখন তারা বেদনায় মুহ্যমান, তখনই স্বামীজীর কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটত, তাতে ফুটে উঠত উচ্ছল খুশির ভাব। কিন্তু সেই ভাব স্থায়ী হতে না হতেই আবার বজ্রগম্ভীর বিষাণে ধ্বনিত হতো জেগে ওঠার উদাত্ত, আকুল আহ্বান। তখনই সকলে নড়েচড়ে বসতো। তাঁর কণ্ঠস্বর যে না শুনেছে সে বুঝবে না সঙ্গীত জিনিসটা কি! সুকণ্ঠ কাকে বলে!

আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর মুখে ভারতবর্ষের এই সনাতন মর্মবাণী শুনেছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥' (হে অমৃতের পুত্রগণ; তোমরা শোনো, এমনকি যাঁরা দিব্যধামবাসী তাঁরাও শুনুন, আমি সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ পরম পুরুষকে জেনেছি শুধুমাত্র যাঁকে জানলেই মৃত্যুকে জয় করা যায়। মুক্তির বা পরিত্রাণের দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।)—অথবা আত্মবিস্মৃত সিংহ-শাবকটির গল্প শুনেছেন, তাঁরা প্রাণের গভীরে যে বিপুল নাড়া খেয়েছিলেন সে স্মৃতি কোনদিনও কি তাঁরা ভুলতে পারবেন? পারবেন না। সত্যের এমনই জোর। তুমি যতই ভ্যা ভ্যা কর, নিজেকে দুর্বল ভেবে মিথ্যা ভয় পাও, তবুও তুমি মেষ নও। তুমি বরাবরই সিংহ ছিলে, এখনও তা-ই আছ—অমিতবিক্রম, নির্ভীক পশুরাজ। 'আমি মেষ'—এই মিথ্যা কল্পনাটিকে শুধু তোমার ত্যাগ করতে হবে। তাহলে এই মুহূর্তেই তুমি বীরকেশরী। 'তত্ত্বমসি'।

স্বামীজীর এই কথাগুলির ভিতর এমন একটা সূক্ষ্ম শক্তি ছিল যা শ্রোতার মনকে এক উচ্চতর, শুদ্ধতর চেতনার রাজ্যে তুলে দিত। যার ফলে, একবার যে স্বামীজীর কথার স্বাদ পেয়েছে, তার পক্ষে আর গড্ডালিকায় গা ভাসান সম্ভব হতো না। তার নবজন্ম হতোই হতো। তার দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ সবই পালটে যেত। এইভাবে শ্রোতার মনে তিনি আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে দিতেন। ধীরে ধীরে সেই বীজ থেকে অঙ্কুর এবং কালে সেই অঙ্কুর ফলে, ফুলে সুশোভিত এক সার্থক বনস্পতিতে পরিণত হতো। আত্মজ্ঞানের এই দিব্যবাণী সুপ্রাচীন—তাতে সন্দেহ নেই। এটা ধরে নিলাম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুই এই তত্ত্বের সাথে পরিচিত এবং তাঁদের মধ্যে কারও কারও ধারণা এই বিষয়ে স্পষ্টতর। কিন্তু বিবেকানন্দের মতো কেউই অত জোরের সাথে, নিজের বুক চিরে সেই তত্ত্বের সত্যকে জগতের কাছে উন্মোচিত করেননি। তাঁর কাছে তত্ত্ব আন্দাজে-ঢিল-ছোঁড়া পণ্ডিতি কচ্‌কচি ছিল না। তত্ত্ব ছিল তাঁর কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো জীবন্ত সত্য। আর সব কিছু অসার, অনিত্য হলেও ঐ তত্ত্ব ছিল তাঁর কাছে একমাত্র নিত্য সত্য। শুধু বিশ্বাসের জোরে নয়, ঐ অনুপম তত্ত্বকে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন, প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং অভ্রান্ত ঐ উপলব্ধির পর তাঁর জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল—মনুষ্য জীবনের ঐ চরম লক্ষ্যপথে অন্যদেরও সাহায্য করা। তাই তাঁর আহ্বান ঃ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত।' ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না চরম লক্ষ্যে পৌঁছাও, এগিয়ে চল। থেমো না।

তাঁর বক্তৃতার অবিস্মরণীয় সেই প্রথম একটি ঘণ্টায় তিনি এমনভাবে আমাদের মনগুলিকে তাঁর আপন চৈতন্য সত্তার সঙ্গে এক ভূমিতে তুলে দিলেন যে ঐ দুরূহ তত্ত্বের কিছুটা যেন তখনই আমরা অনুভব করতে পারলাম। পরে ধীরে ধীরে, বহুকষ্টে, সংগ্রাম ও নিরন্তর প্রচেষ্টার পর আমাদের কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পেরেছিল—আমাদের মনটাই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একেই বলে গুরুকৃপা।

যাঁরা ইউনিটেরিয়ান চার্চে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতায় এসেছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বক্তৃতায় না এসে পারলেন না। তাঁরা তো এলেনই, সঙ্গে করে তাঁরা তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট আত্মীয়দেরও এই বলে নিয়ে এলেন ঃ 'চলুন, একজন মহাপুরুষের কথা শুনবেন তো চলুন। তাঁর মতো কথা এর আগে আমরা কারও মুখ থেকে শুনিনি।' ফলে, দলে দলে বহু নতুন শ্রোতাও উদ্‌গ্রীব

হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতে এলেন। ঘর কানায় কানায় ভরে গেল। এত শ্রোতা যে ঘরে আঁটলো না। বহু লোক, সারিবদ্ধ আসনের মাঝখানে চলাচলের যে পথ থাকে, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। বহু শ্রোতা আবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে স্বামীজীকে দেখতে থাকলেন।

স্বামীজী তাঁর মূল বক্তব্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করলেন এবং কখনও রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান, কখনও বিভিন্ন পুরাণ ও লোকগাথার সাহায্যে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে প্রাঞ্জল করে তুললেন। উপনিষদ্ থেকেও তিনি অনর্গল উদ্ধৃতি দিতে লাগলেন। প্রথমে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি আবৃত্তি করলেন, পরে সুললিত ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করে দিলেন। তাঁর বক্তৃতার ভাষা শ্রোতাদের তো মুগ্ধ করেছিলই, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, তার ধ্বনি ও ছন্দ-মাধুর্য তাঁদের আরও বেশি আবিষ্ট করেছিল, নাড়া দিয়েছিল তাঁদের মর্মমূলে। তাঁরা উপনিষদের মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেলেন।

যেদিন তাঁকে 'ভারতবর্ষ'—এই শব্দটি তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে প্রথম উচ্চারণ করতে শুনি, আমার মনে হয়, সেই দিনই আমাদের ভারত-প্রেমের উন্মেষ। মাত্র পাঁচ অক্ষরের একটি শব্দের ভিতর যে এতো ভাব থাকতে পারে, তা যেন বিশ্বাসই হয় না! তাতে ছিল ভালবাসা, আবেগ, গৌরববোধ, সুতীব্র ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, বিষাদ, বীর্যবত্তা, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা এবং সব ছাপিয়ে, ভালবাসা আর ভালবাসা! শত শত গ্রন্থ রচনা করেও অন্যের মধ্যে এমন সর্বগ্রাসী ভাব সঞ্চারিত করা যায় না। কিন্তু, ঐ নামের এমনই জাদু, যাঁরাই শুনেছেন তাঁরাই মজেছেন। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ।' এবং তারপর থেকে চিরদিনের জন্য 'ভারতবর্ষ' তাঁদের অন্তরের ধন হয়ে যায়। ভারতবর্ষের সব কিছুই তখন তাঁদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ওঠে—তার মানুষ, তার ইতিহাস, তার শিল্পকলা, রীতিনীতি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমতল, তার কৃষ্টি, তার আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা, এমন কি তার ধর্মশাস্ত্রগুলি পর্যন্ত জীবন্ত বোধ হয়। তারা যেন কানে কানে কথা বলে ওঠে! ফলে, শুরু হয় নতুন জীবন—ধ্যান ও ধারণার। অনুশীলন ও অনুধ্যানের। সমগ্র জীবনের রূপরেখাটিই পাল্টে যায়।

শিকাগো ধর্মমহাসভা শেষ হলে স্বামী বিবেকানন্দ 'পন্ডস্ লেকচার ব্যুরো'[১] নামে এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের খপ্পরে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী

১ কোম্পানির নামটি সঠিক জানা যায় না—প্রকাশক।

আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তৃতা দিতে রাজি হন। রীতি অনুসারে প্রত্যেক শহরের স্থানীয় কমিটিকে প্রস্তাব দেওয়া হতো 'মানুষের দেবত্ব', 'ভারতের প্রথা ও ভারতীয়দের আচার-আচরণ', 'ভারতের নারী', 'ভারতীয় কৃষ্টি' বা অনুরূপ কয়েকটি বিষয় থেকে আপনারা যে কোনও একটি বিষয় বেছে নিন—বিবেকানন্দ সেই বিষয়েই বক্তৃতা করবেন। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, যে সমস্ত শহরে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা যত কম—যেমন খনি অঞ্চলগুলি, সেখানকার মানুষ বেছে বেছে তত দুর্বোধ্য বিষয়গুলিই নির্বাচন করতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন ঃ 'ওহ্, বোকা-বোকা ভাবলেশহীন মুখগুলির সামনে ধর্মের জটিল বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলা যে কি ঝকমারি, তা তোমাদের কি বলবো!'

এইভাবে সন্ধ্যের বক্তৃতা এবং তারপর সারা রাত গাড়িতে করে এক শহর থেকে আরেক শহরে যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে তাঁর কয়েকটা সপ্তাহ কাটল। কিন্তু ক্রমশ এই বিরক্তিকর কর্মের নাগপাশে তিনি যেন হাঁফিয়ে উঠলেন। ডেট্রয়েট শহরে তাঁর কিছু প্রভাবশালী বন্ধু ছিলেন যাঁদের সঙ্গে শিকাগো থাকতেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীর গুণমুগ্ধ এবং তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁদের কাছে গিয়ে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমাকে বাঁচান আপনারা, আমি এভাবে আর পারছি না।' তখন তাঁরা উদ্যোগী হয়ে লেকচার ব্যুরোর সাথে স্বামীজীর চুক্তি বাতিল করলেন। অবশ্য এর ফলে স্বামীজীকে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হলো।

স্বামীজী প্রথমে ভেবেছিলেন বক্তৃতা দিয়ে কিছু পয়সা উপার্জন করে তা দিয়ে ভারতে কাজ শুরু করবেন। কিন্তু অর্থ উপার্জনের জন্যই যে তিনি বক্তৃতা দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলেন, সে কথা সর্বাংশে সত্য নয়। তাঁকে ছায়ার মতো অহর্নিশ অনুসরণ করে ফিরেছে এক দিব্য প্রেরণা—যে প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু তাঁর গুরুদেব। তিনি কখনও ভোলেননি গুরুদেব তাঁকে এক বিশাল কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন তাঁকে অনেক কাজ করতে হবে। একটি প্রাণপ্রদ, পবিত্র বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কেমন করে? কিভাবে? ডেট্রয়েটে পৌঁছেই স্বামীজী বুঝলেন—না, এইভাবে লেকচার ব্যুরোর হয়ে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর সেই মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সেই পরিণতির দিকে নিয়ে যায় না এমন কোনও কাজের পেছনে আধঘণ্টা সময় অপচয় করতেও আর তিনি রাজি নন। ছ সপ্তাহ তিনি ডেট্রয়েটে রইলেন, কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপ্রবাহের চিন্তা

নিরন্তর ঘিরে রইলো তাঁকে। মাঝে-মধ্যে দু একটি বক্তৃতা তিনি দিলেন বটে, কিন্তু মন নিমগ্ন বহুজনহিতায় সেই কর্মযজ্ঞের ধ্যানে। যাই হোক, আমরা তাঁর একটি বক্তৃতাও বাদ দিইনি। বারবার বিভোর হয়ে শুনলাম অনির্বচনীয় আত্মার সুসমাচার এবং ভারতের কথা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতবর্ষকে আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। বুঝতে পারলাম—আমরা আমাদের 'শিক্ষক' পেয়ে গেছি। 'গুরু' না বলে 'শিক্ষক' বললাম এই জন্য, তখনও আমরা 'গুরু' শব্দটির সাথে পরিচিত হইনি। বক্তৃতায় উপস্থিত থাকলেও তখনও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়নি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? তাঁর কাছ থেকে ইতোমধ্যেই যে অমূল্য শিক্ষা আমরা পেয়েছি তা আয়ত্ত করতেই আমাদের বহু বছর কেটে যাবে। আর আত্মীকরণের সে কাজ সম্পূর্ণ হলে আবার তিনি কোনও না কোনও ভাবে, কোথাও না কোথাও তাঁর অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার নিশ্চয় আমাদের সামনে মেলে ধরবেন।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিষ্যমণ্ডলী

তিনি ধরলেনও তাই। তবে এত শীঘ্র যে সেই সুদিন আসবে আমরা কল্পনাও করিনি। এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই সহস্রদ্বীপোদ্যানে আবার আমাদের দেখা হলো। দেখা না-হয় হলো; কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে যে আমরা একই বাড়িতে থাকতে পাবো, এ আমরা ভাবতেও পারিনি! এ আশাতীত! কল্পনাতীত! কিন্তু তবুও সত্য।

সময়টা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে—১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ, ৬ জুলাই দুর্জয় সাহসে বুক বেঁধে আমরা স্বামীজীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের শুধু এইটুকু জানা ছিল, তিনি একদল 'ছাত্র-ছাত্রী' নিয়ে একত্র আছেন। 'শিষ্য' কথাটার এখন বিশেষ চল নেই বলেই ছাত্র-ছাত্রী কথাটি ব্যবহার করলাম। শিষ্য হতে গেলে অনেক ত্যাগের প্রয়োজন যা এখনকার প্রজন্মের বেশির ভাগ মানুষেরই ধাতে সয় না। সে যা হোক, আমরা ভেবেছিলাম স্বামীজী যেখানে আছেন সেখানে তিনি নিশ্চয় কিছু শিক্ষা বা উপদেশ দিচ্ছেন; আমরাও সেগুলি শুনলে উপকৃত হব। সেই ভেবেই যাত্রা। তার বেশি কিছু আশা করিনি। মিসেস ফাঙ্কি 'Inspired Talks'-এর ('দেববাণী'-র) ভূমিকায় আমাদের সেই যাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন। পুনরুক্তির ভয়ে সে কাহিনী আর এখানে বলছি না।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে আমরা যে কয়েক সপ্তাহ ছিলাম সেই কথাই আমি এখন

বলবো। কিন্তু, সত্যি সত্যি, সে অভিজ্ঞতার কথা কি লিখে বোঝানো যায়' সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর সান্নিধ্যে থাকার সময় আমাদের মন যে উচ্চ ভাবভূমিতে বিরাজ করত সেই স্তরে কারও মন যদি ওঠে, তবে কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই সেই উত্তুঙ্গ অনুভূতি পুনরুদ্ধার করে শব্দের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

এক কথায় বলতে গেলে আমরা তখন আনন্দে ভাসতাম। তখন অবশ্য এ কথা বোঝার মতো বুদ্ধি ছিল না যে তাঁর কাছে আছি বলেই এত আনন্দ। তাঁর প্রভাবেই আমাদের দ্বীপবাসের দিনগুলি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর। প্রেরণার পক্ষপুট বিস্তার করে তিনি আমাদের নিয়ে উড়ে যেতেন ভাবনার দিব্যলোকে, যে লোকে তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ বিহার, যে লোকে বাঁধা তাঁর নিজস্ব নীড়। তিনি নিজেই পরে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন ঃ সহস্রদ্বীপোদ্যানেই আমার সবচেয়ে ভাল কেটেছে। এই ভাললাগার কারণ ঐখানেই তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে খুঁজে পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর ভাবপ্রচারের যন্ত্র-স্বরূপ হতে পারেন—অন্তত তাঁর সেই রকমই মনে হয়েছিল।

আমাদের তিনি মুক্তির পথ দেখাবেন, মুক্ত করে দেবেন—এটিই ছিল স্বামীজীর প্রথম এবং প্রধান ইচ্ছা। একদিন বিধুর কণ্ঠে বলেই ফেললেন ঃ 'আহ্ যদি তোমাদের একটিবার স্পর্শ করে মুক্ত করে দিতে পারতুম!' এতটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না করলেও তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এই—সহস্রদ্বীপোদ্যানের এই ছোট দলটিকে তিনি এমনভাবে নিজের হাতে তৈরি করবেন যাতে তারা নিজেরাই আমেরিকায় তাঁর আদর্শ ও ভাব প্রচারের কাজ চালাতে পারে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'ভারতে এই ভাবাদর্শ ভারতীয়রাই প্রচার করবে, আমেরিকানরা আমেরিকায়।'

তাঁর সেই ছোট বারান্দায় বসে—যেখান থেকে সারি সারি সবুজ গাছের ঝাঁকড়া মাথার দুলুনি আর দূরে কল্লোলিনী সেন্ট লরেন্স নদীর শোভা চোখে পড়তো—স্বামীজী প্রায়শই আমাদের ডেকে বলতেন ঃ 'উঠে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে কিছু বল দেখি।' আসলে স্বামীজী চাইতেন আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখি। এক এক সময় ভাবি—স্বামীজী কি জানতেন তাঁর মতো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তার সামনে যদি কোনওমতে আমরা নিজেদের জড়তাটা কাটিয়ে উঠতে পারি, তাহলে দুনিয়ার কোনও শ্রোতাই আমাদের ভয়ের কারণ হবে না? স্বামীজী যাই ভেবে থাকুন না কেন—আমাদের তো প্রাণ যায়! সে যেন একটা

আগ্নপরীক্ষা! এক এক করে তিনি প্রত্যেককেই ডাকবেন এবং তাকে দিয়ে কিছু বলিয়ে তবে ছাড়বেন। এর থেকে কারোর রেহাই ছিল না। হয়তো সেই কারণেই আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বামীজীর সান্ধ্য বৈঠকে ডুব দিতেন। যদিও তাঁরা এ কথা খুব ভালো করেই জানতেন, রাত যতই গভীর হয় স্বামীজীর ভাবতন্ময়তা ততই বাড়ে। আমরা অধিকাংশই অবশ্য ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ ধ্বনিকে গ্রাহ্যই করতাম না। স্বামীজীর কথা শোনার জন্যে রাত দুটো পর্যন্ত জেগে বসে থাকা আমাদের কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। কতদিন এমন হয়েছে—চোখের সামনে চাঁদ উঠলো আবার চোখের সামনেই মিলিয়ে গেল ভোরের আলোয়। স্থান-কালের সীমারেখা তখন আমাদের জীবনে সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়েছিল।

সন্ধ্যাবেলায় পূতসঙ্গের লোভে আমরা যখন স্বামীজীর পদপ্রান্তে এসে ওপরের বারান্দায় বসতাম, তখন অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গের কোনও ধরাবাঁধা রুটিন ছিল না, যে আজ এই-এই বিষয় আলোচনা হবে। স্বামীজী তাঁর ঘরের দরজার সামনে বড় চেয়ারটিতে বসে থাকতেন। কখনও তিনি গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন। সেই দেখে আমরাও ধ্যানে, নয়তো বা স্তব্ধ হয়ে বসে তাঁর ধ্যানতন্ময় মূর্তি দেখে প্রাণের গভীরে এক অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করতাম। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। রাত বাড়তে থাকলে আমরা একে একে যে যার ঘরে ফিরে যেতাম; কারণ জানতাম, গভীর ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে স্বামীজী আর কথা বলতে চাইবেন না। কোনও কোনও দিন আবার অল্প কিছুক্ষণ ধ্যানের পর স্বামীজী আমাদের প্রশ্ন করতে বলতেন আর আমাদের মধ্য থেকে কাউকে বলতেন ঃ 'তুমিই আজ সবার প্রশ্নের উত্তর দাও।' উত্তরে ভুলচুক যাই ঘটুক না কেন স্বামীজী আমাদের মাথা ঘামিয়ে সঠিক সমাধানটি খুঁজে বের করার প্রেরণা দিতেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যখন সত্য ছুঁই-ছুঁই, ঠিক তখনই দু একটি কথায় তিনি আমাদের সব সংশয় দূর করে দিতেন। এই ছিল স্বামীজীর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি। শিক্ষার্থীর মনকে কিভাবে উৎসাহিত করতে হয়, নিজের প্রশ্নের মীমাংসা কিভাবে নিজেকেই করতে হয়—এটা তিনি খুব ভাল জানতেন। যখনই আমাদের মাথায় কোনও একটা নতুন চিন্তা এসেছে বা কোনও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জিনিসকে দেখতে অনুপ্রাণিত হয়েছি, তখনই আমরা ঐ বিষয়ে স্বামীজীর মত জানার জন্য তাঁর কাছে ছুটে যেতাম আর বলতাম ঃ 'স্বামীজী, আমার মনে হচ্ছে এটা এ-ই হবে।' সরাসরি হ্যাঁ-না কোনও কিছু না বলে যাতে আমরা ঐ ব্যাপারটি নিয়ে আরও গভীর চিন্তা করি সেইজন্য স্বামীজী বলতেন ঃ 'তাই নাকি?' ফলে আবার বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তা-

ভাবনা শুরু হতো। যখন ধারণা আরও কিছুটা স্পষ্ট হলো, আবার স্বামীজীর কাছে ছোটা, এবং আবারও সেই উত্তর ঃ 'তাই নাকি?' অর্থাৎ আরও গভীরভাবে চিন্তা কর। এইভাবে সম্ভবত বার তিনেক 'তাই নাকি? তাই নাকি'-র পর যখন আমাদের চিন্তাশক্তিতে আর কুলাতো না, তখন আমাদের চিন্তার মধ্যে ভুলটা কোথায় স্বামীজী তা দেখিয়ে দিতেন। আমরা, যারা পাশ্চাত্যের মানুষ, তারা ছোটবেলা থেকেই একভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুলটা সেই কারণেই হতো।

আর স্বামীজী সেটা খুব ভালভাবে জানতেন বলেই এত অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে, এত সুগভীর ভালবাসা দিয়ে আমাদের গড়ে তুলেছিলেন। এ যে কত বড় অহৈতুকী কৃপা তা আর কি বলবো! পরে, ভারতবর্ষে ফিরে, স্বামীজী চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব শিষ্য-শিষ্যাদের একত্র করে হিমালয়ের কোনও একটি নিভৃত স্থানে আর কিছু দিন শিক্ষা দেবেন।

সেবার সেই গ্রীষ্মে স্বামীজীকে কেন্দ্র করে যাঁরা সহস্রদ্বীপোদ্যানে জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা এক অর্থে সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। স্বামীজীর খোঁজে পথে বেরিয়ে যে দোকানীটিকে তাঁর বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে ঠিকই বলেছিল ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাহাড়ের ওপর ঐ বাড়িটিতে কয়েকজন অদ্ভুত ধরনের মানুষ থাকেন বটে! ওঁদের মধ্যে আবার একজন বিদেশীও আছেন।'

আমাদের ঐ ছোট্ট দলে তিন বন্ধু ছিলেন যাঁরা স্বামীজীর নিউইয়র্কের ক্লাসগুলিতে নিয়মিত হাজির থাকতেন। তাঁরা হলেন মিস এস. ই. ওয়াল্ডো, মিস রুথ এলিস এবং ডাঃ উইট (Wight)। গত তিরিশ বছর ধরে দর্শন বিষয়ে যেখানে যত বক্তৃতা হয়েছে, তাঁরা সব শুনেছেন; কিন্তু সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর কাছে এসে তারা যে সত্যের সন্ধান পেয়েছেন, তার সাথে তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতার কোনও তুলনাই চলে না। আর এই স্বীকারোক্তি স্বয়ং ডাঃ উইট-ই আমার মতো নবাগতদের কাছে করেছেন। আর মিস ওয়াল্ডো? একনাগাড়ে দীর্ঘকাল বক্তৃতা শুনে শুনে তাঁর এমনই একটা ক্ষমতা জন্মেছিল যে যে কোনও বক্তৃতা শুনে তিনি চট্ করে দু-একটি শব্দে সমস্ত বক্তৃতার সারাৎসারটি ধরে রাখতে পারতেন। তাঁর জন্যই আমরা 'Inspired Talks' ('দেববাণী')-এর মতো অমূল্য গ্রন্থখানি পেয়েছি। সে বছরই ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই ওপর কয়েকটি ক্লাসের ভার দিয়ে যান এবং স্বামীজী যখন ফিরিলেন, তখন মিস ওয়াল্ডোকে তাঁর কাজে অকৃপণভাবে সাহায্য

করার সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন। পতঞ্জলি-র যোগসূত্রের ওপর ভাষ্যটি তিনি মুখে-মুখেই মিস ওয়াল্ডোকে বলে গিয়েছিলেন এবং মিস ওয়াল্ডো ঠিক তেমন-তেমন ভাবেই টুকে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ-এর ওপর স্বামীজীর বইগুলি প্রকাশনার ব্যাপারেও তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ, পরিশীলিত মন এবং সর্বোপরি নিষ্ঠা-ভক্তি তাঁকে স্বামীজীর আদর্শ সহকারী হতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

এবার রুথ এলিসের কথায় আসি। নম্র, মিতভাষী এবং লাজুক রুথ নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রে কাজ করত। কিন্তু স্বল্পবাক ও মুখচোরা হলে কি হয়, স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল তার অপরিসীম। পরম ভালবেসে এবং অবশ্যই মজা করে যাঁকে আমরা 'Little Old Docky Wight' বা 'বুড়ো খোকা ডকি উইট' বলে ডাকতাম, সেই ডাঃ উইট রুথকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। রুথ থেকে যখন ডকির কথায় এসেই গেলাম, তখন বলি, তাঁর বয়স তখন সত্তর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু তাহলে কি হয়, তাঁর এতো উৎসাহ, এতো আগ্রহ যে দেখলে মনে হয় সরল বালক! প্রত্যেক ক্লাসের শেষে যখন কিছুক্ষণের বিরতি হতো, তখন স্বামীজীর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে, টেকো মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বুড়ো-খোকা 'ডকি' নাকিসুরে বলে উঠতেন ঃ 'তাহলে স্বামীজী, মোদ্দা কথাটা তো এই দাঁড়াচ্ছে, "আমিই সেই পরম ব্রহ্ম!" আমরা সকলেই ডকির এই আপ্ত-বাক্যটির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আর স্বামীজী ডকির সেই কথা শুনে স্নেহময় পিতার মতো হেসে বলতেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' এই মধুর সস্নেহ আলাপনের সময় তিরিশ বছরের যুবক স্বামীজীকে সত্তর বছর বয়স্ক ডকির চেয়েও সহস্রগুণ প্রবীণ বলে মনে হতো। প্রাজ্ঞ, কিন্তু বৃদ্ধ নন। বরং বলা যায়, যুগ যুগ সঞ্চিত জ্ঞানের আলোয় আলোকিত চিরপ্রবীণ যুবা। কখনও কখনও তিনি নিজেই বলতেন ঃ 'মনে হয় আমি তিনশো বছরের বৃদ্ধ।' এই কথা বলার পর তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

স্টেলা থাকতো তলার একটা ঘরে। প্রথম কয়েকদিন তো আমরা তাকে দেখতেই পাইনি, কারণ কদাচিৎ সে স্বামীজীর ক্লাসে আসত। শুনেছিলাম সে নাকি সাধন-ভজন নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে; ক্লাসে আসলে তার সেই সাধনের বিঘ্ন হতে পারে। স্বভাবতই তার ব্যাপারে আমাদের খুব কৌতূহল ছিল। পরে অবশ্য তার সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনেছি। জেনেছি তিনি একজন অভিনেত্রী ছিলেন। পুরনো সংস্কার তো আর সহজে যায় না! তাই ভাবতাম,

বুঝি এ আবার এক নতুন নাটক শুরু হলো। হারিয়ে যাওয়া রূপ আর যৌবন ফিরে পাবার এ কি এক নতুন কৌশল? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কথাটা সত্যি। আমেরিকানদের কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থ রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি। তাঁর উচ্চতম শিক্ষা ও উপদেশের যে কেউ এমন কদর্থ করতে পারে, তা স্বামীজী কেমন করে বুঝবেন? তিনি এই ব্যাপারে কতটা সচেতন তা নিয়ে আমাদের মনেও প্রথমটায় বেশ সংশয় ছিল। কিন্তু অচিরেই সেই সন্দেহ দূর হলো। দূর হলো স্বামীজীর কথাতেই। তিনি একদিন বললেন ঃ 'ঐ খুকীটিকে আমি পছন্দ করি কারণ ওর মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নেই।'

স্বামীজী বললেন। কিন্তু আমরা কোনও হুঁ-হাঁ করলাম না। শুধু শুনে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর গলার আওয়াজ বদলে গেলো। খুব গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন ঃ 'ওকে "খুকী" বলে ডাকি এই আশায় যে ঐ ডাকটাই হয়তো একদিন ওকে শিশুর মতো সরল, অকপট করে তুলবে।' হয়তো ঐ কারণেই স্বামীজী তাকে গোপাল-মন্ত্র দিয়েছিলেন।

আমরা যখন সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে চলে আসি, স্টেলা তখন 'Orchard Lake'-এ যায় নির্জনবাসের জন্য। এক-কামরার একটা বাড়ি তৈরি করিয়ে সে সেখানে একলাই থাকত। এসব ক্ষেত্রে প্রায়শই যা হয়—অদ্ভুত সব গুজব ছড়াতে লাগলো। সে নাকি পাগড়ি বাঁধে। সে নাকি বিদ্‌ঘুটে সব 'যোগ' অভ্যাস করে! মজার ব্যাপার, যোগের অর্থ তখন কেউই বুঝত না। যোগ বলতে সাধারণের ধারণা ছিল ও একটা কিম্ভূতকিমাকার ভারতীয় গুহ্যবিদ্যা, ক্রিয়াকলাপের ব্যাপার। ফলে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে অনেক কাগজের রিপোর্টার স্টেলার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ভিড় করতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক সুপরিচিত লেখকের কথা। তাঁর বয়স যখন কম, তখন তিনি লিফট চালাতেন। তিনিই সর্বপ্রথম এই নির্জন দ্বীপবাসী যোগিনীর গল্প লিখে 'ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস'-এ পাঠান এবং আশ্চর্যের কথা, সেই লেখা ফলাও করে ছাপাও হয়। লেখক নিজেও এতটা আশা করেন নি। অনেক পরে যখন সেই লেখকের বেশ নামডাক হয়, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ 'ঐ লেখাটি প্রকাশিত হবার পর থেকে আমার ধারণা হলো আমি যা-ই লিখবো, লোকে তাই নেবে।' কিন্তু হায়! খ্যাতি অত সুলভ নয়। তার জন্য বিস্তর এবং দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়। ঐ লেখককেও তাই করতে হয়েছিল। প্রকাশক ও সম্পাদকমণ্ডলীর নেকনজরে পড়ার জন্য তাঁকেও বহু বছর অপেক্ষা করতে

হয়। ঐ নিরন্তর লেগে থাকার দরুণই 'যোগ'-এর সঠিক অর্থ একদিন তিনি বুঝতে পারেন এবং সেইদিন থেকেই ভারতবর্ষ তাঁর কাছে পবিত্র এক দেশ—যেখানে মানুষ বেড়াতে যায় না, যায় তীর্থযাত্রী হিসেবে পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে। ঐ লেখকের ভারত-প্রীতির প্রমাণ তাঁর প্রথম উপন্যাস যার মুখ্য পটভূমি হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন এই ভারতবর্ষকেই। কী নিবিড় অনুভব এবং বিরল অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি ভারতীয় পল্লীজীবনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে পাঠক যেন কয়েক ঘণ্টার জন্য ভারততীর্থ পরিক্রমা করে আসেন। কে বলতে পারে, এই লেখকের জীবন আংশিকভাবে হলেও স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি, বিশেষত তিনি যখন বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন? লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'যাঁরাই কোনও না কোনওভাবে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছেন।'

স্টেলার কথা বলতে বলতে লেখকের কথায় চলে এসেছি। তাঁর কথা শেষ হওয়ায় আবার স্টেলার কথাতেই ফিরি। নির্জন দ্বীপবাসের পর স্টেলা আবার সাধারণ জীবনে ফিরে যায়। তারপর দীর্ঘকাল সে বেপাত্তা। আমরা কেউই তার কোনও হদিশ পাইনি। মাত্র কয়েক মাস আগে খবর পেলাম—তার দেহ গেছে। আমাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে মাঝের তিরিশটা বছর সে যে কি নিয়ে ভরে ছিল, কেনই বা সে কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখলো না, এমনকি স্বামীজী, যিনি তার জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করে, তাতে জলসিঞ্চন করেছিলেন, তাঁর সাথেও না—এ এক অপার রহস্য! কে সে উত্তর দেবে? আমরা কেবল এইটুকু বিশ্বাস করতে পারি, ভগবৎ প্রেমের যে বীজ স্বামীজী তাকে দিয়েছিলেন, সেই বীজ ফলবতী হয়েছিল। সার্থক হয়েছিল।

মিসেস ফাঙ্কি সম্পর্কে স্বামীজী বলতেন ঃ 'ও আমাকে মুক্তি দেয়।' বাস্তবিক, ফাঙ্কির সামনে স্বামীজী যেভাবে নিজেকে মেলে ধরতেন, যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব তাঁর মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠতো, অন্য আর পাঁচজনের উপস্থিতিতে তেমনটি কদাচিৎ ঘটতে দেখেছি। আরেকবার ফাঙ্কির কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন—'ও বড় সরল!' এ কথা শুনে ফাঙ্কি খুব মজা পেত। তার সর্বক্ষণ চেষ্টা ছিল, কি করে স্বামীজীকে একটু আনন্দে রাখা যায়। সম্ভবত আমাদের মধ্যে কেউই তার মতো স্বামীজীর বিশ্রাম, বিনোদন ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অত চিন্তাভাবনা করেনি। ফাঙ্কি বুঝতো দেহ-মন সব সময় চড়ে থাকা

ভাল নয়। তাই অন্যরা যখন স্বামীজীর প্রতিটি কথা গোগ্রাসে গিলতো, তখন ফাঙ্কি ভাবতো স্বামীজীকে কি করে একটু আনন্দ দেওয়া যায়। সে স্বামীজীকে মজার মজার সব গল্প শোনাত। কখনও বা হালকা চালে নিজেকে নিয়েও রসিকতা করতো। ওর কাণ্ড দেখে স্বামীজী একজনকে বলেছিলেন ঃ 'ও আমাকে একটু বিশ্রাম দিতে চায়।' স্বামীজী যাকে এই কথা বলেছিলেন তাকেই আবার ফাঙ্কি একদিন বলেন ঃ 'জানি, স্বামীজী আমাকে বোকা ভাবেন। কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। স্বামীজী আনন্দে থাকলেই আমি খুশি।' যেহেতু স্বামীজীর মতো পরম দাতার কাছেও ফাঙ্কির কিছু চাওয়ার ছিল না, সেই জন্যই স্বামীজীর বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতিটুকু সে অমলিন, অকৃপণভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। তার হাসিখুশি স্বভাব, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, উৎসাহ—সব কিছুই বড় মধুর। বড় তৃপ্তিদায়ক। অন্যদিকের আকর্ষণও তার বড় একটা কম ছিল না। সে অসম্ভব সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী। এমনকি আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তার সেই শ্রী অটুট। স্বামীজীর প্রসঙ্গ উঠলে আজও তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, প্রবল উৎসাহে সে যেন আবার নতুন করে জ্বলে ওঠে। হারিয়ে ফেলে নিজেকে। তাকে দেখলে মনে হয় আজও স্বামীজী বেঁচে আছেন, তাঁর উপস্থিতি যেন টের পাওয়া যায়। ভাগ্যবানেরই এমন অনুভূতি, এমন দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়! যখন তার ভগ্ন, দুর্বহ শরীরটিকে ছেড়ে দেবার অন্তিম লগ্ন উপস্থিত হবে, তখন, কোনও সন্দেহই নেই, সম্মুখের আগ্রাসী অন্ধকার প্রনষ্ট হয়ে সবকিছু আলোয় পরিপ্লাবিত হবে এবং সেই জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডলে আবির্ভূত হবেন এক দিব্য পুরুষ, যাঁর হাতে ধরা ইহজীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার—মুক্তি।

স্বামীজীর তখনকার একটা মত ছিল—গোঁড়ামি হচ্ছে বিপথগামী শক্তি। এই শক্তির প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে যদি উচ্চতর খাতে বইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই শক্তিই বিরাট আকার নিয়ে দশজনের মঙ্গল করতে পারে। শক্তি আমাদের চা-ই চাই। এই মনোভাব থেকেই তিনি মেরি লুইস এবং লিয়ন্ ল্যান্ডস্বার্গ—এই দুজনকে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন। মেরি লুইস এবং ল্যান্ডস্বার্গ, দুজনের মধ্যেই স্বামীজী প্রচণ্ড গোঁড়ামি দেখে ওঁদের অমূল্য শক্তিকে কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নানা কারণেই আমাদের ছোট, দলটিতে মেরি লুইসকে একটু বিশেষভাবে চোখে পড়ত। একটু অন্য ধাঁচের মানুষ ছিলেন তিনি। বছর পঞ্চাশ বয়েস। লম্বা, কাটা-কাটা নাক, মুখ। এতটাই পুরুষালি গড়ন যে দুবার না দেখে বোঝাই যেত না, ছেলে কি মেয়ে। তখনও মহিলাদের মধ্যে 'ববড্ হেয়ার' চালু হয়নি, কিন্তু তাঁর চুল তখনই ছোট ছোট করে ছাঁটা। লম্বা-

লম্বা হাত-পা, গলার গম্ভীর আওয়াজ, এবং ভারতে ব্যাটাছেলেরা যেমন পরেন, অনেকটা সেই গোছের ঢোলা বহির্বাস। তিনি বলতেন ঃ আমার হচ্ছে সর্বোচ্চ জ্ঞানের পথ। তিনি বেশ কয়েকটি চরমপন্থী দলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতেন। শিক্ষাদীক্ষা তাঁর বেশ ভালই ছিল এবং বেশ বলতে পারতেন। মেরি বলতেন ঃ 'বক্তৃতামঞ্চেই আমার স্থান।' দাম্ভিকতা এবং ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুনই তিনি স্বামীজীর শিষ্যত্ব এবং তাঁর আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অনুপযুক্তা বিবেচিত হলেন। তিনি সকলের আগে সহস্রদ্বীপোদ্যান ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে প্রথমে ক্যালিফর্ণিয়া এবং পরে ওয়াশিংটনে দুটি বেদান্ত চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

আমাদের দলের সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে লিয়ন্ ল্যান্ডস্বার্গ ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ। আমেরিকার নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে তিনি রাশিয়ান ইহুদি ছিলেন। ইহুদিদের সব ভাল গুণগুলিই তাঁর মধ্যে ছিল—আবেগ, কল্পনা, বিদ্যানুরাগ, প্রতিভাকে সমাদর করার মতো বিরাট হৃদয়। কি নয়? তিন-তিনটে বছর তিনি স্বামীজীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন—সঙ্গী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সচিব রূপে, আবার সেবক হিসেবেও। ইউরোপীয় দর্শন, সংস্কৃতি ও একাধিক ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান তাঁর মনকে ব্যাপ্তি এবং দুর্লভ গভীরতা উভয় বৈশিষ্ট্যেই সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর ভিতরে তেজ ছিল, ছিল সৌন্দর্য। কিন্তু সব ছাপিয়ে ফুটে উঠতো নিজের প্রতি উদাসীনতা। তাঁর এই নির্লিপ্ত, গোঁড়ামি এবং গরিবদের প্রতি টান—যা অনেক সময় বাতিকের পর্যায়ে চলে যেত—এই তিনটি কারণেই স্বামীজী তাঁকে টেনেছিলেন। প্রায় দেখা যেত তাঁর শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তিনি কোনও ভিখারিকে দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এটা মনে করলে ভুল হবে তাঁর অঢেল টাকা ছিল—তাই থেকে তিনি গরিবদের সাহায্য করতেন। তা, কিন্তু নয়। বরং বলা যায়, যারা তাঁর সাহায্য পেতেন, তিনি প্রায় তাদের মতই অর্থকষ্টে ভুগতেন। নিউইয়র্কের একটি কাগজে অল্প সময়ের কিছু কাজ করে তিনি সামান্য অর্থ উপার্জন করতেন। যখন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে ৩৩নং স্ট্রীটে থাকতেন, তখন ঐ টাকাতেই দুজনের চলতো। কখনও তাতে কোনও রকমে কুলিয়ে যেত, কখনও কুলাতো না। ক্লাস শেষ হলে রাত্রে দুজন্ একসঙ্গে হাঁটতে বেরোতেন। ফেরার পথে অল্প পয়সায় যা হোক হালকা কিছু খেয়ে নিতেন—কারণ পকেট প্রায়শই ফাঁকা থাকতো। কিন্তু এই যে টানাটানি, এতে দুজনার কেউই এতটুকু বিচলিত হতেন না, কারণ তাঁরা জানতেন—'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।'

ল্যান্ডস্‌বার্গ যেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা—সব শাখাতেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাছাড়া ইহুদি জাতির ইতিহাসের দুটি পরম্পরাও—তার অতীত গৌরব এবং পরবর্তী বিপর্যয়—তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল। অন্যদিকে পুঁথিপত্রের চেয়েও মানুষের জীবনকে স্বামীজী অধিক মূল্য দিতেন বলেই ল্যান্ডস্‌বার্গের সঙ্গ তাঁকে আনন্দ দিত। দুজনের এই সখ্যতা দুটি সুপ্রাচীন জাতির মধ্যে এক মিলনসেতু রচনা করেছিল।

যাঁরা প্রথমদিকে সহস্রদ্বীপোদ্যানে এসে স্বামীজীর কৃপা লাভ করেছিলেন ল্যান্ডস্‌বার্গ তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর দয়ালু স্বভাবের জন্যই স্বামীজী তাঁর নতুন নাম দিলেন 'কৃপানন্দ'। তীব্র ভাবাবেগসম্পন্ন মানুষ বলেই স্বামীজী তাঁকে ভক্তিপথে, অর্থাৎ পূজা এবং ঈশ্বরানুরাগের পথে চালিত করেছিলেন। কারণ আবেগের মধ্যদিয়েই ভক্তির সহজ বিকাশ হয়। ল্যান্ডস্‌বার্গকেই স্বামীজী তাঁর ভাব প্রচারের কাজে প্রথম লাগালেন।

ডেট্রয়েট ছেড়ে স্বামীজী নিউইয়র্কে যান। নিউইয়র্ক হলো আমেরিকান সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। স্বামীজীর আশা ছিল সেখানে তিনি তাঁর পরিকল্পনা মতো কাজ শুরু করতে পারবেন। সেখানে গিয়ে তিনি কিছু বিত্তবান বন্ধুও পেলেন যাঁরা তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। তাঁদের সবই ভালো, কিন্তু তাঁরা স্বামীজীর শিক্ষাকে জীবনে রূপ দেবার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা স্বামীজীর জন্য ভালো খাওয়া, ভালো পরা, এবং ভালো থাকার সব বন্দোবস্তই করেছিলেন। কিন্তু, সোনার খাঁচাও তো খাঁচা। তাতে কি সিংহ তুষ্ট হয়? ফলে, আবার বেদান্ত-কেশরীর 'নেতি নেতি' হু-হুঙ্কার। তিনি বুঝতে পারলেন—এ অবস্থায় আমার কাজ একেবারেই অসম্ভব।'

অনেক ভেবেচিন্তে এবার স্বামীজী ঠিক করলেন তিনি একাই থাকবেন এবং যেখানে থাকবেন সেখানেই ক্লাস নেবেন। যাদের ইচ্ছা তারাই ক্লাসে আসতে পারবে। ল্যান্ডস্‌বার্গকে বললেন ঃ সস্তায় ঘর দেখো দিকি। খোঁজখবর করে ল্যান্ডস্‌বার্গ ৬৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীটে ঘর যোগাড় করলেন বটে, কিন্তু কানাঘুযো হলো, যে পাড়ায় ঘর নেওয়া হয়েছে, সেখানে রুচিবান মানুষ, বিশেষ করে ভদ্রমহিলারা কখনও আসবেন না। কিন্তু আশ্চর্য! ধনী, দরিদ্র, সব রকমের মানুষই ঐ তথাকথিত নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ঘরে আসতে লাগলেন। তাঁরা চেয়ারে বসতেন। যখন ভিড়ের দরুন চেয়ারে কুলাতো না, তখন তাঁরা যেখানে পারতেন সেখানেই বসে পড়তেন—টেবিল, সিঁড়ি, এমনকি ওয়াশস্ট্যান্ডেও। কোটিপতি

ঘরের মহিলারাও স্বামীজীর পায়ের কাছে মেঝেতে বসতে পেরে কৃতার্থবোধ করতেন। স্বামীজী ক্লাস করে কোনও পয়সা নিতেন না। ফলে মাসের শেষে প্রায়শই ঘর-ভাড়ার টাকাও থাকত না। স্বামীজী তখন নিতান্ত দায়ে পড়েই ঠিক করলেন, মাঝে মাঝে তিনি অন্যান্য বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিয়ে কিছু অর্থের সংস্থান করবেন। সে বছর গোটা শীতটাই তিনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটলেন। কিন্তু এত অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি একটা পয়সাও জমাতে পারলেন না। প্রচণ্ড অনিশ্চয়তার মধ্যে তবুও তিনি কাজ চালাতে লাগলেন। এক-এক সময় মনে হতো, ক্লাস বুঝি এবার বন্ধই হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় সঙ্গতিসম্পন্ন কেউ কেউ স্বামীজীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন—স্বামীজী, আপনার কোনও চিন্তা নেই; আমরাই সব টাকাকড়ি যোগাবো। কিন্তু আমাদের দুটি শর্ত আছে। স্বামীজী বললেন—কি তোমাদের শর্ত? তাঁরা বললেন ঃ প্রথম শর্ত হচ্ছে একটা 'ভদ্র পরিবেশে' বাড়ি ঠিক করতে হবে। এবং দ্বিতীয় শর্ত—বেছে বেছে উপযুক্ত 'ভদ্রলোকদেরই' আপনার ক্লাসে আসতে বলা হবে। কিন্তু শর্তের শৃঙ্খল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী করবেন কোন্ দুঃখে? এই দাসত্ব করার জন্যই কি ঘরবাড়ি ছেড়ে তিনি সন্ন্যাসীর গৈরিক অঙ্গে তুলেছেন? নাম-যশের মোহকে শূকরী-বিষ্ঠা জ্ঞান করে পথের ধূলায় শয্যা পেতেছেন? কখনোই না। তাঁর ত্যাগের তুলনায় সামান্য এই আর্থিক নিরাপত্তা অতি নগণ্য। স্বামীজী তাই সিদ্ধান্ত নিলেন—এখন থেকে তিনি আর মানুষের সাহায্যের ওপর নির্ভর করবেন না। যদি তাঁর কাজ ঠিক ঠিক ঈশ্বরের কাজ হয়, তবে সাহায্য আপনিই আসবে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তিনি সমাজের উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপোষ করে আদর্শকে খাটো করবেন না। তাই তিনি বিত্তবান অনুগ্রহকারীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এই সময়কার একটি চিঠিতে স্বামীজীর এই মনোভাবের ছবিটি ধরা পড়েছে। স্বামীজী লিখছেন ঃ '..."ঠিক ঠিক লোকের" সাথে আমি পরিচিত হই। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সার বুঝেছি, কেবলমাত্র যারা ঈশ্বরপ্রেরিত, তারাই "ঠিক ঠিক লোক"। তারাই পারে এবং তারাই আমাকে সাহায্য করবে। বাকি যারা, ভগবান তাদের মঙ্গল করুন এবং তাদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। ...প্রভু আমার, তোমার কৃপায় কি মানুষের সহজে বিশ্বাস আসে!!! শিব! শিব! ভালো লোকই বা কোথায়. মন্দ লোকই বা কোথায়? সবই তো দেখছি তিনি। বাঘের মধ্যেও তিনি! মেষ শিশুটির ভেতরেও তিনি। সাধুর মধ্যেও তিনি, পাপীর মধ্যেও তিনি, তিনিই সব হয়েছেন! কায়মনোবাক্যে আমি তাঁরই আশ্রয় নিয়েছি। সারা জীবন

যিনি আমাকে তাঁর কোলে ঠাঁই দিয়েছেন, তিনি কি আমাকে এখন ত্যাগ করবেন? ঈশ্বর যদি কৃপা না করেন সমুদ্রও জলশূন্য হয়ে যায়, গভীরতম অরণ্যও নিষ্পত্র হয়, লক্ষ্মীর ভাঁড়ারও ফাঁকা হয়ে যায়। আর তিনি যদি চান তো মরুভূমির বুকেও তিনি নদীর কলতান শোনাতে পারেন, পথের ভিখারিও পায় কুবেরের ঐশ্বর্য। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাময় প্রভু—এ কি শুধু কথার কথা? না জীবন্ত সত্য?

'ঢের হয়েছে, "সুন্দর পরিবেশ, ঠিক ঠিক শ্রোতার কাছে বক্তব্য পেশ করে" আর কাজ নেই! ঠিক, বেঠিক—তুমিই আমার সর্বস্ব, হে পরম শিব! প্রভু আমার, আশৈশব আমি তোমার শরণাগত। হে আমার পরম আশ্রয়, হে আমার বন্ধু, গুরু, জীবনের ধ্রুবতারা, হে আমার পরমেশ্বর, পরমাত্মা—আমি নিশ্চিত, উত্তর মেরুতে থাকি আর দক্ষিণ মেরুতেই থাকি, জঙ্গলে, পর্বতে বা সমুদ্রে যখন যেখানেই থাকি না কেন, তুমি আমাকে কখনোই ছেড়ে যাবে না, কখনোই না।...দেবতা আমার, এই সব দুর্বলতা থেকে তুমি আমাকে চিরকাল রক্ষা কোরো, আর দেখো, আমি যেন কখনও তুমি ছাড়া আর অন্য কারও কাছে কোন সাহায্য প্রত্যাশা না করি। একজন যথার্থ ভালো লোককে বিশ্বাস করেই কেউ কখনও ঠকে না। আর যে তুমি সকল ভালোর উৎস, যে তুমি ভালো করেই জানো, আমি সারাটা জীবন শুধু তোমারই দাস—সেই আমাকে কি তুমি পরিত্যাগ করবে, ছেড়ে যাবে? আমি অন্যের হাতে খেলার পুতুল হয়ে যাবো বা পথভ্রষ্ট হব, এ তুমি কখনোই চাও না— এ আমি বেশ জানি। এও জানি তুমি কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না।'

এরপর খুব উৎসাহী এবং অনুগত কিছু ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেওয়ায় স্বামীজীর কাজে আর কোনও রকম অসুবিধা হয়নি। স্বামীজী লিখলেন ঃ 'জগতের ইতিহাসে এমন কখনও কি দেখা গেছে যে শুধু টাকার জোরেই মহৎ কোনো কাজ সিদ্ধ হয়েছে? হৃদয় এবং মস্তিষ্কের দ্বারাই চিরকাল তা সম্ভব হয়েছে, টাকার দ্বারা নয়।'

সারা শীতটাই স্বামীজীর কাজ চললো। শীতের শেষে, অথবা বলা যেতে পারে, গ্রীষ্মের শুরুতেই যখন ক্লাস শেষ হবার কথা, তখন এই একান্ত অনুরক্ত ভক্তের দলটি বললো ঃ স্বামীজী, ক্লাস বন্ধ হোক—এ আমরা চাই না। আমরা আরও ক্লাস করতে চাই।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজনের সেণ্ট লরেন্স নদীর ওপর সহস্রদ্বীপোদ্যানে

একটা বাড়ি ছিল। সকলে মিলে ঠিক করলেন গ্রীষ্মকালটা ওখানেই কাটান হবে। তাঁরা স্বামীজীকে তাঁদের ইচ্ছার কথা জানালেন। এ ব্যাপারে তাঁদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে স্বামীজী খুশি হয়ে বললেন ঃ বেশ, তাই হবে। এক বন্ধুকে তিনি লিখলেন ঃ এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে আমি কয়েকজনকে 'যোগী' করতে চাই। স্বামীজী বুঝেছিলেন তাঁর কাজ এইবার ঠিক মতো শুরু হয়েছে এবং যাঁরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেবার জন্য সহস্রদ্বীপোদ্যানে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা যথার্থই তাঁর শিষ্য-শিষ্যা।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মিসেস ওলি বুল-কে স্বামীজী লিখছেন ঃ 'এই সপ্তাহে আমার ক্লাস শেষ হচ্ছে। সামনের শনিবার মিঃ লেগেটের সঙ্গে মেইনে যাচ্ছি। ওখানে তাঁর একটি চমৎকার হ্রদ এবং বেশ কিছু বনভূমি আছে। দু-তিন সপ্তাহ থাকবো। সেখান থেকে সহস্রদ্বীপোদ্যানে ফিরবো। ১৮ জুলাই কানাডার টরেন্টোতে একটি ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ আছে। সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকেই সেখানে যাবো এবং ফিরে আসবো, এই মনস্থ করেছি।'

৭ জুনের চিঠিতে স্বামীজী লিখলেন ঃ 'শেষপর্যন্ত মিঃ লেগেটের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমার দেখা দর্শনীয় জায়গাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। কল্পনা করে দেখ—পাহাড়ের কোণে বিশাল অরণ্য-পরিবেষ্টিত একটি সরোবর। চারপাশে কোথাও কেউ নেই, শুধু আমরা কয়েকজন! এতো সুন্দর, এতো নিস্তব্ধ, এতো সুখপ্রদ কি বলবো! শহরের হৈ-হট্টগোল ছেড়ে এখানে এসে আমি যে কতটা খুশি তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পার। এখানে এসে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর গীতা পড়ি। মহা আনন্দে আছি। অবশ্য দিন-দশেকের মধ্যেই আমি এ জায়গা ছেড়ে সহস্রদ্বীপোদ্যানে চলে যাব। তার আগে যে কটা-দিন আর এখানে আছি, দিন-রাত ধ্যানে ডুবে থাকব—এই ইচ্ছা। ওহ! ভাবতেও কী ভালো লাগে!'

জুন মাসের প্রথম দিকে তিন-চার জনকে নিয়েই স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে তাঁর শিক্ষাদানের কাজ শুরু করে দিলেন। আমরা সহস্রদ্বীপোদ্যানে এসে পৌঁছলাম শনিবার, ১৮৯৫-এর ৬ জুলাই।[১] স্বামীজী ঠিক করলেন যাঁরা ওখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের বেশ কয়েকজনকেই সোমবার দীক্ষা দেবেন। দীক্ষার ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ রবিবার বিকেলে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি তোমাদের সকলকে খুব ভালভাবে চিনি না। তাই ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাদের দীক্ষার

১ মেরি লুইজ বার্কের মতে দিনটি ১৯ জুলাই, (পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০-৫১)

জমি প্রস্তুত কি না।' এই কথার পর সসঙ্কোচে তিনি বললেন ঃ 'আমার একটা বিশেষ শক্তি আছে যার দ্বারা আমি মানুষের মনের খবর জানতে পারি। সে-শক্তি অবশ্য আমি সচরাচর খাটাই না। কিন্তু তোমরা যদি অনুমতি দাও তো তোমাদের মনটা আমি একটু দেখে নিতে চাই। কারণ, অন্যান্যদের সঙ্গে তোমাদেরও দীক্ষাটা কালই হয়ে যাক, এই আমার ইচ্ছা।' আমরা সানন্দে সম্মতি জানালে স্বামীজী আমাদের মনগুলি খতিয়ে দেখলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল, পরীক্ষার ফলাফলে তিনি খুশি। ফলে, পরের দিন অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদেরও দীক্ষা হয়ে গেল। আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্র দিয়ে স্বামীজী আমাদের শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন।

পরে আমরা স্বামীজীকে ধরেছিলাম—স্বামীজী, আমাদের মনে আপনি কি দেখলেন? উত্তরে স্বামীজী তাঁর দর্শনের কিছু কিছু কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন ঃ দেখলুম, তোমরা আমার অনুগত হবে এবং অধ্যাত্মজীবনে উন্নতি করবে। আমাদের চিন্তার তরঙ্গ ভেদ করে যে মানসলোকের চিত্রাবলী তিনি দেখেছিলেন, তার কিছু কিছু ছবি তিনি পরে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলেন, যদিও প্রতিটি ছবির তাৎপর্য তিনি ব্যাখ্যা করেননি। একটি ক্ষেত্রে তাঁর মানসনেত্রে ফুটে উঠেছিল দৃশ্যের পর দৃশ্য, যার অর্থ জনৈক ভক্তের ভাগ্যে খুব দেশ ভ্রমণ আছে—সম্ভবত প্রাচ্যদেশে। কিরকম বাড়িতে আমরা বাস করবো, আমাদের চারপাশে কি ধরনের মানুষ থাকবে, আমাদের জীবন কোন্ কোন্ জিনিস দ্বারা প্রভাবিত হবে—এসব খুঁটিনাটি তিনি সবই বলে দিয়েছিলেন।

আমরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম—আপনি কি করে এতসব বুঝতে পারেন, তিনি বললেন ঃ তোমরা যে কেউই এটা করতে পারো। এ বলা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। প্রথমে তোমাকে মহাশূন্যের চিন্তা করতে হবে—অসীম, নীল, সর্বব্যাপী আকাশ। বেশ কিছুক্ষণ একাগ্রভাবে এই মহাশূন্যের ধ্যান করলে ধীরে ধীরে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠতে থাকে। সেই ছবিগুলোর তাৎপর্য বুঝতে হয়। তখনই অন্যের মনের কথা বলা যায়। কেউ কেউ অবশ্য কখনও সখনও এই ধরনের ছবি দেখতে পায়, কিন্তু ছবিগুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ধরতে পারে না।

একজন সম্পর্কে স্বামীজী দেখেছিলেন, তার জীবন ভারতবর্ষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যাবে। এইরকম বড়, ছোট, নানা ঘটনার পূর্বাভাস

স্বামীজী আমাদের দিয়েছিলেন যার প্রায় প্রত্যেকটিই এ যাবৎ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ রকম পরীক্ষার দ্বারা যে কোনও মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষতা—তার নৈতিক সাহস, শক্তি এবং চরিত্র—যাচাই করা যায়। স্বামীজীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাই আমাদের সব আত্মাবসাদ, সব হীনমন্যতা ঘুচে গেল। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিদূরিত হলো সব সংশয়। এক কথায়, আমরা শান্ত, নিশ্চিন্ত হলাম; কারণ আমরা এমন একজনের স্বীকৃতি পেয়েছি যিনি অদ্বয় পরম সত্তার সঙ্গে অচ্ছিন্ন হয়ে বিরাজ করছেন। তাই নয় কি...?

সহস্রদ্বীপোদ্যান লম্বায় নয় মাইল, চওড়ায় মাইল দুয়েক। সেন্ট লরেন্স নদীর বুকে যতগুলি দ্বীপ আছে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম। নদীর তীরে গ্রাম। গ্রামের ঘাটে স্টীমার এসে ভেড়ে। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় দ্বীপটি একেবারে নির্জন ছিল। গ্রামের দোকানীর কাছে স্বামীজীর খোঁজ করতে সে যে বাড়ির কথা বললো, সেটি গ্রাম থেকে এক মাইল উপরে। একটা টিলার ওপর বাড়িটি। কখনও কখনও ভাবি, শক্ত পাথরের উপর তৈরি ঐ বাড়িটি কি প্রতীকী নয়? সামনের দিকে বাড়িটা দোতলা, পিছনের দিকে তেতলা। চারপাশে ঘন জঙ্গল। এমন একটা পরিবেশ যেখানে কাছে-পিঠে কোনও মানুষ নেই, অথচ যা প্রয়োজন সবই নাগালের মধ্যে। আমরা ইচ্ছেমতো যেদিকে খুশি ঘুরেফিরে বেড়াতাম। লোকজন চোখেই পড়ত না। কখনও কখনও শুধু ল্যান্ডস্‌বার্গকে সঙ্গে নিয়েই স্বামীজী বেড়াতে বেরোতেন। কখনও আবার আমাদের দু-একজনকেও সঙ্গে নিতেন। মাঝে মাঝে আমরা গোটা দলটাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তাম। বেড়াতে বেড়াতে স্বামীজী কথা বলতেন, কিন্তু কখনও বিতর্কিত বিষয় আলোচনা করতেন না। চারপাশের নীরবতা, গাছপালা, আর ঝোপঝাড় দেখে বোধহয় স্বামীজীর অন্তরে ভারতীয় অরণ্যের উদ্দীপন হতো, মনে পড়ে যেত অতীত অভিজ্ঞতার কত শত স্মৃতি। পরিব্রাজক জীবনের নানান অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা তিনি এই সময় আমাদের বলতেন।

নির্জনবাসের সেই নিরুপম দিনগুলিতে বাইরের কোনও লোকের উপস্থিতি আমরা টের পাইনি বললেই চলে। দ্বীপের শোভা দেখার জন্য ক্বচিৎ কখনও দু একজন আসত—তার বেশি কিছু নয়। সাধন ও শিক্ষার একেবারে আদর্শ পরিবেশ। গোটা আমেরিকায় এমন একটি স্থান যে থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাস হয় না। কত না উচ্চ চিন্তা ঐখানে ব্যক্ত হয়েছে! আহা, কী আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলটাই না ওখানে তৈরি হয়েছিল, কত না শক্তির বিকাশ ঐ দ্বীপখণ্ড

প্রত্যক্ষ করেছে! এই সেই স্থান যেখানে স্বামীজীর কত না মহত্তম অনুভূতি হয়েছে, যেখানে তিনি নিজের হৃদয় ও অনন্ত চিন্তারাশি আমাদের সামনে উজাড় করে দিয়েছেন। চোখের সামনেই দেখলাম কত নতুন চিন্তার জন্ম হলো, আবার তাদের রূপায়ণও দেখলাম। কত পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হতে দেখলাম। আবার এও দেখলাম পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে সেগুলি থেকে কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এমন অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ বহু ভাগ্যে হয়। মিস ওয়াল্ডো কি আর সাধে বলেছিলেন ঃ 'আমাদের কি এমন সুকৃতি ছিল যার ফলে আমরা এতবড় একটা সুযোগ পেলাম?' মিস ওয়াল্ডোর সাথে সকলেই আমরা এই ব্যাপারে একমত। এই বিস্ময় আমাদের সকলেরই।

গোড়ায় ঠিক হয়েছিল একান্নবর্তী পরিবারের মতোই আমরা বাস করবো। চাকর-বাকর থাকবে না, নিজেদের কাজ নিজেরাই চালিয়ে নেবো। এও স্থির হয়েছিল, প্রত্যেককেই দৈনন্দিন কিছু না কিছু কাজ করতেই হবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই, প্রায় সকলেই ঘর-গেরস্থালির কাজে এতই অনভ্যস্ত, এতই অপটু ছিলেন যে কাজে নেমে দেখলেন—না, মোটেই সুবিধা হচ্ছে না। কাজ করতে গিয়ে, কাজ তো দূরের কথা, হাস্যকর সব পরিস্থিতির উদ্ভব হতে লাগলো। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, হাসির বদলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করলো। আমাদের মধ্যে তখন যাঁরা 'Brook Farm'পড়ছিলেন, তাঁরা দেখলেন গল্পের পরিস্থিতির সাথে তাঁদের সঙ্কটের কী দারুণ মিল! এমার্সন কেন যে অতীন্দ্রিয়বাদীদের সঙ্গে দলবেঁধে থাকতে চাননি তাও তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন। এমার্সনকে অবশ্য মানসিক প্রশান্তির জন্য অন্য মূল্য দিতে হয়েছিল।

আমাদের সঙ্কটের কথাতেই ফিরে আসি। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা এতটাই করিৎকর্মা ছিলাম যে আমাদের ভিতর কেউ কেউ শুধুমাত্র ডিশ ধুতে পারত। যাঁর ওপর পাঁউরুটি কাটার ভার, তিনি তো কাজে নামার আগেও কাৎরাতেন, এবং কাজে নেমে? যাক, সে কথা বলে আর কাজ নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট, তিনি শুধু কাঁদতেই বাকি রেখেছিলেন। আশ্চর্য! ছোটখাটো কাজের ভিতর দিয়েই আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কিরকম নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে! জীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে আমাদের যে সমস্ত দুর্বলতাগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরদিন ঢাকা পড়ে থাকে, মাত্র দু একদিনের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনেই তা জলছবির মতো ফুটে ওঠে। খুব যে মজার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই।

স্বামীজীর প্রতিক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। যদিও আমাদের দলের একজন ছাড়া সকলেই বয়সে স্বামীজীর চেয়ে বড় ছিলেন, ধৈর্য ও মাধুর্যে কিন্তু কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁকে দেখলে মনে হতো তিনি যেন সত্যি সত্যিই আমাদের বাবা অথবা মা। কর্মযোগীদের মধ্যে যখন উত্তেজনা চরমে উঠত, তখন তিনি নিজেই এগিয়ে এসে বড় মধুরভাবে আশ্বস্ত করার জন্য আমাদের বলতেন ঃ 'আচ্ছা, আচ্ছা, আজ আমিই তোমাদের রেঁধে খাওয়াবো।' স্বামীজীর মুখে এই কথা শোনামাত্র ল্যান্ডস্‌বার্গ একটু আড়ালে সরে গিয়ে হায় হায় করে উঠতেন। বলতেন, 'হে ভগবান, রক্ষা কর!' তাঁর মুখে এই কাতর প্রার্থনা শুনে আমরা ভাবতাম—ব্যাপারটা কি? ল্যান্ডস্‌বার্গকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে বললেন ঃ ওরে বাবা, নিউইয়র্ক থাকতে স্বামীজী যেদিন রাঁধতেন, সেদিন আমি আতঙ্কে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তাম। কারণ, রান্নাবান্নার পর বাসনের যে পাহাড় জমতো, সেগুলো তো আমাকেই মেজে তুলতে হবে।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও যখন আমরা ঘরগেরস্থালির কাজ সামলাতে পারলাম না, তখন আমাদের সাহায্য করার জন্য বাইরের একজন লোক রেখে দেওয়া হলো। আর আমাদের মধ্যে যাঁরা এসব কাজে অপেক্ষাকৃত পটু, তাঁরা দু-একজন বেশিরভাগ কাজটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। তখন আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু কাজকর্মের পাট চুকিয়ে একবার ক্লাসে ঢুকলে তখন আবার সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ, অন্য ভাব। চারদেওয়ালের মধ্যে তখন বিরক্তিকর কিছুই থাকত না। দেহবোধও থাকত না, যেন শরীরটাকে আমরা সবাই বাইরে রেখে এসেছি। অর্ধবৃত্তাকারে বসে প্রতীক্ষা করতাম আর ভাবতাম, না-জানি আজ কোন্ নতুন কথা শুনবো? নিত্য-চেতনার কোন্ দুয়ারটি আজ খুলে যাবে, কোন্ দিব্যদর্শন হবে কে জানে? প্রত্যাশার রোমাঞ্চ যেন সর্বক্ষণই ঘিরে থাকত আমাদের। আনন্দময় এক অচিন দেশের স্বপ্ন মনের মধ্যে জাগাত আশা আর সৌন্দর্যের নিত্যনতুন ইশারা। কিন্তু এই এত-যে চাওয়া, এত যে প্রত্যাশা, তাও ছাপিয়ে যেত যখন স্বামীজী বলতে শুরু করতেন। আমাদের মনকে তিনি যে কোন্ ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যেতেন তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এটা অবিসংবাদিত সত্য এবং সেকথা আমরা কখনোই ভুলতে পারি না যে তাঁর পূতসঙ্গে এসে আমরা জেনেছি, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য কি? কোথায় বা আমাদের পৌঁছতে হবে? আর শুধু বাচিক বা বৌদ্ধিক জানাই নয়, স্বামীজী সেই পবিত্র

শৈলশিখরে আমাদের উঠিয়ে বলেছিলেন—ঐ দেখ, ঐ হচ্ছে তোমাদের চিরপ্রতিশ্রুত আনন্দলোক। সেই অপার্থিব দর্শনের পর থেকে জাগতিক সুখ-দুঃখ আমাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।

তিনি আমাদের একটা গল্প বলেছিলেন। এক নন্দন-কাননের গল্প। একবার এক কৌতূহলী ব্যক্তি সেই বাগানের ভিতর কি আছে তা দেখার জন্য পাঁচিলে উঠেছিলেন। পাঁচিলে উঠে যেই বাগানের দিকে তাকানো, অমনি এক লাফ! বাগানের এমনই আকর্ষণ যে তিনি আর ফিরে এসে তাঁর সঙ্গী সাথীদের, বাগানের ভিতর কি আছে, তা বলে যেতে পারলেন না। কোনও খবর নেই দেখে তাঁর এক সঙ্গীও পাঁচিলে উঠলেন, কিন্তু তাঁরও ঐ এক দশা! পাঁচিলে উঠে বাগানের দিকে তাকানো মাত্রই এক ঝাঁপ। সব চুপচাপ দেখে আরও একজন ঐ পাঁচিলে উঠে দেখতে চেষ্টা করলেন—ব্যাপারটা কি? কিন্তু তিনিও শেষপর্যন্ত হো-হো করে লাফ দিয়ে বাগানের ভিতর পড়লেন। ফিরে এসে আর খবর দিলেন না। কিন্তু দুর্লভ সৌভাগ্যবশত আমরা এমন একজন গুরু পেয়েছি যাঁর কাছে নন্দন-কাননের আকর্ষণ গল্পের ঐ ব্যক্তিদের চেয়ে তিলমাত্র কম নয় এবং যিনি, পাঁচিলের ওধারে কি আছে তা প্রত্যক্ষ করেও, অন্যদের প্রতি করুণা ও অনুকম্পাবশত ফিরে এসেছিলেন যাতে পিছনে যারা পড়ে আছে, তারাও তাঁর মুখ থেকে সব শুনে ঐ প্রাচীর ডিঙোতে পারে।

সকাল থেকে রাতদুপুর পর্যন্ত এইভাবেই চলতো। স্বামীজী বলছেন, আমরা শুনছি। যখন দেখতেন আমরা খুব অভিভূত, তখনই স্বামীজী রহস্যমধুর মৃদু হেসে বলতেন ঃ 'কেউটেতে কেটেছে, তোমাদের আর নিস্তার নেই।' অথবা বলতেন, 'আমি তোমাদের জালে আটকেছি; পালাবে যে, সে উপায় আর নেই।' আমাদের গৃহকর্ত্রী মিস ডাচার ছিলেন মেথোডিস্ট খ্রীস্টান। ছোটখাটো চেহারার মহিলা, কিন্তু খুব নিষ্ঠাবতী। তাঁর মতো গোঁড়া মেথোডিস্টের বাড়িতে আমাদের দলটি যে কি করে সেই গ্রীষ্মে জড়ো হলো, সেটা এক রহস্যই বটে। কিন্তু যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের আকর্ষণী শক্তির কথা জানেন তাঁরা এতে মোটেই অবাক হননি। যাঁরা ঠিক ঠিক ঈশ্বর অভিলাষী স্বামীজীর ডাকে তাঁদের সাড়া দিতেই হবে। একবার যিনি স্বামীজীকে দর্শন করেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর আর স্বামীজীকে অনুসরণ না করে উপায় নেই। কারণ স্বামীজী সেই ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে শক্তি মানুষকে নিরন্তর কাছে টেনে তাকে আপন পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা জোগায়।

ধর্মের ধরাবাঁধা পথে যিনি এগোচ্ছেন, আচার অনুষ্ঠানের গোঁড়ামির নিগড়ে যিনি সতত বদ্ধ, তাঁর পক্ষে স্বামীজীর ভাব গ্রহণ করা প্রথমটায় শক্ত ছিল বৈকি। সেই ভাব কখনও কখনও ভীতিপ্রদ মনে হতো তাঁর কাছে। তিনি ভাবতেন, তাঁর আদর্শ, জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ, ধর্ম সম্পর্কে ধারণা—সবই বুঝি রসাতলে গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলির কোনটাই নষ্ট হয়নি, রূপান্তর ঘটেছিল মাত্র। মাঝে মধ্যে দু-তিনদিন হয়তো মিস ডাচার ক্লাসেই এলেন না। আমরা অবাক হতাম। কিন্তু স্বামীজী ওঁর ব্যাপারটা বুঝতেন। তাই আমাদের বলতেন ঃ 'তোমরা কি বুঝতে পারছনা ওঁর এটা সাধারণ অসুখ নয়? ওঁর মনে এখন তোলপাড় চলছে যেটা উনি সহ্য করতে পারছেন না। দেহে তারই প্রতিক্রিয়া ঘটছে, এই যা।'

একদিন মিস ডাচারের উপস্থিতিতে স্বামীজী বললেন ঃ 'সাংসারিক কর্তব্যের ধারণা হলো দুঃখের মধ্যাহ্ন-সূর্য যা জীবনকে একেবারে ঝলসে দেয়।' আমতা-আমতা করে মিস ডাচার স্বামীজীর এই কথার মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'আমাদের সব কর্তব্যই কি তাহলে...? তিনি আর কথা শেষ করতে পারলেন না, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন তাঁকে আর আমাদের ত্রি-সীমানায় দেখাই গেল না। আসলে মুক্তির উদ্‌গাতা, চিরবিপ্লবী স্বামীজী সেদিন যা বলতে চেয়েছিলেন তার মর্ম এই—নিত্যমুক্ত আত্মাকে শৃঙ্খলিত করে এমন সাধ্য কার আছে? সে চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর।

এইভাবে স্বামীজী আমাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা-ভক্তি থাকলে সে শিক্ষাকে স্বাগত জানানো খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। সাপের মতো পুরনো খোলস ফেলে দিয়ে নতুন চামড়া গ্রহণ করলেই গোল মিটে যেত। কিন্তু বিশ্বাসের চাইতে পুরনো সংস্কার এবং লোকাচারের গোঁড়ামি যাঁদের মধ্যে প্রবলতর, তাঁদের পক্ষে স্বামীজীর উপদেশ ধারণা করা বিশেষ কষ্টকর এবং সময় সময় তা মর্মান্তিক হতো।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে শিক্ষাদান

সে যাই হোক, আমরা সকলেই স্বামীজীর ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম। একজন হিন্দুর কাছে হয়তো তত্ত্বগুলি নতুন নয়, কিন্তু এমন তেজের সঙ্গে, এমন জোরের সঙ্গে তিনি কথাগুলি বলতেন, তাঁর মুখনিঃসৃত সত্যগুলি এমন গভীর উপলব্ধি থেকে উঠে আসত যার ফলে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নতুনই মনে হতো।

বেথলহেমের সেই অপাপবিদ্ধ যুবকটির মতো তিনিও এমনভাবে সনাতন সত্যগুলি উচ্চারণ করতেন যাতে বোঝা যেত ঐ সত্যের সাথে তাঁর নিবিড় পরিচয়। বোঝা যেত তিনি একজন যথার্থ 'আধিকারিক পুরুষ'। আমরা যারা পাশ্চাত্যের মানুষ, তাদের কাছে অবশ্য এই সত্যগুলি একেবারে নতুন ঠেকত। মনে হতো তিনি যেন কোনও দিব্যধাম থেকে আশা, আনন্দ ও পরিপূর্ণ জীবনের বাণী নিয়ে আমাদের মুক্তির জন্য এই মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। ধর্ম মানে কেবল বিশ্বাস নয়, ধর্ম হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু। বই পড়ে একটা দেশ সম্পর্কে হয়তো কিছু তথ্য জানা যায়, কিন্তু যতক্ষণ না নিজের চোখে সেই দেশ দেখা হচ্ছে ততক্ষণ সত্যিকারের ধারণা হয় না। যা কিছু সবই অন্তরে। যে দেবতাকে আমরা স্বর্গে খুঁজছি, গুরুর ভিতর বা মন্দিরে খুঁজছি, তিনি আমাদের ভিতরেই রয়েছেন। যদি তাঁকে আমরা বাইরেও প্রত্যক্ষ করি, সে শুধু এই কারণে যে তিনি আমাদের হৃদয়পুরে বিরাজ করছেন। কিভাবে, কোন্ পথ দিয়ে গেলে আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাবো? তার উত্তর এই, একাগ্র ধ্যানের পথে। একাগ্রতাই প্রদীপ যা অন্ধকার দূর করতে পারে।

আত্মবিকাশের নানান পথ। সব পথই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়। গুরু জানেন তোমার পক্ষে কোন্ পথটি সহায়ক হবে। তিনি তোমাকে সেই পথটিই বলে দেবেন। স্বামীজী যেদিন বললেন—তোমরা যে শুধু যুক্তিকে ধরে থাকতে পারো তাই নয়, সর্বাবস্থায় তোমরা যুক্তিকে অবশ্যই ধরে থাকবে—তখন যে আমাদের কী আনন্দ হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। স্বামীজীর মুখে ঐ কথা শোনার আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যুক্তি আর অনুভূতি, এ দুটি জিনিস বুঝি পরস্পর বিরোধী। কিন্তু না, তা নয়। স্বামীজীর মুখেই প্রথম শুনলাম, যুক্তির চেয়ে বৃহত্তর সত্যের সন্ধান যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিকেই আমাদের আঁকড়ে থাকতে হবে। এবং এই যে যুক্তির অতীত বস্তু, তার সঙ্গে যুক্তির কোনও বিরোধ নেই।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে প্রথম দিন সকালেই জানলাম আমাদের যে আপাতচেতনা তার চাইতেও উচ্চতর একটা চেতন অবস্থা আছে। তার নাম 'সমাধি'। চেতন আর অবচেতন—সাধারণত এই দুটি অবস্থার কথাই আমরা জানি। কিন্তু এই বিভাজন যথাযথ নয়। চৈতন্যের শ্রেণীবিন্যাস হওয়া উচিত এইভাবে—মগ্নচৈতন্য, চেতনা, এবং তৃতীয় বা অতিচেতন অবস্থা। এইখানেই পাশ্চাত্যের মানুষদের মুশকিল হয়। কারণ, এই ত্রিবিধ-বিভাজনের সঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারা

মেলে না। তাঁরা চেতনাকে—অবচেতন বা অচেতন এবং চেতন—এই দু-ভাগে ভাগ করেন। তাঁরা শুধু মনের স্বাভাবিক অবস্থাকেই স্বীকার করেন; সাধারণ চেতন অবস্থার বাইরেও যে একটা অতিচেতন অবস্থা, যাকে আমরা প্রেরণা বলতে পারি, থাকতে পারে—এ তাঁরা ভাবতেও পারেন না। যদি প্রশ্ন ওঠে—অতিচেতন অবস্থাটা যে উচ্চতর অবস্থা সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো—তার উত্তর স্বামীজীই দিয়েছেন। তিনি বলছেন ঃ 'প্রথম অবস্থায় মানুষ "মানুষ" হিসেবে যায়, কিন্তু বোকা হয়ে ফিরে আসে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় সে প্রবেশ করে মানুষ হিসেবে, কিন্তু ফেরে দেবতা হয়ে।' স্বামীজী সবসময় বলতেন ঃ 'মনে রাখবে অতিচেতন অবস্থা কখনও যুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে না। সে যুক্তিকে অতিক্রম করে, কিন্তু কখনও তার বিরুদ্ধতা করে না। বিশ্বাস আর প্রত্যয় এক কথা নয়। অনন্ত বা অসীমকে ধরলে তবেই প্রত্যয় আসে। প্রত্যয় দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত।'

সত্য সকলের জন্যই। সকলেরই সে কল্যাণ করে। তার মধ্যে গোপনীয়তা কিছু নেই। সত্য পবিত্র। কিভাবে সেই সত্যকে আমরা লাভ করতে পারি? স্বামীজী বলছেন, শ্রবণ, মননের দ্বারা। গুরুবাক্য শ্রবণ করে সেটিকে মনন করতে হয়। স্বামীজীর ভাষায়, 'আপ্তবাক্যের ওপর দিয়ে যুক্তির বন্যা বয়ে যাক। কিন্তু তুমি তাকে শক্ত করে ধরে থাকো, তার ওপর সমস্ত মনটি একাগ্র করে ধ্যান কর, তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাও।' নীরব হয়ে গভীর নীরবতার মধ্য থেকে শক্তি সঞ্চয় কর, নিজেই একটা অধ্যাত্মশক্তির বিশাল আধার হয়ে যাও। যে নিজেই ভিখারি সে আবার অন্যকে কি দেবে? কে দিতে পারে? যে রাজা, সে-ই কেবল দিতে পারে এবং সে রাজাই দিতে পারে যে নিজের জন্য কিছুই চায় না।

স্বামীজী বললেন ঃ 'তোমার যে টাকাকড়ি, জানবে তা তোমার নয়। ঈশ্বরের। ঈশ্বরই তা তোমার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, ওতে লিপ্ত হোয়ো না। নাম, যশ, অর্থ ঘোর বন্ধন। ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিয়ো না। তার চেয়ে মুক্তির অপূর্ব আনন্দ সম্ভোগ করো। কারণ তুমি মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত! চিন্তা করো—কী ভাগ্যবান আমি! আমিই মুক্তি! আমিই অনন্ত! আমি আত্মা, যার শেষ এবং শুরু কিছুই নেই। আমিই সব হয়েছি, সকলের মধ্যেই আমি। এই মহাসত্য নিরন্তর আবৃত্তি করতে থাকো।'

স্বামীজী বললেন ঃ ঈশ্বর সর্বৈব সত্য এবং এই সত্যকে সংসারের আর

পাঁচটা জিনিসের মতোই পরিষ্কার অনুভব করা যায়। ল্যাবরেটরিতে যেমন বিভিন্ন রকম পরীক্ষানিরীক্ষার নির্ভুল ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা লাভেরও ঠিক সেইরকম কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উপায় আছে। মনই হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়। স্মরণাতীতকাল থেকেই মুনি, ঋষি, যোগী ও সন্তেরা ঐ যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণা করে আত্ম-বিজ্ঞানের সত্যগুলি আবিষ্কার করে আসছেন এবং সেই সত্যের স্বর্ণপেটিকা কেবল তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের হাতেই তাঁরা তুলে দিয়ে যাননি, তার উত্তরাধিকারী করে গেছেন অনাগত কালের সেই সব মানবসন্তানদেরও, যারা সত্যসন্ধানী। এই অধ্যাত্মজ্ঞান গুরু থেকে শিষ্যে আসে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষক যে পদ্ধতিতে ছাত্রদের শিক্ষা দেন, ধর্মগুরুর শিক্ষাপদ্ধতি তার থেকে স্বতন্ত্র। আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ যে ধরনের অধ্যাত্ম-শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত, তা অনেকটা এইরকম—একটি শিশুকে পাটীগণিতের একটি অঙ্ক কষতে দিয়ে উত্তরটা বলে দেওয়া হলো, কিন্তু ফলাফলটা কিভাবে পাওয়া গেল সে ব্যাপারে তাকে কিছুই বলা হলো না। বুদ্ধ, যিশু, জরথুস্ত্র, লাওৎসের মতো জগদ্-বরেণ্য আচার্যদের সাধারণ ফলাফলটি আমাদের জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে ওঁদের শিক্ষা যেন আমরা সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করি। আমাদের মধ্যে যাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রাচুর্য আছে অথবা যাঁরা অনুভূতির সূক্ষ্মতর একটা অবস্থায় পৌঁছে উপলব্ধি করেছেন যুক্তি-বুদ্ধির অতীত একটা সত্তা, তাঁদের পক্ষে অন্ধ বিশ্বাসে ঐ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বলবো, কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাস আমাদের চরিত্রকে আমূল পাল্টে দিতে পারে না, মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে পারে না। কিন্তু এই প্রথম আমরা শুনলাম, এমন একটি পদ্ধতি আছে যার দ্বারা সাধারণ সুনির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়। এবং সাধনার সেই ক্রম, যাকে গুরু-শিষ্য পরম্পরা বলা হয়, যা ভারতবর্ষে এখনও প্রচলিত। সেই প্রথম বুঝলাম সব ধর্মই কেন নীতিশাস্ত্র দিয়ে শুরু হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক; কারণ সত্য, অহিংসা, পবিত্রতা, অস্তেয়, শুচিতা, সংযম ছাড়া আধ্যাত্মিকতার কোনও অর্থই থাকে না। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষের কাছেই ধর্ম আর নৈতিকতা সমার্থক। সেইজন্য ছোটবেলা থেকে আমাদের ঐ একটা জিনিসেরই অনুশীলন করতে বলা হয়। এবং আমাদের ধর্মচর্চার ঐখানেই ইতি। আমাদের অবস্থা সেই যুবকটির মতো, যে যিশুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ঃ 'প্রভু, কি করে আমি অমর হবো?' যিশু তার উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'যাঁরা ঈশ্বরের দূত, তাঁদের কথা তুমি তো পড়েছ। হত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, আর

পরস্ত্রীর প্রতি কখনও আসক্ত হোয়ো না।' সেই কথা শুনে যুবকটি বলেছিল ঃ 'প্রভু, ছোটবেলা থেকেই তো আমি ঐ বচনগুলি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে আসছি।'

আমাদের এখন তাই 'যোগ', 'সমাধি' এবং অন্যান্য সাধনরহস্যগুলি সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল। আমরা সেইগুলি জানতে চাইছিলাম। কিন্তু স্বামীজী যখন প্রথমে নৈতিক আদর্শগুলির ওপর খুব জোর দিলেন, তখন আমরা একটু অবাকই হলাম। কারণ ওসব কথা তো আমাদের জানা। কিন্তু বিস্ময়ের সেই ভাব অচিরেই কেটে গেলো কারণ আমরা বুঝতে পারলাম—আমাদের জানা নৈতিকতার আদর্শ, আর স্বামীজী যা বলতে চাইছেন, দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। স্বামীজী যে আদর্শের কথা বললেন তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, তার ব্যাপ্তি অচিন্তনীয়।

স্বামীজী বললেন—চিন্তায়, কথায় এবং কাজে সত্যকে ধরে থাকাই সর্বোচ্চ আদর্শ। যদি কেউ এই আদর্শকে একাদিক্রমে বারো বছর ধরে থাকতে পারে তবে তার বাক্‌সিদ্ধি হয়, সে যা বলে তাই হয়, তার মুখের প্রতিটি কথাই সত্য হয়ে যায়। এইরকম সত্যনিষ্ঠ নিখুঁত মানুষ যদি কাউকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'তোমার রোগ সেরে যাক', অমনি সে ব্যাধিমুক্ত হয়। যদি বলেন—কল্যাণ হোক, তো কল্যাণ হয়। যদি বলেন, তোমার মুক্তি হোক, অমনি তার বন্ধনদশা ঘুচে যায়। এইরকম ক্ষমতার অধিকারী এমন কিছু মহাপুরুষের কথা স্বামীজী বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতারও ঐ ক্ষমতা ছিল বলেই কি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সন্তান লাভ করেছিলেন? হওয়াই সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও সেই একই সত্যের প্রতিফলন দেখি। এক যুবককে তিনি একবার বলেছিলেন ঃ 'সোমবার আবার এসো।' তার উত্তরে ছেলেটি বলেছিল ঃ 'সোমবার আসতে পারবো না। ঐদিন আমার একটু কাজ আছে। আমি কি মঙ্গলবার আসতে পারি?' শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন ঃ 'না। আমার মুখ দিয়ে ''সোমবার'' বেরিয়ে গেছে, এখন আর অন্য দিনের কথা বলতে পারবো না।'

'সত্য আচরণের দ্বারা যতক্ষণ চিত্তশুদ্ধি না হচ্ছে ততক্ষণ কেমন করে আমরা সত্য লাভ করবো? যিনি সত্যপরায়ণ তাঁর কাছেই সত্য ধরা দেয়। সত্যই সত্যকে আকর্ষণ করে। প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি কর্মই ফিরে আসে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্য লাভ করা যায় না।'

আমাদের সময়ে আমরা মহাত্মা গান্ধীকে দেখছি। কারও কারও মতে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি। সে যাই হোক, সত্য আচরণ এবং অহিংসার নীতি একজন মানুষকে যে কতদূর নিয়ে যেতে পারে, গান্ধী তার দৃষ্টান্ত। তিনি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নাও হন, তবুও বলবো, বিশ্বের মহৎ চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি অবশ্যই অন্যতম।

সত্য সম্পর্কে যেমন, অহিংসার বেলাতেও তাই। সর্বাত্মক অহিংসা—বাক্যে, চিন্তায় এবং কর্মে। ভারতবর্ষে এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যাঁরা কেবল প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রেই অহিংসাকে সীমায়িত করেন। তাঁরা যে শুধু নিরামিষ আহার করেন তাই নয়। তাঁরা এমনভাবে চলাফেরা করেন যাতে সামান্য কীটপতঙ্গেরও আঘাত না লাগে। কোনও পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার আগে তাঁরা সন্তর্পণে রাস্তাটাকে ঝাঁট দিয়ে নেন এবং মুখে কাপড়ের পট্টি বাঁধেন যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবেরও প্রাণহানি না হয়। কিন্তু তাতেও কি সব দিক রক্ষা হলো? দৃষ্টির অন্তরালে এমন অগণিত বহুবিচিত্র জীবন আছে যা আমাদের শতপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও আহত হবেই। তাই আমরা এ কথা বলতে বাধ্য, অহিংসার এই ধারণা আমাদের আদর্শের চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারে না। বস্তুত অহিংসার আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই সাধক হিংসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। 'জীবন্ত কোনও কিছুই আমার ভয়ে ভীত হবে না'—এই ভাবটি তাঁর জীবনে বাঙ্ময়, জাজ্জ্বল্যমান সত্য হয়ে ফুটে ওঠে। এইরকম মহৎ ব্যক্তির পায়ের কাছে সিংহ এবং মেষ শাবক নিশ্চিন্তে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। প্রেম এবং করুণার ধারা নিয়মের সব গণ্ডি তখন ভেঙ্গে দেয়।

সংযম ও পবিত্রতার প্রসঙ্গ স্বামীজীকে সর্বদাই গভীরভাবে নাড়া দিত। ঐ প্রসঙ্গ উঠলে তিনি ঘরের মধ্যে সিংহের মতো পায়চারি করতেন আর ক্রমশ উদ্দীপ্ত হতেন। তারপর এক সময় পায়চারি থামিয়ে কারও সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়তেন যেন ঘরে কেউ নেই। তারপর আবেগের সঙ্গে শুরু করতেন ঃ 'ব্রহ্মচর্যের ওপর সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই কেন এতো জোর দেয়, তা কি বুঝতে পার না? যেখানে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ঠিক ঠিক পালন করা হয়, শুধু সেখানেই মহাত্মা দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি মনে করো, এর পিছনে কোনও কারণ নেই? রোমান-ক্যাথলিক চার্চে ঠিক এই কারণেই সেন্ট ফ্রান্সিস্ অফ আসিসি, ইগনেশিয়াস লয়োলা, সেন্ট টেরিজা, সেন্ট ক্যাথারিন-এর মতো উচ্চকোটির সন্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ঠিক ঐ কারণেই ওঁদের সমকক্ষ

মহাপুরুষ প্রোটেস্টান্ট চার্চে কখনও দেখা যায়নি। পবিত্রতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অতি নিবিড় সম্বন্ধ. বুঝলে হে? তোমরা যদি বল, সম্বন্ধটা কি তা আমাদের বুঝিয়ে দিন, তাহলে বলি শোনো—এইসব মহান সাধক-সাধিকা প্রার্থনা আর ধ্যানের মাধ্যমে দেহের সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রবণতাটিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। ভারতীয় সাধক-সাধিকারা এই রহস্যটি খুব ভালভাবেই জানেন এবং যাঁরা 'যোগী' তাঁরা সচেতনভাবেই শক্তির এই রূপান্তর ঘটান। রূপান্তরিত এই নতুন শক্তিকে 'ওজস্' বলে এবং এই শক্তি মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকে। 'কুণ্ডলিনীর' নিম্নতম চক্র, অর্থাৎ 'মূলাধার' থেকে এই শক্তিকে উর্ধ্বতম কেন্দ্রে টেনে তোলা হয়।'

স্বামীজীর কথা শুনে আমাদের মনে পড়ে গেলো চিরপরিচিত সেই মহান বাণী ঃ 'আর আমাকে যদি টেনে উর্ধ্বগামী করা হয়, তাহলে আমি সকলকেই কাছে টেনে নেবো।'

অনুরূপ ব্যাকুলতার সঙ্গে স্বামীজী বলে চললেন ঃ যেখানেই বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখবে, প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে দেখবে, জেনো 'সুষুম্না'-নাড়ীর মধ্য দিয়ে ঐ ওজস্ কিছুটা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। অবশ্য শুধু স্বামীজী বলেছেন বলেই কি কথাটা বিশ্বাস করতে হবে? আমরা নিজেরাও কি লক্ষ্য করিনি অবতার, এমনকি মহাত্মারাও সকলের মধ্যে কি বিপুল ভালবাসা সঞ্চারিত করতে পারেন, যে ভালবাসার টানে গ্যালিলীর জেলেরা তাদের জাল গুটিয়ে তরুণ ছুতোরের শরণাগত হয়, যে প্রেমের টানে শাক্যবংশীয় রাজকুমাররা তাদের ধনসম্পদ, রত্নভাণ্ডার, রাজপাট সব হেলায় ছেড়ে আসে? এই হলো সেই দিব্য আকর্ষণ। অমর্ত প্রেমের টান।

স্বামীজী যেদিন ব্রহ্মচর্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন সেদিন তাঁর কণ্ঠে যে কী মর্মস্পর্শী আকুলতা ফুটে উঠেছিল, তা বলার নয়। তাঁর সমস্ত সত্তা শুধু যেন একটি কথাই বলতে চাইছিল—এই অমূল্য শিক্ষা তোমরা জীবনে গ্রহণ কর। অবশ্য একথা সত্যি, ঐ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের কোনও অধিকারই আমাদের থাকত না, পেতাম না তাঁর কাজের যন্ত্র হবার দুর্লভ সুযোগ। স্বামীজী চেয়েছিলেন স্বেচ্ছা-সমর্পণ, অর্থাৎ আমরা যেন সজ্ঞানে নিজেদের রূপান্তর ঘটাতে প্রয়াসী হই। তিনি বলেছিলেন ঃ 'যার স্থৈর্য নেই, সে কেমন করে নিজেকে সংযত করবে? এমন পাঁচ-ছ জনকে আমি চাই যারা তারুণ্যের অম্লান শক্তিতে ভরপুর।'

এতো গেল ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের কথা। আর কৃচ্ছ্রসাধন? কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে স্বামীজীর বক্তব্য এই ঃ তোমরা নিজেরাই বিচার করে দেখ না সব ধর্মের মহাত্মারাই কেন উপবাস এবং আত্মনিগ্রহের পথ বেছে নেন। অবশ্য এটা ঠিক আমাদের মধ্যে এমন বহু সাধক আছেন যাঁরা খামোখা দেহকে শত্রু জ্ঞান করেন এবং তাঁদের কাছে কৃচ্ছ্রসাধন হলো আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা উপায়-মাত্র। কিন্তু আত্মনিগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, শাসন করা। সাধারণ ইচ্ছাশক্তির জোরে আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য কখনোই সিদ্ধ হবে না। তার জন্য চাই ইস্পাতের মতো স্নায়ু এবং লোহার মতো সবল ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি হবে স্বতঃপ্রণোদিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। সংযমের প্রতিটি পদক্ষেপ এই ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ়তর করে। ভারতবর্ষের মানুষ একেই 'তপস্যা' বলে। 'তপঃ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'তপ্ত' করা। অর্থাৎ তপস্যার ফলে আন্তর প্রকৃতি বা আমাদের যে সূক্ষ্ম সত্তা, তা তেতে ওঠে। কি করে এটা সম্ভব হয়? তার অনেক প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু সাধককে সেগুলি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে হয়। প্রক্রিয়াগুলি কিরকম? দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ধর, কেউ সঙ্কল্প করলো সে কয়েক মাস মৌন থাকবে অথবা বিশেষ বিশেষ দিনে উপবাস করবে অথবা দিনে মাত্র একবারই খাবে। ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাস এইভাবে করা যেতে পারে—সে হয়তো কিছুদিন, তার যা প্রিয় খাদ্য, সেগুলি খেল না। কিন্তু এই যে সংযম বা কৃচ্ছ্রসাধন, এর দুটি শর্ত আছে। প্রথম হচ্ছে, সঙ্কল্পটি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করা চাই। দ্বিতীয়ত, ব্রত পালনের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রাখতে হবে। ব্রত ভঙ্গ করলে ভালোর চাইতে মন্দই বেশি হয়। আর ঠিকমতো ব্রত পালন করতে পারলে উচ্চতর সাধনার উপযোগী চরিত্র তৈরি হয়।

ধ্যান সম্পর্কে দু-একটি নির্দেশ ছাড়া স্বামীজী আমাদের ধরাবাঁধা আর কোনও বিধান দেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র এই কয়েকদিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমাদের ধারণা আর চিন্তার মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলো, পাল্টে গেল মূল্যবোধ। এ যেন নতুনভাবে আমাদের শিক্ষা শুরু হলো। আমরা ভয়শূন্য হয়ে সঠিকভাবে চিন্তা করতে শিখলাম। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণা শুধু যে স্পষ্টতর হলো তা-ই নয়, তা যেন সীমার গণ্ডি ভেঙ্গে অসীম, অনন্তের পথে ধাবিত হলো। আধ্যাত্মিকতা যে দিব্যজীবন এনে দেয়, এনে দেয় শক্তি, আনন্দ, তেজ, দীপ্তি ও উৎসাহ, তা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। বুঝলাম প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সব সময় ইতিবাচক, তার ভিতর নেতিবাচক কিছুই নেই। সেই জড়তা, দুর্বলতা বা অন্য কোনও ধরনের তামসিকতা। তাই যদি

হয়, তাহলে দেবচরিত্রের মানুষের মধ্যে অসাধারণ শক্তির প্রকাশ দেখে আমরা অবাক হই কেন? কেনই বা পাশ্চাত্যের মানুষের চোখে আধ্যাত্মিকতা বলতে দুর্বল, নীরক্ত, কৃশকায় চেহারা ভেসে ওঠে? দুটি কি একই বস্তু? যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, তখন ভাবি আমরা কী নির্বোধই না ছিলাম! তখন বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝছি বীর্যবত্তাই জীবন এবং শক্তি হলো দেবতার দান—দিব্য প্রেরণা।

স্বামীজী ক্লাসে আমাদের কি কি বলতেন, তাঁর বাণীর পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর বাণী ও রচনা পড়লে যে কেউ তা জানতে পারবেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে সহস্রদ্বীপোদ্যানে এমন একটা আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল যা প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই মুক্তিলাভের এক সুতীব্র উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের সেই প্রভাব অবিশ্বাস্য, অনির্বচনীয়। কোনও শব্দ দিয়ে সেই পরিমণ্ডলের মহিমা বোঝানো যাবে না, কারণ তা শব্দকে ছাপিয়ে যায়। এই মহিমাটি উপলব্ধি করেই বুঝেছিলাম আমরা কত ভাগ্যবান! যেদিন তিনি বললেন, 'পার্থিব জীবনের প্রতি এই জঘন্য আসক্তি...', সেই দিনই আমাদের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল, আমাদের দৃষ্টি প্রবিষ্ট হলো জীবন-মৃত্যুর পারে অপার রহস্যাবৃত এক অনুপম লোকে। মাত্র ঐ কয়েকটি কথাই আমাদের অন্তরে মুক্তির অদম্য ইচ্ছা জাগিয়ে দিল। আমরা চোখের সামনে দেখলাম একটি মহাপ্রাণ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য কী আকুলি বিকুলিই না করছেন। দেহটাই যেন তাঁর কাছে অসহ্যরকমের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শুধু বাধা নয়, অখণ্ড স্বরূপের সাথে মিলনের পথে দেহ যেন এক নিকৃষ্টতম পরিহাস। ঘরের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের বিক্রমে পায়চারি করতে করতে তিনি সজোরে বলে উঠলেন ঃ ' "আজাদ", "আজাদ"। মুক্তি, মুক্তি!' হ্যাঁ, ঐ সময় তাঁকে ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতোই লাগছিলো, তবে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিলো তিনি জানেন তাঁর খাঁচাটি লোহার নয়, পলকা বাঁশের তৈরি।

আর একদিন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বারবার বলতে লাগলেন ঃ 'এবার আর 'মায়া'-কে ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিও না। জন্মজন্ম আমরা মায়ার খপ্পরে পড়েছি। কতবারই না চিনির পুতুলের লোভে আমরা আমাদের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েছি, আর মুখে দেওয়া মাত্রই সেই চিনির ড্যালা গলে জল! আর নয়। এবার আর আমরা কোনওমতেই ধরা দিচ্ছি না।'

এইভাবে স্বামীজী আমাদের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা জাগিয়ে তুললেন। মুক্তির জন্য যে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, তার দুটি—অর্থাৎ মনুষ্যশরীর এবং সদ্‌গুরু লাভ—তা আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি। বাকি শুধু মুমুক্ষুত্ব, মুক্তির সুতীব্র ইচ্ছা। তাও তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন।

স্বামীজী বলতেন ঃ 'মায়ার মতো প্রতারক আর দ্বিতীয় কিছু নেই। খুব হুঁশিয়ার! এবার আর তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। বরং তার বাইরে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা কর।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এও বলতেন, 'মোহে পড়ে তোমরা তোমাদের অমূল্য সম্পদ খুইয়ে বসো না। ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না তোমার চরম লক্ষ্যে পৌঁছাও, এগিয়ে চল। কিছুতেই থেম না।' এই কথা বলেই বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র গতিতে আমাদের মধ্যে কারও সামনে তিনি ছুটে যেতেন এবং জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে, আঙুল নেড়ে-নেড়ে বলতেন ঃ 'মনে রেখ। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু, একমাত্র সত্য।' তাঁর ঐ ভাব দেখলে মনে হতো—আহা মানুষটি ঈশ্বর-প্রেমে পাগল। ঐ সময়েই তিনি 'সন্ন্যাসীর গীতি' রচনা করেন। স্বামীজীর কথা শুনে আমরা অনুভব করতাম, আমরা যে আমাদের দেবত্ব খুইয়ে বসেছি শুধু তাই নয়, কোনও এক সময় আমরা যে দেবতা ছিলাম, সেই সত্যটাই বেমালুম ভুলে গেছি। তাই স্বামীজীর বারবার এই সতর্কবাণী ঃ 'ওঠ, জাগ—তোমরা যে অমৃতের সন্তান। পুতুল দেখে ভুলো না। ওগুলি কোনটা চিনির পুতুল, কোনটা নুনের। মুখে দেওয়ামাত্রই ওগুলি গলে যাবে। কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। তার চাইতে রাজা হও। জানো জগৎ তোমার হাতের মুঠোয়। তুমিই দুনিয়ার অধীশ্বর। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি জগৎসংসারকে উপেক্ষা না করছ, ততক্ষণ পর্যন্ত জগৎ তোমার কাছে ধরা দেবে না। চাই ত্যাগ, ত্যাগ। ত্যাগই মূলমন্ত্র।'

ঐশ্বর্য, ক্ষমতা আর ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই আমাদের জীবনযুদ্ধ। ঐতেই আমাদের জীবনের সবটুকু সময়, চিন্তা ও শক্তি অপব্যয়িত হয়। কিন্তু সহস্রদ্বীপোদ্যানের সেই জগৎ যেন আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। সেখানে আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল—কি করে মায়ার সর্বগ্রাসী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই মায়া, যে মায়ার আবেশে জগৎ সংসার মোহিত হয়ে আছে। অবশ্য আজ হোক, কাল হোক, মুক্তির ইচ্ছা এবং সুযোগ সকলের জীবনেই আসবে। আমাদের জীবনেও এল। এবং যেকটা দিন সহস্রদ্বীপোদ্যানে ছিলাম, স্বামীজীর সচেতন প্রয়াস ও অনুপ্রেরণায় আমরা আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম সব কিছুই সেই মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে চালিত করেছিলাম।

স্বামীজীর মধ্যে মুক্তির একটা সহজাত তৃষ্ণা ছিল। কেবল নিজের মুক্তি নয়, সকলের মুক্তির কথাই তিনি চিন্তা করতেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসেছিলেন শুধু তাঁদের মধ্যেই তিনি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে মুক্তিলাভের এক জ্বলন্ত তৃষ্ণা জাগাতে পেরেছিলেন। 'সন্ন্যাসীর গীতি'-তে স্বামীজী গেয়েছেন ঃ

ভেঙ্গে ফেলো শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোনার নির্মিত হলে কি দুর্বল।
হে ধীমান, তারা তোমার বন্ধনে?
ভাঙো শীঘ্র তাই ভাঙো প্রাণপণে...
নিরন্তর বল—'ওঁ তৎ সৎ ওঁ।'[১]

খোশমেজাজে

কিন্তু কেবল বেদান্তের আলোচনা বা গুরুগম্ভীর তত্ত্বচিন্তাই নয়, ক্লাসের পর কখনও কখনও আমরা এমন আনন্দ আর নির্দোষ মজায় মেতে যেতাম, যে ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের এর আগে আর কখনও হয়নি। আমরা ভাবতাম অধ্যাত্মজগতের মানুষ মানেই বুঝি হাসতে জানেন না। কিন্তু আমাদের সে ভুল ধারণা ধীরে ধীরে ভেঙে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যিনি ঠিক-ঠিক নির্লিপ্ত, যিনি সত্যদ্রষ্ঠা, তিনিই ইচ্ছামাত্র জগতের যত দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য শিশুর মতো সরল আনন্দে মেতে উঠতে পারেন। ফলে কিছুক্ষণের জন্য আমরাও হালকা হয়ে যেতাম।

স্বামীজী অনেক মজার মজার গল্প জানতেন। তার মধ্যে কয়েকটি গল্প তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন। একটি গল্প এইরকম ঃ এক পাদ্রী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এক দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেই দ্বীপের বাসিন্দারা মানুষ খেতো। দ্বীপে পৌঁছেই পাদ্রী জিজ্ঞেস করলেন—'আমার আগের পাদ্রীকে তোমাদের কেমন লেগেছে?' মানুষখেকোরা সমস্বরে বলে উঠলো, 'ওহ্, ভারী সুস্বাদু!'

আরেকটি গল্প ঃ এক নিগ্রো ধর্মপ্রচারক ভক্তমণ্ডলীর কাছে সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা

---

১ স্বামীজী লিখিত 'The song of the sannyasin' কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। নাম দেন 'সন্ন্যাসীর গীতি'। বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য। যাঁরা মূল ইংরাজি রচনাটি পড়তে চান, তাঁরা 'The complete works of swami Vivekananda', vol IV, pp. 392-5 দেখতে পারেন।

করতে গিয়ে বললেন ঃ 'গড মেড অ্যাডাম এ্যান্ড পুট হিম আপ এগেন্‌স্ট ডি ফেন্স টু ড্রাই (God made adam and put him up against de fence to dry)'। অর্থাৎ কিনা ঈশ্বর আদমকে তৈরি করে বেড়ার ওপর শুকোতে দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলীর একজন চেঁচিয়ে বললেন, 'হোল্ড অন ডেয়ার, ব্রাড্ডার। হু মেড ড্যাট ফেন্স?' (Hold on dere, brudder. who made dat fence?)' অর্থাৎ, ভাই হে, একটু দাঁড়ান। আমি জানতে চাই তাহলে ঐ বেড়াটা কে তৈরি করল? এইরকম একটা বেয়াড়া কূট প্রশ্ন শুনে নিগ্রো প্রচারক মঞ্চ থেকে ঝুঁকে গম্ভীর মুখে বললেন ঃ 'ওয়ান মোর কোয়েশ্চন লাইক ড্যাট, এ্যান্ড স্মাশেস অল টিওলজি! (One more question like dat, and you smashes all teology!)' অর্থাৎ এইরকম আর একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন তুললেই শাস্ত্রীয় বচন সব বরবাদ হয়ে যাবে।

স্বামীজী সেই ভদ্রমহিলার গল্পও আমাদের বলতেন যিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 'স্বামীজী আপনি কি Buddhist?'(ভদ্রমহিলার উচ্চারণে 'বুদ্ধিস্ট হয়েছিল 'বাডিস্ট'।) তার উত্তরে দুষ্টুমি করে গম্ভীর মুখে স্বামীজী বলেছিলেন, 'না, ম্যাডাম—আমি একজন florist (ফুল ব্যবসায়ী)।'

অল্পবয়সী এক মহিলার কথাও স্বামীজী বলতেন। স্বামীজী ও ল্যান্ডস্‌বার্গ যে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন সেখানে সকলের জন্য একটা সাধারণ রান্নাঘর ছিল। সেইখানে মহিলাটিও রান্নাবান্না করতেন। মহিলাটির স্বামী ভূতপ্রেতচর্চার আসরে মিডিয়া হতেন। এটিই ছিল তাঁর পেশা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুব একচোট হয়ে গেলে ভদ্রমহিলা একটু সহানুভূতি পাবার আশায় স্বামীজীকে বলতেন ঃ 'আপনিই বলুন, ও যে আমার সঙ্গে এইরকম দুর্ব্যবহার করে, এটা কি ঠিক? আমি না থাকলে ওর আসরে ভূত সাজত কে?'

ল্যান্ডস্‌বার্গ-এর সঙ্গে প্রথম কোথায় কিভাবে আলাপ হয়েছিল, সে কথাও স্বামীজী বলেছিলেন। থিওসফিস্টদের এক সভায় ল্যান্ডস্‌বার্গ 'শয়তান' সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন, সেইখানেই স্বামীজী প্রথম দেখেন ল্যান্ডস্‌বার্গকে। স্বামীজীর ঠিক সামনেই টকটকে লাল জামা পরা এক মহিলা বসেছিলেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝেই ল্যান্ডস্‌বার্গ খুব জোরের সঙ্গে 'শয়তান' শব্দটি উচ্চারণ করছিলেন; আর যখনই তা করছিলেন তাঁর হাতের একটি আঙুল অনিবার্যভাবে ঐ মহিলাটির দিকেই আন্দোলিত হচ্ছিল।

কিন্তু এইরকম রঙ্গ-কৌতুক করতে করতে একসময় স্বামীজী প্রসঙ্গান্তরে

চলে যেতেন। হয়তো শকুন্তলার কাহিনীই শুরু করে দিলেন। তখন আবার সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশ, অন্য মেজাজ। যখন শকুন্তলার উপাখ্যান বলতেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতাম তাঁর কী প্রচণ্ড কল্পনাশক্তি! কি কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি! রোমান্স যে কী বস্তু, তা কি ছাই আমরা আগে বুঝতাম? নরনারীর মধ্যে নির্জীব, নীরস ভালবাসাকেই আমরা এতকাল রোমান্স বলে জানতাম। কিন্তু ঐ পার্থিব আকর্ষণ প্রকৃত রোমান্সের ছায়া মাত্র। প্রকৃত ভালবাসার ছোঁয়ায় প্রকৃতিও মুখর হয়ে ওঠে। জীবন্ত হয়ে ওঠে। পিতার আশ্রয় ছেড়ে শকুন্তলা যেদিন পতিগৃহে যাত্রা করলেন সেদিন তপোবনের সমস্ত গাছপালা, ফুল, পাখি ও হরিণের দল সমস্বরে হাহাকার করে বলে উঠেছিল ঃ 'শকুন্তলা চলে গেছে, শকুন্তলা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে।' তাদের এই বিলাপ যেন আমাদের প্রাণেও প্রিয়বিচ্ছেদের বেদনা জাগায়। শকুন্তলা বিহনে যেন আমরাও কাতর হই।

শকুন্তলার পরই আসতো সাবিত্রীর প্রসঙ্গ, সাবিত্রী যাঁর পতিপরায়ণতা মৃত্যুর দেবতা যমকেও পরাস্ত করেছিল। বিয়ের সময় খ্রীস্টানরা যেমন অঙ্গীকার করেন, 'আমাদের স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্ক মৃত্যু পর্যন্ত অটুট থাকুক'—সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর প্রেম মৃত্যুর সেই সীমারেখাকে মেনে নেয়নি। স্বামীর প্রতি তাঁর এতই গভীর ভালবাসা যে মৃত্যুকেও পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

স্বামীজী আমাদের সতী-র কাহিনীও শুনিয়েছিলেন। অনবধানবশত অন্যের মুখে পতিনিন্দা শুনে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। আর বলেছিলেন উমা ও সীতার উপাখ্যান। উমার এমন প্রেম যে পরজন্মেও তিনি তাঁর স্বামীকে ভুলতে পারেননি। আর সীতার প্রতি স্বামীজীর সুগভীর শ্রদ্ধা সাবিত্রীকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 'সীতা' নাম উচ্চারণ করলে তিনি এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়তেন যে কখনোই তিনি আমাদের কাছে সীতা সম্পর্কে একটানা খুব বেশি কিছু বলতেন না। কখনও সখনও দু-একটি শব্দে বা দু-একটি বাক্যে তাঁর সেই অনির্বচনীয় ভাব ব্যক্ত করতেন। কখনও বলতেন ঃ 'সীতা পবিত্রতা এবং সতীত্বের প্রতীক।' কখনও বলতেন ঃ 'সীতা স্ত্রী-জাতির আদর্শ। এমন একটি চরিত্র যা অনন্যা এবং চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে আছে।' স্বামীজী বলেছিলেন, 'ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ সীতার আদর্শেই গড়ে তুলতে হবে।' এবং শেষ করেছিলেন এই বলে, 'আমরা সব সীতা মায়ের সন্তান।' শেষের কথাগুলি বলার সময় বিষণ্ণ আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। এইভাবে স্বামীজীর কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনে ভারতীয় নারীর আদর্শটি মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

কখনও কখনও স্বামীজী তাঁর ভারতীয় জীবনের নানান কথা আমাদের শোনাতেন। বলতেন ঃ ছোটবেলা থেকেই গেরুয়া রং আমার মনে এমনভাবে দাগ কেটেছিল যে উঠানে কোনও সাধুসন্ত এসে দাঁড়ালেই হলো, অমনি হাতের কাছে যা পেতুম সব দিয়ে দিতুম। একবার ঐ রকম কেউ একজন এলে বাড়ির লোকেরা আমাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখল। কিন্তু তাতে কি? জানালা তো খোলাই ছিল। দিলুম তার মধ্য দিয়ে কিছু জিনিস ফেলে।

ছেলেবেলা থেকেই স্বামীজী ধ্যান করতেন। কখনও কখনও ধ্যানে বসে এমন হতো বাহ্যজগতের কোনও হুঁশই তাঁর থাকত না। কিন্তু এই শান্ত ধ্যানতন্ময়তার পাশাপাশি তাঁর দুষ্টুমি দামালপনাও অব্যাহত ছিল। এক এক সময় তাঁর দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মা তাঁকে জলের কলের তলায় চেপে ধরতেন আর বলতেন ঃ 'বাপরে! শিবের কাছে ছেলে চেয়েছিলুম, তা তিনি পাঠিয়ে দিলেন কি না এই ভূতকে!' এ রকমটি যে হবে তাতে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যে শক্তি ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে তুলবে তাকে বাগ মানানো কি মুখের কথা!

স্বামীজীর মুখেই শোনা—মাস্টারমশাই এসেছেন, তাঁকে পড়াচ্ছেন। আর বালক নরেন্দ্রনাথ তাঁরই সামনে চোখবুঁজে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল বসে আছেন। মাস্টারমশাই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠলেন ঃ 'তোর তো ভারী আস্পর্ধা! আমি পড়াচ্ছি আর তুই দিব্যি ঘুমোচ্ছিস?' গৃহশিক্ষকের ধমকানিতে নরেন্দ্রনাথ চোখ খুলে মাস্টারমশাই এতক্ষণ যা পড়িয়েছেন তা গড়গড় করে বলে গেলেন। মাস্টারমশাই তো থ!

যাঁরা স্বামীজীর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির কথা জানেন তাঁরা কেউই স্বামীজীর জীবনের এই ঘটনাটিকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। একবার কেউ একজন এ ব্যাপারে মন্তব্য করলে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঠিক এইরকমটাই ঘটেছিল এবং আমার মায়েরও অনুরূপ স্মৃতিশক্তি। রামায়ণ পাঠ শুনে পরমুহূর্তেই শোনা অংশটুকু তিনি স্বচ্ছন্দে আবৃত্তি করে যেতে পারেন।'

একদিন তিনি সুইডেনের ইতিহাসের কোনও দিক নিয়ে কিছু বলছিলেন। ঘটনাস্থলে একজন সুইডিশও ছিলেন। স্বামীজীর কোনও কথার ভুল ধরে তিনি স্বামীজীকে শুধরে দিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীজী শুধু শুনে গেলেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টাই করলেন না। নিজের বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তিনি এতটাই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে সুইডিশ ভদ্রলোকটির কথার কোনও প্রতিবাদ

তিনি করলেন না। মন্তব্য তো দূরের কথা! ঠিক তার পরের দিনই সুইডিশ ভদ্রলোক মুখ কাঁচুমাঁচু করে এসে বললেন ঃ 'আমি পরে ব্যাপারটা ভালো করে খতিয়ে দেখলাম—আপনার কথাই ঠিক, স্বামীজী।'

শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, বহুবার বহুভাবেই তাঁর স্মৃতিশক্তি যে কতটা নির্ভুল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রখর স্মৃতিশক্তি যে আধ্যাত্মিকতার অন্যতম লক্ষণ, সে কথা স্বামীজী বলতেন।

মায়ের সম্পর্কে স্বামীজী আমাদের কত গল্পই না বলতেন। ছোটখাটো চেহারা, কিন্তু ভারী আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর। ছেলের সম্পর্কে তাঁর গর্বের বুঝি অন্ত ছিল না। কিন্তু মনের সেই আবেগকে চেপে রাখবার সযত্ন প্রয়াস তাঁর মধ্যে সর্বদাই দেখা যেত। একদিকে পুত্রের বেছে নেওয়া ত্যাগের জীবনের প্রতি তাঁর অনীহা, অন্যদিকে তার স্বোপার্জিত ভুবনজোড়া খ্যাতিতে গর্ববোধ করা—এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্বে তিনি কতই না ক্ষতবিক্ষত হতেন। আর পাঁচজনের মতো বিয়ে-থা করে নরেন্দ্রনাথ ঘর-সংসার করবেন, জাগতিক সাফল্য অর্জন করবেন, প্রথম প্রথম এটাই বোধহয় তাঁর মনোগত বাসনা ছিল। কিন্তু পরে তিনি নিজের চোখে এত দেখলেন তাঁর দীন-ভিখারি সন্তানের পায়ে রাজা মহারাজারা এসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কিন্তু স্বামীজীর জীবনের এই যে দুটি ভিন্ন পরিণতি, তার মধ্যপর্বটিতে ভুবনেশ্বরীদেবীর মাথার ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। সবকিছু সহজভাবে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষেও খুব সহজ ছিল না। বহুবছর পর একজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—স্বামীজী শৈশবে কেমন ছিলেন? তার উত্তরে ভুবনেশ্বরীদেবী বলেছিলেন ঃ 'তার জন্যে আমাকে দু-দুটি ঝি রাখতে হয়েছিল!'

আমরা যারা স্বামীজীর মাতা-ঠাকুরানীকে দেখার সুযোগ পেয়েছি তারা জানি স্বামীজী, তাঁর রাজকীয় চেহারাখানি মায়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। ছোটখাটো চেহারার এই মহিলার চালচলন ছিল একেবারেই রানীর মতো। তাই আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি পরবর্তিকালে তাঁর পুত্রকে যে বারবার 'রাজকীয় চেহারার সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলে সম্বোধন করেছে, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। ভুবনেশ্বরীদেবীর মধ্যে এমন এক সহজ শুদ্ধতা ছিল, যেটি মনে হয়, তিনি অন্যের ভিতরেও সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন এবং সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। কিন্তু স্বামীজীর মতো এমন মহান আত্মা কোনওদিনও কি তাঁর আদর্শ পরিবেশটি খুঁজে পান? সত্যি কথা, তিনি ভারতের

মতো দেশে জন্মেছিলেন। এবং তিনি তাঁর বাবা-মার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। মায়ের প্রতি স্বামীজীর কী ভালবাসাই না ছিল! পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তবুও মায়ের কথা ভোলেন নি। হঠাৎ হয়তো মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আশঙ্কা হলো মায়ের হয়তো কোনও বিপদ হয়েছে। অমনি লোক মারফৎ মায়ের খবর নেওয়া চাই-ই চাই। যখন বেলুড় মঠে ছিলেন, তখন লোক পাঠিয়ে নিয়মিত মায়ের খবরাখবর সব নিতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মায়ের কিভাবে যত্ন করা যায়, মায়ের কষ্ট কেমন করে একটু লাঘব করা যায়—অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে এও তাঁর একটা প্রধান চিন্তা ছিল।

স্বামীজীর স্মৃতিচারণ শুনতে শুনতে আমরাও যেন তাঁর শৈশবের সোনালি দিনগুলিতে ফিরে যেতাম। মনে হতো আমরাও যেন দিনকতক তাঁরই সঙ্গে সিমলায় তাঁরই পিতৃগৃহে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি। কথা দিয়ে আঁকা মালায় ফুটে উঠত স্মৃতির অজস্র ফুল, কাছে এসে ফের সরে সরে যেত বাল্য ও কৈশোরের অসংখ্য ছবি। বোনদের কথা স্বামীজী বলতেন। তাঁদের তিনি বিশেষ স্নেহ করতেন। বাবার কথাও বলতেন। তাঁর প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাবটি প্রবল ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'মেধা ও দয়ার ভাবটি আমি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছি।' স্বামীজীর মুখ থেকেই আমরা শুনেছি তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত কেমন অকাতরে লোককে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন, এবং এ ব্যাপারে তিনি পাত্রাপাত্র বিচার করতেন না। মদ্যপও তাঁর সাহায্য পেত, এবং তিনি ভালোভাবেই জানতেন লোকটি তাঁর দেওয়া টাকা নেশা করে উড়িয়ে দেবে। এ ব্যাপারে কেউ কটাক্ষ করলে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি বলতেন ঃ 'সংসারটা অশান্তি আর দুঃখে ভরা। কেউ যদি দু-চার মুহূর্তও তা ভুলে থাকতে পারে, থাকুক না।'

এমনি দরাজ ছিল তাঁর দেবার হাত! একদিন অমিতব্যয়িতার কথা তুলে স্বামীজী তাঁর বাবাকে বললেন ঃ 'বাবা, আপনি আমার জন্য কি রেখে যাচ্ছেন?' বিশ্বনাথ দত্ত সেকথা শুনে উত্তর দিলেন ঃ 'যা, একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়া, তাহলেই বুঝবি আমি তোকে কি দিয়ে যাচ্ছি।'

ধীরে ধীরে স্বামীজীর বয়স বাড়তে থাকলে তাঁর চিন্তাভাবনা, উৎসাহের মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল। একটা সময় এল যখন তিনি সঙ্গিসাথীদের একত্র করে ধর্মচর্চায় মেতে উঠলেন। কথায় বলে, 'ছায়া পূর্বগামিনী।' বেশ কয়েক

বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ আমি বাদ না সাধলে নরেন নিজেই একটা ধর্ম সম্প্রদায় গড়ে তুলতো এবং জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতো।

ঈশ্বর সন্ধানে

কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে স্বামীজী ক্রমশ অজ্ঞেয়বাদী হয়ে উঠলেন। এই সময়টা তিনি গভীর উৎসাহের সঙ্গে হার্বার্ট স্পেন্সারের রচনাবলী পড়তেন। স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁর কিছু পত্রালাপও হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদীই হন আর ভক্তই হন—ঈশ্বর আছেন কি না এবং থাকলে কোথায়, কিভাবে আছেন, এই চিন্তাটা বরাবরই তাঁর মন জুড়ে ছিল। স্বামীজীর মুখ থেকে তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থার বর্ণনা শোনা আমাদের এক সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা। তিনি একের পর এক ধর্মগুরুর কাছে ব্যাকুল হয়ে ছুটে যাচ্ছেন আর প্রশ্ন করছেন ঃ 'মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?' কিন্তু কারও কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে তাঁর সব প্রশ্নের মীমাংসা হলো। শুরু হলো তাঁর জীবনের সুবর্ণ অধ্যায়। কিন্তু সে এক দীর্ঘ এবং বহুশ্রুত কাহিনী।

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং সান্নিধ্য পেলেও ভয়ঙ্করী কালীর এক সামান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পূজককে জীবনের ধ্রুবতারা বলে গ্রহণ করা বা তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথাকে বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়া, কোনওটাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত এবং অজ্ঞেয়বাদী নরেন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ ছিল না। স্বামীজী আমাদের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের কথাও সবিস্তারে বলেছিলেন। ঈশ্বরের সন্ধানে এসে শেষে কি মূর্তিপূজা, পুতুল পূজা করতে হবে নাকি? অসম্ভব! গোড়ায় স্বামীজীর মতো সংস্কারমুক্ত মানুষের কাছে এ চিন্তা অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজ সরল মানুষটির মধ্যে নরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন জীবন্ত জমাট আধ্যাত্মিকতা— যে বস্তুর সন্ধানে তিনি ফিরছিলেন এবং যার আভাস তিনি দ্বিতীয় কারও মধ্যে দেখেন নি। নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন যদি কালী পূজা করেই কারও মধ্যে এমন পবিত্রতা, এমন সত্য, এমন জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেমের প্রকাশ হয়, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হবেই। দিব্যভাবের এমন জীবন্ত বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালে পুরনো তাত্ত্বিক মতাদর্শগুলি ভেঙ্গে চুরমার হতে বাধ্য। তাঁর ক্ষেত্রে হলোও তা-ই। বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করে তিনি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের

পায়ে সঁপে দিলেন। সঁপে তো দিলেন, কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়? সংস্কারের বাধা অতিক্রম করতে তাঁকে বিস্তর ও সুদীর্ঘ সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু রূপে বরণ করার পরও তিনি তাঁর সঙ্গে বহু তর্ক করেছেন। সবশেষে এক দিব্য অভিজ্ঞতার পর তাঁর সব সংশয় তিরোহিত হয়। তাঁর সেই অপার্থিব অনুভবের কথা অবশ্য তিনি আমাদের কখনও খুলে বলেননি। কারণ তা ছিল তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত, পবিত্রতম অনুভব!

স্বামীজীর গুরুভক্তিও ছিল তুলনারহিত। ভালবাসা, আনুগত্য প্রভৃতি শব্দ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর মনোভাবকে পরিস্ফুট করা যায় না। তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে ঐ শব্দগুলি বরং যেন নতুন তাৎপর্য, এক নতুন মাত্রা লাভ করেছিল। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ঈশ্বরের ঘনীভূত বিগ্রহ, প্রগাঢ় উপলব্ধির ছন্দে ছন্দে যাঁর শরীরের আমূল রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। যদিও আক্ষরিক অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত ছিলেন না, তবুও তাঁর সম্পর্কে বিবেকানন্দের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা ঃ 'তাঁর মতো শিক্ষিত, বুদ্ধিমান মানুষ আমি আমার জীবনে আর একটিও দেখিনি।' ভুললে চলবে না, একথা বলছেন বিবেকানন্দ স্বয়ং যাঁর ক্ষুরধার, অলোকসামান্য বুদ্ধি জগতের তাবড় তাবড় চিন্তাশীল ব্যক্তিকেও বিস্মিত করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেন। শুরু হলো তাঁর ধর্মশিক্ষার নতুন পাঠ। আগে অন্যান্যদের মতো তিনিও মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের এই পূজারি, যিনি ভবতারিণীকে মাতৃভাবে আরাধনা করতেন, তাঁর মধ্যে নরেন্দ্রনাথ এমন একটি সুমহান চরিত্রের সন্ধান পেলেন যা অদৃষ্টপূর্ব! দীপ্তোজ্জ্বল, আভাস্বর সেই চরিত্র দিব্যভাব ও প্রেমের ঘনীভূত সচল মূর্তি! তিনি মনে মনে বিচার করলেন ঃ 'মূর্তিপূজার দ্বারা যদি কেউ এমন একটি অমল চরিত্র লাভ করতে পারেন, তাহলে সেই মূর্তিপূজক আমার প্রণম্য। আমি তাঁর পায়ে মাথা বিকোতে প্রস্তুত।'

নরেন্দ্রনাথ দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একজন মানুষ যিনি এক এক করে সব ধর্মই নিজের জীবনে আচরণ করে দেখেছেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। তাঁর পূতসঙ্গে এসে 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'—এই শ্লোকের অর্থ কি তা নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। তিনি এই সত্যও

জানলেন, 'এ্যকোয়াই বল, পানিই বল, আর জলই বল—বস্তু এক।' সর্বোপরি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনলেন—ধর্ম কেবলমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার নয়, ধর্ম হচ্ছে প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিস এবং সেই অনুভূতিলাভের সুনির্দিষ্ট পথ আছে। নরেন্দ্রনাথ এও জানলেন—মানুষ ইচ্ছা করলে এখানে, এই জন্মেই দেবতায় রূপান্তরিত হতে পারে। মানব হতে পারে অতিমানব। নরেন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন—ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু—এই ধ্রুব সত্যের সাকার রূপ।

অবশেষে এল পরম বিহঙ্গের বিদায় নেবার পালা। ঈশ্বরপ্রেমে পাগল এই দেবমানব গুটিকয়েক শিষ্য রেখে যেন বড় তাড়াতাড়ি স্ব-স্বরূপে লীন হলেন। প্রিয় গুরুর অদর্শনে শিষ্যদের অবস্থা হলো প্রতিপালকহীন অসহায় মেষশাবকদের মতো। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অসহায় একাকীত্বের ভিতর দিয়েই তাঁরা বুঝতে পারলেন ঠাকুর তাঁদের ছেড়ে যাননি। বহুভাবেই তাঁরা শ্রীগুরুর দিব্য উপস্থিতি টের পেতে লাগলেন। সব সংশয় ঘুচে যাওয়ায় এবার তাঁরা এক জায়গায় একত্র হয়ে ঠাকুরের পূজা-অর্চনা ও সাধনভজনে ডুব দিলেন। গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তপস্যার উদ্দেশ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়লেও পূজার বেদির সামনে অক্ষয় প্রদীপ জ্বালিয়ে একজন ঠিকই বসে থাকতেন।

পরিব্রাজক জীবনের কথা

প্রবল বৈরাগ্যের তাড়নায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানেরা এবার দক্ষিণেশ্বর থেকে হিমালয়, হিমালয় থেকে রামেশ্বরম—এককথায় উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেন। পায়ে হেঁটে, কখনও বা গরুর গাড়িতে, হাতি বা উটের পিঠে চেপে, আবার কখনও বা ট্রেনে চড়ে তাঁরা ভারততীর্থ পরিক্রমা করতে লাগলেন। কেউ গেলেন তিব্বতে, কেউ-বা হিমালয়ের কোনও নিভৃত গুহায় তপস্যায় বসে গেলেন। কখনও বা রাজপ্রাসাদে, কখনও আবার দীনদুঃখী চাষির খোড়ো ঘরে তাঁদের দিন কাটতে লাগলো। এইভাবে বহু বছর কাটবার পর গুরুভাইরা সব আবার একত্র হয়ে দক্ষিণেশ্বরের নিকট গঙ্গার অপর পারে পাকাপাকিভাবে মঠ তৈরি করে বাস করতে লাগলেন।

অন্যান্য গুরুভাইদের মতো বিবেকানন্দও পরিব্রাজক হয়ে বহুদিন ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তবে তাঁর পরিব্রজ্যার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তার একটা উপায়

খুঁজে বার করা। স্বদেশবাসীর মঙ্গলচিন্তা তাঁকে এই সময় একেবারে পাগল করে তুলেছিল। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই পরিব্রাজক হয়ে স্বামীজী প্রথমেই বোধগয়ায় সেই বোধিবৃক্ষের তলায় বসে তপস্যা করলেন যেখানে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধও সংসার-অরণ্য থেকে মানবের মুক্তির পথ উদ্ভাবনের জন্য ধ্যানের আসন পেতে বসে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন।

বুদ্ধকে স্বামীজী কী চোখে দেখতেন তা বলে বোঝানো যাবে না। বুদ্ধের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই তিনি যেন কেমন হয়ে যেতেন! বোঝা যেত হৃদয়ের গভীরে এক প্রকাণ্ড তরঙ্গ উঠেছে। তারপর দিনকয়েক চলত কেবলমাত্র বুদ্ধেরই প্রসঙ্গ। এমন নাটকীয়ভাবে, এমন অন্তরঙ্গভাবে তিনি বুদ্ধের জীবনী আমাদের সামনে মেলে ধরতেন যে মনে হতো ঘটনাগুলো যেন আমাদের চোখের সামনেই পরপর ঘটে যাচ্ছে, মনে হতো এই সেদিনকার ঘটনা! শুধু তাই নয়, মনে হতো এ যেন আমাদের জীবনেরই বৃত্তান্ত। দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকে যেতেন স্বামীজী, আর আমরাও দেখতে পেতাম যুবরাজ সিদ্ধার্থকে। দেখতে পেতাম তাঁর প্রাসাদ ও প্রমোদ-উদ্যানগুলি। রূপসী যশোধরাও যেন পায়ে পায়ে আমাদের সামনে হাজির হতেন। স্বামীর বৈরাগ্য দেখে তাঁর মনে সর্বদাই চাপা উৎকণ্ঠা—কি জানি কখন কি হয়! তিনি যেন ভবিতব্যের ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন। পাবেনই তো। কারণ কথায় বলে 'ছায়া পূর্বগামিনী।' এরপর পুত্র হলো যশোধরার। মা হওয়ায় যশোধরা যেন সাময়িক একটু আশ্বস্ত হলেন। ভাবলেন, যাক—এই ছেলেই তার বাবাকে সংসারে টেনে রাখবে! কিন্তু সে আশা দুরাশায় পরিণত হলো যখন সিদ্ধার্থ পুত্রের নাম রাখলেন 'রাহুল'—রাহুল অর্থাৎ শৃঙ্খল। যশোধরার মনে আবার পুরনো ভয় উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো। তাঁর আশঙ্কা হলো, তবে কি সন্তানও তার পিতাকে স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে পারবে না? ভাবতে না চাইলেও তাঁর মন বলে উঠলো—না, না, না। শঙ্কায় তাঁর বুক দুরদুর করে উঠলো।

স্বামীজীর বলার এমনি গুণ যে সে ভয় আমাদেরও বেশ পেয়ে বসলো। যশোধরার দুঃখে আমাদের হৃদয়ও ব্যথাতুর হলো।

একটা জিনিস তখন আমরা লক্ষ্য করিনি। টের পেয়েছি অনেক পরে। সেটা এই—স্বামীজী যখন আমাদের বুদ্ধের জীবন কাহিনী বলতেন, তখন একদিকে পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, এমনকি নিজের রাজ্যের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ এবং অন্যদিকে এক মহত্তম আদর্শের আহ্বান, এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাবের সংঘাত

সিদ্ধার্থকে কতখানি ক্ষতবিক্ষত করেছিল বা আদৌ করেছিল কি না, তার ইঙ্গিত তিনি আমাদের কাছে একবারের জন্যও দেননি। তাঁর কথা শুনে আমাদের মনে হয়েছে সিদ্ধার্থের মনে এ নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। বাস্তবিকই তাই। কারণ একবারের জন্যও তাঁর একথা মনে হয়নি ঃ 'আমি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পিতার মৃত্যু হলে কে রাজ্যের ভার নেবে?' সিদ্ধার্থ কি জানতেন না, পিতার যে রাজ্য, তার চাইতেও অতি বিশাল এক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তিনি? তিনি কি জানতেন না, শাক্য বংশের চেয়েও অনন্তগুণ বড় এক ঘরে তাঁর জন্ম? অবশ্যই জানতেন। কিন্তু তাঁর কাছের লোকেরা তা জানতেন না। অবশ্য তাঁর জন্য তাঁদের প্রতি তরুণ সিদ্ধার্থের গভীর সহানুভূতি ছিল। আর সেই সপ্রেম সহানুভূতির ভিতর প্রচ্ছন্ন ছিল নীরব বেদনা। কিন্তু সব ছাপিয়ে যা চোখে পড়ত তা তাঁর অটল, অকুণ্ঠ সঙ্কল্প। তাই আপন লক্ষ্যের দিকে সিদ্ধার্থ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। আর যশোধরা পিছনে পড়ে থাকলেও সাধ্যমতো স্বামীর আদর্শ অনুসরণ করে সংযত জীবন যাপন করতে লাগলেন। অতি সাধারণ বেশভূষা, একবেলা আহার আর ভূমিশয্যা—এই হলো তাঁর দৈনিক জীবনচর্চার অঙ্গ। যশোধরার মহত্ত্বের কথা সিদ্ধার্থ জানতেন। তিনি যে ভবিষ্যৎ বুদ্ধের সহধর্মিণী। বুদ্ধের ত্যাগের আদর্শকে অঙ্গের ভূষণ করে তিনিও যে জীবনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন।

এরপর শুরু হলো গৌতমের নিদারুণ সাধন-সংগ্রাম। একের পর এক আচার্যের কাছে তিনি গেলেন। বহু ধরনের সাধন-পদ্ধতি অভ্যাস করলেন। সে এক উদগ্র তপস্যা! কঠোরতা, সংযম, দীর্ঘ উপবাস ও ক্লেশকর ব্রতাদি পালনের ফলে তিনি একেবারে মরণাপন্ন হলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন এভাবে হবে না। এ পথ তাঁর জন্য নয়। তখন তিনি সব ছেড়ে-ছুড়ে বোধগয়ায় একটি পিপুল গাছের তলায় এসে ধ্যানের আসন বিছিয়ে বসলেন এবং জগদ্‌বাসীর উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু। অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।' (অর্থাৎ, 'এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যায় যাক—অস্থি, চর্ম, মাংস ধ্বংস হয় হোক; বহু বহু জন্মেও যা দুর্লভ সেই পরমজ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমি এই আসন ছেড়ে উঠছি না।')

সেই সত্যজ্ঞান তিনি সেখানে লাভ করলেন। তারপর জয়ের উল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন ঃ

'বহু, বহু জন্ম ধরে বাঁধা পড়ে ছিনু
জীবনের পায়—
সতত করিনু সন্ধান, হায়
কে করেছে নির্মাণ
দুঃখে পূর্ণ এই ইন্দ্রিয়কারাগার।
দুরন্ত সংগ্রামের পর
আজ আমি জেনেছি তোমায়
যে তুমি গড়েছো এই ভগ্ন পিঞ্জর।
আর কভু রচিবে না
ব্যথা দিতে কারা—
গড়িবেনা ভেদ-স্তম্ভ করিতে বঞ্চনা।
শেষ হলো ঘর ছাওয়া
নব নব রূপে,
ধরিবে না আর তুমি বিভ্রম সম্মুখে।
বিঘ্নশূন্য সেথা হতে যাত্রা এক যানে—
চলা মোর থেমে যায় পরিনির্বাণে ॥'

বোধিলাভের পর বুদ্ধ পিতৃরাজ্যে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ পিতার আনন্দ আর ধরে না! রাজপুত্র ফিরছেন শোনামাত্রই তিনি রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন—রাজধানীকে পত্রে, পুষ্পে, তোরণে, বর্ণের বিচিত্র বাহারে সুসজ্জিত কর। সকলের মধ্যেই উচ্ছ্বাস আর আগ্রহ, প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা—কতদিন পর রাজকুমার দেশে ফিরছেন!

কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? এ যে এক ভিখারি! হ্যাঁ, ভিখারিই বটে! অদ্ভুত এক বিষয়বিতৃষ্ণ ভিখারি। একদল ভিক্ষুর পুরোভাগে তিনি আসছেন ধীরে, অতি ধীরে। প্রিয়-প্রতীক্ষায় অস্থির যশোধরা আজ যেন আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না। প্রাসাদ অলিন্দ থেকে স্বামীকে দেখামাত্রই তিনি বালকপুত্র রাহুলকে বললেন ঃ 'যাও বৎস, পিতার কাছে গিয়ে এখনি তোমার পাপ্য চেয়ে নাও।' রাহুলের দুচোখে অপার বিস্ময়! 'কে আমার পিতা?' রাহুল যশোধরাকে জিজ্ঞাসা করলো। যশোধরার ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেলো। পুত্রের এই রকম একটা প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না রাজপথ দিয়ে এক মৃগেন্দ্র আসছেন!' এ কথা শোনামাত্রই রাহুল দৌড়ে গেল সেই কন্দর্পকান্তি বীর কেশরীর কাছে, চাইলো তার প্রাপ্য। সঙ্গে সঙ্গে তার অঞ্জলিপুটে অর্পিত হলো এক টুকরো গৈরিক বস্ত্র!

পরবর্তী একটি দৃশ্যে রাহুল পিতার পিছু পিছু হাঁটছে আর আপনমনে ভাবছে—'কী সুদর্শন রাজকীয় চেহারা! আমাকেও অনেকটা ওঁরই মতো দেখতে' ইত্যাদি ইত্যাদি। পুত্রের মনোভাব বুঝতে পেরে বুদ্ধ তখনই তাকে ভর্ৎসনা করলেন। ফলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো রাহুলকে। সেদিন আর তার ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষায় যাওয়া হলো না। একটি গাছের তলায় বসে সে পিতার নির্দেশমতো ধ্যান করেই কাটালো। সেইদিনই রাজা এবং শাক্যবংশীয় পাত্রমিত্ররাও প্রথম বুদ্ধের বাণী শুনলেন। শুনে তাঁরা এমনই মোহিত যে একে একে সকলেই বুদ্ধের শরণ নিলেন। যশোধরাও বুদ্ধের কৃপা পেয়ে শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হলেন।

দিনের পর দিন স্বামীজী এইভাবে বুদ্ধের আবির্ভাবের দৃশ্যপট থেকে শুরু করে কুশীনগরে তাঁর অন্তিমলগ্নের মর্মন্তুদ দৃশ্যটি পর্যন্ত এমন ভালবাসা দিয়ে বর্ণনা করতেন যে আমাদের মনে হতো আমরা যেন নিজের চোখেই সবকিছু প্রত্যক্ষ করছি। কুশীনগরের মাল্লাদের মতো বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের মুহূর্তে আমাদেরও চোখে জল। এক হিসেবে আমরাও ভাগ্যবান।

বারাণসীতে স্বামীজী বেশ কয়েকমাস ছিলেন। সেখানে সাধুসঙ্গ আর পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা করেই তাঁর দিন কাটত। একদিন ওখানকার এক অতিপরিচিত ও অতিবৃদ্ধ সাধু শাস্ত্র আলোচনার সময় স্বামীজীর স্বাধীন মতামতকে অর্বাচীন বালকের ধৃষ্টতা বলে ভুল করলেন। তিনি স্বামীজীর ওপর এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে শাপশাপান্ত করেন আর কি। স্বামীজীও দমবার পাত্র নন। তিনিও বলেছিলেন ঃ 'গোটা ভারতবর্ষকে কাঁপিয়ে তবেই আমি আবার এই বারাণসীর মাটিতে পা দেবো, নচেৎ নয়।' স্বামীজী কথা রেখেছিলেন। ১৯০২ সালের আগে তিনি আর বারাণসীর ছায়া মাড়ান নি। অবশ্য তার বহু পূর্বেই বিশ্বের দরবারে তিনি আপন মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

স্বামীজী নিজেকে সর্বদাই ভারতের সন্তান, ঋষিদের বংশধর বলেই মনে করতেন। যদিও চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির নবীনতায় তিনি অত্যাধুনিকদের চেয়েও অনেক বেশি অভিনব ছিলেন, তবুও সনাতনপন্থী হিন্দুদের কেউই তাঁর মতো বৈদিক ঋষির আরণ্যক জীবনের প্রজ্ঞাদীপ্ত দিনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন নি। বস্তুত সনাতন সত্যগুলি তাঁর শিক্ষাদানের গুণে এমন জীবন্ত হয়ে উঠতো যে অনেক সময় মনে হতো তিনি যেন সুদূর অতীতের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা কোনও এক প্রাচীন ঋষি। কৌতূহলী হয়ে আমাদের কেউ কেউ

তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এমন আশ্চর্য সুললিত মন্ত্রোচ্চারণ আপনি কোথায় শিখেছেন, স্বামীজী? আপনার স্তোত্রপাঠ শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। তার উত্তরে স্বামীজী সলজ্জভাবে বলেছিলেন ঃ একবার আমার এক দর্শন হয়। দেখি প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনও এক অরণ্যে আমি রয়েছি আর শুনতে পাচ্ছি কেউ যেন একের পর এক পবিত্র সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে যাচ্ছে। সেদিন সে কণ্ঠস্বর শুনে খুবই অবাক হয়েছিলুম। কারণ তা ছিল আমারই কণ্ঠস্বর। আর একবার দেখেছিলুম এক অরণ্যে বহু ঋষি একত্র হয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করছেন—চরম সত্য কি? বুধমণ্ডলীর ভিতর থেকে সেই উত্তর দিলেন এক তরুণ তাপস। উদাত্ত কণ্ঠে সেদিন তাঁকে ঘোষণা করতে শুনেছিলুম, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ২/৫, ৩/৮)—'অমৃতের পুত্র তোমরা সব শোন, দিব্যধামবাসী দেবতারাও শুনুন, আমি সেই পরম সত্যস্বরূপ পুরুষকে জেনেছি একমাত্র যাঁকে জানলেই জন্মমৃত্যু চক্রের পারে যাওয়া যায়। মুক্তির আর অন্য কোনও পথ নেই।'

পরিব্রাজক জীবনের গোড়ায় জাত-পাতের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বামীজীকে বিস্তর লড়াই করতে হয়েছে। সে কথা তিনি আমাদেরও বলেছিলেন। একদিন তিনি পথ চলছেন, হঠাৎ তাঁর মনে হলো একটু তামাক খেলে বেশ হয়। তা, যেতে যেতে তিনি দেখলেন একদল মেথর রাস্তার ধারে বসে তামাক খাচ্ছে। স্বামীজী থামলেন না, এগিয়ে গেলেন। কিন্তু বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর তাঁর মনে হলো তিনি আর চণ্ডালগুলোর মধ্যে কোনও প্রভেদই নেই—স্বরূপত তাঁরাও একই আত্মা। তক্ষুনি স্বামীজী ফিরে এসে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের কাছ থেকে হুঁকো চেয়ে নিয়ে মনের সুখে তামাক খেলেন।

এই ঘটনা থেকে অবশ্য এ কথা মনে করা ঠিক নয় স্বামীজী বর্ণাশ্রম প্রথার নিন্দা করতেন। স্বামীজী বলতেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক বিশেষ লগ্নে তথা জাতির অভ্যুদয়ে বর্ণাশ্রমের একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা যখন মানুষের হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করে, যখন সে আর মানুষকে মানুষরূপে দেখতে শেখায় না, যখন সে ভুলিয়ে দেয় আমি আর চণ্ডাল স্বরূপত এক এবং অবিভাজ্য আত্মা, তখন বুঝতে হবে ঐ প্রথা ভাঙ্গবার দিন এসেছে। কিন্তু কেবল ভাঙ্গতে হবে বলেই ভাঙ্গা—স্বামীজী তা সমর্থন করতেন না।

সদানন্দ

পরিব্রাজক জীবনের এই সময়টাতেই বিবেকানন্দ প্রথম একজনকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। ট্রেনে করে আসছিলেন তিনি। ট্রেন হাতরাস স্টেশনে থামলে অল্পবয়সী স্টেশন মাস্টার তৃতীয় শ্রেণীর[১] কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে বসে থাকা তাঁরই সমবয়সী পদ্মপলাশলোচন এক সাধুর অনিন্দ্য দৃষ্টির প্রেমে পড়ে যান। কারণ, মাত্র কয়েক দিন আগেই স্বপ্নে তিনি ঐ চোখদুটি দেখেছিলেন। দেখার পর থেকে ঐ অসম্ভব চোখদুটি তাঁকে যেন প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরছ। এখন আকস্মিকভাবে সেই চোখদুটি আবার দেখতে পেয়ে স্টেশন মাস্টারের আনন্দ বুঝি আর ধরে না! তিনি বিস্মিত, রোমাঞ্চিত! সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে তিনি করজোড়ে মিনতি করলেন—কৃপা করে যদি আপনি ট্রেন থেকে নেমে আমার বাসায় যান তো আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী রেল কর্মচারীটির সেই অনুরোধ রেখেছিলেন।

পরে, আফিসের কাজকর্ম সেরে স্টেশন মাস্টারটি ঘরে ফিরে যখন নবাগত সন্ন্যসীর পায়ের কাছে এসে বসলেন, তখন তিনি শুনলেন সাধুজী আপনমনে একটা বাঙলা গান গাইছেন যার অর্থ—'বিদ্যে পাবার সাধ থাকে তো চাঁদমুখে ছাই মাখো, যাদু।' যুবক ভক্তটির আর তর সইলো না। চট্ করে উঠে গিয়ে তিনি অফিসের পোশাক ছেড়ে সমস্ত মুখে এক গাদা ছাই মেখে আবার স্বামীজীর কাছে ফিরে এলেন।

স্বামীজী যেদিন ট্রেনে হাতরাস ত্যাগ করলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গী হলেন সেই মুখে-ছাই মাখা স্টেশন মাস্টার যিনি পরে স্বামী সদানন্দ বলে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে সদানন্দজী বুক ফুলিয়ে বলতেন ঃ আমি কি মুক্তি-ফুক্তির লোভে স্বামীজীর পিছু নিয়েছিলাম নাকি? কখনোই না। ঐ 'সর্বনেশে চোখ জোড়াই' আমাকে পাগল করে ছেড়েছে।

এবার সদানন্দের পরিব্রাজক জীবন শুরু হলো। সেই নতুন জীবনে পুরাতনের নিশ্চিত আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না সত্য, এও সত্যি মাঝে মাঝে পথের কষ্টে তিনি ক্লিষ্ট হতেন, কিন্তু তবুও গুরুর সান্নিধ্যে এমন এক দিব্য মাধুর্য ছিল যা তাঁকে দৈহিক কষ্টের কথা ভুলিয়ে দিত। ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে হয়তো পায়ে ফোস্কা পড়েছে। কিন্তু গুরুর সেবাযত্নে সে যন্ত্রণার কথা শেষপর্যন্ত

---

১ স্বামী সদানন্দের মতে 'ফার্স্ট ক্লাস কামরায়'। উদ্বোধন প্রকাশিত 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী', পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য।

তাঁর মনে থাকত না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বামী সদানন্দ ঐ সুখের দিনগুলির কথা বলতে গিয়ে কেঁদেছেন। তিনি বলতেন, 'ভাবতে পারো স্বামীজী আমার জুতো মাথায় বয়েছেন!'

সেসব দিনের কথা ভোলবার নয়। স্মৃতির ফলকে সোনার অক্ষরে সেগুলি চিরন্তর হয়ে আছে। স্বামীজী এবং সদানন্দ দুজনের মধ্যেই একটি শিল্পিসত্তা ছিল যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। দুজনের মধ্যেই স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি ছিল। গুরু, শিষ্য—দুজনের চেহারাই ছিল অসম্ভব আকর্ষণীয়। শিল্পীরা তো তাঁদের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন।

অনন্ত জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে হিমালয়ের দুর্গম গিরিগুহায় একাকী দিনের পর দিন কেমন ধ্যানমগ্ন হয়ে কাটাতেন, স্বামীজী সে তপস্যার জীবনের কথা আমাদের কাছে বলেছিলেন। কিন্তু চাইলেও ধ্যানের প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন তাঁর কপালে বেশিদিন জুটলো না। ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে আর একবার তাড়িয়ে নিয়ে গেল মরুরাজ্য রাজপুতানায় এবং পশ্চিম ভারতের শহরগুলিতে। এই সময় নির্জনবাসের ইচ্ছা তাঁর এতো প্রবল হয়েছিল যে ইচ্ছে করেই গুরুভাইদের সঙ্গে পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ রাখতেন না। ফলে মাঝে মাঝে তাঁরাও ব্যাকুল হয়ে স্বামীজীর খোঁজখবর শুরু করতেন। একবার বহু খোঁজাখুঁজির পর এক গুরুভাই দেখলেন Bombay Presidency-র এক জায়গায় স্বামীজী ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখবর অন্যান্য গুরুভাইদের জানালেন। তিনি লিখছেন ঃ 'তাঁর সমস্ত মুখখানি দেবতার দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করছিল। দেখলেই বোঝা যায় এ ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতি।' সেই গুরুভাই-এর বর্ণনা থেকে জানা যায় তিনি ভয়ে ভয়ে স্বামীজীর কাছে গেলে স্বামীজী তাঁকে সস্নেহে কাছে বসিয়ে সব খোঁজখবর নিলেন; কিন্তু এও বললেন ঃ 'তুই অবিলম্বে এখান থেকে চলে যা। মোটেই আমার পিছু নিবিনে। আমায় একলা থাকতে দে।'

বিবেকানন্দ কিছুদিন খেতরি রাজার অতিথি হয়েছিলেন। খেতরির রাজা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদিন তিনি রাজ দরবারে বসে আছেন। এমন সময় এক বাঈজী এসে গান গাইবার উদ্যোগ করলে স্বামীজী তক্ষুনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। স্বামীজী উঠে যাচ্ছেন দেখে মহারাজ বল্লেন ঃ 'স্বামীজী আপনি যাচ্ছেন কেন? ও যে গান গাইবে তাতে আপত্তিকর কিছুই থাকবে না, বরং আমার মনে হয় ওর গান শুনে আপনি তৃপ্তই হবেন।' এই

কথায় স্বামীজী আবার বসে পড়েন।[১] বাঈজী তখন ভক্ত-কবি সুরদাসের এই ভজনটি ধরেন ঃ

'প্রভু মেরে অবগুণ, চিত ন ধরো।
সমদরশী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো।
ইক লোহা পূজা মেঁ রাখত, ইক রহত ব্যাধ-ঘর পরো,
পারসকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।
ইক নদীয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরো,
জব্ মিলি দোনো এক-বরণ-ভয়ে, সুরসুরি নাম পরো;
ইক জীব ব্রহ্ম কহাবত, সুরদাস ঝগরো,
অজ্ঞান সে ভেদ হোবে, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।'

বাঈজীর কণ্ঠে ভক্তিরসের বেদনাবিধুর গান শুনে নবীন সন্ন্যাসী একেবারে মুগ্ধ। তিনি গায়িকাকে আশীর্বাদ করেন এবং সেও সেইদিন থেকে তার জীবিকা পরিত্যাগ করে শুদ্ধ ও পবিত্র জীবনে ব্রতী হয়।

স্বামীজী যখন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করছিলেন তখন তাঁর মাথায় শুধু একটা চিন্তাই ঘুরপাক খেত ঃ কি উপায়ে দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়। সমস্যা তো একটা নয়, সমস্যার পাহাড়! কি নেই সেখানে? জনসাধারণের, বিশেষত অনুন্নত শ্রেণীর দারিদ্র্য এবং তাদের প্রতি উন্নত শ্রেণীর মানুষের নৈতিক দায়িত্ব; ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা এবং অন্যান্য রোগের সমস্যা, বাল্য বিবাহ, স্ত্রীজাতি ও বিধবাদের দুরবস্থা; অশিক্ষা, খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনার সমস্যা, জাত-পাতের সমস্যা—এককথায় সমস্যার মহামিছিল!

তীর্থ ভ্রমণের যে একটা বিশেষ মূল্য আছে স্বামীজী এই সময় তা উপলব্ধি করলেন। তিনি বললেন ঃ 'ভারতবর্ষকে উঠাতে হলে তাকে ভালবাসতে হবে, আর ভালবাসতে গেলে অতি অবশ্যই তাকে জানতে হবে।' আজ দেখি উৎসাহী তরুণ ছাত্রের দল তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে শতশত মাইল পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এতে শুধু যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয় তাই নয়, মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবোধও জেগে ওঠে। দেশের সংহতিও সুদৃঢ় হয়। তীর্থযাত্রীর দল তাদের দেশমাতৃকার সাথে পরিচিত হয় এবং তাকে ভালবাসতেও শেখে। তারা এক বিশ্বাস, এক আশা, এবং একই উদ্দেশ্যের

১ বাস্তব ঘটনা এই—স্বামীজী প্রথমে দরবার ছেড়ে চলে যান। কিন্তু পরে গানের শুদ্ধভাবে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে আসেন এবং নিজের ভুল স্বীকার করেন। —প্রকাশক।

সূত্রে গ্রথিত। ভারতবর্ষের মতো এই-যে বিশাল একটি দেশ, সনাতন পবিত্র ভাষা বলতে তার একটাই যা থেকে অন্য আর পাঁচটা ভাষার জন্ম হয়েছে। ঠিক একইভাবে দেখতে গেলে ভারতের একটাই পৌরাণিক ঐতিহ্য, মূলত একই ধরনের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা এবং জীবনের চরম লক্ষ্যও একটাই। ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী খ্রীস্টানদের কাছে ভগবান যিশুর শবাধারের যে মূল্য, ক্যাথলিকদের কাছে রোম-এর যে মহিমা, মুসলমানদের কাছে মক্কার যে কদর, হিন্দুদের কাছে তীর্থযাত্রার মূল্য তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। যদি তীর্থক্ষেত্রগুলির ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র রচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বরম এবং পুবে পুরী থেকে পশ্চিমে দ্বারকা পর্যন্ত অগণিত তীর্থক্ষেত্রই ভারত প্রতিমার তনুরুচি আবৃত করে রেখেছে। যদি কেউ প্রশ্ন করেন, তীর্থযাত্রীর দল কিসের সন্ধানে ফেরেন? তার উত্তর এই—মানবাত্মার চিরন্তন যে লক্ষ্য, তার প্রতিই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁরা সেই পরম সত্যবস্তুর সন্ধান করেন যাঁর প্রতি ব্যাকুলতা আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ, একেবারে খুইয়ে বসেছি।

এমন মানুষ যাঁরা, তাঁরা যে ভারতবর্ষকে ভালবাসবেন, তার সমস্যাগুলি এবং প্রয়োজনের কথা আর পাঁচজনের চাইতে ভালভাবে বুঝবেন এবং তার সেবায় নিজেদের জীবন আহুতি দেবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? যাঁরা সমাজ-সংস্কারক তাঁদের সঙ্গে এঁদের বিরাট পার্থক্য। সমাজ-সংস্কারকরা যে ভুল করে থাকেন, এঁরা তা করেন না। এঁরা পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, অথচ বর্তমানের যা প্রয়োজন তাকেও মর্যাদা দেন। অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস এবং ভালবাসা সম্বল করে এঁরা সকল কর্মে প্রবৃত্ত হন। এঁরা জানেন পরিবর্তন বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস নয়, তা স্বাভাবিক নিয়মে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসে থাকে। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক এবং গঠনমূলক। কোনও কিছুকে ধ্বংস করা এঁদের অভিপ্রায় নয়।

স্বামীজী নিজেও সংস্কারক ছিলেন না। তিনি কেবল স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাস করতেন, ধ্বংসে নয়। ভারতবর্ষের নানাবিধ প্রথা আর সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়মকানুনগুলি তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে প্রতিটি রীতিনীতিই শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে এবং ধীরে ধীরে কু-ভাবের অনুপ্রবেশ তাকে দুষ্ট করেছে।

দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর করাল অট্টহাসি কেমন করে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে কঙ্কালে পরিণত করেছে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য স্বামীজী স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে লক্ষ্য করেছেন একটা মহান জাতির ঐতিহ্য কিভাবে ধুলোয় লুটাতে বসেছে। এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি। তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজে হাত দিলেন। আজও সেই সেবাযজ্ঞ অব্যাহত। যখনই যেখানে কলেরা বা অন্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, প্লেগ মহামারীতে শতশত লোকের প্রাণ যায়, তখনই সেখানে দেখবেন বিবেকানন্দের উত্তরসূরীরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দুঃখী ও আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, দুর্ভিক্ষের সময় দেখবেন তাঁরাই ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিচ্ছেন। আবার বন্যার সময় দেখবেন তাঁরাই ত্রাণকার্য পরিচালনা করছেন। এই ত্রাণ ও সেবামূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকেই, কারণ যাঁরা সাহায্য পাঠান তাঁরা ভালভাবেই জানেন তাঁদের পাঠানো প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখা হয় এবং সেই অর্থ অত্যন্ত বিবেচনা করে বহুজন হিতায় খরচ করা হয়।

Bombay Presidency-তে থাকার সময় স্বামীজী বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত চর্চা করতেন। ঐ সময়েই সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষ ভঙ্গিটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। স্বামীজী দাক্ষিণাত্যের উচ্চারণ রীতির বরাবরই খুব প্রশংসা করতেন। সেখান থেকে নানা জায়গা ঘুরে, কোথাও এক রাত্রি, কোথাও বা কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে স্বামীজী অবশেষে মাদ্রাজ পৌঁছলেন। দক্ষিণ-ভারতের এই শহরে আসামাত্রই একদল উৎসাহী, ধর্মপ্রাণ যুবক তাঁর একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন। তাঁরা স্বামীজীকে প্রকৃত মহাত্মা বলে চিনতে পারলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও তাঁরা স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ করে নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হলেন না, কারণ এটা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন স্বামীজীর ক্ষেত্রে জাতি বা বর্ণের কোনও সঙ্কীর্ণ নিয়মই খাটে না—তিনি ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। উদ্যমী এই যুবকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থভিক্ষা করে স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করলেন।

জগৎকে ভারতাত্মার অনন্য বাণী শোনাবার জন্য স্বামীজীর অন্তর এবার উদ্বেল হলো, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হলো আমেরিকার দিকে। তিনি এও ভাবলেন আমেরিকা কুবেরের দেশ। দেশের গরিব মানুষের জন্য সেখান থেকে হয়তো কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'মানুষ যখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে তখন তার কাছ থেকে তুমি ধর্ম আশা করতে পারো না।'

স্বামীজী যদিও সাহায্যের আশা নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমেরিকায় পৌঁছে দেখা গেল তিনি গ্রহীতা নন, তিনি দাতা। কিন্তু যিনি সর্বত্যাগী কপর্দকহীন সন্ন্যাসী, তিনি আবার কি দেবেন? কি দিতে পারেন তিনি? শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যিই কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন। যে অমূল্য ধন বহু সাধনায় তিনি অর্জন করেছিলেন রাজার মতো দরাজ হাতে তা তিনি সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দানের সেই পরম বস্তুটি কি? আত্মজ্ঞান। জগৎকে এখনও ভারতবর্ষের যদি কিছু দেবার থাকে তো সে এই মূল্যাতীত আত্মার অমৃত বাণী।

সহায় সম্বলহীন, নিঃসঙ্গ, কোনও ঢাকঢোল না পিটিয়েই তিনি সুদূর আমেরিকায় পাড়ি দিলেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'আমি বাপু জীবনে কখনও বক্তৃতা-ফক্তৃতা দিইনি। তবে হ্যাঁ, আমার চারপাশে যারা ভিড় করতো, ঘরোয়াভাবে তাদের সামনে কখনও সখনও কিছু বলেছি। সেসব ক্ষেত্রেও সাধারণত কেউ কিছু প্রশ্ন করলে আমি তার উত্তর দিয়েছি মাত্র। তাছাড়া ধর্মমহাসভায় সকলেই আগে থেকে তাঁদের বক্তব্য বিষয় সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন যা আমি করিনি। যখন আমার বলার পালা এলো, গুরুদেব ও মা সরস্বতীকে স্মরণ করে আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং শুরু করলাম এই বলে—"আমেরিকাবাসী আমার বোনেরা এবং ভায়েরা।" কিন্তু ঐটুকু বলেই আমাকে থামতে হলো। কারণ ঐ কটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই এমন তুমুল করতালি শুরু হলো যে হলো ফেটে যাবার যোগাড়।' সেই অকল্পনীয় বাঁধ-ভাঙ্গা অভিনন্দনের উচ্ছ্বাস দেখে স্বামীজী রোমাঞ্চিত হলেন, বুঝি বা এক লহমার জন্য একটু শঙ্কিতও। কিন্তু সেই প্রথম তিনি মনে প্রাণে অনুভব করলেন, তিনি একা নন, তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান এক জগৎপ্লাবী মহাশক্তি। এরপর তিনি যে ঈশ্বরের চাপরাশ পেয়ে তাঁরই ইচ্ছায় কর্ম করছেন এ নিয়ে সংশয়ের তিলমাত্র ছায়া তাঁর মনকে বিব্রত করেনি।

স্বামীজীই পথ দেখালেন। পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনিই সর্বপ্রথম বেদান্তের কথা শোনালেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও চরিত্র দেখে সকলে অবাক! ও দেশের মানুষ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো ঃ 'যে দেশে এমন মানুষ জন্মায়, সেই দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো কি ঘোর আহাম্মকি নয়?'

তাঁর মুখের কিছু কথা

এমন কিছু মহৎ চিন্তা আছে যা যুগ যুগ টিকে থাকে। টিকে থাকার কারণ এই নয় সেগুলি সবচাইতে প্রয়োজনীয় এবং জরুরি; তারা স্থায়ী হয় তাদের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্বের গুণে। ঠিক এই রকম একটি কথা স্বামীজীর কাছ থেকে শুনেছিলাম যেদিন তিনি আমাদের যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর গল্পটি বলেছিলেন। আপ্তবাক্যটি স্বামীজী উচ্চারণ করেছিলেন গল্পের একেবারে শেষে। তিনি বলেছিলেন ঃ 'স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে না, স্বামীর মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান তাঁকেই সে ভালবাসে।'

প্রেম ঃ সব ভালবাসাই যে মূলত এক এবং অবিচ্ছিন্ন—এটা আমরা এই প্রথম শুনলাম। সন্তানের প্রতি, বাবা-মার প্রতি, স্ত্রী বা বন্ধুবান্ধবের প্রতি আমাদের যে ভালবাসা তা এই কারণে যে তাদের সকলের মধ্যেই সেই এক চৈতন্য, এক পরমাত্মা, এক আনন্দ জ্বলজ্বল করছে। মা তাঁর সন্তানের মধ্যে সেই দেবত্বকে অনুভব করেন, স্ত্রী করেন তাঁর স্বামীর মধ্যে। এই সত্য অনুরূপভাবে অন্যান্য সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক অখণ্ড, অবিভাজ্য প্রেমকে আমরা যেন খণ্ড খণ্ড করে এক একটা সঙ্কীর্ণ খাঁচার মধ্যে পুরে পৃথক পৃথক নাম দিয়ে বলছি—মায়ের ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, বন্ধুর ভালবাসা, দয়িতের ভালবাসা, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এক প্রেমই বহুভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

আনন্দ ঃ 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' [তৈত্তিরিয়োপনিষদ্ (৩।৬)-এর এই শ্লোকের অর্থ, আনন্দ থেকেই জীবের জন্ম, আনন্দ দ্বারাই সে জীবন ধারণ করে এবং পরিশেষে আনন্দের মধ্যেই সে মিশে যায়।] পাপ থেকে আমাদের জন্ম হয়নি। আমরা আনন্দের সন্তান। আনন্দই আমাদের সকলের স্বরূপ। আর এই যে আনন্দ, এ কিন্তু বাইরের জিনিস নয় যে আমরা তাকে লাভ করবো বা অর্জন করবো। 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই। আমাদের জীবনে দুঃখ আসে, ঝড় আসে ঠিকই, কিন্তু তাতে যা সত্য তা কখনও মিথ্যা হয়ে যায় না। সবকিছুর মাঝেও আমি বজ্রের তেজে বলে উঠবো ঃ 'আমি আনন্দস্বরূপ, আমি জ্ঞানস্বরূপ। আমার এই স্বরূপ—এ কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না, আবার কোনও কিছুই এর ওপর নির্ভর করে না।' এই সত্য একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর, আবার পরম সুন্দর।

ক্রমোন্নতি ঃ এ যাবৎ আমরা বিশ্বাস করতাম জ্ঞান বা মুক্তি— এ হলো একেবারে শেষের কথা। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

কিন্তু সনাতন সত্যের বার্তাবাহক স্বামীজী আমাদের বললেন, মুক্তি ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে আসে না। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে অজ্ঞানতার আবরণটি সরিয়ে ফেলে চরম সত্যটি উপলব্ধি করা। মানুষ এখন স্বরূপত দেবতাই আছে। শুধু সেই দৈবী সত্তাটিকে উপলব্ধি করতে হবে। মুক্তি লাভ মানে বাইরে থেকে কোনও কিছু লাভ করা নয়। নিজেদের পাপী, ক্ষুদ্র বা অসহায় ভাবা ঘোর বাতুলতা, একটা জঘন্য মিথ্যা-কল্পনা। আমরা নিষ্কলুষ, সর্বশক্তিমান আত্মা। এইটি অনুভব করতে পারলে এই মুহূর্তেই তুমি মুক্ত।

অবতারাদি ঃ যিশু যে ঈশ্বরের পুত্র (Son of God) বা ঈশ্বরাবতার ছিলেন, সে কথা স্বামীজী বিশ্বাস করতেন। তিনি যিশুকে শ্রদ্ধা ও উপাসনাও করতেন। কিন্তু যিশু যে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার—এ কথা তিনি বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে করতেন। ঈশ্বরের শক্তি ও দিব্য করুণা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আধারে প্রকাশিত হয়েছে—এই ছিল তাঁর মত।

পারসীদের প্রসঙ্গে ঃ স্বামীজী পারসীদের কথাও আমাদের বলেছিলেন। এক হাজার বছর আগে মুসলমান সৈন্য পারস্য আক্রমণ ও অধিকার করলে জরথুস্ট্রের বেশ কিছু অনুগামী প্রাণভয়ে ভারতে পালিয়ে আসেন। কালক্রমে তাঁরাই পারসী নামে পরিচিত হন। অগ্নির এই উপাসকরা আজও নির্বিঘ্নে তাঁদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। নতুন দেশ ভারতবর্ষে এসেও তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। সংখ্যায় অল্প হলেও আজ ভারতীয় সমাজে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু মহৎ চরিত্রের মানুষও জন্মেছেন। সমালোচনা করতে চাইলে তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু একটা কথাই বলা চলে—তাঁরা সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে খুব বেশি মেলামেশা করেন না, সবার থেকে নিজেদের একটু দূরে সরিয়ে রাখেন, এবং হাজার বছর ভারতবর্ষে থেকেও তাঁরা নিজেদের ভারতবাসী ভাবতে পারেন না।[১]

খ্রীস্টধর্ম ঃ স্বামীজীর মতে অ্যাপসল টমাস-ই ভারতে প্রথম খ্রীস্টধর্ম প্রচার করেন। সেটা যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার প্রায় পঁচিশ বছর পরের ঘটনা। তিনি এও বলেছিলেন, ধর্মের নামে অহিন্দুদের ওপর কখনও কোনও অত্যাচার ভারতবর্ষে হয়নি। ভারতবর্ষে যারা প্রথম খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল তাদের বংশধরেরা আজও দক্ষিণ ভারতে শান্তিতে বসবাস করছে। ইউরোপ যখন বর্বরীয় অন্ধকারে ডুবে ছিল, তার অনেক আগেই ভারতের মানুষ খ্রীস্টধর্মকে স্বাগত জানিয়েছে,

১ অতীতে যাই হোক না কেন, বর্তমানে এ কথা প্রযোজ্য নয়। —প্রকাশক

তার পবিত্র শিক্ষাগুলির সমাদর করেছে। ভারতে এখন দশলক্ষ খ্রীস্টান বাস করেন।[১] আগে বাস করতেন এর তিনগুণ।

সমত্ব ঃ স্বামীজী বলেছিলেন একটা সময় তিনি সমদৃষ্টি লাভের জন্য খুব সাধন করেছেন এবং প্রায়শই তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন যার অর্থ হলো ঃ 'যিনি সর্বভূতে এবং নশ্বর সবকিছুর মধ্যেই সেই এক এবং অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। সর্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দেখেন বলে তিনি নিজে নিজেকে হিংসা করতে পারেন না। তিনি সেইজন্য পরমগতি প্রাপ্ত হন।'[২] স্বামীজীর লেখা সাম্প্রতিক একটি কবিতার[৩] কয়েকটি চরণ এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। স্বামীজী লিখছেন ঃ

'ভাল মন্দ প্রেম আর ঘৃণা
সুখ তথা দুঃখ যাহা বলি
একে ছাড়ি অন্য নাহি থাকে
যুগ্মভাবে বাঁধা তো সকলি।
দুঃখ ছাড়া সুখস্বপ্ন দেখি;
ভ্রান্তি শুধু! সত্য নাহি হয়,
আসিল না, আসিবে না কভু
আমি ছাড়া কেহ দোষী নয়।'

জীবনের আপাততুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারেও স্বামীজী এই সমদর্শিতার আদর্শকে কিভাবে ধরে থাকতেন তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর মতো অকুতোভয় ও অতি সূক্ষ্ম মনের মানুষের পক্ষে কাজটি যে কত কঠিন ছিল তা আমরা তখুনি বুঝতে না পারলেও পরে বুঝেছি। যখন প্রশ্ন করা হলো, কলকাতার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত এক মিশনারি পরিবারের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তিনি কেন আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও চেষ্টাই করেন নি, স্বামীজী বললেন, 'হাতি দেখলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু তাতে হাতির কি আসে যায়? হাতি কি ওসব ভ্রূক্ষেপ করে?' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মিশনারি পরিবারটি এই বলে হুমকি দিয়েছিলেন—'ডেট্রয়েট গেলে বাছাধনকে আমরা উৎখাত করে ছাড়বো'।

স্বামীজী এমন একজনের সঙ্গে থাকতেন যাঁর খুব তিরিক্ষি মেজাজ। একজন

১ এই সংখ্যা বর্তমানে অনেক বেশি।

২ 'সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।' শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৩।২৯

৩ মূল ইংরেজি কবিতাটি- 'No one to Blame' ১৮৯৫, ১৬ মে, নিউইয়র্কে রচিত। [বাংলায় 'দোষ কারো নয়' (৭ম, পৃঃ ৩১৬)]

প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি ওঁর সঙ্গে থাকেন কেন?' স্বামীজীর উত্তর ঃ 'ওহ্, এই কথা? আমি ওর কাছে ঋণী কারণ ও আমাকে সংযম অভ্যাসের সুযোগ দেয়।'

স্বামীজীর এই উত্তর যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যেনতেন প্রকারেণ আরামে থাকার জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ কী কাণ্ডটাই না করে। অথচ স্বামীজী, যাঁকে আমরা প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেখতাম, অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তাঁর দৈনিক দিনযাপনের মধ্য দিয়ে গীতার সুমহান বাণীগুলি কিভাবে জীবন্ত হয়ে উঠত। শত্রু বা মিত্র, নিন্দুক অথবা স্তুতিকার, উভয়ের ভিতরেই আত্মাকে দেখা এবং মান-অপমানে অবিচল থাকাই ছিল স্বামীজীর নিরন্তর সাধনা।

তাঁর মতো অতি অল্প বয়সে রাতারাতি অথবা, সঠিক বলতে গেলে, কয়েক মিনিটের মধ্যে জগদ্বিখ্যাত হবার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়েছে। কিন্তু শিকাগো ধর্মমহাসভায় ঠিক এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটেছিল। শুধু খ্যাতি বললেও সবটুকু বলা হলো না। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী সকলকে এমন গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যে সেই প্রেরণাই কখনও কখনও স্তুতির উন্মত্ত তরঙ্গ হয়ে তাঁর পদপ্রান্তে আছড়ে পড়তো। কিন্তু সাধারণের এই উন্মাদনা আর তীব্র আবেগের সামনে স্বামীজী এমন নির্লিপ্ত, প্রশান্ত থাকতেন যে তাঁকে দেখে মনে হতো বুঝি-বা তিনি হিমালয়ের কোনও গুহায় একাকী ধ্যানমগ্ন। সংসারের ভোগাকাঙ্ক্ষী মানুষ এই নামযশের ছিটেফোঁটা পাবার জন্য সারাটা জীবন কী সংগ্রামই না করে; কিন্তু স্বামীজীর ওসবে এতটুকু রুচি ছিল না। বলতেন ঃ ওসব হচ্ছে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল। 'নামযশের নোংরা ন্যাকড়া।'

কোনও কোনও দিন তিনি ভাবে এমন চড়ে থাকতেন যে মনে হতো তিনি মানবজাতির ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। এমন একটি মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন ঃ 'পরবর্তী মহা-অভ্যুত্থান ঘটবে হয় রাশিয়ায়, নয়তো চীন দেশে— আমি ঠিক বলতে পারছি না কোন্ দেশে। তবে রাশিয়া বা চীন, এই দুটি দেশের একটিতেই যে সেই যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়বে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' স্বামীজী আজ থেকে বত্রিশ বছর আগে যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তখন চীন মাঞ্চু সম্রাটের অধীনে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে স্বৈরাচারী ঐ শাসনের অবসান ঘটবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। জার-শাসিত রাশিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। সেদেশে তখন সেরা সেরা মানুষদের সাইবেরিয়ার খনিগুলিতে শ্রমিক হিসেবে চালান করা হচ্ছে। তাই, আর যে

কোনও দেশেই ঘটুক না কেন, চীন বা রাশিয়ায় যে কোনও যুগান্তকারী ঘটনা ঘটতে পারে, এ সম্ভাবনা সাধারণ চিন্তাবিদদের অকল্পনীয়ই ছিল।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, সমাজে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের শাসন বা পুরোহিততন্ত্রই প্রচলিত ছিল। তারপরে এল ক্ষত্রিয় শাসন। এখন বৈশ্যদের প্রতাপ চলছে। বাণিজ্যিক স্বার্থই জগৎকে চালাচ্ছে। অর্থনৈতিক চিন্তাই এখন মানুষকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু এই পর্বও সমাপ্তির মুখে। এরপর শূদ্ররা উঠবে, শ্রমজীবিরাই কর্তৃত্ব করবে।

স্বামীজী বলে গেলেন, আমরাও সবিস্ময়ে শুনলাম। কিন্তু তবুও মনে প্রশ্ন থেকে যায়—স্বামীজী কেমন করে বুঝলেন বাণিজ্যিক যুগের ইতি আসন্ন? তার চাইতেও বড় রহস্য, স্বামীজী কি করে অনাগত ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করে বললেন রাশিয়া চীনই এই যুগ-পরিবর্তন আনবে? একটা জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। স্বামীজী, 'আমার মনে হয়', এই বলে সতর্কতার সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করেননি, তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের যে ছবি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাকেই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, পরম প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন।

কিছুক্ষণ পর স্বামীজী বললেন ঃ 'গোটা ইউরোপ একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে। আধ্যাত্মিকতার প্রবল বন্যায় সে আগুন না নেভালে সমগ্র মহাদেশটাই বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।' এ কথা স্বামীজী বলেছিলেন ১৮৯৫-এর শান্ত, সমৃদ্ধ ইউরোপকে দেখে। ঠিক তার কুড়ি বছর পরই ঘটলো সেই মহাবিস্ফোরণ।

মোঘল শাসন

স্বামীজী মোঘলদের খুব প্রশংসা করতেন। ভারতের ইতিহাসের এই পর্বটিকে তিনি এমন নাটকীয়ভাবে তুলে ধরতেন যে মাঝেমাঝে আমাদের মনে হতো স্বামীজী বোধহয় নিজের অতীত জীবনের গল্পই আমাদের শোনাচ্ছেন। এ কথাও আমাদের প্রায় মনে হয়েছে—আচ্ছা, স্বামীজীই কি পূর্বজন্মে প্রতাপশালী সম্রাট আকবর ছিলেন? তা যদি না হবেন তো মোঘল বাদশাদের চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়ের এতসব খুঁটিনাটি কথা তিনি জানলেন কি করে?

স্বামীজী একটা কথা খুব বিশ্বাস করতেন। তা এই—যে জন্মে আমরা

জ্ঞানলাভ করি, তার আগের আগের জন্মে আমাদের সবরকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতে যেমন সবরকমের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অনটনের প্রাচুর্য থাকে, তেমনি থাকে অর্থ, প্রশংসা, খ্যাতি, ক্ষমতা, আনন্দ, কর্তৃত্ব—এক কথায় জগতের যাবতীয় ভোগসুখের বৈচিত্র্যময় অনুভব। উচ্ছ্বসিত আবেগে স্বামীজী বলতেন ঃ আমার নিজের কথাই ধর না কেন, 'লক্ষ লক্ষ বার আমি সম্রাট হয়ে জন্মেছি।'

আরেকটা কথা স্বামীজী প্রায়শ বলতেন। বহু বহু জন্মের চেষ্টাতেও যখন আমরা সাফল্যের চরম শিখরে উঠতে ব্যর্থ হই, তখন আমাদের একটা বিশেষ জন্ম হয় যে জীবনে আমরা সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞী এই ধরনের কিছু একটা হই। যে জন্মে আমরা মোক্ষ লাভ করি তার ঠিক আগের জন্মে এমনটি হয়। ভারতীয়রা বিশ্বাস করে বাদশা হবার আগের জন্মে আকবরের মধ্যে অধ্যাত্ম পিপাসা ছিল। কিন্তু যোগভ্রষ্ট হওয়ায় অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্তির জন্য তাঁকে ফের জন্ম নিতে হয়। মুক্তিলাভের জন্য আকবরকে মাত্র আর একটিবার দেহধারণ করতে হয়েছিল।

স্বামীজী বাদশা, বেগম, মহামাত্য এবং সেনাপ্রধানদের এইসব ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে আঁকতেন যে মনে হতো তাঁরা যেন আমাদের বহুপরিচিত, তাঁরা সব রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। এইভাবেই স্বামীজীর চোখ দিয়ে আমরা ফরঘনা-র (মধ্য এশিয়া) দ্বাদশবর্ষীয় সুলতান বাবরকে দেখেছি। দেখেছি মাতামহীর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁকে বড় হতে, দেখেছি মায়ের সঙ্গে তাঁর কষ্টের জীবন। পরে তাঁকে সমরখন্দ্-এর শাহ্ হতেও দেখলাম। তখন তাঁর কতই বা বয়স! নতুন রাজ্য পেয়ে তাঁর আনন্দ বুঝি আর ধরে না— যেন একটা মজার খেলনা হাতে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই রাজত্বকালের আয়ু মাত্র একশো দিন। সমরখন্দ্ ছিল বাবরের কাছে স্বপ্নের শহর। সেই প্রিয় রাজ্য হারিয়ে তিনি হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। এবার শুরু হলো তাঁর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং জয়-পরাজয়ের উত্তাল জীবন। তারপর একদিন হঠাৎ দেখলাম বাবর তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যদিও তিনি মূলত বিদেশী হানাদার, তবুও ভারতের সম্রাট হয়ে তিনি এদেশের সাথে একেবারে একাত্ম হয়ে গেলেন এবং রাস্তাঘাট তৈরি, গাছ লাগানো, কুয়ো খোঁড়া ও নগর নির্মাণের কাজে অচিরেই হাত লাগালেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক বাবর স্বদেশের কথা কখনও ভোলেননি। মনটা যেন থেকে থেকেই ঘোড়সওয়ার হয়ে পাহাড়ী পথে

ধুলোর ঝড় তুলে তাঁকে নিয়ে যেত পাহাড়ঘেরা স্বপ্ননগরী সমরখন্দে। সমরখন্দ্-এর মাটিতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। বাবর জনপ্রিয়, রোমান্টিক চরিত্র ছিলেন। তাঁরই হাতে মোঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল।

মৃত্যুর পর বাবরের রাজত্ব হাতবদল হলে পুত্র হুমায়ুন দেশান্তরী হলেন। কয়েকজন অনুগামী পরিবৃত হয়ে প্রাণভয়ে তিনি সিন্ধুদেশের মরুপ্রান্তরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগলেন। এখানেই রাজপুত্র হুমায়ুনের পরিচয় হলো রূপসী হামিদার সঙ্গে। দেখা মাত্রই প্রণয়। হুমায়ুন বিয়ে করলেন হামিদাকে। বিপদতাড়িত দুর্ভাগ্যের জীবনে হুমায়ুনের একমাত্র সঙ্গী হলেন কিশোরী হামিদা। আমরা মানসনেত্রে দেখছি নিজের ঘোড়ায় হামিদাকে বসিয়ে তার পাশে পাশে শান্ত ছায়ার মতো হেঁটে চলেছেন হুমায়ুন।

মরুভূমির বুকেই জন্ম নিল তাঁদের একমাত্র সন্তান—পরবর্তী কালের সম্রাট আকবর। ভাগ্যের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস, সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেও হুমায়ুনের হাতে তখন এমন কিছুই ছিল না যা তাঁর সঙ্গীদের উপহার দিয়ে ঘটনাটিকে তিনি স্মরণীয় করে রাখতে পারেন। থাকার মধ্যে ছিল একটি কস্তুরী। কি আর করেন হুমায়ুন! সেটিই ভেঙ্গে একটু একটু সকলকে দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'খোদার কাছে প্রার্থনা, এই সুগন্ধী মৃগনাভির মতো আমার পুত্রের যশ কীর্তিও যেন দশদিকে ছড়িয়ে পড়ে!'

হুমায়ুন অবশ্য শেষপর্যন্ত তাঁর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন। কিন্তু রাজ্য ভোগ করার সুখ তাঁর কপালে বেশিদিন সইল না। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে দিল্লীর প্রাসাদে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী একমাত্র পুত্র আকবরই এবার দিল্লীর বাদশা হলেন। তখন তাঁর বয়স সবে তেরো পেরিয়েছে। সিংহাসনে আরোহণের দিনটি থেকে তেষট্টি বছর বয়সে দেহত্যাগের মুহূর্ত পর্যন্ত আকবর ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হিসেবে রাজত্ব করে গেছেন। তাঁর মতো এতগুলি গুণের সমন্বয় ভারতের ইতিহাসে খুব কম শাসকের ভিতরেই দেখা গেছে। তাঁর ঔদার্য ও মহানুভবতা উন্নতমনা সেনাপতি বৈরামকেও লজ্জা দিয়েছিল। আকবর তখনও বালক। তাঁর এক শত্রুকে বন্দি করে সামনে নিয়ে আসা হলে সেনাপতি বৈরাম আকবরের হাতে একখানি তরোয়াল তুলে দিয়ে বললেন ঃ আপনার শত্রুকে আপনি স্বহস্তে হত্যা করুন জাঁহাপনা। তরুণ আকবর কিন্তু সেনাপতির সে পরামর্শ শোনেননি। শুধু বলেছিলেন ঃ 'যে শত্রু পরাজয় স্বীকার করে তাকে আমি হত্যা করি না।'

তাঁর সাহস ছিল প্রশ্নাতীত; একবাক্যে সকলেই তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করেছেন। আবার খেলাধূলায়ও তাঁর সমকক্ষ বিশেষ কেউ ছিলেন না। যেমন অব্যর্থ ছিল তাঁর নিশানা, তেমনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী পোলো খেলোয়াড়। অশ্বারোহণেও তিনি সকলের চেয়ে ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। তিনি মাংস খেতেন না। বলতেন : 'পেটকে কবরখানা করে লাভ কি?' ঘুমোতেনও খুব কম। রাতে মাত্র কয়েকঘণ্টা। বেশিরভাগ সময়ই দর্শন ও ধর্মচর্চা করে কাটাতেন। তিনি মুসলমান ছিলেন এ কথা সত্যি, কিন্তু সব ধর্মের আচার্যদের কথাই তিনি শুনতেন। এবং শুধু শোনাই নয়, নানারকম প্রশ্নও করতেন। এমনও হয়েছে রাতের পর রাত তিনি তাঁর কাবাখানায় বসে হিন্দু ব্রাহ্মণের কাছে যোগ শিক্ষা করেছেন। পরবর্তী কালে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান এবং পারসীদের ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে একটি নতুন ধর্মের পরিকল্পনা করেন। সেই ধর্মের নাম দেন 'দিন ইলাহি'।

পদমর্যদায় সম্রাট হলেও আকবর মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন; অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক—মহামন্ত্রী আবুল ফজল। দুই—সভাকবি ফৈজী। তিন—ব্রাহ্মণ বিদূষক বীরবল। চতুর্থজনের নামও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি হচ্ছেন সম্রাট শ্যালক এবং প্রবীণ সেনাপতি মান সিং। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন হিন্দু, আর দুজন মুসলমান।

আকবরের বন্ধুরা শুধু যে সুখের সঙ্গী ছিলেন তা নয়, তাঁরা দরবারেও সম্রাটের পাশে পাশে থাকতেন এবং যুদ্ধের সময়ও তাঁকে অনুসরণ করেছেন। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে যখন আকবরের জীবন বিপন্ন, তখন দেখি এই বন্ধুরা তাঁদের আপন আপন তরবারি কোষমুক্ত করে বাদশাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন।

হিন্দু, মুসলমান সকলেই আকবরের নতুন ধর্মকে স্বাগত জানান। সম্রাটের সব কাজের পিছনেই তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ছিল। সত্যি বলতে কি, এমন জনসমর্থন এবং একসাথে এতোগুলি বিশ্বস্ত বন্ধু অন্য কোনও রাজাবাদশার বরাতে জোটেনি। সাধারণ মানুষের জীবনেই প্রকৃত বন্ধুলাভ এক দুর্লভ ঘটনা। তার ওপর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে যিনি অধিষ্ঠিত, তাঁর ক্ষেত্রে তো এ রকম প্রাপ্তিযোগ অভাবনীয়, প্রায় অশ্রুতপূর্ব ঘটনাই বলা যায়।

কাবুল থেকে দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

তাঁর দক্ষ প্রশাসনের সুবাদেই সেলিম—পরবর্তী কালে সম্রাট জাহাঙ্গীর—এক বিশাল ও সুসংহত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন। 'আকবরের এই বিলাসপ্রিয়' সন্তানের রাজত্বকালে মোঘল দরবারের জাঁকজমক আর জৌলুস এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার কাছে আগের ভোগবিলাস আর শৌখিনতার সব দৃষ্টান্ত ম্লান হয়ে গেছে।

এবার মঞ্চে প্রবেশ করলেন সুশোভনা, মনোরমা নুরজাঁহা। 'নুরজাঁহা' কথাটির অর্থ জগতের আলো। জাহাঙ্গীর-মহিষী নুরজাঁহাই প্রকৃতপক্ষে বিশ বছর স্বামীর রাজত্ব পরিচালনা করেছেন। অসামান্যা এই রমণীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। জাহাঙ্গীরের আমলে মোঘল সাম্রাজ্যের শক্তি, স্থায়িত্ব এবং শ্রীবৃদ্ধির পেছনে এই মহিলার বুদ্ধি ও চাতুর্যের যথেষ্ট অবদান ছিল। সম্ভবত সেই কথা স্মরণ রেখেই জাহাঙ্গীর নুর জাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। সুবর্ণ-নির্মিত সেই মুদ্রার ওপর খোদাই ছিল এই কটি কথা—'নুরজাঁহার ছবি বুকে ধরে সোনা যেন উজ্জ্বলতর হলো।'

নুরজাঁহার ওপর বাদশার এমন অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যে যখন আত্মীয়স্বজন অনুযোগ করে বলত—জাঁহাপনা, আপনি নুরজাঁহার হাতেই সব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন—তখনই জাহাঙ্গীর প্রতিবাদ করে বলতেন ঃ 'কেন দেবো না? ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কি করে করতে হয়, তা ও আমার থেকেও ভাল জানে।' কখনও অসুস্থ হলে জাহাঙ্গীর রাজবৈদ্যের চিকিৎসার চেয়েও নুরজাঁহার চিকিৎসাই বেশি পছন্দ করতেন। একমাত্র নুরজাঁহাই সম্রাটের বদভ্যাসগুলিকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন। দৈনিক তিন পেয়ালার বেশি সুরা সম্রাটকে পান করতে দিতেন না তিনি।

নুরজাঁহা যখন কার্যত প্রশাসনের সর্বেসর্বা তখন মোঘল স্থাপত্যরীতিতেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলো। আকবরের মন-পসন্দ অনাড়ম্বর লাল বেলে পাথরের জায়গায় ঠাঁই করে নিল মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য শ্বেতপাথর। প্রাসাদের রুক্ষ পাথরের দেওয়াল অদৃশ্য হলো। সেখানে ফুটে উঠলো মণি-মঞ্জিলের রোশনাই। মধ্য-এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলের মজবুত ও বলিষ্ঠ স্থাপত্যশৈলীকে বিদায় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো পারস্যের সুচিক্কণ কমনীয়তাকে। 'শিল্প সুষমায়' সমৃদ্ধ এই নতুন বাস্তুকলা থেকেই পরবর্তী কালে জন্ম নিয়েছে তাজমহল, এবং আগ্রা, দিল্লী ও লাহোরের অনুপম প্রাসাদগুলি। যমুনার অপর পারে ইতমাদুদ্দৌলার নয়নমনোহর যে স্মৃতিসৌধটি আজও নীরবে

দাঁড়িয়ে আছে, সেটি নব্য স্থাপত্যশৈলীর প্রথমদিককার নিদর্শন। নুরজাঁহাই উদ্যোগী হয়ে তাঁর পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইতমাদুদ্দৌলা ছিলেন প্রথমে দৌলতখানার অধ্যক্ষ, পরে তিনি জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। শোনা যায় নুরজাঁহার বান্দারাই নাকি স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে সূক্ষ্ম অলঙ্করণের কাজটি করেছিলেন। ইতমাদুদ্দৌলায় যে শিল্প সুষমার প্রাথমিক প্রয়োগ, তার চূড়ান্ত পরিণতি তাজমহল যেখানে মাত্র একটি গোলাপ-পাপড়ির বর্ণাঢ্য আভা ফোটাতে শিল্পীরা চুয়াল্লিশ রকমের লাল পাথর ব্যবহার করেছেন। ইতমাদুদ্দৌলার সঙ্গে তাজমহলের গঠন সৌষ্ঠবের তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় মোঘল আমলে শিল্পকলার কী দ্রুত, বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছিল। আগ্রার প্রাসাদে নিজের মহলটিকেও নুরজাঁহা মনের মতো করে সাজিয়েছিলেন। শিল্পকলায় তাঁর আন্তরিক অনুরাগ সত্যিই মনে রাখার মতো। শোনা যায় তাঁর দান-ধ্যানের হাতও খুব দরাজ ছিল।

বিবেকানন্দ যে মুসলমান সংস্কৃতিকে এতো বুঝতেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ কোনও ব্যক্তি বা জাতির মহৎ গুণগুলি, শুধুমাত্র তার ইতিবাচক দিকগুলি, দেখবার এক বিরল ক্ষমতা তাঁর ছিল। ভারতবর্ষ বলতে তিনি কেবল হিন্দুদেরই বুঝতেন না। তাঁর মত ছিল সব নিয়েই ভারতবর্ষ। তিনি কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন ঃ 'আমার মুসলমান ভাই।' বাস্তবিক, ইসলামিক কৃষ্টি, নিজের ধর্মের প্রতি মুসলমানদের নিষ্ঠা, তাঁদের সাহসিকতা ইত্যাদি সদ্গুণের খুব প্রশংসা করতেন স্বামীজী। তাঁদের সঙ্গে এ ব্যাপারে তিনি এতটাই একাত্ম বোধ করতেন যে বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোনও মুসলমানের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব ছিল না—তাঁকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা! সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন এমন একজনের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি, তাঁদের জাহাজ জিব্রালটারে নোঙ্গর করলে মুসলমান লস্কররা স্বামীজীকে দেখামাত্রই 'দীন, দীন' (আরবী এই শব্দের অর্থ 'দুনিয়ার মালিক') বলে রোদন করতে করতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখে স্বামীজী একেবারে অভিভূত!

এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজী আমাদের আরবের সেই তরুণ উটচালকের কথা বলতেন যিনি খ্রীস্টের জন্মের ছশো বছর পর আবির্ভূত হয়ে স্বদেশকে ক্রমিক অবনতি ও অবক্ষয়ের চোরাবালি থেকে টেনে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। রাতের পর রাত তিনি প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন। অবশেষে

মরুভূমির বুকে এক পাহাড়ের ওপর দীর্ঘ উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর তাঁর দিব্য দর্শন হলো। সুতীব্র ঈশ্বরানুরাগ এবং 'আল্লাহ্'-র কাছ থেকে দিব্যবাণী লাভ করে তিনি প্রবুদ্ধদের একজন হলেন, যাঁরা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ বলে সর্বকালে সর্বজনের পূজ্য, তিনি তাঁদেরই একজন বলে গণ্য হলেন। জগতে এই রকম ঈশ্বরকল্প পুরুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই যে কথাটি বিশেষভাবে সত্য তা হলো, 'ওঁর প্রভাব অনন্তকাল ধরে চলবে।'

স্বামীজীর কথা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম, আরবদেশই হোক, প্যালেস্টাইনেই হোক, অথবা ভারতবর্ষই হোক, অবতার পুরুষেরা যখন যেখানেই শরীর ধারণ করুন না কেন, তাঁদের সকলের মুখে একই কথা।

পয়গম্বরের একাকীত্ব স্বামীজী প্রাণ দিয়ে অনুভব করতেন। সাধারণ মানুষ যে এই দিব্যপুরুষকে উন্মাদ মনে করতেন, এ কথা ভাবতে তিনি বড়ই ব্যথা পেতেন। প্রথমদিকে মাত্র কয়েকজনই তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন তাঁর বাণী। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর ধৈর্য, প্রেম ও করুণা দেখে বোঝা গেল কী সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আরবের এই নবীর আবির্ভাব।

আমাদের মধ্যে রক্ষণশীল কেউ স্বামীজীর কথার মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, উনি বহুবিবাহ প্রচার করে গেছেন।' স্বামীজী তার উত্তরে বললেন ঃ মহম্মদের আবির্ভাবের সময় আরব দুনিয়ায় এক জঘন্য ধরনের বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। সেই ভয়ানক অবস্থার অবসানকল্পেই মহম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন একই সঙ্গে কেউই চারটির বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না।

স্বামীজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে আরেকজন মন্তব্য করলেন, তা না হয় হলো, কিন্তু 'উনি যে বলতেন মেয়েদের হৃদয় বলে কোনও বস্তু নেই'—তার কি উত্তর? স্বামীজী তখন সবিস্তারে বলতে লাগলেন ইসলাম নারীজাতিকে কোন্ চোখে দেখে। আমেরিকান ভক্তরা যখন শুনলেন মুসলমান মেয়েরা এমন কিছু কিছু স্বাধীনতা ভোগ করেন যা তথাকথিত স্বাধীন আমেরিকান মেয়েদেরও নেই, তখন তাঁরা বেশ মুষড়ে পড়লেন।

সাধারণ এই প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষ হলে স্বামীজী আমাদের মনটাকে ফের এক ঊর্ধ্বতম চেতনার রাজ্যে তুলে দিলেন। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, হজরত মহম্মদকে আপাতদৃষ্টিতে যতই সঙ্কীর্ণ এবং অবিবেচক মনে হোক না কেন, এ

কথা অনস্বীকার্য যে তিনি এক বিরাট পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর শক্তিতে তিনি জগতকে এক বিপুল নাড়া দিয়ে গেছেন। সেই শক্তি এখনও কাজ করে চলেছে।

হজরত মহম্মদ কি ইচ্ছে করেই এক নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন? তার উত্তরে স্বামীজী বললেন—মনে হয় না তিনি আটঘাট বেঁধে তাঁর ধর্মান্দোলন শুরু করেছিলেন। বরং এ কথাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় প্রথমটায় তিনি চূড়ান্ত, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির আনন্দেই বিভোর ছিলেন; কিন্তু ক্রমে সেই অমূল্য জ্ঞান বা যে পরম বস্তুর সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার এক অদম্য ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসে।

মহম্মদের জীবদ্দশায় ইসলাম ধর্মের যে পরিণতি তা কি পয়গম্বরের অভিপ্রেত ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ এটা নিশ্চিত নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে সংঘর্ষের সূত্রপাত তার পরিকল্পনা আর যেই করে থাকুন, মহম্মদ করেননি। কিন্তু একটা প্রবল শক্তি যখন ছাড়া পায় তখন কোনও মানুষই তার গতি রোধ করতে পারে না। ইসলামের ক্ষেত্রেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসলমান সৈন্যরা এশিয়া ভূখণ্ডের সর্বত্র অপ্রতিহত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইউরোপের দিকেও লোভের হাত বাড়ায়। তারা স্পেন দখল করে সেদেশে বড় বড় বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিতরা সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে জ্ঞানচর্চায় নিজেদের নিযুক্ত করলেন। ভারতীয় দর্শন ও প্রাচ্যের লোকতত্ত্বও সেখানে পড়ানো হতো। তাঁদের এই সাংস্কৃতিক চর্চা ওদেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুরুচি, সহবৎ ও সৌন্দর্যবোধ এনে দিয়েছিল। যখন তাঁরা ঐ দেশ ছেড়ে গেলেন তখন ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সাক্ষিস্বরূপ পিছনে রেখে গেলেন অতুলনীয় সব স্থাপত্য নিদর্শন এবং জ্ঞানতৃষ্ণার ঐতিহ্য। প্রাচ্যের কৃষ্টি এবং প্রজ্ঞাও সেই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শিষ্যমণ্ডলীর শিক্ষা

স্বামীজীর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল একেবারেই অভিনব। আধার বুঝে তিনি শিক্ষা দিতেন। সকলকে এক ছাঁচে ঢালা—এ তাঁর রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি, যতক্ষণ কেউ মুখ ফুটে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় না জানিয়েছে এবং যতক্ষণ স্বামীজী নিজে তার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েছেন, ততক্ষণ তিনি কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামাননি—উপদেশ দেওয়া তো দূরের কথা! কাউকে কাউকে তিনি চূড়ান্ত

স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সেই স্বাধীনতা পাওয়ার ফলেই তাঁরা স্বামীজীর কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়েছিলেন। আমাদের অপরিচিত এমন কারও সম্বন্ধে কখনও কিছু বলতে হলে স্বামীজী খুব সতর্ক হতেন এবং বুঝিয়ে দিতেন 'অমুক আমার শিষ্য বা শিষ্যা নন। বন্ধু মাত্র।' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইতেন বন্ধু আর শিষ্য এক জিনিস নয়। শিষ্যের সাথে গুরুর আলাদা সম্পর্ক। বন্ধুর অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি, গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে, হয়তো সে গড্ডালিকায় গা ভাসাচ্ছে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই। স্বামীজী এ ব্যাপারে এতটাই সচেতন ছিলেন যে অযাচিতভাবে নিজের কোনও মতামত দ্বারা কারও ব্যক্তিগত জীবনকে সামান্য প্রভাবিত করাকেও তিনি অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতেন। মনে করতেন এটা অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক-গলানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু একবার কেউ স্বামীজীকে গুরুপদে বরণ করলে তখন আবার স্বামীজীর অন্য রূপ। শিষ্যের ভালোমন্দের সব দায়িত্ব নিয়েছেন কি না! তখন তিনি ইচ্ছে করেই তার দুর্বলতা, কুসংস্কার এবং মূল্যবোধের অসঙ্গতিগুলোকে নির্মমভাবে আঘাত করতেন। যদি অপরিণত বোধের উচ্ছ্বাসে জগতটাকে কেউ খুব সুন্দর বলত এবং মনে করত জগতের সবকিছুই ভালো, মন্দ বলে সেখানে কিছু নেই, অমনি স্বামীজী যুক্তিজাল বিস্তার করে তৎক্ষণাৎ তার সেই মোহ ছিন্নভিন্ন করে দিতেন। বলতেন—ভালোর যদি অস্তিত্ব থাকে তো মন্দেরও আছে। ভালো আর মন্দ, একই সত্যের দুটি দিক মাত্র। দুটি-ই মায়ার অন্তর্ভুক্ত। স্বামীজী বলতেন—'বালির ঢিবিতে মুখ গুঁজে বোলো না ঃ সবই ভালো, খারাপ বলে কিছুই নেই। ভালোকে যদি পুজো করতে হয়, তবে ভয়ঙ্করকেও কর। অবশেষে দুয়ের পারে চলে গিয়ে বল, ''ঈশ্বরই একমাত্র সত্য''।'

বাস্তবিক, আমরা যখন দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই, তখনও কি আমরা সাহসে বুক বেঁধে বলতে পারি—হ্যাঁ, জীবনটা, এই জগতটা, সত্যিই সুন্দর? ঠিক এই মুহূর্তেই অগণিত মানুষ কি বিপদগ্রস্ত নয়? জগতটা কি দুঃখে পরিপূর্ণ নয়? হাজার হাজার মানুষের জীবন কি দুর্ভাগ্যের করাল ছায়ায় ব্যথাতুর হয়ে উঠছে না? জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু এই পৃথিবীর প্রতিটি জীবকে কি কুরে কুরে খাচ্ছে না? এই ব্যথা, বেদনা, শোক, তাপ ও মর্মভেদী হাহাকার শুনেও যে বলে, 'জগতটা কি সুন্দর', হয় সে মূঢ় নয়তো সে আত্মসুখী স্বার্থপর—অন্যের দুঃখকষ্টে তার কিছুই এসে যায় না!

এইভাবে রুক্ষ, কঠিন বাস্তবের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এই সুখ-দুঃখের দ্বৈত সত্তার পারে যে এক অপরিবর্তনীয় সত্য বিরাজমান, তার আভাসও স্বামীজী শীঘ্রই আমাদের দিলেন। আমরা জানলাম অমৃতত্বলাভ মানে জন্ম-মৃত্যুর পারে যাওয়া, জানলাম জীব হচ্ছে আনন্দস্বরূপ এবং সুখ-দুঃখ দুয়েরই ঊর্ধ্বে সেই আনন্দের অবস্থান। এও জানলাম সতত-পরিবর্তনশীল এই জীবনের অজস্র ভাঙ্গা-গড়ার ঊর্ধ্বে সেই নিত্য, শাশ্বত সত্যের স্থিতি। মানুষের আত্মা চিরপ্রশান্ত, আপন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

এইসব অত্যুচ্চ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা যেন 'এক নতুন স্বর্গ, এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেলাম।' পাবারই কথা। কারণ 'যিনি সঠিক বুঝেছেন আত্মাই সবকিছু হয়েছেন, আত্মার একত্ব যিনি উপলব্ধি করেছেন, তাঁর আবার সুখই-বা কি, দুঃখই-বা কি?' স্বামীজী মুখে কখনও বলেননি ঃ 'তোমরা সৎ হও, সত্যকে ধরে থাক, অনন্যমনা হও।' কিন্তু তিনি আমাদের সকলের ভিতর ঐ সদ্‌গুণাবলী অর্জন করার একটা প্রবলতম আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। কেমন করে? বলা শক্ত। তবে এর কারণ কি এই নয়, তাঁর মধ্যে ঐ সততা, সত্যনিষ্ঠা, একনিষ্ঠতা ও সারল্য দেখেই আমরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম?

যেদিন স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'এই দুনিয়াটা একটা এঁদো ডোবা'— সেদিন অনেকেই হয়তো তাঁর কথায় আহত হয়েছিলেন, অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন; কেউ কেউ হয়তো তার কথা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু বহু বছর পর, রবিবারের এক প্রসন্ন সকালে কলকাতার দমদম রোড দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য! দেখলাম কয়েকটা মোষ কাদাগোলা জলে মহা আনন্দে চড়ে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা এই দৃশ্য দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠলো। ভাবলাম এই নোংরা কর্দমাক্ত জল ছেড়ে মোষগুলো তো অন্য কোনও সুন্দর জিনিস নিয়েও আনন্দ করতে পারতো! তা না করে এই দুর্গন্ধেভরা পাঁকের মধ্যে লুটোপাটি করছে! তারপরই মনে হলো—মোষগুলো এখন কাঁদা ঘেঁটেই দৈহিক সুখ পাচ্ছে, তাই ও রকম করছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ঃ 'এই দুনিয়াটা একটা এঁদো ডোবা।' সত্যি কথা। বিচার করে দেখলে আমাদের অবস্থাও এই মোষগুলোর চেয়ে কিছুমাত্র ভালো নয়। অমৃতের সন্তান হয়েও আমরা সংসারের পাঁক ঘেঁটে বড়ই আনন্দ পাই।

স্বামীজী চাইতেন আমরাই আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে বার করি। তিনি কেবল আদর্শটি আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে

কেউ সাহায্য চাইলে তিনি বলতেন—না। শিষ্যশিষ্যারা সব ব্যাপারে তাঁর ওপর নির্ভর করবে এটা তিনি কখনোই বরদাস্ত করতেন না। এ রকম পরনির্ভরতার মনোভাবের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। 'স্বনির্ভর হও। তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি রয়েছে'—এই ছিল তাঁর ভাব। আমাদের চলার পথকে যেনতেন প্রকারেণ সহজ করে দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমাদের ভিতরকার সুপ্ত শক্তিকে কিভাবে জাগাতে হয়, কিভাবে তার বিকাশ ঘটাতে হয়, সেই শিক্ষাই তিনি আমাদের দিয়েছেন। স্বামীজী গর্জে উঠে বলতেন ঃ 'শক্তি! শক্তি! শক্তি ছাড়া আমি অন্য কিছু প্রচার করি না। আর সেইজন্য আমি এত উপনিষদের কথা বলি।'

পুরুষদের মধ্যে যেমন পুরুষকার দেখতে চাইতেন স্বামীজী, তেমনি নারীদের মধ্যেও তিনি এমন কতকগুলি গুণের প্রকাশ দেখতে চাইতেন যা ভাষায় বোঝানো যায় না। স্বামীজী যে মেয়েদের সবল, স্বনির্ভর দেখতে চাইতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মেয়েরা নিজেদের ছোট্ ভেবে অপরের দয়ায় বেঁচে থাকবে, এ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। স্বামীজী তাঁর মনোভাব এমন দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করতেন যা আমাদের কাছে টনিকের কাজ করতো। দীর্ঘকালের প্রসুপ্ত শক্তি যেন ফণা তুলে দাঁড়াতো। আমাদের মধ্যে এই প্রত্যয় জেগে উঠতো—আমরাও শক্তিমান, আমরাও মুক্ত।

এক একজন শিষ্যকে তিনি এক একভাবে শিক্ষা দিতেন। কাউকে হয়তো নিরন্তর দাবড়ানি দিয়ে কঠোরতম সংযমের পথে পরিচালিত করেছেন। আহারবিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমনকি কথাবার্তার ওপরেও নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা, আবার কারও কারও ওপর তেমন কোন বাধা নিষেধ ছিল না। ত্যাগ ও সংযমের কথাও তাদের বেশি বলতেন না। এক এক সময় ভাবি, তার কারণ কি এই—স্বামীজী এইভাবেই তাদের ধার্মিকতার বড়াই ভাঙ্গতে চাইতেন? কারণ ভালোর বন্ধনও তো একটা বন্ধন! একজনের প্রতি হয়তো সস্নেহ বিদ্রুপ, আবার আরেকজনের প্রতি হয়তো আপাত কঠোর মনোভাব—এই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি। আমরা লক্ষ্য করতাম, যাঁরাই নতমস্তকে স্বামীজীর নির্দেশ মেনে চলতেন তাঁদের জীবনেই একটা আমূল পরিবর্তন আসতো।

স্বামীজী আমাদেরও রেহাই দিতেন না। আমাদের সযত্নলালিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি পরম মাধুর্যের সঙ্গে তিনি দূর করে দিতেন। এইভাবেই আমাদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। কিভাবে চিন্তা করতে

হয়—তিনিই আমাদের শিখিয়েছিলেন। কিভাবে নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা মিথ্যাকে বর্জন করে যে কোনও মূল্যেই নির্ভীকভাবে সত্যকে আঁকড়ে থাকতে হয়, তাও তিনি আমাদের শিখিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশানুযায়ী চলার ফলে বহু জিনিস, যা আগে মূল্যবান মনে হতো, তারা তাদের লাবণ্য ও দীপ্তি হারিয়ে জীবন থেকে চির-নির্বাসিত হলো। এতকাল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ছিলাম আমরা। মনগুলিও ছিল বহুমুখী। কালে সেই ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত মনকে কিভাবে গুটিয়ে এনে ঊর্ধ্বমুখী করতে হয়, অজস্র উদ্দেশ্যগুলিকে সংহত করে একমাত্র যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বারবার এই সংসারে আসা, সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখী করতে হয়, তাও আমরা শিখলাম। জানলাম পরম সত্যের নিলয় আমাদের এই হৃদয়-মন্দির। সেখানেই তাঁকে খুঁজতে হবে। সত্যের সন্ধানে মরুপ্রান্তর বা শৈলচূড়ায় গিয়ে কোনও লাভ নেই। এই পথ অবলম্বন করলেই আত্মবিকাশ দ্রুততর হয় এবং চরিত্রের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে।

তাহলেই ভেবে দেখুন, স্বামীজীর মতো এই অসাধারণ শক্তির সান্নিধ্যে এসে প্রথমটায় আমরা যে একেবারেই কুঁকড়ে যাব, এতে আর আশ্চর্য কি? আর এই সংকট যে কেবলমাত্র আমাদেরই হয়েছিল তা নয়। অন্যান্য অনেকেরও সেই একই অবস্থা। বেশ কিছুকাল পর একজন বিশিষ্ট আমেরিকান মহিলা, স্বামীজী ও তাঁর যেসব গুরুভাই আমেরিকায় এসেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'স্বামী ...কেই আমার বেশি পছন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের চাইতেও।' যিনি শ্রোতা, তিনি তো অবাক। তাঁর দুচোখে বিস্ময় দেখে সেই ভদ্রমহিলা তখন বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি জানি স্বামী বিবেকানন্দ ঢের ঢের বড়, কিন্তু ওঁর এতো শক্তি যে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি।' পরবর্তী কালে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনি এক সুপরিচিত প্রচারকের কাছে। তিনি যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রচার দেখে মনে হয়েছিল তাঁরা বেদান্ত-ভাবনার দ্বারা অনুভাবিত। তাই কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি কি কখনও স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন? তার উত্তরে সেই প্রচারক বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাঁর বক্তৃতাও আমি শুনেছি। কিন্তু তাঁর এতো শক্তি যে আমি বিহ্বল হয়ে পড়তাম। বরং স্বামী ...কে আমার অনেক বেশি কাছের মানুষ বলে মনে হতো।' এই বলে তিনি উত্তর ভারতের এক বেদান্ত প্রচারকের নাম উল্লেখ করলেন যিনি কিছুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ছিলেন।

এই মনোভাবের ব্যাখ্যা কি এই, যে কতকগুলি গুণ এবং ব্যক্তিত্ব আমাদের স্বাভাবিকভাবে কাছে টানে এবং কতকগুলি দূরে ঠেলে দেয়? কিন্তু তা যদি সত্য হয়, তাহলে নিশ্চয় তার একটা কারণও আছে। কি সেই কারণ? সেটা কি নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব বিনাশের আশঙ্কা? বাইবেলে আছে ঃ 'যে নিজের প্রাণ দেয়, সে অবশ্যই প্রাণ ফিরে পায়।' সে যাই হোক, বিবেকানন্দের শক্তিমত্তায় ভীত হয়ে দূরে সরে গেছেন এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। অন্যদিকে, লোহা যেমন চুম্বকের পিছনে ধেয়ে যায়, সেই শক্তির দুর্বার আকর্ষণেও ঠিক তেমনি হাজার হাজার মানুষ তাঁর কাছে ছুটে গেছেন। তাঁর এমনই আকর্ষণী শক্তি ছিল, নারী, পুরুষ, এমনকি শিশুরাও যে একবার তাঁর কাছে গেছে, সেই চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়ে গেছে।

ভদ্রতার মুখোশ পরে বা কোনও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তিনি আমাদের মন জয় করার চেষ্টা করেননি। ধর্মজগতের আচার্য বা গুরু হিসেবে তাঁর যেভাবে চলা উচিত বলে আমরা মনে করতাম, সেসব মনগড়া ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে বাঁধবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করেন নি। বরং যে সমস্ত ব্যাপারে আমরা মাত্রাতিরিক্ত স্পর্শকাতর ছিলাম সেগুলিকে তিনি আমলই দিতেন না। সেগুলিকে যেন তিনি ইচ্ছে করেই আঘাত করতেন যাতে আমরা একটা নাড়া খাই। অন্য ধর্মগুরুরা হয়তো বা তাঁদের দোষত্রুটিগুলো লুকোবার চেষ্টা করেন। হয়তো তাঁদের কেউ কেউ লুকিয়ে তামাক বা মাংস খান। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে তামাক খাওয়া বা মাংস খাওয়া কোনও দোষের নয়। কিন্তু যদি এসব দেখে কারও মনে কষ্ট হয় তো ব্যবহারিক সুবিধার জন্য তাদের চোখের আড়ালেই এসব জিনিস খাওয়া ভালো। কিন্তু স্বামীজীর ধাত সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি বলতেন ঃ 'আমি যদি ভুল করি, কখনোই তা লুকোবার চেষ্টা করবো না, বরং ছাদ থেকে হাঁক মেরে সকলকে বলবো—আমি এই ভুল করেছি।'

একথা অস্বীকার করবো না, আমরা মেয়েরা তখন রক্ষণশীল ছিলাম, একটা গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতাম। সামাজিক আচরণে সৌজন্যের সামান্য অভাবটুকুও আমাদের পীড়া দিত। অবশ্য বোহেমিয়ানদের কথা আলাদা। কিন্তু স্বামীজী ওসব মেকি সৌজন্যের ধার ধারতেন না। তখনকার দিনে মেয়েদের উপস্থিতিতে ছেলেরা কেউ ধূমপান করতেন না। আর স্বামীজী কি করতেন, শুনবেন? ইচ্ছে করে দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের সামনে এসে এমন ভক্ করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তেন যে নাকে মুখে সে ধোঁয়া ঢুকে যেত। স্বামীজী না হয়ে

অন্য কেউ হলে নির্ঘাৎ মুখ ঘুরিয়ে চলে আসতাম, জীবনে আর তাঁর সাথে কথাই বলতাম না। তা সত্ত্বেও বলবো প্রথম দিন স্বামীজীর ঐ কাণ্ড দেখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কি উদ্দেশ্যে স্বামীজীর কাছে এসেছি। মনে পড়ে গেল এমন একজন মহাপুরুষের কাছে আমি এসেছি যাঁর মতো ধার্মিক আমি আর দুটি দেখিনি। এমন মানুষ যে হয় তা আমি কখনও কল্পনাও করিনি। তাঁর মুখ থেকে এমন মহাসত্য আমি শুনেছি যা আগে কখনও শুনিনি বা ভাবিনি। তিনি জানেন কিভাবে সত্য লাভ করতে হয়; আমাকেও নিশ্চয় তিনি সেই পথ দেখিয়ে দেবেন। মনে মনে বিচার করলুম—একটু তামাকের ধোঁয়ার জন্যে কি আমাকে নিরাশ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে? সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে উত্তরও পেলাম—না, কখনও না। আর যেই না এই কথা ভাবা, তামাক সম্পর্কে বিরক্তি, সেইজন্য খুঁতখুতেভাব নিমেষে উধাও! ঘটনাটা বলতে যতটুকু সময় লাগলো তার চেয়েও কম সময়ে। সেইসঙ্গে আর একটা ব্যাপারেরও নিষ্পত্তি হলো। কিন্তু সে কথা এখন নয়, পরে বলা যাবে।

তারপর আমরা দেখলাম যে, মানুষটিকে আমরা এতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, তিনি আমাদের সমাজের আদবকায়দা প্রায় কিছুই জানেন না। আমরা জানতাম যে-মানুষ যত সভ্যভব্য স্ত্রীজাতিকে তিনি তত বেশি সম্মান করেন। কিন্তু ইনি এমন একজন মানুষ যিনি মেয়েদের প্রতি কোনও নজরই দেন না, এমনকি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমরা যে সহানুভূতিসূচক ব্যবহার পাই, স্বামীজীর কাছ থেকে সেটুকু আশা করাও বৃথা। যখন আমরা পাথুরে উঁচুনিচু পথ বেয়ে টিলায় উঠতাম বা নামতাম, তিনি ভুলেও আমাদের দিকে তাঁর হাতটি বাড়িয়ে দিতেন না। মুখে কিছু না বললেও আমাদের প্রতি তাঁর এই উদাসীনতায় খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মনের ভাব কি তাঁর অজানা? একদিন তিনি বলে উঠলেন ঃ 'তোমরা বৃদ্ধা, দুর্বল বা অসহায় হলে নিশ্চয় তোমাদের সাহায্য করতুম। কিন্তু তোমরা অন্যের সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে এই ছোট জলধারাটি ডিঙ্গিয়ে যেতে পারো বা সামান্য চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠতে পারো। তোমরা আমারই মতো শক্ত-সমর্থ। তোমাদের সাহায্য করতে যাবো কোন দুঃখে? মহিলা বলে? ওটা হলো "শিভাল্‌রি" (দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সাহায্য-সমবেদনা বা নারী জাতির প্রতি বীরোচিত আনুগত্য)। তোমরা কি বুঝতে পার না, এই অনুকম্পার পেছনে নারী-পুরুষের স্থূল আকর্ষণের খেলাটি রয়ে গেছে?'

প্রথমটায় অদ্ভুত লাগলেও কথাগুলি শুনে বুঝলাম নারীজাতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা কাকে বলে! আমাদের সামনে যেন চিন্তার এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল। অথচ ভাবলে অবাক লাগে, এই স্বামীজীই যখন রামকৃষ্ণজায়া ও শিষ্যা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতেন, বারবার গায়ে এবং মাথায় গঙ্গার জল ছিটাতে ছিটাতে যেতেন যাতে দেহ-মন পবিত্র থাকে। একমাত্র এই পবিত্রতা-স্বরূপিণীর কাছেই স্বামীজী তাঁর মনের সব কথা খুলে বলতেন। শ্রীশ্রীমার অনুমতি ও আশীর্বাদ পেয়ে তবেই তিনি পাশ্চাত্যে গেছেন। যখনই তাঁর দর্শন পেয়েছেন, তখনই স্বামীজী তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছেন। কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ ঈশ্বরকে কি তিনি 'মা' বলে পুজো করেননি? সকল নারীকেই কি তিনি জগন্মাতার এক-একটি রূপ মনে করতেন না? অবশ্যই করতেন। এমনকি আপন দেবত্ব-বিস্মৃত রূপোপজীবিনীদেরও তিনি ঐ একই দৃষ্টিতে দেখেছেন...খেতড়ির রাজপ্রাসাদে এক বাঈজীর মধ্যেও কি তিনি তাঁর উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেননি? স্বামীজী কী শুদ্ধ, পবিত্র দৃষ্টিতে তাকে দেখেছেন সে কথা উপলব্ধি করেই সে তার জীবিকা ছেড়ে দেয় এবং নির্মল জীবন যাপন করতে থাকে। পরবর্তী কালে তার উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও হয়। দেশের মানুষ সমালোচনা করবে জেনেও খোদ আমেরিকায় বসে তিনি এক মহিলাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা দেন, কারণ তিনি তাঁর মধ্যে লিঙ্গহীন আত্মা ছাড়া আর অন্য কিছু দেখেননি।

ভিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজী বরাবর তাঁর স্বভাবসুলভ রাজকীয়তা বজায় রেখে চলতেন। অন্যের দোষ-ত্রুটির প্রতি তিনি অত্যন্ত উদার ও উদাসীন ছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু সেই উদারতার অপব্যবহার তিনি করেননি। বলা নিষ্প্রয়োজন, তবুও বলছি—লোক দেখানোর জন্য তিনি কখনও কিছু করতেন না। যখন বিত্তবানদের অতিথি তখন স্বেচ্ছায় তাঁরা যা দিয়েছেন, প্রসন্নচিত্তে, এমনকি কখনও কখনও সাগ্রহে তিনি সেই দান গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যাঁদের অবস্থা ততটা স্বচ্ছল ছিল না, তাঁরা কিছু দিতে চাইলেও তিনি কিছুতেই তা গ্রহণ করতেন না। যে সময়ের কথা বলছি তখন আর তিনি ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসী নন। তখন তাঁর পরিবেশ, পরিস্থিতি এতটাই বদলে গেছে যে একজন কৌতূহলবশত প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 'আচ্ছা, স্বামীজী কি পূর্বে মোঘল বাদশা-টাদশা কিছু ছিলেন?' বোকার মতো প্রশ্ন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি কি মোঘল বাদশাদের চেয়েও বড় ছিলেন না? সব মোঘল বাদশাদের এক করলে যা দাঁড়াবে তার চাইতেও তিনি ঢের, ঢের বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর মধ্যে

রাজকীয়তা ছিল বললে কমই বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে গগনচুম্বী চরিত্রের দীপ্তিতে তিনি ছিলেন জ্যোতির্ময় যাঁর কাছে সকলের মাথা আপনিই নুয়ে আসতো। তাই নয় কি?

যারা দরিদ্র ও পীড়িত, দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের আঘাতে যারা জীর্ণ দীর্ণ, তাদের প্রতি স্বামীজীর একটা সহজাত ভালোবাসা ছিল। এ কথা কাউকে বলে দিতে হতো না। তাঁকে দেখলে যে কেউ বুঝতেন, যদি কারও ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবারণ হয় তবে তিনি তাঁর দেহের রক্তমাংস পর্যন্ত হাসিমুখে তুলে দিতে প্রস্তুত। আজও তাঁর জন্মদিনে দরিদ্রনারায়ণদের পেট ভরে খাওয়ানো হয়। এই বিশেষ দিনে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের যুবকরা অধঃপতিত ও তথাকথিত নীচুজাতের মানুষকে অন্নাদি পরিবেশন করেন। পশ্চিমের মানুষকে এর তাৎপর্য বোঝানো অসম্ভব। মানুষ—তার আবার জাত, বেজাত! ওহ্, বিবেকানন্দ ছাড়া এই সুকঠিন সমস্যার এমন সহজ ও বলিষ্ঠ সমাধান আর কে করতে পারতেন! উচ্চবর্ণ ও অনুন্নত সম্প্রদায় নিয়ে যুক্তিতর্কের কোনও চুলচেরা বিচার নয়, শুধু একটুখানি ভালবাসা আর আন্তরিকতা!

যখন আমেরিকায় ছিলেন ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়েও অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ের এই ভালবাসা ফুটে বেরুত। তাই একদিন—আপনি ফরাসী ভাষা শিখছেন কেন?—এই প্রশ্ন করা হলে স্বামীজী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিলেন ঃ 'এম. এল.-কে উপোসের হাত থেকে বাঁচাবার এই একটাই পথ।' আরেকবার আরেকজনের হাতে একটা দশ ডলারের নোট গুঁজে দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'এটা এস. কে দিও—বোলো না আমি দিয়েছি।' আবার যখন আমাদেরই পরিচিত একজনের বিরুদ্ধে বেদান্ত সোসাইটির টাকাপয়সা নিয়ে গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠলো, তখনও স্বামীজী তাঁর দুর্বল ভ্রাতৃপ্রতিম ব্যক্তিটিকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা ভেবনা। 'টাকাপয়সা যা ঘাটতি পড়ে আমিই মিটিয়ে দেবো।' তখন ঐভাবেই ব্যাপারটা মিটে যায়। পরে অবশ্য স্বামীজী আমাদের কাছে বলেছিলেন ঃ 'জানি না কোত্থেকে টাকা আসবে; কিন্তু তবুও গরিব মানুষটি ঝঞ্ঝাটে পড়ুন—এ আমি চাই না।'

আমেরিকা থেকে চলে আসার পরও স্বামীজী কিন্তু তাঁর আশ্রিত ও অনুরাগীদের কথা ভোলেন নি। বরং যারা জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তাদের কথা খুব বেশি ভেবেছেন। বিশেষ করে চিন্তা করতেন সেইসব 'মহিলাদের' কথা 'যাঁদের ঘাড়ে পুরুষের দায়িত্ব।'

একবার স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আচ্ছা স্বামীজী, ঐ যে ভদ্রমহিলা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে আপনার নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেকে ধর্মগুরু বলে জাহির করছেন এবং চেলা জোগাড় করার চেষ্টায় আছেন—এর পিছনে কি আপনার কোনও সমর্থন আছে? সব শুনে স্বামীজী বললেন ঃ 'ছি, ছি! ওর তো স্বামী আছে। স্বামীর কাছ থেকেই তো ও মাসে মাসে কিছু টাকা পেতে পারে।'

স্বামীজীর এই কথা শুনে একজন বললেন ঃ 'কিন্তু, স্বামীজী, উনি বলে বেড়াচ্ছেন আপনিই নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। উনি দাবি করছেন ওঁর প্রথম দুটি ক্লাস করলে তবেই আমরা আপনার শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হব। কথাটা এতো অবিশ্বাস্য লেগেছে কি বলবো! নিশ্চয় এর পেছনে কোনও মতলব আছে। ভদ্রমহিলা তাঁর প্রথম ক্লাসে কিছু ব্যায়াম শেখান, আর দ্বিতীয় ক্লাসে বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করা গুহ্যবিদ্যা সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি মুখে মুখে বলে যান। এইভাবে লোক ঠকানোর সুযোগ কি ওঁকে দেওয়া উচিত? লোকের কাছে এইসব ছাইভস্ম বলে টাকা নেওয়া এবং সর্বোপরি আপনার নাম ভাঁড়ানো এইসব কি চলতে দেওয়া উচিত? আপনি কি বলেন?' সব শুনে স্বামীজী, শুধু দুটি শব্দ উচ্চারণ করলেন, 'শিব! শিব!' ব্যস, তারপরই ঐ প্রসঙ্গ একেবারে ভুলে গেলেন। স্বামীজীকে কেউ একবার প্রশ্ন করেছিলেন ঃ স্বামীজী, আপনি যে মাঝে মাঝে 'শিব! শিব!' বলেন, তার মানে কি? প্রশ্নটি শোনামাত্রই স্বামীজীর চোখে দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল। মুখে বললেন, ওঃ, এই কথা? ওর মানে হলো 'উফ্, উফ্! আমার খুব কাঁপুনি লেগেছে, এক বোতল রাম এনে দাও।'

স্বামীজীর এই কথাকে শুধুমাত্র লঘু পরিহাস মনে করলে ভুল করা হবে। আর, তাছাড়া, এ রকম একটা আচমকা প্রশ্নের কী-ই বা উত্তর তিনি দিতে পারতেন? তবে আমরা লক্ষ্য করেছি যখনই কোনও ব্যাপারে তিনি বিব্রত হতেন, কয়েক মুহূর্ত ঐ নিয়ে চিন্তা ভাবনার পর তিনি 'শিব' 'শিব' বলে ব্যাপারটার ঐখানেই ইতি টেনে দিতেন। আমরা বুঝতাম স্বামীজী নিজেকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। স্বরূপ চিন্তার ফলে সব অশান্তিই নিমেষে জল হয়ে যেত।

নিউইয়র্ক থাকতে স্বামীজী একবার একদল দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়েন। তাঁরা স্বামীজীর চারপাশে আঠার মতো লেগে থাকত। পথে হাঁটতে বেরিয়ে

প্রথমে একজনের সঙ্গে আলাপ। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বেড়ানো শেষ হলে স্বামীজী যখন ফিফটিএইটথ্ (৫৮) স্ট্রীটে বেদান্ত সোসাইটির বাড়িতে ফিরতেন তখনও বেয়াড়া লোকগুলো স্বামীজীর সঙ্গ ছাড়ত না। একদিন এই রকম তিনি ফিরছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক অনুরাগী ভক্তও আছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, 'এই ধরনের অদ্ভুত, অপ্রকৃতিস্থ লোকগুলোকে স্বামীজী কেন যে আকর্ষণ করেন, কে জানে?' স্বামীজী তাঁর মনের কথা টের পেয়েছেন। বিদ্যুৎ চমকের মতো চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী উত্তর দিলেন ঃ 'বুঝতে পারছ না? ওরা যে শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ।'

একদিন ফিফথ্ এ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছেন স্বামীজী। তাঁর আগে আগে দুজন বৃদ্ধ চলেছেন। রিক্ত, অসহায়, সহায়সম্বলহীন দুই বৃদ্ধ। তাঁদের দেখে স্বামীজী তাঁর এক সঙ্গীকে বললেন ঃ 'দেখতে পাচ্ছো, সংসার ওঁদের একেবারে ছিবড়ে করে দিয়েছে!' জীবনের কাছে পরাস্ত এই দুঃখী মানুষগুলোর জন্য করুণা আর সমবেদনায় স্বামীজীর কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে উঠলো। অবশ্য করুণা আর সমবেদনা ছাড়াও সেদিন তাঁর কথার সুরে বোধহয় আরও কিছু ছিল, কারণ তাঁর কথা শোনামাত্রই তাঁর সঙ্গীটির ভাবান্তর হলো। পথ চলতে চলতেই সে শপথ নিল—বার্ধক্য, রোগ, শোক, দারিদ্র্য যাই আসুক না কেন, জীবনের কাছে আমি কোনও দিনও হার মানব না। শেষপর্যন্ত হয়েছিলও তাই। স্বামীজীর নীরব আশীর্বাদে তার সেই প্রতিজ্ঞা সার্থক হয়েছিল।

কাজের পরিকল্পনা

স্বামীজীর মাথায় যে দিনরাত একটা বিশেষ কাজের চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে, সে কথাটা প্রথম দিকে আমরা বুঝতে পারিনি। এখন বুঝি চিন্তাটা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। 'কাজ! কাজ! ভারতে কাজ শুরু করবো। কিন্তু কোন্ পথে? কিভাবে?'—থেকে থেকেই ব্যথাভরা কণ্ঠে এই কথাগুলি তিনি উচ্চারণ করতেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মের রূপটি ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল, এ কথা সত্য, কিন্তু আমেরিকায় থাকতেই তাঁর কাজের পদ্ধতি কি হবে এ ব্যাপারে তিনি একটা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন অর্থই প্রকৃত সমাধান নয়। এমনকি সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তাও সব সমস্যার প্রতিকার করতে পারবে না। প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষার,

যে শিক্ষার আলোকে মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপকে, তার দৈবীসত্তাকে চিনে নিতে পারবে। এই জ্ঞান ফুটে উঠলে, বাদবাকি যা কিছু, সব আপনা আপনিই আসবে—সামর্থ্য, শক্তি, পুরুষকার, সব কিছু। তখন সে আবার যথার্থ মানুষের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এই অভ্যুদয়ের বীর্যবান বাণীই তিনি কলম্বো থেকে আলমোড়া সর্বত্র ঘোষণা করেছিলেন।

স্বামীজীর পরিকল্পনাটি ছিল এই রকম। প্রথমে গঙ্গার তীরে তিনি একটা বড়সড় জমি কিনবেন। তারপর সেখানে একটি মন্দির হবে। নিত্যপূজা হবে সেখানে। আর থাকবে একটি মঠ। মঠে গুরুভাইরা থাকবেন। থাকবেন তরুণ সাধু, ব্রহ্মচারীরাও। সেখানে তাঁদের তালিম দেওয়া হবে। ধর্মজীবনের সমস্ত রকম শিক্ষাই তাঁরা সেখানে পাবেন। কেমন করে ধ্যান করতে হয় তাও যেমন তাঁদের শেখানো হবে, তেমনি তাঁরা সেখানে থেকে উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা, সংস্কৃত, এমনকি বিজ্ঞানচর্চাও করবেন। কয়েকবছর এইভাবে শিক্ষালাভের পর মঠের অধ্যক্ষ যখন বুঝবেন তাঁরা বেশ ভালমতো তৈরি হয়েছেন, তখন তাঁরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে নিজেরাই শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলবেন, সকলের মধ্যে ধর্মভাব প্রচার করবেন ও আবার প্রয়োজনমতো দরিদ্র ও পীড়িতের সেবা এবং দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সময় ত্রাণের কাজও করবেন। স্বামীজী আমেরিকায় বসে যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা সেই সময় করেছিলেন তা এমন সুচারুভাবে রূপায়িত হয়েছে যে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়! বর্তমান ভারত তার সাক্ষী।

যে সময় স্বামীজী তাঁর এই বিশাল কর্মসূচীর রূপরেখাটি এঁকেছিলেন, সে সময় তিনি ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী মাত্র। তাই অনেকের হয়তো মনে হয়ে থাকবে এসব নিছক পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু পরে আমরা স্বচক্ষে তাঁর সেই স্বপ্নকে সম্পূর্ণরূপে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখলাম।

আমি যে সময়কার অভিজ্ঞতার কথা লিখছি ঠিক তার আগের গ্রীষ্মে স্বামীজী গ্রীন-একারে ছিলেন। গ্রীন-একার জায়গাটি মেইন-উপকূলে। সেখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ করতেন এবং তাঁদের কথা শোনার আগ্রহে বহু সত্যান্বেষী মানুষ সেখানে সম্মিলিত হতেন। এই গ্রীন-একারেই একটি গাছের তলায় স্বামীজী প্রাচ্যের বাণী ব্যাখ্যা করেছিলেন। সেই গাছটিকে আজও আমেরিকার মানুষ 'স্বামীজীর পাইন গাছ' (The Swami's Pine) বলেই জানে। গ্রীন-একারে থাকাকালীনই স্বামীজী আমেরিকানদের জীবনধারার এক নতুন দিকের সঙ্গে পরিচিত হন। ওখানকার

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দেখে তো তিনি একেবারে মুগ্ধ! ভারী চমৎকার মুক্তস্বভাবের ছেলেমেয়ে সব! অর্থহীন লোকাচারের দাস নয়। প্রাণে অদম্য উৎসাহ অথচ সংযত। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা দেখে তো তিনি চমৎকৃত! স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু অপবিত্রতা নেই। তিনি বলেছিলেন ঃ 'ওদের পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের ভাবটি আমার বেশ মনে ধরেছে।'

বেশ কয়েকদিন স্বামীজীর মন এই চিন্তাতেই ডুবে রইলো। পায়চারি করতেন আর থেকে থেকে দু-একটি কথা বলতেন। তিনি যে কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলতেন—তা নয়। নিজের সাথে নিজেই কথা বলতেন। বস্তুত 'কথা' না বলে ওগুলিকে তাঁর সরব চিন্তা বলাই যুক্তিযুক্ত। সেই আত্মকথন বা শব্দময় চিন্তাগুলি ছিল অনেকটা এই ধরনের ঃ 'আমেরিকার সামাজিক স্বাধীনতা আর বিধিনিষেধে আবদ্ধ ভারতের সমাজব্যবস্থা—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বেশি ভালো? আমেরিকানরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। এটা এক হিসেবে ভালো, কেননা সমাজের সকল স্তরের মানুষ উন্নতির সুযোগ পায়। স্বাধীনতা না থাকলে উন্নতি অসম্ভব! কিন্তু এর বিপদও অনেক। তবু এটা ঠিক, ভুলচুকের মধ্য দিয়েও মানুষের অনেক অভিজ্ঞতা হয়। পক্ষান্তরে আমাদের ভারতে 'সমাজের' কল্যাণটাকেই বড় করে দেখা হয়। ব্যক্তি সেখানে গৌণ। তাই যে কোনও ভাবেই হোক, তাকে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতেই হয়। সন্ন্যাসী হয়ে ঘর-সংসার ছাড়লে অবশ্য অন্য কথা। নাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে সেখানে কিছু নেই। কিন্তু আবার এটাও তো ঠিক, ঐ সমাজ থেকেই বহু মহাপুরুষ, আধ্যাত্মিক জগতের বহু দিকপাল বেরিয়েছেন। তাহলে কি এটাই বুঝতে হবে ধর্মজীবনে যারা অপরিণত তাদের আনুকূল্যেই এটা সম্ভব হয়েছে? ভারতবাসীর পক্ষে কোন্‌টা মঙ্গলজনক? কোনটা? আমেরিকার খোলা হাওয়ায় সকল মানুষই উন্নতির সুযোগ পায়। এটা বিস্তার বা বিস্তৃতির দিক। কিন্তু ভারতের আছে গভীরতা। এই বিস্তৃতি এবং গভীরতা, দুটিকেই কিভাবে সমন্বিত করা যায় সেটাই সমস্যা। ভারতবর্ষের প্রগাঢ় গভীরতাকে বজায় রেখে কিভাবে একই সঙ্গে তার ব্যাপ্তি বাড়ান যায়?'

বলা বাহুল্য, স্বামীজীর কাছে সমস্যাটি নিছক কল্পনা বিলাস বা বুদ্ধির কসরৎ মাত্র ছিল না। প্রশ্নটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন এবং এই প্রশ্নের সমাধান ভারতের কল্যাণের জন্য একান্তই জরুরি ছিল। আমেরিকায় বসে সামাজিক

স্বাধীনতার কি মূল্য এবং জনমানসে তার কতখানি প্রভাব তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আবার ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কেও তিনি আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন। ভারতীয় সমাজের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা যুগযুগ ধরে ইতিহাসের বহু উত্থানপতন সত্ত্বেও তাকে সজীব রেখেছে। বহু দেশ উঠেছে, পড়েছে; কিন্তু ভারত এখনও অম্লান। স্বামীজীর সমস্যা ছিল এমন একটা উপায় বার করা যাতে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার চিরাচরিত কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেও অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ গুণগুলিকে তার সাথে অন্বিত করা যায়।

দিনের পর দিন এই চিন্তাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। এবং সেই ধ্যানের গভীরতা থেকে মাঝে মাঝেই তিনি তাঁর ভাবনাগুলিকে তুলে এনে আমাদের সামনে মেলে ধরতেন। সেই চিন্তার প্রাণকেন্দ্রে ছিল এক মহৎ আদর্শের স্বপ্ন যার কাছে তাঁর কর্ম-পরিকল্পনার অন্যান্য দিকগুলি, যথা বাড়িঘর, স্থান নির্বাচন, কাজের পদ্ধতি ইত্যাদিও গৌণ বলে মনে হতো। ভারতের চিরকালের আদর্শ যে নারীজাতি, তার ভবিষ্যৎ ভূমিকা কি হবে সেই রূপ কল্পনায় তিনি নিবিষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতো দীপ্ত উজ্জ্বল মনের মানুষের পক্ষেও কাজটা নেহাৎ সহজ ছিল না। কিন্তু চিন্তাকে সূক্ষ্ম কারুকার্যে মণ্ডিত করে সেই কল্যাণময়ী আদর্শকে তিনি ধীরে, অতি ধীরে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সুনিপুণ ভাস্করের মতো বহুমূল্য পাথর নিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব মাতৃমূর্তি রচনায় তন্ময় হয়ে গেলেন, যে মূর্তি ইতঃপূর্বে আর কোনও শিল্পীর কল্পনাতেও আসেনি, যে মূর্তি দিব্য বিভায় জীবন্ত, চৈতন্যের আলোকে সমুজ্জ্বল। একটু একটু করে কিভাবে সেই শ্রীমূর্তি রূপ নিল, বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমরা তা লক্ষ্য করলাম। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো যখন ছেনি, হাতুড়ি নিয়ে তাঁর অনুপম ভাস্কর্য 'মোজেস্-এর মধ্যে তেজ, বীর্য ও বিশালতার ব্যঞ্জনাটি ফুটিয়ে তুলতেন, তখনও বোধকরি আমাদের মতো গুটিকয়েক ভাগ্যবান সেই দৃশ্য দেখে ধন্য হয়েছিলেন।

মেয়েদের দিয়ে কোন্ কাজ করাবার কথা তিনি ভেবেছিলেন? শুধুমাত্র একটি স্কুল করে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া? না, কখনোই না। কারণ দেশে হাজার হাজার স্কুল রয়েছে; তার সঙ্গে আরও একটা যুক্ত হলে দেশের অবস্থার কিছু ইতরবিশেষ হবে না। তাহলে কি মেয়েদের জন্য বোর্ডিং স্কুল চালানো? না, তাও না। যদিও এটা ঠিক বোর্ডিং স্কুল খুললে যে সমস্ত বাপ-মা তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারেন না, তাদের একটা আশ্রয় হয়। অতএব তার একটা উপযোগিতা যে

আছে সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু স্বামীজীর চিন্তা অত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। তবে কি তিনি নিরাশ্রয় বিধবাদের জন্য কোনও 'হোম' চালাবার কথা ভেবেছিলেন? এই জাতীর 'হোম' যথেষ্ট প্রয়োজনীয় হলেও স্বামীজী এর চাইতেও অনেক বড় কাজের কথা ভেবেছিলেন। যে সব কর্মপ্রচেষ্টা ইতঃপূর্বেই করা হয়েছে স্বামীজী তার পুনরাবৃত্তির কথা ভাবেন নি। তাঁর চিন্তাধারা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। কি সেই চিন্তা? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের নিজেদেরই প্রশ্ন করতে হবে ঃ এই যুগে ভারত তথা বিশ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাবের বিশেষ তাৎপর্য কি? যে আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ এক নতুন শক্তি, এক নতুন জীবনের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, তা কি কেবল পুরুষদের জন্য? কখনোই নয়। কিন্তু সেই দিব্য শক্তি, দিব্য জীবনের তড়িৎ-স্পর্শ ভারতীয় মেয়েদের জীবনে কিভাবে এনে দেওয়া যায়? আধ্যাত্মিকতার অমল অগ্নি তাঁদের প্রাণে কিভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া যায় যাতে তাঁরা নিজেরাই এক-একটি মশালের মতো জ্বলে উঠে লক্ষ লক্ষ নারীর মধ্যে সেই আগুনকে ছড়িয়ে দিতে পারে? এই ছিল স্বামীজীর অনেক চিন্তার মধ্যে একটা বড় চিন্তা। ব্যথাতুর কণ্ঠে তিনি বলতেন ঃ 'এই কাজের জন্য একজন মহিলার প্রয়োজন। পুরুষের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু কোথায় সেই নারী?'

স্বামীজী যখন পরিব্রাজক অবস্থায় দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই তখন থেকেই তিনি এমন এক শক্তিময়ী, মহীয়সী নারীর সন্ধান করছিলেন যিনি তাঁর এই কাজের গুরুদায়িত্ব নিতে পারেন। একের পর এক নারীকে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু কেউই সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। একজন মহিলা, যাঁর ওপর স্বামীজীর প্রচণ্ড আশা ছিল, তাঁর নাম করে কেউ একজন একবার প্রশ্ন করেছিলেন—অমুক কি আপনার কাজের ভার নিতে পারেন না? তার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'সে তার নিজের কাজ করতে চায়।' এ কথা স্বামীজী সমালোচনার সুরে বলেননি। যা ঘটনা তাই বলেছিলেন। একের পর এক যাঁরই সুপ্ত শক্তিকে স্বামীজী জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনিই ভেবেছেন ঐ শক্তি বুঝি তাঁর নিজস্ব! সুযোগ সুবিধা পেলে তিনিও স্বামীজীর মতো বড় হতে পারতেন। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করতে চেয়েছেন, স্বামীজীর কাজ নয়। অবশ্য যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া সত্যিই শক্ত যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মননশীলতা—দু-ই আছে, আছে গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা, যিনি স্বার্থশূন্য এবং যিনি অন্যের ভিতর অধ্যাত্মচেতনার আগুন ছড়িয়ে দিতে পারেন। এমন কাউকে

তৈরি করাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল যিনি নিজেও পরে অন্যদের তাঁর গুরুর কাজের উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারবেন। তাঁদের ভিতর থেকে আবার বাছা বাছা পাঁচ-ছজন নেতৃস্থানীয়া কর্মী কাজের ধারাটিকে ধরে রেখে ক্রমশ তা সম্প্রসারিত করবেন। এই যে পাঁচ-ছজন, তাঁরা একদিকে যেমন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিকশক্তির অধিকারিণী হবেন, তেমনি হবেন অসাধারণ বিদুষী, ধীময়ী ও মনীষাসম্পন্না। অতীতের যা কিছু সুন্দর ও মহৎ এবং বর্তমানের যা কিছু ভালো, এই উভয় পরম্পরাই তাঁদের মধ্যে সমন্বিত ও প্রতিফলিত হবে। এই ছিল স্বামীজীর লক্ষ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কেমন করে? কি ধরনের শিক্ষা পেলে এমন দীপ্তিময়ী, তেজোময়ী নারীর আবির্ভাব সম্ভব হবে? স্বামীজীর মত ছিল এই, যাঁরা তাঁর কাজ করবেন তাঁদের তিনটি গুণ অতি অবশ্যই থাকতে হবে— পবিত্রতা, গুরুর প্রতি জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং ভক্তি। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ 'আমি পবিত্রতা বড় ভালবাসি।' আর যখনই এই কথা বলতেন, তখনই তাঁর কণ্ঠস্বর বড় বিষণ্ণ শোনাতো। স্বামীজী বলতেন ঃ 'আমাদের চেষ্টা হবে সীতার আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলা। সীতা—যিনি পবিত্রতার চাইতেও পবিত্র, সতীত্বের ঘনীভূত রূপ। ধৈর্য ও তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ। সীতাই ভারতীয় নারীর আদর্শ। ভারতের মেয়েদের যা হতে হবে সীতা তারই ভাব-প্রতিমা। ভারতীয় নারীর যা চরম আদর্শ তার উৎস 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই সীতা চরিত্র যা হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র আর্যাবর্তের নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলেরই পূজা পেয়ে আসছে।'

পবিত্রতার কথা বলতে শুরু করলে স্বামীজী আর থাকতে পারতেন না। সর্বদা তিনি আমাদের পবিত্রতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিন্তু পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কখনও সখনও আরও একটি গুণের আভাস দিতেন যা নারীত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্বন্ধযুক্ত না হলেও তাঁর বলা গল্পগুলি থেকে এ ধারণা আমাদের হয়েছে যে সেই গুণ ছাড়া নারীত্বের আদর্শ ছবিটি যেন সম্পূর্ণ হয় না। স্বামীজী বারবার আমাদের কাছে সেই রাজপুত রমণীর গল্প করতেন যিনি স্বামীর যুদ্ধে যাওয়ার আগে তাঁকে বর্ম পরিয়ে দিয়ে বলতেন, 'এই বর্ম পরেই রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসো, নয়তো যুদ্ধ করতে করতেই বীরের মৃত্যু বরণ করো।' রাজপুত রাণী পদ্মিনীর উপাখ্যান স্বামীজী কী নিখুঁতভাবেই না বর্ণনা করতেন! তাঁর বলার গুণে বীরাঙ্গনা পদ্মিনী পারিজাতের অপরূপ রূপলাবণ্য নিয়ে যেন আমাদের সামনে এসে দাঁড়াতেন। মুসলমান হানাদারের লালসার শিকার হওয়ার চেয়ে পদ্মিনী এবং বহু রাজপুত রমণী আগুনে

আত্মাহুতি দেওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন। প্রিয়জনের মৃত্যুভয়ে যে নারী সদাই শঙ্কিত ও কম্পমান তাঁর প্রতি স্বামীজীর কোনও সহানুভূতি ছিল না। তিনি বলতেন, 'রাজপুত রমণীর মতো হও।'

স্বামীজী যদি তাঁর কাজের জন্য শুধু গুটিকয়েক কলেজ-থেকে-পাশ-করা মেয়েই চাইতেন তাহলে তো কোনও গোলই ছিল না, কারণ ইতোমধ্যেই বেশ কিছু মহিলা কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছেন। প্রশ্নটা আসলে অন্য। যেসব অল্পবয়সী ছেলেরা স্বামীজীর কাছে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই ডিগ্রী ছিল। কিন্তু তবু তাঁদের ট্রেনিং নিতে হয়েছে। তাঁরা এমন অনেক কিছুই মগজে ভরে এনেছিলেন যা তাঁদের ভুলতে হয়েছে। পুরানো মূল্যবোধের বদলে নতুন মূল্যবোধ জাগাতে হয়েছে তাঁদের ভিতর। তাঁদের সামনে মেলে ধরতে হয়েছিল জীবনের নতুন আদর্শ, নতুন উদ্দেশ্য। স্থির করে দিতে হয়েছিল জীবনের অভ্রান্ত লক্ষ্য। এইভাবে ক্রমে যখন তাঁদের চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে, যখন তা অধ্যাত্মভাব ধারণের উপযুক্ত হয়েছে, কেবল তখনই তাঁদের ভিতর তেজোময় আধ্যাত্মিক ভাব ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সেই ভাব পুষ্ট হয়েছে শিক্ষা, আলাপ-আলোচনা এবং যাঁরা অন্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে পারেন এমন মহাপুরুষদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে। এই সুনির্দিষ্ট ক্রমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে সম্পূর্ণ চরিত্রটাই যখন পাল্টে যায়, তখন তাঁরা ভাবপ্রচারের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন এবং তখন তাঁরা নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে নেমে পড়েন।

বই-পড়া-জ্ঞান বা ডিগ্রীর মূল্য যদিও স্বামীজী কখনও খাটো করে দেখেননি, তবুও স্বীকার করতেই হবে ওগুলি গৌণ। অবশ্য লেখা এবং পড়ার মূল্য আছে বৈকি। দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ ঘটাতে এবং উচ্চ আদর্শ ও চিন্তার সাথে পরিচিত হবার ঐ একমাত্র চাবিকাঠি। সেই কারণেই কেবলমাত্র একটা স্কুল বা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কথাই তিনি চিন্তা করেননি। তিনি চেয়েছিলেন আরো বড় কিছু করতে যাতে ভবিষ্যতে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনা আপনিই গড়ে উঠবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি চাইছিলেন একদল নতুন শিক্ষক তৈরি করতে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও যুগোপযোগী করতে হলে তিনটি জিনিস দেখতে হবে। প্রথমত তা যেন বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিশীলিত করে। দ্বিতীয়ত তা যেন জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটায়। তৃতীয়ত তা যেন অধ্যাত্মবোধকে পুষ্ট করে। যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁরা যদি তাঁদের প্রাণের প্রদীপটি ঊর্ধ্বলোক থেকে আসা অনির্বাণ পবিত্র হোমাগ্নিতে জ্বালিয়ে না নেন,

তবে সেই শিক্ষা খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না। সেই কারণেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার এতো প্রয়োজন। সকলের পক্ষেই যজ্ঞের বেদিমূলে আসা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু যিনি অগ্নি সংগ্রহ করে নিজেই মশাল হয়ে গেছেন, তিনি অন্যের প্রাণে জ্ঞানের প্রদীপটি অনায়াসে জ্বেলে দিতে পারেন। এইভাবে এক থেকে বহুর মধ্যে জ্ঞানের দীপ্ত শিখা জ্বলে উঠুক, ছড়িয়ে পড়ুক শত, সহস্র প্রাণে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ধর্মবোধ এমন এক বস্তু যা অবশ্যই অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে হয়। অধ্যাত্মচেতনা এক পরম প্রাপ্তি। এটা অর্জন করা যায় না, যদিও এ কথা অনস্বীকার্য ধ্যান-জপ, উপলব্ধিবান পুরুষের সঙ্গ, শাস্ত্রচর্চা এবং সদ্‌গ্রন্থ পাঠেরও খুব প্রয়োজন আছে।

স্বামীজী নিজে কখনও বলেননি শিষ্যকে গুরুর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হতে হবে। বলেননি ওটি একটি আবশ্যিক গুণ। কিন্তু আজ বহুবছর পর পিছনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করি ভক্তির কি প্রয়োজন! স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা-ভক্তি কিছুই চাননি। কোনও রকম দাবিই তাঁর ছিল না। আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রতি তাঁর এতো গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল যে তাঁর আচার-আচরণ যেন একটা কথাই বলতো ঃ 'কোনও রকম হস্তক্ষেপ নয়।' তোমরা ঠিকই এগোচ্ছ। তোমাদের কিছু বলতে হবে না।

স্বামীজী অন্ধ আনুগত্য চাইতেন না। আমরা দাস হই, এটা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন ঃ 'আমি আমার কর্মীদের কাজে আদৌ নাক গলাই না; কারণ যার কাজ করার সামর্থ্য আছে, তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্বও আছে। চাপ দিলে সে বেঁকে বসে। এই কারণেই আমি কর্মীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চাই।'

তাঁর মধ্যে প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব যে ছিল না—তা নয়। কিন্তু মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে তিনি সদা সচেতন ছিলেন বলেই সেই উদ্ধত ভাবের রাশ টেনে রাখতে পারতেন। তিনি কখনোই মনে করতেন না, সব মানুষই সমান। আমরা অনেকেই কথাটা হাল্কাভাবে আউড়ে যাই বটে, কিন্তু অর্থটা বুঝি না। কিন্তু স্বামীজীর দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি জানতেন সকলের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত; কিন্তু প্রকাশের বিরাট তারতম্য। সেই জন্যই তিনি বলতেন—সকলের সমান অধিকার, এ হতে পারে না। কিন্তু সকলের সমান সুযোগ থাকা দরকার। অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নীচুতলার মানুষের প্রতি তাঁর এতটাই সহানুভূতি ছিল যে তিনি উন্নতশ্রেণীর মানুষের চেয়ে তাদেরই বেশি সুযোগসুবিধা দেবার

পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি জানতেন তাদের প্রয়োজনটাই বেশি। কাজে কাজেই তিনি দুর্বলের ওপর খবরদারি করা পছন্দ করতেন না। বরং তাদের বাড়তি স্বাধীনতা দিতেন। অবশ্য স্বামীজী নিজে শিষ্যদের কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা দাবি না করলেও তাঁকে যখন কেউ গুরুপদে বরণ করে নিত, তখন সে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে পারতোই না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছাটুকুও চলে যেত।

ভারতবর্ষ এখন একটা যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে, অন্যদিকে শোনা যায় নবীনতা বা আধুনিকতার পদসঞ্চার। যুগের এই পালাবদলকে আমরা যতই নিন্দা করি না কেন, যতই আমরা পুরাতনকে আঁকড়ে থেকে পরিবর্তনের ঢেউকে বাধা দেবার চেষ্টা করি না কেন, রূপান্তরের এই ধারা অপ্রতিরোধ্য। এই তরঙ্গ এখন আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। প্রশ্ন এই ঃ এই পরিবর্তনকে আমরা কেমন করে গ্রহণ করবো? আমরা কি পরিবর্তনের চোরাস্রোতে ভেসে যাবো? না সাহসের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়ে তার শক্তিকে প্রয়োজনমতো ভবিষ্যতের কাজে লাগাবো? কেউ কেউ প্রতিরোধের পরিবর্তে বিদেশী কালচারকে মেনে নিয়ে তার অন্ধ অনুকরণে মত্ত হয়েছেন। কিন্তু বনস্পতি-রূপ যে সংস্কৃতি ভিন্ন দেশে, ভিন্ন প্রয়োজনে জন্ম নিয়েছে, তাকে পুরোপুরি উপড়ে এনে আরেকটি দেশের মাটিতে পুঁতলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? এক দেশের পক্ষে যা উপযোগী অন্য আরেকটি দেশের পক্ষে তা উপযোগী নাও হতে পারে। সেইজন্য প্রত্যেক দেশকেই তার নিজের নিজের কৃষ্টি গড়ে তুলতে হবে এবং সেই কৃষ্টির সুষ্ঠ বিকাশ যাতে সম্ভব হয় সেইজন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। যে বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ সমগ্র জগতকে, বিশেষত এশিয়া ভূখণ্ডকে প্লাবিত করতে উদ্যত, তার থেকে ভারতবর্ষ যদি নিজেকে বাঁচাতে নাও পারে, তার এমন চেষ্টা করা উচিত যাতে পরিস্থিতিটা অন্তত আয়ত্তে থাকে। পুরাতনের ভিতর থেকে নূতনের অভ্যুদয় হবেই, কিন্তু দেখতে হবে তা যেন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয়। পদ্মফুল কি প্রিমরোজ হবে? কখনোই না। বরং আমাদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে পদ্মটি আরও সুন্দর, আরও নিখুঁতভাবে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়ে এক মহান জাতির প্রতীকরূপে চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে। অপূর্ব সেই শতদলের শেকড় ধরিত্রীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও তা ফুটে উঠবে এক অতি নির্মল, শুদ্ধ পরিমণ্ডলে যার নাম ভারতবর্ষ।

কতকগুলি ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের জোয়ার মেয়েদের জীবনকেই সবচেয়ে বেশি ঘা দিয়েছে। শহর জীবনের ক্রমবর্ধমান প্রসারের ফলে মেয়েরা ক্রমশই পল্লীজীবনের স্বাভাবিক মুক্ত পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঘিঞ্জি নগরগুলির চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়েছে। যদি উচ্চবর্ণ অথচ দরিদ্র ঘরের মহিলা হন—বেশিরভাগই তাই—তাহলে তো কথাই নেই, মাসের পর মাস তাঁরা ঘর ছেড়ে বের হতে পারবেন না। অর্থনৈতিক চাপটাই অবিশ্বাস্যরকম বেশি। একদিকে দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে পুষ্টিকর খাদ্য, আলো-বাতাস ও ব্যায়ামের একান্ত অভাবে অশান্তি, রোগ এবং অকালমৃত্যু এঁদের নিত্যসঙ্গী। যাঁদের স্বামী জীবিত তাঁদের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থা বিধবাদের। সংসারের কাছ থেকে তাঁদের যেন কিছুই পাবার নেই! সনাতন পল্লীসমাজে তবুও তাঁদের একটা ভূমিকা ছিল। তাঁরা সেখানে সম্মান নিয়ে থাকতেন। দায়ে-অদায়ে লোকে তাঁদের কাছে যেত, পরামর্শ নিত। কিন্তু এখন? এখন তাঁদের দুরবস্থা গেরস্তঘরের দাসী-বাঁদীর মতো। তাঁদের মনের ভাব এখন এই—অন্যের ঘাড়ে যখন আছি, তখন থাকা-খাওয়ার বদলে গতরে খাটি। বাড়ির লোকের অন্তত ঝি-চাকরের পয়সাটা তো বাঁচবে! যেখানে অভাব আরও চরম সেখানে এই অসহায়া বিধবারাই প্রথম টের পান তাঁরা কতটা অবাঞ্ছিত। হাবেভাবে এই কথা তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়—আছেন, তাই খাটছেন, নইলে আপনার সাহায্যের কোনও প্রয়োজন ছিল না। যাঁরা অত সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষ নন, তাঁরা এসব ক্ষেত্রে শুধুই অপমানিত বোধ করেন। কিন্তু যাঁদের অনুভব শক্তি প্রবল তাঁদের ক্ষত আরও গভীর। তাঁরা অহর্নিশি এই ভেবে কষ্ট পান—আমি বেঁচে থেকে পরিবারের আর পাঁচ জনের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসাচ্ছি! অসহায় বলেই তাঁদের মর্মযন্ত্রণা আরও বেশি। দিবারাত্র তাঁদের একটাই চিন্তা—আহা! রোজগার করে যদি দুটো টাকা বাড়ির লোকের হাতে এনে দিতে পারতাম!

এই অসহায়া নারীদের স্বামীজী বিশেষভাবে সাহায্য করতে চাইতেন। তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল অপরিসীম। স্বামীজী বলতেন ঃ 'মেয়েদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে।' কিন্তু কি করে—সে কথা তিনি বলেননি। তিনি আমাদের কেবল এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন, যিনি ঐ কাজের ভার নেবেন ও-চিন্তা তাঁর; তিনিই ঐ সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করবেন। স্বামীজী অবশ্য বলেছিলেন ঃ 'মেয়েদের শিক্ষার আলো দিতে হবে।' তিনি এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তার কথা আমাদের কাছে কিছুটা বিশদভাবে বলেছিলেন এবং কয়েকটি সূত্রও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—পশ্চিমী

ধাঁচের শিক্ষা দিলে চলবে না, ওঁদের ভারতীয় পদ্ধতিতে, ভারতীয় আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। লেখাপড়া শেখাটাই মূল উদ্দেশ্য নয়, ওটি উপায় মাত্র। এমনভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনটা কাটাতে পারে এবং সেবাপরায়ণা হয়ে ওঠে। লেখাপড়া শিখে আত্মসুখী হলে চলবে না। বিদ্যাচর্চা ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য নয়। মেয়েরা পড়তে শিখে যদি সস্তা, কুরুচিপূর্ণ চটকদার নাটক-নভেলের মধ্যেই মুখ গুঁজে পড়ে থাকে তো তাদের লেখাপড়া না শেখাই ভালো। আর তারা যদি সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে স্বদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করে, তবে সেই শিক্ষা আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের সামনে রামায়ণ, মহাভারতের উচ্চতম আদর্শগুলি প্রতিনিয়ত তুলে ধরতে হবে। সে পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়েই হোক, গল্পের মধ্য দিয়েই হোক, আর যাত্রা-কথকতার মাধ্যমেই হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মহৎ চরিত্রগুলি তাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ঘোরাফেরা না করে যতক্ষণ পর্যন্ত সুমহান আদর্শ ও ভাবগুলি তাদের সত্তার অঙ্গীভূত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। থামলে চলবে না। তাহলেই কালে এক মহান, শক্তিময়ী নারীজাতির উদ্ভব হবে।

স্বামীজী বলতেন, সকলের আগে মাতৃভাষাটা ভালো করে শেখাতে হবে। তারপর সংস্কৃত। ক্রমে ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল ইত্যাদি। এবং এসবের সঙ্গে সঙ্গে সেলাই, সূচিশিল্প, সুতো কাটা, রান্নাবান্না, সেবাশুশ্রূষা করা এবং যে কোনও রকমের দেশীয় হাতের কাজেও তাদের উৎসাহিত করতে হবে। বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য জ্ঞান তাদের দিতে হবে বৈকি, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্য যে পরম পবিত্র সেই বোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহত্তম চিন্তাগুলির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তারা যথার্থ শিক্ষা লাভ করবে। যে শিক্ষা ভারতীয় নারীর অতীত কৃষ্টি, ধর্ম ও ঐতিহ্যগত সংস্কারগুলির প্রতি সহজাত বিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, সে শিক্ষা শুধু যে মূল্যহীন তা-ই নয়, সে শিক্ষা কু-শিক্ষা। ঐ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মেয়েরা এখন যেমন আছে তাদের সেই রকম থাকতে দেওয়াই বরং মঙ্গল। অঙ্ক শিখতে হবে এইজন্য যে তা মনকে নিয়মিত করে, তা আমাদের নির্ভুল হতে সাহায্য করে, সত্যলাভের প্রেরণা দেয়। ইতিহাস পড়া এই উদ্দেশ্যে, তা আমাদের ফলাফল দেখে কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার অভ্যাসটি গড়ে দেয়, বলে দেয়—অতীতের এই ভুল তুমি যেন না করো।

স্বামীজীর কাছে নারী-মুক্তির অর্থ ছিল সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়া। সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙ্গে গেলেই তো তাদের আসল শক্তি ফুটে বেরুবে।

প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'মন' নিয়ে মাতামাতি। তার একমাত্র লক্ষ্য মনের শৃঙ্খলা আনা। তার সঙ্গে অবশ্য ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ভাষা শিক্ষা—এইসব জুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষার এই ধারণা খুবই সীমিত এবং একপেশে। শুধু মন নিয়েই তো আর মানুষ নয়। স্বামীজী বলতেন—মানুষের যা প্রকৃত স্বরূপ তার প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোল না কেন? জগতে যখন একটা নতুন আলো প্রবেশ করে, তখন তা জীবনের প্রতিটি দিগন্তই উদ্ভাসিত করে দেয়। মানুষ যদি আসলে দেবতাই হয়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের ওপর যে আবরণটি পড়ে আছে, তাকে সরিয়ে দেওয়া। স্বামীজী বলেছিলেন—'মানুষের, অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনের নামই শিক্ষা।'

তিনি সকলকে আহ্বান করে বলতেন—আমরা একটু পরীক্ষা করেই দেখি না কেন! এই সন্ধিক্ষণে যখন সমগ্র বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন একান্তই প্রয়োজন, তখন আমরা পুরানো ঢং-এর শিক্ষা ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে একটা বৃহত্তর আদর্শের ওপর, একটা মহত্তর উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাই না কেন! স্বামীজী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতেন ভারতের মেয়েদের শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্য থেকে অন্তত এমন কয়েকজন বের হোক যারা মেধা ও প্রজ্ঞায় অতুলনীয়া, যারা বুক ফুলিয়ে বিশ্বের যে কোনও মহিলার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যে অধ্যাত্ম জ্যোতির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী এখন ভাসমান, সেই জ্যোতির অমোঘ স্পর্শে তাদের হৃদয়ের অধ্যাত্মশিখাটি দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। প্রদীপ্ত এই ভারতকন্যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হবে ত্যাগ ও সেবা। গুটিকয়েক এই রকম সিংহী বেরোলেই ভারতের মেয়েদের যা কিছু সমস্যা, তার সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। অতীতে আমাদের দেশের মেয়েরা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। সেই রকম মেয়ে কি এই পোড়া দেশে আর গুটিকয়েক হয় না যারা বহুর সুখের জন্য তাদের দেহ, মন, প্রাণ সব বলি দিতে পারে? স্বামীজী উদ্দীপ্ত হয়ে বলতেন ঃ 'গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে দাও দেখি যারা পবিত্র এবং স্বার্থশূন্য, আমি দুনিয়া কাঁপিয়ে দেবো।'

স্বামীজী বারবার বলতেন—কোনও পুরুষ মেয়েদের সমস্যার সমাধান

করতে পারবে না। এ কাজে মেয়েদেরই এগিয়ে আসতে হবে। একমাত্র তাদের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল অতি কঠোর। কিছু বললেই বলতেন ঃ 'আমি কি মেয়ে যে তাদের সমস্যার সমাধান করবো? দূর হঠো! তারাই তাদের সমস্যার মোকাবিলা করবে।'

স্বামীজী কেন এই রকম বলতেন বুঝতে হলে তার চিন্তার গভীরে যেতে হবে, দেখতে হবে নারীজাতির শক্তি ও মহিমায় তাঁর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, ছিল কী আকাশচুম্বী আস্থা ও শ্রদ্ধা। তিনি বিশ্বাস করতেন ঃ 'প্রত্যেক নারীই জগন্মাতার অংশ, মূর্তিময়ী শক্তি।' সেই শক্তিকে এবার জাগাতে হবে। যদি মেয়েদের শক্তি প্রায়শই বিপথগামী হয়ে থাকে, তবে তার কারণ এই, তাদের ওপর প্রভূত অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু যেদিন তার পায়ের শৃঙ্খল খসে পড়বে, সেইদিনই তার সিংহী স্বভাব জেগে উঠবে। যুগ যুগ ধরে মেয়েরা কষ্ট সয়ে এসেছে। সেই অবর্ণনীয় কষ্টের মূল্যেই তারা অনন্ত ধৈর্য এবং ধরিত্রীর সহ্যশক্তি পেয়েছে।

ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন এই শিক্ষা দিতে পারি যে মানুষ পাপের সন্তান নয়, দুঃখ তার নিত্যসঙ্গী নয়, কোনও অবিচারের ফলে শতেক বিকৃতি নিয়ে সে এই পৃথিবীতে আসেনি, বরং সে ঈশ্বরের তনয়, স্বরূপত শুদ্ধ ও পূর্ণ—তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা কেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবো না? কেন আমরা ভাবতে পারবো না বিদ্যার্থীরা সব জ্যোতির তনয়, সুন্দর স্বাধীন মুক্তির আনন্দে তারা আপন ভবিতব্যের পাতাগুলি উল্টে যাচ্ছে? সব ধর্মই তো একই কথা বলে ঃ 'তোমার মধ্যেই সব।'

স্পষ্টত ছেলেদের চাইতে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই নতুন ভাবনাকে রূপ দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ শুধুমাত্র ডিগ্রী নেবার জন্য পড়াশুনা তাদের না করলেও চলে। অন্তত ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি যা তাতে কর্মজীবনে প্রবেশ করে বিভিন্ন পদের জন্য প্রতিযোগিতার খাতায় নাম লেখাতে তাদের এখনও বেশ কিছুটা দেরি আছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে প্রচলিত ধারার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে তাদের তাল মিলিয়ে চলা আবশ্যিক নয়। এবং এটা নিশ্চিত এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে যদি শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিমার্জিত করে নেওয়া যায়, তাহলে এরই ভিতর থেকে এক নতুন প্রজাতির জন্ম হবে, জন্ম নেবে অসাধারণ চরিত্রের সব নারী-পুরুষ।

শিশুদের স্কুল? হ্যাঁ, তারও প্রয়োজন আছে বৈকি। কারণ শিক্ষাকে সর্বস্তরে

ছড়িয়ে দিতে হবে। অসহায় বিধবাদের জন্য আশ্রমেরও প্রয়োজন। দরকার সেবামূলক অন্যান্য উদ্যোগেরও। এক কথায়, সর্বস্তরে নতুন জীবনের দামামা বেজে উঠুক, নতুন নতুন চিন্তার বিকাশ হোক, দুর্জয় প্রাণশক্তিতে সবকিছু ভরপুর হোক। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন পরীক্ষানিরীক্ষা যদি ব্যর্থও হয়, তবুও বলবো সবটুকু বিফলে যাবে না। কারণ শুভ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শক্তি, উৎসাহ এবং দায়িত্ববোধ—এইসব সদ্‌গুণগুলির বিকাশ তো হবেই। আর যদি এই মহৎ পরিকল্পনা সার্থক হয়—যা হতে বাধ্য—তাহলে দেশের ও দশের কতখানি যে কল্যাণ হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই মুহূর্তে ফলাফলের পূর্বাভাস দেওয়া বাস্তবিকই কঠিন। কিন্তু এটা বলা যায়, এই অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেসব মেয়েরা বেরিয়ে আসবে, তারা আর কিছু না হোক, মহিলা হিসেবে অসাধারণ শক্তিসম্পন্না হবেই হবে। বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে এই ধরনের বেশ কিছু মহিলার একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি ঠিক ঠিক ঢেলে সাজানো যায় তাহলে এমন কতকগুলি মহৎ চরিত্রের আবির্ভাব হবে যারা বিশ্বের ইতিহাসে একটা দাগ রেখে যাবে। প্রাচীন গ্রীসের মেয়েরা যেমন শারীরিক দিক দিয়ে প্রায় নিখুঁত ছিল, ভারতের মেয়েরাও তেমনি মননশীলতা ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তাদের পরিপূরক হয়ে উঠবে। ভালবাসা, কোমলতা, মাধুর্য, তিতিক্ষা, হৃদয়বত্তা, বুদ্ধি এবং সবচেয়ে বড় কথা, অধ্যাত্ম শক্তির সমন্বয়ে তারা অনন্যা, অতুলনীয়া হয়ে উঠবে।

(প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৩১)

ভারতের কয়েকটি সমস্যা

আমাদের মাঝে মাঝে মনে হতো স্বামীজীর কথায় পারম্পর্যের অভাব আছে। কয়েকদিন হয়তো বাল্য-বিবাহ, জাতপাত, পর্দাপ্রথা, ধর্মীয় জীবনে ভাবালুতা অথবা অনুরূপ কোনও কুসংস্কারের প্রচণ্ড সমালোচনা করলেন। তাঁর আবেগদৃপ্ত কথা শুনে মনে হতো—সত্যিই তো, স্বামীজী যা বলছেন তার ওপর আর কি কথা চলতে পারে? অধিকাংশ সময় তাই বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা তাঁর কথা মেনে নিতাম। কিন্তু যেই স্বামীজী টের পেতেন তাঁর কথা আমরা মুখ বুঁজে মেনে নিয়েছি, অমনি তাঁর অন্য মূর্তি! ঘুরে দাঁড়িয়ে, যাঁরা তাঁর কথায় সায় দিয়ে গেছেন, তাঁদের তিনি তুলোধোনা করে ছাড়তেন! একটার পর একটা

অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিতেন আগে যা বলেছেন তার উল্টোটাই সত্য। স্বামীজীর কাণ্ড দেখে ক্বচিৎ কখনও কেউ হয়তো মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলে উঠতেন ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, গতকাল যে আপনি অন্য কথা বলেছিলেন।' তার উত্তরে স্বামীজী বড়জোর বলতেন ঃ 'তা বটে। তবে সে তো কালকের কথা।'

এইভাবে স্বামীজী কখনও দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্যকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলবার চেষ্টা করতেন না। কোনও ব্যাখ্যাও দিতেন না। কারণ আমরা যদি মনে করি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সমতার অভাব আছে, তাতে তাঁর কি আসে যায়? এই প্রসঙ্গে এমার্সন-এর একটি মন্তব্য মনে পড়ে। তিনি বলতেন ঃ 'সর্বদা সামঞ্জস্য খুঁজতে চাওয়া, ও সব ক্ষুদ্র মনের সংস্কার।'

জীবনের যাবতীয় সমস্যাগুলিকে স্বামীজী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। এক সুউচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। আর আমরা মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখতাম, ফলে তাঁর দেখা আর আমাদের দেখার মধ্যে বিরাট ফারাক থেকে যেত। শিষ্যদের অসহায় ভাব দেখলে বড় জোর তিনি বলতেন ঃ 'তোমরা কি বুঝতে পারছ না, এগুলি আমার সরব চিন্তা ছাড়া কিছু নয়?'

অনেক পরে আমরা বুঝেছি সবদিক বিচার করে তবেই স্বামীজী কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসতেন। অবশ্য তার মানে এই নয়, সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যে যুক্তি সেটিকে তিনি একেবারেই অকাট্য মনে করতেন এবং বিপরীত যুক্তিটিকে পুরোপুরিই ভুল মনে করতেন। না, তা তিনি করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল একটি যুক্তির স্বপক্ষে পাল্লাটা একটু বেশি ভারী এবং সময়ের প্রয়োজনের সঙ্গে তা সঙ্গতিযুক্ত—এই যা! তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, একবার কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সেটি নিয়ে আর কোনও আলোচনা না করে তাকে কাজে রূপ দেবার কথাই ভাবতেন।

নিছক সমালোচনা স্বামীজী পছন্দ করতেন না। বলতেন—ওতে হানি হয়। ঠিক এই কারণে তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। বলতেন—ওতে হিতের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশি। কারণ সংস্কারের শুরু নিন্দা দিয়ে, অন্যকে ধিক্কার দিয়ে। এতে ভারতের মতো দেশে, যেখানে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং স্বাজাত্যবোধ জাগানোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ, সেই কাজ বিঘ্নিত হবে। কারণ, আর যাই হোক, অন্যকে ধিক্কার দিয়ে ঐক্য আনা যায় না। নতুন

মূল্যবোধ স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠা চাই, বাইরে থেকে বা ওপর থেকে জোর করে তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে স্বামীজী দেখতে পাচ্ছিলেন কি কি কারণে সমাজের অভিপ্রেত পরিবর্তন আসন্ন। এই যুগে অবশ্য অর্থনৈতিক কারণগুলিই জোরদার। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের চাপেই যে পর্দাপ্রথা, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথাগুলি ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য তা বোঝার জন্য অবশ্য খুব বেশি গভীর চিন্তার দরকার ছিল না।

একদিন কেউ তাঁর কথার বিরোধিতা করলে স্বামীজী চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ঃ 'তুমি আমার সঙ্গে কি তর্ক করবে? আমরা পঞ্চাশ পুরুষ আইনজীবী।' এই বলেই তিনি এমন অসাধারণ ভাবে তাঁর মতের স্বপক্ষে তথ্য এবং যুক্তি দিতে লাগলেন যে আমাদের কারও কারও বদ্ধমূল ধারণা হলো 'কালো' শব্দের অর্থ 'সাদা'। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে এইভাবে বলতো ঃ 'স্বামীজী, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সাহস আমার নেই, কিন্তু আপনি তো জানেন, এটা সত্য'—তক্ষুনি স্বামীজীর চোখেমুখে অবিশ্বাস্য এক কোমলতা ফুটে উঠতো। তিনি সম্মতি দিয়ে বলতেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ।' এইসব ছোটছোট ব্যাপার নিয়ে আমরা খুব মজা করতাম। ভাবনার যে উচ্চভূমিতে স্বামীজী স্বাভাবিকভাবে সদাসর্বদা বিচরণ করতেন এবং আমাদের মনকেও টেনে তুলতেন, তার চাপ থেকে মনটা যেন কিছুক্ষণের জন্য ছুটি পেয়ে সহজ স্ফূর্তিতে মেতে উঠতো!

যেটা আমাদের আশ্চর্য লাগতো, সেটা হচ্ছে, স্বামীজী শুধু যে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারতেন তা-ই নয়, তিনি যে কোনও সমস্যার সমাধান বাতলে দিতে পারতেন—এমন সমাধান যা সত্যিই অভিনব।

প্রতিটি দেশাচার ধরে ধরে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিতেন কিভাবে তাদের জন্ম হয়েছে। শুরুতে তাদের প্রত্যেকটির পিছনেই এক বা একাধিক কারণ ছিল। তাদের উপযোগিতা ছিল। কালে তা প্রথায় দাঁড়িয়েছে, এবং সব প্রথার ক্ষেত্রেই যা হয়, ক্রমশ তার মধ্যে ছাইভস্ম ঢুকে তাকে অবান্তর করে তোলে। এখন বিচার করে দেখা প্রয়োজন কোনও প্রথার ভালো দিক কোন্‌টা, আর কোন্‌টাই বা ক্ষতিকর। যেহেতু এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এক-একটি প্রথার সূত্রপাত, সেইহেতু তার বিলোপ সাধনের আগে ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত বর্তমান পরিস্থিতিতে তার আর কোনও সার্থকতা আছে কি না। বস্তুত সব দেশেই তার নিজস্ব কিছু প্রথা বা দেশাচার আছে। আমরা ভাবি ওগুলির উৎপাত বুঝি শুধু

ভারতেই। তা কিন্তু নয়। ওটা আমাদের ভুল ধারণা। আমেরিকার কথাই ধরা যাক না কেন। স্বাধীন দেশ হিসেবে আমেরিকার বয়স এখন দেড়শ বছরের সামান্য কিছু বেশি। কিন্তু এরই মধ্যে সে দেশে দুটি পৃথক জাতের সৃষ্টি হয়েছে যারা একে অন্যের প্রতি অনমনীয়। একজন নিগ্রোর গায়ের রং সুইডিশের মতো পরিষ্কার হলেও কি হবে, সে সাদা ও কালো এই দু জাতের মধ্যে যে বেড়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা কখনোই ডিঙোতে পারবে না। তাছাড়া আমেরিকায় যা হয়েছে ভারতবর্ষে সে রকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। এদেশে কি কখনও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে? শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় ছাড়াও আমেরিকায় আরও কিছু কিছু শ্রেণীবিভাগ গড়ে উঠেছে যেগুলি মূলত অর্থনৈতিক। কার কত টাকা আছে তার ভিত্তিতে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করার চেয়ে আধ্যাত্মিক সম্পদের মানদণ্ডে কোনও বর্ণের উৎকর্ষ যাচাই করা কি মহত্তর চিন্তার পরিচায়ক নয়?

আমেরিকার কথা ছেড়ে এবার ইউরোপের দিকে চোখ ফেরাই। সেখানে এই সেদিনও বাল্যবিবাহের চল ছিল। আমরা বহুবার পড়েছি অমুক অমুক রাজকন্যাদের বারো বছরে বিয়ে হয়েছে। আর এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে রাজপরিবারের লোকজন যা করবেন, প্রজারাও তাই করবেন। শেক্‌সপীয়ারের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এ দেখি জুলিয়েট-এর বয়স যখন চোদ্দর কম, তখনই তার বাপ-মা কাউন্ট প্যারিস-এর সঙ্গে তার বিয়ের বন্দোবস্ত করছেন।

তাহলে ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে না—মানুষের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি ও কতকগুলি পারিপার্শ্বিক কারণেই নানাবিধ লোকাচারের উদ্ভব এবং কোনও একটা সময় তার প্রয়োজনীয়তাও থাকে? স্বামীজী সেটা খুব ভালো করে বুঝতেন বলেই কোনও বিরুদ্ধ সমালোচনা না করে প্রথমে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরিষ্কার দেখে নিতেন সুদূর অতীতে কি কারণে একটি বিশেষ দেশাচারের জন্ম হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যে কিভাবে অনভিপ্রেত জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এইভাবে দেখে, বুঝে, তিনি প্রথমেই চিন্তা করতেন কোন্ আদর্শের দ্বারা এই অবাঞ্ছিত উপসর্গগুলিকে দূর করা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদর্শটি দেখিয়ে দিয়েই তিনি চুপ হয়ে যেতেন, কারণ সেটাই রোগ নিরাময়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন, যে শক্তি বর্তমান ভারতে ক্রিয়াশীল তার দ্বারাই পরিমার্জিত হয়ে দেশাচারগুলি অন্য রূপ নেবে। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে পুরাতনকে নিন্দা

না করেই আমাদের একটা নতুন ধারা, একটা নতুন সংস্কার গড়ে তুলতে হবে। তা যদি করা যায় তাহলে ক্রমশ জীর্ণ রীতিনীতিগুলি সময়ের সঙ্গে সকলের অগোচরে আপনিই খসে পড়বে।

বিবাহ নিছক নিজের ভোগসুখের জন্য নয়। বিবাহ একটা প্রচণ্ড দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার। আর সে দায়িত্ব সমাজের প্রতি। কথায়, চিন্তায় এবং কাজে নিশ্ছিদ্র পবিত্রতা চাই। পবিত্রতার আদর্শবর্জিত যে দাম্পত্য জীবন তা সমাজে ত্যাগের ভাবকে পুষ্ট করে না এবং এই রকম সমাজ মহৎ মানুষের আবির্ভাবে ধন্য হয় না। জীবনের যেসব ক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকা গৌণ সেখানেও সত্যাশ্রয়ী হওয়া চাই। সত্য ও পবিত্রতার আদর্শই একটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বামীজী বলতেন, সমসাময়িক আর পাঁচটা সভ্যতার মতো ভারতবর্ষ যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়নি, আজও যে সে সপ্রাণ—এর পিছনে রয়েছে তার সত্য ও ত্যাগের আদর্শ।

ত্যাগ ও পবিত্রতার আদর্শের কথা উঠলে স্বামীজীর মন ছুটে যেত ইতিহাসের পাতায় পাতায়। সুপ্রাচীন জাতিগুলির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্ত তখন তিনি আমাদের কাছে ছবির মতো মেলে ধরতেন। আমরাও বুঝতে পারতাম একটি জাতি যখন গড়ে ওঠে, তখন তাকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সংযত ও বাহুল্যবর্জিত কঠোর জীবন যাপনের ফলে ক্রমশ সে জাতি বড় হয়। কিন্তু যেই তার সমৃদ্ধি আসে তখনই শুরু হয় ঢিলেমি। স্বেচ্ছাচার ও বিলাসে মত্ত হয়ে ক্রমশ তার অবক্ষয় ও অধঃপতন সূচিত হয়। কালে সেই জাতির সভ্যতা ধ্বংস হয়। ব্যাবিলন, এ্যাসিরিয়া, গ্রীস, রোম—সব দেশেরই এই এক ইতিহাস, এক পরিণাম! কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও জীবিত। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা সত্ত্বেও এদেশ কখনও তার আদর্শকে খাটো করেনি।

স্বামীজী বুঝতেন সমাজজীবনের বহু ক্ষেত্রেই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জেনেও তিনি প্রশ্ন করতেন ঃ 'কিন্তু কোন্‌টা অপেক্ষাকৃত ভালো? এদেশের বাপ-মায়ের ঠিক করা বিয়ে, না পাশ্চাত্যের ব্যক্তিগত পছন্দের বিয়ে? এদেশের ছেলেরাও অবশ্য এখন নিজেদের মনোমতো পাত্রীকে বিয়ে করার অধিকার দাবি করছে।' স্বামীজী এ কথাও চিন্তা করতেন ঃ অসবর্ণ বিবাহে কি উৎসাহ দেওয়া উচিত? কারণ এ দেশে আগেই অসবর্ণ বিবাহের ফলে দুই জাতের খারাপ গুণগুলো নিয়ে এক উদ্ভট বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে দুই পৃথক জাতের ভাল গুণগুলো ভাবী প্রজন্মের মধ্যে বর্তালো? তা যদি হয়

তো এক মহা শক্তিশালী জাতির উদ্ভব হবে। হবে না? তাহলে কি মিশ্রবিবাহ সমর্থনযোগ্য?'

ভারতবর্ষ যে ঋষির দেশ সে কথা স্বামীজী কখনও ভোলেননি। অতীতে যে জাতি বিশ্বকে অতীন্দ্রিয় জগতের বহু দুর্মূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়েছে, যে জাতির অধ্যাত্ম মণি-মঞ্জুষার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে আজও পৃথিবীর মানুষ তাকিয়ে, সেই মহান জাতিকে কেমন করে রক্ষা করা যায় এই ছিল স্বামীজীর ধ্যান-জ্ঞান।

বাল্যবিবাহের প্রশ্নটি নিয়েও স্বামীজী যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন। কোন্ বিষয়টা নিয়েই বা তিনি চিন্তা করেন নি? বাস্তবিক, এমন কোনও সমস্যা নেই যার ওপর তিনি আলোকপাত করেননি। যে কোনও সমস্যার ওপর তিনি তাঁর সন্ধানী মনটিকে কেমন নিবিষ্ট করতেন সেইটি লক্ষ্য করাই ছিল পরম শিক্ষা। হয়তো কেউ একটা প্রশ্ন করলো বা হঠাৎ কোনও একটা মন্তব্য করে বসলো—ব্যস্। অমনি স্বামীজী উদ্দীপিত হয়ে উঠে দ্রুত পায়চারি শুরু করে দিলেন; শুরু হয়ে গেল গলিত লাভার মতো তপ্ত কথার প্রবাহ। কোনও একটি বিষয়ের প্রতি একবার তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হলে যতক্ষণ না সেই বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করছেন ততক্ষণ তিনি অন্য কোনও বিষয়ে মন দিতেন না।

কেউ কেউ অভিযোগ করেন স্বামীজী নাকি বাল্যবিবাহ, জাতিভেদপ্রথা এবং পর্দাপ্রথাকে সমর্থন করতেন। এ অভিযোগও শোনা গেছে, তিনি যে মহান বাণী প্রচার করেছেন তা নাকি নিজের জীবনে মেনে চলেননি। আমরা যারা স্বামীজীকে দেশের নানান সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করার চেষ্টায় নিরন্তর ছটফট করতে দেখেছি, জানি এসব অভিযোগ কতখানি মিথ্যা। স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুর পীড়ন ও অবিচার দেখে যাঁর বীর হৃদয় থেকে-থেকেই গর্জে উঠতো, তিনিই শতেক শৃঙ্খলে আবদ্ধ অসহায় নারীদের পায়ে আর একটি নতুন বেড়ি পরাবেন—এ কথা কি স্বপ্নেও মনে ঠাঁই দেওয়া যায়? 'যাঁর হৃদয় ছিল মাখনের মতো নরম', পদদলিত মানুষের প্রতি ভালবাসায় যিনি প্রায় উন্মাদ ছিলেন, বদ্ধজীবদের মুক্ত করাই যাঁর জীবনব্রত ছিল, প্রেমের সেই ঘনীভূত মূর্তিকে পরম পরিত্রাতা না ভেবে মানুষ যে কি করে অন্য কিছু ভাবতে পারে জানি না!

কিন্তু অভিযোগ এবং মিথ্যা অপবাদ সত্ত্বেও সংস্কার আন্দোলন এবং সংস্কারকের প্রতি স্বামীজীর তেমন আস্থা ছিল না। তা থাকার কথাও নয়।

কারণ সংস্কারের দ্বারা অনেক দোষ-ত্রুটি, অনেক অবাঞ্ছিত সমস্যা নির্মূল করা যায় বটে, কিন্তু তার জন্য খেসারতও কম দিতে হয় না। বহু মূল্যবান সুন্দর জিনিস এর ফলে বিনষ্ট হয়, দাগ রেখে যায় এক কদর্য শূন্যতার। স্বামীজী ধ্বংসের পূজারী ছিলেন না বলেই সংস্কারকদের সুরে সুর মেলাতে চান নি। তিনি চাইতেন পরিবর্তন আসুক, কিন্তু দেশের মানুষের আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়ে নয়। শুধুমাত্র দেশাচার এবং প্রাচীন রীতিনীতিগুলিকে ধিক্কার দিলেই কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হবে না, এই ছিল তাঁর মত। আমরা ভেবে অবাক হই, স্বামীজীর সময়কার বহু মানুষের মনে এই রকম একটা বিকৃত চিন্তা কি করে ঠাঁই পেল যে তাঁদের দেশের যা কিছু সবই দোষের, আর পাশ্চাত্যের সবকিছুই নিখাদ ভালো? তাঁরা কিসের দ্বারা সম্মোহিত হয়েছিলেন, কে জানে? তবে এ কথা কি তাঁদের মনে একবারও উদিত হয়নি যে ভারতবর্ষের সব কিছুই যদি খারাপ হবে তো এ দেশটা এতকাল বেঁচে রইলো কি করে? আদত কথা এই, ভারতের কিছু দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু তার হৃদয়টি সুস্থ। আর ধরতে গেলে, দোষত্রুটি কোথায় নেই? পাশ্চাত্যের সবই কি নির্দোষ? নির্ভুল? ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীজী পায়চারি করতেন আর ভারতবর্ষের সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করতেন।

মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভাবটিকে কোনও ক্ষেত্রেই নষ্ট করা উচিত নয়। বর্তমান ভারত সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্বামীজী বলতেন—একটা আপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে দশটা বিপদ ডেকে আনা কি ঠিক? প্রাচীন ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহও ছিল না, পর্দা প্রথাও ছিল না। এখনও যে ভারতের সর্বত্র তাদের চল আছে, তাও নয়। কতকগুলি প্রদেশে, যেগুলি এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল সেখানেই ঐ প্রথা দুটি বিশেষভাবে চালু আছে। কিন্তু যদি একটু তলিয়ে দেখি তাহলে দেখবো পর্দাপ্রথা জাতির পবিত্রতার আদর্শটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। মেয়েরাই যে শুধু পবিত্র জীবন যাপন করবে তা নয়, পুরুষদেরও পবিত্র হওয়া অবশ্যকর্তব্য। বিবাহিতা নারী যেমন পরপুরুষের দিকে অশুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে না, তেমনি বেআব্রু হয়ে সে পুরুষকে প্রলুব্ধও করবে না।

কোনও মানুষ যে তার দেশের রীতিনীতি বা অতীতকে সম্পূর্ণভাবে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে—এটা স্বামীজীর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতো। কিন্তু তার অর্থ এই নয় তিনি সমাজের দোষ-ত্রুটির অন্ধ অনুরাগী ছিলেন। এক এক সময়

তিনি বলতেন ঃ 'এ দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। তার জন্যই কি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এমন নেতিবাচক হয়ে পড়েছে? কিন্তু এর প্রতিকার কি?'

বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে স্বামীজী বিশেষ কিছুই বলতেন না কারণ ওগুলি সর্বজনবিদিত। তিনি এ কথাও বলেননি যে সেগুলির অবসান চাই, এটাই ছিল তাঁর রীতি। যে জিনিসটা জলবৎ স্বচ্ছ সে সম্বন্ধে তিনি কখনও উচ্চবাচ্য করতেন না। বাল্যবিবাহের রীতি মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, তাকে দুর্বল করেছে, নানাদিক দিয়েই তার অশুভ পরিণতি মানুষকে বিড়ম্বিত করেছে। স্বামীজী সে কথা জানতেন। তবুও তিনি তড়িঘড়ি কিছু করতে চাননি এই কারণে, তাতে হিতের চাইতে অহিতই বেশি হতো। স্বামীজী অনন্যসাধারণ মনের অধিকারী ছিলেন, এ কথা আমরা সবাই জানি। তা যদি হয়, তাহলে কখনও তাঁর কাছ থেকে গতানুগতিক সমাধান আমরা আশা করতে পারি না। পারি কি?

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে জেনেছিলাম বাল্যবিবাহের বিষয়টি স্বামীজীকে অমন গভীরভাবে কেন নাড়া দিত। হয়তো বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা চিন্তাভাবনার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতেন ঃ 'আরে বাপু, অর্থনৈতিক চাপ আসলেই সব আপনা থেকেই বদলে যাবে। তার সঙ্গে যদি শিক্ষা যুক্ত হয় তো কথাই নেই। শিক্ষা! মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা চাই-ই চাই! কিন্তু যে ধরনের শিক্ষা এখন তারা পাচ্ছে, সে রকম শিক্ষা নয়। ঈশ্বর না করুন, ঐ শিক্ষা পেলে দেশটা আরো উচ্ছন্নে যাবে।'

(প্রবুদ্ধ ভারত, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯৪৫)

কানহেরী

সহস্রদ্বীপোদ্যানে থাকতেই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করে ফেলেছিলেন। এই কর্মসূচীর মধ্যে যেমন তাঁর ভারতীয় শিষ্যদের জন্য চিন্তাভাবনা ছিল, তেমনি ছিল আমেরিকান ভক্তমণ্ডলীর জন্য সুনির্দিষ্ট কাজের পরিকল্পনা, বিশেষ করে তাঁদের জন্য যাঁরা কোনও-না-কোনও দিন ভারতবর্ষে যাবার কথা ভাবছিলেন। সেই সময় অবশ্য পরিকল্পনাগুলি আমাদের কাছে দিবাস্বপ্নই মনে হয়েছিল। একদিন স্বামীজী বললেন ঃ 'ভারতে গিয়ে আমরা একটা চমৎকার জায়গায় থাকবো, বুঝলে?—একটা দ্বীপ, তার তিনদিকে সমুদ্র! যেখানে ছোটছোট গুহা। এক একটি গুহায় দুজন করে থাকতে পারবে। দুটি গুহার মাঝে একটি করে জলাধার—তাতে স্নান করা যাবে। পাইপে করে প্রতিটি

গুহায় পানীয় জল পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে কারুকার্যমণ্ডিত বহু স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিশাল হল থাকবে, আর থাকবে একটি সুবিস্তীর্ণ চৈত্যহল যেখানে পূজার্চনাদি হবে। ওহ্, দারুণ ব্যাপার হবে না?'

স্বামীজীর কথা শুনে মনে হয়েছিল তিনি বোধহয় আকাশকুসুম রচনা করছেন। বাস্তবিক, আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকম একটা ব্যাপার কখনও সম্ভব হতে পারে।

আমাদের সহস্রদ্বীপোদ্যানের ঐ ছোট দলটির মধ্যে একমাত্র আমারই কয়েক বছরের ভিতর ভারতে আসার সৌভাগ্য হলো, এ দেশে দু-তিন বছর থাকার পর একবার আমি একলা বম্বেতে আছি। হাতে দু-তিন দিন সময়; বেশ কিছুকাল ধরেই কানহেরী-তে[১] যাওয়ার একটা ইচ্ছা আমায় পেয়ে বসেছিল। জানতাম কানহেরী বোম্বাই থেকে খুব বেশি দূরে নয়। জায়গাটা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুধু এইটুকু জানা ছিল ওখানে কতকগুলো গুহা আছে যার মধ্যে একটি 'চৈত্যহল' বা বৌদ্ধদের মন্দির যেটিকে Fergusson তাঁর 'History of Indian and Eastern Architecture নামক গ্রন্থে কার্লির চৈত্যটির অক্ষম অনুকরণ বলে বর্ণনা করেছেন। সত্যিই, ভেবে দেখতে গেলে জায়গাটির তেমন কোনও আকর্ষণই ছিল না। কিন্তু তবুও কানহেরী আমাকে এতটাই টানতে লাগলো যে নিজেই অবাক হলুম। আশ্চর্য! বোম্বাই-এর কাছাকাছি কতই তো গুহা রয়েছে। সেগুলি মনে ধরলো না, দেখবার বিশেষ ইচ্ছেও হলো না। মন থেকে-থেকেই কানহেরী, কানহেরী করতে লাগলো।

একে-ওকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, কিন্তু কেউই কানহেরীর হদিশ দিতে পারলো না। ঐ নামটাই কেউ শোনেনি! অবাক কাণ্ড! শেষে সারাদিন খোঁজখবর করার পর একজন বললেন ঃ 'আমার মনে হয়, আগামী কাল সকাল সাতটার ট্রেনে আপনি যদি "বরিভালি" যান, সেখানে কেউ না কেউ আপনাকে কানহেরী যাবার পথ বলে দেবে।'

---

১ মহারাষ্ট্র সরকারের সর্বশেষ নথিপত্র অনুযায়ী কানহেরী গুহাগুলি বম্বে থেকে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সংখ্যায় একশোর বেশি এই গুহাগুলি পশ্চিম ভারতের বৃহত্তম বৌদ্ধ গুম্ফাগুলির অন্যতম। এখানকার প্রথম দিককার গুম্ফাগুলি হীনযান-পর্বের বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। গোলাকৃতি পাথর কেটে করা। দ্বিতীয় থেকে নবম খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গুম্ফাগুলি তৈরি হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গুম্ফাটি সুবিশাল স্তম্ভ, ভাস্কর্য এবং স্তূপের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় গুম্ফাটি 'চৈত্যহল' বলে পরিচিত। দশম গুম্ফাটি দেখে মনে হয় সেটিই এক সময় Assembly Hall রূপে ব্যবহৃত হতো। ছাপ্পান্ন নম্বর গুম্ফাটির ভিতর থেকে আরব সাগরের দৃশ্য অতি চমৎকার। আজ পর্যন্ত গুম্ফাগুলি চারপাশের জঙ্গলে ঢাকা।

পরের দিন ট্রেনে চাপলাম। দেখলাম বোম্বাই থেকে বরিভালি মাত্র বাইশ মাইল। তখন আমি হিন্দি জানতাম না। শুধু 'Cave' মানে যে 'গুহা' সেটা জানতাম। ঐ গুহাসম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বল করেই বরিভালি স্টেশনে নামলাম। দেখি স্টেশনের বাইরে তিনটে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। তিনটের মধ্যে একটি গাড়োয়ানকেই আমার পছন্দ হলো। বছর সতেরো বয়স। চোখমুখ বেশ সপ্রতিভ। তার কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'গুহা, গুহা!' সে মাথা নাড়ল। বুঝলাম না সে আমার কথা বুঝলো কি না! তাই আবার বললাম ঃ 'গুহা, গুহা!' সেও মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। ভারী বিপদ তো! কি করি? তখন মাথায় একটা সুবুদ্ধি এল। বলে উঠলাম ঃ 'কানহেরী, কানহেরী।' এইবার কাজ হলো। সে ঘাড় নেড়ে বোঝাল কানহেরী যেতে সে রাজি। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'কিত্‌না?' সঙ্গে সঙ্গে সে তিনটে আঙুল দেখিয়ে বলল ঃ 'তিন রুপিয়া।'

আমি তখন খুশিতে ডগমগ। তাড়াতাড়ি তার গাড়িতে উঠলাম। সেও গাড়ি ছেড়ে দিল। ফসলকাটা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গাড়ি ক্যাঁচ কোঁচ করে চলতে লাগলো। বেশ কিছুটা ঐভাবে যাওয়ার পর গাড়ি একটা জঙ্গলে ঢুকলো। গাড়িও চলছে আর ওদিকে জঙ্গলও গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। চতুর্দিক বেশ অন্ধকার। হঠাৎ চোখে পড়লো বড় বড় গাছের পিছনে তীরধনুক হাতে আদিবাসী মানুষ। আমাদের দেখছে।

পথ ক্রমে একেবারে সরু হয়ে এল। বোঝা গেলো আমরা পথের শেষে পৌঁছেছি। গাড়োয়ানভাই গাড়ি থামিয়ে এবার যা বললে তাতে আমি হকচকিয়ে গেলাম। সে বললো ঃ 'এখান থেকে আপনাকে একলাই যেতে হবে।' বললাম, 'সে কি ! আমি তো এখানকার পথঘাট কিছুই চিনি না। একলা যাব কি করে? তোমাকেও ভাই আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

দুজনে কেউ কারও ভাষা বুঝি না। কিন্তু তবুও আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাব বুঝতে পারছিলাম। কেমন করে যে এটা সম্ভব হলো জানি না। সে যা হোক, আমার সঙ্গে যেতে/হবে বলায় গাড়োয়ান বললো ঃ 'বলদগুলোকে এভাবে একলা ফেলে আমি যেতে পারবো না।' বললাম—কেন? বলদদুটিকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চল। তখনও বুঝিনি জঙ্গলে বাঘ আছে, আর সেই হেতুই ও বলদদুটিকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। যা হোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত সে আমার সঙ্গে গেল।

একটুখানি যেতেই আমরা এক ছোট্ট নদীর ধারে এসে পড়লাম। পাহাড়ী

নদী। তখন প্রায় শুকনো। নদীর ওধারে একটা ছোট পাহাড় উঠে গেছে। আমরা ধাপকাটা সিঁড়ি দিয়ে একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম। আহা, সেখান থেকে চারপাশের শোভা যে কী মনোহর তা লিখে বোঝানো যায় না। নীলাঙ্গুরীয়-সদৃশ ত্রিধা পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি। জলের প্রান্ত ছুঁয়ে বনানীর ছায়া। পাথর কুঁদে করা বসার আসন। ভাস্কর্যশোভিত একটি সুবিশাল হলো। স্বামীজী যেমন-যেমন বলেছিলেন এখানে দেখছি সবই আছে—সমুদ্র-পরিবেষ্টিত দ্বীপখানি, অ্যাসেম্বলিহল, কার্লির অনুকরণে চৈত্যহল, দুখানি পাথরের শয্যাবিশিষ্ট ছোট ছোট ঘর, দুটি ঘরের মাঝে একটি করে জলাধার, এমনকি জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার নলটি পর্যন্ত! বহুদিন আগে দেখা একটি স্বপ্ন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে যেন আজ আমার সামনে সত্য হয়ে উঠলো।

স্থানটি একেবারে নির্জন, পরিত্যক্ত। একজন চৌকিদারও নেই। আমেরিকায় বসে স্বামীজীর কথা শুনে যা রূপকথার গল্প বলে মনে হয়েছিল, আজ দেখছি তা শরীরী হয়ে উঠেছে। সব দেখেশুনে আমি তো একেবারে অভিভূত! তাই সেই রাতেই যখন স্বপ্ন দেখলাম, বহুদিন আগে যেসব বৌদ্ধ তাপস সেখানে বাস করতেন, তাঁদেরই সঙ্গে দরবার হলে বসে আছি, তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। সকলকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, বিশেষ করে তাঁকে, যিনি অন্তেবাসীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর কথা আমি বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম এবং শুনে মনে হচ্ছিল ঐ শিক্ষার সাথে যেন আমি খুবই পরিচিত, যদিও আমার পাওয়া উপদেশাবলীর সঙ্গে বাহ্যত ঐ শিক্ষার কিছু পার্থক্য আছে। শুধু পরের দিনই নয়, বেশ কিছুদিন ঐ স্বপ্নের রেশ ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ স্বপ্নের কথা আমি কোনওদিন ভুলতে পারবো না। অবশ্য দুঃখের বিষয় সেদিন স্বপ্নের মধ্যে যে কথাগুলি শুনেছিলাম, জেগে উঠে তা আর ঠিকমতো মনে করতে পারিনি।

কলকাতায় ফিরে স্বামী সদানন্দকে আমার ঐ অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলাম। এও বললাম, সহস্রদ্বীপোদ্যানে থাকার সময়ই স্বামীজী আমাদের ঐ জায়গাটির কথা বলেছিলেন। আমার কথা শুনে সদানন্দজী বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজী যখন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে পশ্চিম ভারতে, তখনই তিনি ঐ সুপ্রাচীন গুম্ফাগুলি দেখেছিলেন। স্থানটি তাঁকে দারুণ অনুপ্রাণিত করে। সম্ভবত স্থানটি দেখে তাঁর কোনও এক পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে ওঠে, মনে পড়ে যায় তিনি সেখানে ছিলেন। স্বামীজী যখন গুম্ফাগুলি দেখেন

তখন জায়গাটার নাম পর্যন্ত কেউ জানত না। ভুলে গিয়েছিল আর কি! স্বামীজীর আশা ছিল ভবিষ্যতে ঐ জায়গাটিতে একটি কেন্দ্র গড়ে তুলে তাঁর কর্মের পরিকল্পনাটিকে রূপায়িত করবেন। পরে আমি যখন পশ্চিম ভারতে যাই তখন গুম্ফাগুলি আমারও নজরে পড়ে। আর এই এখন তুমি দেখলে। অতীতে আমরা সকলেই ওখানে ছিলাম আর কি!'

পরবর্তী কালে স্বামীজী যখন জায়গাটা নিতে পারতেন তখন তা সরকারের হাতে চলে গিয়েছে। বর্তমানে একজন কর্মচারী স্থানটির দেখাশোনা করেন। একটা নতুন রাস্তাও হয়েছে। বনজঙ্গলও এখন আর আগের মতো নেই। সেখানে অনেকেই এখন পিকনিক করতে যায়।

কানহেরী জায়গাটা সলসেট দ্বীপে। বোম্বাই থেকে দূরত্ব প্রায় বিশ মাইল। একটা ছোট নদী মূল ভূখণ্ড থেকে কানহেরীকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আর তিনদিক থেকে সমুদ্র তাকে ঘিরে রেখেছে। যিশু খ্রীস্টের জন্মের সময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই দ্বীপে থাকতেন। শোনা যায় মহামতি বুদ্ধঘোষ নাকি চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে চৈত্যহলটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। হলের প্রবেশপথে এই মর্মে একটি লিপিও উৎকীর্ণ আছে। অনুমান করা হয়, বুদ্ধঘোষের সময় এটি বৌদ্ধ ধর্মচর্চার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধঘোষ পরে কানহেরী থেকে সিংহলে যান। সেখান থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বার্মায়। সে যুগের তিনি একজন বড় প্রচারক ছিলেন। বাগ্মী হিসাবেও তাঁর অসাধারণ খ্যাতি ছিল। আজকের দিনে 'মহামার্গ' বলে যা পরিচিত, সেটি তাঁরই অবদান।

ডেট্রয়েটে স্বামীজী—১৮৯৬

স্বামী বিবেকানন্দ আরও একবার ডেট্রয়েট শহরে এসেছিলেন (জুলাই, ১৯০০)। সেবার অবশ্য কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। বিদায় নেবার আগে পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

ডেট্রয়েটে রওনা হওয়ার আগে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো—স্বামীজী, আপনি তো যাচ্ছেন; সেখানে কি বলবেন তা কিছু ঠিক করেছেন? তার উত্তরে তিনি যেন বলতে চাইলেন, নাহ্, ঠিক আর কি করবো?

কথাটা এক অর্থে ঠিক, কারণ অধিকাংশ বক্তৃতার আগেই তিনি কোনও প্রস্তুতি নিতেন না। অবশ্য তার মানে এই নয় তিনি 'তৈরি না হয়েই' বক্তৃতা

দিতে যেতেন। স্বামীজী আমাদের বলেছিলেন কোথাও বক্তৃতা করার থাকলে সাধারণত তার আগেই তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন। সেই স্বর বক্তব্য বিষয় সব বলে যেত। পরের দিন বক্তৃতামঞ্চে উঠে স্বামীজী আগের দিন যা শুনেছেন সব গড়গড় করে বলে যেতেন। কণ্ঠস্বরটি যে কার, সে কথা স্বামীজী কোনওদিন খুলে বলেননি। যাঁরই হোক, সেই স্বরের মাধ্যমে এক অপরিমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি যে নিজেকে অভিব্যক্ত করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং সেই শক্তি, যা স্বামীজীর ক্ষমতার চাইতেও অনেক বেশি, তাঁর সুগভীর একাগ্রতা দ্বারা পরিবাহিত হয়ে সকলের কাছে, হয়তো সকলের অজান্তেই উন্মোচিত হয়েছিল। স্বামীজীর প্রতিটি কথার ভিতর থেকে যে কী তেজ, কী শক্তি, কী মহিমা ক্ষরিত হতো তা কোনও শব্দের মাধ্যমে বোঝানো যাবে না। সেই প্রচণ্ড শক্তিতরঙ্গ যখন শ্রোতাদের ওপর আছড়ে পড়তো, তখন তাঁদের কি অবস্থা হতো তা সহজেই অনুমেয়। তাঁদের পুরাতন ভাব-ভাবনা, মূল্যবোধ, এমনকি ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত সব খড়কুটোর মতো কোথায় ভেসে যেত! সেই শক্তি সমগ্র দুনিয়াটাকেই এক তাল কাদায় পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তা এক-আধটা মানুষের কী কথা! এমন এক দুর্নিবার শক্তি যে, সামনে যা পড়বে, তাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে! সেই শক্তির সান্নিধ্যে এলে মানুষের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের উদ্দেশ্য সবই পাল্টে যেত। পুরাতন প্রবণতাগুলি নতুন খাতে বইতে শুরু করতো। ধীরে ধীরে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে যেত।

স্বামীজীর অন্তস্তল থেকে যে শক্তি বিচ্ছুরিত হতো, সেটা কি? কি সেই শক্তি যা সকলেই অনুভব করেছে, কিন্তু কেউই ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি? তাকে কি 'ওজস্' বলা চলে? স্বামীজী প্রায় এই 'ওজস্'-এর কথা বলতেন। দৈহিক শক্তি ও তেজকে সুসংহত করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে এই অতীন্দ্রিয় শক্তির উদয় হয়। এই শক্তি লাভ করলে মানুষ জগতটাকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে। তখন তার প্রত্যেক কথার ভিতরেই বজ্রের শক্তি নিহিত থাকে। এ শক্তি যাঁর হয় তিনি হয়তো সামান্য দুটি-একটি কথা বললেন; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তি, তার অনুরণন অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। অথচ অপরজন যত সুবক্তাই হন না কেন, তাঁর কথায় কিন্তু এই জোর, এই তেজ, এই শক্তি থাকে না। স্বামীজী বলতেন—এই কারণেই যিশুর সমসাময়িক সব পণ্ডিতের কথাই লোকে ভুলে গেছে, কিন্তু দু-হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও সহজভাবে বলা তাঁর দুটি একটি কথা আজও জগৎকে অনুপ্রাণিত করছে, শক্তি জোগাচ্ছে।

লেখার মধ্যে বলা-কথার শক্তি অনেকটাই হারিয়ে যায়। স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা আমার এ কথা বুঝবেন। তবুও বলি—বক্তৃতা দেবার সময় স্বামীজীর ভিতর থেকে এমন এক সুতীব্র আধ্যাত্মিক শক্তি স্ফুরিত হতো যার প্রভাবে শ্রোতাদের কারও কারও মন সাধারণ চেতনার স্তর ছাড়িয়ে অতি উচ্চভূমিতে উঠে যেত, যার ফলে বক্তৃতার শুরুটা ছাড়া তাঁরা আর কিছুই মনে রাখতে পারতেন না। তাঁর কথা কিছুটা শোনার পরই মনটা যেন কেমন ফাঁকা হয়ে যেত। কারণ মনের স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি তখন বন্ধ হয়ে গেছে। যুক্তি ও স্মৃতির বদলে সেখানে তখন বিরাজ করতো এক ঊর্ধ্বতন চেতনার দীপ্তি। হয়তো অনেক পরে উপলব্ধি করা যেত নিরালম্ব মনে কখন যেন তাঁর বাণী এক গভীর ছায়া ফেলে গেছে।

বক্তা হিসাবে তিনি আমেরিকায় এতো জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে তাঁর উপযুক্ত বিশাল বক্তৃতামঞ্চ খুঁজে বার করাই খুব মুশকিল হতো। যত বড় হলই হোক না কেন, তাতেও সব লোক আঁটতো না। ফলে অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরতে হতো। স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েট এলেন, তখন যাঁর ওপর বক্তৃতার হল ভাড়া করার দায়িত্ব পড়েছিল সেই ব্যক্তিই কবুল করেছিলেন—এত লোক একসঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে চান যে সে রকম বড়সড় হল আমি একটাও পেলাম না। 'সার্কাসের তাঁবুতে যত লোক আঁটে, সে রকম হল আর কোথায় পাওয়া যাবে!'

পরপর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার পর স্বামীজীর বন্ধু র‍্যাবি গ্রস্‌মান 'টেম্পল বেথেল'-এ স্বামীজীকে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ জানান। এটা স্বামীজীর ডেট্রয়েট ছাড়ার ঠিক আগের রবিবারের ঘটনা। নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগেই মন্দিরটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। এত জনসমাগম হয়েছিল যে মন্দিরের দরজাগুলি বন্ধ করে দিতে হলো। শতশত লোককে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাছোড়বান্দা বহু লোক বাইরে থেকে দরজা ধাক্কাতে লাগলো। তাদের দাবি—স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে দিতে হবে। ঠিক বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার আগে হৈ-হট্টগোল এমন চরমে উঠলো যে সকলে ভাবলেন এইবার বুঝি উন্মত্ত জনতা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য! সেসব কিছুই হলো না। স্বামীজী মঞ্চে প্রবেশ করা মাত্রই সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। শ্রোতারাও স্থানুবৎ! একজন বিদেশী স্বামীজীর দর্শনে এতোই মুগ্ধ যে তিনি আর থাকতে পারলেন না, ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে উঠলেন ঃ 'ওহ্‌, কী সুন্দর, তাই না?' কথাটি তিনি

মিথ্যে বলেননি। কারণ এমন অমর্ত্য সৌন্দর্য মানুষের হয় না। বোধহয় আর কখনও হয়নি। তবে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—তাঁর শক্তির বাহ্যিক প্রকাশটা যেন একটু কম। শক্তির ভাবটা একটু চাপা পড়ে তা যেন দেবদ্যুতিতে পরিণত হয়েছে। যে জগৎকে বিদায় জানাবার লগ্ন তাঁর আসন্ন, সেই জগতের সকলের প্রতি ঘনীভূত করুণায় তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডলখানি জ্বলজ্বল করছে। ঠিক ভারতীয়দের আঁকা কোনও দেবতার ছবির মতো। আলখাল্লা ও উষ্ণীষ যেন গাঢ় সূর্যের আলো দিয়ে তৈরি, সোনার বরণ গায়ের রং, স্বর্গীয় জ্যোতিতে মুখখানি উদ্ভাসিত এবং অন্তরে যেন দিঘির জলের প্রশান্তি বিরাজ করছে।

স্বামীজী এবার বলা শুরু করলেন। জীবনের পরম সত্যগুলি এমন অপূর্ব কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন যে নিমেষে তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর কণ্ঠস্বর এবং তাঁর বাণী একাকার হয়ে গিয়ে যেন এক অনুপম ছবিকে সম্পূর্ণ করে তুললো। সকলেই স্থির হয়ে সেই ধ্বনিময়, গতিময় চিত্রপটটি নিরীক্ষণ করতে করতে ধ্যানের কোন্ গভীরতার মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেললেন তা বোধকরি তাঁরা নিজেরাও জানেন না।

শ্রীগুরু

স্বামীজী আমেরিকায় কেবল বেদান্তই প্রচার করেছেন। তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলেননি বললেই চলে। ফলে, সত্য সত্যই দক্ষিণেশ্বরের সরল ব্রাহ্মণ বিবেকানন্দের জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছেন, এ নিয়ে কারো মনে কোনও সংশয় না থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর এমনই একটা ভাব ছিল যে, যাঁরা তাঁর গুরুদেবের কথা শোনার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব, তাঁদের সামনেও তিনি ঐ বিষয়ে মুখ খুলতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্বামীজীর ঐ শ্রদ্ধামিশ্রিত সসঙ্কোচ ব্যবহার থেকেই আমরা প্রথম আঁচ করতে পেরেছিলাম 'গুরু' শব্দের তাৎপর্য কি। পরে তাঁর মুখ থেকে জেনেছি গুরু সম্পর্কে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি এবং ভারতীয় ধর্মজগতের মহাপুরুষরা কিভাবে যুগ যুগ ধরে সেই গুরু-শিষ্য পরম্পরাটিকে পুষ্ট করেছেন। গুরুকে স্বামীজী নানাভাবে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন বলেই আমাদের কাছে তাঁর গুরুনিষ্ঠা এবং ভক্তি বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয়েছিল। আমরা তাঁর জীবনের এই ঘটনাবলী থেকে এক প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলাম যা আমাদের অনুভূতি

এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেও একই রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। ফলে আমাদের গুরুদেবের সঙ্গেও আমাদের অনুরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অতুলনীয় সম্পর্ক আমাদের সামনে গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক অত্যুচ্চ আদর্শ তুলে ধরেছে।

স্বামীজীর কাছ থেকে ঐ সময় আমরা যে সমস্ত কথা শুনেছিলাম তা আমাদের কতটা নতুন মনে হয়েছিল? এর উত্তরে বলতে হয়—প্রথম যে চিন্তাটি আমাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তা হলো গুরুকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানই গুরুর যোগ্যতার সবচাইতে বড় মাপকাঠি। কারণ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষই অন্যের মধ্যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চার করতে পারেন। গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি যে শিষ্যে যায়, এই ধারণাটিই পাশ্চাত্যের প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কারসম্পন্ন মানুষকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেছিল। তারা এ সত্য জানতই না যে অধ্যাত্মচেতনা আর পাঁচটা জিনিসের মতো অন্যকে দেওয়া যায়। এ কথা জানার পর তাদের মনে হলো, তাহলে তো 'Apostolic Succession' বা ক্যাথলিক খ্রীস্টান ধর্মগুরুদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতিটি অমূলক নয়; এই কারণেই রোমের চার্চ আজও বিশ্বাস করে পিটার-এর আধ্যাত্মিক শক্তি এক পোপ থেকে আর এক পোপে প্রবিষ্ট হয়। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের মানুষ আজও বিশ্বাস করে, অথবা সঠিক বলতে গেলে, তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে গুরু শিষ্যের মধ্যে তাঁর সাধনালব্ধ শক্তি সঞ্চার করতে পারেন।

আর একটা কথা আমরা নতুন শুনলাম। তা এই—'প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি নিজস্ব সাধন পথ আছে; গুরু সেটি জানেন।' শিষ্যের সংস্কার বুঝে গুরু বলে দেন তার পক্ষে ভক্তি, যোগ, জ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম, এর মধ্যে কোন্‌টি অধিক ফলপ্রদ। সব পথ দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছান যায়, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ একটি হয়তো শিষ্যের পক্ষে সুগম হবে। গুরু সেটি জানেন এবং শিষ্যকে তিনি সেইভাবে পথ দেখিয়ে স্নেহময়ী জননীর মতো বলে দেন—দেখ বাবা, পথে কিন্তু এই-এই বিপদ আসতে পারে বা সাধন করতে করতে তোমার এই-এই অভিজ্ঞতা হতে পারে; কিন্তু তাতে যেন ভয় পেয়ো না, হতাশ হয়ো না।

গুরু যেন জ্ঞানের দরজা আগলে বসে থাকেন। শিষ্যকে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে নয়, তার অমূলক ভয় দূর করার জন্যই স্বেচ্ছায় তাঁর প্রহরী সাজা। শিষ্য গুরুর কাছে সাহস পাবার জন্য যায়, গিয়ে তার মনের কথা, তার নানান অনুভূতির কথা সব খুলে বলে। ওসব কথা সে আর কাউকে বলতে পারে না,

কারণ তা বলা বারণ। তার মন্ত্র, তার ইষ্ট, তার অনুভূতি, স্বামীজীর ভাষায়, শুধু 'গোপনীয়ই নয়, অতি পবিত্রও।'

গুরুর প্রতি শিষ্যের আন্তরিক ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকা চাই। সেখানে এতটুকু ফাঁক থাকলে চলবে না। একবার স্বামীজী প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 'তোমাকে যদি এক্ষুনি জানলার বাইরে ঝাঁপ দিতে বলি, পারবে?' আসলে স্বামীজী এমন কতকগুলি শিষ্য চেয়েছিলেন, যাদের ঐ রকম একরোখা ভক্তি থাকবে। কারণ ভক্তির ঐ রকম দৃঢ়তা না থাকলে তাঁর কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের গুরু নানকের (গোবিন্দ সিং) একটি গল্প বারবার শোনাতেন। গল্পটি এই ঃ একদিন শিখগুরু তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন—তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমাকে আমৃত্যু বিশ্বাস করতে পারে? এ কথা শুনে একজন শিষ্য এগিয়ে গেলেন। নানকজী (গোবিন্দ সিং) তাঁকে নিয়ে তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। কয়েক মিনিট বাদেই তিনি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে কোষমুক্ত তরোয়াল। তা থেকে টপ্‌টপ্ করে রক্ত ঝরছে। আবার তিনি শিষ্যদের সামনে ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন—তোমাদের মধ্যে এখনও এমন কে আছে যে আমাকে আমৃত্যু বিশ্বাস করবে? ঐ কথা শুনে আর একজন শিষ্য এগিয়ে গেলেন। এবং নানকজীর (গোবিন্দ সিংজীর) সাথে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলেন। কিন্তু প্রথম জনের মতো তিনিও আর ফিরলেন না। এইভাবে একের পর এক পাঁচজন যখন তাঁবুর ভিতরে গিয়ে আর ফিরলেন না, তখন গুরু নানক (গোবিন্দ সিং) তাঁর তাঁবু গোটাবার আদেশ দিলেন। তাঁবু খুলতেই দেখা গেল পাঁচ শিষ্যই অক্ষত রয়েছেন, কেবল একটা ছাগল পড়ে আছে—ধড় থেকে তার মাথাটা আলাদা। সবাই বুঝলো গুরুজী তাঁর তরবারি দিয়ে ঐ ছাগলটিকেই হত্যা করেছিলেন। ঐ রকম সাচ্চা, অকুতোভয় পাঁচ শিষ্য পেয়ে গুরু নানক (গোবিন্দ সিং) যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, তাতে কি বিস্ময়ের কিছু আছে?

স্বামীজী প্রায়ই বলতেন ঃ "গুরু যেমন উত্তম হবেন, তেমনি শিষ্যও চাই।"[১] আবার বলতেন ঃ "গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি করা চাই। কারণ তিনিই তোমাকে সংসার-সিন্ধু পার করাবেন। সর্ব অবস্থায় তাঁকে বিশ্বাস করবে। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'[২] বিশ্বাসের এইরকম আঁট চাই।"

---

১ 'আশ্চর্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।' কঠোপনিষদ্, ১/২/৭

২ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', 'গুরুভাব-পূর্বার্ধ, কলকাতা, উদ্বোধন, ১৩৬০, পৃষ্ঠা ১২৮ দ্রষ্টব্য।

স্বামীজী এই কথাগুলিও খুব বলতেন, যেমন ঃ 'সুষুন্নার (যোগীদের পথ) মধ্য দিয়ে যাঁরা যান, তাঁরাই কেবল আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন। জ্ঞানলাভ করতে হলে গুরুর কাছে যেতেই হবে। গুরু হচ্ছেন মাধ্যম; তাঁর ভেতর দিয়েই তোমার কাছে অধ্যাত্ম ভাব আসবে।'

স্বামীজী যত বড় মহাপুরুষই হন না কেন, তাঁর কাছে গেলে কেউই নিজেকে ছোট ভাবতে পারত না। কি এক অলৌকিক উপায়ে তিনি সকলের ভিতরেই এই ভাব জাগিয়ে দিতেন—তুমি সামান্য নও। তুমি বিরাট। তার কারণ কি এই—স্বামীজী সকলের ভিতর দোষত্রুটি নয়, দুর্বলতা নয়, শুধু মহৎ গুণগুলিই দেখার অভ্যাস করেছিলেন? সম্ভবত এর কারণ আরও গভীরে নিহিত। তিনি 'আত্মা', এই উপলব্ধি হবার পর স্বামীজী সর্বদাই সকলের মধ্যে সেই আত্মাকেই দেখতে চেষ্টা করেছেন। স্বামীজী অনুভব করেছিলেন ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি ওসব আপনিই খসে পড়বে, কিন্তু 'তৎ', অর্থাৎ সেই আত্মা, নিত্য জাজ্বল্যমান। আমরা নিজেদের যতটুকু চিনতাম, তাঁর চাইতে স্বামীজী আমাদের অনেক বেশি চিনতেন। তাই অহরহ তাঁর সত্য ঘোষণা এখনও কানে বাজে ঃ 'নিজেকে দুর্বল ভাবাই সবচেয়ে বড় পাপ। তোমার চেয়ে মহৎ আর কিছু নেই; তুমি যে ব্রহ্ম, এটা উপলব্ধি কর। তোমার শক্তিতেই সব শক্তিমান। সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ অথবা পৃথিবী—আমরা সকলের ঊর্ধ্বে।'

পঞ্চভূতের ফাঁদে

স্বামীজী ছটফট করতেন। এক দুরন্ত অস্থিরতা তাঁকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। সেটা লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলতেন ঃ 'উনি (স্বামীজী) বড় চঞ্চল, বড়ই চঞ্চল।' কিন্তু এই ছটফটানি নির্বোধের ছটফটানি নয়। যে নির্বোধ সে জানে না সে কি চায়, কার দ্বারা সে তাড়িত হচ্ছে। কিন্তু স্বামীজী খুব ভালমতোই জানতেন তাঁর প্রেরণার উৎসটি কি। যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর আচরণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। নিজের আত্মা সম্পর্কে, আপন দৈবী সত্তা সম্পর্কে তিনি নিত্য সচেতন ছিলেন। আর সচেতন ছিলেন বলেই দেহটা তাঁর কাছে হাড়মাসের খাঁচা, এক জঘন্য যন্ত্রণা, এক নিদারুণ বন্ধন বলে মনে হতো। বনের সিংহকে খাঁচায় পুরে রাখলেও সে কি অরণ্যের মুক্ত জীবনকে কখনও ভুলতে পারে? পারে না। সে তখন লৌহপিঞ্জরের মধ্যে অস্থিরভাবে শুধু পায়চারি করতে থাকে। কিন্তু মন পড়ে থাকে তার গহন অরণ্যে। স্বামীজীর অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। তাঁর মুক্ত স্বভাব

দেহের নিগড়ে বাঁধা পড়ে থেকে-থেকেই যেন হাহাকার করে উঠতো। হাঁসফাঁস করে উঠতো। মনে হতো এখনই যেন তিনি সমস্ত অবরোধ ভেঙ্গে পালিয়ে যাবেন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে পারেন—কেন? আমরা সকলেই তো এই বন্ধনে ধরা পড়েছি। কিন্তু আমাদের ঐ কথা, মুখের কথা। প্রাণের কথা নয়। কারণ আমরা কয়জন এই বন্ধন সম্বন্ধে প্রকৃত সচেতন? বোধহয় একজনও না। সব দেখেশুনে মনে হয় কয়েদখানা আমাদের বড় মধুর লাগে। বন্দিজীবন শেষ হয়ে যাবে ভাবতেই প্রাণে যেন শেল বেঁধে আমাদের।...

কিন্তু চোখের সামনে আমরা এমন একজনকে দেখেছি যিনি, দেহের বন্ধন যে এক বিড়ম্বনা বিশেষ, সে বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন, যিনি দেহের অতীত যে নিত্যমুক্ত সত্তা তাকে অনুভব করেছিলেন এবং সর্বদা দেহের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এবং এই মহৎ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেই আমাদের চোখ খুলে গেল। স্বামীজীকে মুখে আর কিছু বলতে হয়নি। আমরা বুঝতে পারলাম ঃ "ওঃ, তাহলে শাস্ত্র যে শিক্ষা দেন, 'আমি দেহ নই, মন নই,' তার তাৎপর্য তাহলে এই! 'আমি এই জোড়াতালি দেওয়া দুর্বল দেহ বা সসীম মন—দুয়ের কোনওটাই নই, কারণ আমিই সেই, সেই পরম ব্রহ্ম।"

স্বামী বিবেকান্দকে আবার দর্শন করি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে, বেলুড়ে। তখন তাঁর একেবারে অন্য রূপ। আমেরিকায় তাঁকে যেমনটি দেখেছিলাম, তার সাথে এই রূপের তফাৎ অনেকখানি। বেলুড়ে তাঁকে দেখে মনে হলো সিংহ যেন তার স্বাভাবিক পরিবেশে রয়েছে। এখানে তাঁর মানুষের তৈরি নিয়মকানুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার দায় নেই। প্রয়োজন নেই অষ্টপ্রহর লৌকিক শিষ্টাচারের মুখোশ এঁটে থাকার। এখানে দেখলাম তাঁর মধ্যে এক স্নিগ্ধ প্রশান্তি বিরাজ করছে যেটি বিদেশে সর্বদা চোখে পড়তো না। এখানে তিনি পরিচিতদের মধ্যে আছেন বলেই নিজের ভাবে থাকতে পারছেন, আত্মস্থ হয়ে থাকতে পারছেন। তাঁর ভাবের পরিধি যেন আগের চেয়ে এখন আরও বিস্তীর্ণ। এখন তিনি যেন তাঁর বৃহত্তম সত্তার মধ্যে সমাহিত। তাঁকে ঘিরে আছেন অল্পবয়সী ভক্ত এবং তাঁর গুরুভায়েরা, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সব সন্তান যাঁরা দীর্ঘ প্রব্রজ্যা শেষ করে আবার মঠে একত্র হয়েছেন।

স্বামীজীর কাজও যেন অনেকটা শেষ। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে তিনি তাঁর বাণীর অমোঘ বীজ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। কিছুটা জার্মানী এবং ফ্রান্সেও। কলম্বো থেকে আলমোড়ার পথেপথে শোনা গেছে তাঁর অক্লান্ত সিংহনাদ। তরুণ

ইংরেজ শিষ্য গুডউইন-এর সপ্রেম চেষ্টার ফলে তাঁর বাণী আজ সুরক্ষিত। আমেরিকায় বসে ভাগীরথীকূলে যে জমির স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তাও কেনা হয়েছে এবং কেবল তাই নয়, সেই জমির ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মন্দির এবং গুরুভাইদের থাকার জন্য একটি মঠও তৈরি হয়ে গেছে। তাছাড়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মশিক্ষার কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অনাথ আশ্রম—এগুলিও তাঁর নির্দেশে এক এক করে গড়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ ও বন্যাত্রাণের পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়েছে। এতোসব করেও তাঁর বয়স তখন উনচল্লিশ। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর মুক্তি আসন্ন। মুক্তি পেলেন ১৯০২-এর ৪ জুলাই।

স্বামীজী গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী বিশ্বাস করতেন যেখানে (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৪/৭-৮) ভগবান বলছেন ঃ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—অর্থাৎ, 'হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার আশ্রয় নিয়ে আমি নরদেহ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হই। যুগে যুগে আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সাধুদের পরিত্রাণ করা এবং দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন।'

বাস্তবিক, এটা দেখা গেছে যখনই আধ্যাত্মিক স্রোত স্তিমিত হয়ে পড়ে অথচ জগতে আধ্যাত্মিকতার খুব প্রয়োজন, তখনই ঈশ্বর মানুষের দেহ ধারণ করে আসেন। অবতারের অবতরণের সাথে সাথেই সমগ্র বিশ্বে অধ্যাত্মশক্তির এক প্রবল জোয়ার বয়ে যায়। সেই শক্তি যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলদায়ক, তাকে রক্ষা করে এবং যা কিছু দুষ্ট তাকে ধ্বংস করে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। অসংখ্য মানুষের মধ্যে ধর্মজীবন যাপন করার এক উন্মাদনা জেগে ওঠে। শুরু হয় এক নতুন জীবনপ্রবাহ। এই শক্তির প্রভাব শুধু যে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই অনুভব করা যায় তা নয়, চিন্তা এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রেও তা ফুটে ওঠে। চিন্তাভাবনার জগতে এর প্রকাশ হয় শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিক্ষার পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব হয় এবং তাঁরা খ্যাতির চরম শিখরে উঠেন। বৈষয়িক ক্ষেত্রে এই শক্তির প্রকাশ এতটা গভীর না হলেও তা সর্বব্যাপী ও স্পষ্ট। ঐহিক সমৃদ্ধি, স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং প্রবল জাতীয় চেতনার

মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট হয়। এক কথায়, জাতির জীবনে এক নবজাগরণ ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—এই শক্তি একাদিক্রমে ছ'শ বছর সক্রিয় থাকে। তারপর ক্রমশ সেই শক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। জগতও আবার তামসিকতায় ডুবে যায়। জমে ওঠে নানা আবিলতা। ক্রমে এমন একটা দুঃসময় আসে যখন নতুন এক ঐশী শক্তি বা অবতারের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে ওঠে। যদিও সব অবতার সমান শক্তিসম্পন্ন হন না, তবুও এ কথা সত্য প্রত্যেকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আধ্যাত্মিকতার পুনরুজ্জীবন ঘটে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। মোটকথা, অবতারেরা এসে দুনিয়াটাকে একটা নাড়া দিয়ে যান। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে ভারতবর্ষ পার্থিব ভোগসুখ তথা জাগতিকতার চোরাবালিতে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণরাই তখন সব সুযোগ সুবিধা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। শূদ্রের শাস্ত্রচর্চায় তখন কোনও অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণদের বিধান ছিল কোনও শূদ্র যদি শাস্ত্রীয় বচন শুনে ফেলে তবে তার কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়া হবে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন দেহবান ঈশ্বরের আবির্ভাব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এবং তখনই বুদ্ধের জন্ম।

বুদ্ধ যেন করুণার প্রতিমূর্তি! জ্ঞানের দুয়ার তিনি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি বলতেন : 'আমার স্বভাবে কৃপণতা নেই। যতটুকু জানি সব বলে দিয়ে গেলাম।' তিনি ব্রাহ্মণ, শূদ্র—কোনও বিচার করেননি, সৎ-অসৎ বিচার করেননি। তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। শাস্ত্রের চরম তত্ত্ব, জীবনের চরম সত্য তিনি সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিলিয়ে দিলেন।

বুদ্ধের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মরা নদীতে আবার যেন বান ডাকল। এক দুরন্ত দিব্যশক্তির উচ্ছ্বাসে ভারতভূমি যেন পুনঃপ্লাবিত হলো এবং হাজার হাজার মানুষ সেই অমিত শক্তিতরঙ্গে ভেসে গেল। বুদ্ধের প্রভাব জীবনের সর্বস্তরে স্পন্দিত হলেও ধর্মজীবনেই তার প্রকাশ সমধিক। তাঁর শিক্ষার গুণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভোগসুখের জীবন বর্জন করে ত্যাগ ও বৈরাগ্যময় জীবনকেই বেছে নিতে লাগল। রাজপুত্র ও ক্ষৌরকার, প্রভু এবং ভৃত্য একই সঙ্গে বুদ্ধের শরণ নিলেন। মায়িক উপাধি বর্জন করায় তখন সকলেই এক। তখন কেই বা রাজা, কেই বা প্রজা? সে এক অপূর্ব দৃশ্য! নাপিতের যদি আগে দীক্ষা হয়ে থাকে তবে রাজকুমারও নাপিতের পায়ের ধুলো নিতেন। এতটুকু কুণ্ঠিত হতেন না।

পালি শাস্ত্রে অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ আছে। একবার কয়েকজন শাক্যবংশীয় রাজকুমার ঠিক করেন সংসার ত্যাগ করে তাঁরা বুদ্ধের সঙ্ঘে যোগ দেবেন। সঙ্কল্পমতো তাঁরা গৃহত্যাগ করে পথে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের নাপিতও আছেন। ঠিক ছিল রাজপুত্রেরা সন্ন্যাস নিলে নাপিতটি তাঁদের বহুমূল্য পোশাক এবং অলঙ্কারাদি নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসবেন। কিন্তু বেশ কিছু পথ একসঙ্গে অতিক্রম করার পর নাপিতেরও ইচ্ছে হলো তিনিও সন্ন্যাস নেবেন। সে কথা তিনি রাজকুমারদেরও জানালেন। তাঁরা তো এ হেন সঙ্কল্পে খুব খুশি। নাপিতটিকে উৎসাহ দিয়ে তাঁরা বললেন—তাহলে আপনি এক কাজ করুন। আমাদের দীক্ষা নেওয়ার আগেই আপনি দীক্ষাটা নিয়ে ফেলুন। তাহলে আপনাকে বিধিপূর্বক প্রণাম করতে আমাদের আর কোনও অসুবিধা থাকবে না। এই উপাখ্যান থেকেই বোঝা যায় জাতপাতের বালাই সে সময় ঘুচে গিয়েছিল। কোনও জাতই বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারত না। একমাত্র যিনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শক্তিমান, মহৎ, তিনিই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচিত হতেন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও, পুনরুজ্জীবনের এই ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু অশোকের দুই বা তিনশত বছর পর থেকেই পতন শুরু হয় এবং সেই অবনতি চরমে ওঠে অষ্টম শতকে যেটি আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব কাল। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তখন এমনই বিকৃতি এসেছিল যে তার বিনাশ হয়ে উঠেছিল অবশ্যম্ভাবী।

এর ঠিক ছয়শো বছর পর নাজারেথের যিশু পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন। তাঁর জন্মভূমি তখন রোমানদের অধীন। তাদের অত্যাচারে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মানুষ তখন এমনই অসহায়, দুঃখকষ্টে এমনই জর্জরিত যে আকুল হয়ে তারা এক মহান পরিত্রাতার আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলো। কিন্তু পার্থিব মানুষ যেমন চায় অবতার কি তেমনভাবেই আসেন? কখনও না। ফলে সামান্য ছুতোরের ছেলে বলে ভগবান যিশুকে তারা 'অবজ্ঞা করল, ঘৃণা করল।' গুটিকয়েক সাধারণ মানুষ ছাড়া কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। কিন্তু সত্য সত্যই যিশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। অসীম শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীকে দারুণভাবে একটা নাড়া দিতে এসেছিলেন। তাই ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখতে পাই তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল পরই রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই ঘটনার ঠিক ছয়শো বছর পর আরবদেশে আর একজন অবতার পুরুষের জন্ম হয়। তিনি হজরত মহম্মদ। তিনি এসে তাঁর দেশবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের পথ দেখালেন। তাঁর আবির্ভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে ঐস্লামিক শক্তির উদয় হলো, যে শক্তি পরবর্তী কালে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এমনকি দক্ষিণ ইউরোপ এবং ভারতবর্ষেও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। দক্ষিণ ভারতে আচার্য শঙ্করের আবির্ভাবও এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিও 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন এবং ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই' অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সময়, অর্থাৎ অষ্টম শতকে বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত অবনমন ঘটেছিল। বহু অনধিকারী ব্যক্তি এই ধর্ম গ্রহণ করায় এতে বহুরকমের বিকৃত আচার ও সংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কালে এর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আচার্য শঙ্কর ভারতের মানুষের কাছে পুনরায় আত্মার বিশুদ্ধ অবিনাশী বাণী তুলে ধরলেন। ফলে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হলো এবং সনাতন আত্মজ্ঞানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারতবাসীর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

মধ্যযুগ বা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ'-এর পর ত্রয়োদশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে সৃষ্টিধর্মী যুগ হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঐ সময় সেন্ট ফ্রান্সিস্ অফ আসিসির আগমন। অধ্যাত্মভাবে পরিপূর্ণ বহু গীতি কবিতা রচনা করে সমগ্র মহাদেশটাকে তিনি একেবারে মাতিয়ে দেন। মানুষের মধ্যে ধর্মভাব প্রবল হয়ে ওঠে। সেই ভাবের বন্যায় হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের জীবন বরণ করে নেন। নতুন শক্তির উদ্বোধনের এই সন্ধিক্ষণে দান্তের জন্ম (১২৬৫-১৩২১) এবং ঠিক এক বছরের মাথায় গিয়োত্তো-র (১২৬৬-১৩৩৬)। এর পরপরই এলেন সাভোনারোলা (১৪৫২-১৪৯৮), মাইকেল্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), বেনেভেনুতো সেলিনি (১৫০০-১৫৭১), বার্নিনি (১৫৯৮-১৬৮০) এবং অন্যান্য রথী-মহারথীরা। আকাশে বাতাসে নবজাগৃতির আনন্দধ্বনি পরিব্যাপ্ত হলো।

এবার বিংশ শতাব্দীর চিত্রটা একটু দেখা যাক। কি দেখছি সেখানে? বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখা—ভাই ভাই-এর সঙ্গে লড়াই করছে। লক্ষ লক্ষ মানবসন্তান, তাদের মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট ও উন্নতচরিত্রের মানুষ আছেন, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছেন। সর্বত্রই হিংসা আর হানাহানি। ইউরোপের এক দেশ আরেকটি দেশের সাথে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যেও

সংঘর্ষ। এর সঙ্গে জুটেছে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ধর্মের অবক্ষয় এবং পার্থিব ভোগসুখের উদগ্র লালসা! পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ এমন এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন যে তার কোনও অস্তিত্ব থাকবে কি না সন্দেহ। এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে আজ একজন অবতারের একান্ত প্রয়োজন। এমন দুঃসময় বোধহয় মানুষের জীবনে আর কখনও আসেনি। কিন্তু বর্তমানের যে ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠছে তার থেকে কি আমরা ভবিষ্যতের কোনও ইঙ্গিত পাচ্ছি?

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই উনবিংশ শতাব্দীতে ছোট, বড় নানান জ্যোতিষ্ক বিশ্বের নানা প্রান্তে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের সাধ্যানুযায়ী মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নতুন আধ্যাত্মিক শক্তি ও আলোক বিকিরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে পারস্যের বাব (Bab) এবং বাহাউল্লা এবং ভারতবর্ষের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দই উজ্জ্বলতম। কিন্তু এই যুগের অবতার কে? এঁদের মধ্যে অবতারের আসনে আমরা কাকে বসাতে পারি? নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে ধ্রুবতারা কোনটি?

যাঁরা বাহাইপন্থী, তাঁরা বলবেন বাব এবং বাহাউল্লাই এই যুগের অবতার, আবার যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অনুরাগী তাঁরাও জোরের সঙ্গে দাবি করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যেই ঐশী শক্তির মহত্তম বিকাশ ঘটেছে। তাঁরাই এ যুগের অবতার। কিন্তু এমন কোনও লক্ষণ বা সূত্র আছে কি, যার দ্বারা আমরা এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারি? অবশ্যই আছে। আমরা যদি আমাদের অন্তরকেই এই প্রশ্ন করি—এঁদের মধ্যে কোন্ মহাপুরুষের বাণী ও শিক্ষা সর্বাপেক্ষা যুগোপযোগী?—তাহলেই আমরা আমাদের প্রার্থিত উত্তর পেয়ে যাবো। কারণ যুগাবতার বলে একমাত্র তিনিই স্বীকৃতি পেতে পারেন যাঁর বাণী কোনও বিশেষ জাতি বা দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যাঁর বাণী সর্বজনীন, সমগ্র বিশ্বের জন্য উদ্‌গীত। ভবিষ্যৎই সাক্ষ্য দেবে কার বাণী নতুন অধ্যাত্মযুগের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, অনির্বাণ আলোর বন্যায় দশদিক প্লাবিত করেছে, এবং এক অভাবনীয় শক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধূলির ধরণীতেই এক নতুন স্বর্গ রচনা করেছে।

(প্রবুদ্ধ, ভারত, মার্চ-১৯৭৮)

জোসেফিন ম্যাকলাউড

৫৪ ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীট, নিউইয়র্ক। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি আমি আমার বোনের সঙ্গে ঐ বাড়িতে গিয়েছিলাম। ঐখানেই প্রথম আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ শুনি। তিনি তাঁর বসবার ঘরে ছিলেন। পনেরো-কুড়িজন ভদ্রমহিলা এবং দুতিনজন ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি। কোনও চেয়ার খালি না থাকায় আমি মেঝেতে, একদম সামনের সারিতে গিয়েই বসলাম। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে স্বামীজী কিছু বললেন। কিন্তু তিনি ঠিক কি যে বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তবে এটি বেশ মনে আছে তাঁর কথাটি শোনামাত্রই মনে হলো কথাটি সত্য। তাঁর দ্বিতীয় কথাটিও আমার কাছে সত্য বলে মনে হলো, তৃতীয় কথাটিও তা-ই। এরপর সাত-সাতটি বছর আমি তাঁর কথা শুনেছি এবং প্রতিবারই তিনি যা বলেছেন, সবকিছুই আমার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হয়েছে; তখন থেকেই আমার কাছে জীবনের অর্থ অন্যরকম হয়ে গেছে। তিনি যেন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—আমি অনন্ত, অনন্তে বিরাজমান; এর বৃদ্ধিও নেই, পরিবর্তনও নেই। এ যেন প্রদীপ্ত সূর্যের মতো, যাকে একবার দেখলে আর কখনো ভোলা যায় না।

সেবার সারাটা শীতেই, সপ্তাহে তিনটি দিন সকাল এগারোটায় আমি তাঁর ভাষণ শুনতে যেতাম। আমি কখনো তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি; কিন্তু নিয়মিত যেতাম বলে তাঁর বসবার ঘরে সামনের দুটো আসন রোজই আমাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আপনারা বুঝি দুই বোন?' আমরা বললাম ঃ 'হ্যাঁ।' তখন তিনি আবার বললেন ঃ 'আপনারা কি অনেক দূর থেকে আসেন?' বললাম ঃ 'না, তেমন কিছু বেশি দূর নয়—হাডসন থেকে মাইল তিরিশ উজিয়ে এসেছি।' তিনি খুশি হয়ে বললেন ঃ 'অত দূর থেকে আসেন? বাঃ, চমৎকার!' স্বামীজীর সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ।

যে কয়জন ধার্মিক মানুষ দেখেছি তাঁদের মধ্যে, আমার মনে হয়েছে, বিবেকানন্দের পরেই মিসেস রোয়েৎলেজবার্জারের স্থান। তিনিই আমাদের

স্বামীজীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজীও তাঁকে খুব সমাদর করতেন। একদিন আমরা দুজন স্বামীজীর কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'স্বামীজী, কি করে ধ্যান করতে হয় আমাদের একটু শিখিয়ে দেবেন?' তিনি বললেন ঃ " 'ওম্' শব্দটির ওপর এক সপ্তাহ ধ্যান করুন, তারপর এসে আমাকে জানাবেন।" এক সপ্তাহ বাদে তাই আমরা আবার তাঁর কাছে গেলাম। মিসেস বার্জার বললেন ঃ 'আমি একটা আলো দেখতে পেয়েছি।' স্বামীজী বললেন ঃ 'বাঃ, চালিয়ে যান।' আমি বললাম ঃ 'না, না—সেটি যেন হৃদয়ে জ্যোতির মতো একটা কিছু।' স্বামীজী উত্তর দিলেন ঃ 'ভালো, লেগে থাকুন।' শেখানো বলতে ঐটুকুই তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন।

আমরা কিন্তু তাঁকে দেখার আগে থেকেই ধ্যানের অভ্যাস করতাম। গীতাও আমাদের বেশ ভালমতো পড়া ছিল। আমার মনে হয়, বিবেকানন্দরূপ মহাশক্তিকে চেনবার পক্ষে এগুলো পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কাজ করেছিল। অন্যকে সাহস জোগানো—সম্ভবত এর মধ্যেই ছিল তাঁর শক্তি। অথচ নিজের সম্বন্ধে তাঁকে বিন্দুমাত্র সচেতন মনে হতো না। অন্যের প্রতিই ছিল তাঁর যত আগ্রহ। তিনি বলতেন ঃ 'জীবন-গ্রন্থের পাতা যখন খুলতে শুরু করে, তখনই মজার আরম্ভ।' তিনি আমাদের উপলব্ধি করিয়ে দিতেন, জীবনে ঐহিক বা জাগতিক বলে কিছু নেই—সবই আধ্যাত্মিক, সবই পবিত্র। বলতেন ঃ 'সর্বদা মনে রেখ, ঘটনাচক্রেই তুমি একজন আমেরিকান, একজন মহিলা, আসলে চিরকালই তুমি ভগবানের সন্তান। দিনরাত নিজেকে বলো—কে তুমি; নিজের স্বরূপ কখনো ভুলে যেও না।'

স্বামীজীর উপস্থিতিটাই সকলকে এমন উদ্দীপিত করতো, সকলের মধ্যে এমন একটা শক্তির সঞ্চার করতো, কি বলবো! তোমার টাকা না থাকলে যেমন তুমি টাকা দান করতে পারো না—বড় জোর মনে মনে কল্পনা করতে পারো যে তুমি দিচ্ছ—তেমনি নিজে ঐশী শক্তির অধিকারী না হলে কখনোই এ শক্তি অন্যকে দেওয়া যায় না।

আমরা কখনো তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম না; কারণ তখনো তেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠেনি। সেবার বসন্তে যখন আমার হবু-ভগ্নীপতি, ফ্রান্সিস. এইচ. লেগেট, আমাদের এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ করলেন, আমরা তাঁকে বলেছিলাম ঃ 'আমরা আপনার সাথে খাওয়া-দাওয়া করতে পারি, কিন্তু সন্ধ্যেটা আপনার সঙ্গে কাটাতে পারবো না।' তিনি বলেছিলেন ঃ 'বেশ, তবে আমার সঙ্গে খাওয়া-

দাওয়াটাই অন্তত করুন।' খাওয়ার পাট চুকলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আজ সন্ধ্যাবেলায় কোথায় যাচ্ছেন?' আমরা বললাম, একটা বক্তৃতা শুনতে যাবো। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমি কি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি?' আমরা বললাম ঃ 'হ্যাঁ'। তিনি গেলেন, শুনলেন এবং বক্তৃতার শেষে স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন ঃ 'স্বামীজী, তাহলে আপনি কবে আমার বাড়িতে খাচ্ছেন?' মিঃ লেগেট-ই সামাজিকভাবে স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

ক্যাটস্কিল পাহাড়ের রিজলি ম্যানরে মিঃ লেগেট থাকতেন। সেখানে গিয়ে স্বামীজী কয়েকদিন ছিলেন। রিজলিতে যাওয়ার আগে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ কেউ বললেন ঃ 'স্বামীজী, এখন তো আপনার যাওয়া হতে পারে না; এখন ক্লাস চলছে।' শান্ত অথচ গম্ভীরভাবে তাঁদের দিকে ফিরে স্বামীজী উত্তর দিলেন ঃ 'ক্লাসগুলো কি আমার? আমি যাবোই।' যেমন কথা তেমনি কাজ। তিনি সত্যিই গেলেন। সেখানে থাকার সময় আমার বোনপো ও বোনঝির সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। তাদের একজনের বয়স তখন বারো, অন্যজনের চোদ্দ। নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর আবার যখন তাঁর ক্লাস শুরু হলো, তখন সেখানে স্বামীজী যেন ওদের দুজনকে চিনতেই পারলেন না; অন্তত দেখে তো তাই মনে হলো। ওরাও অবাক! একটু অভিমানের সুরেই ওরা বললো ঃ 'স্বামীজী আমাদের ভুলে গেছেন।' আমরা বললাম ঃ 'দাঁড়াও, ক্লাসটা শেষ হতে দাও।'

স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতেন, তখন বক্তব্য বিষয়ে তিনি একেবারে ডুবে যেতেন। সেদিনের বক্তৃতা শেষ হলে, কাছে এসে তিনি বললেন ঃ 'এই যে বাচ্চারা, তোমাদের দেখে আবার খুব আনন্দ হলো।' স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন, ওদের তিনি ভোলেননি; আর তারাও আহ্লাদে আটখানা।

সম্ভবত ঐ সময়ে তিনি আমাদের নিউইয়র্কের বাড়িতে অতিথি ছিলেন। একদিন আমরা দেখলাম তিনি বাড়ি ফিরলেন। মুখটি খুব গম্ভীর, মনটি অন্তর্মুখ। কয়েকঘণ্টা কারো সঙ্গে কথাই বললেন না। শেষে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'স্বামীজী, আজ আপনি কি করলেন?' তিনি বললেন ঃ 'আজ আমি এমন একটা জিনিস দেখলাম যা শুধু আমেরিকাতেই সম্ভব। আমি বাসে ছিলাম; দেখলাম হেলেন গোল্ড এক পাশে বসে, আর অন্যদিকে কাচা কাপড়চোপড় কোলে নিয়ে [ভয়ে জড়োসড়ো] এক নিগ্রো ধোপানী। আমেরিকা ছাড়া অন্য কোনও দেশে এই দৃশ্য দেখা যাবে না।'

ঐ বছরের জুন মাসে মিঃ লেগেটের মাছ ধরবার ক্যাম্পে অতিথি হয়ে স্বামীজী ক্রিশ্চিয়ান লেকের 'ক্যাম্প পারসিতে' যান। আমরাও গেলাম। আমার বোনের সঙ্গে মিঃ লেগেটের বিয়ের পাকা-কথা ওখানেই ঘোষণা করা হলো। ঠিক হয় বিদেশেই বিয়ে হবে এবং ঐ বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি যে কটা দিন ক্যাম্পে ছিলেন, সাদা সুন্দর বার্চ গাছের নিচে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে ডুবে থাকতেন। আমাদের কিছুই না জানিয়ে ঐ সময়ে বার্চ গাছের ছাল দিয়ে তিনি অতি সুন্দর দুটি বই তৈরি করেছিলেন। সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে বই দুটি লিখে তিনি আমাকে আর আমার বোনকে দিয়েছিলেন।

তারপর আমি আর আমার বোন যখন তার বিয়ের পোশাক কিনতে প্যারিস গেলাম, স্বামীজী গেলেন সহস্রদ্বীপোদ্যানে। সেখানে ছয় সপ্তাহ ধরে তিনি অপূর্ব প্রেরণাদায়ক সব কথা বললেন—যা Inspired Talks বা 'দেববাণী' নামে পরিচিত। আমার মতে ঐ বইটিতে লিপিবদ্ধ বাণীগুলি সবচেয়ে সুন্দর; কারণ, সেখানে আমরা এমন সব কথা পাই যেগুলি স্বামীজী তাঁর একদল অন্তরঙ্গ শিষ্য-শিষ্যাদের কাছেই বলেছিলেন। তাঁরা ছিলেন শিষ্য, আর আমি কিন্তু কখনোই তাঁর বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ছিলাম না। কী উৎকৃষ্ট বাণী-সম্পদই যে তিনি তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন! সহস্রদ্বীপোদ্যানের সেই দিনগুলির মতো অন্য কোনও কিছুই তাঁর হৃদয়কে এমন পরিপূর্ণভাবে উন্মোচিত করতে পারেনি।

আগস্ট মাসে তিনি মিঃ লেগেটের সঙ্গে প্যারিসে এলেন। সেখানে আমি এবং আমার বোন হল্যান্ড হাউসে উঠেছিলাম; স্বামীজী আর মিঃ লেগেট উঠেছিলেন অন্য একটা হোটেলে। অবশ্য রোজই আমাদের দেখাশোনা হতো। মিঃ লেগেটের একজন পিয়ন ছিল। সে সবসময়ই স্বামীজীকে বলতো ঃ 'আমার রাজা!' ঐ সম্বোধন শুনে স্বামীজী তাকে বলতেন ঃ 'কিন্তু বাপু হে, আমি তো মোটেই রাজা নই। আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী।' পিয়নটি উত্তর দিত ঃ 'আপনি নিজেকে তা বলতে পারেন, তবে আমি এত রাজা-রাজড়া ঘেঁটেছি যে তাঁদের একবার দেখলেই চিনতে পারি।' আসলে স্বামীজীর আচার ব্যবহার, চালচলন, সবকিছুর মধ্যেই এমন একটা আভিজাত্য ছিল যা সকলকেই মুগ্ধ করতো। তবুও একবার জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে বললেন, 'স্বামীজী, আপনি এত আভিজাত্যপূর্ণ যে কি বলবো!' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'আমি নই, আমার হাঁটার ধরন।'

৯ সেপ্টেম্বর মিঃ এবং মিসেস লেগেটের বিয়ে হলো। ঠিক তার পরদিনই

স্বামীজী, মিঃ ই. টি. স্টার্ডির আহ্বানে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মিঃ স্টার্ডি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী সন্তানের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিল। লণ্ডনে গিয়ে স্বামীজী মিঃ স্টার্ডির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ওখানে থাকার কয়েকদিন পরই স্বামীজী লিখলেন ঃ 'এখানে ক্লাস শুরু হচ্ছে; চটপট চলে এস।' কিন্তু আমরা যখন গেলাম, ততদিনে তিনি বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন। প্রিন্সেস হল-এ স্বামীজী খুব তেজোদৃপ্ত একটি ভাষণ দিলেন। পরেরদিনই খবরের কাগজগুলি ফলাও করে ছাপলো—একজন বিরাট ভারতীয় যোগী লণ্ডনে এসেছেন। স্বামীজী লণ্ডনে প্রভূত সম্মান পেয়েছিলেন।

সেইবার ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা লণ্ডনে ছিলাম। তারপর স্বামীজী আবার আমেরিকায় এলেন, কারণ সেখানে তখনো তাঁর অনেক কাজ বাকি। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে, লণ্ডনে ফিরে গিয়ে স্বামীজী সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর কাজে হাত দেন এবং ক্লাস শুরু করেন। সারাটা গ্রীষ্ম সেখানে কাজ করে জুলাই মাসে সেভিয়ারদের সঙ্গে তিনি সুইজারল্যান্ড চলে যান।

সব বিষয়েই স্বামীজীর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি রোমে থাকার সময় আমার বোনঝি এ্যালবার্টা স্টার্জেস (পরবর্তী কালে লেডি স্যান্ডুইচ) শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি তাঁকে ঘুরিয়ে দেখায়। তখন প্রধান প্রধান স্মৃতিসৌধগুলির অবস্থান ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে স্বামীজীর জ্ঞান দেখে সে অবাক হয়েছিল। আবার সেন্ট পিটার্স-এ গিয়ে রোমান চার্চের পবিত্র স্মারকগুলির প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধা দেখে সে আরও বিস্মিত হয়। সন্তদের সমাধির উপর বিছানো সুন্দর নক্সাদার চাঁদর এবং তার উপর রাখা বহুমূল্যবান মণিমুক্তা, সবকিছুই স্বামীজী গভীর শ্রদ্ধাভরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। স্বামীজীর সেই সশ্রদ্ধ ভাব দেখে অভিভূত এ্যালবার্টা প্রশ্ন করেছিল ঃ 'স্বামীজী, আপনি তো ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন; তাহলে এই [পার্থিব] জিনিসগুলিকে আপনি এত সম্মান দেখাচ্ছেন কেন?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'এ্যালবার্টা, তুমি ভুল করছো। ব্যক্তি-ঈশ্বরে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহলে তো তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলিই তাঁকে দেবে, তাই না?'

সেই বছর শরৎকালে সেভিয়ার দম্পতি ও মিঃ জে. জে. গুডউইন-কে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী সুইজারল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরে গেলেন। সেখানে সমগ্র জাতির সাগ্রহ অভিনন্দন তাঁর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়েছিল। 'lectures from Colombo to Almora' (ভারতে বিবেকানন্দ) নামক বইটিতে এই প্রাণস্পর্শী সংবর্ধনার

নিখুঁত বর্ণনা আছে। মিঃ গুডউইন ছিলেন দক্ষ স্টেনোগ্রাফার। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি লিখে রাখার জন্য ৫৪ ওয়েস্ট, ৩০ নং স্ট্রীটেই তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর আগে তিনি কোর্টের স্টেনোগ্রাফার ছিলেন, যার অর্থ প্রতি মিনিটে তিনি দুশোটি শব্দ লিখতে পারতেন। এই পটুত্বের জন্য তাঁর পারিশ্রমিকও খুব বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাঁকেই নিয়েছিলাম—কারণ বিবেকানন্দের একটি কথাও আমরা হারাতে চাইনি। কিন্তু প্রথম সপ্তাহের পর মিঃ গুডউইন আর টাকা নিতে রাজি হলেন না। সবাই যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, আপনি টাকা নিচ্ছেন না কেন?' তখন তিনি বললেন ঃ 'বিবেকানন্দ যদি তাঁর জীবনটা দিয়ে দিতে পারেন, আমি তাঁকে আমার এই সেবাটুকু দিতে পারবো না?' স্বামীজীর সঙ্গে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, আর ঘুরেছিলেন বলেই সাতখণ্ডে[১] লিপিবদ্ধ স্বামীজীর মুখের কথাগুলি আমরা পেয়েছি।

স্বামীজী ভারতে ফিরে গেলে আমি আর তাঁকে চিঠি লিখিনি। আশা করছিলাম, তিনিই লিখবেন, অবশেষে সেই চিঠি এল। লিখেছেন ঃ 'চিঠি দাও না কেন?' তখন লিখলাম ঃ 'আমি কি ভারতে যাবো?' উত্তরে তিনি লিখলেন ঃ 'হ্যাঁ, তুমি যদি দারিদ্র্য, আবর্জনা ও অধঃপতন দেখতে চাও, অর্ধনগ্ন লোকে ধর্মকথা বলছে—এই দৃশ্য দেখতে চাও তো চলে এসো। অন্য কিছু চাইলে এসো না। কারণ আমরা আর কোনও কটুকথা শুনতে রাজি নই।'

মিসেস ওলি বুল ও স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে ১২ জানুয়ারি প্রথম যে জাহাজটা পেলাম তাতেই রওনা হলাম। লণ্ডন ও রোম হয়ে আমরা ১২ ফেব্রুয়ারি বম্বে পৌঁছলাম। সেখানে মিঃ আলাসিঙ্গা আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী তাঁর কপালে ছিল লম্বা লাল তিলক। এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি। আমি স্বামীজীর কাছেই বসে। হঠাৎ মন্তব্য করে বসলাম ঃ 'মিঃ আলাসিঙ্গা কেন যে কপালে বৈষ্ণবদের মতো ঐ তিলক-ফিলক কাটেন, বুঝি না!' টিপ্পনি কাটামাত্র স্বামীজী আমার দিকে ঘুরে গর্জে উঠলেন ঃ 'চুপ কর! তোমরা এতদিন কি করেছ?' আমি তখনো বুঝিনি কী অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছি! একটি কথাও না বলে চুপ করে রইলাম, কিন্তু চোখে জল এল। পরে জেনেছিলাম, ব্রাহ্মণ যুবক আলাসিঙ্গা পেরুমল মাদ্রাজে একটি কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর মাসিক আয় ১০০ টাকা, এবং ঐ টাকাতেই বাবা, মা, স্ত্রী ও চারটি শিশু সন্তানের

১ ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডগুলিই বাংলায় বাণী ও রচনা নামে দশখণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে।

ভরণপোষণ করতে হয়। তা সত্ত্বেও স্বামীজীকে পাশ্চাত্যে পাঠানোর জন্য তিনি লোকের দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়িয়েছেন। আলাসিঙ্গা না থাকলে হয়তো আমরা পাশ্চাত্যের মানুষ বিবেকানন্দকে পেতামই না। আলাসিঙ্গার কথা জানার পর বুঝলাম ওঁর প্রতি সামান্যতম কটাক্ষেও স্বামীজী সেইদিন কেন অত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

বম্বে পৌঁছলে সেখানকার সকলে চাইলেন, আমরা বম্বেতেই থাকি। আমরা কিন্তু থাকিনি। কলকাতা যাওয়ার প্রথম যে ট্রেনটি পাওয়া গেল, তাতেই আমরা রওনা হলাম। সেদিনটা ট্রেনেই কাটলো। পরের দিনও তা-ই। তার পরদিন কলকাতা পৌঁছলে ভোর চারটেয় দশ-বারো জন শিষ্য নিয়ে স্বামীজী আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেখানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় ছিলেন। তাঁদের কারো মাথায় বেগুনি রং-এর পাগড়ি, কারো সোনালি, কারো বা লাল। আমেরিকায় থাকার সময় মিসেস ওলি বুল ওঁদের খুব যত্নআত্তি করেছিলেন। সেদিন ওঁরা আমাদের এত মালা পরিয়েছিলেন যে ফুলে ফুলে আমরা একেবারে ঢেকে গিয়েছিলাম। আমার আবার মালা পরতে চিরদিনই ভয়!

মিসেস বুল এবং আমি একটি হোটেলে উঠলাম। মিঃ মোহিনী চ্যাটার্জি হোটেলে দেখা করতে এলেন এবং বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কাটালেন। আমি তো শেষে বলেই ফেললাম ঃ 'আপনার স্ত্রী চিন্তা করবেন না তো?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'বাড়ি ফিরে মাকে আমি সব খুলে বলবো।' তাঁর ঐ কথার অর্থ আমি সেদিন ঠিক ধরতে পারিনি। সম্ভবত বছরখানেক বাদে মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হওয়ার পর একদিন তাঁকে বললাম ঃ "আচ্ছা, প্রথম দিন সেই যে আপনি বলেছিলেন 'বাড়ি ফিরে মাকে সব খুলে বলবো', এর মানে কি?" তিনি বললেন ঃ 'এই ব্যাপার! এর মানে হলো, রাতে বাড়ি ফিরে আমি কখনোই আগে নিজের ঘরে ঢুকি না। সারা দিন কি হলো না হলো সেসব প্রথমে মাকে খুলে বলি।' এই কথা শুনে বললাম ঃ 'কিন্তু আপনার স্ত্রী? তাঁকে সব খুলে বলেন না?' তিনি উত্তর দিলেন ঃ 'আমার স্ত্রীর কথা বলছেন? তাঁর ছেলের সঙ্গেও তো তাঁর ঐ একই রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।' তখনই আমি বুঝলাম ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে মৌল তফাৎটা কোথায়। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি মাতৃত্ব এবং আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা স্ত্রী-অভিমুখী। দুয়ের মধ্যে এটাই বিরাট ফারাক।

দু-একদিনের মধ্যেই আমরা স্বামীজীকে দর্শন করতে গেলাম। তিনি তখন

বেলুড়ে, নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ির অস্থায়ী মঠে। বিকেলে স্বামীজী বললেন ঃ 'নতুন যে মঠটা কেনা হচ্ছে, আমি সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো।' আমি বললাম ঃ 'অবশ্যই। কিন্তু স্বামীজী, এই বাড়িটি কি যথেষ্ট বড় নয়?' বাগানবাড়িটি ভারী সুন্দর ছিল—ছোটখাট, এক বা দুই একর জায়গায় ওপর। ভিতরে একটা ছোট পুকুর, আর চারপাশে অজস্র ফুল। আমার ধারণা ছিল, যে কোনও লোকের পক্ষেই বাড়িটি যথেষ্ট বড়। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি সবকিছুই অন্যভাবে দেখতেন এবং চিন্তা করতেন। তাই, ছোট ছোট কয়েকটা গলি পেরিয়ে, এখন যেখানে মঠ হয়েছে, সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। নদীর ধারে পুরনো একটা খালি বাড়ি চোখে পড়ায় মিসেস বুল আর আমি বললাম ঃ 'স্বামীজী, আমরা কি এই বাড়িটায় থাকতে পারি না?' তিনি বললেন ঃ 'এটা অগোছালো হয়ে আছে।' আমরা বললাম ঃ 'তাতে কি? আমরা গুছিয়ে ঠিকঠাক করে নেব।' আমাদের মনোভাব বুঝে তিনি অনুমতি দিলেন। তখন আমরা বাড়িটাকে নতুন করে চুনকাম করালাম; নিজেরাই বাজারে গিয়ে মেহগিনি কাঠের কিছু পুরনো আসবাবপত্র কিনে এনে একটা ড্রইং রুম বানিয়ে ফেললাম যার অর্ধেকটা ভারতীয় ঢং-এ সাজানো আর অর্ধেকটা পাশ্চাত্য ছাঁদে। খাওয়ার ঘরটা ছিল বাইরের দিকে। আমাদের শোবার ঘর ছাড়াও একটা বাড়তি ঘর ছিল। আমরা কাশ্মীর যাওয়ার আগে পর্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা আমাদের অতিথি হয়ে সেই ঘরটিতে থাকতেন। প্রায় দু-মাস আমরা ঐ বাড়িতে ছিলাম। স্বামীজীর সান্নিধ্যে আমরা যতদিন কাটিয়েছি, তার মধ্যে এই সময়টাই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

প্রতিদিন সকালে তিনি চলে আসতেন আর বড় আমগাছটার তলায় বসে দিনের প্রথম চা-পর্বটি সারতেন। সেই আমগাছটা এখনো বেঁচে আছে। ওঁরা সব আমগাছটা কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা কিছুতেই কাটতে দিইনি। আমরা যে গঙ্গার ধারে ঐ কুটিরে থাকতাম তাতে স্বামীজী খুব খুশি হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর কাছে আসতেন, তাঁদের সকলকেই তিনি এই বাড়িতে নিয়ে আসতেন। দেখাতেন যে, যেটাকে তিনি বাসের অযোগ্য মনে করেছিলেন, সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা কেমন চমৎকার একটা বাড়ি করে তুলেছি।

বিকেলে বাড়ির সামনেই আমরা চায়ের আসর বসাতাম। ওখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত নদীটা চোখে পড়তো। প্রায়ই দেখা যেত মালবোঝাই নৌকাগুলো স্রোতের উল্টোদিকে ভেসে যাচ্ছে। মনে হতো ড্রইং রুমে বসেই যেন আমরা সবকিছু দেখছি।...

একদিন রাতে তুমুল বৃষ্টি নামলো। আর আমাদের খাওয়ার ঘরের বাইরে যে বারান্দা ছিল, সেখানে পায়চারি করতে করতে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণের কথা, তাঁর অনন্ত প্রেমের কথা এবং জগতে সেই প্রেমের শক্তি কিভাবে কাজ করে চলেছে, তার কথা বলে চললেন। স্বামীজীর একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—যখন তিনি যে-ভাবের মধ্যে ডুবে থাকতেন, তখন সেই ভাবটিকেই বড় করে দেখতেন। যখন তিনি ভক্ত, প্রেমিক, তখন তিনি কর্মযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগকে এমনভাবে দূরে সরিয়ে রাখতেন, যেন তাঁর কাছে তাদের কোনও মূল্যই নেই। আবার যখন তিনি কর্মযোগী, তখন কর্মই তাঁর কাছে সব। জ্ঞানের বেলাতেও ঠিক তা-ই। কখনো কখনো সপ্তাহের পর সপ্তাহ তিনি একটি বিশেষ ভাবে লীন হয়ে থাকতেন। ঠিক এর আগেই যে-ভাবে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই!

তাঁর মনঃসংযোগের ক্ষমতাও ছিল বিস্ময়কর। সেই শক্তির দ্বারাই মনে হয়, আমাদের সকলের মধ্যে সুপ্ত বিশ্বাত্মক চেতনার দ্বারটি তিনি উন্মুক্ত করে দিতেন। সম্ভবত এই অসীম একাগ্রচিত্ততার দরুনই তাঁকে এত তরুণ ও তরতাজা দেখাতো। তাঁর মধ্যে কোনও পুনরাবৃত্তি ছিল না, ছিল না কোনও একঘেয়েমি। কোনও ঘটনাই তাঁর কাছে তুচ্ছ বা সামান্য ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য এমন কোনও ঘটনার ওপরও যখন তাঁর প্রজ্ঞার আলোটি বিচ্ছুরিত হতো, তখনই নিমেষে তা অনন্তের ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। তাঁর কাছে, আমরা যারা পাশ্চাত্যের মানুষ, তাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। আমাদের তিনি মান দিয়ে বলতেন 'জীবন্ত বৈদান্তিক'। আরও বলতেন ঃ 'তোমরা যখন কোনও কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস কর, তখন তাকে কাজে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা কর, স্বপ্ন দেখে কাল কাটাও না। ঐটিই তোমাদের শক্তি।'

এক বর্ষামুখর রাতে স্বামীজী সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অনাগারিক ধর্মপালকে আমাদের কাছে নিয়ে আসেন। মিসেস ওলি বুল, ভগিনী নিবেদিতা আর আমি খুব মজা করে ঐ বাড়িতে থাকতাম। স্বামীজীও তাঁর অতিথিদের এটা দেখিয়ে এক বিশেষ আনন্দ পেতেন যে, দেখো, পশ্চিমের মেয়েরা কেমন সাদাসিধেভাবে, কেমন নিজের বাড়ির মতো সহজ হয়ে এখানে বাস করছে।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ মে আমরা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, তবে একটু ঘুরপথে। নৈনিতালে আমাদের যাত্রা-বিরতি। গ্রীষ্মকালে যুক্ত প্রদেশ সরকারের কাজকর্ম এই নৈনিতাল থেকেই পরিচালিত হয়। ওখানে পৌঁছতেই

শত শত ভারতীয় স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল সুন্দর ছোট একটি পাহাড়ী ঘোড়া। তাঁরা ঘোড়ার পিঠে স্বামীজীকে বসিয়ে তাঁর সামনে ফুল-ফল ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। যিশুখ্রীস্ট যখন জেরুজালেমে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর ভক্তেরাও ঠিক এমনিভাবেই অভ্যর্থনা করেছিলেন। সেই মুহূর্তেই আমি বলে উঠেছিলাম, 'ও হরি! এটা তাহলে একটা প্রাচ্য রীতি!'

তিন দিন আমরা একটি হোটেলে একাই ছিলাম। তাঁকে আমরা আদৌ দেখতে পাইনি। অবশেষে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। একটা ছোট বাড়িতে আমরা গেলাম। গিয়ে দেখি স্বামীজী বিছানার ওপর বসে, আর তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে প্রসন্নতার এক জ্যোতি। বলা বাহুল্য, আমাদের আবার দেখতে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। তাঁর প্রতি কোনরকম দৃষ্টিই দিতাম না। ফলে আমরা কখনোই তাঁর বোঝা হয়ে উঠিনি। আর আমাদের মনেও কখনো এই ভাব উঠতো না যে, তিনি আমাদের সঙ্গ দিচ্ছেন না বা আপ্যায়ন করছেন না।

নৈনিতাল থেকে এবার আমরা চললাম আলমোড়ার পথে। আলমোড়ায় স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হন। আমরা আলাদা একটা বাংলো ভাড়া করে সেখানেই এক মাস থাকলাম। স্বামীজী সবসময় চাইতেন তাঁর পশ্চিমী শিষ্যরা আলমোড়ায় থেকে হিমালয়ের সান্নিধ্য পাবে আর সেখানেই সাধনভজন করবে। তাঁর একান্ত আশা ছিল ওখানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিঃ সেভিয়ার মঠ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের চায়ের মজলিসে লোকজনের এমন ভিড় বাড়তে লাগলো যে উত্ত্যক্ত হয়ে তিনি ঠিক করলেন যে, হিমালয়ের আরও চল্লিশ মাইল ভেতরে গিয়ে মঠ করতে হবে। কাজেই, আশ্রম যখন হলো, সেটা হলো মায়াবতীতে—রেলস্টেশন থেকে আশি মাইল দূরে। তখন ওখানে যাওয়ার ভালো রাস্তাও ছিল না।

আমরা ওখানে থাকতে থাকতেই খবর এল মিঃ গুডউইন উটকামন্ডে দেহ রেখেছেন। স্বামীজীর কানে এই দুঃসংবাদ পৌঁছতেই তিনি বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তুষারাবৃত হিমালয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একসময় বলে উঠলেন ঃ 'জনসভায় ভাষণ দেওয়া আমার শেষ হয়ে গেল।' এরপরে খুব কমই তিনি সাধারণের মধ্যে বক্তৃতা দিয়েছেন।

আলমোড়া থেকে ২০ জুন আমরা কাশ্মীর রওনা হলাম। রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত ট্রেনে গেলাম; সেখান থেকে তিন-ঘোড়া-টানা টাঙ্গায়। প্রতি পাঁচ মাইল

অন্তর ঘোড়া বদলানো হলো। পথ এমন চমৎকার যে রোমানদের তৈরি যে-কোনও রাস্তাকে টেক্কা দিতে পারে। ফলে কাশ্মীর পর্যন্ত দুশো মাইল আমরা যেন উড়ে চললাম। বারামুল্লাতে পৌঁছে আমরা চারটে দেশী হাউস-বোট পেয়ে গেলাম। ওরা বলে 'ডুঙ্গা'। ডুঙ্গাগুলি বিশাল—লম্বায় প্রায় ৭০ ফুট, আর পাশাপাশি দুটো খাট রাখা যায় এবং মধ্যে একটা টানা বারান্দা বা চলাচলের পথ থাকতে পারে, এমন চওড়া। উপরে মাদুরের ছাউনি। জানলার প্রয়োজন হলে মাদুর গুটিয়ে নিলেই হতো, ইচ্ছে করলে দিনের বেলায় সমস্ত ছাদটাই এইভাবে সরিয়ে রেখে খোলামেলায় থাকা যেত। অবশ্য আমরা মনে মনে জানতাম যে আমাদের মাথার উপর একটা ছাদ আছে।

আমাদের জন্য যে চারটে ডুঙ্গা নেওয়া হয়েছিল। একটা মিসেস বুল আর আমার জন্য; একটা মিসেস প্যাটারসন ও ভগিনী নিবেদিতার জন্য; আর একটা স্বামীজী ও আর একজন সন্ন্যাসীর জন্য। চতুর্থ ডুঙ্গাটি ছিল আমাদের খাওয়ার ঘর—সেখানে আমরা সবাই খাওয়ার সময় জড়ো হতাম।

কাশ্মীরে আমরা চার মাস ছিলাম। তার মধ্যে প্রথম তিন মাস কাটালাম ঐ সাদাসিধে ছোট নৌকাগুলিতে। সেপ্টেম্বরের পর খুব ঠাণ্ডা পড়ায় আমরা একটা সাধারণ হাউস-বোট ভাড়া করলাম যার ভিতর আগুন পোয়াবার ব্যবস্থা আছে। 'ফায়ারপ্লেস' থাকায় হাউস-বোটটি বাড়ির মতোই উষ্ণ ও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। ওখানে আমাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হতো, ভগিনী নিবেদিতা তার অনেকটাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটায় স্বামীজী উঠে পড়তেন। তামাক খেতে খেতে স্বামীজী মাঝিদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখতে পেলে আমরাও উঠে পড়তাম। তারপর শুরু হত প্রাতঃভ্রমণ। সূর্যের তাপে তেতে না উঠা পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘণ্টা আমরা পায়ে পায়ে বেড়াতাম আর স্বামীজী ভারতের কথা, ভারতবর্ষের . জীবনাদর্শ কি, ইসলাম কি করেছে আর কি করেনি, সেইসব কথা বলতেন। ভারতের ইতিহাস, তার শিল্প-স্থাপত্য ও ভারতীয়দের আচার-আচরণের কথা বলতে বলতে তিনি একেবারে তন্ময় হয় যেতেন। আমরা শুনতাম আর চোরকাঁটায়-ভরা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতাম, মাথার ওপর পাহাড়ী পথে অজস্র গোলাপি ও নীল ফুল চোখে পড়তো।

ভেনিসের সাথে বারামুল্লার অনেক সাদৃশ্য আছে। ওখানকার মতো এখানেও পথ বলতে ছোট-বড় অনেক খাল। আমরা আমাদের ভাড়া করা ছোট নৌকায় প্রায়শই ভেসে বেড়াতাম; শহরে যাওয়া আসা করতাম; আমাদের দেখলেই

ব্যবসায়ীরা তাদের পশরা নিয়ে ডিঙি বেয়ে আমাদের নৌকার দিকে ধেয়ে আসতো। আমরাও নৌকার রেলিং-এ ভর দিয়ে বেশিরভাগ কেনাকাটা সেরে নিতাম।

মাঝি সমেত এক-একটি নৌকার মাসিক ভাড়া ছিল ৩০ টাকা। মাঝিরা নিজেদের খরচায় খাওয়া দাওয়া করতো। তারা বাপ, মা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে নৌকার একদম শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটু জায়গায় থাকতো। তারা যখন রাঁধতো এমন ভুরভুরে সুগন্ধ বেরোতো যে আমরা আর থাকতে না পেরে প্রায়ই একটু চেয়ে খেতাম। নৌকাগুলির একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, সেগুলি নানাভাবেই চালানো যেত। মাঝিরা কখনো লগি ঠেলে, কখনো তীরের উপর দিয়ে হেঁটে গুণ টেনে, আবার কখনো বা দাঁড় বেয়ে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যেত। তার জন্য অবশ্য ওদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হতো না।

ঝিলাম নদীর এদিক ওদিক কোনও হ্রদে কখনো বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা হলে আগের দিন রাতে আমাদের কাজের লোকদের বলে রাখতাম। তক্ষুনি তারা হাঁস বা মুরগী, শাক-সবজি, ডিম, দুধ, মাখন, ফল ইত্যাদি যোগাড় করতে চলে যেত। সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই বুঝতে পারতাম নৌকা চলছে। অবশ্য এত ধীরে নৌকা চলত যে, ভাল করে লক্ষ্য করলে তবেই বোঝা যেত সেটা চলছে। খাওয়ার সময় হলে কাজের লোকটি সরু এবং লম্বাটে একটি ট্রে-তে সুস্বাদু গরম খাবার সাজিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করতো। একটি পাত্রে থাকতো স্যুপ, একটিতে মাংস, আর একটিতে ভাত। ওদের নৈপুণ্য দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি, যে বিস্ময়ের ঘোর আমাদের কোনওদিনই কাটেনি।

গোঁড়া হিন্দুরা যে মুরগী খাওয়াকে খুব সুনজরে দেখেন না, তা আমরা বিলক্ষণ জানতাম। তাই কাউকেই বলা হতো না, খাওয়ার জন্যই আমরা মুরগী কিনছি, কিন্তু বলি আর নাই বলি, নৌকার খোলের তলায় ঢোকানো গোটাছয় মুরগী তো আর চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়! তারা যখন কোকর কোঁ করে ডেকে উঠতো, তখনই হতো আমাদের সবচেয়ে মুশকিল। একবার নদীর উজান পথে যাচ্ছি। সেই সময় যে সব হিন্দু পণ্ডিত স্বামীজীকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁদের কানেও ঐ শব্দ গেলে তাঁরা কোত্থেকে ঐ আওয়াজ আসছে জানার জন্য সন্দেহের চোখে ইতিউতি তাকাতেন। স্বামীজী জানতেন মুরগীগুলো নিচে লুকানো আছে। তাই দুচোখে তাঁর কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠতো। তবুও স্বামীজী কিছু প্রকাশ করে আমাদের অপ্রস্তুত করেননি বা আমাদের ছেড়ে চলেও যাননি। পণ্ডিতের দল স্বামীজীকে বলতেনঃ ‘আচ্ছা স্বামীজী, আপনি এই ম্লেচ্ছ

মহিলাদের সহ্য করেন কি করে? এঁরা তো অস্পৃশ্য।' আবার পাশ্চাত্যের কারো সাথে দেখাশোনা হলে তাঁরা ফিসফিসিয়ে বলতেন ঃ 'স্বামীজী যে আপনাদের যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছেন না, সেটা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? তা-যদি না হতো, তাহলে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি অবশ্যই মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন।' এইভাবে পরস্পরের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিদঘুটে দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে আমরা খুব মজা করতাম, হাসাহাসি করতাম।

এরপর লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি আমাদের ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য স্বামীজী ডেকে পাঠালেন স্বামী সারদানন্দকে, আর নিজে সোজা কলকাতা চলে গেলেন। বেড়ানো শেষ করে আমরা যখন বেলুড় পৌঁছলাম, দেখলাম আমাদের ছোট কটেজটিতে স্বামীজী ইতোমধ্যেই মঠ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। স্বভাবতই আমরা আর সেখানে থাকতে পারলাম না; বালী থেকে দু-মাইল দূরে একটা বাড়ি ভাড়া করে ফেললাম। পাশ্চাত্যে ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা সেখানেই ছিলাম।

মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য মিসেস ওলি বুল কয়েক হাজার ডলার দিয়েছিলেন। আমার সাধ্য কম; তাই আটশ ডলার জোগাড় করতেই বেশ কয়েক বছর লেগে গেল। একদিন স্বামীজীকে বললাম ঃ 'আমি সামান্য কিছু টাকা দিচ্ছি, আপনি দয়া করে যদি কাজে লাগান।' তিনি বললেন ঃ 'কি, কি বললে?' ['টাকা'] বললাম, 'হ্যাঁ'। 'কত টাকা'?—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম ঃ 'আটশ ডলার'। শোনামাত্রই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ "যা, হয়ে গেল; এবার তোর প্রেসটা কিনে ফেল।" তিনি ছাপাখানা কিনে ফেললেন এবং সেখান থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের বাংলা পত্রিকা 'উদ্বোধন' প্রকাশিত হতে লাগলো।

১৮৯৯-এর জুলাই মাসে স্বামীজী আবার ইংল্যাণ্ডে এলেন, সঙ্গে নিবেদিতা। সেখানে সিস্টার ক্রিস্টিন এবং মিসেস ফাঙ্কি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সেখান থেকে স্বামীজী আমেরিকায় এলেন। আর রিজলি ম্যানরে আমাদের কাছে এলেন ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। সেখানে তিনি এবং তাঁর দুই গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের জন্য আমরা একটা কটেজ ছেড়ে দিলাম। ঐ সময় ভগিনী নিবেদিতা ও মিসেস ওলি বুল-ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা যারা স্বামীজীকে ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তাদের নিয়ে রীতিমতো একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠলো। আমার বোন মিসেস লেগেটকে স্বামীজী 'মা' বলে

ডাকতেন। আর খাবার টেবিলে সবসময় তাঁর পাশেই বসতেন। স্বামীজী বিশেষ করে চকোলেট আইসক্রীম খেতে ভালবাসতেন। তার কারণ হিসাবে বলতেন ঃ 'আমি নিজেও চকোলেট কি না, তাই চকোলেট আইসক্রীম এত ভালবাসি'। একদিন আমরা স্ট্রবেরী খাচ্ছিলাম। তাই দেখে একজন বললেন ঃ "স্বামীজী, স্ট্রবেরী আপনার ভালো লাগে?" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "আমি কখনো স্ট্রবেরী খাইনি।" 'খাননি! সে কি! আপনি তো রোজই স্ট্রবেরী খাচ্ছেন।' অমনি স্বামীজীর উত্তর ঃ "তোমরা ওগুলোর ওপর ক্রীম চাপাও—আর ক্রীম চাপালে নুড়িও ভালো লাগবে।"

সন্ধ্যা হলে রিজলি ম্যানরের হলে-এ ফায়ারপ্লেসের চারধারে আমরা সবাই মিলে বসতাম আর তিনি কথা বলতেন। একদিন কোনও একটা বিষয়ে স্বামীজী যখন আলোচনা করছেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন মহিলা বলে উঠলেন ঃ "স্বামীজী, আমি কিন্তু এই বিষয়ে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না।" তিনি উত্তর দিলেন ঃ "পারলে না? তা, বেশ তো—তাহলে এটা তোমার জন্য নয়।" আর একজন বললেন ঃ "কিন্তু স্বামীজী, আমার মতে, আপনি যা বললেন তা একদম খাঁটি কথা।" অন্যের মতামতকে তিনি পূর্ণ মর্যাদা দিতেন; তাই স্বামীজী দ্বিতীয় জনকে বললেন ঃ "ও, তাহলে মনে হচ্ছে ওটা তোমার জন্যই।"

আর এক সন্ধ্যায় আমরা দশ-বারো জন আছি। স্বামীজী সেদিন অদ্ভুত এক ভাবে বিভোর হয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। কথা বলতে বলতে তাঁর স্বর এত কোমল হয়ে আসছিলো যে, আমাদের মনে হচ্ছিলো বহু দূর থেকে কথাগুলি ভেসে আসছে। সেই সন্ধ্যায় দিব্য পরিবেশে অধ্যাত্মভাব এমনই জমাট বেঁধেছিলো যে কারো মুখেই কথা সরছিলো না। রাতের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, পরস্পরকে সৌজন্যমূলক বিদায়সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে আমরা যে-যার মতো ঘরে চলে গেলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমার বোন মিসেস লেগেট একটি ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন, নিমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন কাঁদছেন। ভদ্রমহিলা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আমার বোন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সে কি! আপনি কাঁদছেন কেন?" উত্তরে সেই ভদ্রমহিলা [স্বামীজীকে স্মরণ করে] বলেছিলেন ঃ "ঐ মানুষটি আমাকে অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন। আমি আর তাঁর কথা শুনতে চাই না।"

স্বামীজী যখন রিজলি ম্যানরে, তখন একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটি লিখেছেন একজন অপরিচিত মহিলা। তিনি জানিয়েছেন আমাদের একমাত্র ভাই লস

এঞ্জেলস্-এ গুরুতর অসুস্থ। তাঁর ধারণা, ভাই আর বাঁচবে না, আর আমাদের খবরটা জানা উচিত। আমার বোন আমাকে বললেন ঃ "মনে হয় তোমার একবার যাওয়া উচিত।" বললাম ঃ "অবশ্যই"। দু ঘণ্টার মধ্যে আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ঘোড়ার গাড়িও দরজার সামনে উপস্থিত। চার মাইল গাড়ি হাঁকিয়ে রেল স্টেশনে যেতে হবে। আমি যখন ঘর থেকে বেরলাম, স্বামীজী হাত তুলে একটি সংস্কৃত আশীর্বচন উচ্চারণ করে বললেন ঃ "ওখানে কয়েকটা ক্লাসের ব্যবস্থা করে ফেলো। তারপর আমি যাচ্ছি।"

আমি সোজা লস এঞ্জেলস-এ গেলাম। শহরের উপকণ্ঠে গোলাপে ঢাকা ছোট কটেজের একটি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় আমার ভাইটি শুয়ে আছে। ভাইয়ের বিছানার ওপর দেখলাম স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। দশ বছর ভাইকে দেখিনি। ঘণ্টাখানেক কথা বলেই বুঝলাম সে কতটা অসুস্থ! তারপর গৃহকর্ত্রী মিসেস ব্লজেট-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বললাম ঃ "আমার ভাই তো দেখছি খুবই অসুস্থ।" 'তিনি বললেন ঃ "'হ্যাঁ'। বললাম ঃ "মনে হচ্ছে, ও আর বাঁচবে না।" তিনি বললেন ঃ "আমারও তাই ধারণা।' জিজ্ঞেস করলাম ঃ "শেষ কটা দিন সে এখানেই থাকতে পারে কি?" তিনি বললেন ঃ "স্বচ্ছন্দে"। তখন আমি প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে প্রশ্ন করলাম ঃ "আমার ভাইয়ের বিছানার উপর দিকে একজনের ছবি টাঙানো আছে দেখলাম; ছবিটি কার, বলতে পারেন?" সত্তর বছরের সংযত গাম্ভীর্য এইবার তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠলো। বললেন ঃ "ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তো ইনিই তিনি।' 'ওর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"—আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ "১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তারুণ্যে ভরপুর ঐ যুবকটি ভাষণ দেবার জন্য ওঠে যখন বললেন 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ', তখন সাত হাজার নরনারী এমন কিছুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো যা তারা নিজেরাও হয়তো জানতো না, বা জানলেও ভাষায় প্রকাশ করতে পারতো না। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে দেখলাম, দলে দলে মেয়েরা বেঞ্চ ডিঙিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছে।" আমি তখন মনে মনে বললাম ঃ "দেখ বাছা, এই ধাক্কাটা যদি তুমি সামলাতে পার, যদি তলিয়ে না যাও, তবে বুঝব সত্যিই তুমি ভগবান।"

সব শুনে আমি মিসেস ব্লজেট-কে বললাম ঃ "আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি।" 'আপনি ওঁকে চেনেন?'—অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম ঃ "হ্যাঁ। নিউইয়র্কের ক্যাটস্কিল পাহাড়ের ছোট্ট গ্রাম স্টোনরিজ, দুশো লোকের বাস

সেখানে। আমি সেখান থেকেই আসছি, আর তিনি এখন সেখানে।" মিসেস ব্লজেট আবার বললেন ঃ "আপনি তাকে জানেন?" বললাম ঃ "আপনি তাঁকে এখানে আসতে অনুরোধ করুন না?" তিনি অবাক হয়ে বললেন ঃ "এখানে, আমার এই পর্ণকুটিরে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ। আপনি চাইলে তিনি এখানে নিশ্চয়ই আসবেন।"

তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমার ভাইটি মারা গেলো; আর ছ-সপ্তাহের মাথায় স্বামীজী সেখানে এলেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে, ক্যালিফর্ণিয়ায়, এইবার তিনি ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন।

বেশ কয়েকমাস মিসেস ব্লজেট-এর অতিথি হয়ে রইলাম। তিনটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি খাওয়ার ঘর, এবং একটি বৈঠকখানা—এই নিয়ে ছিল তাঁর ছোট্ট কটেজটি। প্রতিদিন সকালে স্বামীজী স্নানে গেলেই কলঘর থেকে সংস্কৃত স্তোত্রের গম্ভীর ধ্বনি আমাদের কানে যেত; কারণ কলঘরটি ছিল রান্নাঘরের ঠিক পাশেই। স্নান সেরে যখন তিনি বেরোতেন, চুলগুলি সব এলোমেলো। এইবার তাঁর প্রাতঃরাশের জন্য তৈরি হওয়ার পালা। মিসেস ব্লজেট ভারী চমৎকার প্যানকেক তৈরি করতেন। রান্নাঘরের টেবিলে বসেই আমরা সেগুলো খেতাম। স্বামীজীও আমাদের সঙ্গেই বসতেন। এই সময় মিসেস ব্লজেট-এর সঙ্গে স্বামীজী কতই না মজার আলোচনা করতেন আর তাঁর কথার চটজলদি সব জবাব দিতেন! মিসেস ব্লজেট যখন পুরুষদের বজ্জাতির কথা বলতেন, তখন স্বামীজী নানা রগড়ের কথা বলে প্রমাণ করে দিতেন ঐ ব্যাপারে মেয়েরা পুরুষদেরও এক কাঠি উপরে!

মিসেস ব্লজেট কদাচিৎ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে যেতেন। উনি বলতেন ঃ "আমার কাজ কি জানেন? আপনারা ফিরে এলে ভালো ভালো মুখরোচক খাবার রেঁধে খাওয়ানো। স্বামীজী 'হোম অফ্ ট্রুথ' এবং অন্যান্য হলেও বিস্তর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার শোনা বক্তৃতাগুলির মধ্যে সর্বোত্তম বোধহয় 'ন্যাজারেথের যিশু'। সেদিন তিনি যিশুর মহিমা, শক্তি ও ভাবে নিজেকে এমন হারিয়ে ফেলেছিলেন যে, তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন এক শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। ঐ জ্যোতি দর্শনে আমি এতটাই অভিভূত হয়েছিলাম, ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলিনি। মনে হয়েছিলো, তাঁর ভিতর তখনো উচ্চ চিন্তার তরঙ্গ উত্তাল হয়ে বয়ে চলেছে; কথা বললে তার গতি রুদ্ধ হতে পারে। মনে মনে এইসব ভাবছি, হঠাৎ তিনি আমাকে বললেন ঃ 'কেমন করে ওটা তৈরি করে, আমি বুঝতে পেরেছি।' জিজ্ঞেস

করলাম ঃ 'আপনি কোন্ জিনিস তৈরির কথা বলছেন?' স্বামীজী বললেন ঃ 'মশলাদার মালিগাটনি (mulligatawny) স্যুপ তৈরির কৌশলটা আমি বুঝতে পেরেছি। ওরা নির্ঘাৎ স্যুপের মধ্যে একটা 'বে'-গাছের পাতা ছেড়ে দেয়।"

নিজের মূল্য নিয়ে তিনি যে কখনো মাথা ঘামাননি, তিনি যে সম্পূর্ণ অভিমানশূন্য ছিলেন, ওপরের ঘটনাটি স্বামীজীর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটিই উজ্জ্বল করে তোলে। অথচ এটা লক্ষণীয় যে, তিনি অন্যের মধ্যে সর্বদাই অফুরন্ত শক্তি ও মহানুভবতার প্রকাশ দেখতে পেতেন; অন্যের ভালো দিকটা কখনো তার দৃষ্টি এড়াত না। যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে আসতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অনুভব করতেন স্বামীজী যেন এক বিশেষ শক্তি ও সাহসে তাঁদের সঞ্জীবিত করে দিচ্ছেন। যখন স্বামীজীর কাছ থেকে তাঁরা চলে যেতেন, তখন তাঁদের আর মনের কোনও জড়তা নেই, গ্লানি নেই; নতুন প্রেরণা ও শক্তিতে তখন তাঁরা ভরপুর। তাই যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'মহাপুরুষ চেনার উপায় কি?' আমি সবসময় একই উত্তর দিয়েছি। বলেছি, 'যাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রাণে এক নতুন বল পাওয়া যায়, তিনিই একজন যথার্থ মহাপুরুষ।' স্বামীজী নিজে বলতেন ঃ 'যাঁরা ত্রাণকর্তা তাঁরা সর্বদাই তাঁদের আশ্রিতদের পাপতাপ ও দুঃখের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেন, আর আশ্রিত সন্তানের দল নিঃশঙ্কচিত্তে, হাসতে হাসতে আপন আপন লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে। সাধারণ মানুষ আর দেবমানবদের মধ্যে এই হলো তফাত।'

রিজলি ম্যানরে থাকতে স্বামীজী আমার বোনঝিকে আর একটা কথা বলেছিলেন ঃ 'অ্যালবার্টা, জীবনের কোনও ঘটনাই কখনো তোমার কল্পনাকে ছাপিয়ে যেতে পারবে না।'

একদিন মিসেস ব্লজেট স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করাবার জন্য তিন মহিলাকে নিয়ে এলেন। স্বামীজী যাতে স্বচ্ছন্দে নিভৃতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন সেইজন্য আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আধঘণ্টা বাদে স্বামীজী আমার কাছে এসে বললেন ঃ 'যে-তিনজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছেন তাঁরা তিন বোন। এঁদের খুব ইচ্ছে আমি একবার প্যাসাডেনায় যাই।' বললাম ঃ 'তা বেশ তো, ঘুরেই আসুন না কেন।' তাঁর সরল প্রশ্ন ঃ 'যাবো?' বললাম ঃ 'নিশ্চয় যাবেন।' ঐ তিনজন মহিলা হলেন মিসেস হ্যান্সবরো, মিস মীড এবং মিসেস ওয়াইকফ। হলিউডে মিসেস ওয়াইকফের বাড়িটি এখন বিবেকানন্দ ভবন। মিসেস ওয়াইকফ এবং একজন সন্ন্যাসী এখন সেখানে আছেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল স্বামীজী ক্যালিফর্ণিয়ার অ্যালামেডা থেকে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমার মনে হয় এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চিঠি। এটাই শেষ চিঠি তাঁর উদ্দীপিত বাণীসমূহের মধ্যে।

ঐ বছরেই পরের দিকে আমার বোন এবং ভগ্নীপতি মিঃ লেগেট আসন্ন প্রদর্শনী ও উৎসবের জন্য প্যারিসে একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন। আমরা জুন মাসে সেখানে গেলাম, স্বামীজী এলেন আগস্টে। তিনি কয়েক সপ্তাহ আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে অবশেষে মিঃ জেরাল্ড নোবেল-এর বাড়ি গিয়ে সেখানেই থাকলেন। মিঃ নোবেল বিয়ে-থা করেননি। আমাদের এই বন্ধুটি সম্পর্কে স্বামীজীর খুব উঁচু ধারণা ছিল। পরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মিঃ নোবেল-এর মতো একজন বন্ধু পেতে যদি আবার জন্মাতে হয়, সেও সৌভাগ্যের কথা।' এই ছ-মাস স্বামীজীকে আপ্যায়ন করার অনেক সুযোগ আমরা পেয়েছি; প্রায় প্রতিদিনই দুপুরে তিনি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একদিন প্যারিসে মধ্যাহ্নভোজনের সময় গায়িকা মাদাম এম্মা কালভে জানালেন, শীতে তিনি মিশর যাচ্ছেন। আমি তাঁর সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব করায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর দিকে চেয়ে বললেন ঃ 'আমার অতিথি হয়ে আপনিও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন?' স্বামীজী রাজি হলেন। আমরা রওনা হলাম। ভিয়েনায় দু-দিন, কনস্টান্টিনোপল-এ ন-দিন আর এথেন্সে চারদিন থেকে মিশরে। দিনকয়েক পর স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি এবার যেতে চাই।' জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কোথায় যাবেন, স্বামীজী?' তিনি বললেন ঃ 'ভারতে ফিরবো।' আমি বললাম ঃ 'হ্যাঁ, যান।' 'যাবো?'—তিনি জিজ্ঞেস করলেন। বললাম ঃ 'নিশ্চয়ই'। মাদাম কালভের কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাইছেন।' তিনিও বললেন ঃ 'নিশ্চয়ই যাবেন।' তখন তিনি প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট কিনে স্বামীজীকে ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। দেশে পৌঁছেই তিনি মিঃ সেভিয়ার-এর মৃত্যুসংবাদ পান এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন কেমন শান্ত, সুন্দরভাবে মিসেস সেভিয়ার তাঁর স্বামীর মৃত্যুকে মেনে নিয়েছেন। লিখেছিলেন, মিঃ সেভিয়ার থাকতে যেভাবে তিনি দিন কাটাতেন, ঠিক তেমনিভাবেই মায়াবতী আশ্রমে আবার তিনি তাঁর সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেছেন।

নীলনদ ধরে এগিয়ে চলার সময় অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের কয়েকজন ইংরেজের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে জাপানে যাওয়ার জন্য ঝুলাঝুলি

করতে থাকায় ভারত হয়ে যাওয়ার আবার একটা সুযোগ পেলাম। আবার স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন, আমি যদি তাঁকে যাওয়ার জন্য লিখি তবে তিনিও জাপান যাবেন। জাপান গিয়ে ওকাকুরা কাকুজুর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তিনি টোকিও-র বিজুৎসুইন চিত্রকলা-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি খুব চেয়েছিলেন যে, স্বামীজী জাপানে আসুন, তাঁর অতিথি হয়ে থাকুন। কিন্তু স্বামীজী আসতে না চাওয়ায় মিঃ ওকাকুরাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে ভারতে এলেন। বেলুড়ে কয়েকদিন কাটানোর পর ওকাকুরা যেদিন খুব তেজের সঙ্গে আমাকে বললেন, 'বিবেকানন্দ আমাদের, তোমাদের নন; কারণ তিনি প্রাচ্যদেশীয়', সেটি আমার জীবনের এক আনন্দদায়ক মুহূর্ত। সেদিন আমি বুঝলাম দুজনার মধ্যে ভাবের কতখানি মিল রয়েছে। দু-একদিন পরে স্বামীজী আমাকে বললেন ঃ 'আমার মনে হচ্ছে বহুদিনের হারানো ভাই যেন ফিরে এসেছে।' একদিন স্বামীজী ওকাকুরাকে বললেন ঃ 'তুমি কি আমাদের মঠে যোগ দেবে?' মিঃ ওকাকুরার উত্তর ঃ 'না, জগতের সব ভোগ এখনো আমার শেষ হয়নি।' আমার মতে ওকাকুরা ঠিকই করেছিলেন।

সেইবার গ্রীষ্মে আমেরিকার কনসাল-জেনারেল প্যাটারসন ওঁদের কনসুলেট-এ আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন। সেখানে অতিথি ছিলেন মিঃ ওডা। টৌকিওর আসাকুসা মন্দিরে আমি তাঁরই অতিথি হয়েছিলাম।

সেবার প্রায় সারা বছরই মাঝে মধ্যে স্বামীজীকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এপ্রিল মাসে একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'এই জগতে আজ আমি একেবারেই নিঃস্ব। নিজের বলতে আর একটি পয়সাও আমার নেই। আমাকে যে-যা দিয়েছিল, সব আমি দু-হাতে বিলিয়ে দিয়েছি।' আমি বললাম ঃ 'স্বামীজী, আপনি যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন মাসিক পঞ্চাশ ডলার আমি আপনার সেবার জন্য নিয়মিত দিয়ে যাবো।' তিনি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন ঃ 'তাতে আমার চলে যাবে তো?' আমি বললাম ঃ 'হ্যাঁ, তা চলে যাবে। তবে, বোধহয় ক্রীম খাওয়াটা হয়ে উঠবে না।' তখনই আমি তাঁকে দুশো ডলার দিলাম। কিন্তু চারমাস কাটতে-না-কাটতেই তিনি চিরদিনের জন্য চলে গেলেন!

একদিন বেলুড় মঠে খেলাধূলার কোনও অনুষ্ঠানের পর ভগিনী নিবেদিতা বিজয়ীদের পুরস্কার দিচ্ছিলেন আর আমি স্বামীজীর শোওয়ার ঘরের জানলা দিয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময়ে স্বামীজী আমাকে বললেন ঃ 'আমি

চল্লিশ পেরোবো না।' আমি জানতাম তখন তাঁর উনচল্লিশ চলছে। তাই বললাম ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধদেব তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি তাঁর চল্লিশ থেকে আশি বছরের মধ্যেই করেছিলেন।' স্বামীজী শুধু বললেন ঃ 'যে-বাণী দেওয়ার ছিল, তা আমি দিয়ে দিয়েছি। আমাকে যেতে হবেই।' জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কেন স্বামীজী?' তিনি বললেন ঃ 'বড় গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গাছগুলো বাড়তে পারে না। তাদের জায়গা করে দেবার জন্যই আমাকে যেতে হবে।'

এর পর আমি আবার হিমালয়ে চলে যাই। তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হয়নি। রাজার 'জুবিলি' উপলক্ষ্যে এরপর আমি ইউরোপ ফিরে গিয়েছিলাম। আগেই বলেছি আমি কখনোই তাঁর শিষ্যা ছিলাম না—বন্ধু মাত্র। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে, ভারত ছাড়ার আগের মুহূর্তে, আমার শেষ চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলাম ঃ 'ডুবলে আপনার সঙ্গেই ডুববো, আর ভাসলে, সেও আপনারই সঙ্গে।' কথাটি আমি তিনবার পড়লাম। পড়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম ঃ 'আমি কি এটা মন থেকেই বলছি?' হ্যাঁ, মন থেকেই বলেছিলাম। চিঠিটা তাঁর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলাম। সেই চিঠি তিনি পেয়েও ছিলেন, যদিও আমি তার উত্তর পাইনি। ১৯০২-এর ৪ জুলাই তিনি দেহ রাখলেন।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে স্বামীজীর শেষ সাক্ষাৎকার ২ জুলাই। তিনি তাঁর স্কুলে একটি বিশেষ বিজ্ঞান পড়ানো উচিত হবে কি না, সেই ব্যাপারে স্বামীজীর মতামত নিতে মঠে গিয়েছিলেন। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'তুমি যা করতে চাইছ, হয়তো সেটাই ঠিক। তবে কি জানো, জাগতিক কোনও কিছুতেই আমি আর মন দিতে পারছিনে। আমি এখন মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি। নিবেদিতা ভাবলেন, স্বামীজী বোধহয় একটু অন্যমনস্ক আছেন, তাই এই কথা বলছেন। তখনই স্বামীজী বললেন ঃ 'তোমাকে কিন্তু খেয়ে যেতে হবে।' ভগিনী নিবেদিতা সবসময় হিন্দুদের মতো আঙুল দিয়েই খেতেন। সেদিন তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে, স্বামীজী স্বয়ং তাঁর হাতে জল ঢেলে দিলেন। উপযুক্ত শিষ্যার মতো কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের সুরে ভগিনী নিবেদিতা বলে উঠলেন ঃ 'আপনাকে এসব করতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।' স্বামীজী সেকথা শুনে বললেন ঃ 'যিশুখ্রীস্ট তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।' ভগিনী নিবেদিতার মুখে এসে গিয়েছিল ঃ 'কিন্তু সে তো তাঁদের শেষ সাক্ষাতের সময়!'

স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতারও সেই শেষ দেখা। শেষের সেই দিনে নিবেদিতার কাছে তিনি আমার কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন আরও অনেকের কথা। আমার

কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ 'ও পবিত্রতার মতোই পবিত্র, ভালবাসার মতো মধুর।' আমি কথাগুলিকে আমার প্রতি স্বামীজীর শেষ বাণী হিসাবেই গ্রহণ করেছি। এর ঠিক দু-দিনের মধ্যেই তিনি দেহ রাখলেন। তার আগে বলে গেলেন ঃ 'এই বেলুড় মঠে যে আধ্যাত্মিক শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তা দেড় হাজার বছর ধরে কাজ করে চলবে। কালে এটি বিরাট এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেবে। মনে করো না, এসব আমার কল্পনা, আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।'

৪ জুলাই আমার কাছে তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল ঃ 'স্বামীজী নির্বাণলাভ করেছেন।' বেশ কয়েকদিন আমি মুহ্যমান হয়ে রইলাম। সে টেলিগ্রামের আর কোনও উত্তর দিইনি। তারপর এক অদ্ভুত শূন্যতা, এক নিদারুণ একাকিত্ব আমায় এমন করে গ্রাস করেছিল, যার ফলে বছরের পর বছর আমি শুধু কেঁদেছি। অবশেষে মেটারলিঙ্কের এই কথাগুলি পড়লাম ঃ 'যদি তুমি কারো দ্বারা সত্যিই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে থাক, তবে চোখের জলে নয়, জীবন দিয়ে তা প্রমাণ কর।' এরপরে আমি আর কাঁদিনি, আমেরিকায় ফিরে গিয়ে যেসব জায়গায় স্বামীজী ছিলেন সেগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করতে লাগলাম। সহস্রদ্বীপোদ্যানে গিয়ে মিস ডাচারের অতিথি হলাম। কুটিরটি তাঁরই। স্বামীজী যে ঘরে থাকতেন, তিনি আমায় সেই ঘরটিতেই থাকতে দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ চোদ্দ বছর বাদে আমি আবার ভারতবর্ষে যাই। অধ্যাপক গেডস্ এবং মিসেস গেডস্-এর সঙ্গে গিয়ে সেবার যে ভারতবর্ষ আমার চোখে পড়লো তা শোকাচ্ছন্ন, মুহ্যমান ভারত নয়, বরং স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ, পুনরুজ্জীবিত এক নতুন ভারত। ততদিনে ছ-সাতটা মঠ গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে অসংখ্য শাখাকেন্দ্র ও সমিতি। তারপর থেকে প্রায়ই ভারতে যাচ্ছি। মঠের সকলে চান আমি মঠের অতিথিভবনেই উঠি। মঠের নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীদের কেউই তো স্বামীজীকে দেখেননি; তাই আমার মুখে স্বামীজীর কথা শুনতে তাঁরা খুব ভালবাসেন। ওঁদের বক্তব্য—আমি নাকি স্বামীজীকে জীবন্ত করে তুলি। আর আমিও ভারতবর্ষে থাকতে ভালবাসি। আমার মনে পড়ে, স্বামীজীকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'স্বামীজী, কিভাবে আমি আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারি?' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'ভারতবর্ষকে ভালবাস।' তাই বেলুড় মঠের অতিথিভবনের ওপরতলাটা এখন একরকম আমারই হয়ে গেছে। প্রতি বছর শীতে ওখানে যাই; সম্ভবত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যাবো।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ডিসেম্বর ১৯৪৯)

[স্বামীজীর দেহান্তের পর বেলুড় মঠের অতিথিভবন থেকে লেখা একটি তারিখবিহীন চিঠিতে মিস ম্যাকলাউড তাঁর জীবনে স্বামীজীর প্রভাব এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ]

...স্বামীজীর অনন্ততাই আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেই অতলান্ত গভীরতার তলদেশ স্পর্শ করা তো দূরের কথা, তার ধারেকাছে যাওয়ার সাধ্যও আমার ছিল না। এতই বিরাট ছিলেন তিনি! ... আহা, তাঁর সান্নিধ্যে এসে সকলেই মুক্তির স্বাদ অনুভব করতেন। এই যে মহাপুরুষের সঙ্গ, তার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে কে কতটুকু প্রভাবিত হলেন, সেটিই বড় কথা, তাই নয় কি? কে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারলেন, সেটাই বিচার্য।

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, সংশয়াতীতভাবে চরম সত্যে আমি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি কি না। হ্যাঁ, জোর গলায় বলছি, আমি তা পেরেছি। আর আমার সফলতার এই অনুভূতি আমার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। স্বামীজীর মধ্যে যে সত্যের আলো আমি দেখেছি তাই আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে। অন্যের দোষত্রুটি বিচার করতে যাওয়াটা এখন বড়ই অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। কেনইবা এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মেতে থাকা, যখন জানি অনন্ত সত্য-সমুদ্রে পরমানন্দে আমরা নৃত্য করতে পারি? আমি নিঃসন্দেহ, আমাকে মুক্ত করতেই স্বামীজী এসেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করার মতো, মিসেস এস-কে ঐক্যানুভূতিতে নিষিক্ত করার মতো, আমাকে মুক্ত করাটাও তাঁর অন্যতম কাজ ছিল।

কিন্তু জগৎকে ত্যাগের আদর্শ দেখানোই হলো ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। তাই ভারতের ত্যাগব্রতী কর্মীরা এবং ভারতবর্ষের জন্য বিশেষভাবে কাজ করেছেন এমন একজন [নিবেদিতা] প্রায়ই বলতেন ঃ 'দিনরাত একটি কথাই আমার কানে বাজে—ভুলো না, ত্যাগের চাইতে বড় আর কিছু নেই।' আর ঐখানেই ছিল তাঁর জোর, যে জোরে তিনি বর্তমান ভারতের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়দের প্রাণের মানুষ হয়ে রইলেন। আমার কোনও ত্যাগ নেই বটে, তবে আমি মুক্ত। আমার কাজ স্বাধীনভাবে ভারতকে তার অগ্রগতির পথে সাহায্য করা; আনন্দের সঙ্গে দু-চোখ ভরে শুধু দেখা—ভারত এগোচ্ছে। দুস্তর জীবন-অরণ্যের মধ্য থেকে নতুন পথ কেটে মুক্তির সন্ধান যারা করছে, ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সেইসব তরুণ আদর্শবাদীদের যখন আমি দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। ...

স্বামীজীকে আমার মনে হয় হিমালয় যাঁর ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা দাঁড়াতে পারি। আমার জীবনে স্বামীজীর ভূমিকা ছিল তাই। পুজোআর্চা নয়, গৌরব অর্জন করা নয়, স্বনির্ভর হয়ে অটল আত্মবিশ্বাসের শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে জীবন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার শক্তিই তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি! তাই, অবশেষে আজ আমি মুক্ত। আর মুক্তির স্বাদ যে কী অদ্ভুত তা কি বলবো! পাশ্চাত্যে আমার পাওয়ার আর কিছুই নেই, আমার সবকিছুই এখানে, এই ভারতবর্ষে।

...অতিথিভবনের ওপরতলায় দুটি নতুন ঘর নিয়ে আমি আছি। শান্ত নদীর ধারে খোলামেলা মুক্ত পরিবেশে খুব আরামেই আছি। অন্য কোথাও প্রশান্তির এই প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটানো আমার কাছে অকল্পনীয়। আমার ঘরে এখন অঢেল জায়গা—দামি আসবাবের চিহ্নমাত্র নেই, নেই মূল্যবান কার্পেট, ছবি বা শৌখিন বাসন-পত্র। থাকার মধ্যে কয়েকটা চায়ের কাপ-ডিশ ইত্যাদি। বিষয়ের বোঝা আমার কাঁধ থেকে নেমে গেছে। নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করার বাতিক, তাদের যত্ন নেওয়া—এসব যেন কোথায় বাতাসের মতো মিলিয়ে গেছে। এত নির্জনতা, তবুও আমার কখনোই একা লাগে না! [একাকিত্ব আমি সহ্যই করতে পারি না।] এই স্থূল শরীরেই স্বর্গবাস সম্ভব; তার জন্য দেহত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।

তাই সময় সময় মনে হয়—মানুষ কেন যে এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বাস করতে চায়, সেই জানে। আশ্চর্য!

মিসেস লেগেটকে[২] স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ 'ভগবান আমাদের এক ছটাক জ্ঞান আর একটু বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ঐসবে আমি আর ভুলছি না। এবার আমি জেগেছি। বিচার-বুদ্ধির চেয়েও বহুগুণ বড় জিনিসের সন্ধান আমি পেয়েছি—আর তা হলো প্রেম।' মস্তিষ্ক এবং হৃদয়, আমার মনে হয়, দুটিই চাই।

(বেদান্ত এ্যন্ড দ্য ওয়েস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬২)

---

২. চিঠিটি মিঃ লেগেট-কে লেখা। মূল চিঠি এবং উদ্ধৃতির মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য আছে The Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, vol. VI, p. 367, দ্রষ্টব্য।

কনস্টান্স টাউন

আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে সনাতন ভারতবর্ষের এমন এক নির্ভীক ও সুদর্শন যুবক নব্য আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন যাঁর মুখখানি ছিল আত্মজয়ের প্রভায় উজ্জ্বল। আমেরিকার মানুষ তাঁকে চিনতেন না, জানতেন না। তাই ঐ নবীন ভারতীয়ের এই দেশে আসার পিছনে না ছিল কোনও আমন্ত্রণ, না ছিল কোনও সাড়ম্বর পূর্বঘোষণা...।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং বেশভূষার নানান কষ্ট সত্ত্বেও সমস্যাসঙ্কুল এই তীর্থযাত্রায় বিবেকানন্দ কেমন শান্ত পদবিক্ষেপে একের পর এক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে আপন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, ধর্মমহাসভার চূড়ান্ত অধিবেশনে বক্তা হিসেবে তিনি কেমন করে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন, সরল, সহজ, অথচ প্রাণস্পর্শী বাণীর সৌন্দর্যে কেমন করে তিনি শ্রোতাদের মধ্যে অসীম শক্তির সঞ্চার করেছিলেন, বক্তৃতার পরের দিন তিন-তিনটি মহাদেশের বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলি তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমার জয়ধ্বনি করতে কেমন উঠে পড়ে লেগেছিল, বিশ্বের মহত্তম শিক্ষাগুরুদের মধ্যে তাঁর স্থান কত উঁচুতে সেই গবেষণায় ব্যাপৃত হয়েছিল—সেসব কথা সেই প্রজন্মের মানুষ, যাঁরা এখনো অনেকেই জীবিত, তাঁদের মনে আজও জলছবির মতো ভাসে।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার একান্ত ব্যক্তিগত স্মৃতি যা আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি, খুব সম্ভব তা অনেকের সাথেই মিলবে না। আমি যখন তাঁকে প্রথম দর্শন করি তাঁর বয়স সাতাশ।[১] পাথর-কুঁদে-করা কোনও গ্রীক দেবমূর্তির মতো সুন্দর তাঁর চেহারা। অন্তত আমার চোখে তা-ই মনে হয়েছিল। তাঁর গায়ের রং একটু শ্যামলাই। তাঁর বড় বড়, টানা টানা চোখদুটির দিকে তাকালে মনে হতো মধ্যরাতের 'গভীর কৃষ্ণনীল আকাশ' বুঝিবা মাটিতে নেমে এসেছে। তাঁর দেশের মানুষ সচরাচর যেমন ছোটখাট পাতলা গড়নের হয়ে থাকে, স্বামীজী কিন্তু মোটেই সে রকম ছিলেন না। তাঁর চেহারার বাঁধুনি ছিল খুব দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। আর মাথায় ছিল ছোট ছোট কোঁকড়ানো একরাশ কালো চুল। প্রথম দিন আমাদের দুজনের গায়ের রং-এর আকাশ-পাতাল

---

১ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স তখন ৩১ বছর। প্রকাশক

ফারাক দেখে আমি তো অবাক! আমার বয়স তখন চব্বিশ। সুশ্রী, ছিপছিপে লম্বা চেহারা আমার। মাথায় সোনালি চুল, চোখদুটি ধূসর-নীল। দুজনার মধ্যে এর চেয়ে বড় বৈসাদৃশ্য আর কি হতে পারে?

বিবেকানন্দের সাথে আমার প্রথম পরিচয়টি ঘটে একটু অদ্ভুতভাবেই। শিকাগোয় অভূতপূর্ব সাফল্যের পর বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বামীজীকে বারবার নিউইয়র্কে আসবার আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন। কারণ নিউইয়র্কের রীতিই ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষকে আপ্যায়ন করা। যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় নিউইয়র্কে একজন বিখ্যাত ডাক্তার থাকতেন। তাঁর নাম এগবার্ট গার্নসী। ডাঃ গার্নসী অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, অমায়িক ও বিস্তর পড়াশুনাকরা-লোক। পঞ্চম অ্যাভিনিউ-এর ৪৪ নং রাস্তায় তাঁর একটি বিশাল বাড়ি ছিল; সেখানেই তিনি সপরিবারে থাকতেন। পরিবারের কথা যখন উঠলই, তখন বলি, ডাঃ গার্নসীর মতো তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাও অতিথি অভ্যাগতদের খুব ভালবাসতেন। এককথায়, তাঁরা অতি চমৎকার মিশুকে মানুষ ছিলেন। কোনও বিশিষ্ট বিদেশী অতিথি এলেই ডাঃ গার্নসীর রেওয়াজ ছিল তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিউইয়র্কের বাছা বাছা মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এই কাজে মিসেস গার্নসী ও তাঁদের কন্যা-রত্নটির ভূমিকাও নেহাত কম ছিল না। ধর্ম ও বিশ্বশান্তির স্বার্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের যে আদর্শ স্বামীজী আমেরিকার জনগণের কাছে তুলে ধরেছিলেন, ডাঃ গার্নসীকে তা খুবই আকৃষ্ট করেছিল। তাই স্বামীজীর মতো মহাপুরুষকে যে তিনি বিশেষভাবে সম্মান জানাবেন সেটা যেন আমাদের প্রায় জানাই ছিল।

ঘটলোও তাই। স্বামীজীর সম্মানে ডাঃ গার্নসী এক ডিনারের আয়োজন করলেন। তিনি ঠিক করলেন রবিবাসরীয় সেই ভোজসভায় নিমন্ত্রিতরা প্রত্যেকেই একটা না একটা ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। রবার্ট ইঙ্গারসোল সে সময় শহরে না থাকায় ঠিক হলো তিনি নিজেই ইঙ্গারসোলের মত সমর্থন করবেন। মহামান্য কার্ডিনাল গোড়ায় কিছুটা আগ্রহ দেখালেও শেষপর্যন্ত ডিনারে আসতে রাজি হলেন না। এমনকি যখন তাঁকে অনুরোধ করা হলো—আপনি না আসতে পারলে অন্য কোনও যাজককে পাঠান—তখন সে প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি রাজি না হওয়ায় অবশ্য একদিক দিয়ে আমারই সুবিধে হলো। আমি একে ক্যাথলিক, তার ওপর প্রখ্যাত জেসুইট ধর্মযাজক উইলিয়াম ও ব্রিয়েন পারদোঁ, এস. জে-র কাছ থেকে তালিম পেয়েছি; এ-সবই

ডাঃ গার্নসী জানতেন কারণ তিনি আমার চিকিৎসা করতেন এবং সেই কারণেই খবর পাঠিয়ে তিনি জানান ভোজসভায় আমাকে হাজির থেকে ক্যাথলিক মতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে সেদিন সেখানে ডাঃ পার্কহার্স্ট এবং আমেরিকার বিখ্যাত অভিনেত্রী মিনি ম্যাডার্ন ফিস্কেও ছিলেন। ফিস্কে অবশ্য তখন অতিথি হয়ে গার্নসীদের বাড়িতেই ছিলেন। মনে আছে, খাবার টেবিলে আমরা সর্বসাকুল্যে মোট চোদ্দজন ছিলাম।

স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ঠিকই করে নিয়েছিলাম যে তাঁর অখ্রীস্টান ধ্যানধারণার সঙ্গে যদি আমাদের না-ও মেলে ('পৌত্তলিক' কথাটা বড় খারাপ শোনায়) তবুও আমরা বাদানুবাদে না গিয়ে তাঁর সঙ্গে খুব সংযত এবং মধুর ব্যবহারই করবো। কিন্তু হায়! ভোজসভা শুরু হতে দেখা গেল স্বামীজীর সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ কিছুই হলো না; কিন্তু খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন!

স্বামীজীর ঠিক পাশেই আমি বসেছিলাম। স্বামীজী এবং আমি দুজনই চুপচাপ এই হাস্যকর পরমত অসহিষ্ণুতার প্রকাশ দেখে মনে মনে এক ধরনের কৌতুক বোধ করছিলাম। কিন্তু গৃহস্বামীর সে উপায় ছিল না। তাঁর শতেক জ্বালা! যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় এবং অতিথিদের আহারপর্বটা যাতে নির্বিঘ্নে চুকে যায় সেজন্য মাঝে মাঝেই মজার মজার সব কথা বলে তিনি পরিবেশটিকে সহজ করে দিচ্ছিলেন। ভারতবর্ষ ও সে দেশের মানুষের নানান প্রথা ও রীতিনীতির প্রসঙ্গ উঠলে স্বামীজী থেকে থেকেই সেগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল দর্শন ও ধর্মবিষয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠা করা। আমেরিকায় বেদান্তকেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাঁর চেয়ে উদার ও সহনশীল মানুষ তামাম ভারতবর্ষে আর কেউ ছিলেন বলে আমার মনে হয় না।

ডাঃ গার্নসীর ভোজসভায় স্বামীজী যখন এলেন তখন তাঁর গায়ে কমলা রং-এর সিল্কের জোব্বা আর মাথায় ছিল সোনালি সুতোর কাজকরা সাদা পাগড়ি। পায়ে মোজা ছিল না। তিনি শুধু নরম বাদামি চামড়ার একজোড়া চটি পরেছিলেন। আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত এই ভোজসভাতেই। পরে বৈঠকখানায় বসে তিনি আমায় বলেছিলেন ঃ 'মিস গিবন্স্, আপনার ও আমার দর্শন এবং ধর্মবিশ্বাসের মূলকথা একই।'

আমি তখন আমার মায়ের সাথে সেন্ট্রাল পার্কের খুব কাছাকাছি ১নং ইস্ট,

৮১ নং স্ট্রীটে বেরেসফোর্ড অ্যাপার্টমেন্টস-এ থাকি। মা ছিলেন পুরোদস্তুর দক্ষিণী। তাঁর শৈশব কাটে সাউথ ক্যারোলিনার অন্তর্গত চার্লসটন্-এ। ফরাসী রাজপরিবারের রক্ত ছিল তাঁর গায়ে। অপরূপ সুন্দরী বলে মায়ের খুব খ্যাতিও ছিল। তাঁর চোখ এবং চুল—দুটিই ছিল ঘন কালো। তাঁর রসবোধ ছিল এবং হৈ-হুল্লোড়, আমোদ-প্রমোদ খুব পছন্দ করতেন। চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডকে কেন্দ্র করে যেসব সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান হতো, তাতে তাঁর যাওয়া চাই-ই চাই। কারণ তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল দুনিয়ার যত অভিজাত মানুষ, তাঁরা সকলেই চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের সদস্য। অতএব বলাই বাহুল্য, আমার এবং স্বামীজীর দুজনার কারোরই মায়ের ঐ কল্পিত ঘেরাটোপের মধ্যে ঠাঁই ছিল না।

ডাঃ গার্নসীর ডিনার পার্টি থেকে ফিরেই মাকে স্বামীজীর কথা সব খুলে বললাম। এ-ও বললাম ঃ 'মা, মানুষের মন যে কত উন্নত, কত উদার হতে পারে তা আজ স্বচক্ষে দেখে এলাম। আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলছি, আমাদের মাঝে আজ এক প্রচণ্ড শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে।' আমার কথার উত্তরে মা বললেন ঃ 'কি ভয়াবহ ভোজসভা রে বাবা! যত রাজ্যের মেথোডিস্ট, ব্যাপ্টিস্ট, প্রেসবিটেরিয়ান সব একসঙ্গে, আবার তারই মধ্যে কমলা পোশাক পরা এক কালো পৌত্তলিক!' এ কথা বললেও মা কিন্তু ধীরে ধীরে বিবেকানন্দের প্রতি একটা টান অনুভব করছিলেন; বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও বাড়ছিল। ফলত একদিন দেখা গেল তিনি একটি বেদান্তকেন্দ্রে যাতায়াত শুরু করেছেন। মায়ের কাণ্ডকারখানা দেখে স্বামীজী খুব মজা পেতেন। আজ এতগুলি বছর পরেও, এই মুহূর্তে আমি স্বামীজীকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, তাঁর সম্পর্কে মায়ের মন্তব্য শুনে তিনি হো হো করে হাসছেন।

এক সোমবার সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটান অপেরাতে 'ফাউস্ট' মঞ্চস্থ হয়েছিল। মেলবা, দ্য রেজকে, ব্যেরমেইস্টার-এর মতো বিখ্যাত তারকারা তাতে অভিনয় করেছিলেন। ফলে অভিনয়ের রাতে সমাজের গণ্যমান্য মানুষ বিশেষত সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ভিড়ে হলে ছুঁচটি পর্যন্ত গলার জায়গা ছিল না। অবশ্য অপেরা দেখা তো আর তাঁদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তাঁরা সেজেগুজে, হীরে জহরতে শরীর মুড়ে বক্সে এসে এমন কায়দায় বসবেন যাতে সকলের মুগ্ধ দৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়ে। অপেরা দেখার চেয়ে নিজেদের দেখানোয় তাঁদের অনেক বেশি আগ্রহ। এবং এই একই কারণে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা মন্দাক্রান্তা ছন্দে হলে ঢুকবেন এবং আসনে বসে সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করবেন।

সেদিনের অনুষ্ঠানে আমাদের জন্য কয়েকটি বিশেষ আসন সংরক্ষিত ছিল, তাছাড়া স্বামীজী কখনো অপেরা দেখেননি। সেসব কথা মনে রেখেই আমি বললাম—আচ্ছা, স্বামীজীকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলে কেমন হয়? সেকথা শুনে মা স্বামীজীকে বললেন ঃ 'কিন্তু আপনি যে কালো। লোকে দেখলে কি বলবে?' স্বামীজী হেসে বললেন ঃ 'আমি আমার বোনের পাশেই বসবো। আর আমি এও জানি আমার বোন এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

স্বামীজীকে সেদিন এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আশপাশের সবাই বারবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছিলেন। এবং আমি প্রায় এক রকম নিশ্চিত সে-রাতে তাঁরা আদৌ অপেরা শোনেননি।

বিবেকানন্দের হয়তো সুবিধে হবে এই ভেবে আমি থেকে থেকেই ফাউস্ট-এর গল্পটি তাঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। ব্যাপারটি মায়ের নজরে পড়তেই তিনি বলে উঠলেন ঃ 'হায় ভগবান, তুই করছিস কি! তুই না একটা অল্প বয়সের মেয়ে? এ রকম লক্ষ্মীছাড়া গল্প একজন পুরুষকে বলা তোর মোটেই উচিত নয়।' তা শুনে স্বামীজী বললেন ঃ 'কাহিনীটা যদি ভালই না হয়, তাহলে আপনিই বা ওকে এখানে আনলেন কেন?' মার উত্তর ঃ 'দেখুন, সমাজে থাকতে গেলে এসব অপেরা-টপেরায় একটু আধটু আসতে হয়। না এসে পারা যায় না। মানছি, অপেরার গল্পগুলো বাজে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে আলোচনা না করলেও তো চলে।'

বলিহারি মানুষের নীতিবোধ! তার মূর্খামির জন্য সত্যিই দুঃখ হয়। যাহোক, যে-কথা বলছিলাম, অপেরা দেখতে দেখতে পরে এক সময় স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আচ্ছা বোন, মঞ্চের ওপর ঐ-যে ভদ্রলোকটি গান গেয়ে সুন্দরীকে প্রেম নিবেদন করছেন, উনি কি যথার্থই ভদ্রমহিলাকে ভালবাসেন?' বললাম ঃ 'হ্যাঁ, স্বামীজী।' স্বামীজী আমার কথায় অবাক হয়ে বললেন ঃ 'কিন্তু ভদ্রলোকটি তো মেয়েটির প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন, ওঁকে দুঃখ দিয়েছেন।' মৃদুস্বরে বললাম ঃ 'তা অবশ্য দিয়েছেন।' আমার কথা শেষ হতে না হতেই স্বামীজী বলে ওঠেন ঃ 'ও হরি, এইবার বুঝেছি! উনি মোটেই ঐ সুদর্শনাকে ভালবাসেন না। লালপোশাকপরা লেজবিশিষ্ট ঐ যে সুপুরুষ, যাকে তোমরা—কি যেন বল, ওঃ মনে পড়েছে, শয়তান, ঐ শয়তানকেই উনি ভালবাসেন।' এইভাবেই তাঁর শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মন দিয়ে স্বামীজী সবকিছুই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে এলেন—যেমন অপেরা, তেমনি তার দর্শক! দুটিই অন্তঃসারশূন্য!

অপেরার একটি অঙ্ক শেষ হয়েছে, আর একটি অঙ্ক শুরু হবে। ঠিক এমনি সময়ে অতি অল্পবয়সী এক ধনীর দুলালী এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'হলুদ পোশাক পরা ঐ সুদর্শন ভদ্রলোকটি কে? ওঁর পরিচয় জানার জন্য আমার মা ছটফট করছেন।'

আমার ও স্বামীজীর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং আমার ধারণা, সেই সখ্যতার কথা জগতের কেউ এখনো জানে না। আমাদের সম্পর্ক ছিল কেবলই আত্মিক; দ্বন্দ্বময়, পার্থিব জগতের কোনও ভাবেরই সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। আমাদের আত্মার কখন, কোথায় এবং কিভাবে পরমগতি হবে—সে কথাই তিনি আমার কাছে সদাসর্বদা বলতেন। তিনি আমার কথা কখনো কাউকে বলেননি, এমনকি নামটিও নয়। বাস্তবিক, আমাদের মধ্যে ছিল এক অশরীরী বন্ধুত্ব, এক নিবিড় আত্মিক যোগ। এখনো ঠিক তা-ই আছে।

স্বামীজীর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। তিনি যে দর্শন তাঁর লেখায় এবং বক্তৃতায় প্রচার করে গেছেন, তার অনেক কিছুই আমাকে শিখিয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক, কেমন করে ধ্যান করতে হয়, ধ্যানের শক্তি মানুষকে কিভাবে জগতের সব দুঃখকষ্ট উপেক্ষা ও অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং কেমন সংশয়াতীত-ভাবে বুঝিয়ে দেয় দেহধারণ ও দেহকে সুস্থ, সবল রাখার উদ্দেশ্য কি। বুদ্ধি ও চিন্তার বিকাশের জন্য, আত্মসংযমের জন্য, নির্মল, সুগভীর আনন্দের জন্য, এমনকি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা লাভের জন্যও ধ্যান কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে, তার রহস্যও তিনি আমার কাছে মেলে ধরতেন। তিনি বলতেন, অন্যের মঙ্গল করবার ক্ষেত্রে ধ্যানের শক্তি অসীম। এর দ্বারা অন্যকে খোলা পুঁথির মতো পড়ে নেওয়া যায়; বোঝা যায় কার কি অভাব। এর দ্বারা নিজের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য কতটা কি প্রয়োজন তাও বোঝা যায়। বোঝা যায় বলেই ধ্যান আমাদের আহারে বিহারে সংযম এনে দেয়। আমাদের পবিত্রতা, ধৈর্য এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করতে শেখায়। এবং সবচাইতে বড় কথা, আমরা ধ্যানের মাধ্যমে কেবল একটি বিশেষ মানুষকেই নয়, সমস্ত জগৎকে, অবিচ্ছিন্ন জগৎসত্তাকে ভালবাসতে, আপনার করে নিতে পারি।

আজ চল্লিশ বছর পর তিনি আমাকে এক সুদীর্ঘ নীরবতা থেকে মুক্তি দিলেন। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ অনুযায়ী এখন কয়েকটি কাজ করবো, এই আমার অভিলাষ।...

কী উদারই না ছিলেন তিনি! অন্যের মতামত ও চিন্তাধারাকে কী গভীর সহানুভূতির সঙ্গেই না দেখতেন! একদিন তিনি আমার সাথে ২৮ নং স্ট্রীটের ছোট্ট সেন্ট লিও চার্চের প্রার্থনায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেন্ট লিও চার্চের সবকিছুই অতি সুন্দর ও দৃষ্টি-নন্দন। আর ওখানকার বৃদ্ধ যাজক, ফাদার ডিউসি ছিলেন একজন সত্যিকারের শিল্পী। তখন ভরদুপুর। প্রার্থনাসভায় যেই বাইবেল থেকে পাঠ শুরু হলো, অমনি বিবেকানন্দ নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। দৃশ্যটি একবার কল্পনা করুন! স্বামীজী ঐভাবে বসে আছেন। আর গির্জার রঙিন কাঁচের জানলার মধ্য দিয়ে নীল, লাল ও সোনালি আলোর রশ্মি ঠিকরে এসে তাঁর সাদা ফুলের মতো পাগড়িটিকে অপূর্ব রং-এ রাঙিয়ে দিয়েছে এবং মর্মর দেওয়ালের বুকে ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর অনিন্দ্য বরতনুর বর্ণাঢ্য রূপরেখা। শুভ্র স্ফটিকস্বচ্ছ মেঝেতে তাঁর গৈরিকের ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে যেন লেলিহান অগ্নিশিখা, এবং সেই অগ্নিময় জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে তাঁর নিরুপম মুখকমল ঐকান্তিক প্রার্থনায় নিশ্চল, সমাহিত।

স্বস্তিবচন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন গির্জার ঘণ্টাগুলি মধুর সুরে বেজে উঠলো এবং উপস্থিত সকলেই প্রার্থনাসভার বেদিমূলে যিশুর দৈবী সান্নিধ্য উপলব্ধি করে প্রণত হলেন, তখনই, ঠিক সেই মুহূর্তেই, আমার একটি হাত আলতো করে স্পর্শ করে মৃদুস্বরে স্বামীজী বললেন ঃ 'এই দেখো, আমরা দুজনেই একই ঈশ্বর, একই দেবতার পুজো করি।'

(প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯৩৪)

মেরি সি. ফাঙ্কি

আহা, জায়গাটা বড় সুন্দর! বাড়ির একতলায় বেশ বড়সড় একটা ক্লাসরুম ও রান্নাঘর, আর দোতলায় বেশ কয়েকটা শোয়ারঘর। ঐ বাড়িরই একটা অংশে স্বামীজী নিরিবিলি আলাদা থাকেন। তাঁর যাওয়া-আসার জন্য বাইরের দিকে পৃথক একটা সিঁড়ি। তাঁর ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট বারান্দা, এবং সেখানেই প্রতি সন্ধ্যায় তিনি আমাদের সকলকে ডেকে পাঠান। এই বারান্দা থেকে চারপাশটা এত মনোহর লাগে যে কী বলবো! অবশ্য তা হবে না-ই বা কেন? আশপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় আমাদের কটেজটি যে উঁচুতে। তাই বারান্দায় দাঁড়ালেই সারি সারি গাছের মাথা ছুঁয়ে আমাদের দৃষ্টি চলে যায় দূরে, বহু দূরে যেখানে রূপসি সেন্ট লরেন্স নদী মাইলের পর মাইল এঁকেবেঁকে হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের শীতে স্বামীজী ডেট্রয়েটে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সবগুলিই আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত আলাপ ছিল না, আলাদাভাবে আমরা কখনও তাঁর সাথে দেখাও করিনি। তাই আমরা তাঁর কাছে এক রকম অপরিচিতই ছিলাম বলা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত মধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন যে আমরা অভিভূত না হয়ে পারিনি। ভাবুন তো তখন আমাদের মনের কি অবস্থা!

সহস্রদ্বীপোদ্যানের কটেজে যখন পৌঁছলাম তখন ভয়ে, উৎকণ্ঠায় আমরা প্রায় দিশেহারা ও আধমরা। কারণ স্বামীজী বা তাঁর অনুগামীদের কেউই আমাদের অস্তিত্বের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতেন না; অথচ আমাদের এতই দুঃসাহস যে সেসব জেনেও, শুধু তাঁকে অনুসরণ করেই, সাতশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা এক জায়গায় এসে পড়েছি! আর শুধুই কি আসা? দেখা হওয়া মাত্রই তাঁকে বললাম ঃ 'কৃপা করে আমাদের গ্রহণ করুন। তিনিও নির্দ্বিধায় আমাদের গ্রহণ করলেন। তাঁর কৃপা-করুণায় সেই মুহূর্তেই আমরা ধন্য হয়ে গেলাম!'

বৃষ্টিবাদলার রাত। চতুর্দিকে চাপ-চাপ অন্ধকার। স্থানীয় লোকজন কাউকেও আমরা চিনি না। কিন্তু আমাদের আর তর সইছিল না। এক-একটা মুহূর্ত তখন

সোনার চেয়েও দামি। স্বামীজী-সন্দর্শনের চিন্তা তখন আমাদের পাগলপারা করে তুলেছে। তাই সব বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু যাব কোথায়? কোন্ দিকে গেলে তাঁর দেখা পাব? কিছুই বুঝতে পারছি না। সহসা আমাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঠিক হলো ধারে-কাছে যেখানেই দোকান দেখব সেখানেই মিস ডাচারের খোঁজ করব। এইভাবে হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে এক জায়গায় শুনলাম, হ্যাঁ, শ্রীমতী ডাচার নামে এক ভদ্রমহিলা কাছাকাছি একটা কটেজে থাকেন বটে এবং 'অদ্ভুত পোশাক-পরা এক বিদেশী ব্যক্তি'-ও সেখানে আছেন।

আমরা বুঝলাম খোঁজার পালা শেষ; আমরা ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছি। একটি লোকও পাওয়া গেল। লণ্ঠন হাতে সে-ই আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ওঃ, কী পিছল আর খাড়া পথ রে বাবা! পা টিপে টিপে উঠছি তো উঠছিই। বৃষ্টিতে জায়গায় জায়গায় এমন হড়কাচ্ছে যে মনে হচ্ছে এক পা এগোই তো দু-পা পেছোই।

শ্রীমতী ডাচারের বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই আমাদের কানে ভেসে এল স্বামীজীর মধুর, সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁদের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। আমাদের বুকের ভেতরটা তখন এমন ধড়াস ধড়াস করছে যে, আমার নিশ্চিত ধারণা, বাইরে থেকেও তা শোনা যাচ্ছিল। গৃহকর্ত্রী স্বামীজীকে জানালেন 'ডেট্রয়েট থেকে দুজন মহিলা এসেছেন; তিনি যেন নিচে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন।' খবর পাওয়া মাত্রই স্বামীজী এলেন এবং এত মধুরভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন যে মনে হলো আমাদের জীবনে যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে এসেছে। তিনি বললেন ঃ 'ডেট্রয়েট আমার ভাল লাগে। ওখানে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, জানেন তো?'

আসার সময় ভাবছিলাম হয়তো এই রাতবিরেতে কোনও হোটেল বা বোর্ডিং-এ থাকতে হবে। কিন্তু ওখানকার সহৃদয় মানুষগুলির বুকে এতটাই ভালবাসা যে তাঁরা কিছুতেই আমাদের অন্যত্র যেতে দিলেন না। তাঁরা আমাদেরও ঐ ভক্ত-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চাইলেন; করে নিলেনও। আর ওঁদের সকলের প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় আমাদের হৃদয় ভরে উঠলো।

এই হলো এখানে থেকে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। ভাবা যায়, বিবেকানন্দের সঙ্গে আমরা একই বাড়িতে আছি? সকাল আটটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমরা তাঁরই মুখের কথা শুনছি? আমি তো বাবা স্বপ্নেও ভাবিনি এ রকম

সর্বাঙ্গসুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে কোনও দিন থাকতে পারব। বিবেকানন্দের পূত সান্নিধ্যে থাকা! তাঁর শিষ্যা হওয়ার সৌভাগ্য! না, না, সত্যি বলছি এ আমি কখনও কল্পনাও করিনি। এক-এক সময় ভাবি, কোনও একদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে নির্ঘাৎ দেখব যে এ সবই স্বপ্ন। কারণ এটা তো ঠিকই, বিবেকানন্দ আমাদের কাছে স্বপ্নই ছিলেন; তাঁকে পাওয়াটাই ছিল স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্ন আজ সাকার হয়েছে! তাহলে কি এটাই বুঝতে হবে—আজ যা স্বপ্ন, আগামী কাল সেটাই বাস্তব হয়ে প্রতিভাত হবে? আমরা কি 'স্বপ্ন দিয়েই তৈরি?'

বিবেকানন্দ সর্বদা অধ্যাত্মজগতের চরম ও মহত্তম সত্যটিই আমাদের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর শিক্ষার মধ্যে কোনও আজগুবি ভাঁওতা নেই । নেই কোনও ভূতুড়ে বা শয়তানের অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। তাঁর মুখে সর্বক্ষণই ঈশ্বর নয়তো যিশু ও বুদ্ধের কথা। আমার ধারণা, আমি আর কখনোই আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারব না। কারণ 'সত্য' কি—তার কিছুটা আভাস আমি পেয়েছি।

একবার শুধু ভেবে দেখ—কী কপাল আমাদের! বিবেকানন্দের কথা শুনতে শুনতে খাওয়া-দাওয়া, প্রতিদিন সকালে তাঁর ক্লাস করা এবং রাতে ওপরের বারান্দায় বসে আবার তাঁর কথামৃত শোনা। মাথার ওপরে অনাদি যুগের তারারাও যেন সেসব কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করে! বিকেলে আমরা বেশ কিছু পথ হেঁটে আসি। আর সেই সময় লক্ষ্য করি, স্বামীজীর ভাবঘন দৃষ্টিতে সবই চিন্ময়। তিনি তখন অনায়াসেই 'কলস্বনা তটিনী-তরঙ্গে শাস্ত্রবাণীর ঝঙ্কার শুনতে পান, উপলখণ্ডে খোদিত দেখেন ধর্মোপদেশ আর সর্বভূতে প্রত্যক্ষ করেন ঈশ্বরের মঙ্গলময় উপস্থিতি।' আবার এই স্বামীজীই একেক সময় এমন হাসিখুশি সদানন্দ এবং কৌতুকপ্রিয় যে হাসতে হাসতে আমাদের পাগল হওয়ার অবস্থা!

পরবর্তী বিবরণ ঃ তোমাকে যখন এর আগে লিখেছিলাম, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ক্রমাগত চিন্তাজগতের উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করেই চলেছি। স্বামীজীর কথা—ডেট্রয়েট বলে যে কোনও জায়গা আছে, তা আপাতত একেবারে ভুলে যাও। অর্থাৎ তিনি বলতে চান—তাঁর উপদেশ গ্রহণের সময় কোনও স্বার্থবুদ্ধি অথবা ব্যক্তিগত চিন্তা যেন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন না করে। তাঁর উপদেশ ঃ সামান্য ঘাস থেকে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবের মধ্যে, এমন-কি 'নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষের' মধ্যেও, যে ঈশ্বর আছেন তাঁকে দেখবার চেষ্টা কর।

সত্যি কথা বলতে কি, সময় এত কম যে এখান থেকে চিঠি লেখা এক রকম প্রায় অসম্ভব। এখানে জায়গা কম, লোক বেশি। তাই ছোটখাট অসুবিধা মানিয়ে নিতে হয়। এখানে বিশ্রাম বা আরাম করার মতো পর্যাপ্ত সময় আমাদের হাতে নেই কারণ শীঘ্রই স্বামীজী ইংল্যাণ্ড চলে যাচ্ছেন। সাজসজ্জার দিকে নজর দিয়েও আমরা বিন্দুমাত্র সময়ের অপচয় করি না, পাছে তাঁর কোনও কথা, মণিমুক্তার মতো মূল্যবান কোনও কথা শুনতে না পাই। সত্যি বলতে কি, তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমাদের কাছে মহার্ঘ রত্নের চেয়েও দামি। তুমিই বল, সামান্য জিনিসের বদলে কে আর মণিমাণিক্য খোয়াতে চায়? স্বামীজী যাই বলেন, একটি কথা আরেকটি কথার সাথে এমন সুন্দর ভাবে খাপ খেয়ে যায়, যেন কথার নকশি কাঁথা! আলোচনার সময় তিনি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গেলেও প্রতিবারেই অবলীলায় মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলেন—'ঈশ্বর লাভ করতে চেষ্টা কর। তিনি ছাড়া আর সবকিছুই অসার।'

স্বামীজীকে কেন্দ্র করে সহস্রদ্বীপোদ্যানের এই যে অধ্যাত্ম পরিমণ্ডল-এর সকলেই এবং সবকিছুই খুব ভাল এবং মজার। তবুও বলব, মিস ওয়াল্ডো এবং মিস এলিসের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অসাধারণ চরিত্র। কেমব্রিজের ডঃ রাইট ঠিক এমনই এক মানুষ। ভদ্রলোক খুবই কৃষ্টিবান ও সুরসিক। এক-এক সময় তাঁকে নিয়ে এমন মজার ব্যাপার হয়! স্বামীজীর কথা শুনতে শুনতে তিনি এমনই তন্ময় হয়ে যান যে প্রত্যেক আলোচনার শেষে তিনি স্বামীজীকে এই প্রশ্নটি করবেনই করবেন ঃ 'আচ্ছা, স্বামীজী, শেষবেশ কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে তো—আমিই ব্রহ্ম, আমিই সেই নির্গুণ পরম সত্তা?' এই কথা শোনার পর স্বামীজীর মুখের হাসিটি যদি তুমি একবার দেখতে! সে এক মধুর প্রশ্রয়ের হাসি। যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে। ডঃ রাইটের প্রশ্নের উত্তরে মৃদু স্বরে স্বামীজী বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ডকি, স্বরূপত আপনিই ব্রহ্ম, অবিকারী পরম সত্তা।' ক্লাস ও আলোচনার পর যখন সকলের খাওয়ার ডাক পড়ে ডঃ রাইট-ও আসেন, তবে একটু দেরিতে। তাঁকে আসতে দেখলেই স্বামীজীর চোখে-মুখে কৌতুক খেলে যায়। ছদ্ম গাম্ভীর্যে সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে ওঠেন ঃ 'এই যে, ব্রহ্ম আসছেন!' অথবা 'ঐ যে সচ্চিদানন্দ আসছেন!'

স্বামীজী একটু হৈচৈ করে মজা করতে ভালবাসেন। কখনও কখনও তিনি বলে ওঠেন ঃ 'আজ আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াব, বুঝলে?' সত্যিই তাঁর

রান্নার হাত অতি চমৎকার; আর নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে 'সঙ্ঘের ভাইবোনদের' খাওয়াতেও তিনি খুব ভালবাসেন। এমনিতে তাঁর রান্না খুবই সুস্বাদু; কিন্তু তোমায় চুপি চুপি বলে রাখি, তিনি এত বেশি মশলা দেন যে সেগুলো তারিয়ে তারিয়ে খায় কার সাধ্যি! এত মারাত্মক ঝাল! তবে আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে খেতে গিয়ে যদি দমও বন্ধ হয়ে যায়, তাও ভি আচ্ছা, তবুও আমি খাবই। তা, খেতে গিয়ে প্রায় সেই রকমই অবস্থা! তা হোক। ভাবি, বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষ যদি আমার জন্য রাঁধতে পারেন, আমি তো কোন্ ছার, আমার ঘাড়ও খাবে। ঈশ্বর তাঁর কল্যাণ করুন—এই প্রার্থনা!

আমাদের এখানে, বিশেষত খাওয়ার সময়, যেন হাসিঠাট্টার ঝড় বয়ে যায় এবং এর হোতা স্বামীজী স্বয়ং। ট্রেনের ডাইনিং কারের বেয়ারাদের মতো হাতে একটা সাদা তোয়ালে জড়িয়ে হুবহু তাদেরই ভঙ্গিতে এবং তাদেরই সুরে স্বামীজী আমাদের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়েন—'এই শেষ বারের মতো বলা হচ্ছে, খাবার কিন্তু টেবিলে দেওয়া হয়েছে।' বল দেখি, এর পরও কেউ না হেসে থাকতে পারে! অবশ্য এখানেই শেষ নয়। খেতে বসে দফে দফে হাসির তুফান ওঠে। স্বামীজী হয়তো কোনও টিপ্পনী কাটলেন অথবা কারও পিছনে লাগলেন—ব্যস্! অমনি হো-হো-হা-হা-হি-হি শুরু হয়ে গেল। আর হবে না-ই বা কেন? অন্যের হাবভাব স্বামীজী এমন নিখুঁত নকল করতে পারেন, প্রত্যেকের ছোটখাট দোষত্রুটি এবং বাতিকগুলোকে তিনি এমন মধুর রসে জারিয়ে পরিবেশন করেন, আমাদের না হেসে উপায় কি? তবে হ্যাঁ, তিনি নিছক রসিকতাই করেন, কাউকে বিদ্রূপ করা বা আঘাত করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

এর আগের চিঠিতে স্বামীজীর অসাধারণ কৌতুকপ্রিয়তার কথা তোমাকে লিখেছি। কিন্তু তারপর ছোটখাট এতো অজস্র ঘটনা ঘটে গেছে যে আমার এখন এই ধারণাই বদ্ধমূল—বিবেকানন্দ এক বহুমুখী চরিত্র। তাঁর ইতি করা মুশকিল। আমরা স্বামীজীর কথাগুলি সব লিখে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমার অসুবিধা হচ্ছে এই, তাঁর কথা শুনতে শুনতে এমন তলিয়ে যাই যে লেখার কথা আর কিছুমাত্র মনে থাকে না। আর আমারই বা দোষ কি বল! এমন অবিশ্বাস্য প্রাণজুড়ানো কণ্ঠস্বর! কণ্ঠস্বরই বা বলছি কেন, বলা উচিত দৈবী সঙ্গীত। আর ঐ সঙ্গীতের সুর একবার যার কানে যাবে, সেই মজবে। যাই হোক, আমাদের সকলের প্রিয় মিস ওয়াল্ডো স্বামীজীর বাণী ও উপদেশগুলি

আদ্যোপান্ত লিখে রাখছেন; ফলে এটা এক রকম নিশ্চিত তাঁর কথাগুলি হারিয়ে যাবে না।

সি-র [ক্রিস্টিনের] এবং আমার জন্মলগ্নে নিশ্চয় কোনও দেবদূতের কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল। নচেৎ এমনটি তো হওয়ার কথা নয়! যদিও 'কর্ম' ও 'জন্মান্তরবাদ' সম্পর্কে আমরা এখনও বিশেষ কিছুই জানি না, তবু এইটুকু বুঝতে পারছি স্বামীজীর পবিত্র সান্নিধ্যে আসার পিছনে দুয়েরই একটা ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

সময় সময় আমি তাঁকে খুব বিদঘুটে প্রশ্ন করে বসি; কারণ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁর মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা আমি জানতে চাই, নিজের চোখে দেখতে চাই। ফলত কৌতূহলতাড়িত হয়ে আমার আবেগপ্রবণ মন কখনও কখনও এমন উদ্ভট সব প্রশ্ন তোলে যে ধরনের প্রসঙ্গের অবতারণা করতে স্বামীজীর অতি বিশ্বস্ত, ঘনিষ্ঠ জনেরাও সঙ্কুচিত বা ভীত হবেন। স্বামীজী কিন্তু আমার সব প্রগল্‌ভতাকেই হাসি মুখে মেনে নেন। ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। একবার তিনি একজনকে বলেছিলেন, 'মিসেস ফাঙ্কি এইভাবে আমার মনকে একটু বিশ্রাম দিতে চায়। ও বড্ড সরল।' তুমিই বল, এটা কি তাঁর গভীর স্নেহ এবং উদারতার পরিচায়ক নয়?

একদিন সন্ধ্যায় আমরা সবাই শোওয়ার-ঘরে বসে আছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আর স্বামীজী ভারতীয় নারীর ত্যাগ ও পবিত্রতার আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তন্ময় হয়ে সীতার উপাখ্যান বলছেন। তিনি যে কী সুন্দর গল্প বলেন! শুনতে শুনতে মনে হবে চরিত্রগুলি তোমার চোখের সামনে একদম জীবন্ত হয়ে উঠেছে। স্বামীজী তো গল্প বলে চলেছেন। আমরাও শুনছি। কিন্তু কি জানি কেন হঠাৎ আমার মাথার পোকা নড়ে উঠল। আমার মনে হলো—আচ্ছা, ছলাকলায় নিপুণা পাশ্চাত্যের অভিজাত সমাজের রূপ-মদমত্ত গর্বিনীদের স্বামীজী কোন্ চোখে দেখবেন? ভাল করে ভেবে দেখার আগেই প্রশ্নটা ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কথাটা বলেই, ছি ছি, আমি তো লজ্জায় মরি! স্বামীজী কিন্তু প্রশ্নটা শুনে তাঁর বড় বড় গভীর চোখদুটি আমার দিকে শান্তভাবে ফিরিয়ে গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন : 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও যদি অপবিত্র বা অশোভন ভাবে আমার দিকে চায়, তবে সেই মুহূর্তেই সে কুৎসিৎ কদাকার একটা সবুজ ব্যাঙে পরিণত হবে। আর যাই হোক, একটা ব্যাঙকে দেখে নিশ্চয় কেউ মুগ্ধ হবে না, কি বল?'

আমার নাম নিয়ে একবার এক মজার ঘটনা ঘটল। একদিন সকলে মিলে

গ্রামের দিকে যাচ্ছি। স্বামীজীও আছেন। পথে একটি কাঁচ-মিস্ত্রির তাঁবু পড়ল। সেখানে লোকটিকে ফুঁ দিয়ে কাঁচের নানারকম জিনিস তৈরি করতে দেখে স্বামীজী তো মহা খুশি। তিনি এগিয়ে গিয়ে লোকটির কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি সব যেন বললেন। তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন—চল, গ্রামের বড় রাস্তা ধরে খানিকটা হেঁটে আসি। ফেরার পথে কাঁচের কারিগরটি স্বামীজীর হাতে চুপচাপ বেশ কয়েকটি প্যাকেট তুলে দিল। আমরা স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে ভাবছি—এগুলো কিসের প্যাকেট কে জানে! পরে জানতে পারলাম প্যাকেটে আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্ফটিকের তৈরি বড় একটি বল উপহার হিসেবে রয়েছে। প্রত্যেকটি বলের ভেতরেই প্রাপকের নাম এবং তার সঙ্গে লেখা রয়েছে এই কথাটি—'বিবেকানন্দের প্রীতি-উপহার'।

বাড়ি ফিরেই আমরা যে-যার মোড়ক খুলে ফেললাম। আমারটা খুলতেই দেখি, আমার নামের বানান ফাঙ্কির (Funke) বদলে হয়েছে 'ফুঙ্কি' (phunkey)। তখন আমাদের সে কী বেদম হাসি! কিন্তু স্বামীজীর সামনে তো আর হাসা যায় না। হয়তো তিনি দুঃখ পাবেন। তাই আমরা একটু আড়ালে গিয়ে হাসতে লাগলাম। অবশ্য বানান-বিভ্রাটে স্বামীজীর কোনও হাত ছিল না। আমার নামটা তিনি এ পর্যন্ত কোনও দিন লেখার অক্ষরে দেখেন নি। 'ফাঙ্কি' হলো 'ফুঙ্কি'!

সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর একটি বিশেষ রূপ দেখেছিলাম। যদিও আমরা অনেকেই বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড়, তবুও তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাদের স্নেহময় পিতা, আর আমরা তাঁর আদরের সন্তান। আমাদের কিছু সুন্দর উপহার দিতে পেরে তিনি কত না তৃপ্ত! সেদিন তাঁকে বড় মৃদু, বড় মধুর লেগেছিল।

ভারতে তাঁর কাজের যন্ত্ররূপে তিনি ক্রিস্টিনকে গ্রহণ করেছেন। সেও তাই খুব খুশি। কিন্তু আমার মন খুব খারাপ, কারণ আমার ভারতে যাওয়ার ব্যাপারে স্বামীজীর খুব একটা মত নেই। আমার একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছিল, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দুটি জিনিস একান্ত প্রয়োজন। এক ঃ গেরুয়া নেওয়া। দুই ঃ গুহায় থাকা। এখন ভাবি আমি কি নির্বোধ ছিলাম, অথচ স্বামীজীর কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি! তিনি বলেছিলেন ঃ 'তুমি গৃহী। ডেট্রয়েটে তোমার স্বামী এবং সংসার আছে। সেখানেই ফিরে যাও। তাঁদের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আপাতত তোমার পক্ষে এই পথই মঙ্গলজনক।'

পরের চিঠি ঃ আজ সকালে আমরা গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম। স্বামীজী

সকলের সঙ্গে খুব মজা করছিলেন। আনন্দে একেবারে টইটুম্বুর হয়ে ছিলেন। আমার হাতে এখন সময় এত কম যে ক্লাসে বসেই তোমাকে চিঠি লিখছি। আমি স্বামীজীর খুব কাছে বসে আছি, আর তিনি এই মুহূর্তে যে কথাগুলি বলছেন তা আমি তোমায় হুবহু তুলে দিচ্ছি। স্বামীজী বলছেন : 'গুরু হচ্ছেন স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো। তাঁর কাছে যারা আসে তাদের সকলের চৈতন্য তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত। সেইজন্য কাকে, কখন, কিভাবে সাহায্য করতে হবে সেটি তিনি ভালোই জানেন।' স্বামীজীর কথার গূঢ় অর্থ এই, যিনি গুরু হবেন তাঁকে কার কি অভাব, পরিষ্কার বুঝতে হবে এবং সেইমতো চেতনার স্তর অনুযায়ী যে যেখানে যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থা থেকেই টেনে তুলবেন।

এইবার তিনি তাঁর সকালের ক্লাস শেষ করে আমার দিকে ফিরে বলছেন : 'ফাঙ্কি, একটা মজার গল্প বল তো। খুব শীঘ্রই আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেব। এখন একটু হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে আনন্দ করাই ভালো, তাই না?'

আমাদের কটেজের পিছন দিকের পাহাড়ী ঢাল, যেটি এবড়োখেবড়ো পথের রূপ নিয়ে নদীর কোল বরাবর চলে গেছে, ঐ পথ ধরেই রোজ বিকেলে আমরা অনেক দূর হেঁটে আসি। ঐ খাপছাড়া পথটি আমাদের সকলেরই বিশেষ পছন্দ। একদিন ঐ পথ ধরে যাচ্ছি। হঠাৎ খুব কাছেই বনবেড়ালের দুর্গন্ধ পাওয়া গেল। তারপর থেকেই বেড়াবার সময় হলে স্বামীজী রহস্য করে বলতেন : 'আমরা কি এখন গন্ধ-মাতন সরণি দিয়েই হাঁটব?'

চলতে চলতে এক-এক সময় আমরা স্বামীজীকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ি, আর তাঁর মুখ থেকে অমূল্য সব কথা শুনি। কখনও হয়তো একটা পাখি দেখে, কখনও ফুল বা প্রজাপতি দেখে তাঁর কথার প্রবাহ শুরু হয়ে যায়। কত না কথা! কখনও তিনি বেদের গল্প বলেন, কখনও বা ভারতীয় কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। একটি কবিতা আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। তার প্রথম লাইনটি ছিল অনেকটা এই রকম—'তার চোখ দুটি যেন পদ্মের ওপর নিবদ্ধ দুটি কালো ভ্রমর।' তাঁর মতে আমাদের দেশের বেশিরভাগ কবিতাই অগভীর ও সাধারণ ভাবের, ভারতীয় কবিতার মতো অত সূক্ষ্ম ও উচ্চাঙ্গের নয়।

বুধবার, ৭ আগস্ট : হায়, স্বামীজী এখান থেকে চলে গেলেন! আজ রাত ন-টার স্টীমারে ক্লেটন গেলেন। সেখান থেকে প্রথমে ট্রেনে নিউইয়র্ক, পরে নিউইয়র্ক থেকে জাহাজে লণ্ডন যাবেন।

আজ শেষের দিনটি স্বাদে ও সৌরভে, ভাবে আর অনুভবে, যথার্থই অনির্বচনীয় ছিল। এই দিনটির অক্ষয় স্মৃতি কি কোনও দিনও ভুলতে পারব? সকালে কোনও ক্লাস না থাকায় স্বামীজী সি.—[ক্রিস্টিন] আর আমাকে বললেন— চল, তোমরা দুজন আমার সাথে একটু বেড়িয়ে আসবে। (স্বামীজী কেবল আমাদের দুজনকেই যেতে বললেন, কারণ অন্যান্যরা পুরো গ্রীষ্মকালটাই তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন, আমাদের কিছু কথা আছে। লন্ডন যাওয়ার আগে তাই তিনি শেষবারের মতো আমাদের দুজনকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ করে দিলেন।)

পায়ে পায়ে আমরা প্রায় আধ মাইল দূরে চলে গেলাম। কাছেই ছোট একটা পাহাড় মতো। সেখানে উঠতেই চোখে পড়ল শুধু গাছ আর গাছ, আর অটুট নীরবতা। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক দেখে শেষপর্যন্ত স্বামীজী একটি গাছ বেছে নিলেন। গাছটির একটি বৈশিষ্ট্য, তার ডালপালাগুলি একটু আনত হয়ে ক্রমশ দু পাশে ছড়িয়ে গেছে। আমরা তিনজনই গাছের ছায়ায় বসলাম। ভাবছি— এইবার স্বামীজী বোধহয় কিছু বলবেন। কিন্তু সরাসরি ঈশ্বরপ্রসঙ্গ না করে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন ঃ 'এখন আমরা ধ্যান করব। মনে কর আমরা সব বুদ্ধ, বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসেছি।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দেখলাম তিনি ধ্যানে তন্ময় স্থির এক ব্রোঞ্জ মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারুণ ঝড় উঠল, শুরু হলো মেঘের সিংহ-গর্জন এবং মুষলধারে বৃষ্টি। স্বামীজীর কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। আমার কাছে একটা ছাতা ছিল। নিঃশব্দে সেটি তাঁর মাথার ওপর মেলে ধরে যতটুকু সম্ভব তাঁকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলাম। এত গভীর ধ্যানে তিনি আপ্লুত যে চারপাশের জগৎ-সংসার পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে মুছে গেছে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাটবার পর দূরে চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ কানে এল। বুঝতে পারলাম সঙ্গিসাথীরা ছাতা, বর্ষাতি নিয়ে আমাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। ওঁদের পায়ের শব্দ, উদ্বিগ্ন কথাবার্তা আর হৈচৈ শুনে অচল ব্রোঞ্জ মূর্তি ধীরে ধীরে সচল হলেন। চোখ মেলে ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতেই তিনি বুঝতে পারলেন—কটেজে ফিরতে হবে। অস্ফুট স্বরে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'আমি কি আবার কলকাতার বর্ষার মধ্যে এসে পড়লুম নাকি!'

শেষ দিনটায় তাঁর হাবভাব যেন শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিল। এত কোমল! এত মধুর! বিদায় বেলায় তাঁর স্টীমার নদীর বাঁকের মুখে অদৃশ্য হওয়ার ঠিক

আগের মুহূর্তে স্বামীজী মাথার টুপিটা উৎফুল্ল কচি ছেলের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে বারবার নাড়াতে লাগলেন। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! কিন্তু সত্যিই গেলেন।

সংক্ষিপ্ত এই স্মৃতিচিত্রটি যখন প্রায় শেষ করে এনেছি, ঠিক তখনি ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ গেল। দেখি, আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫—আজ থেকে ঠিক একত্রিশ বছর আগে প্রায় এই সময়েই ইউনিটেরিয়ান চার্চে আমি প্রথম স্বামীজীকে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর শ্রীমুখের বাণী শুনেছিলাম।

আহা, সেসব কি দিনই না গেছে! সহস্রদ্বীপোদ্যানের দিনগুলি যেন ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য করুণা আর আশীর্বাদ হয়ে আমাদের জীবনে নেমে এসেছিল। চাঁদের মৃদু রুপোলি আলো কিংবা তারার সুবর্ণপ্রভায় আদৃতা রজনীগুলি আমাদের কাছে কখনও কখনও রহস্যময়ী হয়ে উঠত। কিন্তু আমাদের জীবনে স্বামীজী যেভাবে এসেছিলেন তার মধ্যে রহস্যের নামগন্ধ ছিল না। তিনি নিতান্ত সহজ, স্বচ্ছ সূর্যালোকের মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করেছিলেন।

আমরা পরে জেনেছি, আবোলতাবোল রহস্যের জাল বোনা এবং অলৌকিক কাণ্ডকারখানা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কি করে পারবেন? তিনি এসেছিলেন আত্মার পূর্ণতা, আত্মার মহিমা, আত্মার অনন্য দীপ্তি প্রকাশ করতে। তিনি বলতেন, মানুষ সাধ করে নিজের পায়ে নিজেই শৃঙ্খল পরিয়েছে; নিজেকে খণ্ডিত, সীমিত করে রেখেছে। স্বামীজীর শিক্ষার ছত্রে ছত্রে প্রতিধ্বনিত এই বাণী ঃ 'তোমার মুক্তির চাবিকাঠি তোমার নিজেরই হাতে।'

স্বামীজী নিজে যে পথে গিয়েছেন, আমাদেরও সেই পথ দেখাবার জন্য কি অশেষ কষ্টই না তিনি সহ্য করেছেন! আজ একত্রিশ বছর পরেও আমার চেতনায় স্বামীজীর ভাবমূর্তিটি ঠিক আগের মতোই বিশাল, আকাশচুম্বী রয়ে গেছে। আমার কাছে তিনি সর্ব-বন্ধন-বিমোচক আপোষহীন মুক্তির দিশারী। প্রাচ্য দিগন্ত থেকে দ্বিমুখী, শাণিত এক তরবারি-হাতে অগ্নিগর্ভ, আদিত্যবর্ণ এই মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রতীচ্যের আকাশে। জিজ্ঞাসু বেশ কিছু মানুষ তাঁকে সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তিনিও তাঁদের মধ্যে আপন শক্তি অকৃপণভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, এই হলেন বিবেকানন্দ!

(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯২৭)

মাদাম ই. কালভে

আমার এমন এক মহাপুরুষকে জানার সৌভাগ্য হয়েছে যিনি ধর্মনিষ্ঠ এবং প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ছিলেন, ছিলেন সন্ন্যাসী, মহাত্মা, দার্শনিক এবং সত্যিকারের বন্ধু। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তিনি আমার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, আমার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও আদর্শকে সম্প্রসারিত করে তাতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। সত্য সম্পর্কে এক উদার বোধের উদ্বোধনও তিনিই আমার ভিতর ঘটিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ।

এই অসাধারণ হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ধর্মের আচার্য হিসাবে যাঁর নাম তখন আমেরিকার মানুষের মুখে মুখে। শিকাগোয় একবার তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আমিও তখন সেখানে—দেহে মনে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত; চরম নৈরাশ্যে আক্রান্ত। আমার বন্ধুবান্ধবদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে তাঁর সান্নিধ্যে এসে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন দেখে একদিন আমিও স্থির করলাম, তাঁর কাছে যাব।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিনক্ষণ আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তাই, স্বামীজী যে বাড়িতে তখন ছিলেন, সেখানে পৌঁছানোমাত্রই আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর কাছে যাওয়ার আগে একটি বিষয়ে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল—তিনি নিজে থেকে কথা বলার আগে যেন আমি নীরবতা ভঙ্গ না করি। তাই ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি ধ্যানের আসনে স্থির, টানটান হয়ে বসেছিলেন। গেরুয়া বসনের প্রান্তভাগটি সরল রেখায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। তাঁর মাথায় পাগড়ি; মাথাটি ঈষৎ সামনের দিকে ঝোঁকানো; দৃষ্টি আনত। সামান্য কিছুক্ষণ মৌনি ছিলেন তিনি। তারপর চোখদুটি না তুলেই বললেন : 'আহা বাছা, কি ঝড়টাই না তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছে! শান্ত হও, শান্ত হও। এখন শান্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।'

এরপর তিনি শান্ত, নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমার জীবনের সমস্ত গোপন সমস্যা এবং উদ্বেগের কথা একের পর এক বলে যেতে লাগলেন। তখনো তিনি আমার নাম পর্যন্ত জানতেন না। অথচ তিনি আমার জীবনের এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ করলেন, আমার ধারণা, যা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও অজ্ঞাত। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার বিস্ময়কর ও অলৌকিক মনে হয়েছিল।

অবশেষে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আপনি এতকথা জানলেন কি করে? আমার সম্বন্ধে কেউ কি আপনাকে কিছু বলেছে?'

তাঁর মুখখানি প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠলো। তিনি এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন আমি শিশু—বোকার মতো এক প্রশ্ন করে বসেছি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন ঃ 'আমাকে কেউ কিছুই বলেনি। আর, তুমি কি মনে কর, তার কোনও দরকার ছিল? খোলা বইয়ের মতোই আমি তোমার অন্তর পড়ে ফেলেছি।'

আমার বিদায় নেওয়ার সময় হলো। তিনি বললেন ঃ 'শোনো, সব দুঃখ ভুলে যাও। আনন্দ করো। আবার সুখী হওয়ার চেষ্টা করো। শরীরের যত্ন নাও। চুপচাপ বসে থেকে দিনরাত শুধু দুঃখের কথা ভেবো না। তোমার আবেগের মোড় ঘুরিয়ে তাকে সৃষ্টিমূলক কাজে অভিব্যক্ত করো। তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এর প্রয়োজন আছে। তোমার শিল্পের দাবিও তাই।'

তাঁর ব্যক্তিত্ব আর কথাবার্তা সেদিন আমাকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে চলে আসার সময় অনুভব করছিলাম, আমার অন্তরে দিনরাত যে অশান্তির আগুন জ্বলছিল, নানা ধরনের জটিল যে দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধছিল, সেসব দূর করে সেখানে তিনি যেন তাঁর স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ চিন্তারাশি ঢেলে দিয়েছেন।

তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে আমি আবার আগেরমতো হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠলাম। তিনি কিন্তু আমার ওপর কোনও ধরনের সম্মোহন-শক্তি প্রয়োগ করেননি। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর পবিত্রতা, লক্ষ্যের প্রতি একাগ্রতা—এই সবই আমাকে উদ্বুদ্ধ ও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁকে আরো একটু ভাল করে জানার সুযোগ পাওয়ার পর আমার মনে হয়েছে, কোনও আর্ত ব্যক্তি সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে এলে স্বামীজী প্রথমেই সেই নতুন অতিথির উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে এক শান্ত সমাহিত অবস্থার মধ্যে নিয়ে যান। মন নিস্তরঙ্গ হওয়ায় শ্রোতার পক্ষেও সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে স্বামীজীর কথা শোনা সম্ভব হয়।

তিনি প্রায়শ নীতিকথা-মূলক গল্প অথবা কাব্যিক উপমার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতেন এবং আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। একদিন আমরা অমরত্ব এবং মানুষের জন্মগত সংস্কার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। স্বামীজী তখন পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গে বলছিলেন। পুনর্জন্মে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং পুনর্জন্মবাদ ছিল তাঁর উপদেশের অপরিহার্য অঙ্গ। [মুক্তি প্রসঙ্গে] তাঁর বক্তব্য শুনে আমি বলে উঠেছিলাম ঃ 'আমি ঐ পরিণতির কথা ভাবতে পারি না, কেমন যেন ভয়াবহ মনে হয়। আমার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা যত তুচ্ছই হোক, আমি তাকেই আঁকড়ে থাকতে চাই—অনন্ত একত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে আমার কাজ নেই। ঐ চিন্তা আমার পক্ষে অসহনীয়।'

আমার কথা শুনে স্বামীজী বললেন ঃ "তাহলে একটা গল্প শোন। একদিন একফোঁটা জল অনন্ত সাগরে এসে পড়লো। সাগরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তার ভেউ ভেউ কান্না আর অভিযোগ! ঠিক তোমারই মতো। তার ঐ করুণ অবস্থা দেখে একটুখানি হেসে সাগর তাকে জিজ্ঞাসা করলো—'তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে এসেই তো তুমি তোমার সব ভাইবোনের সঙ্গে মিলিত হতে পারলে; তোমার সেইসব ভাইবোনও এক-একটি জলবিন্দু; সেই সব বারিবিন্দু নিয়েই আমি এই সাগর। তুমি এখানে তাদেরই সঙ্গে মিশে গেলে। এখন থেকে তোমার আর পৃথক সত্তা রইল না। তুমিও সমুদ্র হয়ে গেলে। তবে তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও, সূর্যের রশ্মিকে অবলম্বন করে তোমাকে আকাশে উঠে মেঘের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। সেখান থেকে তুমি আবার একদিন এক বিন্দু জল হয়ে নিচে নেমে আসতে পারো, ঝরে পড়তে পারো ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর বুকে।' "

স্বামীজী এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও অনুগামীর সঙ্গে তুরস্ক হয়ে আমি মিশর ও গ্রীসে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা! আমাদের দলে ছিলেন স্বামীজী, ফাদার হায়াসিন্থ লয়সন্ ও তাঁর স্ত্রী। শ্রীমতী লয়সন্ বস্টনের মেয়ে। এছাড়াও দলে ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুগামিনী, শিকাগোর মিস ম্যাকলাউড। ভারী চমৎকার, উদ্যমী মহিলা। এবং আমি নিজে—দলের গায়িকা বা, কবিত্ব করে বলা যায়, 'সুর-বিহঙ্গমী'।

ভ্রমণ তো নয়, সে ছিল অপূর্ব এক তীর্থযাত্রা। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস—কি না জানতেন স্বামীজী! সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেসব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো, সেসবই আমি মন দিয়ে শুনতাম, কিন্তু তর্ক-বিতর্কে যোগ দেওয়ার চেষ্টা

করতাম না। আমি শুধু আমার অভ্যাসমতো গান গাইতাম, যখন-তখন। পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে ফাদার লয়সন্-এর যথেষ্ট সুনাম ছিল; স্বামীজী তাঁর সঙ্গে নানা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি, কবে কোন্ চার্চ-কাউন্সিল বসেছিল, খ্রীস্টধর্মের নথিপত্রের মূল বয়ানে কি আছে, আলোচনার সময় সবই স্বামীজী গড়গড় করে বলে যেতেন; অথচ খ্রীস্টধর্মের বিদগ্ধ পণ্ডিত হয়েও ফাদার লয়সন্-এর নিজেরই অনেক সময় ঐসব ব্যাপারে খটকা লাগতো।

গ্রীসে এলেউসিস (Eleusis) দেখতে গিয়ে স্বামীজী তার সব রহস্য আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে, এক পূজার বেদি থেকে অন্য এক পূজার বেদির দিকে আমাদের নিয়ে যেতে যেতে প্রতিটি জায়গায় কিরকম শোভাযাত্রা হতো, তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সুদূর অতীতের প্রার্থনামন্ত্র সুর করে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন তিনি; এছাড়া পুরোহিতদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ কিরকম ছিল তা-ও আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

মিশরে একটি রাতের কথা ভুলবো না। নীরব স্ফিঙ্কস্ (Sphinx)-এর তলায় আমরা সকলে বসে, আর অতীন্দ্রিয় প্রাণস্পর্শী ভাষায় কথা বলে চলেছেন স্বামীজী। সেই রাতে তিনি যেন ধূসর অতীতের কোন্ স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের!

স্বামীজীর কথার মধ্যে এমন এক জাদু ছিল যে, তিনি যে-কোনও অবস্থায় যা-কিছু বলতেন তা-ই আমাদের মনকে চুম্বকের মতো টেনে রাখতো। তখন সময়ের কোন জ্ঞানই আমাদের থাকতো না। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মশগুল হয়ে আমরা যে কতবার ট্রেন ধরতে পারিনি, তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসে আমরা তাঁর কথা শুনছি, আর ওদিকে একটার পর একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে, এমনকি আমাদের মধ্যে বাস্তববুদ্ধি যাঁর সবচেয়ে বেশি, সেই মিস ম্যাকলাউডও সময়ের খেই হারাতেন। ফল যা হওয়ার তা-ই হতো। যে সময়ে আমাদের যেখানে পৌঁছানোর কথা, সেখানে না পৌঁছে অন্য কোনও জায়গায় আটকে গিয়ে চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়তে হতো আমাদের।

কায়রোর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একদিন আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। সম্ভবত তন্ময় হয়ে আমরা কথা বলছিলাম। যাই হোক, এক সময়ে দেখলাম, অত্যন্ত নোংরা ও দুর্গন্ধময় এক রাস্তায় এসে পড়েছি। কাছাকাছি সব বাড়ির জানালা থেকে অর্ধনগ্ন মেয়েরা বিশ্রীভাবে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে; কেউ কেউ আবার দোরগোড়ায় এলোমেলোভাবে বসে, নয়তো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

স্বামীজী প্রথমে এসব কিছুই লক্ষ্য করেননি। তিনি আপনমনে হাঁটছিলেন। কিন্তু ভাঙাচোরা এক বাড়ির সামনে বেঞ্চে বসে থাকা মেয়ের দল যখন তাঁর দিকে চেয়ে হেসে উঠে তাঁকে ডাকতে লাগলো, তখনই তাঁর চমক ভাঙলো। আমাদের দলের এক মহিলা এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে স্বামীজীকে রক্ষা করার জন্য সকলকে দ্রুত এগিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু স্বামীজী শান্তভাবে দল থেকে আলাদা হয়ে ঐ মেয়েদের বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'আহা, দুঃখিনী বাছারা! আহা, এরা দৈহিক সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবত্বকে বলি দিয়েছে। এখন দেখ, এদের কি দুরবস্থা!'

এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আর সেই কান্না দেখে মেয়ের দল একেবারে স্তব্ধ, লজ্জানত। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে নতজানু হয়ে স্বামীজীর বস্ত্রের প্রান্তভাগ শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলো, "Humbre de Dios, Humbre de Dios!" অর্থাৎ ইনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, ইনি দেবদূত! অন্য একটি মেয়ে লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিতা হয়ে এমনভাবে দু-হাতে মুখ ঢাকলো যেন সে প্রাণপণে চাইছিল তার আত্মাকে ঐ পবিত্র দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যেতে।

অবিস্মরণীয় এই ভ্রমণ উপলক্ষেই তাঁকে আমার শেষবারের মতো দেখা। কয়েকদিন পরেই স্বামীজী সকলকে ডেকে বললেন এবার তিনি দেশে ফিরবেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, তাঁর চিরবিদায় নেওয়ার কাল আসন্ন; তাই তিনি তাঁর গুরুভাইদের কাছে ফিরে যেতে চাইছিলেন, যাঁদের তিনি কর্ণধার—ফিরে যেতে চাইছিলেন তাঁদের কাছে যাঁদের সঙ্গে তিনি তাঁর শৈশব ও যৌবন কাটিয়েছেন।

এক বছর পর আমরা তাঁর মহাপ্রয়াণের সংবাদ পেলাম। ততদিনে ঐ মহাজীবন-রূপ গ্রন্থখানি রচনার কাজ সমাপ্ত—একটি পৃষ্ঠাও যার নষ্ট হয়নি। তিনি সমাধি-অবস্থায় শরীর ত্যাগ করেছিলেন। সংস্কৃতে 'সমাধি' শব্দের অর্থ স্বেচ্ছামৃত্যু, কোনও দুর্ঘটনায় বা রোগে, শোকে জর্জরিত হয়ে মৃত্যু নয়। শরীর ত্যাগের আগে তিনি শিষ্যদের ডেকে বলেছিলেন ঃ 'অমুক দিনে আমি শরীর ত্যাগ করবো।'[১]

---

১. স্বামীজী তাঁর কোনও শিষ্যকে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিনক্ষণ আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কি না, সে-বিষয়ে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটি নিশ্চিত যে, তিনি তাঁর মহাসমাধির পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। সমকালীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে সে রকম ইঙ্গিতই মিলেছে।

বেশ কয়েক বছর পরে যখন ভারত ভ্রমণে গেলাম, সেই সময়ে স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি যে-মঠে ছিলেন সেটি দর্শন করার ইচ্ছা হলো। স্বামীজীর মা স্বয়ং আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মার্বেল পাথরে তৈরি স্বামীজীর সুন্দর সমাধি-মন্দির দেখলাম। স্বামীজীর মার্কিন বন্ধু মিসেস লেগেট এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। সমাধি-মন্দিরে কোনও নাম নেই দেখে স্বামীজীর ভাইকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। স্বামীজীর ভাই এই সঙ্ঘেরই সন্ন্যাসী।[১] তিনি সবিস্ময়ে খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন; তাঁর সেই মহিমাব্যঞ্জক ভঙ্গিটি আজও চোখে ভাসে; অবশেষে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ 'তিনি তো চলে গেছেন।'

বেদান্তবাদীদের বিশ্বাস, বেদান্তই হিন্দুধর্মের মূল শিক্ষা ও তত্ত্বগুলিকে আজও অবিকৃতভাবে রক্ষা করে আসছে। এইজন্যই তাঁদের কোনও মন্দির নেই, তাঁদের প্রার্থনামন্ত্রগুলিও অতি সরল; ভক্তিভাব পুষ্ট করার জন্য তাঁদের কোনও প্রতীক মূর্তি বা পটেরও প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সব প্রার্থনা অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ঈশ্বরের [ব্রহ্মের] উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। বৈদান্তিকরা তাঁদের বিনম্র প্রার্থনায় বলেন ঃ 'হে অজ্ঞেয় অনন্ত চৈতন্য, তুমি নামহীন; কে তোমাকে নামের বন্ধনে বাঁধতে পারে!'

স্বামীজী আমাকে প্রাণায়াম করতে শিখিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের শক্তি আকাশের বায়ুতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত; প্রাণায়ামের সাহায্যে সেই শক্তিকে নিজের ভিতরে টেনে নেওয়া যায়।

মঠে গেলে স্বামীজীর গুরুভাই এবং অন্যান্য সাধুরা সকলেই আমাদের খুব সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর ছায়া-ঘেরা একটি স্থানে আমাদের জন্য টেবিল পাতা হয়েছিল। ওঁরা আমাদের নানারকম ফুল ও ফল দিলেন।

স্বামীজী নিজেও নানা উপলক্ষ্যে একাধিকবার তাঁর আসন্ন বিদায়ের কথা বলেছেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বেশ কয়েকটি জনসভায় ভাষণ দিয়ে স্বামীজী হঠাৎ একদিন ঢাকায় তাঁর কয়েকজন শিষ্যের কাছে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন ঃ 'আমি খুব বড়জোর আর এক বছর বাঁচবো।' তাঁর শরীর যাওয়ার ঠিক আগের বুধবার আর-একজনকে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি।' এই প্রসঙ্গে এ রকম আরও বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর শেষের দিনগুলির বেশ কিছু ঘটনাই ছিল তাঁর আসন্ন মহাপ্রয়াণের দ্যোতক। তবে একথাও ঠিক, ঘটনাগুলি যখন সবার চোখের সামনে একটির পর একটি ঘটে যাচ্ছিল, তখন সেগুলির তাৎপর্য বোঝা যায়নি।

১. স্বামীজীর যে-ভাইয়ের উল্লেখ এখানে করা হয়েছে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ছিলেন না।

আমরা যেখানে বসেছিলাম ঠিক তার নিচ দিয়ে কলস্বিনী গঙ্গা বয়ে চলেছে। শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্রে সুর তুললেন। বড় হৃদয়স্পর্শী, সকরুণ সেই সুরমূর্ছনা। এক ভক্ত-কবি স্বামীজীর স্তুতিমূলক একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাতেও ধ্বনিত হলো গভীর বিষণ্ণতার সুর। আমাদের সেই অপরাহ্ন কেটেছিল পরম প্রশান্তি ও নিবিড় ধ্যানতন্ময়তায়।

সাধুসঙ্গে অতিবাহিত পরম পবিত্র, অবিস্মরণীয় সেদিনের সেই মুহূর্তগুলি আজও আমার স্মৃতিতে অম্লান। সেই পবিত্র, সুন্দর, উন্নতচেতা মানুষগুলি যেন এই পৃথিবীর নয়—জ্ঞান, পবিত্রতা, সৌন্দর্য, সারল্য দিয়ে তৈরি সে-যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগৎ।

(প্রবুদ্ধ ভারত, নভেম্বর ১৯২২)

মড স্টাম

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের পাতা ঝরার দিনেই তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। শ্রীমতী লেগেটের প্যারিসের বাড়িতে তাঁর বসার ঘরে আলোর দিকে পিছন ফিরে তিনি বসেছিলেন। তাঁর নাম কি বলা হলো, আমি ঠিক ধরতে পারিনি। কিন্তু ঘরে ঢুকে তাঁর পাশেই আমাকে বসতে হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ফরাসী ভাষা জানি কি না। আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, তিনিও জানেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'আচ্ছা, জাতি হিসেবে ইংরেজরা যেমন উন্নতি করেছে, তাতে আপনার কি মনে হয় না যে ফরাসীর পর ইংরেজি-ই বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা হয়ে দাঁড়াবে?' প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এমন একটা উত্তর দিলেন যে আমি অবাক! তিনি বললেন ঃ 'তাতার নয়তো নিগ্রোরাই ভবিষ্যতে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াবে, নেতৃত্ব দেবে।' কেন, তার কারণও তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, দু-দশ বছর বা কয়েক শতাব্দী নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না; সুবিস্তীর্ণ কাল এবং যুগযুগান্তর ধরে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিবৃত্তটি স্মরণে রেখেই তিনি কোনও একটি সিদ্ধান্তে আসেন।

এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কার না কৌতূহল হয়? আমারও হলো। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, গম্ভীর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন এই ভদ্রলোক প্রাচ্য দেশীয় মহাত্মা; নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই আলাপ-পরিচয়ের বহুদিন পর ইতালির শ্রেষ্ঠ সেনানীরা যেদিন অ্যাবিসিনিয়ার নিগ্রোদের হাতে বিধ্বস্ত হলো সেদিন কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। অথচ, যখন শুনেছিলাম, তখন বিশ্বাসই হয়নি! মনে হয়েছিল, এ একটা অবাস্তব কথা!

[১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান ক্লাবে শ্রীমতী ফ্রান্সিস লেগেট যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন, সেখানেও লেখিকা স্বামীজীকে দর্শন করেন।]

সেদিনের সেই ঘরোয়া বৈঠকে ঐ অনন্যসাধারণ অতিথি ছাড়াও আরও তিনজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বস্টনের এক অল্পবয়সী মহিলা,

যিনি বিশ্বমেলায় 'Hymn of the Republic' গেয়ে পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছোটখাট হলেও ভদ্রমহিলা দেখলাম খুব সজাগ ও সপ্রতিভ; একেবারে টানটান হয়ে বসে স্বামীজীর কথা শুনছেন। স্বামীজী তখন অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ইংরেজি তর্জমা করে ভারতের অতীত গৌরবের কথা বর্ণনা করছিলেন। স্বামীজী বক্তা, আর সব শ্রোতা। স্বামীজীর সামনে কথা বলতে কারও সাহস হচ্ছিল না। অবশেষে তিনি যখন বললেন আধ্যাত্মিকতায় হিন্দুরা আজও সবার উপরে, বস্টনের ঐ মহিলা তখন আর থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদের সুরে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, আপনি এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, উৎকর্ষের বিচারে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ এখানকার, ধরা যাক, ম্যাসাচুসেটসের সাধারণ নাগরিকের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। এত কথা কি, শুধু সংবাদপত্রগুলির দিকে তাকালেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে!'

স্বামীজীর মন এতক্ষণ যেন কাব্যের জগতে বিচরণ করছিল। এবার তিনি রূঢ় বাস্তবে ফিরে এলেন। বড় বড় চোখ দুটি তুলে মেয়েটিকে শান্তভাবে একবার নিরীক্ষণ করলেন তিনি। তারপরেই বলে উঠলেন ঃ 'হ্যাঁ, বস্টন যে একটা রীতিমতো সভ্য-ভব্য শহর সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। একবার সেখানে গিয়েছি। নতুন জায়গা। কোনও কিছু চিনি না, জানি না। আমাকেও কেউ চেনে না। এখন যে রকম লাল কোট পরে আছি, তখনও সেই রকম একটা কোট পরেছিলুম। আর মাথায় ছিল পাগড়ি। শহরের বেশ একটা বড় রাস্তা দিয়ে আপন মনে হেঁটে যাচ্ছি। দু-পাশে লোকজন, কর্মব্যস্ততা। হঠাৎ মনে হলো একদল ছেলে-বুড়ো আমার পিছু নিয়েছে। তখন আমি একটু জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। ওমা, আমার দেখাদেখি তারাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল! আর ঠিক তারপরই কাঁধে একটা আঘাত পেলুম। বুঝতে পারলুম পিছন থেকে কেউ কিছু ছুঁড়ে মেরেছে। চোট পাওয়ামাত্রই আমি ছুটতে লাগলুম। তারাও। শেষে রাস্তায় বাঁকের মুখে অন্ধকার গলিঘুঁজির মতো একটি জায়গা পেয়ে সেখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। কয়েক মুহূর্ত! তারপরই প্রচণ্ড বেগে লোকগুলো আমার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল—আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!' এই পর্যন্ত বলে স্বামীজী মন্তব্য করলেন, 'আহা, ম্যাসাচুসেটস খুব কৃষ্টিবান শহরই বটে!'

আশ্চর্য! এতকথা শোনার পরও মহিলা কিন্তু চুপ করলেন না; অবিশ্বাস্য দুঃসাহস দেখিয়ে চড়া গলায় তিনি বলে উঠলেন ঃ 'আমার তো মনে হয়,

বস্টনের কোনও লোক কলকাতায় গেলেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটত!' স্বামীজী বললেন ঃ 'অসম্ভব। প্রকাশ্যে শত্রুতা করা দূরে থাক, আমাদের বাড়িতে অপরিচিত কেউ এলে তাঁর প্রতি সামান্য কৌতূহল দেখানো আমরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি।'

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের এক সকালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে নিউইয়র্কে আসেন, তখন আবার আমাদের দেখা হয়। শ্রীমতী কলস্টন এবং আমি ভোরবেলায় জাহাজঘাটায় গিয়ে দেখি স্বামীজী আর তুরীয়ানন্দজী ছোট একটি স্টীমার থেকে নামছেন। তাঁদের দুজনকেই বড় রুগ্‌ণ এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি সিডনি ক্লার্ককে আগেই তার করে জানিয়েছিলাম, স্বামীজীরা আসছেন; তিনি যদি জেটিতে উপস্থিত থেকে তাঁদের মালপত্রগুলো একটু তদারক করেন তাহলে খুব উপকার হয়। তিনি সে অনুরোধ রেখেছিলেন। যথাসময়ে এসে স্বামীজীদের স্বাগত জানিয়ে, তাঁদের অদ্ভুত বিদেশী বাক্সগুলিকে কর্তৃপক্ষের জিম্মা থেকে উদ্ধার করে, গুনে গেঁথে ঠিকঠাক আছে কি না পরীক্ষা করে নিজের কাজে চলে গিয়েছিলেন। স্টীমারটি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে পড়ায় আমরা তিনজন ছাড়া শহরের লোকজন কেউ আসতে পারেনি। রিজলী থেকে যাঁদের আসার কথা তাঁরা বেলা দশটায় এসে দেখেন সব ভোঁ ভাঁ! বাস্তবিক, তাঁরা খুব হতাশ হয়েছিলেন।

তুরীয়ানন্দের সঙ্গে স্টীমার থেকে নামার সময় স্বামীজীর হাতে বেশ বড়সড় একটি বোতল দেখেছিলাম। জীর্ণ, ছেঁড়া-কাগজে-মোড়া ঐ বোতলটি স্বামীজী সযত্নে নিজের হাতে ধরে রেখেছিলেন। 'বিন্নে-ওয়াটার'-এ পৌঁছাবার আগে ঐ মহামূল্যবান বোতলটি তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না। জানা গেল, ভারতবর্ষ থেকে তিনি স্বয়ং ওটি হাতে করেই এনেছেন এবং ওর মধ্যে আছে মহা সুস্বাদু এক রকম আচার। বোতলটি আমাদের দেখিয়ে স্বামীজী বললেন ঃ 'এটি জো-র (জোসেফিন ম্যাকলাউড) জন্য! ...'

তারপর আমরা একসঙ্গে ফিরে গেলাম। শুরু হলো আনন্দের হাট। আহা, সেসব কী দিনই গিয়েছে! ওখানকার খোলামেলা মুক্ত পরিবেশে স্বামীজীর বেশ উপকার হচ্ছিল—আর কি চমৎকার সব কথা, কত অমূল্য উপদেশ, সে আর কি বলব! অগ্নিবর্ণ পোশাকে, দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি যখন রিজলীর লনে পায়চারি করতেন তখন তাঁর চেহারায় এমন এক মহিমা ফুটে উঠত, কবির ভাষায় বলতে গেলে, যা দেখে মনে হতো তিনি যেন 'জগৎকে দুপায়ে মাড়িয়ে, চরম উপেক্ষা

করে চলে যাচ্ছেন।' অমন ভাবব্যঞ্জক হাঁটা ইহজীবনে দেখিনি, আর কখনও যে দেখব সে আশাও করি না। চালচলন, ব্যক্তিত্ব, তাঁর সব কিছুর মধ্যেই এমন একটা রাজকীয় ব্যাপার ছিল যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যেত না। তাঁর সেই ভাবটি যেমন অননুকরণীয় তেমনই অনির্বচনীয়। কথায় বা লিখে তা প্রকাশ করার উপায় নেই।

একদিন স্বামীজী আমাকে বললেন, মনকে দুশ্চিন্তা-মুক্ত রাখার জন্য তিনি কোনও একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চান। সেই কারণেই আমাকে তাঁর জিজ্ঞাসা ঃ 'আমি কি তাঁকে ছবি আঁকা শেখাতে রাজি আছি?' আমি বললাম—তা, বেশ তো। সেই মতো সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করা হলো। নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীজী বিরাট একটি লাল আপেল নিয়ে আমার কাছে এলেন এবং বিনীতভাবে ফলটি আমার হাতে দিলেন। আমি এই উপহারের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'শিক্ষা যাতে ফলপ্রসূ হয় তার জন্যই যৎসামান্য এই প্রতীকী উপহার। ' ছাত্রের মতো ছাত্র বটে! যেমন মেধা তেমনই একাগ্রতা। কোনও কিছুই একবারের বেশি দু-বার বলতে হতো না। বলার সাথে সাথেই টপ করে ধরে নিতেন। শুরু থেকেই তাঁর ড্রইং এমন আশ্চর্যরকম নিখুঁত ও বুদ্ধিদীপ্ত যে দেখলে মনেই হতো না সেটি কোনও শিক্ষার্থীর কাজ। এত চটপট সবকিছু শিখে ফেলছিলেন যে চতুর্থ পাঠ নেওয়ার পরই তাঁর মনে হলো প্রতিকৃতি আঁকবেন। প্রতিকৃতি তো আঁকবেন। কিন্তু মডেল কোথায়?... অগত্যা মিস্টার লেগেটের বৈঠকখানা ঘরে তুরীয়ানন্দকেই মডেল হয়ে বসতে হলো। আমরাও সব দূরে ডিভানে বসলাম। ঘরের ঝলমলে আলোয় এবার স্বামীজী আঁকতে লাগলেন, আর তুরীয়ানন্দজী বসে রইলেন—যেন নিশ্চল এক ব্রোঞ্জমূর্তি। বলতে কুণ্ঠা নেই, ছবিটি চমৎকার হয়েছিল। ভবিষ্যতে হয়তো ঐ ঘরটিতে অনেক বড় বড় লোক আসবেন—হয়তো কেন, নিশ্চিতই আসবেন—কিন্তু সরল শিশুর মতো আত্মভোলা ঐ মানুষটিকে আর কখনও ঐ ঘরে দেখা যাবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাগজ পেন্সিল নিয়ে এমন অনন্যমনা হয়ে ছবি আঁকতেন যে দেখে মনে হতো ছবি আঁকাই বুঝি তাঁর পেশা! ছবি আঁকা শিখে বাস্তবিকই তিনি বড় আনন্দ পেয়েছিলেন এবং সেকথা তিনি আমাকে বারবার জানাতেন। এই সামান্য ব্যাপারটুকুর জন্য তিনি এমনভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে আমি তো একেবারে অভিভূত!

আর একদিনের কথা। বেশ গরম পড়েছে। সকালবেলায় আমরা সবাই

এক ঘরে বসে আছি। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, আমরা বলে বসলাম—স্বামীজী, আপনি কি করে পাগড়ি বাঁধেন আমাদের দেখাতে হবে। স্বামীজীও দেখালেন। শুধু দেখালেন তাই নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির লোকেরা কতরকমভাবে পাগড়ি বাঁধে তাও দেখাতে লাগলেন। মরুভূমির লোকেরা প্রচণ্ড গরমের হাত থেকে ঘাড় বাঁচানোর জন্য কিরকম করে পাগড়ি বাঁধে সেটি যখন তিনি দেখাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম—স্বামীজী অন্তত কিছুক্ষণ আপনি এইভাবে থাকুন, নড়বেন না। আমি চট্ করে একটা স্কেচ করেনি। আমার অনুরোধ তিনি রাখলেন বটে, তবে কথা বলা আগের মতোই চলল। সেদিন আমাদের কাছে তিনি পবিত্রতা এবং সত্য প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেছিলেন।

রিজলীর কত স্মৃতি! স্বামীজীকে নিত্যনতুন মনে হতো আমাদের। কোনও দিন হয়তো সঙ্গীত নিয়ে বললেন, কোনও দিন হয়তো শিল্পকলা নিয়ে। একদিন সকালে ঘরে ঢুকেই আবেগদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—'মুক্তি'। মুক্তিই হলো বড় কথা। 'মহম্মদ বা বুদ্ধ খুব মহৎ চরিত্রের মানুষ ছিলেন, তাতে আমার কি এল গেল! ওতে কি আমার ভালো-মন্দের কোনও হেরফের হবে? নিজেদের দায়িত্বে, নিজেদের স্বার্থেই আমাদের ভালো হওয়া দরকার; অতীতে কেউ ভালো ছিলেন বলে নয়!'

মনে পড়ছে, আর একবার তিনি আমাকে একটি পুরাতন ভারতীয় গান শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। গানটির উপজীব্য ছিল প্রেম। গানের কথাগুলো অনেকটা এই রকম ঃ

দুলে দুলে ফুলটি
কহিল আমারে—
কাছে এসে মোরে তুলে নাও;
নিজ হাতে ভালবেসে
আমাকে মালা করে,
আপনার প্রিয়ারে সাজাও।

অনেক কষ্টে গানের কথাগুলি রপ্ত করেছিলাম, কিন্তু ভাব বা সুর কোনওটাই ধরতে পারিনি। সুরের মধ্যে এত মারপ্যাঁচ, ছোট ছোট তান এবং মীড়ের কাজ ছিল যে তা কিছুতেই আমার মগজে ঢোকেনি।

এর অল্প কয়েকদিন পরেই রিজলীতে দারুন জমকালো এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। সুন্দর সুন্দর ফুল ও আলো দিয়ে এমনভাবে টেবিল

সাজানো হয়েছিল যে সকলের তাক লেগে যাবার দশা। সালংকারা মহিলারা সকলেই তাঁদের সেরা পোশাকে ঝলমল করছিলেন। ঘরে যখন কথাবার্তা ও হৈ-হুল্লোড়ের ফোয়ারা ছুটছে, ঠিক এমনই এক মুহূর্তে চরম উদাসীনতা পেয়ে বসল আমাকে। সকলের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলাম—কত টাকা থাকলে না-জানি মানুষ এমন এলাহি আয়োজন করতে পারে! আবার এও চিন্তা করলাম—আচ্ছা, ভোজসভায় সমবেত অতিথিদের যতটা হাসিখুশী দেখাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কি এঁরা ততটাই আনন্দিত, নাকি সব লোক-দেখানো? স্বামীজী আমার উল্টোদিকে আড়াআড়ি বসেছিলেন। হঠাৎ সমস্ত সোরগোল ভেদ করে তাঁর ভাবগম্ভীর স্বর কানে এল। ঠিক যেন আমার কানের পাশেই তিনি বলে উঠলেন ঃ 'খুকি, এই মায়ায় ভুলো না।' বুঝতে পারলাম, টেবিলের ওপর একরাশ ফুল ও আলোর বেড়া ডিঙিয়েও তিনি আমাকে ঠিক লক্ষ্য করেছেন। (কেন জানি না, আমাকে তিনি 'বেবি' বা খুকি বলেই ডাকতেন।)

একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ 'তুমি তোমার মনের কথা একদম লুকোতে পার না। কারণ ঠোঁটদুটি নড়ে ওঠার আগেই তোমার চোখদুটি সব প্রকাশ করে দেয়।' তারপর তিনি বললেন ঃ 'আর লুকোবার দরকারই বা কি? সকলের মতো তুমিও মুখোশ পরে ঘুরবে? কক্ষনো না। কপটতাকে কখনও প্রশ্রয় দিয়ো না। তাতে হয়তো তুমি কষ্ট পাবে, কিন্তু দেখবে, তোমার অনুভব এবং কর্মশক্তি দুই-ই বেড়ে গেছে। আশ্চর্য! প্রায় গোটা পৃথিবীটাই যেন সামাজিকতা আর ভণ্ডামির একটা পুরু জোব্বা গায়ে দিয়ে চলেছে—ঠিক গল্পের সেই দুটি লোকের মতো যারা একই সঙ্গে গালে গাল রেখে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, আবার যে যার মতো অপাঙ্গে জগতের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে।'

স্বামীজীর চরিত্রের অসংখ্য দিক। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যার বুঝি কোনও তুলনাই হয় না। তাঁর ভাবসাব দেখলে অনেক সময় মনে হতো যেন এক বয়স্ক শিশু। এতটাই সরল, এতটাই অকপট ছিলেন তিনি যে সহজেই সকলের মন জয় করে নিতেন। পছন্দের জিনিস হলে তিনি খুবই আনন্দ করে খেতেন—যেমন, আইসক্রীম। কতবার দেখেছি, স্যালাড খাওয়ার পর একটু পায়চারি করবেন বা ধূমপান করবেন বলে টেবিল ছেড়ে উঠে গেছেন। কিন্তু লেডি বেটি (শ্রীমতী ফ্রান্সিস এইচ. লেগেট) যেই বলে

উঠতেন—আজ বোধহয় আইসক্রীম আছে, তাই না?—অমনি বাধ্য শিশুর মতো সুড়সুড় করে স্বামীজী তাঁর চেয়ারে এসে বসে পড়তেন, আর এমন হাসি-হাসি মুখে আইসক্রীমের প্রতীক্ষা করতেন যে সে রকম সরল নিষ্পাপ আনন্দের হাসি ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরের মুখেও সচরাচর দেখা যায় না। আইসক্রীম তিনি ভালবাসতেন, আর ভালবাসতেন বলেই তাঁর জীবনে ঐ বস্তুটির কোনও অভাব কখনও ঘটেনি।

সেবার সেই শরৎকালে যখন আমি সেখানে ছিলাম, একটা ঘোর দুশ্চিন্তা যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল। কাউকে কিছু না বললেও মন থেকে কিছুতেই সে চিন্তা তাড়াতে পারছিলাম না। একদিন পড়ন্ত বিকেলে স্বামীজী আমাকে বললেন ঃ 'চল, ওদিকের খামার থেকে একবার ঘুরে আসি; যন্ত্রে কেমন শষ্য মাড়াই হচ্ছে দেখে আসা যাক।' রিজলীর পশ্চিমের জানলাগুলোর সামনে দাঁড়ালে ঐ খামারবাড়িটা চোখে পড়ত।

যে ঘটনাটির কথা বলতে যাচ্ছি, সে সময় দিন সাতেকের জন্য আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই প্রতিদিন 'ম্যানর হাউস'-এ আসা যাওয়া করতাম, আর বলাই বাহুল্য ওঁদের নিত্য আনন্দোৎসবে যোগ দিতাম। যাই হোক, স্বামীজীর সঙ্গে পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামছি, এমন সময়ে তিনি হঠাৎ বললেন ঃ 'আরে, কাল রাতে কোথায় ছিলে? রিজলীর ভোজসভায় তোমার অভাব আমরা খুব অনুভব করেছি।' স্বামীজীর কথায় আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। তবুও কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি—'পার্টি? কই, পার্টির কথা তো কিছু শুনিনি।'

স্বামীজী বললেন ঃ 'সে এক এলাহি ব্যাপার! কত রকম তারের বাজনা, আহারের কত রকম আয়োজন! এমনকি ফেজেন্ট পর্যন্ত! আচ্ছা, তুমি কখনও ফেজেন্টের মাংস খেয়েছ?' আমতা-আমতা করে বললাম ঃ 'না। এখন বলুন দেখি, পার্টিতে কে কে ছিলেন।' স্বামীজীর উত্তর ঃ 'কে ছিল না, তাই বল! আর সকলের সেই নাচ যদি তুমি দেখতে! চলছে তো চলছেই! শেষ আর হয় না! নাচঘরে নয়, বাড়িতেই নাচলো সবাই। নাচের চোটে সবকিছু ওলট পালট। ওহ্, একখানা পার্টি হলো বটে!'

স্বামীজীর কথা শুনে ভাবতে লাগলাম—এসবের মানে কি? এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল অথচ আমাকে কেউ কিছু বললেন না, আগেও না, পরেও না! আশ্চর্য তো! যাই হোক, খানিকক্ষণ পরে ঐ ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে

দিলাম। পরের দিন জানতে পারলাম, গোটা ব্যাপারটাই স্বামীজীর বানানো। আমাকে আমার দুর্ভাবনা থেকে কিছুক্ষণ নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য এবং আমার চিন্তাধারাটি একটু অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই স্বামীজী ঐ গল্প বানিয়ে বলেছেন। অথচ স্বামীজী এমনভাবে বলেছিলেন আমি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে পারিনি।

আমি যেন এখনও দেখতে পাই হলঘরের সবুজ গদিমোড়া পালঙ্কে টানটান শুয়ে ক্লান্ত এক শিশুর মতো স্বামীজী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। একবার ঐ ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছিলাম। তাঁর প্রশান্ত মুখের রেখাগুলি কী সরল, সুন্দর! কিন্তু আঁকতে গিয়ে দেখলাম ভারী শক্ত ব্যাপার!

একদিন আঁকার ক্লাস শেষ হলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'বল দেখি, তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?'

শুনেছিলাম স্বামীজী ভবিষ্যতের কথা সব বলে দিতে পারেন। তাই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা তাঁকে বলতে অনুরোধ করলাম। স্বামীজী বললেন ঃ 'বেশ, যেদিন ভেতর থেকে কিছু বলার ইচ্ছে হবে, সেইদিনই বলব, কেমন?'

কয়েকদিন পর নিজে থেকেই স্বামীজী আমাকে ডেকে বললেন ঃ 'এসো'। আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে সবুজ ডিভানে বসলাম। স্বামীজী বললেন ঃ 'হাতটা সোজা করে পাতো দেখি।' হাতটা এগিয়ে দিতেই স্বামীজী তাঁর একটি হাত আলতো করে আমার হাতের ওপর রেখে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর একেবারে চুপ। মনে মনে ভাবছি, এখন তো সকলেই হাঁটতে বেরিয়েছেন, নয়তো পড়াশুনা করছেন। বেশ নিরিবিলি পরিবেশ। এই সুযোগে স্বামীজীর কাছ থেকে ভবিষ্যতের খুঁটিনাটি সব কথা জেনে নেওয়া যাবে। স্বামীজী দু-একবার গভীর শ্বাস নিয়ে যেই বলতে শুরু করলেন 'কি দেখছি জানো...',? অমনি দড়াম করে দরজা ঠেলে অ্যালবার্টার প্রবেশ! লাফাতে লাফাতে এসে সে ঝুপ করে আমাদের কাছে বসে পড়ল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হওয়ায় ঐখানেই হাত দেখার ইতি। স্বামীজী পরে আর কখনও ঐ প্রসঙ্গ তোলেননি, আর আমিও কিছুদিনের মধ্যেই অন্যত্র চলে গেলাম।

আর একদিনের ঘটনা। ওখানে কয়েকজন মহিলা অতিথি উপস্থিত। দুজন মহিলার সঙ্গে তাঁদের কন্যারাও ছিলেন। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর আমরা সকলে হলঘরে বসে আছি। স্বামীজীও সেখানে উপস্থিত। তাঁর পরনে অগ্নিবর্ণ রেশমী পোশাক। আর সে কী অসাধারণ রূপ তাঁর! সে দৈব সৌন্দর্যে মনপ্রাণ

সব জুড়িয়ে যায়। আগুনের ধারে বসে স্বামীজী ধীরে ধীরে তাঁর আয়ত, সজল 'ভ্রমরকৃষ্ণ' চোখদুটি ঘরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বসে থাকা সকলের ওপর বুলিয়ে নিয়ে 'বিবাহ' প্রসঙ্গে বলতে শুরু করলেন। প্রথম কথাটি শুনেই বুঝলাম চিন্তার কোন্ গভীরতম স্তর থেকে তিনি আলাপ শুরু করেছেন। ঠিক ঐভাবে কোনও পুরুষকে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি। স্বামীজী বললেন 'সেই আকাশের কথা যেখানে মিলন-সুখ অনুভূত হয়।' যাঁরা মেয়েকে সঙ্গে করে এসেছিলেন, আমাদের মধ্যে সেই দুই মহিলা স্বামীজীর কথা শুনে প্রথমটা খুব হকচকিয়ে গেলেও স্বামীজীর সুগম্ভীর ও পরিমার্জিত উপস্থাপনার গুণে শেষপর্যন্ত ঐ প্রসঙ্গের তাৎপর্য উপলব্ধি করে অসম্ভব পুলকিত ও মুগ্ধ হলেন। আমি নিশ্চিত আমরা কেউই আর ঐ রকম আলোচনা শুনতে পাব না। অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন সুস্থ, স্বাভাবিক আর পাঁচটা মানুষের মতোই তিনি তাঁর চিন্তা ও মতামত অকপটভাবে ব্যক্ত করছিলেন। কিন্তু কথাগুলি তিনি এমন করে বলছিলেন যে তা সঙ্গীতের মতোই শোনাচ্ছিল। আমার সাধ্যি কি তাঁর বলা কথাগুলি আবার আপনাদের কাছে তুলে ধরি! অথচ তাঁর বক্তব্য কতই না প্রাঞ্জল ছিল এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল এমন কিছু যা জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।

কথা শেষ হলে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন এবং এক অখণ্ড নীরবতার মধ্যে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন; ঠিক এক আদর্শ মহাপুরুষেরই মতো।

(বেদান্ত এ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৫৩)

ভগিনী নিবেদিতা

১। কলকাতা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ ঃ এ্যালবার্ট হলে মা-কালীর ওপর আমার বক্তৃতাটি সোমবার চুকে গেছে। খুব ভিড় হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সভাপতি মা-কালী ও আমাকে খুব এক হাত নিলেন। তা নিন গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক মাতৃভক্ত সন্তান আর থাকতে পারলেন না; তিনি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে সভাপতির বাপান্ত করে ছাড়লেন। সেটা আবার আমার ভালো লাগলো না। যাক, তুমি কিছু মনে করো না। কিন্তু সত্যি বলছি, সমস্ত ব্যাপারটা যখন ভাবি তখন এমন বেদম হাসি পায় কী বলবো! বক্তৃতার ব্যাপারে স্বামীজী খুব খুশি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর পিছনে কোনও যুক্তি আছে। কারণ বক্তৃতা দেওয়ার পর থেকেই বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে—বক্তৃতাটি না দিলেই বোধহয় ভালো হতো। বক্তৃতা দিয়ে বোধহয় খারাপই করলাম, ইত্যাদি, ইত্যাদি।—'রা গলাবাজি করে বলে বেড়াচ্ছে—ও আবার কি ৺কালী পুজোর ছিরি! সাধারণ মানুষ তবুও ঐ পুজোর হুজুকে মাতে কারণ তাদের এমনই হীন সংস্কার যে ওর চাইতে ভালো কিছু উপাসনার কথা তারা ভাবতেও পারে না।

যাক গে। ওদিকে আবার কালীঘাটের লোকজন ওখানে একটা বক্তৃতা দেবার জন্য খুব ধরেছে। তাদের ইচ্ছে আমি ৺কালী সাধনার ওপর বলি। এসব বলে হয়তো তেমন কিছু ফল হবে না। কিন্তু স্বামীজীর ধারণা, আর কিছু হোক না হোক, সঙ্কীর্ণমনা ছুঁৎমার্গীর দল এতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাবেন। আর সাথে সাথে এটাও লোকে বুঝবে ধর্ম কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে আমার একটা বিশেষ লাভ হয়েছে এই, আমি একজন বন্ধু পেয়েছি। অল্পবয়সী ছেলে, কিন্তু উৎসাহ আর উদ্দীপনায় যেন টগবগ করে ফুটছে। খুব খোলামেলা মনের ; জীবনে মহৎ কিছু করতে চায়।

'বলি'-র অন্তর্নিহিত চরম তত্ত্বটি, মনে হয়, আমি ধরতে পেরেছি, যদিও জানি না ভাষায় তাকে ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে পারবো কিনা। আমার ধারণা, ভক্ত যতদিন দেবতার পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করার মতো শক্ত-সমর্থ না হচ্ছে, ততদিন সে জীবজন্তু বলি দিয়েই তুষ্ট থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সে আত্মবলিদানের শক্তি অর্জন করে, সেই মুহূর্তেই সে পেলিক্যান পাখির মতো নিজের রক্ত নিজেই

টেনে বার করে এবং সেই রক্তেই পূজার ফুল রাঙিয়ে জগজ্জননীর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে ধন্য হয়। 'বলি' ব্যাপারটার মূল তাৎপর্য আমার কাছে এই, যা তোমাকে লিখলাম। এ কথা সকলেরই জানা বলিদানের এই ব্যাখ্যা আমি স্বামীজীর নিজের মুখ থেকেই শুনেছি। অতএব তা নিশ্চিতভাবেই শাস্ত্রসম্মত এবং স্বীকৃত। অবশ্য তুমি কি ভাবো, বা এ বিষয়ে তোমার কি মত, তা আমি জানি না।

গতকাল সকালে আমরা দুজন বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। আমরা যাব শুনে স্বামীজী খুব খুশি হয়েছিলেন এবং সেকথা তিনি সকালে আমাদের বলে পাঠিয়েছিলেন। আমি বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথকে স্বামীজীর কথা বললাম। এও বললাম—দেখুন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আপনার পায়ে দুটি প্রণাম রাখলাম। একটি আমার নিজের, অন্যটি আমার গুরুদেবের। আমার কথা দেবেন্দ্রনাথের অন্তর স্পর্শ করায় তিনি বললেন—হ্যাঁ। তাকে অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলাম। সে সময় আমি নৌকায় ঘুরছিলাম। তুমি তাকে বলো, আর একবার সে আমার কাছে এলে খুব খুশি হব।

ফিরে গিয়ে স্বামীজীকে যখন এ কথা বললাম, তাঁর সে কী আনন্দ! বললেন, 'নিশ্চয় যাব, আর তুমিও আমার সঙ্গে যেতে পার। যদি যাও, চটপট একটা দিন ঠিক করে ফেল দেখি!'

শুনেছি, তরুণ স্বামীজী একবার ঠ-বাবার নৌকায় গিয়ে খুব ব্যাকুলতার সঙ্গে অদ্বৈতের ওপর কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ নাকি কিছুক্ষণ মৌন থাকেন; তারপর শান্তভাবে বলেন—'ঈশ্বর আমাকে শুধু দ্বৈতের সন্ধানই দিয়েছেন।' তারপর স্বামীজীর পিঠ চাপড়ে তিনি বলেছিলেন ঃ 'তোমার দেখছি যোগীর চোখ।'

২। কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ ঃ আমার কালী-বিষয়ক বক্তৃতাটিকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে নানা আলোচনার সূত্রপাত হলে স্বামীজীর কোনও কোনও বন্ধুকেও তা বেশ ভাবিয়ে তোলে। স্বামীজীর পক্ষে সেটা যেন শাপে বর হলো। তিনি সেই সুযোগে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারলেন। একদিন স্বামীজী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সঙ্গে আমিও আছি। কথাবার্তা শুরু হলে আলোচনা অনিবার্য ভাবে প্রতীক উপাসনার দিকে মোড় নিল। স্বামীজী বললেন ঃ "বেচারা 'ম' প্রতীকবাদের ইতিহাসটা কখনও পড়ে দেখেননি। পড়লে বুঝতেন জড় প্রতীকের উপাসনা বড় একটা ফলপ্রদ হয় না। তোমরা আমার কথাই ধর না কেন। কী অদ্ভুত শিক্ষাই পেয়েছিলাম

আমি। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন প্রথম প্রথম যেতুম তখন মানুষটিকে আমার ভাল লাগতো, কিন্তু তাঁর ভাবের প্রতি আমার কোনও রকম শ্রদ্ধা ছিল না। এইভাবে এক-আধটা বছর নয়, ছ-ছটা বছর ধরে চললো নিরন্তর সংগ্রাম। আমি বলতুম, 'আপনি আমাকে যা করতে বলছেন, ওসব আমি বিশ্বাসই করি না।' তিনি বলতেন, 'ওরে, তোর বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি এসে যায়। যা বলছি, তুই করেই দেখ্না কেন। করলেই হাতেনাতে ফল পাবি।' আমাদের মধ্যে শুধু এই ধরনের লড়াই চলতো। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, সর্বদা তিনি আমাকে এতটাই ভালবাসতেন যে ভালবাসা জীবনে আমি আর কারও কাছ থেকে পাইনি। আর শুধু কি ভালবাসা? তার সাথে মিশেছিল গভীর শ্রদ্ধা। তিনি ভাবতেন, 'এই ছেলেটি (নরেন) বড় হয়ে এই হবে, তাই হবে।' আর, বোধহয় সেই কারণেই, আমাকে কখনও তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত সেবার কাজ করতে দিতেন না। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রতি তিনি এই ভাবটি বজায় রেখেছিলেন। একটু পাখার বাতাস করতে গেলেও বলতেন—না, ও তোর কাজ নয়। অন্যান্য কাজও যখন যা করতে গেছি, বাধা দিয়েছেন।"

৩। কলকাতা, ১২ মার্চ, ১৮৯৯ ঃ গত রাত্রে মঠের এক সাধু এসেছিলেন। তাঁকে বললাম 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর জন্য স্বামীজীর একটি ইন্টারভিউ নিতে চাই। সাধুটি বললেন—তা বেশ তো। ছটায় এসে আপনাকে নিয়ে নৌকায় ফিরে যাবো। মঠ থেকে ফেরার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। সকালে এই সাধুর সঙ্গে 'স'-ও এসেছিলেন। 'স' এসেছিলেন ইন্টারভিউ-এর পর আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তাই শেষপর্যন্ত নৌকায় আমাদের যাওয়া হলো না। আমরা তিনজন একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আটটায় মঠে পৌঁছলাম। স্বামীজী তখন গাছের তলায় জ্বলন্ত ধুনির সামনে বসে আছেন। ...সাক্ষাৎকার যখন নিলাম তখন স্বামীজী বললেন ঃ 'মার্গট, আমি তোমায় স্পষ্ট বলছি, বেশ কিছু দিন ধরেই অপ্রতিরোধ বা কাজকর্মের ব্যাপারে ন্যূনতম প্রতিরোধের পন্থাটি নিয়ে আমি চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু দেখছি এটা একটা জঘন্য রকমের ভুল। ব্যাপারটা আপেক্ষিক। সে যাই হোক, ঠিক করেছি, আমি অন্তত আর ও নিয়ে মাথা ঘামাব না। পৃথিবীর ইতিহাসখানা একবার খুলে দেখ। দেখবে, তা হলো গুটিকয়েক সৎ, নিষ্ঠাবান, উদ্যমী মানুষের ইতিহাস। আপন আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় যে স্থির, জগৎ তার পায়ের তলায় আসতে বাধ্য। অতএব, আমি আমার আদর্শ থেকে একচুলও হটে আসছি না জেনো। আমি হুকুম করবো আর জগৎ তা তামিল করবে।' ...

৪। কলকাতা, ৯ এপ্রিল, ১৮৯৯ ঃ স্বামীজী বলেন, আমার মহা দোষ আমি একসঙ্গে বড্ড বেশি কাজ হাতে নিয়ে ফেলি। ঠিকই বলেন। এবং আমি সেটা যে বুঝিনা তা নয়। অতএব প্লেগ রোগীর শুশ্রূষা মাথা থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, নালা-নর্দমা ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখার যে কর্মসূচী আমরা হাতে নিয়েছি, সেটি যাতে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয় সেই কাজেই এখন আমাকে কোমর বেঁধে লাগতে হবে। সেটাই কি উচিত নয়, তুমি কি বল? আমার তো বিশ্বাস প্লেগ মহামারীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেবার কাজ চালানোর যে উত্তেজনা ও আনন্দ তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি আত্মত্যাগ ও গুরুভক্তির পরিচয় থাকবে এই কাজে। অবশ্য একথা যে বলছি সেও এক ধরনের শিশুসুলভ অহংকার থেকে। কারণ আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু পুরনো সেবার কাজ বন্ধ রাখায় বেশ মনঃক্ষুণ্ণ। তিনি অবশ্য সরাসরি আমাকে কিছুই বলেন নি; আর সত্যি কথা কি, আমিও তাঁকে এ ব্যাপারে কিছু বলার সুযোগ দিতে চাই না—আত্মপক্ষ সমর্থন করা তো দূরের কথা! আবার বিবেকের সংশয় অতিক্রম করবার মতো মনের জোর যে আমার আছে তা-ও নয়।

সাফাই অভিযানের জন্য আমাদের তহবিলে এ পর্যন্ত দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা জমা পড়েছে। বেশ ভালোই বলতে হবে। অবশ্য একথাও সত্যি, টাকাটা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। যে সন্ন্যাসী এই সেবার কাজ পরিচালনা করছেন তিনি গত শনিবার যখন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট দিলেন তখন স্বামীজীকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল। একটানা দু-ঘণ্টা তিনি নানান বিষয়ে কথাবার্তা বললেন; উপনিষদও বাদ গেল না। স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, ‘সেবা, মনুষ্যত্ব, সমমর্মিতা বাদ দিলে ধর্মের আর রইলো কি! ওদিকে নিবেদিতা এক কোণে পড়ে রয়েছে আর ইংরেজরা তাকে সাহায্য করে যাচ্ছে। ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন!’ মজার কথা এই, আজ যখন আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম, স্বামীজী আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই বলতে লাগলেন ঃ ‘প্লেগ, মার্গট, প্লেগ।’ স্বামীজীর কাণ্ড দেখে আমি মনে মনে না হেসে পারলাম না। তিনি বললেনঃ ‘দেখো, আমাদের কর্মীদের হয়তো একটু নম্রতা-ভব্যতার অভাব আছে, কিন্তু বাংলাদেশের প্রকৃত মানুষ বলতে ওরাই। ওদের মধ্যেই যা একটু মনুষ্যত্ব আছে। ইউরোপে মেয়েরাই পুরুষদের পৌরুষ দিয়েছে কারণ তারা কাপুরুষতাকে ঘৃণার চোখে দেখে। বাঙালি মেয়েরা কবে যে ইউরোপের মেয়েদের মতো পুরুষদের দুর্বলতা দেখে নির্মম পরিহাস ও বিদ্রূপে জ্বলে উঠবে কে জানে?’

৫। কলকাতা, ১ মে, ১৮৯৯ ঃ স্বামীজী এখন মঠে জ্বর ও ব্রঙ্কাইটিসে শয্যাশায়ী।

শুক্রবার স্বামীজীর কাছে গেলাম এবং দুপুরে একসঙ্গে খেলাম।... কিন্তু শনিবার দেখলাম তাঁর মেজাজ একেবারে বদলে গেছে। একেবারে যেন অন্য মানুষ! এক এক সময় ভয় হয়, তাঁর দিন কি তবে ফুরিয়ে আসছে! কিন্তু তা যদি নাও হয়, এটা সুনিশ্চিত তিনি আর কোনও কিছুর সাথে আপোষ করবেন না। হয় সোজা হিমালয়ে গিয়ে ধ্যান-জপে কাটিয়ে দেবেন, নয়তো আবার জগতের সামনে দাঁড়িয়ে এমন কিছু চরম সত্য প্রচার করবেন যে বাণীর অলোকসামান্য প্রভায় অজ্ঞানতার অন্ধকার চুরমার হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে গিয়ে তারা যে ঠিক পথেই এগোচ্ছে, এ আশ্বাস কিছুদিনই দেওয়া চলে। আর তা তিনি দিয়েছেনও। কিন্তু অনন্তকাল ধরে ও কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী ঠারে ঠোরে যেন সে কথাই আমাকে বলতে চাইছেন। তাঁর এখনকার মনের ভাব এই—ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। একটানা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর স্বামীজী শান্তভাবে বললেন ঃ 'এতক্ষণ যা বললুম, মার্গট, এসব তুমি এখন কিছুই বুঝবে না। আরও কিছু দিন যাক, তখন তুমিও বুঝবে।' ...

স্বামীজীর কাজের জন্য টাকা দিতে পারেন এমন লোকের অভাব বাংলাদেশে আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই, যাঁরাই কিছু দিতে চান, তাঁরা দানের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু শর্তও জুড়ে দেন। ফলে সে অর্থ স্বামীজী তদ্দণ্ডেই প্রত্যাখ্যান করেন। এই হলেন স্বামীজী! এই তাঁর নীতি বোধ! এই তাঁর আদর্শ! তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাব হলো—নীতি জলাঞ্জলি দিয়ে কেক খাওয়ার চেয়ে পেটে দড়ি বেঁধে থাকা সহস্রগুণ ভালো। ... এই ক্ষুরস্যধারা বিবেক সম্বল করেই তিনি জগৎ জয় করতে চান, অন্য কোনও সহজ উপায়ে নয়। স্বামীজী ঠিকই বলেন—জগতের নিয়মই এই। তুমি যদি জগৎকে আঁকড়ে ধরতে যাও, জগৎ অবধারিতভাবেই তোমাকে ডিঙিয়ে যাবে। কিন্তু জগৎকে যে উপেক্ষা করতে পারে, জগৎ তার কাছে নতজানু হয়ে আসে, নিজেকে ধরা দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।...

৬। কলকাতা, ৮ মে, ১৮৯৯ ঃ আহা, কী চমৎকার কথা! 'তোমার জীবনের উদ্দেশ্য তোমার স্বরূপটি খুঁজে পাওয়া। শান্ত হয়ে তাই খোঁজ আর জীবনের পিছনে ছুটে চলা থেকে বিরত হও।' বাস্তবিক, এই হলো চরম সত্য। যে সমস্ত জিনিসের পিছনে আমরা ছুটে মরি—অর্থাৎ যা আমরা চাই, আর যা আমাদের চাওয়া উচিত—এই দুয়ের মধ্যে কত তফাত!

আজ স্বামীজীকে দর্শন করলাম। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম তাঁর যখন মাত্র তের বছর বয়স তখনই টমাস আ কেম্পিসের বইটি তাঁর হাতে আসে। বই-এর ভূমিকায় লেখক তাঁর মঠের এবং কেমন করে তাঁদের সঙ্ঘ চলে তার একটা বিবরণ দিয়েছেন। ঐ মঠের বর্ণনাই বইটির আকর্ষণ শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি তখন ঘুণাক্ষরেও জানতেন না একদিন তাঁকেই এইসব নিজের হাতে গড়ে তুলতে হবে।

স্বামীজী বললেন ঃ দেখ, 'টমাস আ কেম্পিস' আমার খুব প্রাণের জিনিস, তাঁর বই আমার প্রায় কণ্ঠস্থ। কিন্তু আমি ভাবি, যিশু কি কি বলেছিলেন। অতশত কথায় না গিয়ে তাঁর জীবন চরিত রচয়িতারা যদি শুধু এই কথাগুলি সাদামাটা ভাবে আমাদের বলতেন—যিশু কি খেতেন, কি পান করতেন, তিনি যেখানে থাকতেন সে পরিবেশটা কেমন ছিল, কোথায় বা তিনি ঘুমাতেন এবং সমস্ত দিনরাত তিনি কিভাবে কাটাতেন—তাহলেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু সেসবের ধারে কাছে না গিয়ে যিশুর জীবনবেত্তারা তাঁর মুখে কেবল লম্বা লম্বা কথা জুড়ে দিয়েছেন, তাঁকে ভাষণ দিইয়ে ছেড়েছেন! দেখ বাপু, ধর্মের সার কথাগুলি হাতে গোনা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র সেসবেও কিছু কাজ হবে না। আসল কথা মানুষের দিব্য জীবনটি, তার চরিত্রটি। যথার্থ ধর্মের মধ্য থেকে মানুষের জীবন কেমন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় সেটিই আদত জিনিস, লক্ষ্য করবার বস্তু। এ অনেকটা কি রকম জানো? মনে কর, তুমি হাতের মুঠোয় এক তাল কুয়াশা ধরে রেখেছি; আর তারপর ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম অধরা বস্তুটিই তোমার চোখের সামনে একটি মানুষে রূপান্তরিত হলো। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ধর্মজীবনে ঠিক এই ব্যাপারটিই ঘটে। মুক্তি-ফুক্তি কিস্যু নয়, বুঝলে মার্গট, কিস্যু নয়। এমনিতে ওসবের কোনও মূল্যই নেই। ওটি মহত্তম প্রেরণা মাত্র। মানুষটা কি দাঁড়ালো, সেটাই প্রধান বিচার্য!

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে এই আলোচনাটা প্রথম কিভাবে শুরু হয়েছিল এইবার মনে পড়েছে, স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নয়, তিনি নিজে যেভাবে জীবন যাপন করে গেছেন, সেইটিই আমাদের একান্তভাবে গ্রহণীয় এবং সেইভাবের অনুধ্যানমূলক একখানি গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সেটি এখনও লেখা হয়নি। যাই বল না কেন, দুনিয়াটা আর কি! একগুচ্ছ ছবি বই তো নয়! একটার পর একটা ছবি চোখের সামনে আসছে আর সরে সরে যাচ্ছে। তার মধ্যে যেটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার সেটি এই, মানুষের চরিত্র

কিভাবে গড়ে উঠছে; কিভাবে সে ক্রমিক পূর্ণতার পথে এগোচ্ছে। বাস্তবিক, এই তো আমরা দেখছি, আর কি? শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই আগাছা সরিয়ে দিতেন। বুড়ো-হাবড়াদের তিনি বিশেষ আমল দিতেন না। শিষ্য হিসেবে তিনি বেছে নিতেন সেইসব অনাঘ্রাত, শুদ্ধসত্ত্ব তরুণদের যাদের মধ্যে সংসারের ভাব এতটুকু প্রবেশ করেনি।'

৭। কলকাতা, ১৮৯৯ ঃ শুক্রবার রাতে আমার বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা ছাড়া এ সপ্তাহে বলার মতো তেমন ঘটনা ঘটেনি। জনৈকা বান্ধবীর স্বামী দেখলাম আমার ওপর বেজায় খাপ্পা; আমাকে খুব এক হাত নিলেন। একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন ঃ ''আপনাকে দেখলে 'মিস নোবল'-ই মুখে এসে যায়। বেশ কিছু দিন অভ্যাস না করলে 'সিস্টার নিবেদিতা' বলে আপনাকে ডাকতে পারবো বলে তো আমার মনে হয় না।'' ভদ্রলোকের অভিযোগ, আমি নাকি বীভৎস রকমের সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি এবং এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনার কোথায় বাধছে বলুন তো, আপনার আর আমার মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? প্রশ্ন করতেই আসল ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ল। ভদ্রলোক যা বললেন তাতে বুঝলাম—স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করাতেই ওঁর দারুণ আপত্তি। বললেন ঃ 'এমন একজন সঙ্কীর্ণমনা মানুষ যাঁর চোখে নারী মাত্রেই আধা-রাক্ষসী, যিনি মহিলা দেখা মাত্রই মূর্ছা যান', তাঁকে কিনা আবার পূজা!

ভদ্রলোকের কথার ছিরি দেখে আমার বিষম খাবি খাওয়া অবস্থা, হাসিও পেল। মনের ভাব চেপে শুধু এই বললাম—আপনার ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই; তাই আপনার কথা মানতে পারলাম না। বললাম, স্বামীজীর কথা বাদই দিন, আমরা কেউই বলিনি আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে পূজা করুন। পূজা করা বা না করা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কিন্তু তাতেও প্রসঙ্গের নিষ্পত্তি হলো না। তিনি এবার বললেন ঃ 'বর্তমান ভারতের প্রয়োজন সমন্বয়কারী এক সর্বজনীন ধর্ম। অবতারবাদ প্রচার করে সেই প্রয়োজন মিটবে না।' ওঁর এই কথা শুনে আমি তো থ! যে অবতার অসাম্প্রদায়িক, যিনি বলেন—মত পথ বই আর কিছু নয়, সে অবতারকে দিয়ে বর্তমান ভারতের প্রয়োজন না মিটলে আর কাকে দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, এটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না! আমি স্থিরনিশ্চয়, ভারতবর্ষের সামনে আজ এই একটিমাত্র পথই খোলা। অবতারবাদে যদি কারও বিশ্বাস না

থাকে স্বামীজীর মতো তিনি না হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার না-ই বলুন, তাতে কি আসে যায়!

আমার বন্ধুটি বললেন ঃ 'তাহলেও, এটা তো একটা নতুন কোনও ধর্ম হলো না।' বললাম, কে চেয়েছে নতুন ধর্ম? ও নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। অন্তত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের তো নয়ই। তাঁরা যেটি চাচ্ছেন সেটি শিক্ষা বিস্তার। দিকে দিকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে উৎসুক তাঁরা। এবং আপাতত তাঁরা সাধ্যমতো সেই কাজেই ব্যস্ত। কে কাকে পূজা করবে না করবে, ভবিষ্যতের ধর্ম কি হবে—এ সব প্রশ্ন মানুষ শিক্ষা পেলে পরে নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবে।

এরপর বন্ধুটি বললেন ঃ 'যেদিন বিবেকানন্দকে বলতে শুনলাম তিনি দেশের মানুষের মনুষ্যত্ব এবং পৌরুষ জাগিয়ে তুলতে চান, সেদিন কী রোমাঞ্চিতই না হয়েছিলাম! লণ্ডনে বসে কলকাতায় দেওয়া তাঁর বক্তৃতাগুলিও আমি সোৎসাহে পড়েছি এবং লক্ষ্য করেছি সত্যের জন্যে, মানুষের যথার্থ মঙ্গলের জন্যে কী তীব্র ঘৃণা ও বৈরাগ্যের সঙ্গেই না তিনি মানুষের দেওয়া মান-সম্মান ছেঁড়া, ময়লা কাগজের মতো পথের ধূলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন! কিন্তু যেদিন দেখলাম তিনি তাঁর গুরুর পূজা করছেন সেদিন আমি হতাশায় ভেঙে পড়লাম। মনে হলো, এও কি সম্ভব! যে মানুষটির মধ্যে এত বীরত্ব, এত মহত্ত্ব, তিনি কিনা শেষপর্যন্ত একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা হয়ে বসলেন!

তোমাকে এতসব বলছি, তার কারণ একটাই—কথাগুলি নথিবদ্ধ থাকা দরকার। একদিন হয়তো লোকে বলে বসবে, 'স্বামীজী নতুন কিছু করেনও নি, বলেনও নি।' ভদ্রলোকের আবেগপ্রসূত অসংলগ্ন মন্তব্য তাই এক হিসাবে আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান।

৮। সিংহলের উপকূলে, ২৮ জুন, ১৮৯৯ ঃ মাদ্রাজে খুব মজা হয়েছিল। ওখানকার বহু ভক্ত ও সাধারণ মানুষ লাট সাহেবের কাছে আবেদন করেন স্বামীজীকে যেন জাহাজ থেকে নামতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্লেগের কথা মনে রেখে কর্তৃপক্ষ সে অনুমতি দেননি। ফলে আমরা জাহাজেই থেকে গেলাম। একপক্ষে ভালোই হলো। কারণ সমুদ্রযাত্রায় স্বামীজীর খুব উপকার হচ্ছিল। নিচে নামবার অনুমতি পেলে লোকের ভিড়ে আর অনর্গল কথা বলার ধকলে তিনি অবধারিতভাবে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। জাহাজে থাকলে সেটা অন্তত হবে না—এই ভেবে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অবশ্য তাতেও স্বামীজী

রেহাই পেলেন না। নৌকা বোঝাই ভক্ত ও অনুরাগীর দল সারাদিন জাহাজের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন। অনেকেই স্বামীজীর জন্য হাতে করে কিছু এনেছেন। স্বামীজীও সাগ্রহে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে তাঁদের দর্শন দিতে লাগলেন। কিন্তু অনবরত ডেক থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে দর্শনাদি দেওয়া এবং সকলকে মিষ্ট ভাষণে তুষ্ট করাও কম কথা নয়।...

...ঘণ্টাখানেক হলো স্বামীজী এখানে এসেছেন। কিন্তু এরই ভিতর আমাদের মধ্যে নানাধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। হঠাৎ কি করে যেন এক সময় 'ভালবাসার' প্রসঙ্গ উঠলো। স্বামীজী অনেক কথাই বললেন, বিশেষ করে বললেন ইংরেজ ও বাঙালি গৃহবধূদের নিষ্ঠার কথা, তাদের ত্যাগের কথা। বললেন—ওরা মুখ বুজে সব কষ্ট সহ্য করে। অবশ্য ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষের জীবনে কখনও কখনও সুখের সুদিন ঝিলিক দিয়ে যায়, কবিতাও হাতছানি দিয়ে ডাকে বৈকি! কিন্তু ঐ ক্ষণভঙ্গুর পলাতকা আনন্দকে আস্বাদন করার জন্য মানুষকে কী চোখের জলটাই না ফেলতে হয়! অবশ্য এটাও ঠিক দুঃখকষ্ট পেলেই মানুষের দৃষ্টি সাফ হয়, তার আধ্যাত্মিক উদ্বোধন হয়; সুখে তা কখনো হয় না। সুখ মানুষকে বেঁধে রাখে, পরাধীন করে। আর পরাধীনতা হচ্ছে দুঃখের আকর। একমাত্র শান্তি স্বাধীনতায়।

স্বামীজী আরও বললেন ঃ 'জাগতিক সব রকম ভালবাসাই একধরনের বন্ধন, কারণ তাতে কোনও না কোনও স্বার্থ জড়িত থাকেই। একমাত্র মায়ের ভালবাসাতেই কখনো কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। তুমি নিশ্চিত জেনো, মার্গট, অন্যের আনন্দ হবে বলে নয়, নিজে আনন্দ পাবে বলেই একজন আরেকজনকে ভালবাসে।' একটু থেমে স্বামীজী বললেন ঃ "যদি আগামী কালই আমি মাতাল হই, তাহলে আমার শিষ্যরা ঘৃণাবশত আমাকেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার এমন কিছু গুরুভাই আছে (সকলে নয়) যারা তা করবে না। তাদের কাছে আমি এখন যেমন, তখনও তারা আমাকে সেই দৃষ্টিতেই দেখবে। এই হলো ভালবাসা, আর এই রকম ভালবাসার ওপরই ভরসা করা চলে। তুমি একটা কথা জেনো, মার্গট", স্বামীজী বললেন ঃ "আধ ডজন মানুষ যখন ঠিক এইভাবে ভালবাসতে শেখে, তখনই ঠিক ঠিক একটি নতুন ধর্মের সূচনা হয়। তার আগে নয়। আমি সেই ভক্ত মহিলাটির কথা কখনও ভুলতে পারি না যিনি খুব সকালে যিশুর সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে একাকী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তিনি যেন কার গলার আওয়াজ পেলেন;

ভাবলেন, বুঝি বা বাগানের মালীই কথা বলছে। অথচ ঠিক সেই মুহূর্তেই যিশু তাঁকে স্পর্শ করেছেন। ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়িয়েই যা দেখতে পেলেন তাতে তিনি স্তম্ভিত! প্রেমের আবেগে, পুলকে তিনি তখন আর কথা বলতে পারছেন না। গদগদ স্বরে শুধু বললেন 'প্রভু আমার, দেবতা আমার!' ব্যস্, ঐ কটি কথা। 'প্রভু আমার, দেবতা আমার'! বলতে না বলতেই দেবমূর্তি মিলিয়ে গেল।"

স্বামীজী বলে চললেন, "দেখ, গোড়ায় ভালবাসাকে নিষ্ঠুরতা বলেই মনে হয়, কারণ তখন সে স্থূল। জাগতিক ভালবাসা অথবা ধর্মের প্রতি অনুরাগ দুটি ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে তার উত্তরণ ঘটে, সে সূক্ষ্ম হতে থাকে। ভালবাসা তখন মানসিক বা বৌদ্ধিক স্তরের অনুভূত সত্য। শেষে ভালবাসা যখন আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়, তখন তার নাম প্রেম। কেবলমাত্র এই চূড়ান্ত পর্যায়েই আমরা কায়মনোবাক্যে বলতে পারি 'প্রভু আমার, দেবতা আমার'। আমাকে এই রকম আধ ডজন শিষ্য দাও দেখি, আমি জগৎ কাঁপিয়ে দেবো, দুনিয়া তোলপাড় করে দেবো।"

৯। আমেরিকা, ৯, ১২ এবং ১৩ অক্টোবর, ১৮৯৯ ঃ ঘণ্টা দেড়েক হলো স্বামীজী একনাগাড়ে পায়চারি করছেন আর আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন—"পোশাকি ভদ্রতা আর লোকদেখানো বিনয় ছেড়ে দাও। কথায় কথায় বাইরের জিনিস দেখে 'লাভলি' (কী মনোহর) আর 'বিউটিফুল' (কী সুন্দর), ওসব কোনও কাজের কথা নয়।"

মাঝে মাঝেই বলছেন ঃ "চলে এস হিমালয়ে। ভাবাবেগবর্জিত হয়ে আত্মোপলব্ধি কর। আর আত্মাকে যখন জানবে, তখনই তুমি দশদিক কাঁপিয়ে বজ্রের মতো কড়াৎকড় শব্দে পৃথিবীর বুকে ফেটে পড়তে পারবে। যারা মিন-মিন করে বলে—'আমার কথা কি কেউ শুনবে?'—তাদের ওপর আমার কোনও আস্থাই নেই। আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস, যার বলার মতো কিছু আছে, তার কথা জগৎ শুনতে বাধ্য। আত্মশক্তিতে জ্বলে ওঠো, মার্গট, জ্বলে ওঠো। পার না জ্বলে উঠতে? যদি না পার, হিমালয়ে গিয়ে এখুনি তপস্যায় লেগে যাও।" এই কথা বলেই স্বামীজী আচার্য শঙ্করের বৈরাগ্যবিষয়ক 'চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রম্' আবৃত্তি করতে লাগলেন আর প্রতিটি শ্লোকের শেষাংশ গুণগুণ সুরে উচ্চারণ করতে থাকলেন এই বলে ঃ 'ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে' (অতএব, হে নির্বোধ, গোবিন্দকে ভজনা কর, গোবিন্দকে ভজনা কর, গোবিন্দকে ভজনা কর)।

স্বামীজী আমাদের সামনে যে আদর্শগুলি তুলে ধরছিলেন তা যদি দু-একটি কথায় বোঝাতে হয় তাহলে এই দাঁড়ায় ঃ 'তুচ্ছ সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে ওঠো; অশান্ত মনকে এমন কষে বাঁধো যে ইন্দ্রিয়ের চিরন্তন আহ্বান সে উপেক্ষা করতে পারে। জেনে রেখো, নরম বিছানায় শোয়া অথবা সুস্বাদু লোভনীয় খাবার যেমন ভোগের উপকরণ, তেমনি যখন শারদ হাওয়ার ছোঁয়ায় গাছের শাখায় শাখায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়, তখন সেটি দেখে তৃপ্ত হওয়াও ইন্দ্রিয়সুখভোগের ব্যাপার।' স্বামীজীর কথা—লোকের নিন্দা এবং স্তুতি, দুটিকেই ঘৃণা করতে শেখো, উপেক্ষা করতে শেখো, কারণ দুটিই হাস্যকর।

স্বামীজী বারবার বলছেন ঃ 'তিতিক্ষা অভ্যাস কর।' তিতিক্ষা অর্থাৎ প্রতিকারের চেষ্টা না করে দেহের কষ্ট সহ্য কর, কষ্টের কথা চিন্তা করাও চলবে না। ক্রমে অভ্যাসের ফলে তুমি এমন একটা অবস্থা লাভ করবে যথা তোমার দেহের যে কোনও কষ্ট আছে, সে কথাটাই ভুলে যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বামীজী ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, এক সাধুর কুষ্ঠ হয়েছিল। দুরারোগ্য ব্যাধি। হাতের আঙুলগুলি পচে যাচ্ছে, খসে পড়ছে, একদিন পথে চলবার সময় ক্ষতস্থান থেকে একটি কীট মাটিতে পড়ে গেলে নির্বিকারচিত্তে তিনি তাকে তুলে আবার ক্ষতস্থানে রেখে দেন। স্বামীজী আরও বললেন, দুঃখ-কষ্ট যদি আসে, মৃত্যু যদি আসে, তাকে ভালবেসে বরণ করে নাও। পরে তিনি বলেছিলেন, যে সমস্ত সভ্যতা বহুদিন ধরে টিকে আছে তাদের মর্মমূলে বইছে বৈরাগ্যের ফল্গুধারা। ত্যাগ ছাড়া কোনও সভ্যতা বাঁচতে পারে না।

বাস্তবিক, এটা আমরা প্রায় সকলেই বুঝি কতকগুলি কর্তব্যকর্ম যেন শৃঙ্খলের মতো আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এবং সেই শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা এক রকম প্রায় দুঃসাধ্য বললেই চলে। গতকালই স্বামীজী শিবের প্রসঙ্গ করতে গিয়ে বললেন ঃ 'আত্মচিন্তাই যেন তোমাদের জীবনের সার হয়।' আর সব বাজে। এমনকি মুক্ত পুরুষের কাছে ধ্যানও একটি বন্ধন বিশেষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভেবে দেখ, শিব, যিনি পরমেশ্বর বা মহেশ্বর, তিনিও বিশ্বের মঙ্গলের জন্য নিত্য ধ্যানে নিমগ্ন। হিন্দুরা সত্যিই বিশ্বাস করে এইসব মহাত্মা বা অবতারাদির ধ্যান এবং কল্যাণকামনা ছাড়া জগৎ কবেই বিনষ্ট হয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্যরা আত্মপ্রকাশ এবং মুক্তিলাভের কোনও সুযোগই পেত না। ধ্যানই জগতের কল্যাণ করার প্রত্যক্ষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

গতকাল কথায় কথায় স্বামীজী হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনাও

দিলেন। সীমাহীন তুষার-তরঙ্গ, তার মধ্যে স্থানে স্থানে বনানীর বিগলিত শ্যামলিমা। কালিদাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, সেখানে 'শিব যেন শব হয়ে পড়ে আছেন, আর তাঁর বুকের ওপর আলুলায়িত প্রকৃতি সহমৃতার ভূমিকায় নিত্য শোভমানা।'

১০। আমেরিকা, ১৮ অক্টোবর, ১৮৯৯ ঃ শুক্রবার দুপুরে খেতে বসে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করতে লাগলেন। বারবার তিনি নিজেকে এই বলে ধিক্কার দিতে লাগলেন—ওহ্, পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন মনটাকে এমনই বিষিয়ে দিয়েছে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সন্দেহবশত শুধু এই প্রশ্নই করেছি, মানুষটি কি সত্যিই 'মহাপুরুষ'? ছ-বছর পর বুঝলাম, না, সাধারণত শুদ্ধসত্ত্ব 'মহাপুরুষ' বলতে আমরা যা বুঝে থাকি, তিনি তা নন। তিনি স্বয়ং পবিত্রতা, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ছিলেন; ঐ তিনের একীভূত, ঘনীভূত মূর্তি ছিলেন।

স্বামীজী বলতে লাগলেন—তিনি এক সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন। হাসিখুশি, ফষ্টিনষ্টি খুব পছন্দ করতেন। কোনও মহাপুরুষ যে অমন হতে পারেন, এটা আমার জানাই ছিল না। আর পাঁচজন যেমন ভাবেন, আমিও তেমনি ভাবতুম, মহাপুরুষ মানেই বুঝি ভয়ানক গম্ভীর হবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বুঝলুম, না—তা নয়।

কিছুক্ষণ পর প্রসঙ্গ অন্য দিকে মোড় নিল। বোধহয় ব্যোয়র (Boer) যুদ্ধের কথা উঠল। অমনি স্বামীজী বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। শূদ্র সমস্যা, যার সমাধান আমেরিকাতেই প্রথম সম্ভব হবে, সেই কথা বলতে গিয়ে স্বামীজীর মুখ অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়ে উঠল—মনে হচ্ছিল, তিনি যেন ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। স্বামীজী বলতে লাগলেন—বিভিন্ন মনুষ্যপ্রজাতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটবে। বললেন—ঢেউ আসছে, প্রচণ্ড পরিবর্তনের ঢেউ যা সব তোলপাড় করে দেবে এবং ঐ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অভিঘাতেই সূচিত হবে ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়। 'এবং সেই পরিবর্তনের সব লক্ষণই স্পষ্ট', এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বামীজী শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন ঃ "দেখ, কতদিন আগেই আমাদের শাস্ত্র বলেছেন 'যখন ঈশ্বরকে ছেড়ে মানুষ টাকার পূজা করবে, যখন জোর যার মুলুক তার, এই দৃষ্টিভঙ্গিই মানুষ গ্রহণ করবে, এবং যখন সবল দুর্বলের ওপর উৎপীড়ন চালাবে—তখনই বুঝবে কলিযুগ জটিল, ভয়াবহ রূপ নিতে চলেছে।"

একদিন আমরা সকলে খেতে বসেছি। এমন সময় মিসেস বি—বলে

উঠলেন ঃ 'স্বামীজী, আমার মনে হয় আপনার কবিতাগুলি কিন্তু নিখুঁত নয়। বরঞ্চ, এক অর্থে ওগুলি আপনার সুনামের হানি করেছে।' স্বামীজী চুপ করে আছেন দেখে তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ 'আমার স্বামীও এই রকম; তাঁর গান-বাজনার সমালোচনা করলে তিনি কখনও কিছু মনে করেন না। তাঁর মনের ভাব এই—হ্যাঁ, তোমরা বলতেই পারো, কারণ আমি যে নিখুঁত নই সে বিষয়ে আমি নিজেই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। কিন্তু এই মানুষই আবার তাঁর রাস্তাঘাট তৈরির জ্ঞান নিয়ে কটাক্ষ করলে ভীষণ দুঃখ পান। এই ব্যাপারে তাঁকে খুশি করা খুব সহজ। একটু প্রশংসা করলেই গলে যান।'

মিসেস বি-র বলা শেষ হলে আমরাও সকলে স্বামীজীকে ক্ষ্যাপাতে লাগলাম। বললাম—আপনি যে কত বড় আচার্য সে বিষয়ে আপনার এতটুকু হুঁশ নেই, কিন্তু ওদিকে ভাল প্রতিকৃতি আঁকতে পারেন বলে মাটিতে আপনার পা পড়ে না!

সব শুনে স্বামীজী হঠাৎ বললেন ঃ "দেখ, দুটি জিনিস আছে। একটি হচ্ছে ভালবাসা, আর দ্বিতীয়টি একাত্মতা। একাত্মতা ভালবাসার চাইতেও বড়। ধর্মের প্রতি আমার আলাদা ভালবাসা নেই, কারণ ধর্ম আর আমি অভিন্ন, এক সত্তা হয়ে গেছি। ধর্মই আমার জীবন। যে যা নিয়ে থাকে, সেটিকে কি সে ভালবাসে? বাসে না, যদিও সে বিষয়ে তার অধিকার এবং যোগ্যতা প্রশ্নাতীত। যতক্ষণ আমরা কোনওকিছুর সঙ্গে একাত্ম না হচ্ছি ততক্ষণই সেটির প্রতি আমাদের ভালবাসা, যতকিছু টান। আপনার স্বামী দিনরাত গান-বাজনা নিয়ে থাকেন বলেই সেটিকে তিনি ভালবাসেন না। কিন্তু এনজিনিয়ারিং বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অপেক্ষাকৃত কম, তাই ঐ বিষয়ে তাঁর যত অনুরাগ। 'ভক্তি' আর 'জ্ঞান'-এর মধ্যে ঠিক এই তফাৎ। এবং ঠিক এই কারণেই ভক্তির চেয়ে জ্ঞান বড়।"

সারা সকাল ধরে স্বামীজীর মুখে আজ চেঙ্গিস্ খান আর বিধ্বংসী মোগল আক্রমণের বৃত্তান্ত। কথা শুরু হয়েছিল আইন নিয়ে। স্বামীজী বলছিলেন, আইন সম্বন্ধে অন্যান্য জাতির যে ধারণা তার সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অন্যান্যরা আইন বলতে বোঝেন কতকগুলি শুকনো নিয়মকানুন। কিন্তু ভারতের তা নয়। এ ব্যাপারে হিন্দুদের সনাতন বোধ-বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় বেদে।

রবিবার সন্ধ্যায় এক অতিথির সঙ্গে আমরা তিনজন তাঁর বাড়ি গেলাম। সেখানে গিয়ে আমরা শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) নারীজাতি সম্পর্কে

কি লিখেছেন তা বেশ উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে পড়লাম। যখন ফিরছি তখন দেখি চারিদিক জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে। অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের কারও মুখে কথা নেই; চুপচাপ সামনের রাস্তা ধরে হাঁটছি। কারণ আমাদের মনে হয়েছিল কথা বললেই সমস্ত পরিবেশটাই মাটি হবে। এ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'ভারতের জঙ্গলে রাতে যখন কোনও বাঘ শিকার ধরতে বেরোয়, তখন যদি ভুলেও সে একটু শব্দ করে ফেলে, তখন সে নিজেকেও ক্ষমা করে না। রাগে, দুঃখে তখন সে নিজের থাবা বা ল্যাজ নিজেই কামড়ে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে।' এই বলে তিনি মন্তব্য করলেন সৌন্দর্যকে কিভাবে প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করে অন্তরে তার ছাপটিকে চিরস্থায়ী করে রাখতে হয় পাশ্চাত্যের মেয়েদের তা শেখা উচিত।

একদিন বিকেলে চুপচাপ বসে আছি। চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে মনে হচ্ছিল বুঝি বা আমরা ভারতবর্ষেরই কোনও এক জায়গায় আছি। কেন জানিনা আমার কেবলি মনে হতে থাকল, যাঁরা বেদ এবং অদ্বৈত-বেদান্ত অনুরাগী, তাঁদের তুলনায় আমি কত নগণ্য! কিন্তু স্বামীজীর কৃপায় অন্য ভাবের বর্ষণে আমার ঐ হীনমন্যতার ভাবটি কেটে গেল।

তখনকার ঐ আলোচনার সবটুকুই এখানে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আলোচনা শুরু হলো রামপ্রসাদের একটি গান দিয়ে। গানটির অংশবিশেষ এই ঃ

'যে দেশে রজনী নাই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥...'

'বীণাযন্ত্রে আছে বাঁধা যে সঙ্গীত লহরী
সেই সুরে আমি শিখেছি গান
যে গান সদা বাজে মোর কানে
একাগ্র মনই হলো তার
একাগ্র মনই হলো যে মোর গুরু'

আর একটি গান ঃ

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥'

পরের গান ঃ

‘ভুবন ভুলাইলি মা ভব-মোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনী॥
শরীর শারীর যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম-সঞ্চারিণী॥’

রামকৃষ্ণের অদ্ভুত দর্শন হতো। তিনি দেখতে পেতেন একটি লম্বা সাদা সুতো তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে। সেই সুতোর শেষ প্রান্তে জ্যোতিঃপুঞ্জ। আর সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ ক্রমশ বিকশিত হলে তিনি দেখতেন বীণা হাতে তাঁর জগজ্জননী ঐ জ্যোতির কেন্দ্রে বিরাজিতা। এরপর সেই মাতৃমূর্তি বীণাবাদন শুরু করতেন আর রামকৃষ্ণ দেখতেন সেই সুর থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে জীব, জগৎ। কিছুক্ষণ পর মা বীণা বাদন বন্ধ করলে জীব-জগতাদি সবকিছুই অদৃশ্য হতো। জ্যোতির প্রভা যেমন যেমন স্তিমিত হয়ে আসত, সুতোটিও তেমন তেমন ছোট হতে থাকতো। শেষে সবকিছুই তাঁর ভিতর মিলিয়ে যেত।

রামকৃষ্ণের এই অভূতপূর্ব দর্শনের কথা আমাদের শোনাতে গিয়ে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ “আহা, পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে আজ যে আমার জীবনের কত বিচিত্র ঘটনা, বিচিত্রতম দৃশ্যাবলী মানসপটে ভেসে উঠছে তার ইয়ত্তা নেই! চতুর্দিকে জমাট নীরবতা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারের বুক চিরে শেয়ালের ডাক। আর আমরা দক্ষিণেশ্বরে সেই বিশাল গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন। রাতের পর রাত, কখনও কখনও সারারাতই আমরা সেখানে কাটিয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে কত কি-যে বলতেন সেই সময়। তখন আমার কতই বা বয়েস! জানবে, স্বয়ং শিবই গুরু হয়ে আসেন। তাই গুরুকে শিব জ্ঞান করতে হয়। শিব-জ্ঞানে তাঁকে পূজা করতে হয়, কারণ গাছের তলায় বসে গুরু শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিয়ে তার অজ্ঞানতা সমূলে বিনষ্ট করেন। আমাদের সব কর্মই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করা উচিত; নাহলে কর্মফলের বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়বো। হিন্দুরা তাই যখন তৃষ্ণার্তকে একটু জল দেন, তখনও মনে মনে এই ভাব আরোপ করেন, ‘এই জল জগৎকে’, অথবা ‘জগজ্জননী, এই জল তোমাকেই নিবেদন করলাম।’ আমাদের কোনও রকম ফল নেবার যো নেই। সে অনায়াসে নিতে পারেন একজন। তিনি অক্ষয়, অমর, অব্যয়, অবিকারী, শাশ্বত পরমাত্মা। তিনি শিব—যিনি জগতের সমস্ত বিষ নিঃশেষে, নিঃসঙ্কোচে পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। যা কিছু করছ সব সেই পরম শিবের পায়ে সমর্পণ করে দাও।’

এরপর বৈরাগ্য প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন ঃ 'যৌবনই ত্যাগের প্রকৃষ্ট সময়। বৃদ্ধ বয়সে আর কি ত্যাগ করবে? যাঁদের শেষ বয়সে বৈরাগ্য আসে, তাঁরা বড়জোর নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে পারেন; কিন্তু তাঁরা গুরু বা আচার্য হতে পারেন না। অন্যকে কৃপাও করতে পারেন না। কিন্তু যাঁদের অল্পবয়সেই বৈরাগ্য আসে, তাঁরা নিজের লাভালাভের কথা না ভেবে বহু মানুষকে দুরতিক্রম্য সংসার-সাগরের পারে নিয়ে যেতে পারেন।'

এরপর স্কুলের কথা উঠল। স্বামীজী বললেন ঃ 'তোমার প্রাণ যা চায় সেই রকম শিক্ষাই তোমার ছাত্রীদের দাও, মার্গট, শুধু সামান্য এ. বি. সি বা অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামিও না। এই ধরনের বিদ্যায় কিছু হয় না। মেয়েদের যত পার রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, শিব ও কালীর কথা বল। আর এই পাশ্চাত্যের মানুষকেও ঠকিয়ো না। ওদের তুমি খুলেই বল তুমি যে অর্থ সাহায্য চাচ্ছ তা কতকগুলো মানুষকে এ. বি. সি. শেখাবার জন্য নয়। বরং তুমি জোর গলায় বল—তোমার লক্ষ্য ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিকতা এবং সেই হেতুই তুমি তাদের কাছ থেকে সাহায্য দাবি করছ। হ্যাঁ, দাবিই; ভিক্ষা নয়। কখনও ভিক্ষা করবে না। মনে রেখ, তুমি মায়ের দাসী। মা যদি তোমাকে কিছু না-ও দেন তো জানবে তুমি ধন্য—মা তোমাকে মুক্তি দিলেন।'

১১। আমেরিকা, ২৭ অক্টোবর, ১৮৯৯ ঃ গতকাল আমরা তিনজনে একসঙ্গে আছি, এমন সময় স্বামীজী এসে বললেন, 'এস, একটু গল্প করা যাক।' এই বলে তিনি রামায়ণী কথা শুরু করলেন।

তোমাকে আমি প্রসঙ্গক্রমে একটা মজার কথা বলে রাখি—যখন সদানন্দ রামায়ণের প্রসঙ্গ করেন, তখন মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়, হনুমানই রামায়ণের প্রকৃত বীরচরিত্র। কিন্তু যখন স্বামীজীর মুখে শুনি, তখন মনে হয় রাবণই যেন মুখ্য চরিত্র।

তাঁর অননুকরণীয় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গতকাল তিনি আমাদের সেই রামায়ণের গল্পই শোনালেন। বললেন ঃ "রামচন্দ্রের চোখদুটি ছিল নীলপদ্মের মতো। তাই তাঁকে 'নীলোৎপল-লোচন' বলা হতো। যাই হোক, তিনি আশা করেছিলেন জগজ্জননী আদ্যাশক্তি সীতা-উদ্ধার কার্যে তাঁকে সাহায্য করবেন।[১] কিন্তু রাবণও যে ওদিকে মায়ের সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। তাই মায়ের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে এসে রামচন্দ্র যখন দেখলেন লঙ্কেশ্বর জগদীশ্বরীর

১. কৃত্তিবাসের রামায়ণে এই গল্প আছে।

স্নেহচ্ছায়ায় বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে একটা ভয়ংকর কিছু করতে হবে; নইলে মায়ের কৃপাদৃষ্টি তাঁর ওপর পড়বে না। তিনি তখন পরমেশ্বরীর কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন—তাঁর কৃপালাভের জন্য তিনি মায়ের শ্রীমূর্তিকে একশো-আটটি নীলপদ্ম দিয়ে পূজা করবেন। হনুমান নীলপদ্ম সংগ্রহ করে আনলে রামচন্দ্র 'মহাশক্তির আবাহন' শুরু করলেন। (তখন শরৎকাল। এমনিতে তাঁর পূজার সময় ছিল বসন্তকাল। রামচন্দ্রের মাতৃ-অর্চনার স্মরণে তারপর থেকে সেপ্টেম্বর মাসেই মহামায়ার পূজা চলে আসছে।) পূজায় বসে রামচন্দ্র একটি একটি করে নীলপদ্ম মায়ের পাদপদ্মে অর্পণ করতে লাগলেন। ক্রমে যখন একশো-সাতটি পদ্ম-অর্ঘ্য দেওয়া হয়ে গেল, রামচন্দ্র সবিস্ময়ে দেখলেন একটি পদ্ম কম পড়েছে। (মা-ই লীলাচ্ছলে একটি সরিয়ে রেখেছিলেন।) কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রামচন্দ্র এই সঙ্কটেও অটল রইলেন। পূজা সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে তিনি ছুরি দিয়ে নিজের একটি আঁখিপদ্ম উপড়ে ফেলতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তা আর তাঁকে শেষপর্যন্ত করতে হলো না। মা তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তি-ভাব দেখেই প্রসন্না হলেন। পরম বীরকে তিনি বিজয়ের আশীর্বাদ দিলেন। স্বামীজী বললেন, 'অবশ্য শেষপর্যন্ত রামচন্দ্র যে জয়ী হলেন, সে ঠিক তাঁর অস্ত্রের জোরে নয়, তিনি জয়লাভ করলেন রাবণের ভাই বিভীষণের তঞ্চকতার ফলেই। অবশ্য একদিক থেকে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণেরও প্রশংসা করতে হয়। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি আশ্রয় পেলেন রামচন্দ্রের রাজভবনে।' এমন সময় রাবণমহিষী (মন্দোদরী) যখন আপন স্বামী ও পুত্রের হন্তারক রঘুবীরের মুখচন্দ্র দেখবার অভিলাষে তাঁর রাজসভায় আগমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, তখন সপারিষদ স্বয়ং রামচন্দ্র এবং বিভীষণ শোকসন্তপ্তা এই নারীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, কোথায় বহুমূল্য বস্ত্রশোভিতা, সালংকারা রানি? তার পরিবর্তে যিনি রাজসভায় প্রবেশ করলেন, তিনি সাধারণ বস্ত্রে সজ্জিতা সামান্যদর্শনা এক হিন্দু বিধবা! বিস্মিত রামচন্দ্র বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কে এই রমণী?' বিভীষণ উত্তরে বললেন, 'হে রাজন! দেখুন, দেখুন—ইনিই সেই তেজস্বিনী সিংহ-সঙ্গিনী যাঁর বল্লভ এবং শাবকেরা আপনারই হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আপনাকে শুধু একটিবার দর্শনের জন্যই ইনি আজ এখানে উপস্থিত।' ”

স্বামীজী নারীদের কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন! নারীত্বের কি মহিমময় আদর্শ তিনি আজ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন! আমি নিশ্চিত—শেকস্পীয়র তো নয়ই, এমন কি এ্যাস্কিলাস-এর আন্তিগোনে এবং সফোক্লেস-এর অ্যালকেসটিস

চরিত্রের মধ্যেও এমন উত্তুঙ্গ আদর্শ বা ভাবনা অভিব্যক্ত হয়নি। স্বামীজী আমার কাছে যেসব কথা বলেছেন, তা যখন বসে বসে ভাবি, তখন বুঝতে পারি বিশ্বের, বিশেষত ভারতের নারীজাতির প্রতি তাঁর কি বিপুল বিশ্বাস, কি গভীর প্রত্যাশা! সে আদর্শের শিখরে কেউ উঠতে পারল কি পারল না, সেটা অন্য কথা। কিন্তু একটি আদর্শ যে তিনি আমাদের সামনে দিয়ে গেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন রাতে স্বামীজী খুব ভাবে ছিলেন। তিনি আমাদের কাছে ঋষিকেশে সাধুদের তপস্যার কথা বলতে লাগলেন, বললেন ঃ ওখানকার সন্ন্যাসীরা সব ছোট ছোট কুঠিয়া বেঁধে সাধনভজন করেন। যাঁর কুঠিয়া তিনি নিজেই বেঁধে নেন। সন্ধ্যে হলে কাছাকাছি এক জায়গায় ধুনি জ্বেলে সন্ন্যাসীরা যে-যার আসনে আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়েন। শুরু হয় উপনিষদ্ আলোচনা। উপনিষদ্ কেন? 'উপনিষদ্ এই জন্যে যে সাধারণত সন্ন্যাসী হবার আগেই সাধক সত্য কি তা জেনে যান, ফলে বৌদ্ধিক স্তরে তিনি নির্দ্বন্দ্ব, প্রশান্ত। যা বাকি থাকে তা হলো সেই তত্ত্বের উপলব্ধি। অতএব ঐ অবস্থায় যুক্তি-তর্কের কচ্‌কচি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। ঋষিকেশের বুকে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে প্রজ্বলিত আগুনের পাশে বসে তখন একটু উপনিষদ্ আস্বাদন করতেই তাঁদের ভাল লাগে। একটু আলোচনা হতে না হতেই সব কথা থেমে যায়। বিরাজ করে অপার্থিব নৈঃশব্দ্য। সব সাধুকেই তখন দেখা যায়, নিজের নিজের আসনে আত্মগতভাবে, টানটান হয়ে বসে আছেন তাঁরা। কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকবার পর তাঁরা চুপচাপ আপন আপন কুঠিয়ায় ফিরে যান।'

আরেকবার তিনি বলেছিলেন ঃ 'হিন্দুধর্মের একটা বড় দোষ অষ্টপ্রহর ত্যাগের কথা বলা—ত্যাগ ছাড়া যেন কারও কোনওভাবেই মুক্তির আশা নেই! এসব শুনে গৃহীরা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন, নিজেদের অপদার্থ ভাবেন। ভাবেন, কর্মেই তাঁদের অধিকার, ত্যাগ নয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ত্যাগই মূলমন্ত্র। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে ত্যাগের বিধান মেনে চলছে। ত্যাগের বিপরীত রাস্তায় কেউ চলেছেন এ কথা মনে করাটাই এক মস্ত বিভ্রম। বস্তুত আমরা সকলেই আমাদের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তিকে অবারিত করার জন্যই প্রাণপণ সংগ্রাম করে যাচ্ছি। এই প্রচেষ্টার একটাই অর্থ দাঁড়ায়—যত শীঘ্র সম্ভব মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। নাদুস-নুদুস যে ইংরেজটি তামাম দুনিয়ার মালিক হতে চায়, সে মরবার জন্য আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি সংগ্রাম করছে। আত্মরক্ষার চেষ্টাও এক ধরনের ত্যাগ। বাঁচার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ভালবাসার একটা উপায় বৈকি।'

স্বামীজী কখনও কখনও শিখদের, বিশেষ করে দশজন শিখ ধর্মগুরুর কথা আমাদের বলতেন। একদিন তিনি 'গ্রন্থ সাহেব' থেকে গুরু নানকের একটি কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিলেন। কাহিনীটি এই ঃ মক্কায় গিয়ে গুরু নানক একদিন কাবা মসজিদের দিকে পা করে শুয়েছিলেন। সেই দেখে স্থানীয় মুসলমানরা রেগে লাল। তারা ভাবলো, এই মানুষটির এত স্পর্ধা যে যেদিকে ঈশ্বর আছেন সেদিকেই পা রেখে শুয়েছে! একে ঘুম থেকে তুলে উত্তম-মধ্যম দিতে হবে, দরকার হলে প্রাণেও মারবো। তারা নানকজীর কাছে এসে হম্বিতম্বি করতেই তিনি শান্তভাবে চোখ মেলে তাকালেন এবং সহজভাবে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বাপু হে, আমাকে তোমরা একটু দেখিয়ে দাও দেখি কোন্ দিকে ভগবান নেই। তাহলে আমার একটু সুবিধা হয়, আমি পা-দুটো সেইদিকে ঘুরিয়ে রাখতে পারি।' ব্যস্, ঐ এক কথাতেই লোকগুলি ঠাণ্ডা!

১২। আমেরিকা, ৪ নভেম্বর, ১৮৯৯ ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমরা দুজন মন খুলে বেশ কথাবার্তা বলছি, এমন সময় স্বামীজী এলেন। বলা বাহুল্য, তিনিও আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন। স্বামীজীর মুখে এই প্রথম দলত্যাগ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং অসুখ-বিসুখের কথা শুনলাম। অনেক কথার মধ্যে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি এখনও সেই সন্ন্যাসীই আছি যার ফলে হার-জিৎ, লাভ-ক্ষতি এসব কোন কিছুর তোয়াক্কাই করি না। কিন্তু তবুও দলত্যাগ আমার কাছে বেয়াদবি মনে হয়। বিশ্বাসঘাতকতা মনে খুব যন্ত্রণাদায়ক।'

ব্যোয়র (Boer) যুদ্ধের ঘটনাবলী আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে। আশ্চর্য! একটা জাতির ভাগ্য একজন মানুষের কর্মকে এতখানি প্রভাবিত করতে পারে! জেনারেল হোয়াইট-এর মতো একজন মানুষের কিনা এই পরিণতি হলো! হিন্দুরা বেশ বলে—ইংল্যাণ্ড নয় ভিকটোরিয়ারই জয়। ভিকটোরিয়াই ভারত জয় করেছেন। আজ ব্যোয়র (Boer) যুদ্ধেও দেখছি সেই অদৃশ্য শক্তির খেলাই চলছে। ফলে যুদ্ধের ফলাফল কি দাঁড়াবে সে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা আজ কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসংখ্যা বা অন্য কোনও প্রত্যক্ষ কারণ এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারবে না, সেটি নির্ভর করছে জাতির ভাগ্যাকাশে যে নতুন তারকার উদয় হয়েছে তার খেয়ালখুশির ওপর। কাল একটা মস্ত জিনিস। কালের দাবায় তাবড় তাবড় লোকও অসহায় অন্ধ একটি বোড়ে গুটি মাত্র। তাই না? যিনি দাবাড়ু, চাল দিচ্ছেন, তিনি কিন্তু আড়ালে। কেবল ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা মহাপুরুষদের দৃষ্টিতেই কালের গতিপ্রকৃতির কিছুটা কখনও

কখনও ধরা পড়ে। কালের এই নির্মম, নিষ্ঠুর খেলায় যারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, একদিক দিয়ে তাদের দশা ভালই বলবো; কারণ, আর যাই হোক, তাদের বোকা বনতে হলো না।

কৃষ্ণ ও রুক্মিণী প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন—আমাদের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা সবসময় কাজ করে। একটি প্রেয়-র দিকে টানে, অপরটি শ্রেয়-র দিকে। প্রায়শই আমরা বাসনার দিকেই ঝুঁকি। কিন্তু আমাদের উচিত, কিসে আমাদের মঙ্গল একমাত্র সেইটিই বিচার করে চলা। সেইজন্য যিনি নিরাসক্ত, অসঙ্গ, সর্বদাই যিনি দ্রষ্টার ভূমিকায় নিজেকে স্থির রাখেন, তাঁকেই আমরা প্রাজ্ঞ বলি। কিন্তু মানুষ কি করে? মানুষ সহজেই সংসারের নানা খেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে; অথচ অন্তরের সায় সে যে সবসময় পায়, তা নয়। আমাদের সবটাকেই একটা খেলা মনে করা উচিত, সবটাই অভিনয়। মনে রাখা উচিত, সর্বক্ষণই আমরা কোনও-না কোনও ভূমিকায় অভিনয় করছি, কিন্তু এর কোনও পারমার্থিক মূল্য নেই।

উমা এবং শিবের কথাও স্বামীজী বললেন। বললেন, 'এঁদের কাহিনীর কাছে সব পুরাণই হার মেনেছে।' শিব সম্পর্কে বললেন ঃ 'গুরু নবীন, কিন্তু শিষ্য প্রবীণ।' কারণ, ভারতের রীতিই এই। যিনি অল্প বয়সেই নিজের জীবন (পরম-পদে) উৎসর্গ করতে পারেন, তিনিই ঠিক ঠিক গুরু হতে পারেন; আর যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়, সেই বয়সে একটা পথই খোলা থাকে। সেটি হলো ধর্ম শিক্ষা করা।

এর পর স্বামীজী বললেন—তোমাদের যত কিছু কর্ম, সব শিবের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে দাও। শিবই জগতের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। উমার সেই কথা একবার মনে করনা যেখানে তিনি এক ব্রাহ্মণকে কিছুটা অনুযোগের সুরে বলছেন, 'জগদীশ্বর যিনি, তাঁর কি শ্মশানে থাকা শোভা পায়?'

দুপুরে খাবার সময় হাসতে হাসতে স্বামীজীকে তোমার চিঠির কথা বললাম। ঐ যে, তুমি লিখেছিলে না—'কিছু চাই না, কাউকে চাই না।' স্বামীজী সে কথার উত্তরে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'ঠিকই লিখেছে। ও সত্যিই কিছু চায় না। এটা মানুষের শেষের অবস্থা। যে ভিখারি, সে হাত পাতবেই এবং প্রত্যাখ্যানের দুঃখও তাকে সইতে হবে; কিন্তু যার কোনও চাহিদা এবং প্রত্যাশা নেই, তাকে কে প্রত্যাখ্যান করবে?' স্বামীজী বললেন ঃ সারা জীবন নাম-যশ আর বিষয়সুখকে ঘৃণা করেছি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারছি ঐ দুটি জিনিসই কতটা অসার।

১৩। শিকাগো, ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৯ ঃ একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''আচ্ছা, এটা কি করে হয়, স্বামীজীর মতো এতবড় একজন মহান পুরুষ, আজ বলছেন—'আধ্যাত্মিকতাই ভারতের একমাত্র প্রয়োজন; বৈষয়িক সমৃদ্ধি চেয়ে আমি ভুল করেছিলাম', আবার আগামী কালই হয়তো তিনি বলে বসবেন—'ভারতের বৈষয়িক উন্নতি একান্ত প্রয়োজন'?''

আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলাম ঃ 'আবার লক্ষ্য করলেই দেখবেন, দুটি ক্ষেত্রেই কিন্তু স্বামীজী অবিরত এবং সমানভাবে সক্রিয়।' তারপর এও বললাম—দেখুন, এইসব আপাতবিরোধ আমার খুবই উপকার করেছে। কর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর কথাগুলিই চিন্তা করুন না কেন। তিনি তো কর্ম করতেই বলেছেন—কর্ম করবে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে। ...স্বাধীনতা ছাড়া শান্তির কথা ভাবাই যায় না—ওহ্, কথাটা যে কতদূর সত্য, তা আর কি বলবো। আমরা যে ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাই—এটা কি খুব আশ্চর্যের নয়? আমার কথা যদি বল, কাটছাঁট না করে আমি সমস্ত বেদান্তকেই আত্মসাৎ করতে চাই, কারণ এর দ্বারা সামগ্রিক সেবার মনোভাবটি পুষ্ট হয়। আমার বিশ্বাস একটি মাত্র দেহের মধ্যে বদ্ধ থেকে, একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে সব সমস্যার সমাধান খোঁজার চেয়ে বেদান্তের সীমাহীন ব্যাপ্তি, এর সামগ্রিকতা সর্বাংশে শ্রেয়। বাস্তবিক, আমরা কি সকলে একই সূত্রে গ্রথিত নই? আমাদের কি একটাই সত্তা নয়? তা যদি হয়, তোমার যে পথ—সে তো আমারও। তেমনই নিবেদিতার যে-পথ, সেও কি তোমার নয়? হায়! মানুষ যদি একবার এই চরম সত্যটুকু উপলব্ধি করতো!

অ্যান আর্বর

১৩ জানুয়ারি, ১৯০০

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীচরণকমলেষু,[১]

জন্মদিন উপলক্ষ্যে লেখা আপনার আশীর্বাদী কবিতাটি গতকাল রাতে পেয়েছি। এর উত্তরে আর আমি কি লিখব, বলুন? কিই-বা আমি লিখতে পারি! যা লিখব, তাই অতি সাধারণ শোনাবে। শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার সুন্দর ইচ্ছাটি যদি বাস্তবে ঘটেও তা আমার পক্ষে হৃদয়বিদারক হবে।

এ ব্যাপারে আমি রামপ্রসাদের সঙ্গে একমত। 'আমি চিনি হতে চাই না,

---

১ নিবেদিতার জন্মদিনে আশীর্বাদ জানিয়ে স্বামীজী একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তার উত্তরে নিবেদিতা এই চিঠিটি লেখেন।

চিনি খেতে ভালবাসি!' এমনকি আমি কোনও ভাবে ভগবানকেও জানতে চাই না। অবশ্য এ ধরনের চিন্তাও একান্তই হাস্যকর—কারণ এটা কখনই হতে পারে না। আমি চাই না বলে পরম পিতা তাঁর থেকে আমাকে দূরে দূরে রাখবেন।

আমি জানি, ঈশ্বর উপলব্ধি করলে গুরুকে হারাতে হবে বা তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন—এ ভয় নিতান্তই অমূলক। কিন্তু উপলব্ধির সেই চরম মুহূর্তেও শান্তি পাব না যদি নিশ্চিতভাবে আমি একথা না বুঝি আমার গুরু যে আনন্দের অধিকারী হয়েছেন তা মহত্তর।

নানা রকম আজগুবি কথা বলার চেষ্টা করছি; যা ভাবা অনুচিত, সেইসবই ভেবে চলেছি। কিন্তু আমি কি ব্যক্ত করতে চাইছি তা আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন।

এক সময় ভাবতাম ভারতের মেয়েদের জন্য আমি নিজে কিছু করবো। মাথার ভিতর অস্ফুট, বিস্তর বড় বড় পরিকল্পনা ঘুরপাক খেত। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐসব চিন্তার উচ্চশিখর থেকে নিচে নেমে এসেছি। এখন আমি যা কিছু করি এবং করতে চাই, সে শুধু আমার পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্যই।

ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছাও যেন প্রতিদানে কিছু চাওয়া। প্রভু আমার, আমি শুধু সেবার জন্যই সেবা করে যেতে চাই। কেবলমাত্র এই জীবনেই নয়—অনন্তকাল ধরে। অনন্তকাল।

আরেকটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত—এবং যথা সময়ে যেন আমার এই চেতনাটি বজায় থাকে—যে সেদিনের আর দেরি নেই যখন আমার চাইতেও সুযোগ্য হাজার হাজার সন্তান, আমার চেয়েও অনেক, অনেক ভালভাবে আপনার সেবা করবেন, আপনার পায়ে তাঁদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সব উজাড় করে দেবেন।

আপনার মেয়ে,
মার্গট

১৪। ডেট্রয়েট, ১৮ জানুয়ারি, ১৯০০ ঃ বর্তমানে স্বামীজীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভালোই। অন্তত আফসোস করার মতো এখনও কিছু ঘটেনি। আমি অবশ্য কাউকে এসব কথা বলিনি, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু যাই হোক, তত্ত্ব এক জিনিস, আর অভিজ্ঞতা আর এক। এ দুয়ের বিরোধ লেগেই আছে।

এ যাত্রায় যেন পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছি। অনুভব করছি, প্রতি

পদক্ষেপে মা-ই আমাকে চালাচ্ছেন। অবশ্য যখন পিছনের দিকে তাকাই তখন ভাবি—এ আর নতুন কথা কি! বরাবর তো তাই হয়ে এসেছে।

যখন স্বাধীন ছিলাম, তখন সবকিছু ভালমতোই চলেছে। তবে এটা মনে হয়েছে, আমার ব্যক্তিত্ব সকলের কাছে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য হওয়া দরকার যাতে প্রীতির সঙ্গে সহজেই তাঁরা আমাকে কাছে টেনে নিতে পারেন। সেটুকু সম্ভব হওয়ায় দেখছি, আমিও সহজেই, স্বামীজী আমাদের যা বলেন, তা-ই তাঁদের কাছে বলে যাই। আমি যে সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকরে কিছু করি, তা নয়। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছি স্বামীজী যেন ক্রমশই আমার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। আমি যেন তাঁর হাতের বাঁশিটি। মনে হয়, আমি যেন বসে বসে দিনরাত তাঁরই কথা শুনছি। মনের এই বিশেষ অবস্থার কথা যখন প্রথম টের পেলাম, তখন থেকেই মুখে কুলুপ এঁটেছি। কারণ, ভয় হলো লোকে হয়তো বলবে—স্বামীজীর কথাগুলি চুরি করে আমি নিজের মুখে বসাচ্ছি। কিন্তু এখন দেখছি, না, ভুল তো কিছু করিনি। ছেলেমেয়ে আনন্দের সঙ্গে বাপের কথা বলবে না তো কে বলবে? তাই এখন আর কে কি ভাববে ও-নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না।

১৫। শিকাগো, ২৬ জানুয়ারি, ১৯০০ ঃ যতই দিন যাচ্ছে, দেখছি মা-কালীর ইচ্ছা আর আমাদের ইচ্ছার মধ্যে কত তফাৎ! যদি অবশ্য কথাটা এ-ভাবে বলা যায়, তবেই। মা একজনকে যখন সরিয়ে দেন, তখন ভয় হয়—বুঝি সব গেল। সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, তখন মনে হয় পালিয়ে বাঁচি। কিন্তু মায়ের এমনি লীলা বটে। দেখা যায়, ঠিক কেউ না কেউ সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন।

তোমাকে কি আমি—আগে যে কেন্দ্রে কাজ করতাম—তার কথা কখনও বলেছি? ঠিক মনে পড়ছে না। যাই হোক, সেখানে গিয়ে প্রথম একটি সপ্তাহ আমাকে যা বেগ পেতে হয়েছিল, তা কহতব্য নয়। আর সেখানে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল সে-ই যে পরে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। এখন, এখানে এসেও দেখছি হাল ঠিক তা-ই। সব থেকে ভালো যে দু-তিনজন কর্মী, তাদের নিয়েই যত অপ্রত্যাশিত ঝঞ্ঝাট। আমি এটাও দেখছি পর-বৈরাগ্য আর মন্দ-বৈরাগ্যের মধ্যে কত তফাৎ। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, আমাদের এক বন্ধু এসব কিছু যেন বুঝেও বোঝেন না। স্বামীজীর ব্যাপারে তাঁর অজ্ঞতা দেখে আমি না হেসে থাকতে পারি না। তিনি বোঝেন না, জ্বলন্ত বৈরাগ্যের অধিকারী বলেই

সবার সঙ্গে স্বামীজী সহজে সহজভাবে মিশতে পারেন, নির্লিপ্তভাবে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন, আবার প্রয়োজনবোধে নিজেকে গুটিয়েও নিতে পারেন; পারেন তাঁর সম্পর্কে লোকের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। একটা শহরে বহু মানুষের ভালবাসা ও আদর-আপ্যায়ন পাবার পর অন্য আর একটা শহরে গিয়ে যখন সেখানকার লোকজনের কৃত্রিম ব্যবহার দেখে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল, সেদিনই স্বামীজীর মহত্ত্ব মর্মে মর্মে অনুভব করলাম! আবার, যাদের কাছ থেকে পারলে আমি তখনই পালিয়ে যেতাম, সেই লোকগুলিই যখন মায়ের কাজের যন্ত্র হিসাবে প্রতিভাত হলো—তখন বুঝলাম স্বামীজীর কাজের ধারাটি কতটাই নির্ভুল। আর তাঁর দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার কথা যদি বল, তাহলে বলবো সেটিও অসামান্য ও অভিনব। সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় ভাগ্যজয়ী অপূর্ব পরিকল্পনা রচনার কাজ নিঃসন্দেহে লোভনীয়। কার না ভাল লাগে এমন একটি ভূমিকা? স্বামীজী কিন্তু দ্রষ্টার নীরব প্রতীক্ষায় থাকেন। দেখে যান আর স্রোতের তরঙ্গে ভাসতে থাকেন। বলতে পারো, আমি সবে তাঁর মহত্ত্ব একটু একটু বুঝতে শুরু করেছি।

১৬। নিউইয়র্ক, ৪ জুন, ১৯০০ ঃ আমার ধাত তুমি তো ভালোই জানো। যতক্ষণ না মুখে বলছি বা লিখে রাখছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। এক সময় না এক সময় ঠিক মনে হবে—আচ্ছা ব্যাপারটা সত্যি তো? সত্য সত্যই ঘটেছিল তো? তাই লিখে রাখছি।

এই সবে স্বামীজীর বক্তৃতা হলো। আমি একটু আগেই গিয়েছিলাম। দ্বিতীয় সারির বাঁদিকের প্রথম আসনটিতেই বসলাম। লণ্ডনেও বরাবর আমি এই রকম জায়গায় বসতাম। অবশ্য আজ আমি কোনওকিছু না ভেবেই বসেছি।

তারপর আমরা সকলেই যখন তাঁর আসার আশায় পথ চেয়ে বসে আছি, এমন সময় আমার মধ্যে প্রচণ্ড এক উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করলাম, আমার ভিতরটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। কারণ, সহজ মনে হলেও বুঝেছিলাম আজ আমার সামনে এক চরম পরীক্ষা। শেষ যেবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কত কি ঘটল, কত কি এল গেল! কিন্তু আমার কি হলো? কোথায় হারিয়ে গেল আমার জীবন? স্বামীজীর পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করবো বলে অতীত জীবনকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু পোড়া মনের সংশয় তবু ঘোচে না। কেবলই মনে হয়—ভুল পথে চলছি

না তো? কোনও মোহে পড়িনি তো? নাকি এ আমার যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, স্বাধীন সিদ্ধান্তেরই জয়? স্বামীজীর প্রতীক্ষা করছি আর মনে মনে একটা দ্বন্দ্বের ঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। আবার মনকে শান্ত করছি এই বলে—দাঁড়াও না বাপু, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো সব সন্দেহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি এলেন। বক্তৃতামঞ্চে তাঁর আবির্ভাব এবং ভাষণের প্রারম্ভে আত্মস্থ হয়ে তিনি কিছুক্ষণ যেভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে সে যেন শ্রেষ্ঠ এক প্রার্থনা-সঙ্গীত। তাঁর উপস্থিতিতেই ভাবের একটি নিটোল পূজা যেন নিঃশব্দে সারা হয়ে গেল।

অবশেষে তিনি বলতে শুরু করলেন। মুখে কৌতুকের ছটা। প্রথমে জানতে চাইলেন, কি বিষয়ে তাঁকে বলতে হবে। একজন বললেন—বেদান্তদর্শন নিয়েই বলুন না। স্বামীজী বললেন—তবে তাই হোক। এই বলে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন।

স্বামীজী বললেন—একত্ব, সর্বাত্মক ঐক্য, এইটিই আসল কথা। ...'সব কিছুর মূলেই এই ঐক্য বিরাজ করছে। আমরা বৈচিত্র্য দেখি; আমাদের চোখে তাই সোনা, ভালবাসা, দুঃখ, জগৎ—সব আলাদা। কিন্তু তা নয়। স্বরূপত সবই ঈশ্বর। ... আমরা বহু দেখি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একটিই সত্তা।... সেই সত্তার প্রকাশের তারতম্যের জন্যই নামের এত বিভিন্নতা। আজ যা স্থূল বা জড় অবস্থায় আছে, ভবিষ্যতে সেটিই সূক্ষ্ম চৈতন্য বলে প্রতিভাত হবে। আজ যে কীট, আগামী দিনে সেই ভগবান। যে বৈচিত্র্য, যে বিভিন্নতা আমরা এত ভালবাসি, সে সমস্তই এক অনন্ত সত্যের ভগ্নাংশ এবং সেই অনন্ত বা নিত্য সত্য হচ্ছে মুক্তিলাভ।...

'আমাদের যাবতীয় সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম—আমরা সুখ বা দুঃখ কোনটাই চাই না। আমাদের লক্ষ্য মুক্তি। ...মানুষের জ্বলন্ত, অদম্য পিপাসা। সে কখনও তৃপ্ত হয় না। আরও চাই, আরও চাই—এই তার ভাব। তোমরা আমেরিকানরাও তা-ই করে থাক। কিন্তু এই আগ্রাসী বাসনাই বলে দেয় মানুষ স্বরূপত অনন্ত; আর অনন্ত বলেই যতক্ষণ না সে অসীম ও অখণ্ডকে চাইছে এবং পাচ্ছে, ততক্ষণ সে তৃপ্ত, তুষ্ট হতে পারে না।...'

সমুদ্র-তরঙ্গের মতো স্বামীজীর সুমহান বাণী একটির পর একটি আমাদের মনের বেলাভূমিতে প্রচণ্ড গর্জন তুলে আছড়ে পড়তে লাগলো। তিনি বলেই চলেছেন এবং তাঁর সেই হৃদয়কাড়া কথা শুনতে শুনতে আমরা যেন অনন্তে

উন্নীত, এক কালাতীত অবস্থায় উপনীত। তখন আমাদের জীবাত্মাগুলিকে মনে হচ্ছিল যেন শিশু তার কচি কচি হাত দুটি বাড়িয়ে চাঁদ বা সূর্যকে খেলনা ভেবে ধরতে চাইছে।

অনুপম কণ্ঠে স্বামীজী বলেই চলেছেন ঃ 'যে অনন্ত, তাকে কে সাহায্য করবে?...এমনকি রাতের অন্ধকারে সাহায্যের যে-হাতটি তোমার দিকে এগিয়ে আসে, জেনো সেটি তোমারই হাত।'

এই অমোঘ কথা কটি উচ্চারণ করার পরই স্বামীজী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন, তাঁর কণ্ঠে এবার জাগল বিষণ্ণতার সুর। এমন একটা বুকফাটা হাহাকার তার ভিতর থেকে উদ্‌গত হলো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একটু থেমে, টেনে-টেনে স্বামীজী বললেন, 'অমৃতের সন্তান হয়ে কিনা আমরা যা অনিত্য, যা খণ্ড, তারই স্বপ্ন দেখে চলেছি!'

হায়! যাঁরা বলেন বক্তব্যই সব—বক্তার কণ্ঠস্বরের কোনও মূল্য নেই, তাঁদের সিদ্ধান্তের পায়ে প্রণাম। আমার মতে বক্তৃতা হলো শব্দ দিয়ে গাঁথা এক গতিশীল কবিতা, যার সুরটি কেবল স্বরের সার্থক ওঠা-পড়ার মাধ্যমেই ঝংকৃত হতে পারে। কোলাহলময় জীবনের বেচাকেনার হাটে স্বামীজীর দেওয়া একঘণ্টার এই বক্তৃতাটি যেন এক মধুর আশ্রয়, সুদুর্লভ বিশ্রাম, কোনও এক শান্ত গির্জার মধ্যে উদ্গীত প্রাণস্পর্শী দেবস্তুতি।

বক্তৃতার উপসংহারে স্বামীজী বললেন ঃ 'যে নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত ঐক্য বা একত্ব আমাদের ধরে রেখেছে, তা যদি এক মুহূর্তের জন্যও বিঘ্নিত হতো, যদি একটি অণুকেও ধ্বংস করা যেত বা তাকে তার আপন স্থান থেকে বিচ্যুত করা যেত, তাহলে আমি যে আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আপনাদের দেখছি, আপনাদের সামনে বক্তৃতা করছি, এ কিছুতেই সম্ভব হতো না। ... হরি ওঁ তৎ সৎ!'

স্বামীজীর বাণীর মধ্যে আজ আমি এমন কিছু অতলান্ত গভীর সত্যের সন্ধান পেলাম যা আমাদের সকলের জীবনেই লভ্য। আগেও স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু তখন মনে বহু প্রশ্ন উঠতো, জাগতো নানারকম দ্বন্দ্ব। কিন্তু আজ আর মনের মধ্যে কোনও রকম ছটফটানি, অশান্তির ভাব ছিল না। নতুন কিছু শোনবার, করবার বা ভাববার স্পৃহাটি পর্যন্ত অদৃশ্য হলো।

আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বক্তৃতামঞ্চে এই যে মানুষটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার জীবনটা ওঁর হাতের মুঠোয়। বক্তৃতা করার সময় মাঝে মধ্যে যে দু-

একবার চোখাচোখি হয়েছে, তারই ফাঁকে আমি দেখেছি, ওঁর দৃষ্টিতে যে কথা লেখা—সে যেন সেই মুহূর্তে আমারও মনের ভাব। নিজের আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্বলন্ত বিশ্বাস—এ দুটি জিনিস যে কোনও অনুভূতির চেয়েও বড়। স্বামীজী বলেন, 'মূর্খেরা ভাবে অন্যের মধ্যে বিলানোর জন্যই তারা সববিছু সঞ্চয় করে যাচ্ছে।'

১৭। নিউইয়র্ক, ১৫ জুলাই, ১৯০০ ঃ আজ সকালে গীতার আলোচনা দারুণ জমেছিল। চরম আদর্শ যে সকলের জন্য নয়—এই বাস্তব সত্যটির দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়ে স্বামীজী প্রসঙ্গ শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত সন্তের ক্ষতস্থান থেকে বিচ্যুত কীটকে আবার ক্ষতস্থানে রেখে 'খাও, ভাই, খাও' বলা দেখে ঘৃণা এবং বিরক্তিতে যিনি নাক সিঁটকাবেন, অপ্রতিরোধের নীতি তাঁর জন্য নয়। হিংস্র সিংহ অথবা কাপুরুষ, কারও মুখেই অপ্রতিরোধের কথা মানায় না। বললেও তা হাস্যকর শোনায়।

স্বামীজী বললেন ঃ 'আমাদের সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। স্বীকার করতেই হবে আমরা লোকের চোখে ভালো সাজতে চাই; যা আমরা আদপে নই তা-ই দেখাতে চাই। এবং এই ভান করতে গিয়ে আমরা আমাদের জীবনের দশভাগের নয় ভাগ শক্তিরই অপচয় করি। কিন্তু এই মিথ্যা ভনিতা না করে, যা আমরা হতে চাই, তার পিছনে যদি আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু কাজে লাগাই, তাহলে শক্তির সদ্ব্যবহার হয়।'

আলোচনার শুরুতে স্বামীজী ভারতীয় সুরে একটি স্তব গেয়ে শুনিয়েছিলেন। স্তবটির মর্মার্থ এই ঃ

হে জগদ্‌গুরু, আপনার পাদপীঠ দেবতারাও অর্চনা করেন। ভবরোগের বৈদ্য আপনি অখণ্ড, অদ্বিতীয় আত্মা। দেবতাদেরও গুরু আপনি। আপনার পাদপদ্মে আমাদের প্রণাম। আপনার শ্রীচরণে আমরা সকলেই প্রণত। আমরা প্রণত। আমরা প্রণত।

স্বামীজীর আজকের আলোচনায় আগাগোড়া একটি ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট ছিল মনে হয়। সেটি এই, যিশুখ্রীস্ট এবং বুদ্ধ উভয়েই চরম নীতি ও আদর্শের কথা প্রচার করেছেন এবং ঐ একটিমাত্র পথেই সকলকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সমস্যাগুলিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখেননি, যেটি কৃষ্ণ করেছেন। এবং এইখানেই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি এক অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে সমস্যাগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে মুক্তিলাভের বিভিন্ন পথ ও আদর্শকেই

স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁরা কেমন করে বুঝবেন ঠিক এই কারণেই তিনি একবার বলে উঠেছিলেন, 'যিশুর শৈলোপদেশ (The Sermon on the Mount) মানবাত্মার কাছে আর এক নতুন বন্ধন!'

স্বামীজীর এখনকার সব বক্তৃতাতেই দেখছি একটা গভীর ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। কাটছাঁট করে নয়, এটা-ওটা বাদ দিয়ে নয়, জীবনকে জীবনের মতো করেই দেখা, তাকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করার সুর তাঁর কথাবার্তায় ফুটে উঠছে। হয়তো এই কারণেই এখন যাঁরা তাঁর বক্তৃতা প্রথম শুনবেন, তাঁদের পক্ষে স্বামীজীকে বোঝা একটু অসুবিধাজনক হলেও হতে পারে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর স্বামীজী প্রথমে বাংলা কবিতা, তারপর জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন—দেখ, হয়তো এটা আমার নিছকই খেয়াল, কিন্তু তবুও তোমাদের না বলে পারছি না। আমার এক এক সময় কি সন্দেহ হয় জানো? মনে হয় ঐ যে নক্ষত্রপুঞ্জ, ওগুলি বোধহয় আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তা যদি না হবে তো সেখান থেকে মানুষের চেয়ে উন্নততর কোনও জীবের কোনও সংকেত আজ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে এল না কেন? অথচ শোনা যায় আমাদের এই পৃথিবীর মতো লক্ষ লক্ষ পৃথিবী নাকি মহাশূন্যে ভাসছে!

শিল্পকলার কথা উঠলে স্বামীজী দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—লোকের ধারণা হিন্দু চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য বিকৃত-রুচির পরিচায়ক। কিন্তু তা মোটেই নয়। ঐ রকম একটা ভ্রমাত্মক ধারণা গড়ে উঠেছে তার কারণ, শরীর চেতনার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আভাস দিতে চেয়েছেন, আমাদের দেশের মানুষ সেটিকে বরাবর অগ্রাহ্য করতে চেয়েছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অধিকাংশ জাগতিক বা স্থূল বস্তুর একটা প্রতীকী তাৎপর্য আছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, সাধারণ পার্থিব দৃষ্টিতে প্রতীকগুলি প্রায়শই কিম্ভূত কিমাকার ঠেকলেও প্রতীকগুলির অবলম্বন যে দেহ-ব্যাপার, সেগুলি কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই অরুচিকর বা বিসদৃশ ঠেকে না।

গতকালই স্বামীজী আমাকে বলছিলেন, ঘুমিয়ে-পড়া ব্যাপারটা যে কি তা শৈশবে তিনি আদৌ জানতেন না। শুলেই একটি রঙিন আলোর বল তাঁর কাছে আসতো এবং সারা রাত তিনি তার সাথে খেলেই কাটাতেন। কখনও

কখনও জোতির্বলয়টি তাঁকে ছোঁয়ামাত্রই ফেটে আলোর ঝরণাধারা হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রথম যে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তার মধ্যে এই জ্যোতিঃদর্শনের প্রসঙ্গ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে, ঘুমের সময় আলোর মতো কিছু দেখতে পাস?' স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, দেখি বৈকি! কিন্তু সে তো সবাই দেখে—তাই না?'

একজন সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন, এসব যোগজ শক্তির প্রকাশ এবং শৈশবের এই ঘটনাই প্রমাণ করে, ধ্যানের একাগ্রতা নিয়েই স্বামীজী জন্মেছিলেন; এই শক্তি তাঁকে কষ্ট করে অর্জন করতে হয়নি। আমি একটি বিষয়ে নিশ্চিত যে, জীবনের সব অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্রম মনে রাখার যে দুর্লভ ক্ষমতা স্বামীজীর আছে সেটি মহাপুরুষদের অন্যতম অভিজ্ঞান। স্বামীজী যখন শেষবার বুদ্ধের দর্শন পান, মনে হয়, সেই সময়টাতেই তাঁর জ্যোতিঃ দর্শনের পর্ব চলছিল।

সাধনার শেষে পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্পর্কে আমাদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকে না, আমাদের সব কৌতূহল তখন মিটে যায়। তখন মারিয়া টেরেসা (Theresa), পেত্রার্ক অথবা লোরা—কাউকেই আমাদের আর প্রায়োজন নেই, একথা সত্যি। কিন্তু তখনও সাধনপর্বের প্রতিটি ধাপ, আত্মানুভূতির প্রতিটি পর্যায় হৃদয়ে জ্বলজ্বল করে এবং এই ক্রমোন্নতির অভিজ্ঞতাটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর গুরুত্বটি থেকেই যায়। জীবন দিয়ে স্বামীজী এই সত্যটিই আমাদের কাছে তুলে ধরতে চান। আমি বসে বসে যখন তাঁর কথা শুনি, মনে হয়, বুদ্ধি দিয়ে সব বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি; কিন্তু অন্তরে অনুভব করি কাজটি কতটা দুঃসাধ্য। তখন নিজেই নিজেকে বলি, 'অজ্ঞানতার কোন্ মেঘে তোমার মনের আকাশ এতকাল ঢাকা ছিল? তোমার মতো অন্ধ, তোমার মতো অজ্ঞ বোধহয় কস্মিন্‌কালে একটিও জন্মায়নি!' তুমি ঠিকই বলতে, আমি নিরুত্তাপ এবং আমার মধ্যে নমনীয়তার অভাব আছে। বাস্তবিক, আমি বোধহয় ঐ রকমই এবং তার জন্য দায়ী সবকিছু শুধুমাত্র আবেগশূন্য মন দিয়ে দেখার প্রবণতা।

স্বামীজী নিজে এখন ভক্তিটক্তি এবং সবরকম ভাবাবেগের বিরুদ্ধে। বলেন—ওসব এখন আমি ঝেড়ে ফেলতে চাই। কিন্তু তাঁর মন এবং হৃদয় এমন এক সুরে বাঁধা যে অনায়াসে তিনি ঐ কথা বলতে পারেন। তাঁর মন এবং হৃদয় দুটিই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত বলে যে কোনও একটিকে তিনি

ইচ্ছামতো অগ্রাহ্য করতে পারেন। কিন্তু আমার ধারণা, আমাদের অধিকাংশেরই এখন হৃদয়ের বিস্তার প্রয়োজন।

১৮। নিউইয়র্ক, ২৪ জুন, ১৯০০ ঃ যে বাড়িতে আমি আছি সেখানে স্বামীজীও এসেছেন। পূজনীয়া মাতাজীকে (ধীরামাতা [মিসেস ওলি বুল]) একটি চিঠি লিখে আমি এবারের মতো আমেরিকা থেকে পাততাড়ি গোটাচ্ছি। মাতাজীকে খুব ভালবেসে নিশ্চিন্ত করার জন্য লিখলাম, স্বামীজীর নিদারুণ কষ্টের দিনগুলি অতিক্রান্ত; এখন তিনি সর্বত্র দেবতার সম্মান পাচ্ছেন, সমস্ত জগৎ এখন তাঁর পায়ের তলায়।

চিঠিতে যা লিখেছি তা সবই সত্য, এতটুকু বাড়িয়ে লিখিনি! তাঁকে দেখলেই মনে হয় যেন মূর্তিমান দেবতা। এখন তাঁর যে অবস্থা, তাতে সত্যিই তিনি অপ্রতিরোধ্য।

আজ সকাল এগারোটায় 'মাতৃপূজার' ওপর বক্তৃতা দেওয়ার কথা। বক্তৃতায় তিনি কি বলেন তা তুমি পুরোটাই জানতে পারবে, কারণ দরকার হলে দশ ডলার খরচ করেও গোটা বক্তৃতাটিই নোট করাবার ব্যবস্থা করবো। গতকাল স্বামীজীর সামনে একজন বক্তৃতার প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মাতৃপূজা সম্বন্ধেই বলবো। বিষয়টা আমার খুব পছন্দ।'

সেদিন সকালে তাঁকে একটা পরামর্শ দিতে গিয়ে কী ফ্যাসাদেই যে পড়েছিলাম, তা তোমায় আর কি বলবো! তাঁর মনে হয়েছে, আমি যা বলেছি সেটা ভুল, ওহ্, তুমি যদি সেই মুহূর্তে তাঁর রূপ দেখতে! একটা অপরাধ করেও অমন দুর্লভ দৃশ্য দেখতে পাওয়া পরম সৌভাগ্য বলেই আমি মনে করি!

আমার কথার উত্তরে স্বামীজী গর্জে উঠলেন। বললেন, 'আমি যে মুক্ত, মুক্ত, জন্ম থেকেই মুক্ত, এই সত্যটা কখনও ভুলে যেওনা!' তারপর অবশ্য তিনি মাতৃশক্তির কথা বললেন। এও বললেন, কর্ম আর জগতের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে, ইচ্ছা হয়, হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানে ডুবে যাই। স্বামীজী বললেন ঃ 'সর্বদা আঁটঘাট বেঁধে পরিকল্পনা করতে গিয়ে ইউরোপীয়ানরা কখনও ধর্ম প্রচার করতে পারেনি। কয়েকজন ক্যাথলিক সন্তের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

স্বামীজী বললেন ঃ "আমি নই, জগৎ-প্রসবিনী 'মা'-ই যা করার করেছেন এবং ভবিষ্যতেও মা যা-কিছু করবেন, তা আমি মাথা পেতে মেনে নেব।" এই বলে স্বামীজী আমাদের একটি গল্প শোনালেন। গল্পটি এই ঃ কৈলাসে শিব

আর উমা বসে আছেন। হঠাৎ শিব উঠে দাঁড়ালে উমা জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো, উঠলে যে? শিব বললেন, 'আমার এক ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে। অন্যে তাকে ধরে মারছে। আমি তাকে সাহায্য করতে চললুম।' এই বলে শিব অন্তর্হিত হলেন। কিন্তু দেখা গেল মুহূর্ত পরেই তিনি ফিরে এলেন। অবাক হয়ে উমা প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার! তুমি এই বললে সাহায্য করতে যাচ্ছ, আবার এই ফিরে এলে! মহাদেব বললেন, 'গিয়ে দেখলুম আমার সাহায্যের দরকার নেই, সে নিজেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।'

এই গল্পটি শেষ করেই স্বামীজী উঠলেন এবং বিদায় নেবার আগে আমাকে এই বলে আশীর্বাদ করে গেলেন—'বেশ, বেশ। তুমি মায়েরই সন্তান।' স্বামীজীর এই আশীর্বাদ যখন আমার মাথার ওপর ঝরে পড়লো সেই মুহূর্তে প্রাপ্তির আনন্দটি এতই গভীর যে আমি অভিভূত হয়ে নিঃশব্দে চলে এলাম।

(প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৩৫)

এরিক হ্যামন্ড

লণ্ডনে পদার্পণ করেই স্বামীজী প্রভূত সাড়া জাগিয়েছিলেন। বহু মানুষের দৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। সন্দেহ নেই, শিকাগো ধর্মমহাসভায় সকলের মনে তিনি যে বিপুল বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন এবং প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন পূর্বগামিনী ছায়ার মতো তা ইতোমধ্যেই ইংল্যাণ্ডে তাঁর প্রচারক্ষেত্রটিকে কিছুটা প্রস্তুত করে রেখেছিল। কিন্তু একথাও সত্য, লণ্ডনে পৌঁছবার পর তাঁর নয়নাভিরাম রূপ এবং ততোধিক চিত্তাকর্ষক বাগ্মিতা অসংখ্য মানুষকে অচিরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে এল।

লণ্ডন এমনই এক শহর যেখানে সবরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পূর্ণ সুযোগ মেলে। এর বহু রূপ। বহুমুখী বৈশিষ্ট্যে এই মহানগর সমুচ্ছল। সেই কারণেই নানান মতের সমর্থক ও প্রচারকের দল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঝাঁক বেঁধে এখানে ছুটে আসেন। তাঁদের মত ভিন্ন, পথও ভিন্ন। এত বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁদের লক্ষ্য তবু এক—লণ্ডন মহানগর, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সবরকম চিন্তা ও মতবাদকে স্বাগত জানায়, বিভিন্ন নীতি ও মতামত সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য প্রতিদিনই একাধিক হলে ভিড় করে। প্রতিটি হলই জিজ্ঞাসু শ্রোতায় ঠাসা থাকে এবং সর্বত্রই প্রবক্তাদের মুখে কিছু না কিছু চমকপ্রদ বক্তব্য শোনা যায়। কিন্তু লণ্ডন এমনই এক জায়গা যেখানে ধর্মমত থেকে শুরু করে সবরকমের চিন্তাভাবনা ও মতবাদকেই নিক্তিতে ওজন করে নেওয়া হয়। এখানে কোনও ধর্মবিশ্বাসেরই রেহাই নেই। সবকিছুই এখানে বিচার, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক সমালোচনার পর গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। এক কথায় বলতে গেলে, গতিশীল মনুষ্যজীবনের সবরকম প্রবণতার সুর নিয়েই রচিত বিশাল এই নগর-জীবনের মহাসঙ্গীত।

বাস্তবিক, লণ্ডন যেন এক উদ্দাম জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। এখানে অবিরাম চিন্তার বিস্ফোরণ আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটেই চলেছে। সে বিস্ফোরণ কখনও ষোল আনা ধর্মীয়, কখনও বা দার্শনিক তত্ত্বের। আবার অন্তঃসারশূন্য মত প্রতিষ্ঠার উদ্ধত আবেগ—তাও আছে। তবে চিন্তাভাবনার এই যে বহুমুখী উচ্ছ্বাস, বিচিত্র স্ফুরণ, তার অধিকাংশই নিখাদ ও আন্তরিক। এহেন লণ্ডনের সম্পূর্ণ অজানা-

অচেনা, এক রকম বিরুদ্ধ পরিবেশেই, হিন্দুধর্মের প্রধান নায়ক স্বামীজী পদার্পণ করলেন। বস্তুত তাঁর চেয়ে উপযুক্ত ও বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডের চিন্তাজগতের প্রাণকেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছেন, একথা কল্পনাই করা যায় না!

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। তাঁর প্রতি ছিল অন্তহীন বিশ্বাস। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসের দ্বৈত বর্মে সুরক্ষিত হয়ে স্বামীজী যখনই কিছু বলেছেন তখনই তাঁর বাণীর মধ্য দিয়ে সেই মহান আত্মার শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিচ্ছুরিত হয়ে শ্রোতাদের অন্তর তোলপাড় করে দিয়েছে। যে অভ্রভেদী আদর্শের অটল ভিত্তির ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল, স্বামীজী পরে অল্প কয়েকটি কথায় তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ 'ধর্মমত, বিধিনিষেধের গোঁড়ামি, সম্প্রদায়, গির্জা, মন্দির—এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামিও না, মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা বা দেবত্বের তুলনায় ওগুলো অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। আসল কথা, প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই দেবত্ব যতই বিকশিত হবে, ততই সে শক্তিশালী হয়ে উঠে জগতের কল্যাণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে। প্রথমে তাই দেবত্ব বিকাশের চেষ্টা কর, শক্তিমান হয়ে ওঠ; আর কারও সমালোচনা করো না। কারণ সব ধর্মমত এবং ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই কিছু না কিছু সারবস্তু আছে। ধর্ম মানে যে কেবল কথার কচকচি, কতকগুলো শব্দ, নাম বা সম্প্রদায় নয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উপলব্ধিই যে তার সার কথা—সেটি তোমরা জীবন দিয়ে প্রমাণ কর। শুধুমাত্র যাঁরা অনুভব করেছেন, তাঁরাই বুঝবেন 'ধর্ম কি। যাঁরা আধ্যাত্মিকতা অর্জন করেছেন, কেবল তাঁরাই পারেন অন্যের মনে সেই ভাব সঞ্চারিত করে দিতে, তাঁরাই পারেন মহান আচার্য হতে। অজ্ঞানতার তিমিরে একমাত্র তাঁরাই আলোকস্তম্ভ।' (My Master [মদীয় আচার্যদেব])

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং তার উপলব্ধি, যা অধ্যাত্মজীবনের চরম কথা, সকলের সামনে তিনি এমন করে তুলে ধরলেন যা একমাত্র বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল এবং ঐ পারমার্থিক সত্যের আকর্ষণে কাছের এবং দূরের বহু মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতে লাগল। লণ্ডনে যে এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে, সে খবর অচিরেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, স্বামীজী নিজেও নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গেও সহজভাবে মেলামেশা করতে লাগলেন। এক কথায় জনমানসে তিনি তাঁর আসন করে নিলেন। তাঁর মহত্ত্বে অনেকেই মুগ্ধ। একান্ত এই গুণমুগ্ধের দলে ছিলেন মিস মার্গারেট নোব্‌ল, যিনি পরবর্তী কালে একনিষ্ঠ বিবেকানন্দ-শিষ্যা ও রামকৃষ্ণ

সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসিনী [ব্রহ্মচারিণী] হয়ে ভারতবর্ষেই বাকি জীবন কাটান। বেদান্তের ওপর তিনি যেমন চমৎকার বলতেন, লিখতেনও তেমনি। বস্তুত, এই মিস নোবলের সনির্বন্ধ অনুরোধেই বহু পথ পাড়ি দিয়ে আমি প্রথম স্বামীজীর বাসায় যাই। সেই সময়ে বিশেষ বিশেষ দিনে স্বামীজী দর্শন দিতেন, এবং কেউ গেলে তাঁর সাথে কথাবার্তাও বলতেন।

এখন, আমি কিভাবে প্রথম তাঁকে দেখি, সেই কথাই বলি। এক সন্ধ্যায় আমরা তাঁর বাসায় গেলাম। সে এমনই এক অস্বস্তিকর, বিষণ্ণ, নৈরাশ্যজনক সন্ধ্যা যে বলার নয়! দরজার কাছে পৌঁছেই হতাশ হতে হলো। শুনলাম স্বামীজী বাড়িতে নেই। কিন্তু যেই শুনলাম নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে একটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্বামীজীকে হঠাৎই সিসেম ক্লাবে (Sesame club) যেতে হয়েছে এবং যাওয়ার আগে তিনি বলে গেছেন, ইচ্ছে করলে আমরাও সেখানে যেতে পারি, তখনই প্রবল উৎসাহে আমরা ঐ ক্লাবের দিকে ছুটলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখি এক বিশাল বৈঠকখানা, অনেকটা হলঘরের মতো। আর সেখানে সান্ধ্য পোশাকে ফিটফাট বুদ্ধিজীবীদের উপচে পড়া ভিড়। এক সহৃদয় ভদ্রলোক আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি বসালেন। সেখানে তখনও দু একটি চেয়ার খালি ছিল। একে তো এমন একটা জায়গায় আমাদের বসান হলো সেখানে সকলের নজর এমনিতেই আমাদের ওপর পড়তে বাধ্য, তার ওপর আমাদের পোশাকের যা ছিরি, তাতে কারো দৃষ্টি এড়ানো সম্ভবও ছিল না। আমরা তো মরমে মরে গেলাম! বাস্তবিক, এ রকম একটা মহতী সভায় আসতে হবে, এ তো ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি! আমাদের ওভারকোট বেয়ে বৃষ্টির জল তখনও টপ্ টপ্ করে মেঝেতে ঝরছে! ওরই মধ্যে লক্ষ্য করলাম, শ্রোতাদের অধিকাংশই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা কোনও-না-কোনওভাবে শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত। স্বামীজীর আজকের বক্তৃতার বিষয়ও 'শিক্ষা'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। শান্ত, স্নিগ্ধ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অথচ আগে উনি নিজেও জানতেন না আজ এই সভায় তাঁকে ভাষণ দিতে হবে। কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাথে যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তাঁরা জানেন—এ সব তাঁর কাছে কিছুই নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেও সে কথা প্রমাণ করে দিলেন। অন্তরে অন্তরে একজন খাঁটি হিন্দুর বিশ্বাস, মুখে অনর্গল শ্রুতি ও

স্মৃতিবিষয়ক শাস্ত্রীয় কথা, আর সনাতন কৃষ্টি ও সভ্যতার ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা—এই ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা! তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেখা—সে এক দুর্লভ দৃশ্য! অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা! তাঁর শ্যামলা গায়ের রঙ, বুদ্ধিদীপ্ত গভীর চোখ দুটি, এমনকি তাঁর পোশাকটির মধ্যেও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল যা সবাইকে মুগ্ধ করত। কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ঐ সব কিছুকেও ছাড়িয়ে গেল, ছাপিয়ে গেল। ইংরেজি ভাষায় তাঁর এমন আশ্চর্য দখল ছিল যে শ্রোতারা একেবারে থ হয়ে গেলেন! আর কি সব শ্রোতা? যাঁদের রক্তে ইংরেজি, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষক-শিক্ষিকা, যাঁরা ইংরেজ ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য তো বটেই, ঐ ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ও পড়াতেন।

আর স্বামীজীর ইংরেজি ভাষায় জ্ঞানের কথাই বা শুধু বলি কেন, বক্তৃতা শুরু হতেই সকলে বুঝলেন ইতিহাস, রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়েও তাঁর সমান দখল। খোদ ইংল্যাণ্ডের মাটিতে দাঁড়িয়ে, কাউকে এতটুকু তোয়াক্কা ও খোশামোদ না করে ইংরেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করলেন এই বলে—হিন্দুর নৈতিক বিধান অনুযায়ী অর্থের বিনিময়ে যাঁরা শিক্ষা দেন, তাঁরা মহত্তম ও গভীরতম সত্যের চরম অপমানই করে থাকেন। তাঁরা অর্থলোভী প্রতারক। স্বামীজী বললেন ঃ 'শিক্ষা ধর্মেরই অবিভাজ্য অঙ্গ। এই দুটির কোনটিই বেচাকেনার পণ্য নয়।' তাঁর কথাগুলি যেন খাপখোলা তলোয়ারের মতো গতানুগতিকতায় অভ্যস্ত পণ্ডিতদের সব যুক্তি আর আত্মরক্ষার কৌশল কচ্‌কচ্‌ করে কেটে দিচ্ছিল, অথচ তাঁর ভাষণে তিক্ততার লেশমাত্র ছিল না। এই কৃষ্টিবান সৌম্য হিন্দু সন্ন্যাসী তাঁর মধুর হাসি দিয়ে সকলের বিরূপ সমালোচনার সম্ভাবনা স্তব্ধ করে অনায়াসে নিজ মতকেই প্রতিষ্ঠিত করলেন, ওড়ালেন আপন বিজয়-বৈজয়ন্তী। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন এবং প্রথম চেষ্টাতেই সফল হলেন। তিনি ছড়িয়ে দিলেন এক নতুন ভাব ঃ অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়, জীবিকার তাগিদেও নয়, শিক্ষকরা ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন শুধু ভালবেসে।

স্বামীজীর বক্তৃতার পর আলোচনা চলল। কেউ কেউ যুক্তি দেখালেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য কারণেও তো শিক্ষকদের বেতন নেওয়া উচিত। কিন্তু স্বামীজী আপন সিদ্ধান্তে অচল, অটল রইলেন।

এই হলো স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ। এই প্রথম পরিচয় ক্রমে পরিণত হয় সশ্রদ্ধ বন্ধুত্বে, তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অনুরাগে। কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই বন্ধুত্বের স্মৃতি আজও ধারণ করে রেখেছি।

(বেদান্ত কেশরী, মে ১৯২২)

ই. টি. স্টার্ডি

আপনাদের মহান পূর্বসূরী স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে স্মরণসভার আয়োজন আপনারা করেছেন, সেই সভায় যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকতে পারছি না, তবুও মনে হয়, যাঁরা ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তাঁরা হয়তো স্বামীজী-বিষয়ক এই ছোট লেখাটি পড়ে আনন্দ পাবেন, কারণ যিনি লিখছেন তিনি স্বামীজীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন।

প্রায় চল্লিশ বছর হলো বিবেকানন্দ এ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর যে ছবিটি আমার মানসপটে বিধৃত, তার ঔজ্জ্বল্য এতটুকু ম্লান হয়নি। মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনের কথা—তাঁকে বিদায় জানিয়ে এলাম। সেদিন যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনইভাবে তাঁর স্মৃতি আমাকে ঘিরে রেখেছে।

এমনিতে আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়। তা সত্ত্বেও আমার মানসলোকে স্বামীজীর এই যে জীবন্ত উপস্থিতি, সেটি সম্ভব হয়েছে স্বামীজীর নিজের গুণেই, সেই গুণ যাকে সংস্কৃতে 'ওজঃ' বলা হয়। 'ওজঃ' শব্দের অর্থ শারীরিক শক্তি, তেজ, বীর্য, বল এবং দীপ্তি। বস্তুত, তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন একটা অনিবার্য আকর্ষণ ছিল যা সকলকেই চুম্বকের মতো কাছে টানত। অথচ সেই ব্যক্তিত্বকে অনুক্ষণ ছায়ার মতো ঘিরে থাকত এক নিবিড় প্রশান্তি। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটেই যান বা ঘরে দাঁড়িয়েই থাকুন, তাঁর মহিমার কোনও হেরফের হতো না—তাঁকে দেখলেই মানুষের মনে স্বতঃই একটা সম্ভ্রমবোধ জাগতো।

স্বামীজী সুরসিক ছিলেন। গভীর সংবেদনশীল মনের অধিকারী হওয়ায় মানুষের দুঃখ-কষ্টে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। সঙ্গী হিসেবে তিনি ছিলেন বড়ই মধুর ও মনোরম। যে কোনও পরিবেশে তিনি অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, সর্বস্তরের শিক্ষিত বিদগ্ধ যে সব মানুষের সংস্পর্শে স্বামীজী এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে তাঁর সহজাত আভিজাত্য এবং মহানুভবতার প্রশংসা না করে পারেননি। তাঁকে দেখলেই মনে হতো তিনি যেন সর্বদাই—আধুনিক পরিভাষায় যেমন বলা হয়—ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বাস

করছেন।' চলতে ফিরতে, বেড়াতে বেড়াতে, এমনকি বিশ্রামের সময়েও তিনি অনর্গল উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ও ভক্তির কথা বলে যেতেন, আবৃত্তি করতেন স্তবস্তুতি অথবা প্রার্থনা মন্ত্র।

তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। কার কোথায় অসুবিধা তা তিনি চট করে ধরতে পারতেন আর সোজা সরল কথায় তার মীমাংসা করে দিতেন। আবার দুরূহ চিন্তার রাজ্যে তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডক্টর পল ডয়সনের সঙ্গে তাঁর আলোচনাটি আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। স্বামীজী ডয়সনকে বলেছিলেন শোপেনহাওয়ার এবং ভন হার্টমান অন্ধ ইচ্ছা (Blind will) এবং জড়বাদ তথা অচেতনের (Unconscious) ওপর তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই মহা ভুল করেছেন। কারণ শুদ্ধ বা সমষ্টি-চৈতন্যের পূর্ব অস্তিত্ব না মানলে ব্যক্তিবিশেষের বাসনা বা ইচ্ছার কোনও মূল্যই থাকে না। দুঃখের বিষয়, সেই ভুল আজও চলে আসছে এবং ভুল পরিভাষা ব্যবহারের ফলে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে বহুরকম বিকৃতি এসেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা সব কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করব—সেকথা ঠিক; কিন্তু উদারচিত্ত মহাপুরুষদের মধ্যেও যদি ঈশ্বরের মহত্ত্বপূর্ণ প্রকাশকে অনুভব করতে পারি তাহলেও আমরা ধন্য। একমাত্র দৈব অনুগ্রহেই তা সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ এমনই এক ঈশ্বরপ্রতিম মহাপুরুষ ছিলেন।

(বেদান্ত কেশরী, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)

টি. জে. দেশাই

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের কথা। স্বামী বিবেকানন্দের দুটি বক্তৃতা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস মুলার। প্রথম বক্তৃতাটি শুনলাম সেন্ট জেমস্ হল-এ। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী ইঙ্গাল। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত স্বামীজীকে সেই আমার প্রথম দর্শন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল তিনি যেন সাধু নন, বরং কোনও ভারতীয় রাজা। তাঁর মাথায় ছিল গেরুয়া পাগড়ি।

বক্তৃতা করলেন। অসাধারণ সেই বক্তৃতা। তাঁর কথার এমন তেজ যে শ্রোতাদের অন্তরে যেন বজ্রের শক্তি সঞ্চারিত হলো। পরের দিন খবরের কাগজগুলি লিখল, কেশব সেনের পর এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর তুলনারহিত বাগ্মিতা ইংরেজ শ্রোতাদের অবাক করেছে।

স্বামীজীর সেদিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'বেদান্ত'। যখন তিনি বলছিলেন তখন তাঁর সুকান্ত, আয়ত চোখের দৃষ্টি এমন প্রবল বেগে স্পন্দিত হচ্ছিল, তাঁর সর্বাঙ্গ এমন বাঙ্ময় হয়ে উঠছিল, যা বর্ণনার অতীত। সভা শেষ হলে পাগড়ি খুলে স্বামীজী পার্সি টুপির মতো দেখতে বেশ বড়সড় একটি কাশ্মীরি টুপি মাথায় দিলেন।

দ্বিতীয়বার স্বামীজীর বক্তৃতা বেলুন সোসাইটি-তে। বেশ কিছুক্ষণ তিনি বললেন বটে, কিন্তু প্রথম বক্তৃতার মতো অত অগ্নিগর্ভ নয়। স্বামীজীর বলা শেষ হলে এক ধর্মযাজক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আক্রমণ করে বললেন, বাড়িতে বসে বক্তৃতাটি আগে শিখে নিয়ে সেটি পাঠ করলেই স্বামীজী ভালো করতেন ইত্যাদি। ঐ কথা শোনামাত্রই স্বামীজী স্বমূর্তি ধরলেন, জবাব দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তিনি এবার এমন অগ্নিকল্প এক ভাষণ দিলেন যে ধর্মযাজকটি একেবারে স্তম্ভিত! স্বামীজী বললেন ঃ "কিছু মোটা-বুদ্ধির লোক আছেন যাঁরা ভাবেন দু-দিনেই তাঁরা বেদান্ত দর্শন হজম করে ফেলবেন। যে বেদান্ত আয়ত্ত করতে আমার জীবনের বারোটা বছর কেটে গেছে।"

ধর্মযাজকটি যে-যে বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন, স্বামীজী এইবার সেই সব

প্রশ্নের প্রত্যেকটির সমুচিত উত্তর দিতে লাগলেন। উত্তরের পালা সাঙ্গ হলে তিনি এমন সুরেলা অথচ নির্ভীক কণ্ঠে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করলেন যাতে তাঁর বাণীর সত্যতা সম্পর্কে কারোরই কোনও সংশয় রইলো না। 'সুপর্ণম্'[১] দিয়ে শুরু সেই মন্ত্রের ধ্বনি আজও আমার কানে বাজে।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে আমি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন এ্যান্ড আয়ার্ল্যান্ড-এর সভ্য হই। ঐ সংস্থার সদস্য হওয়ার ফলে তৎকালীন বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তখন সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন রিস ডেভিডস্ (Rhys Davids), সংস্কৃতের বিদগ্ধ পণ্ডিত। ঐ সংস্থার কোনও সভা থাকলে তার দিনক্ষণ আমাদের আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হতো। সভায় সাধারণত লোকপ্রিয় কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পড়া হতো এবং তারপর কিছুক্ষণ চলত প্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনা। অবশ্য কেবল আলোচনাই নয়, সভ্যদের জন্য শেষে কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও থাকত। মোটের ওপর, ওখানে আমরা পরস্পরের মধ্যে মতের আদান-প্রদান ও ভাব-বিনিময়ের প্রচুর সুযোগ পেতাম। এই সুবাদে সাহিত্যজগতের বেশ কিছু দিক্‌পালের সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। সোসাইটির নিজস্ব ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো। মিস ডাফ এবং আরও কয়েকজন ভদ্রমহিলা সোসাইটির সদস্যা ছিলেন এবং সভায় তাঁরা প্রায় নিয়মিত আসতেন। মিস ডাফ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। জার্মান অধ্যাপক ডয়সন-এর 'দ্য এলিমেন্টস্ অফ মেটাফিজিকস্' বইটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই সব বিদুষী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার স্বতন্ত্র একটা আনন্দ ছিল। গোঁড়া ইংরেজরা অবশ্য 'উচ্চশিক্ষিতা এইসব মহিলাদের বিদ্রূপ করে বলতেন 'Blue Stockings' বা 'নীল মোজা'। এহেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির কোনও কোনও সভায় আমারও কিছু বলার সুযোগ হয়েছে।

মনে আছে একবার অধ্যাপক বেইন (Bain) উপনিষদের ওপর লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই. ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি ছিলেন স্যার রেমন্ড ওয়েস্ট। অধ্যাপক বেইন-এর পাঠ শেষ হলে আমি খুব তেড়েফুঁড়ে একটি ভাষণ দিলাম। আমি বলেছিলাম মানুষের 'অহংবোধ', বিশেষকরে ইউরোপীয়দের 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র'-প্রিয়তা নৈর্ব্যক্তিক অনন্ত ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার পথে দারুণ অন্তরায়। আমার

---

১ তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩/১১/১)

কথায় অধ্যাপক ডেভিডস্ বিশেষ উত্তেজিত হয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় কিছু মন্তব্য করলেন। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে আমি উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললাম ঃ কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়; আর ইউরোপীয়দের জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাঁরা যখন উপনিষদ্ এবং বেদান্ত দর্শন নিয়ে শৌখিন আলোচনায় মাতেন এবং গোলকধাঁধায় পড়ে হাবুডুবু খান, তখন হিন্দুরাই তাঁদের ঠিক পথটি দেখিয়ে দিতে পারেন কারণ বেদ-উপনিষদ্ হিন্দুদের রক্তে। আরব দেশের একজন সাধারণ তরুণ নাবিকও আমাদের চেয়ে আরব সাগরকে অনেক ভাল চেনে, এবং ঐ সমুদ্রে পথ হারালে সে-ই পারে আমাদের নিরাপদে কূলে পৌঁছে দিতে। যত বড় ধুরন্ধর ইউরোপীয় নাবিকই হোন না কেন আরব সাগরের অন্ধিসন্ধি তাঁর অজানা; অতএব এই ব্যাপারে আরবী কিশোরের কাছে তিনি নিতান্তই শিশু। বেদ-উপনিষদের ক্ষেত্রেও হিন্দুরা ঐ আরবী নাবিকের মতো।

এই কথার পর ঝড় থামল। আমরাও সবাই স্বস্তিতে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। সেদিনের ঐ সভাতেই শ্রীদত্তকে আমি প্রথম দেখি। তিনিও কিছু বলেছিলেন, মনে আছে; তবে অতিরিক্ত মৃদু ও সংযতভাবে।

আমার বক্তৃতা স্বামী বিবেকানন্দের খুব পছন্দ হওয়ায় তিনি আমাকে তাঁর আস্তানায় নিয়ে গেলেন। পথে যেতে যেতে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা হলো। স্বামীজী সেদিন একটা লম্বা সিল্কের টুপি পরেছিলেন যা দেখে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। আমার যদি ভুল না হয় তো সেদিন স্বামীজী এবং তাঁর কোনও গুরুভাই (হয় স্বামী সারদানন্দ নয়তো স্বামী অভেদানন্দ) খিচুড়ি রেঁধেছিলেন। আমাকে ওঁরা বল্লেন—আজ রাতের খাবারটা আমাদের এখানেই হোক না কেন।

ঐ বছরেই (১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে) স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ‘কর্মযোগ’, ‘জ্ঞানযোগ’, ‘ভক্তিযোগ’ এবং ‘রাজযোগ’ প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ব্ল্যাভ্যাটস্কি লজেও বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। আমি সেইসব বক্তৃতার বেশ কয়েকটি শুনেছি। ইংল্যাণ্ডের সেরা সেরা মানুষ তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসতেন। বিবেকানন্দ বলতে তাঁরা একেবারে পাগল—এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।

বক্তৃতার শেষে প্রায়ই তিনি আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরতেন। আবার কখনও কখনও বাড়ির কাছাকাছি ঘুরতে বেরোতেন। ঐ সময়েও মাঝে

মাঝে আমি তার সঙ্গ নিতাম। স্বামীজীর ওখানে খাওয়াদাওয়া আমার লেগেই থাকত। কখনও স্বয়ং তিনি, আবার কখনও বা আমার ছাত্রী মিস মুলার অথবা মিস্টার স্টার্ডি আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন। আমার অনুমান, স্বামীজী আমেরিকা থেকে লণ্ডনে চলে আসার পর মিস্টার স্টার্ডিই তাঁর থাকা-খাওয়ার খরচ চালাতেন। মিস্টার স্টার্ডিকে দেখলে প্রকৃত যোগী পুরুষ বলেই মনে হতো। স্বামীজীর আর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন মিস্টার গুডউইন। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি তিনিই 'শর্টহ্যান্ড'-এ লিখে রাখতেন। পরে সেগুলি বই হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬-এর জুলাই মাসে মন্টেগু ম্যানসনে 'লণ্ডন হিন্দু এ্যাসোসিয়েশন'-এর এক সম্মেলন হয়। সঙ্ঘের সভাপতি হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন। অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। রামমোহন রায় নামে মাদ্রাজের এক ভদ্রলোক 'ভারতবর্ষের প্রয়োজন' এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। সংস্থার সম্পাদক হিসাবে আমাকেই সভার আয়োজন ও আপ্যায়নের যথোচিত ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

যথাসময়ে স্বামীজী সভাপতির ভাষণ দিতে উঠলেন। বক্তৃতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর বাগ্মিতাশক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহে শ্রোতাদের আবিষ্ট করে দেন। বহু সাংবাদিকও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বলতে বলতে স্বামীজী একবার হঠাৎ এমন জোরে টেবিল চাপড়ালেন যে, টেবিলের ওপর রাখা আমার ঘড়িটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সে একটা কাণ্ডই হলো বটে! স্বামীজীর চেহারার মধ্যে একটা আশ্চর্যরকম প্রভুত্বব্যঞ্জক ভাব ছিল যা দেখে আমার গৃহকর্ত্রী তো একেবারে অবিভূত! স্বামীজীর কথা, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে দারুণ নাড়া দিয়েছিল।

স্বামীজীর বাগ্মিতায় যখন ইংরেজরা একেবারে মুগ্ধ, ঠিক সেই সময় বাড়ি ফেরার পথে একদিন বড় বড় প্লাকার্ড চোখে পড়ল। তাতে লেখা—ভারতীয় প্রিন্স রণজিৎ সিংজী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় ইংল্যাণ্ডের মান বাঁচিয়েছেন। তিনি ১৫৪ রান করেও অপরাজিত। ঠিক তার পরের দিনই 'লণ্ডন টাইমস্'-এ এক পেল্লায় সম্পাদকীয় বেরলো। প্রবন্ধের শিরোনাম—'ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের জয়যাত্রা'। তাতে দুটি নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক—মিস্টার চ্যাটার্জি, যিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন, এবং দুই—প্রিন্স রণজিৎ সিংজী, ব্যক্তিগত রানের গড়পড়তা হিসেবে যিনি সেই বছর সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছেন।

ঐ বছরেই শেষের দিকে আমাদের আমন্ত্রণে স্বামী বিবেকানন্দ আরেকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে (স্বামী সারদানন্দ না স্বামী অভেদানন্দ, তা ঠিক মনে নেই) আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমি তখন দ্বিতীয়বার আওয়েনস্-দের ওখানেই আছি। স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাই সেদিন আমাদের সঙ্গে নিরামিষই খেলেন যদিও কথাবার্তায় বুঝলাম মাংসে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তিনি চুরুটও খেতেন। স্বামীজী নৈশভোজে আসায় আওয়েনস্-দম্পতি খুব খুশি হয়েছিলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও বাকপটুতা তাঁদের মুগ্ধ করে।

ঐ বছরেই (১৮৯৬) আমি স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। সেই সময়েই লণ্ডনের 'ওয়েস্ট এ্যান্ড' অঞ্চলের এক প্রাসাদোপম হলে স্বামীজী অনন্যসাধারণ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি চমৎকার গল্প বলেন। গল্পটি এই ঃ একবার কোনও এক রাজা তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য বিরাট এক স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করেছিলেন। ঘটনাচক্রে এক তরুণ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীও সেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির। সন্ন্যাসীকে দেখে রাজকন্যা বিমোহিতা। তিনি সমবেত রাজা ও রাজপুত্রদের মধ্যে কারও গলায় বরমাল্য না দিয়ে সেটি সহসা পরিয়ে দিলেন বিষয়-বিতৃষ্ণ সেই তরুণ যতির কণ্ঠে। ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই বিস্মিত—সন্ন্যাসীও চরম সর্বনাশের আশঙ্কায় রাজপ্রাসাদ থেকে দে ছুট। তিনিও যত ছোটেন, রাজকুমারীও তত। সন্ন্যাসী যেখানে যান, রাজকুমারীও তাঁর পিছু পিছু যান। কিন্তু এত করেও কোনও ফল হলো না, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো না বরবর্ণিনীর। কারণ সন্ন্যাসের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে উদ্বাহ বন্ধনে রাজি হলেন না ত্যাগব্রতী।

সেদিনের বক্তৃতা শেষ হলে ইংল্যাণ্ডের ডাকসাইটে সুন্দরীরা স্বামীজীকে ঘিরে তাঁকে নানান প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। কোনওরকমে তাঁদের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্বামীজী বাইরে চলে এলেন। নিরিবিলিতে একা হয়ে স্বামীজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে তাঁর বাসস্থানে যেতে অনুরোধ করলেন। বলাই বাহুল্য, আমি রাজি হয়ে গেলাম। পথে যেতে যেতে কতকটা যেন তাঁর মন পরীক্ষার জন্যই আমি বললাম—আচ্ছা স্বামীজী, রাজকুমারীকে প্রত্যাখ্যানের আঘাত দেওয়াটা কি তরুণ সন্ন্যাসীর উচিত হয়েছিল? আমার প্রশ্ন শুনে স্বামীজী বিরক্ত হয়ে কঠিন স্বরে বললেন ঃ 'পবিত্রতার আদর্শকে সে-ই বা জলাঞ্জলি দিতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

আরেকদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। স্বামী বিবেকানন্দের ডেরায় গিয়েছি।

সেদিন সেখানে আর কেউ নেই। স্বামীজী আর আমি—এই দুজন। সেদিন স্বামীজীকে বেদান্তের খুব জটিল কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম এবং তিনি প্রতিটি প্রশ্নেরই সদুত্তর দিয়েছিলেন। আমার অনেক প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল ঃ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সম্পর্কটি কি? এখানে বলে রাখি, আমি খুব বেদান্ত চর্চা করতাম। ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করার ব্যাপারে তাই আমার একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ছিল। স্বামীজীকে প্রশ্ন করেই আমি নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম এবং একই সঙ্গে মনে মনে বিচার করে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছিলাম। ঠিক যে মুহূর্তে ব্রহ্মচিন্তায় আমি বেশ তন্ময় হয়েছি, ঠিক তখনই স্বামীজী বলে উঠলেন—তত্ত্বমসি। অর্থাৎ তুমিই তিনি। তদ্দণ্ডেই সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হলো না।

ঐ বছরেরই শেষের দিকে (১৮৯৬) স্বামীজী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন।[১]

পরে আরেকবার আমি স্বামীজীকে দেখব বলে তাঁর বাসস্থানে গিয়েছিলাম। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাকে গ্রহণ করে অনেক সৎপ্রসঙ্গ করলেন। কথায় কথায় ভগবদ্‌গীতার বেশ কটি শ্লোকও সেদিন আবৃত্তি করলেন। শ্লোকগুলি হলো ঃ

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥

—যাঁদের মন সমরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, দেহে অবস্থানকালেই তাঁরা সংসার জয় করেন, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মুক্ত হয়ে যান। যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দোষ, সমদর্শিগণ তাই ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকেন। (গীতা, ৫/১৯)

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥

—হে শত্রুতাপন অর্জুন! তুমি এবং আমি বহুবার জন্মগ্রহণ করেছি। আমি তা জানি, কিন্তু তুমি তা জান না। (ঐ, ৪/৫)

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥

—যে সমস্ত অবিবেকী মানুষ দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধির সাক্ষিভূত

১ প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী ভারতে ফেরেন ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭

আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর, অর্থাৎ আমাকে শাস্ত্রবিধিবিরুদ্ধ উগ্র তপস্যার দ্বারা ক্লিষ্ট করে, অবজ্ঞা করে, তাদের আসুরিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট বলে জানবে। (ঐ, ১৭/৬)

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

—হে শত্রুতাপন অর্জুন! মনের তুচ্ছ দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (গীতা, ২/৩)

তাঁর কথা শুনে আমিও মৃদুস্বরে আবৃত্তি করতে লাগলাম ঃ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

অর্থাৎ, অর্জুন বলছেন—হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ ও অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয়েছে। আমি এখন আত্মতত্ত্ববিষয়ক স্মৃতি বা কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান লাভ করেছি। আমার সন্দেহ দূর হয়েছে এবং আমার মন এখন স্থির হয়েছে। তোমারই উপদেশমতো এখন আমি কাজ করব। গীতা, ১৮/৭৩

স্বামীজী বলেছিলেন—'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধদের এই নীতি আজ সাধারণ মানুষকে মেরুদণ্ডহীন ক্লীবে পরিণত করেছে। তিনি নিজে তাই এক বলিষ্ঠ বীরের ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, শিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রথমটা তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেই উপনিষদের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এই মহাবাক্যটি বিদ্যুৎ ঝলকের মতো মনের মধ্যে খেলে গেল, অমনি তিনি দেহে মনে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলেন যে অসম্ভবও তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো। সেই শুরু। তারপর তিনি একের পর এক বক্তৃতা করে আমেরিকাবাসীদের প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছেন, স্তম্ভিত করেছেন। এ আজ ঐতিহাসিক সত্য। আমেরিকার বিভিন্ন সংবাদপত্রই তার সাক্ষী।

তাই জগতের মানুষের কাছে স্বামীজীর মূল আবেদন এই ঃ তোমরা নিজেদের ক্ষুদ্র, দীনহীন না ভেবে তোমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে, ব্রহ্মস্বরূপটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর।

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি ১৯৩২)

স্বামী বোধানন্দ

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ। তখন আমি কলকাতার রিপন কলেজে পড়ি। সেই সময়েই শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু জানার এক পরম সুযোগ আসে আমার জীবনে। সেই বছরের আগস্ট মাসে আমি কয়েকজন সহপাঠী ও বন্ধুর সঙ্গে পূর্ব কলকাতায় কাঁকুড়গাছি মন্দিরের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে পরম ভক্ত স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্তের মুখেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা প্রথম শুনলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তির কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই রামবাবুর রামকৃষ্ণানুরাগের গভীরতা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা তো প্রায়শই একটা শ্লোক আওড়াই ঃ 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।' কিন্তু এই শ্লোকটির মর্ম ঠিক ঠিক আমরা কজন বুঝি? রামবাবু বুঝেছিলেন। বাস্তবিক, শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর 'যথাসর্বস্ব' ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর একমাত্র আরাধ্য দেবতা; শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোনও দেবতার পূজা তিনি করতেন না। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত ভস্মাস্থি সমাহিত আছে, সেই মন্দির ছাড়া আর কোনও মন্দিরে তিনি যেতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছাড়া অন্য কোনও ধর্মশাস্ত্র তিনি কখনো পড়তেন না। কাউকে কখনো কিছু উপদেশ দিতে হলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ থেকে যা শুনেছিলেন তা-ই বলতেন, অন্য কোনও শাস্ত্রীয় তত্ত্বের কথা বলতেন না।

মাস্টার মহাশয় [বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত] আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। শুনেছিলাম, তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য। একদিন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু কথাও সেদিন হয়েছিল। তিনি তখন জানালেন যে, বরানগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা আছেন; আমরা যেন তাঁদের দর্শন করে আসি। মাস্টার মহাশয় স্বভাবত খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তিনি খুবই সহজ ও মধুর ব্যবহার করলেন। আমাদের তিনি অকপটেই বললেন যে গৃহিভক্ত আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—এ দুই-এর মধ্যে অনেক তফাত। যিনি সন্ন্যাসী তিনি সংসার

ত্যাগ করে ধর্মসাধনের জন্য তাঁর সমগ্র জীবনটি উৎসর্গ করেন। একটি উপমা দিয়ে বললেন ঃ গৃহিভক্ত কিরকম জানো? যেন টোকো আম, যদিও পাকা। আর সন্ন্যাসী যেন আপাকা জাত আম, যেমন ধরো, ফজলি বা ল্যাংড়া! মাস্টার মহাশয়ের উপমাগুলি সর্বদাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হতো। তিনি সেদিন আমাদের আরও বলেছিলেন—যদি তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও শিক্ষার জীবন্ত রূপটি দেখতে চাও, তোমাদের মঠে যেতে হবে।

অল্প কিছুদিন পরেই কলেজ থেকে আমরা সোজা মঠে গেলাম। সেই আমাদের প্রথম মঠ দর্শন। পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা তিনটে হয়ে গেলো। মঠে গিয়ে আমরা প্রথমেই দর্শন পেলাম পূজনীয় শশী মহারাজের [স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের]। আমাদের দেখে তিনি খুব খুশি। আমাদের খোঁজখবর সব নিলেন। ছাত্র জেনে আমাদের কয়েকটি প্রশ্নও করলেন। তারপর বললেন ঃ বাবারা, পড়াশোনায় ফাঁকি দিস-নে।

সেদিন আমরা পাঁচটা কি ছটা পর্যন্ত মঠে ছিলাম। চারটেয় ঠাকুরঘর খোলা হলে পূজনীয় শশী মহারাজ আমাদের সঙ্গে করে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং ঠাকুরের শ্রীচরণের ফুল এবং কিছু প্রসাদী ফল-মিষ্টি দিলেন। মনে হলো, মহামূল্যবান বস্তু পেলাম আমরা। বিছানায় রাখা ঠাকুরের ফটো এবং পূজার বেদিতে আত্মারামের কৌটো, দু-জায়গাতেই আমরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। চার-পাঁচজন সন্ন্যাসী ঐ সময়ে আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা একে একে তাঁদের প্রত্যেককেই প্রণাম করলাম। তাঁরাও ভালবেসে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন আর খুব আশীর্বাদ করলেন। যখন চলে আসছি, পরম স্নেহভরে তাঁরা বললেন ঃ আবার সব মঠে এসো, কেমন? হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে সমস্তক্ষণ আমরা শুধু সেই অপূর্ব দর্শনের কথা, সন্ন্যাসীদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা আর মঠের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কথাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিলাম।

মাস্টার মহাশয় তখন কলকাতার কম্বুলিয়াটোলায় থাকতেন। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে আমরা তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁকে আমাদের মঠ-দর্শনের কথা জানালাম। তিনি সব শুনে উৎসাহ দিয়ে বললেন ঃ এখন থেকে ঘন ঘন মঠে যাতায়াত করবে এবং সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদের কিছু কিছু সেবা করতে চেষ্টা করবে। যেমন ধরো, তাঁদের একটু পা টিপে দিলে বা তামাক সেজে খাওয়ালে, এই রকম আর কি!

মাস্টার মহাশয়ের কথা থেকে বুঝলাম, তাঁর কাছে এইসব সন্ন্যাসীদের দর্শন এবং তাঁদের সেবা করার অর্থ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণকেই দর্শন করা ও তাঁর সেবা করা।

আমরা প্রথম মঠে যাওয়ার অল্প কয়েকদিন আগেই স্বামীজী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে[১] তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় নির্জনবাসের ইচ্ছা তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে ক্বচিৎ কখনো তিনি মঠের গুরুভাইদের চিঠিপত্র লিখতেন। ফলে দু-এক বছর জানাই যায়নি তিনি কোথায় আছেন।

সেই সময় শশী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, মহাপুরুষজী, যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ এবং নিরঞ্জন মহারাজ মঠে থাকতেন। সকলেই আমাদের স্বামীজীর কথা শোনাতেন। তাঁদের মুখ থেকেই শুনি স্বামীজীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় ভালবাসার কথা। তাঁদের কেউ কেউ তখনই আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, স্বামীজী মঠে ফিরলে সানন্দেই আমাদের সন্ন্যাস দিয়ে দেবেন।

ভাবলে অবাক লাগে, এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর আগেই, খুব সম্ভব ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আমি স্বামীজীকে প্রথম দেখি। তখন আমি বৌবাজার মেট্রোপলিটান স্কুলের ছাত্র আর স্বামীজী ঐ স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। তিনি অবশ্য মাত্র কয়েক সপ্তাহ ঐ পদে ছিলেন। আমি নিচু ক্লাসে পড়তাম, তাই স্কুলে তাঁর কাছে পড়া বা তাঁর কথাবার্তা শোনার সুযোগ পাইনি। কিন্তু তিনি যখন স্কুলে ঢুকতেন, সে সময় রোজ আমাদের ক্লাসঘরের জানলা দিয়ে আমি তাঁকে লক্ষ্য করতাম। সে দৃশ্য এখনো আমার চোখের ওপর ভাসে। গায়ে কালো আলপাকার চাপকান্, পরনে প্যান্ট, কাঁধে ঝোলানো প্রায় ছ-ফুট লম্বা একখানি সাদা চাদর। তাঁর হাতে থাকতো ছাতা, অন্য হাতে একখানা বই—সম্ভবত এনট্রান্স শ্রেণীর কোনও পাঠ্য বই। তাঁর চোখ দুটির অসাধারণ দীপ্তি, মুখের সহজ স্মিত হাসি এবং সর্বদা অন্তর্মুখ ভাব—মোহন ব্যক্তিত্বের এই রূপে অনেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। আবার অনেকে তাঁর স্থির গাম্ভীর্য দেখে তাঁর কাছে ঘেঁষতেই সাহস পেতেন না। সে যাই হোক, বরানগর মঠে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে, আমাদের সেই হেডমাস্টার মশাই যাঁকে দেখে আমি এত মুগ্ধ হতাম, তিনি আর কেউ নন—স্বামীজী স্বয়ং!

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচার সেরে স্বামীজী

১. পরে এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল 'যুক্তরাজ্য', আরও পরে হয় 'উত্তরপ্রদেশ'।

ভারতে ফিরলেন এবং [১৮৯৭] জানুয়ারিতে তিনি কলম্বো পৌঁছালেন। কলকাতায় এলেন ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে। কলকাতা থেকে প্রায় কুড়ি মাইল পশ্চিমে আমি তখন আমাদের গ্রামের বাড়ির কাছাকাছি একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করি। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্ম-মহোৎসব তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির বাগানেই উদ্‌যাপিত হতো এবং তাঁর সন্ন্যাসি-শিষ্যেরা সেখান থেকে প্রায় দু-মাইল দূরে আলমবাজার মঠে বাস করতেন। প্রতিবারের মতো সেবারও ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়েছিল ফেব্রুয়ারির শেষে অথবা মার্চের প্রথম সপ্তাহে। উৎসবের একদিন আগে আমি মঠে চলে এসেছিলাম। সেদিন ছিল শনিবার। এখনকার মতো তখনো শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির পরের রবিবারেই সাধারণ উৎসব হতো।

স্বামীজী তখন সাময়িক কিছুদিনের জন্য মঠ থেকে মাইল তিনেক দূরে গঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে বাস করছিলেন। রবিবার একদম ভোরে ঐ বাড়িতে গিয়ে তাঁকে দর্শন করলাম। তখন প্রায় ছটা। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। কিন্তু স্বামীজী খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতেন। তাই দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই তিনি স্বয়ং নিচে নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমি তাঁর কতদিনের চেনা! তিনি তখন মুখ ধোবেন। তাই বড় আপনজনের মতো আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিতে বললেন। আমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি জেনে তিনি খুব খুশি। আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। তখন মহাপুরুষজীও সেখানে ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন, বেশ কয়েকবছর ধরে যে কয়েকজন তরুণ নিয়মিত মঠে যাতায়াত করছে আমি তাদেরই একজন। আমার সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছার কথাও তিনি স্বামীজীকে জানালেন। সেকথা শুনে স্বামীজী বললেন, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমাকে সন্ন্যাস দেবেন। তাঁর আশ্বাসবাণীতে আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সাধারণ উৎসবের কয়েকদিন আগে, সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির দিনেই, স্বামীজী চারজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দিলেন। ঐ একই দিনে তিনি একজন কি দুজন ভক্তকে মন্ত্রদীক্ষাও দিয়েছিলেন। সকাল আটটা নাগাদ তিনি মঠে এলেন। তাঁর ইচ্ছায়, আমারও তাঁর সঙ্গে একই গাড়িতে আসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। মঠে পৌঁছে, স্নানাদি সেরে, স্বামীজী ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলাম। আহা, সে এক সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা!

সাধারণ উৎসবের দিন, আন্দাজ বেলা এগারোটায়, স্বামীজী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাগানে এলেন। বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজী এসেছেন—এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় ভিড় বোধ হয় এত বেশি হয়েছিল। পঞ্চবটীর কাছে স্বামীজীকে ভাষণ দেবার জন্য অনেকেই অনুরোধ করলেন। কিন্তু স্বামীজীকে দর্শন করার আনন্দে উদ্বেল, উচ্ছল জনমণ্ডলী এমন কোলাহল শুরু করলেন যে তাঁর পক্ষে ভাষণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। একটা নাগাদ বিশ্রামের জন্য স্বামীজী মঠে ফিরে গেলেন। সেদিন সারাক্ষণই আমি স্বামীজীর সঙ্গে ছিলাম এবং সেই সুবাদে তাঁর সামান্য একটু সেবা করার সৌভাগ্য সেদিন আমার হয়েছিল। আমার জীবনের চিরস্মরণীয় দিন সেটি, যার স্মৃতি আমার মানসপটে আজও অক্ষয়, ভাস্বর হয়ে আছে। ঐ দিনটির কথা মনে হলে আজও আমি অতীতের মতো আনন্দে, পুলকে শিহরিত হই।

পরদিন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে আবার স্কুলের কাজে যোগ দেবার জন্য ফিরে যেতে হলো। কিন্তু একটি কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার বোধ এবং সেই পুণ্যদিবসের স্মৃতি ও আনন্দের রেশ বহুদিন পর্যন্ত আমার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। স্বামীজীকে আবার কবে দেখবো, আবার কবে তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর কৃপা ও পথনির্দেশ পাবো—সেই আশায় দিন গুণতে লাগলাম।

(প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর ১৯৩৪)

স্বামী বিমলানন্দ

স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই তাঁর খুব অন্তরঙ্গ কয়েকজনের কাছ থেকে তাঁর মহত্ত্বের অনেক কথা শুনেছিলাম। তাই ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে যখন খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে গেছেন, তখন থেকেই আমি তাঁর প্রত্যেক গতিবিধি এবং কাজকর্ম গভীর মনোযোগ ও একান্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে আরম্ভ করি। তাঁর সম্পর্কে আমার মনে যে অতি উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর কর্মের সাফল্যে সেই ভাবমূর্তিটি অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকে কি না দেখার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতাম। হে মাদ্রাজী জনগণ! আপনাদের কাছে আজ আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁকে নিয়ে আমার যে প্রত্যাশা ছিল তাকে তিনি সর্বাংশে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যতদিন না তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করেছি ততদিন পর্যন্ত তাঁকে জানার সম্যক আনন্দ ও তৃপ্তি পাইনি। মাঝে মাঝেই মনে সংশয় জাগতো, মনে হতো—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে আমি একটা ঝোঁকের বশে, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আকাশকুসুম রচনা করছি, ছুটে চলেছি মরীচিকার পিছনে। অতএব, আপনারা বুঝতেই পারছেন, স্বামীজীকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন আমার মনে তাঁর প্রতি কোনও রকম একপেশে পক্ষপাতিত্বের ভাব ছিল না। বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষ কেমন করে তাঁর প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে স্বমতে নিয়ে আসেন তেমন কোনও কৌতূহল-উদ্দীপক মনোহর কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করে সবিস্তারে বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং সেটি আমার বিষয়ের বহির্ভূত। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, স্বামীজীর কাছে যাওয়ার আগেই আমি তাঁর একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

তবে একইসঙ্গে একথাও বলবো যে, সেদিন যদি দেখতাম, স্বামীজীকে যা ভেবে বসে আছি, প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন, কর্ম ও আচরণের মধ্য দিয়ে যদি দেখতাম তিনি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধার উপযুক্ত নন, সেক্ষেত্রে আমার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাতেও দ্বিধা করতাম না। রূঢ় বাস্তবের সেই নির্মম আঘাত হয়তো আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হতো, আমার হৃদয় দুঃখে ক্ষতবিক্ষত

হয়ে যেত; কিন্তু হলফ করে বলছি, আমার কাছে নীতির স্থান সবার উপরে। হৃদয়ের দাবি যত বড়ই হোক না কেন, স্বামীজীর প্রতি আমার যত দুর্নিবার আকর্ষণই থাক না কেন, তাঁর মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখলে আমার বিবেক, বোধ, বুদ্ধি বিদ্রোহ ঘোষণা করতোই করতো, আর সেক্ষেত্রে আমার নীতির পায়ে আমি আমার ভাবাবেগকে বলি দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হতাম না।

এখন কথা হচ্ছে, স্বামীজীর মধ্যে কি ধরনের মহত্ত্ব আমি দেখতে চেয়েছিলাম? বীর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে যে তেজস্বিতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়, তেমন কিছু নয়; আবার কবির সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং আনন্দের অভিব্যক্তিও নয়, পণ্ডিতের অগাধ পাণ্ডিত্য নয়, সুদক্ষ তার্কিকের প্রখর বুদ্ধিমত্তার চমকও নয়, দার্শনিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উপলব্ধির ব্যাপ্তি নয়, প্রকৃত মানবদরদীর আপ্লুত হৃদয়ও নয়। আমি যে স্বামীজীর মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের এইসব গুণ প্রত্যক্ষ করতে চাইনি তার কারণ মোটেই এই নয় যে, তাঁর মধ্যে এইসব গুণাবলী যে প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান তার যথেষ্ট প্রমাণ আমি পাইনি। আসল ব্যাপার হলো, ধর্ম সম্পর্কে আমার যে তৎকালীন সঙ্কীর্ণ ধারণা ছিল ঐসব গুণাবলী ছিল তার বাইরের বিষয়। পাশ্চাত্যে স্বামীজীর অভাবনীয় নিত্যনতুন সাফল্যের যে বার্তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল তাকে আমরা তাঁর বিস্ময়কর ধীশক্তির প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আমার সহজাত মানসিকতার জন্যই হোক অথবা বুদ্ধির একান্ত দৈন্যের জন্যই হোক, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছি, স্বামীজীর ঐ বুদ্ধির দীপ্তির মূলে রয়েছে তাঁর অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন। এবং এই ধর্মজীবনেরই একটি পরম প্রকাশ আমি তাঁর মধ্যে দেখতে চেয়েছিলাম।

'ধর্ম বলতে তখন আমি বুঝতাম পবিত্রতা আর ধ্যান। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র মহান সন্ন্যাসি-শিষ্যদের পায়ের কাছে বসে জেনেছিলাম যে, এই দুটি গুণ অধ্যাত্মরাজ্যের উচ্চভূমিতে ওঠার জন্য অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, ধার্মিক ব্যক্তিকে চেনার ঐ দুটিই কষ্টিপাথর। যে দেবোপম সন্ন্যাসীরা আমাকে এই অমূল্য শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে আমার চোখে পবিত্রতা ও ধ্যানের মূল্য বেড়েছে বই কমেনি। সেইসঙ্গে আবার ধর্মের আরও কয়েকটি দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং তার ফলে ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণাও আরও গভীর এবং স্পষ্ট হয়েছে। স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার আগে পর্যন্ত তাঁকে পবিত্রতা ও গাঢ়

ধ্যানতন্ময়তার মূর্ত প্রতীকরূপে দেখার আকাঙ্ক্ষাই আমি মনে মনে পোষণ করেছি। আমি যে হতাশ হইনি সেকথা আপনাদের কাছে বলাই বাহুল্য। স্বামীজীকে যেদিন প্রথম দর্শন করি, সেদিন তাঁর সেই অনুপম উজ্জ্বল মুখকান্তি, দীপ্তিমান অথচ স্নিগ্ধ-মধুর চোখদুটি দেখে আমার মন-প্রাণ এক অবর্ণনীয় তৃপ্তিতে ভরে গেল; মনে হলো এমন একজনের দর্শন আজ পেলাম যিনি আমার জীবনে অদ্বিতীয়, যাঁর মতো মানুষ আমি আগে আর কখনো দেখিনি!

তারপর যখন পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো কাছে ডেকে তিনি আমাদের সব খোঁজখবর নিতে লাগলেন, মিষ্টিকথায় আমাদের প্রাণে নতুন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করতে লাগলেন, তখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম—আমাদের হৃদয় কখন যেন তাঁর কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। স্বামীজীর চারপাশে তখন অনেক গণ্যমান্য দর্শনার্থী ও বন্ধুর ভিড়—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নগণ্য আমাদের প্রতি তিনি যে কৃপা করেছিলেন, তাতে আমাদের মন-প্রাণ আনন্দে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে তাঁর উদার, অকপট কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা এমন একটি হৃদয়ের পরিচয় পেলাম যেখানে ভয়, ছল-চতুরী বা সামাজিক ভান-ভণিতার কোনও বালাই নেই। সরল, স্পষ্ট, অথচ তেজোদীপ্ত চোখাচোখা সব কথাগুলি যখন উল্কাবেগে তাঁর মুখ থেকে বেরোচ্ছিল, তখনই তাঁর প্রজ্ঞা আর গভীর অন্তর্দৃষ্টির কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পেয়েছিলাম। সেই গগনচুম্বী ব্যক্তিত্বের গভীরতার পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু তবুও অনুভব করছিলাম সেই ব্যক্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণেই আমরা তাঁর সাথে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি।

সেই প্রথম দর্শনের দিনটিতেই স্বামীজীর ঠিক ঠিক বিনয় দেখার এক অপূর্ব সুযোগ পাওয়া গেল। 'ঠিক ঠিক' বললাম এই কারণে যে, নিজেকে ছোট করা এবং মুখে-চোখে একটা কৃত্রিম দীনহীন ভাব ফুটিয়ে তোলাকেই অনেকে ভুল করে বিনয় ভেবে থাকেন। কিন্তু স্বামীজীর বিনয় যাকে আত্মবিলোপ বলা হয় তা-ই; সম্পূর্ণ অহংশূন্য—তাই আত্মমর্যদার শ্রী ছিল তাতে। জনৈক দর্শনার্থী যখন প্রশ্ন তুললেন, আমেরিকায় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তৃতাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি কেন, তখন স্বামীজীর অকপট স্বীকারোক্তি ঃ 'আমিই তা প্রকাশ করতে দিইনি, কারণ ঠাকুরের প্রতি আমি অবিচার করেছিলাম। আমার প্রভু কখনো কারো দোষ দেখতেন না, অথচ তাঁরই কথা বলতে গিয়ে আমি

আমেরিকানদের ডলার-প্রীতির তীব্র নিন্দা করে বসলাম। সেইদিনই বুঝলাম, আমি এখনো তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলার উপযুক্ত হতে পারি নি।'

স্বামীজীর কথায় সেদিন আমরা নানা কারণেই চমকে উঠেছিলাম। ভাবলাম—কী আশ্চর্য! এত লোক যাঁকে সমাদর করছেন, বস্তুত মনে প্রাণে পূজা করছেন যাঁকে, সেই মানুষটি কিনা তাঁর সেই ভক্তদের সামনেই নিজের গুরুদেব সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলার অক্ষমতার কথা স্বীকার করলেন! সেদিন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম ঃ 'ওঃ, কী নিরভিমান এই মানুষটি! আর এই মহাপুরুষের কাছে যে গুরুর আসন এত উঁচুতে, তিনি না জানি আরও কত বড়, আরও কত মহান!'

প্রথম দর্শনে স্বামীজী সম্পর্কে সংক্ষেপে এই হলো আমার ধারণা! তারপর যত দিন যেতে লাগলো, যতই তাঁর সম্পর্কে জানতে লাগলাম, তাঁর প্রতি আমার প্রথম দিনের বিস্ময়কর মুগ্ধতা ততই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। আলাপের সেই প্রথম দিনে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভক্তির বহ্নিশিখায় দীপ্ত কয়েকটি স্ফুলিঙ্গই কেবল আমার সীমিত দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু আরও অনেক, অনেক স্ফুলিঙ্গ দেখার তখনো বাকি ছিল। যতই সেই পাবকের আকর্ষণে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়েছি, কাছে থেকে দেখেছি তার আশ্চর্য রূপ, ততই আমার তুষারশীতল হৃদয় সেই প্রদীপ্ত উৎস থেকে তাপ নিয়ে অন্তত কিছুটাও তপ্ত হয়েছে।

আপনাদের আগেই বলেছি, আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, স্বামীজী পবিত্র ও উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করেই বিপুল জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার পর আমার সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। তবে যেদিন নিজের মুখে তিনি এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করলেন, সেদিন আমার বিশ্বাস বজ্র-প্রত্যয়ে পরিণত হলো। আমার জীবনের সে ছিল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। সেদিন এক ভাবী শিষ্যের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী ব্রহ্মচর্যের ওপর এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন যার স্মৃতি মন থেকে কোনও দিন মুছে যাওয়ার নয়।

ধর্মজীবনে পবিত্রতার কি অপরিসীম মূল্য সেইকথা সেদিন তিনি আমাদের কাছে ব্যক্ত করেন। কেমন করে এই পবিত্রতা রক্ষা করতে হয় তা-ও তিনি আমাদের বুঝিয়ে দেন। তিনি আমাদের সাবধান করে দেন এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন যে, নৈতিকতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি-বর্জিত অন্তঃসারশূন্য ভাবাবেগ

কামকে বাড়িয়ে দিয়ে যথার্থ ধর্মজীবনের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। তারপর যখন তিনি অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, যখন মানুষের সহজাত আসুরিক প্রবণতার মোড়গুলি কিভাবে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় ও তার ফলে সাধকের জীবনে কি প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটে, সেই কথা বলতে লাগলেন—সেই মুহূর্তে তিনি এমনই প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলেন যে মনে হচ্ছিল হৃদয়ে গুহাহিত [অনন্ত-চৈতন্যরূপী] আত্মা যেন তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করছেন এবং শ্রোতাদের দেহমন সেই পরম পবিত্র স্বর্গীয় প্রজ্ঞার ঝর্ণাধারায় নিষ্ণাত হচ্ছে। শব্দের পর শব্দ দিয়ে যে-ছবিটি তিনি আমাদের মনে এঁকে দিচ্ছিলেন, আমরা দেখলাম তারই জীবন্ত প্রতিমূর্তি আমাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে। এবং শেষবেশ তিনি যে কথাগুলি বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন, হে ভক্তমণ্ডলী, আপনারা একবার কল্পনা করে দেখুন, সেই কথাগুলি আমাদের মনকে কি প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। স্বামীজী বললেন ঃ 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন যে, আমি যদি ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে পারি—যেমনটি আমি তোমাদের এইমাত্র বললাম—তাহলে আমি আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবো। যেদিন আমি মনে-প্রাণে অনুভব করেছি, পবিত্রতার চরম লক্ষ্যে আমি উপনীত হয়েছি, কেবল সেইদিনই জগতের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার সাহস হলো আমার। বাবারা—পবিত্রতার এই আদর্শে তোমরা অটল থেকো। তোমাদের কাছে আমার এইটুকুই মিনতি। দেখো, আমার নাম ডুবিয়ো না।'

আর একবার অন্য কোনও প্রসঙ্গে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিশক্তির কথা আমাদের বলেছিলেন। বলেছিলেন, সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তিনি এমন ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন যা অভ্রান্ত; কোনও কিছুর আরম্ভমাত্র দেখেই ভবিষ্যতে তা কি রূপ নেবে তিনি বলে দিতে পারেন। আমি কিন্তু এ কথা মোটেই বলতে চাইছি না যে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই সর্বক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি। ধার্মিক না হয়েও কোনও ব্যক্তি অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী হতে পারেন। আবার এমন ধার্মিক ব্যক্তিও দেখা যেতে পারে জগতের বহু খবরই যিনি রাখেন না, হয়তো নিজের বক্তব্যও তিনি ভালমতো গুছিয়ে বলতে পারেন না। কিন্তু এটি অবশ্যই দেখা যাবে, তিনি সর্বদা সত্যে স্থিত এবং সত্য তাঁর চিত্তে স্বতঃ উদ্ভাসিত।

স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার আগে তাঁর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার যে ধারণা ছিল বর্তমানে সে ধারণার বেশ কিছুটা পরিবর্তন

হয়েছে। এখন বুঝি, তাঁর ভিতর অতীন্দ্রিয় অন্তর্দৃষ্টি এবং অসাধারণ বুদ্ধির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। সত্য ছিল তাঁর সহজাত; সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হতো। কিন্তু তাঁর প্রখর বুদ্ধির আলোকে সেই সত্যকে তিনি যুক্তির ওপর দাঁড় করাতেন এবং প্রভূত তথ্য ও উপমার সাহায্যে তাকে তিনি বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতেন।

যে পবিত্রতা স্বামীজীর অন্তর্দৃষ্টিকে পুষ্ট ও সম্ভব করেছিল তা সাধারণ পবিত্রতা নয়। চতুর্দিকে নিষেধের প্রাচীর তুলে কু-বাতাস থেকে নিজেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে একধরনের শুদ্ধতা জীবনে আসে সত্য, কিন্তু সে পবিত্রতা বড় ভঙ্গুর। স্বামীজীর পবিত্রতা সে-জাতের নয়। তিনি এমনই স্বভাবশুদ্ধ ছিলেন যে, তাঁর গা-বাঁচিয়ে চলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। শুধু তা-ই নয়। এই পবিত্রতা ভয়ে ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পথে নিয়ে তো যেতই না, বরং যেন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রবৃত্ত করতো তাঁকে , শত্রুর ভূমিতে গিয়ে তার মুখোমুখি হতে, তাকে জয় করে নিতে উৎসাহিত করতো তাঁকে—এতেই ছিল তাঁর এক ধরনের উল্লাস। অন্য ভাবে বলা যায়—স্বামীজীর এই পবিত্রতা চতুর্দিকের অশুদ্ধ প্রভাব ও পরিবেশের মধ্যেও অনায়াসে অক্ষুণ্ণ থাকতো, সেই শক্তি তাঁর ছিল। শুধু তাই নয়, যা অশুদ্ধ তার মধ্যে মঙ্গলশক্তির প্রবোধন করে দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁর ঐ জ্বলন্ত পবিত্রতায় ছিল। ক্ষমা করবেন, এই ধরনের একটি বিষয়ের নিতান্ত ব্যক্তিগত খুঁটিনাটির ভিতরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, এই পথে স্বামীজীর যে অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা আমি জানতে পেরেছি তাতে তাঁর শ্রীচরণে আমার হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির অর্ঘ্যটুকু না দিয়ে পারিনি। তাঁর চরিত্রের অন্যান্য বহুবিধ গুণের কথা না হয় বাদই দিলাম, শুধু এই একটিমাত্র গুণের জন্যই আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ আসনখানি আমি তাঁকেই দিয়েছি।

... স্বামীজীর চরিত্রের আর একটি গৌরবোজ্জ্বল দিকের সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল যার মূলকথা ছিল ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ। আমি এখানে ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আচরণ [ও দৃষ্টিভঙ্গির] কথাই বিশেষকরে বলতে চাইছি। আপনারা অনেকেই জানেন, স্বামীজীর বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে কয়েকজন খুবই বিত্তবান। স্বামীজীর অভীপ্সিত কাজে সাহায্য করার জন্য তাঁদের কেউ কেউ ভারতবর্ষে এসে থেকেছেন। তাঁর অতি নগণ্য ভারতীয় শিষ্যদের সঙ্গে স্বামীজী যে রকম আচরণ করতেন, বিত্তবান বিদেশী এই ভক্তদের সঙ্গেও তিনি

ঠিক সেই একই রকম ব্যবহার করতেন; সেখানে কোনও তারতম্য দেখা যেত না। স্বভাবতই তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল ও প্রেমিক পুরুষ—সকলের প্রতিই ছিল তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি তাঁকে কখনো স্নেহান্ধ করে তোলেনি। ভক্তদের চরিত্রে দোষ-ত্রুটি দেখলে তিনি তা শুধরে দিতে ইতস্তত করতেন না।

নরম কথায় অনেক সময়ে কাজ হয় না। তাই মাঝে মাঝে স্বামীজীকে কঠোরও হতে হয়েছে। এবং তাঁর এই ভর্ৎসনার হাত থেকে কেউই রেহাই পাননি—না তাঁর ধনী শিষ্যেরা, না তাঁর কৌপীনধারী সন্ন্যাসি-শিষ্যেরা। যাঁর যা প্রাপ্য তিনি তা-ই পেতেন। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁদের জন্ম, বিলাসিতায় যাঁরা লালিতপালিত, প্রশংসা এবং খোশামোদে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে এই শাসন কখনো কখনো অসহনীয় মনে হতো। জাগতিক দৃষ্টিতে এই কারণে স্বামীজীকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে, কিন্তু তার জন্য কি তিনি কখনো অনুশোচনা করেছেন? আদৌ না। ধনী ব্যক্তিরা তাঁর অনুগত থাকবেন কি থাকবেন না সে বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপই করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁর সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব তুলনাহীন।

... যে কয়েকটি প্রবাদ স্বামীজীর মুখে মুখে ফিরতো তার মধ্যে একটি হলো—'শিরদার সরদার'—অর্থাৎ যে পরার্থে প্রাণ দিতে পারে সে-ই ঠিক ঠিক নেতা হওয়ার যোগ্য। আমাদের সকলের মধ্যে স্বামীজীর স্থান কোথায় সে উত্তর তাঁর জীবন থেকেই মেলে।

আপনাদের আগেই বলেছি, স্বামীজী যেমন কোমলহৃদয় এবং স্নেহপ্রবণ ছিলেন তেমনই আবার প্রয়োজনে কখনো কখনো অত্যন্ত কঠোরও হতে পারতেন। অন্যের মঙ্গলের জন্য তিনি যেমন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারতেন, তেমনই আবার কারো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দরকার হলে রুখে দাঁড়াতেও পারতেন। তিনি যা ভাবতেন বা করতেন তাতে তাঁর সমস্ত মন-প্রাণটা একেবারে ঢেলে দিতেন। এই পরিপূর্ণ একাগ্রতা স্বামীজীর চরিত্র ও জীবনের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

একটা ঘটনার কথা বলি। স্বামীজীর এক শিষ্যের অন্যতম কর্তব্য ছিল মঠের ভৃত্যদের কাজের তদারক করা। কিন্তু তিনি পরিচারকদের দিয়ে ঠিকমতো কাজ করিয়ে নিতে পারছিলেন না। একদিন সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী ঐ-শিষ্যের চোখ খুলে দিলেন এবং তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঠিকমতো কাজকর্ম করিয়ে

নেওয়ার অক্ষমতা একটা দুর্বলতা মাত্র, তার সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বললেন ঃ 'মাঝে মাঝে ওদের একটু বকাঝকা করতে পারো না বলে কখনো ভেবো না, তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ। ওদের জন্য কি তুমি প্রাণ দিতে পারো? আমি নিশ্চিত, তুমি কখনোই তা পারবে না কারণ ওদের তুমি আদপেই ভালবাস না। আমি কিন্তু এই মুহূর্তেই ওদের জন্য মরতে পারি; আবার দরকার হলে এক্ষুনি ঐ গাছের ডালে ওদের লটকে দিতে পারি। তুমি পারবে? না, বাবা, না—ভাবাবেগ আর ভালবাসা এক বস্তু নয়। মনে রেখো কবির সেই বিখ্যাত উক্তি ঃ " 'বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি' অর্থাৎ বজ্রের চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল, এই হলো আদর্শ। প্যানপ্যানানি আর ভালবাসা, এই দুয়ে অনেক তফাত।"

স্বামীজীর মতো এমন নরম মনের মানুষ আমি কখনো দেখিনি। তাঁর কোনও গুরুভাই বা শিষ্যের দেহ গেলে দিনের পর দিন এক অব্যক্ত ব্যথায় তিনি ছটফট করতেন। খাওয়া, শোয়া, বিশ্রাম—সব কোথায় চলে যেত! ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের কোনও এক সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর এক গুরুভাই এর দেহত্যাগ হয়। প্রিয়বিয়োগের সেই বেদনা স্বামীজীর বুকে এত গভীর হয়ে বেজেছিল যে, পুরো এক সপ্তাহ তিনি উদাসীন, অন্যমনস্ক এবং অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন; যত দূর সম্ভব লোকসঙ্গ এড়িয়ে চলতেন। সাত দিন কি আট দিনের মাথায় তিনি হঠাৎ মঠের ঠাকুরঘরে এলেন এবং তখন সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাছে সরল শিশুটির মতো বলতে থাকেন ঃ 'আমার প্রাণের ভাইটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন বলে ঠাকুরের ওপর আমার খুব রাগ হয়েছিল, তাই এই কদিন ঠাকুরঘরে আসিনি। ওদের [গুরুভাইদের] এত ভালবাসি কেন জানিস? ওদের সঙ্গে যতদিন আর যত অন্তরঙ্গভাবে কাটিয়েছি তত আমার নিজের সহোদর ভাইদের সঙ্গেও না। ...কিন্তু ঠাকুরের ওপরেই বা আমি রাগ করবো কেন? আমি কেন আশা করবো, আমার ইচ্ছা মতো সব কিছু ঘটবে? আর দুঃখে আদৌ ভেঙে পড়বোই বা কেন? আমি না বীর? ঠাকুর আমার কাঁধে হাত রেখে বলতেন ঃ " 'নরেন, তুই একটা বীর, তোকে দেখলেই আমি বুকে বল পাই।' হ্যাঁ, সত্যিই আমি বীর। তবে কেন আমি কাপুরুষের মতো দুঃখের কাছে মাথা নোয়াবো?"

...স্বামীজীর যে কোনও একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করুন—তাঁর আমেরিকান, ইংরেজ, বাঙালি অথবা মাদ্রাজী যে কোন শিষ্যকে—সবার মুখে আপনি একই

কথা শুনতে পাবেন যে, প্রাণঢালা ভালবাসা আর সহানুভূতি দিয়ে স্বামীজী তাঁদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। স্বামীজীর বিস্ময়কর প্রজ্ঞা ও মনীষা, সকলের মনেই সম্ভ্রম জাগাতো এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মতো অল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষ সম্ভ্রমের ঐ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেত না, তাঁর হৃদয়ের করুণা ও ভালবাসা আস্বাদন করা তো দূরের কথা! স্বামীজীর হৃদয়বত্তার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

...জগতে যা কিছু আছে সে-সবই যে আমার—শুধু তাই নয়, আমিই সবকিছু হয়েছি, জগতের সঙ্গে এই ঐক্যানুভূতি বা উপলব্ধি না হলে কি বিশ্বপ্রেম সম্ভব? কখনোই না। আর শাস্ত্রে একেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলা হয়েছে। স্বামীজীর শিক্ষার সার কথাও এই—আত্মজ্ঞান বা মানুষের দেবত্ব। আমার স্থির বিশ্বাস, স্বামীজীর আশ্চর্য উদার প্রকৃতির মূলেও আছে এই ভাব। তিনি জ্ঞানী বলেই বিশ্বপ্রেমিক হতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে না বলে পারছি না, বহুদিন ধরে আমি একটা মারাত্মক ভুল ধারণা পোষণ করে আসছিলাম। আমি ভাবতাম, জ্ঞান ও ভক্তি বুঝি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু সূর্য উঠলেই যেমন অন্ধকার পালায় তেমনি স্বামীজীর সংস্পর্শে এসেই আমি এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছি। তিনি ছিলেন একাধারে ভক্ত আবার জ্ঞানী। আর ঠিক সেই কারণেই তিনি ছিলেন কর্মবীর; এক মহাকর্মযজ্ঞে মেতে দুনিয়াটাকে তোলপাড় করে দিতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে-মহাশক্তি জগৎ কাঁপিয়েছে, আজও যে শক্তি সক্রিয়, যা বহু নিদ্রিত জীবকে তার অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলছে, মৃত দেহে যেন প্রাণসঞ্চার করছে, হতাশার নিকষ অন্ধকারে আশার আলো ফুটিয়ে তুলছে, বিশীর্ণ ঊষর প্রাণে প্রেমের সঞ্চার করছে—সেই শক্তির মূলে আছে তাঁর সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের আবার বলছি ঃ কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধী—এই মারাত্মক ভুল ধারণাটিও স্বামীজীর জীবনের দিকে তাকালেই নিমেষে দূর হয়ে যায়।

আমি শুরুতেই বলেছি, স্বামীজীকে দর্শন করার আগে পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল নিতান্তই সীমিত। সেইজন্য আমি কখনোই আশা করিনি যে, স্বামীজীর ভিতর একজন বীরযোদ্ধা, কবি, দার্শনিক, অথবা এক মানব-প্রেমিককে দেখতে পাবো। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে আসার পর দেখলাম, তিনি সবকিছুই; আবার এসবের ঊর্ধ্বে আরও কিছু। তিনি যেমন কবি ছিলেন,

তেমনই ছিলেন দার্শনিক। তিনি যেমন ভাবপ্রবণ ও অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তেমনই ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। আর একাধারে এমনভাবে সবকিছু হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র ধর্মপ্রাণতার জন্যই—ধর্মপ্রাণতা সত্ত্বেও নয়।

স্বামীজীর সান্নিধ্য আমাকে শিখিয়েছে, যে ধর্ম মানুষকে মহান কর্মে উদ্দীপিত করে না, তার নৈতিক, মানসিক ও সুকুমার বৃত্তিগুলি পরিমার্জিত করে তাদের উৎকর্ষ সাধন করে না, যে ধর্ম মানুষকে দয়ালু ও পরার্থে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ করে না এবং সেই সঙ্গে অন্তর্মুখ ও ধ্যানতন্ময় করে তোলে না, সে-ধর্ম ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। একই সঙ্গে একথাও আমি বুঝেছি, অসম্পূর্ণ ধর্মমতেরও বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ তা সাধারণ মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারে। এবং ঠিক সেই কারণেই সব ধর্ম এবং ধর্মমতের সাধককে আমাদের একান্ত সহানুভূতি ও প্রেমের দৃষ্টিতে দেখা উচিত। স্বামীজীর কাছে আমি শিখেছি, আমার কাছে যতই অপ্রীতিকর মনে হোক না কেন, কোনও ধর্মবিশ্বাসকে নিন্দা করার আগে আমি যেন অন্তত তিনবার ভেবে দেখি। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখেছি, যে ধরনের অন্ধ-কুসংস্কার বলে মানুষ টিপ্পনি কাটে সেই সাধন-পূজাই স্বামীজীর প্রেম ও ভক্তির জাদুদণ্ডের স্পর্শে কেমন অনন্ত সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে উঠতো!

আমি শিখেছি ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি—আপাতদৃষ্টিতে তাকে যতই হীন বা পতিত মনে হোক না কেন—স্বরূপত ঈশ্বর; সুতরাং চিরকাল সে পতিত অবস্থায় থাকতে পারে না। এমন মানুষকেও আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত এবং সম্ভব হলে, তাকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলা উচিত—তার বিকৃত আদর্শকে নিন্দা করে নয়, নিষ্ঠুরভাবে তার আদর্শকে ছিন্নভিন্ন করে নয়; বরং শান্তভাবে ঐ বিকৃত আদর্শের জায়গায় সেই ব্যক্তির প্রকৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে সুসমঞ্জস একটি ইতিবাচক আদর্শ তার সামনে তুলে ধরে।

আমি এও শিখেছি, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতাও গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে। কঠিন বাধাবিঘ্নের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি সেই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মধ্যেও কল্যাণ নিহিত থাকে। শান্ত ধ্যানচিন্তা যেমন, তেমনি কর্মও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে মানুষকে এগিয়ে দেয়। আমার এই প্রত্যয় হয়েছে—ঈশ্বরকে আমাদের অন্তরে এবং বাইরে দু-ভাবেই আস্বাদন করা যায়। ভিতরে আমরা তাঁকে অনুভব করি তখনই, যখন

আমাদের মন নির্বিষয় হয়ে যায়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের যাবতীয় স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়। তখনই চৈতন্যের সাথে চৈতন্যের সাক্ষাৎকার। আর বাইরে তাঁকে আমরা সম্ভোগ করি তখনই, যখন সর্বভূতে তাঁর উপস্থিতি আমরা টের পাই এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকলের প্রতি সপ্রেম প্রাণঢালা সেবার অঞ্জলি দিই।

আমি বুঝেছি, ব্যক্তিগত, জাতীয় এবং সর্বজাগতিক স্তরে উদ্ধারকর্তা হিসাবে মহান ব্যক্তিদের অবদান অপরিমেয়। আরও বুঝেছি, এইসব তত্ত্ব আমি কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই বুঝেছি, এখনো স্বভাবের অঙ্গীভূত করতে পারিনি। স্বামীজীর জীবন থেকেই আমি এই শিক্ষা পেয়েছি এবং এই বিষয়ে সচেতন হয়েছি।

আর একটি কথা—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্বামীজী যে চরম অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন আমার সেই প্রত্যয় শুধুমাত্র তাঁর প্রগাঢ় পবিত্রতা, নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সকলের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টান্ত দেখেই হয়নি। শাস্ত্রে ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষের যেসব লক্ষণাবলীর কথা আছে, স্বামীজীর মধ্যেও সেই ধরনের সূক্ষ্ম বহু প্রকাশ দেখেই তাঁর সম্পর্কে আমার এই ধারণা তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। আমি তাঁকে শিশুর মতো কাঁদতে দেখেছি, ঈশ্বরের নামে উন্মত্ত ও ব্যাকুল হতে দেখেছি। আবার এমন গভীর ধ্যানে তাঁকে ডুবে যেতে দেখেছি যে-ধ্যানে তাঁর শ্বাসক্রিয়া পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কত উচ্চ শিখরে তিনি প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আমার ধারণার ছবিতে তুলির শেষ টান দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছে স্বামীজীরই শ্রীমুখের বাণী।...

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩)

স্বামী শুদ্ধানন্দ

অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ জয় করে সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। যখন থেকে স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েছেন, তখন থেকেই সে সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদপত্রে যা কিছু প্রকাশিত হচ্ছে তা-ই সাগ্রহে পড়ছি। তখন দু-তিন বছর মাত্র কলেজ ছেড়েছি—কোনওরকম অর্থ উপার্জনও করি না। সুতরাং কখনো বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি গিয়ে, কখনো বা বাড়ির কাছে ধর্মতলায় 'ইন্ডিয়ান মিরর' অফিসের বাইরে বোর্ডে-টাঙ্গানো 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজী সম্বন্ধে যে কোনও সংবাদ বা তাঁর যে কোনও বক্তৃতা প্রকাশিত হচ্ছে, তা-ই সাগ্রহে পড়ি। এইভাবে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা পর্যন্ত সিংহলে বা মাদ্রাজে যা কিছু বলেছেন, প্রায় সব পড়েছি। এছাড়া আলমবাজার মঠে গিয়ে তাঁর গুরুভাইদের কাছে এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের কাছেও তাঁর অনেক কথা শুনেছি ও শুনছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রগুলি যথা—'বঙ্গবাসী', 'অমৃতবাজার', 'হোপ', 'থিওজফিস্ট' প্রভৃতি—যাঁর যে রকম ভাব—সেই অনুসারে কেউ বিদ্রুপ করে, কেউ উপদেশ দেওয়ার ছলে, কেউ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁর সম্বন্ধে যা-কিছু লিখছেন, তাও প্রায় কিছুই জানতে বাকি নেই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁর জন্মভূমি কলকাতা নগরীতে পদার্পণ করবেন, আজ তাঁর শ্রীমূর্তি দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে, তাই প্রত্যূষে উঠেই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হলাম। এত সকালেই স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে লাগলো। দেখলাম, দুটি ইংরেজি কাগজ বিলি হচ্ছে। পড়ে দেখলাম, তাঁর লণ্ডন ও আমেরিকাবাসী ছাত্ররা বিদায় দেওয়ার সময় তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে-দুটি অভিনন্দনপত্র দিয়েছেন, ঐ দুটি তা-ই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থীরা দলে দলে আসতে লাগলেন। স্টেশন-প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন, স্বামীজীর আসতে আর কত দেরি? শোনা

গেল, তিনি একখানি স্পেশাল ট্রেনে আসছেন, আসার আর দেরি নেই। ঐ যে—গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো।

স্বামীজী যে কামরায় ছিলেন, সেটি যেখানে এসে থামলো, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়েছিলাম। যেই গাড়ি থামলো, দেখলাম স্বামীজী দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করলেন। তখনই স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখে নিলাম। তার পরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা এসে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কিছু দূরে একখানি গাড়িতে ওঠালেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে অগ্রসর হলেন। সেখানে খুব ভিড় জমে গেল। এদিকে দর্শকদের হৃদয় থেকে স্বতঃই 'জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়' 'জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়'—এই আনন্দধ্বনি উঠতে লাগলো। আমিও প্রাণভরে সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়ে জনতার সঙ্গে এগোতে লাগলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাইরে পৌঁছেছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরাই টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলাম, ভিড়ের জন্য পারলাম না। সুতরাং সে-চেষ্টা ত্যাগ করে একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়িটির সঙ্গে এগোতে লাগলাম। স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার জন্য একটি হরিনাম-সঙ্কীর্তন দলকে দেখেছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যান্ড বাজনা বাজাতে বাজাতে স্বামীজীর সঙ্গে চললো, দেখলাম।

রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানারকম পতাকা, লতা-পাতা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। গাড়ি এসে রিপন কলেজের সামনে দাঁড়ালো। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, তিনি মুখ বাড়িয়ে কোনও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিছুটা ঘর্মাক্ত ও মলিন হয়েছে মাত্র। দুখানি গাড়ি—একটিতে স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। অপরটিতে মিঃ গুডউইন, মিঃ হ্যারিসন (সিংহল থেকে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব), জি.জি, কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাই হোক, অল্পক্ষণ গাড়ি দাঁড়াবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন

কলেজবাড়িতে প্রবেশ করে সমবেত সকলকে সম্বোধন করে দু-তিন মিনিট ইংরেজিতে একটু বলে আবার ফিরে গাড়িতে উঠলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হলো না। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাড়ির দিকে ছুটলো। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরলাম।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর চাঁপাতলায় খগেনদের [স্বামী বিমলানন্দের] বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে খগেন ও আমি তাদের একখানা টমটমে চড়ে পশুপতি বসুর বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করছেন, বেশি লোকজনকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর অনেক গুরুভাই-এর সঙ্গে দেখা হলো। স্বামী শিবানন্দ আমাদের স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এরা আপনার খুব admirer [মুগ্ধ ভক্ত]।'

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতিবাবুর বাড়ির দোতলায় একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসেছিলেন। উজ্জ্বল গেরুয়া-পরা অন্যান্য স্বামীজীরা এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। মেঝে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করে সেই কার্পেটের ওপর বসলাম। স্বামীজী যোগানন্দ স্বামীর সঙ্গে তখন কথা বলছিলেন। আমেরিকা-ইউরোপে স্বামীজী কি দেখলেন, সেই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। স্বামীজী বলছিলেন ঃ 'দেখ যোগে, দেখলুম কি জানিস?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা কচ্ছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest [প্রকাশ] করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য-দেশীয়রা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest কচ্ছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।'

খগেনের দিকে চেয়ে তাকে খুব রোগা দেখে স্বামীজী বললেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।' স্বামী শিবানন্দ উত্তর দিলেন, 'এটি অনেকদিন থেকে chronic dyspepsia-তে [পুরনো অজীর্ণ রোগে] ভুগছে।' স্বামীজী বললেন, 'আমাদের বাংলা দেশটা বড় sentimental [ভাবপ্রবণ] কি না, তাই এখানে এত dyspepsia।' কিছুক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করে বাড়ি ফিরলাম।...

স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করে শোনার জন্য ঐখানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে করে কয়েকদিন গিয়েছিলাম। সে সব দিনের কথার যতটুকু স্মরণে আছে, এইবার তাই বলার চেষ্টা করবো।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়—প্রথম এই বাগানবাড়ির একটি ঘরে। স্বামীজী এসে বসেছেন, আমিও গিয়ে প্রণাম করে বসেছি, সেখানে কেউ নেই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি তামাক খাস?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে না।' তাতে স্বামীজী বললেন, 'হ্যাঁ, অনেকে বলে—তামাক খাওয়া ভালো নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা কচ্ছি।'

আর একদিন স্বামীজীর কাছে একজন বৈষ্ণব এসেছেন, তাঁর সঙ্গে স্বামীজী কথা বলছেন। আমি একটু দূরে রয়েছি, আর কেউ নেই। স্বামীজী বলছেন ঃ 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী সর্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।' তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন ঃ 'যে সব ধর্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে ...।'

আর একদিন গেছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসে আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করে স্বামীজী কথাবার্তা বলছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলছে, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু সত্য কি নির্ণয় করতে পারছি না।'

স্বামীজী খুব স্নেহপূর্ণস্বরে বলছেন ঃ 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মতো অবস্থা ছিল, তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমিই বা কিরকম করেছিলে, বল দেখি?'

যুবকটি বলতে লাগলো ঃ "মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামে একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন। তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আমিও সেইমতো দিনকতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলাম। কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, 'দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে।' আমি দিনকতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম। কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হলো না। আমি মহাশয়, এখনো একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?"

স্বামীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলতে লাগলেন ঃ 'বাপু, আমার কথা যদি শোনো, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির

কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ওষুধ, পথ্য জোগাড় করে দিলে এবং যত্নের সঙ্গে সেবা শুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না—তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হলে, এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।'

যুবকটি বললো ঃ 'আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?'

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সঙ্গে স্নেহের সুরে, সহানুভূতির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। তার এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হলেন বোধ হলো। তিনি বলে উঠলেন ঃ 'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে, এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন করে রোগীর সেবা কোনওকালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।' যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না।

আর একদিন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রণেতা মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মাস্টারমশায় বলছেন ঃ 'দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-সব মায়ার বন্ধনে লিপ্ত থাকা লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?' স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দিলেন ঃ 'মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?' মাস্টারমশায় চুপ করে রইলেন।

আমি বুঝলাম, মাস্টারমশায় দয়া, সেবা, পরোপকার ইত্যাদি ছেড়ে সকল প্রকার অধিকারীর জন্যই জপতপ, ধ্যানধারণা বা ভক্তির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মতে মুক্তিলাভের জন্য ঐগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার অধিকারীর পক্ষে যেমন একান্ত আবশ্যক, এমন অনেক অধিকারী আছে, যাদের পক্ষে আবার পরোপকার, দান, সেবা ইত্যাদির সেই রকমই প্রয়োজন। একটিকে উড়িয়ে দিতে গেলে অন্যটিকেও উড়িয়ে দিতে হয়, একটিকে নিলে অন্যটিকে না নিয়ে উপায় নেই। ঐ রকম প্রত্যুত্তরে বেশ হৃদয়ঙ্গম হলো, মাস্টারমশায়

দয়া-সেবাদিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে ধ্যান-ভজনাদিকে রেখে সঙ্কীর্ণভাবের পোষকতা করছিলেন। স্বামীজীর উদার হৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি যেন তা সহ্য করতে পারলো না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্যন্ত মায়ার অন্তর্গত বলে অদ্ভুত যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত করলেন এবং দয়া-সেবাদির সঙ্গে তাকে একশ্রেণিভুক্ত করে কর্মযোগের পথিককে পর্যন্ত আশ্রয় দিলেন।

টমাস আ কেম্পিসের 'Imitation of Christ'-এর প্রসঙ্গ উঠলো। আমরা অনেকেই জানি, স্বামীজী সংসার ত্যাগ করার কিছু আগে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করতেন এবং বরানগর মঠে অবস্থানকালে তাঁর গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সর্বদা আলোচনা করতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এমন অনুরাগী ছিলেন যে, তখনকার 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে তার একটি ভূমিকা লিখে 'ঈশানুসরণ' নামে ধারাবাহিক অনুবাদও আরম্ভ করেছিলেন। ভূমিকাটি পড়লেই স্বামীজী ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে কিরকম গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, বোঝা যায়। বাস্তবিক, বইটিতে বিবেক, বৈরাগ্য, দীনতা, দাস্যভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে এত অসংখ্য জ্বলন্ত উপদেশ আছে যে, যিনিই তা পাঠ করবেন, তাঁর হৃদয়ে ঐ-ভাব কিছু না কিছু জাগবেই জাগবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বোধ হয় ঐ গ্রন্থের উপর স্বামীজীর এখন কিরকম ভাব জানার জন্য তার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তার প্রসঙ্গ তুলে বললেন ঃ 'নিজেকে এই রকম একান্ত হীন ভাবতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে সম্ভবপর হবে?' স্বামীজী শুনে বলতে লাগলেন ঃ 'আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়!' তাঁর এই প্রত্যুত্তরে বুঝলাম ঐ গ্রন্থে লিখিত প্রাথমিক সাধন-সোপান অতিক্রম করে স্বামীজী সাধারণরাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে তখন উপনীত হয়েছেন!

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারতো না; তার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব প্রচারের চেষ্টা করতেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাইপো শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুরা যাঁকে 'রামলাল-দাদা' বলে ডাকেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন ও নিজে পায়চারি করতে লাগলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাতে

একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনি বসুন, আপনি বসুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনওমতেই ছাড়বার পাত্র নন; অনেক বলে-কয়ে দাদাকে চেয়ারে বসালেন এবং স্বয়ং বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।' দেখলাম এত ঐশ্বর্য, এত মান পেয়েও স্বামীজীর মনে এতটুকু অভিমানের উদয় হয়নি। আরও বুঝলাম—গুরুভক্তি এইভাবেই করতে হয়।

অনেকগুলি ছাত্র এসেছে। স্বামীজী একখানা চেয়ারে ফাঁকায় বসে আছেন। সকলেই তাঁর কাছে বসে তাঁর দুটো কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ সেখানে আর কোনও আসন নেই যাতে ছেলেদের বসতে বলা যায়। কাজেই তাদের মাটিতে বসতে হলো। স্বামীজীর বোধ হয় মনে হচ্ছিল তাদের কোনও আসন দিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আবার বুঝি তাঁর মনে অন্য ভাবের উদয় হলো। তিনি বলে উঠলেন, 'তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভালো।'

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন নিয়ে গেছি। চণ্ডীবাবু হিন্দু বয়েজ স্কুল (Hindu Boys' School) নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী। সেখানে ইংরেজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। তিনি আগে থেকেই খুব ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পড়ে তাঁর ওপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠেন। আগে সময়ে সময়ে ধর্মসাধনার জন্য ব্যাকুল হয়ে সংসার ছাড়ারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। দিনকতক শখের থিয়েটারে অভিনয় এবং এক-আধখানা নাটকও রচনা করেছিলেন। তিনি একটু ভাবপ্রবণ ধাতের লোক ছিলেন। বিখ্যাত ডেমোক্রাট [গণতন্ত্রবাদী] এডওয়ার্ড কারপেন্টার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করার সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন এবং তাঁর একখানি ছবি ও সেই আলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কারপেন্টার তাঁর 'Adam's peak to Elephanta' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছিলেন।

চণ্ডীবাবু এসে স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, কিরকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?' স্বামীজী বললেন ঃ 'যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিয়েছিলেন।'

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কাম দমনের বিশেষ সহায়তা হয়?'

স্বামীজী বললেন ঃ 'একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি

প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোনও উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি জানো—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকোতে অনেক দিন লাগে।'

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে চণ্ডীবাবু স্বামীজীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। স্বামীজীও অতি সরলভাবে সব কথা বুঝিয়ে উত্তর দিতে লাগলেন। চণ্ডীবাবু ধর্মসাধনার জন্য অকপটভাবে চেষ্টা করতেন, কিন্তু গৃহী বলে সব সময় মনের মতো সাধনা করতে পারতেন না; বিশেষত ব্রহ্মচর্য ধর্মসাধনে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে দৃঢ় ধারণা থাকলেও কার্যকালে সম্পূর্ণভাবে তার অনুষ্ঠান করতে পারতেন না। তাছাড়া ছেলেদের নিয়ে সর্বদা অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকায়, ধর্মসাধনা ও সৎশিক্ষার অভাবে এবং কুসঙ্গের প্রভাবে অতি অল্প বয়স থেকেই তাদের ব্রহ্মচর্য কিভাবে নষ্ট হয়, তা বিলক্ষণ জানতেন এবং কিভাবে তা তাদের ভিতর পুনঃপ্রবর্তিত করা যেতে পারে, সে বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করতেন। কিন্তু 'স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ?' সুতরাং কোনওভাবে নিজের ও পরের ভিতর ব্রহ্মচর্যভাব প্রবেশ করাতে অসমর্থ হয়ে সময় সময় বড় কাতর হতেন। এখন পরম ব্রহ্মচারী স্বামীজীর অকপট উপদেশাবলী ও ওজস্বিনী বাণী শুনে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, এই মহাপুরুষ একবার মনে করলে আমাদের ও বালকদের ভিতর সেই প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্যভাব নিশ্চয়ই উদ্দীপিত করে দিতে পারেন। আগেই বলেছি, ইনি একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ ঐভাবে উত্তেজিত হয়ে ইংরেজিতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'Oh Great Teacher, tear up this evil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust' অর্থাৎ 'হে আচার্যবর! যে কপটতার আবরণে আমাদের যথার্থ স্বভাব গোপন করে আমরা অন্যের কাছে শিষ্ট, শান্ত বা সভ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি, তা আপনার দিব্যশক্তিবলে ছিন্ন করে ফেলুন এবং লোকের ভিতর যে ঘোর কাম-প্রবৃত্তি রয়েছে, যাতে তা সমূলে উৎপাটিত হতে পারে—সেই শিক্ষা দিন।'

স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করলেন। পরে Edward carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠলো। স্বামীজী বললেন ঃ 'লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist, Democrat প্রভৃতি আসতেন।

তাঁরা বেদান্ত-ধর্মে নিজের নিজের মতের সমর্থন পেয়ে বেদান্তের ওপর খুব আকৃষ্ট হতেন।'

স্বামীজী কার্পেনটার সাহেবের 'Adam's peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়েছিলেন। এইবার সেই বইতে ছাপা চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁর মনে পড়লো। বললেন, 'আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।' আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠলেন। উঠবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'চণ্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?' চণ্ডীবাবু বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম বুঝতে পারেননি। স্বামীজী যখন বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করছেন, তখন অগ্রসর হয়ে বললেন, 'সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?' স্বামীজী বললেন, 'চেহারা দেখতে ভালো, এমন ছেলে চাচ্ছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতির কতকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।'

আর একদিন গিয়ে দেখি, স্বামীজী ইতস্তত বেড়াচ্ছেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ['স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা] স্বামীজীর সঙ্গে খুব পরিচিতভাবে আলাপ করছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হলো। প্রশ্নটি এই ঃ অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধপুরুষে পার্থক্য কি? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর কাছে ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা শরৎবাবুর পেছন পেছন স্বামীজীর কাছে গিয়ে তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তা শুনতে লাগলাম। স্বামীজী ঐ প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে বললেন ঃ 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত। তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হলো না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান—কত সাধন-ভজন করেছি; কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর এই কথা শুনে তাঁর হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভেবে বিস্মিত হতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, ইনি কি নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে

অবতারপুরুষের লক্ষণ বোঝালেন? ইনিও কি একজন অবতার? আরও মনে হলো—স্বামীজী এখন মুক্ত হয়েছেন বলেই বোধ হয় ওঁর মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নেই।

আর একদিন আমি ও খগেন [স্বামী বিমলানন্দ] সন্ধ্যার পর গেছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহনবাবু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য বললেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' হরমোহনবাবুর কথার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ সত্য হলেও, দ্বিতীয় অংশটি কিছুটা অতিরঞ্জিত ছিল। কারণ, আমরা 'গীতা'টিই তখন কিছুটা পড়েছিলাম। বেদান্তের ছোটখাট কয়েকখানা বই ও দু-একখানা উপনিষদের বাংলা অনুবাদ একটু-আধটু দেখা ছাড়া ঐসব শাস্ত্র মূল সংস্কৃতে ভাষ্যাদির সাহায্যে পড়িনি। যা হোক, স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনেই বলে উঠলেন, 'উপনিষদ্ কিছু পড়েছ?' আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।' স্বামীজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ উপনিষদ্ পড়েছ?' আমি মনের ভিতর হাতড়িয়ে, আর কিছু না পেয়ে, বলে ফেললাম, 'কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।' স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, কঠটাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand কবিত্বপূর্ণ।'

কি সর্বনাশ! স্বামীজী বুঝি মনে করেছেন, কঠ উপনিষদ্ আমি কণ্ঠস্থ করেছি; আমাকে তা থেকে খানিকটা আবৃত্তি করতে বলছেন। অথচ কঠ উপনিষদ্-এর সংস্কৃতটা একটু-আধটু দেখলেও কখনো অর্থ বুঝে পড়ার বা মুখস্থ করার চেষ্টা করিনি। বড়ই ফাঁপরে পড়লাম। কি করি! হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। কয়েকবছর ধরেই রোজ নিয়ম করে কিছু কিছু গীতা পাঠ করতাম। তার ফলে গীতার অধিকাংশই আমার কণ্ঠস্থ ছিল। ভাবলাম, যা হোক কয়েকটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি না করলে আর স্বামীজীর কাছে মুখ দেখাবার জো নেই। সুতরাং বলে ফেললাম ঃ 'কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।' স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, তাই বল' তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগের 'স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' থেকে আরম্ভ করে অর্জুনের সমস্ত স্তবটা আবৃত্তি করলাম।

শুনে স্বামীজী উৎসাহ দেওয়ার জন্য 'বেশ, বেশ' বলতে লাগলেন। এর পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর দর্শনে গেছি। রাজেনকে বলেছি, 'ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার কাছে উপনিষদ্ কিছু থাকে তো পকেটে করে নিয়ে চলো। যদি কালকের মতো উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।'

রাজেনের কাছে একখানি প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী-র করা [ঈশ-কেন-কঠাদি-উপনিষদ্] বঙ্গানুবাদের পকেট এডিশন ছিল। সেটি পকেটে করে নিয়ে যাওয়া হলো। আজ অপরাহ্ণে একঘর লোক বসেছিলেন; যা ভেবেছিলাম, তাই হলো। আজও, কিভাবে ঠিক স্মরণে নেই—কঠ উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠলো। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে ঐ উপনিষদের গোড়া থেকে পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঠের মাঝখানে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যেতেও সাহসী হয়েছিলেন—বলতে লাগলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর—স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হতে লাগলো, তখন সেইখানটা বেশি না পড়ে কিছু কিছু ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বরের জায়গাটা পড়তে বললেন।

নচিকেতা বললেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কি না, তারপর নচিকেতাকে যমের প্রলোভন দেখানো ও নচিকেতার দৃঢ়তার সঙ্গে সেসব প্রত্যাখ্যান। এইসব খানিকটা পড়া হলে স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় নচিকেতার চরিত্রের প্রশংসা করে কত কি বললেন। কিন্তু দুর্বল স্মৃতি থেকে সেদিনের সেসব কথার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে।

কিন্তু এই দু-দিনের উপনিষদ্ প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিছুটা আমার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছি এবং এখনো করছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর, লয় ও তেজস্বিতার সঙ্গে পড়া উপনিষদের এক-একটি মন্ত্র যেন এখনো দিব্য কানে শুনতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হয়ে আত্মচর্চা ভুলে থাকি, তখনই শুনতে পাই তাঁর সেই সুপরিচিত কিন্নরকণ্ঠে উচ্চারিত উপনিষদের বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা—'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥' (মুণ্ডক, ২/২/৫)—'সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।'

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হয়ে বিদ্যুল্লতা চমকাতে থাকে, তখন যেন শুনতে পাই—স্বামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছেন ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ —(কঠ, ২/২/১৫)

—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নয়, এইসব বিদ্যুৎ-ও সেখানে প্রকাশ পায় না; এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকায় তাঁর পশ্চাৎ সবকিছু দীপ্তিমান হচ্ছে—তাঁরই দীপ্তিতে এই সবকিছু প্রকাশিত হচ্ছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করে হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন যেন শুনতে পাই, স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করছেন ঃ

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।...
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ —(শ্বেতাশ্ব, ২/৫,৩/৮)

—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শোনো। আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি, যিনি আদিত্যের মতো জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞান-অন্ধকারের অতীত। তাঁকে জানলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে কারণ মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নেই।...

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে পাঁচ দিন হলো বাড়ি ছেড়ে মঠে রয়েছি। পুরাতন সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে এসে পড়লেন—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হলো স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন, 'এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন। তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভালো হয়।'

স্বামীজী তাঁর অভিপ্রায়ের অনুমোদন করে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—একটা নিয়ম করা ভালো বইকি। ডাক সকলকে।' সকলে এসে বড় ঘরটিতে জমা হলেন। তখন স্বামীজী বললেন, 'একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।' তখন এ ওকে সামনে ঠেলে দিতে লাগলো—কেউ এগোয় না। শেষে আমাকে ঠেলে

এগিয়ে দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার ওপর সাধারণত একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করে ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—ওতে মানযশের ইচ্ছা আসবে; যারা ভগবানের আদিষ্ট হয়ে প্রচারকার্যাদি করবে, তাদের পক্ষে আবশ্যক হলেও সাধকদের পক্ষে ওর প্রয়োজন তো নেই-ই, বরং হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাই হোক, আগেই বলেছি, আমি কতকটা forward ও বেপরোয়া—আমি এগিয়ে গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি থাকবে?' (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে সেখানে থাকবো, অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াতে এসেছি, আবার চলে যাবো?) সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করে নিয়ে বসলাম। নিয়মগুলি বলার আগে স্বামীজী বলতে লাগলেন ঃ 'দেখ, এইসব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে; সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।'

তারপর নিয়মগুলি লেখানো হতে লাগলো। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলে একজন পাঠকের কাছে কোনও নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনতে হবে, এই ব্যবস্থা হলো। প্রতিদিন সকালে ও বিকালে একটু একটু করে 'ডেলসার্ট' ব্যায়াম করতে হবে, তাও নির্দিষ্ট হলো। মাদকদ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হলো। শেষে সব লেখা হয়ে গেলে স্বামীজী বললেন ঃ 'দেখ, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভালো করে কপি করে রাখ্—দেখিস্, যদি কোনও নিয়মটা নেতিবাচক ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে ইতিবাচক করে দিবি।'

এই শেষের আদেশটি পালন করতে আমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তার দোষ দেখানো, তাকে 'তুমি অমুক করো না, তমুক করো না'—এইরকম নেতিবাচক উপদেশ দিলে তার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু তাকে যদি একটা আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই তার সহজে উন্নতি হতে পারে,

দোষগুলি আপনা আপনি চলে যায়। এই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে ইতিবাচক করে দেওয়ার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ-কথাই উদিত হতে লাগলো। কিন্তু তাঁর আদেশ মতো যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য থেকে 'না' কথাটিকে বাদ দিতে চেষ্টা করতে লাগলাম, তখন দেখলাম, আর কোনও নিয়মে কোনও গোল নেই, কিন্তু মাদকদ্রব্য-সম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথমে এইভাবে লেখা হয়েছিল—'মঠে তামাক ব্যতীত কেউ অন্য কোনও মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারবেন না।' যখন আমরা ওর মধ্যের 'না'—টিকে বাদ দেবার চেষ্টা করলাম, তখন প্রথমে দাঁড়ালো—'সকলে তামাক খাবেন।' কিন্তু ঐ রকম বাক্যের দ্বারা সকলের ওপর (যে না খায়, তার ওপরও) তামাক খাবার বিধি এসে পড়ছে দেখে, শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে নিয়মটি এই রকম দাঁড়ালো—'মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করতে পারবেন।' যাই হোক, এখন মনে হচ্ছে, আমরা একটা উদ্ভট আপস করেছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর এলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে এও সত্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই তার উপযোগিতা বাড়ে। আর স্বামীজীরও সেই রকমই অভিপ্রায় ছিল।...

একদিন অপরাহ্নে হল-ঘর লোকে ভর্তি। ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করে বসে আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলছে। তারমধ্যে আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু মশায়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখনো কখনো কংগ্রেসে দাঁড়িয়েও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাঁর এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেউ স্বামীজীর কাছে উল্লেখ করায় স্বামীজী বললেন, 'তা, বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—আত্মা সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা, তা-ই খানিকটা বলো।' বিজয়বাবু নানা ওজর আপত্তি করতে লাগলেন—স্বামীজী এবং আরও অনেকেও তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অন্তত পনেরো মিনিট অনুরোধ উপরোধের পরও যখন কেউ তাঁর সঙ্কোচ ভাঙতে পারলেন না, তখন অগত্যা হার মেনে তাঁদের দৃষ্টি বিজয়বাবু থেকে আমার ওপর পড়লো। আমি মঠে যোগ দেবার আগে কখনো কখনো ধর্মসম্বন্ধে বাংলায় বক্তৃতা করতাম, আর আমাদের এক 'ডিবেটিং ক্লাব' ছিল—তাতে ইংরেজি বলার অভ্যাস করতাম। আমার সম্বন্ধে এইসব বিষয় কেউ উল্লেখ করাতে এবার আমার ওপর নজর পড়লো। আগেই বলেছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া। অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে দু-কান-কাটা। আমি একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-

মৈত্রেয়ী সংবাদ-এর অন্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় থেকে আরম্ভ করে আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে যা মুখে এলো, বলে গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হচ্ছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হচ্ছে, এসব খেয়ালই করলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমার পরে স্বামীজীর কাছে নূতন সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় দশ মিনিট আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বললেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করে বেশ গম্ভীরস্বরে নিজের বক্তব্য বলতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতারও স্বামীজী খুব প্রশংসা করলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কারো দোষ দেখতেন না। যার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখতেন, তাতেই উৎসাহ দিয়ে যাতে তার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তারই চেষ্টা করতেন। কিন্তু হে পাঠক, আপনারা এ কথা থেকে যেন এই ভেবে বসবেন না যে, তিনি সকলকে সব কাজেই প্রশ্রয় দিতেন। কারণ, বহুবার দেখেছি, লোকের বিশেষত অনুগত গুরুভ্রাতা বা শিষ্যদের দোষপ্রদর্শনে তিনি সময়ে সময়ে মহা কঠোর মূর্তি ধারণ করতেন। কিন্তু সেটি আমাদের দোষ সংশোধনের জন্য—আমাদের সাবধান করার জন্য—আমাদের নিরুৎসাহ করার বা আমাদের মতো কেবল পরদোষানুসন্ধানবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়। আর এ রকম উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা কোথায় পাবো? কোথায় পাবো এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যদের লিখতে পারেন, 'I want each one of you my children, to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that is my word.' 'আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যা হতে পারতাম, তার চেয়েও শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শক্তিশালী হতে হবে—হতেই হবে, নইলে চলবে না!'

সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দেওয়া স্বামীজীর জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাগুলি লণ্ডন থেকে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব ছোট ছোট পুস্তিকার আকারে ছাপছেন—মঠেও তার দু-এক কপি পাঠাচ্ছেন। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে তখনো ফেরেননি। আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা-স্বরূপ বক্তৃতাগুলি পড়ছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভালো ইংরেজি জানেন না, কিন্তু তাঁর বিশেষ আগ্রহ, 'নরেন' বেদান্ত সম্বন্ধে বিলাতে কি বলে লোককে মুগ্ধ করেছে, তা শোনেন। তাঁর অনুরোধে আমরা তাঁকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়ে তার অনুবাদ করে শোনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নতুন সন্ন্যাসী ও

ব্রহ্মচারীদের বললেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ কর না।' তখন আমরা অনেকে ঐ pamphlet-গুলির মধ্যে যার যা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করে অনুবাদ আরম্ভ করলাম। ইতোমধ্যে স্বামীজী এসে পড়েছেন। একদিন প্রেমানন্দ স্বামী স্বামীজীকে বললেন ঃ 'এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শোনাও দেখি।' তখন সকলেই নিজের নিজের অনুবাদ এনে কিছু কিছু স্বামীজীকে শোনাল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করলেন—'এই শব্দের এই রকম অনুবাদ হলে ভালো হয়' ইত্যাদি দু-একটি কথাও বললেন।

একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রয়েছি। তিনি হঠাৎ আমায় বললেন ঃ 'রাজযোগটা তর্জমা কর না।' আমার মতো অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এই রকম আদেশ স্বামীজী কেন করলেন? আমি তার বহুদিন আগে থেকে রাজযোগের অভ্যাস করার চেষ্টা করতাম। ঐ যোগের ওপর কিছুদিন এত অনুরাগ হয়েছিল যে, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্মযোগকে এক রকম অবজ্ঞার চোখেই দেখতাম। মনে ভাবতাম মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁরা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়ে ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তা নন, ঐ-যোগ সম্বন্ধে আমার যেসব ধারণা ছিল, সেসব তো তিনি ভালোভাবেই বুঝিয়েছেন, তাছাড়াও ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সঙ্গে রাজযোগের সম্বন্ধও তিনি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার এটি অন্যতম কারণ হয়েছিল। রাজযোগের অনুবাদ করলে ঐ গ্রন্থের উত্তম চর্চা হবে এবং তাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হবে, সেই উদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কাজে প্রবৃত্ত করলেন? অথবা বাংলা দেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখে সর্বসাধারণের ভিতর ঐ যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করার জন্যই তাঁর বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলেছেন, 'বাংলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব—যা আছে, তা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।'

যাই হোক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভেবে রাজযোগের অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

(বেদান্ত কেশরী, ডিসেম্বর ১৯২২ ও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯২৩)

কামাখ্যা নাথ মিত্র

আমি যে বছর বি. এ. পাশ করি সেই ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দেই জগদ্বরেণ্য, যুগান্তকারী যতী স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শনের দুর্লভ সুযোগ পাই। তিনি তখন কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুপরিচিত ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে ছিলেন। স্বামীজীর বাণীর গুরুত্ব তখন ঠিক ঠিক না বুঝলেও সেই বাণীর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। অল্প কথায় আমার সেই আগ্রহের ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে অনেক প্রশ্ন। কেন জানি না, ধর্মের প্রতি অদ্ভুত একটা টান অনুভব করতাম। এখন দেশবাসীর মন জুড়ে যেমন রাজনীতি, আমাদের শৈশবে তেমনি ধর্মের প্রতিই ছিল মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। দেশজুড়ে তখন বিভিন্ন ধর্ম-আন্দোলন ও বিতর্কের বান ডেকেছে। নিরন্তর চলছে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার খেলা। একদিকে তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার; দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের সহানুভূতিই ঐ ধর্মের প্রতি। অন্যদিকে যাঁরা গোঁড়া বা সনাতনপন্থী তাঁরা প্রাণপণে হিন্দুধর্মের মনগড়া বৈজ্ঞানিক তথা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছেন। এ ছাড়াও ছিলেন থিয়সফিস্টরা। তাঁরা মহাত্মা, ভূত-প্রেত, এককথায় অলৌকিক কাণ্ডকারখানা নিয়ে খুব মাতামাতি করতেন। দেশের বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষও তখন ওঁদের দিকে ঝুঁকেছেন। তার দুটি কারণ। প্রথমত ব্রাহ্মদের পাশ্চাত্য ঘেঁষা দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পছন্দ করতেন না। দ্বিতীয়ত আমেরিকার কর্নেল অলকট এবং ইংল্যাণ্ডের মিসেস অ্যানি বেসান্ত তখন যেভাবে হিন্দুদের সবকিছুর নির্বিচার প্রশস্তি শুরু করেছেন তাতেও এই নব্যশিক্ষিতের দল একেবারে গদগদ! অবশ্য এঁরা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত একদল যুবক ছিলেন যাঁরা নিজেদের স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী, যুক্তিবাদী অথবা অজ্ঞেয়বাদী বলে দাবি করতেন। তাঁরা কথায় কথায় মিল, কোঁতে, স্পেন্সার, হাক্সলে এবং হেকেলের উদ্ধৃতি দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করতেন। তাঁদের মত ছিল সব ধর্মই মিথ্যা।

চিন্তাজগতের এই রকম একটি পরিমণ্ডলে আমার কৈশোর এবং যৌবন কেটেছে। বড়রা আলোচনা করতেন, শুনতাম। মাঝে মাঝে সেই আলোচনায়

আমিও যোগ দিয়েছি। কিন্তু ধর্ম তখনো আমার কাছে প্রাণের বস্তু হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধির অনুশীলনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।

যদিও রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম, তবুও দুটি জিনিসের প্রভাব আমার ওপর খুব বেশি পড়েছিল। এক—ব্রাহ্ম সমাজের। দুই—আমার এক নিকট আত্মীয়ের, যিনি মনে প্রাণে অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল বটে, কিন্তু ওঁদের ধর্মতত্ত্ব আমি মানতে পারতাম না। এককথায়, একদিকে ব্রাহ্মধর্ম এবং অন্যদিকে অজ্ঞেয়বাদ—এই দুয়ের দোলায় আমি তখন দোদুল্যমান।

এই মানসিকতা নিয়েই আমি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকলাম। যতদূর মনে পড়ে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময়েই প্রথম আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনি। কিন্তু আশ্চর্য, কোনও দেশবাসীর মুখ থেকে নয়, একজন বিদেশীর লেখা পড়েই আমি তাঁর কথা জানলাম। সেই বিদেশী আর কেউ নন—অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার স্বয়ং। 'দ্য নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' (The Nineteenth Century)-তে তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। একটি 'Esoteric Buddhism'—যাতে তিনি মাদাম ব্ল্যাভ্যাটস্কি এবং তাঁর থিয়সফির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন; অন্যটি 'A Real Mahatman'। ম্যাক্সমূলার বর্ণিত এই প্রকৃত মহাত্মা অন্য কেউ নন, তিনি আমাদের ভগবান রামকৃষ্ণ। লেখাদুটি পড়ার পর আমার সামনে যেন নতুন এক দিগন্ত খুলে গেল। এক নতুন আলোর সন্ধান পেলাম আমি। এবং এই এতসব কিছু নীরবে ঘটে গেল আমার মফঃস্বল শহরে থাকার সময়েই।

এই ঘটনার প্রায় এক বছর বাদে শিকাগোর বিখ্যাত ধর্মমহাসভা এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা কাগজে পড়লাম। কিন্তু কে এই বিবেকানন্দ? অল্পদিন পরেই জানতে পারলাম তিনি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যাঁকে প্রকৃত মহাত্মা বলেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রধান শিষ্য। তারপর থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর বাণী সম্বন্ধে সবকিছু জানার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। তাই তাঁকে ঘরে-ফেরা বিজয়ী বীরের উপযুক্ত সংবর্ধনা জানাতে সারা কলকাতা শহর যখন ভেঙ্গে পড়েছে, আমি তখন কলকাতার বাইরে। যাই হোক, পরে সেই অভিনন্দনের বর্ণাঢ্য বিবরণ পড়ে বুঝলাম, ভারতবর্ষের মাটিতে এর আগে কারো ভাগ্যে ঐ দুর্লভ সম্মান জোটেনি।

এর পর থেকে ভারতবর্ষের যেখানে যা-কিছু স্বামীজী বলেছেন তার সমস্ত

বিবরণ আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। পড়তে পড়তে মনে হতো—ভারতাত্মাই যেন তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলছেন। কথার ভিতরে এত তেজ, এত শক্তি যে থাকতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত। কেশবচন্দ্র সেনের বেশ কিছু বক্তৃতা আমি আগে পড়েছিলাম। তাঁর বাগ্মিতা, বলার ভঙ্গি এবং সবকিছুর মধ্যে যে একটি আধ্যাত্মিক আবেদন—সেসব আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা দেখলাম সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের জিনিস। কী বক্তব্যের গভীরতায়, কী দৃষ্টিভঙ্গির চমৎকারিত্বে, কী দিব্য অনুপ্রেরণায়, কী বিশ্লেষণ নৈপুণ্যে, এ-যেন সম্পূর্ণ অভিনব বাণীমন্ত্র যা জাতীয় জীবনের মর্মকেন্দ্রকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেও বিশ্বজনীন। তাঁর বাণীর মধ্যে হিন্দুধর্মের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়েছে, অথচ গোঁড়া সনাতনপন্থীদের হিন্দুধর্মের সঙ্গে, কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া ছুঁৎমার্গীর হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার কতই না তফাৎ! আমি তো হতবাক। স্বামীজীর যে-দুটি বক্তৃতা আমাকে সব চাইতে বেশি নাড়া দিয়েছিল তার একটি হলো কলকাতার টাউন হলে দেওয়া এবং অন্যটি লাহোরে। সেটি ছিল বেদান্তের ওপর। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি যখন পড়ি তখন আমি কলকাতায় বি. এ. ক্লাসের ছাত্র।

স্বভাবতই স্বামীজীকে দর্শন করার আগ্রহে তখন আমি অধীর—একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আগেই বলেছি, সেই সুযোগ এলো ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে। স্বামীজী তখন কলকাতায়, বলরাম বসুর বাড়িতে আছেন। আমার এক সহপাঠী নরেন্দ্রকুমার বোসের সঙ্গে একদিন তাঁকে দর্শন করতে গেলাম।

বলরামবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি বড় হল ঘরটিতে লোক একেবারে উপচে পড়ছে। কলেজের ছাত্ররাই সংখ্যায় বেশি। ফরাস-পাতা মেঝেতে সবাই বাবু-হয়ে বসে আছেন। মাঝখানে একখানি আসন। সেখানে স্বামীজী এসে বসবেন। কোনওরকমে ঘরে ঢুকে নিজের জন্য একটু জায়গা করে নিলাম। ঘরে কোনও শব্দটি নেই। সকলেই চুপচাপ হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে স্বামীজীর প্রতীক্ষা করছেন। মিনিট কয়েক পরেই স্বামীজী এলেন। দেখলাম, তাঁর হাঁটাচলা একেবারে সিংহের মতো। মহিমাব্যঞ্জক রাজকীয় চেহারা। মল্লবীরের মতো মজবুত তাঁর দেহের বাঁধুনি। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, খালি পা। মাথা ও মুখ পরিষ্কার করে কামানো—সব মিলিয়ে এক চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে দেখলেই মনে হয় তিনি সকলকে আদেশ করার জন্যই জন্মেছেন। আসনে বসেই তিনি আমাদের সকলের দিকে একবার তাকালেন। তাঁর সপ্রতিভ বড় বড় চোখদুটি থেকে স্ফুরিত হচ্ছিল দিব্য তেজ।

স্বামীজী বাংলায় বলতে আরম্ভ করলেন; মধ্যে মধ্যে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করছিলেন। তিনি বলে চলেছেন আর আমরা নিবিষ্টচিত্তে শুনছি। তাঁর মুখের প্রতিটি কথাই যেন এক-একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বলার ভঙ্গিটিও তেমনি উদ্দীপক। সেদিন আমরা প্রত্যেকেই প্রাণে প্রাণে স্পষ্ট অনুভব করলাম—হ্যাঁ, সত্যিই এই মহাপুরুষের দেওয়ার মতো কিছু বাণী আছে। মানুষের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি—যেন জেগে উঠেছি। আমাদের সকলের ভিতর তিনি যেন এক নতুন উদ্দীপনা জাগালেন, সঞ্চার করলেন এক নবীন চেতনার। সন্দেহ ও সংশয়ের যুগে এ-যেন বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের এক অবিশ্বাস্য মূর্তি, যাঁর নিষ্ঠা ও সততা প্রশ্নাতীত, এবং যিনি আধ্যাত্মিক শক্তির এক ঘনীভূত বিগ্রহ! তাঁকে দেখাটাই ছিল এক মস্ত শিক্ষা। তাঁর কথা শোনা মানেই অনুপ্রাণিত হওয়া। স্বভাবতই সেই দিনটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। সে স্মৃতি কি কখনো ভোলার?

তিনি আমাদের কি বলেছিলেন? বলেছিলেন শক্তিমান হতে, আত্মবিশ্বাসী হতে, ত্যাগ ও সেবার আদর্শে নিজেদের উৎসর্গ করতে। তাঁর উপদেশের মূল কথাই ছিল শক্তি। 'নেতিবাচক শিক্ষা'-কে তিনি অজস্রবার ধিক্কার দিয়ে সত্যিকারের মানুষ-তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা পরম উৎসাহের সঙ্গে বলেছিলেন। দেশের চরম অবনতি, সাধারণ লোকের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার এক মর্মস্পর্শী ছবি সেদিন তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। আহা দরিদ্র, অধঃপতিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর কী গভীর বেদনা! তাঁর সেই সবেদন অনুভবের, লক্ষ ভাগের এক ভাগও যদি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকতো, তাহলে দেশের চেহারাটা এই মুহূর্তেই পাল্টে যেত। হিন্দুধর্মের মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি সগর্বে বললেন ঃ 'হিন্দুধর্মের মহত্তম চিন্তার শক্তি দিয়ে আমি জগৎ জয় করতে চাই। হিন্দুরা উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক—এই আমি চাই।' তিনি যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করছিলেন তখন আমি তাঁর ভিতর প্রত্যক্ষ করলাম আধ্যাত্মিক জগতের নেপোলিয়নকে। সন্ন্যাসীর গৈরিকের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম বীর যোদ্ধার হৃদয়স্পন্দন। না, তাঁর মধ্যে মিনমিনে হিন্দুর কোনও লক্ষণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, শৌর্যে বীর্যে মহীয়ান তাঁর মতো বলিষ্ঠ হিন্দু আমি আমার জীবনে আর দুটি দেখিনি। আলেকজাণ্ডার, সীজার এবং স্বামী বিবেকানন্দ একই ধাতুতে গড়া—প্রভেদ যা কিছু সে শুধু তাঁদের কর্মক্ষেত্রে।

তাঁর কিছু কথা আজও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন ঃ "তোমাদের পেশীগুলি লোহার মতো শক্ত হোক, আর স্নায়ুগুলি ইস্পাতের। ভ্যাদভ্যাদে জেলি মাছের মতো দীর্ঘায়ু হয়ে বাঁচার চেয়ে প্রাণপ্রাচুর্যেভরা এক মুহূর্তের কর্মময় জীবনও শ্রেয়। কাপুরুষের দল নিত্যই মরে। একজন সৎ নিরীশ্বরবাদী ভণ্ড ঈশ্বরবিশ্বাসীর চেয়ে সহস্রগুণে ভালো। কখনো ঈর্ষা করো না কারণ একমাত্র দাস মনোবৃত্তির জীবেরাই পরশ্রীকাতর হয়। মহত্ত্বই বীরত্ব। 'Virtue' কথাটি এসেছে ল্যাটিন 'Vir' থেকে, যার অর্থ মানুষ। সংস্কৃতে "বীর" শব্দের অর্থও তাই।"

প্রায় দু-ঘণ্টা পর স্বামীজী উঠলেন। তিনি হল-ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরাও যে যার গন্তব্যস্থলে ফিরে গেলাম। বাসায় ফিরলাম বটে, কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন তখনো তাঁর কথাই শুনছি। মনে কেবল তাঁরই চিন্তার ফুট উঠছে। যেদিকে তাকাই সেদিকেই যেন দেখি স্বামীজীর ওজস্বী মূর্তি।

ফলত তাঁর দর্শন পাবার জন্য মনটা আবার ছটফট করতে লাগলো। থাকতে না পেরে পরদিনই ছুটে গেলাম বলরামবাবুর বাড়ি। সেদিন বেশি ভিড় ছিল না। স্বামীজী বারান্দায় একটি আসনে বসেছিলেন। চারপাশে তাঁর গুরুভাইরা। তাঁদেরই একজন শাঙ্করভাষ্য-সহ ব্রহ্মসূত্র পাঠ করছিলেন এবং স্বামীজী মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছিলেন। সেদিনের পরিবেশ একেবারেই স্বতন্ত্র। শান্ত ভাবগম্ভীর পরিমণ্ডল।

ব্রহ্মসূত্র পড়া শেষ হলে স্বামীজীর এক গুরুভাই প্রেতলোকের প্রসঙ্গ তুললেন এবং থিয়সফিস্টদের একটি বই থেকে কিছু কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী তাঁকে এমন প্রচণ্ড ধমক দিলেন যে তাঁর সমস্ত উৎসাহ মুহূর্তে নিভে গেল। দেখলাম, স্বামীজী ভূত প্রেত নিয়ে মাতামাতি দু-চক্ষে দেখতে পারেন না। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক তো নেই-ই, বরং এগুলি মানুষকে দুর্বল, পঙ্গু করে দেয়।

এরপর হালকা কিছু কথাবার্তা শুরু হলে স্বামীজী প্রাণখুলে হাসতে লাগলেন এবং শিশুর মতো ঠাট্টা তামাসায় মেতে গেলেন। তখন তাঁর সম্পূর্ণ অন্য মেজাজ, ভিন্ন মূর্তি! মনে মনে বললাম ঃ গতকাল যে বজ্রগম্ভীর স্বামীজীকে দেখেছিলাম—তিনি আর ইনি কি একই ব্যক্তি?

এই ঘটনার প্রায় বছরখানেক পরে স্বামীজীকে আমি আরও একবার দেখি—কলকাতার স্টার থিয়েটারে। স্বামীজী সেদিন মঞ্চে, বাগ্মীর ভূমিকায়। ভগিনী

নিবেদিতার সঙ্গে কলকাতাবাসীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেদিন ঐ বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মঞ্চেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বসে ছিলেন—সকলের নাম আজ আর আমার মনে নেই। তবে এটুকু স্মরণে আছে তাঁদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এবং স্যার আনন্দ চার্লু ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন যেন স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছিলেন। পরনে লম্বা, ঢিলেঢালা গৈরিক, আর মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। সংক্ষিপ্ত, পরিচ্ছন্ন একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বামীজী প্রথমে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সমাগত সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও স্বভাবমধুর ভঙ্গিতে কিছু বললেন। তাঁর ভাষণ শেষ হতেই স্বামী বিবেকানন্দ আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বিদেশ নীতি সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। 'Complete Works'-এর মায়াবতী মেমোরিয়াল এডিশনে[১] তাঁর এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছে। পাশ্চাত্যে তিনি কিভাবে ধর্ম প্রচার করতে চান তার একটি কর্মসূচী সেদিন তিনি সকলের সামনে উপস্থিত করলেন। বক্তৃতা তো নয়, যেন বিস্ফোরণ! ঐ রকম রোমাঞ্চকর মন্দ্র-মধুর কণ্ঠস্বর, স্বরগ্রামের অমন বৈচিত্র্যময় বিস্তার এবং ওঠানামা, এমন ঋজু স্বরক্ষেপ যা মাঝে মাঝেই বজ্রের মতো শ্রোতাদের সামনে ফেটে পড়ছিল—অমনটি জীবনে আমি আর শুনিনি এবং কখনো শুনবো বলেও মনে হয় না। সেদিন বলার আবেগে তিনি কখনো বা হাতদুটি আড়াআড়িভাবে বুকের ওপর রেখে বীরবিক্রমে মঞ্চের ওপর পাদচারণা করছিলেন, কখনো বা শ্রোতাদের মুখোমুখি স্থির দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাঁর বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন। দুরন্ত পাহাড়ী নদীর ঢল যেমন ক্ষিপ্র অথচ সহজভাবে নেমে আসে, তেমনি স্বচ্ছন্দ, বেগবান ছিল তাঁর প্রকাশভঙ্গি। তাঁর মুখের কথাগুলি যেন গর্জমান জলপ্রপাতের মতো ফেটে পড়ছিল। 'The New York Herald' যথার্থ মন্তব্য করেছিল 'তিনি এক ঈশ্বরপ্রেরিত বক্তা।' বাস্তবিক, তাঁর চেয়ে আরও বড় মাপের মহিমাব্যঞ্জক, বিস্ময়কর, চৌম্বক ব্যক্তিত্ব কল্পনা করা শক্ত। আমরা তো তাঁর কথা শুনতে শুনতে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। অব্যর্থ তীরের মতো তাঁর প্রতিটি কথাই আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি বলতে এই এতক্ষণ যা বললাম। পরবর্তী কালে তাঁর বাণীর তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করার জন্য আমি তাঁর যাবতীয় বক্তৃতা,

১ ইংরেজি তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪০ এবং বাংলায় বাণী ও রচনার ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৬৯

রচনা, এবং তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যথাসম্ভব পড়েছি। আমাদের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন এবং রাজনৈতিক জীবনের এমন কোনও সমস্যা নেই যা নিয়ে তিনি ভাবেননি বা যার ওপর আলোকপাত করেননি। ভারতবর্ষের প্রায়-নিশ্চল জীবনে এক নতুন শক্তি ও বেগ সঞ্চার করে তাকে সচল করে দিয়ে গেছেন তিনি। আমার নিজের কথা বলতে হলে বলবো, যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন আমার চোখে স্বামীজীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে, 'অ্যাটলাস বা টেনেরিফের' মতো তাঁর ভাব-তনু যেন ক্রমবর্ধমান। স্বামীজীর বাণী মুক্তির বাণী, শক্তির, নির্ভীকতার এবং আত্মবিশ্বাসের বাণী। হিন্দুধর্মের শাশ্বত, সনাতন সত্যকেই তিনি নতুন ভঙ্গিতে, বর্তমান যুগের উপযোগী করে প্রচার করেছেন এবং দেখিয়েছেন ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে তথা সমগ্র বিশ্বে এই সত্যকে কিভাবে রূপায়িত করা যায়। তাঁর চেয়ে মহান কোনও চিন্তানায়ক এবং আচার্যকে আমি দেখিনি যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আদ্যন্ত গঠনমূলক ও ইতিবাচক এবং যিনি সকলকেই অনুপ্রাণিত করতে পারেন। ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ এই শতাব্দীর এমন একজন মহাপ্রাণ ভারতীয়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি স্বামীজীর বাণী, চিন্তা এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত না হয়েছেন। সর্বোপরি বিশ্বের দরবারে ভারতকে শ্রদ্ধার আসনে তিনিই বসিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের বহু মানুষ আজ তাঁর বাণীর মধ্যে ইহজীবনের শান্তি ও পরকালের সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। একথা সত্য, এই মুহূর্তে দেশের মানুষ রাজনীতি নিয়ে মেতেছে। কিন্তু যাঁদের একটু দূরদৃষ্টি আছে, যাঁরা মননশীল, তাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে একমত যে, আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সব কাজের ভিত্তি হওয়া উচিত। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের ভবিষ্যৎ চেহারাটা ঠিক কি দাঁড়াবে তা বলা কঠিন; তাবৎ বিশ্বের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কোনওরকম ভবিষ্যদ্‌বাণী করা খুব শক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি নিশ্চিত—মানবজাতির ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরকালই থেকে যাবে। তাঁর পুণ্য প্রভাব দিনের পর দিন জগতে বিস্তারিত হোক—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯৩০)

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথম দর্শন

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের (?) কথা। স্বামীজী কলকাতায় এসেছেন শুনে একদিন বাগবাজারে শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর বাড়ি গেলাম। সাধ—তাঁকে একটিবার দর্শন করি। স্বামীজী তখন বলরামবাবুর বাড়িতেই আছেন। বাড়ির দোতলায়, রাস্তার দিকে বড় হলে বেশ কয়েকজন স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন পাওয়ার আশায় বসে আছেন। স্বামীজী তখন পাশের ঘরে। আমি তাই হলঘরের এক কোণে কার্পেট-মোড়া মেঝের ওপর বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে দেখলাম মিস নোবল (ভগিনী নিবেদিতা) একটি দরজা দিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল হাল্কা হলদে-রঙের পুরো-হাতা আলখাল্লা, পা পর্যন্ত লম্বা। গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। খালি পায়ে ঘরে ঢুকতেই মনে হলো যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি। স্বামীজী যে-ঘরে তখন বিশ্রাম করছিলেন সেই ঘরের দরজার দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিবেদিতা; কিন্তু ঘরে না ঢুকে চৌকাঠের কাছেই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসলেন তিনি। তারপর ঐভাবেই নত হয়ে জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে ফের কৃতাঞ্জলিপুটে স্থির হয়ে বসে রইলেন—প্রার্থনার সময় আমরা যেমনটি করে থাকি। স্বামীজী কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন এবং নিবেদিতাও এমন বিনম্র মধুরভাবে সে কথার জবাব দিলেন যে মনে হলো তিনি যেন কোনও গির্জায় এসেছেন। কথা শেষ হলে নিবেদিতা ফের আভূমি প্রণতা হলেন এবং যেমন নীরবে এসেছিলেন তেমনিভাবেই ফিরে গেলেন।

সিস্টার নিবেদিতার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু আজ তাঁকে চাক্ষুষ দেখলাম। তাঁর সেই সুডৌল সৌম্য, প্রশান্ত মুখখানি দেখলে কি জানি কেন ম্যাডোনার কথা মনে পড়ে যায়; বোঝা যায় মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ।...

নিবেদিতা চলে যাওয়ার একটু পরেই শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এলেন। সঙ্গে খোল-করতাল হাতে তাঁর জনাকয়েক শিষ্য। তাঁরা অন্য সবার থেকে একটু দূরে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলেন। গোস্বামীজীকে দেখামাত্রই স্বামীজী ঘর থেকে বেরিয়ে হলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাতে সশিষ্য

গোস্বামীজীও উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি স্বামীজীর পদধূলি নেবার জন্য দু-এক পা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু স্বামীজীও এ ব্যাপারে খুব সতর্ক। গোস্বামীজীকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনিও নিচু হয়ে তাঁর পদধূলি নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রণাম নিতে উভয়েরই কুণ্ঠা। ফলে দু-পক্ষই কিছুক্ষণ এভাবে চেষ্টা-চরিত্র চালাবার পর যখন প্রণামপর্ব অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো, তখন স্বামীজীই গোস্বামীজীর হাত ধরে তাঁকে মেঝের মধ্যখানে কার্পেটের ওপর নিজের পাশে বসালেন।

বিজয়কৃষ্ণজী তখন একেবারে ভাবস্থ। দেখে মনে হচ্ছিল ভগবৎ প্রেমে তিনি বিভোর। মিনিট কয়েক পর তাঁর ভাব প্রশমিত হলে স্বামীজী তাঁকে বললেন—আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলুন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কানে যেতেই গোস্বামীজী আবার ভাবাবিষ্ট হলেন। অনেক চেষ্টার পর গদগদ স্বরে শুধু এই কয়েকটি কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ 'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে কৃপা করেছিলেন।' আবেগে তাঁর কণ্ঠ এমন রুদ্ধ হয়ে এল যে তিনি এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর মুখ আরক্তিম। দৃষ্টি ঈশ্বর-প্রসাদে তন্ময়। বেশ কিছুক্ষণ তিনি স্থির হয়ে বসে রইলেন আর তাঁর দুচোখ বেয়ে অঝোরে প্রেমাশ্রু ঝরতে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে গোস্বামীজীর শিষ্যরা আর থাকতে পারলেন না; তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীজী ও গোস্বামীজীকে ঘিরে জোর সঙ্কীর্তন শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর গোস্বামীজী কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু দেখে মনে হলো তখনো তিনি ভাবে রয়েছেন। যাই হোক, তাঁর শিষ্যরা তাঁকে মাঝখানে রেখে খুব সন্তর্পণে হলের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে আমি দূর থেকে স্বামীজীকে প্রণাম করার সুযোগ পেলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়ে আমার অন্তর ভরে উঠলো। এলাহাবাদে সরকারি অফিসের আমি একজন সামান্য কেরানি। আর বিদ্যা, বাগ্মিতার সিংহ-পরাক্রমে যিনি আমেরিকার মতো দেশের মানুষের হৃদয় জয় করে এসেছেন, সেই মহামহিমান্বিত স্বামীজী আজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এর থেকে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! স্বভাবতই আমি কৃতকৃতার্থ হলাম। স্বামীজীর দেশে ফেরার খবর পেয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তাঁকে কলকাতায় দর্শন করতে আসা আমার সার্থক হলো।

আমার বড়দা কলকাতায় থেকে ওকালতি করতেন। সেই সুবাদে বছরে দু-

তিনবার আমি কলকাতায় যাওয়া-আসা করতাম। আর যখনই আসি না কেন, এসেই মঠে যেতাম। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তো বটেই, তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-সন্তানদের খুব কাছে থেকে দেখবার, জানবার লোভও আমি সংবরণ করতে পারতাম না।

শ্রীশ্রীমাকে কয়েকবার দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; কিন্তু কি জানি কেন কখনো তাঁর কাছে দীক্ষার আবেদন জানাইনি। আমার এক ব্রাহ্ম বন্ধু ছিল। তার নাম নরেন্দ্রনাথ বসু। সে এবং তার স্ত্রী দুজনেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেছিল। বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ তো প্রথমবার মায়ের চরণ দর্শন করেই দিব্য আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে। সেই আমাকে এসে জানালো স্বামীজী বলরামবাবুর বাড়িতে আছেন। একরকম তার এই সহৃদয়তার ফলেই আমি প্রথমবার স্বামীজীকে দর্শন করার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হই।

আমি যে যুগে জন্মেছি সে যুগের চিন্তাধারা কেমন ছিল তা আজকালকার ছেলেমেয়েদের বোধগম্য হওয়া শক্ত। সেই মানসিকতা, সেই পরিবেশ আজকের প্রজন্মের কাছে অর্থহীন, অবাস্তব বলে মনে হলেও তা একসময় সত্যিই ছিল। আমার নিজের কথাই বলি। ব্রাহ্মণদের চিরাচরিত সংস্কার দ্বারা তখন আমি এতটাই প্রভাবিত ছিলাম যে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ পর্যন্ত করতাম না। আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেদিন স্বামীজীর মতো সন্ন্যাসীও আমার কাছে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী এমন স্নেহের সঙ্গে দুটি-একটি কথা বললেন যে, মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ!

দ্বিতীয় দর্শন

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন সকালে বেলুড় মঠে গেছি। দেখি, রান্নাঘরের সামনে খোলা উঠানে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় গেরুয়া পশমী টুপি, পরনে উলের ড্রেসিং গাউন—সাদার ওপর কালো রঙের বড় বড় চেক কাটা। স্বামীজী এমনিতেই বেশ ফর্সা ছিলেন, কিন্তু তাঁর ত্বকের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ও কমনীয়তার জন্য তাঁকে আরও বেশি ফর্সা লাগতো। সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর চোখদুটি; বড় বড় আর ভাবব্যঞ্জক। এমন সুকান্ত চোখ আর দেখিনি।

এবার আর দূর থেকে নয়, কাছে গিয়ে পাদস্পর্শ করেই তাঁকে প্রণাম

করলাম। কাছেই একটি ছোট তাঁবু ফেলা ছিল। সেখানে দেখলাম ছোট্ট একটি চায়ের টেবিল ও গুটিকয়েক চেয়ার পাতা। একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে স্বামীজী বললেন ঃ 'এর জন্য এক কাপ চা আন দেখি।' ব্রহ্মচারী চট করে চা এবং কিছু প্রসাদ এনে টেবিলে সাজিয়ে দিলেন। এবার যেন স্বামীজীর কথা বলার একটু ইচ্ছা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় থাকো, কি কর ইত্যাদি। আমিও সব বললাম।... এরপর তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। সেই সুযোগে আমিও আমার পরিচিত কয়েকজন সাধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সেরে নিলাম। দশটা পর্যন্ত এভাবেই কাটলো।

[তারপর আবার স্বামীজীর দর্শন।] তিনি তখন তাঁর কয়েকজন গুরুভাই-এর সঙ্গে ভিতরকার বারান্দায় বসেছিলেন। মঠ-প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করে স্বামীজী চেয়ারে আর রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষজী এবং শরৎ মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ) একটি বেঞ্চে। একটু দূরে আরও দুটি বেঞ্চ পাতা ছিল। তারই একটিতে আমি একলা বসেছিলাম। স্বামীজী বেশ খোশমেজাজে তাঁর গুরুভাইদের আমেরিকাবাসের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন ঃ 'শিকাগোয় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ায় সেখানকার পাদ্রীরা তো ক্ষেপে লাল! তারা যোগসাজস করে ঠিক করলে ফ্রান্সে আর একটা ধর্মমহাসভা ডাকা হবে এবং সেখানে বক্তাদের সকলকেই ফরাসী ভাষায় বলতে হবে। তখন আমি ফরাসী ভাষা জানতুম না। স্বভাবতই ওরা ভাবলো আমি ঐ সভায় বলার সুযোগ পাবো না। কিন্তু আমি ফ্রান্সে গিয়ে ছ-মাসের মধ্যেই ওদের ভাষা শিখে ফেললুম। আর শুধু শেখাই নয়, কয়েক জায়গায় ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দেওয়াও শুরু করে দিলাম। আর যায় কোথা! ব্যস্, ওতেই মিশনারি বাবাজীবনেরা একেবারে মিইয়ে গেল। আর একটা ধর্মমহাসভা ডাকার প্রস্তাবেরও ঐখানেই ইতি!'[১]

একটু থেমে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমেরিকায় আমার ঘরের বাইরে একটা লেটার বক্স ছিল। ওটা এমনিতে তালা-বন্ধই থাকতো। মাঝে মাঝে যখন খুলতাম তখন দেখতাম একরাশ চিঠি। সবরকম মানুষই লিখতেন। তার মধ্যে বেশ কিছু চিঠিতেই হুমকি থাকতো—হিন্দুধর্মের প্রচার বন্ধ করুন। যাঁরা লিখতেন তাঁদের অবশ্য আমি চিনতাম না। মাঝে মাঝে আবার প্রশংসাসূচক চিঠিও পেতাম। ঐ ধরনের চিঠি বেশির ভাগ মহিলারাই লিখতেন। তাঁদের

১. স্বামীজীর মুখে যে-কথাগুলি এখানে বসানো হয়েছে তার সঙ্গে নথিবদ্ধ ঘটনার বেশ কয়েকটি অমিল রয়েছে। বর্তমান স্মৃতিনিবন্ধের আরও কয়েকটি পঙ্‌ক্তি সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।—প্রকাশক

মধ্যে কেউ কেউ আবার সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবও দিতেন। কতবার ওদেশের প্রতিপত্তিশালী মহিলারা পরামর্শ দিয়েছেন—স্বামীজী কোনও ধনীর দুলালীকে বিয়ে করে আমেরিকাতেই থেকে যান না কেন! আমি যতই বলি—বাপু হে, ভারতীয় সন্ন্যাসীরা বে-থা করে না। তারা কিন্তু নাছোড়বান্দা! তাদের যুক্তি, আমাদের অনেক পাদ্রীই তো বিয়ে-থা করে দিব্যি ঘর-সংসার করেন, আর আপনি পারেন না?'

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা বললেন ঃ 'শুনে তো আমি স্তম্ভিত! স্বামীজী অবশ্য ঘটনাটির কোনওরকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেননি। শুধু বলে গেলেন ঃ 'আমি তখন এক শহর থেকে আর এক শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আর একটার পর একটা বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছি। এমনও বহুদিন গেছে একই দিনে বেশ কয়েকটি সভায় বলতে হয়েছে। একদিন মাঝরাতে ইজিচেয়ারে বসে বসে ভাবছি—আচ্ছা, অনেক তো বক্তৃতা দিলাম। যে-যে বিষয়ে আমি বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছি, তা তো সবই হয়ে গিয়েছে। এখন যাই বলতে যাবো সেটাই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি হবে, যেটা আমি চাই না, অথচ শিরে সংক্রান্তি! পরের দিনই একটা বক্তৃতা আছে। কি করি? এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি আর নিজের এই দুরবস্থার জন্য মনে মনে ঠাকুরকে খুব দুষছি। এমনি সময় কি হলো জানো? হঠাৎ ঠাকুরের গলা শুনতে পেলাম। তিনি আমার উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠলেন। সেই মুহূর্তে আমার চোখ বন্ধ ছিল; ফলে তাঁকে দেখতে পাইনি। শুধু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে লাগলাম। একটানা বেশ কিছুক্ষণ বলবার পর তিনি বললেন ঃ 'এই দ্যাখ, তুই এই, এইভাবে বলবি। এর জন্য অত চিন্তা করছিস কেন?' আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! কিন্তু, সে যাই হোক, পরবর্তী বক্তৃতার বিষয়বস্তু জানতে পেরে আমি তো খুব খুশি। কিন্তু আর কিছু বিস্ময় তখনো যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা জানতাম না। জানলাম পরদিন সকালে, যখন আমারই ঠিক পাশের ঘরের এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মশাই, গতকাল রাতে আপনার সঙ্গে কে কথা বলছিলেন, বলুন তো? তিনি এমন একটি ভাষায় কথা বলছিলেন যে, আমি তাঁর বক্তব্যের বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলাম না।'

'ঠাকুর বাংলাতেই কথা বলেছিলেন। যাই হোক, ওঁর কথা শুনে আমি একেবারে আশ্চর্য! আমি না হয় শুনলাম, কিন্তু পাশের ঘর থেকে উনি কি করে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, এ আমার কিছুতেই মাথায় এল না।'

স্বামীজী বলতে লাগলেন ঃ 'একবার আমেরিকানরা ধরে বসলো, তোমার গুরুর কথা কিছু বলো। ওঁর বিষয়ে একটি বক্তৃতা দাও। দিলাম। ঠাকুরের ত্যাগের কথা বলতে গিয়ে তাদের বললাম—সোনা-রূপা তো দূরের কথা, তিনি একটা তামার পয়সা পর্যন্ত ছুঁতে পারতেন না। আর তাঁর এই যে ত্যাগ, এটা শুধু কোনও প্রতীকী ব্যাপার নয়, সেটা আক্ষরিক অর্থেও সত্য ছিল। অনবধানবশত মুদ্রায় হাত ঠেকে গেলেও আপনা-আপনিই তাঁর হাত সরে আসতো; আঙুলগুলো যন্ত্রণায় এমনভাবে কুঁকড়ে যেত যে, বোঝা যেত তাঁর সমস্ত স্নায়ু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। সেই দৈহিক যন্ত্রণা এত তীব্র ছিল যে ঘুমের মধ্যেও তিনি আর্তনাদ করে উঠতেন। একদিন রাতে তিনি ঘুমোচ্ছেন আর তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য আমি তাঁর গায়ে একটা রূপোর টাকা আলতো করে ছুঁইয়েছি। মুদ্রার স্পর্শে মুহূর্তের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ জেগে উঠলেন এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। নিজের ছেলেমানুষীতে নিজেই তখন লজ্জায় মরি আর কি!'

স্বামীজী থামতেই রাখাল মহারাজ বলে উঠলেন ঃ ভাই, তুমি ঠাকুরের একটি জীবনী লেখ না কেন! সে কথা শোনামাত্রই স্বামীজীর যেন ভাবান্তর হলো। তিনি বললেন ঃ 'ওরে বাবা! ক্ষেপেছিস নাকি? ও বড় শক্ত কাজ। ওঁর জীবনী লেখা কি আমার কম্ম রে? শেষে কি শিব গড়তে বাঁদর গড়বো!'—তা শুনে রাখাল মহারাজ বললেন ঃ 'ভাই, তুমিই যদি একথা বল তবে আর কে লিখবে? তাহলে তো দেখছি কোনওদিনই আর ঠাকুরের জীবনী লেখা হবে না।' স্বামীজী তার উত্তরে বললেন ঃ 'তা কেন? ঠাকুরের ইচ্ছা হলে, দেখবি, তিনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন।'

এর পর স্বামীজীর গুরুভাইরা কিছুক্ষণের জন্য অন্যত্র চলে গেলে তিনি আমার দিকে ফিরে সহজভাবে কথা বলতে লাগলেন। স্বামীজী বললেন ঃ 'তুমি এলাহাবাদে থাকো, তাই না? ডাক্তার নন্দীকে চেনো? ঝুসিতে থাকতে তাঁর বাড়ি ভিক্ষে করতে যেতাম। তাঁর সাথে আমার খুব আলাপ-পরিচয় ছিল।'

ডাক্তার নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। ঠাকুরের ভক্ত বলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা অন্তরের যোগ ছিল এবং আমরা তাঁকে বেশ পছন্দই করতাম। যতদূর জানি, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনও করেছিলেন। তবে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগের কারণ তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, গঙ্গার ওপারে রমতা সাধুদের জন্য যে কুঠিয়াগুলো ছিল,

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়ে তারই একটাতে বেশ কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। তখন গরমকাল; দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম; চারদিকে 'লু' বইছে। কিন্তু স্বামীজীর কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঐ কাঠফাটা গরমের মধ্যেই একটা ভোট-কম্বলের অর্ধেক কোমরে জড়িয়ে আর বাকি আধখানায় গা ঢেকে খালি পায়ে ডাক্তার নন্দীর বাড়ি আসা-যাওয়া করতেন। এই সময় আমি ঘনঘন বেলুড় মঠে যেতাম। দেখতাম আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বামীজীকে দর্শন করার জন্য মঠে ছুটে ছুটে আসছেন। তবে এটা ঠিক, হুট্ করে যখন-তখন মঠে আসলেই যে স্বামীজীর দর্শন মিলতো তা নয়। কারণ বেশির ভাগ সময় তিনি নিজের ঘরেই কাটাতেন। এমনকি তাঁর গুরুভাইরাও সচরাচর সে সময় তাঁকে বিরক্ত করতেন না। এর কারণ একটাই। তিনি প্রায় সময়ই এমন উচ্চভাবে অন্তর্মুখ হয়ে থাকতেন যে, সে অবস্থা থেকে মনকে নামিয়ে এনে অন্য ভাবের বা অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলা তাঁর পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক মনে হতো। তাই এটা প্রায় একরকম নিয়মই হয়ে গেছিল তিনি স্বেচ্ছায় নিচে নেমে এলে তবেই তাঁর দর্শন মিলবে বা তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা চলবে। সে সময় সাধারণ দর্শনার্থীরাও অবাধে তাঁর কাছে যেতে পারতেন।

একদিন সকালে স্বামীজীর মা ভুবনেশ্বরী দেবী মঠে এসেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবেন। খুব শক্ত-সমর্থ চেহারা। সুন্দর, বড় বড় পল্লবিত চোখ। এককথায় খুব সম্ভ্রম জাগানো চেহারা—এমন একটা ব্যক্তিত্ব যাঁর কথা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হয়। যে মা এত মহীয়সী, তাঁর সন্তানের মধ্যেও যে এই সমস্ত গুণ সঞ্চারিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! যাই হোক, দেখলাম দোতলার বারান্দায় উঠে তিনি 'বিলু-উ-উ' বলে জোরে ডাক দিতেই স্বামীজী তক্ষুনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। মায়ের কাছে বীরেশ্বর বিবেকানন্দ একেবারে যেন ছোট্ট শিশুটি! মায়ের সঙ্গে স্বামীজী অনুগত বালকের মতো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন এবং বাগানে পায়চারি করতে করতে মৃদুস্বরে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

জীবনের শেষ কটা বছর কলকাতায় এলেই স্বামীজী একবার মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। যখন বেলুড়ে থাকতেন, তখন অত ঘনঘন পারতেন না। কিন্তু তাহলেও মাঝেমধ্যে যেতেন। কিন্তু তাও যখন সম্ভব হতো না, হয়তো দু-এক সপ্তাহ দেখাই হয়নি, তখন ভুবনেশ্বরী দেবীই স্বয়ং মঠে হাজির হয়ে পুত্রকে

দেখে যেতেন এবং পারিবারিক ব্যাপারে কোনও পরামর্শ প্রয়োজন হলে, তাও নিয়ে যেতেন।

একদিন বিকেল চারটে নাগাদ জাপানের কনসাল [রাজদূত] স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবেন বলে বেলুড়ে এলেন। তাঁকে মঠের ভেতরের বারান্দায় একটা বেঞ্চে বসানো হলো কারণ ঐখানেই সাধারণত স্বামীজী অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা করতেন। স্বামীজীর কাছে খবর গেল; কিন্তু তিনি আর আসেন না। এদিকে কনসাল বসে আছেন তো বসেই আছেন। আসলে যত হোমরাচোমরা লোকই আসুন না কেন, স্বামীজী তাঁর মেজাজ-মর্জি অনুসারেই চলতেন। ফলে কেউ কেউ মঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হতো। আবার কাউকে হয়তো ধৈর্য ধরে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। কনসালেরও হলো তাই। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর স্বামীজী নিচে নামলেন। তখন তাঁর সান্ধ্যভ্রমণের সময় হয়েছে। কনসালের কাছাকাছি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বামীজী বসলেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে উভয়ের কথাবার্তা শুরু হলো। সৌজন্যমূলক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা শেষ হলে কনসাল তাঁর কাজের কথায় এলেন। তিনি বললেন ঃ 'আমাদের মিকাডো [মহামান্য সম্রাট] আপনাকে সংবর্ধনা দেবার জন্য খুব উৎসুক। আপনাকে আপনার সুবিধামতো যত শীঘ্র সম্ভব জাপানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতেই তিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনার মুখ থেকে হিন্দুধর্মের কথা শোনার জন্য জাপান আজ উন্মুখ।' কনসালের এই কথা শুনে স্বামীজী বললেন ঃ 'শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে জাপান যেতে পারবো বলে তো মনে হয় না।'

তখন কনসাল বললেন ঃ 'আপনার অনুমতি নিয়ে তাহলে কি মিকাডোকে একথা জানাতে পারি, শরীর ভালো হলে সুযোগ-সুবিধামতো আপনি একবার জাপানে যাবেন?' স্বামীজী বললেন ঃ 'এ শরীর কি আর সারবে? মনে তো হয় না।'

ডায়াবেটিসে ভুগে ভুগে স্বামীজীর শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। বেশ রোগা হয়ে গেছেন অথচ প্রথমবার যখন তাঁকে দর্শন করি সে সময় তাঁর শরীর এতটা খারাপ ছিল না। এর অল্পদিন বাদেই এলাহাবাদে ফিরে যাই। কিন্তু শীঘ্রই আবার কলকাতায় আসার একটা সুযোগ জুটে গেল। এলাম। এসেই স্বামীজীকে দেখার আশায় বেলুড়ে ছুটলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে সময় স্বামীজী অন্যত্র ছিলেন। তাই দেখা হলো না।

স্বামীজীর পরেই 'রাজা মহারাজ' বা রাখাল মহারাজই ছিলেন মঠের মাথা। তিনি আমাকে ভালোভাবে চিনতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন মনে হতো তিনি যেন আমার প্রতি একটু উদাসীন। একটু ছাড়াছাড়া ভাব। তাছাড়া অধিকাংশ সময় তিনি নিজের ভাবেই ডুবে থাকতেন। ফলে সহজভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ প্রায় মিলতো না বললেই চলে। তাঁর অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা আমি শুনেছিলাম। একথাও জানতাম প্রায়ই তাঁর 'সমাধি' হতো। এককথায় তিনি তখন আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

একদিন মঠে তাঁর কাছে বসে আছি । দু-একটি সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর তিনি বেশ কিছুক্ষণ মৌন রইলেন। ঐ সময় আমার গুটিকয়েক ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল। ভাবছিলাম ওঁর সাহায্যে সেগুলির সমাধান করে নেব। কিন্তু ওঁকে আমি সেসব কথা মুখ ফুটে কিছুই বলিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যদি তিনি ঠিক ঠিক মহাত্মা হন আমার সমস্যাগুলি তিনি ঠিকই ধরতে পারবেন; আমার নিজের থেকে কিছুই বলতে হবে না। বসে বসে এইসব ভাবছি, হঠাৎ রাখাল মহারাজ বলে ওঠলেন ঃ 'চল একটু হেঁটে আসি।' আমরা যখন বেরোলাম তখনো সন্ধ্যে হয়নি। সামনের পথটা কিছুদূর গিয়ে বেঁকে গেছে। একটা গেছে মঠের এক গেটের দিকে, অন্যটা গঙ্গার দিকে। তখনো মন্দির-টন্দির কিছুই হয়নি। মঠ বলতে তখন শুধু কয়েকটি বাড়ি। বেশির ভাগই ফাঁকা জমি। আর মধ্যে মধ্যে কিছু গাছপালা আর ঝোপঝাড়, এই যা। যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে আমরা জেটির দিকে যাওয়ার যে গেট আছে, সেই পর্যন্ত গেলাম। তারপর আবার উল্টোমুখো। কিছুক্ষণ এইভাবে আমরা পায়চারি করলাম। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কথা চলতে লাগলো। রাখাল মহারাজই বলছেন, আমি শুধু শুনছি। কি করে যে তিনি আমার মনের কথা টের পেলেন জানি না, অথচ সহজ কথার ছলে তিনি আমার তিনটি সমস্যারই সুন্দর সমাধান করে দিলেন।

তারপর রাখাল মহারাজ, মঠের মুখোমুখি যে গঙ্গার ঘাটটি, সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। ঘাটের একটা সিঁড়িতে মহারাজ নিজে বসলেন আর আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। তাই আমি এক সিঁড়ি নিচে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। আর বসামাত্রই ওঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে আমি এতই বিহ্বল হয়ে পড়লাম যে, ঠিক করলাম ওঁর পাদপদ্মেই নিজেকে সঁপে দেবো। বললাম ঃ 'মহারাজ আমাকে কৃপা করুন।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মহারাজ। তারপর

ধীরে ধীরে বললেন ঃ 'বাবা, আমি তোমার গুরু নই; তোমার গুরু বিবেকানন্দ।' ওঁর কথা শুনে হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়লাম। কারণ আমি জানতাম স্বামীজী মাত্র কয়েকজনকেই মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর চেলা হওয়া— এ কি সহজ কথা? এ-যে আমার কাছে স্বপ্ন! মনে মনে ভাবলাম— স্বামীজীও আর আমাকে চেলা করেছেন আর আমার দীক্ষা নেওয়াও হয়েছে! এর দিনকয়েকের মধ্যেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি এলাহাবাদে ফিরে গেলাম।

পরেরবার যখন মঠে গেলাম, দেখলাম স্বামীজীর স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়েছে। আর তিনি বেশ হাসিখুশি।

একদিন ভোরে মঠে গিয়ে শুনি স্বামীজী ঠাকুরঘরে আছেন। তাই দোতলায় উঠে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সে এক অপূর্ব দৃশ্য! স্বামীজী ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হয়ে পুরনো ঠাকুরঘরের ঠিক সামনের ঢাকা বারান্দাটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বীরবিক্রমে পায়চারি করছেন। কখনো তাঁর হাত দুটি দ্রুত চলার ছন্দে দুলছে, আবার কখনো বা তাঁর বরাবরের অভ্যাসমতো বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত। তাঁর ভাব গাম্ভীর্য মুখখানি দেখলাম লাল হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে সেই ভাবাবেগ চাপার চেষ্টা করেও যেন তিনি আর পারছেন না। ... সেই ক্ষিপ্র পাদচারণার মধ্যে আমি স্পষ্ট শুনলাম তিনি অবিরাম আবৃত্তি করে চলেছেন ঃ 'গর্জন্তং রাম রামেতি, ব্রুবন্তং রাম রামেতি।' তাঁর তখনকার সেই অন্তর্মুখ ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ভক্তি-উদ্দামশীল মহাবীর যেন একাগ্রচিত্তে তাঁর পরমারাধ্য শ্রীরাম-সীতার দুয়ারে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত! শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত স্বামীজীর প্রাণে ছিল অদম্য শক্তি এবং সম্ভাবনা; এবং সেই শক্তিবলে প্রভুর সেবায় অসাধ্য সাধন করতেও কৃতসঙ্কল্প ছিলেন তিনি।

সেদিন বিকেলে দশ-বারোজন ছেলে এলো। দেখে মনে হলো বেশিরভাগ কলেজেরই ছাত্র। স্বামীজীকে দর্শন করবে বলে তারা দোতলায় স্বামীজীর ঘরের সামনের গঙ্গার দিকের বারান্দায় এসে জড়ো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে এমন মন খুলে কথা বলতে লাগলেন যে, উচ্ছল, হাসিখুশি স্বামীজীকে সেই মুহূর্তে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ওদেরই সমবয়সী; উদ্দাম প্রাণচঞ্চল এক যুবক। কথা বলতে বলতে বন্ধুর মতো কারো পিঠে হাত রাখছেন, কারোর কাঁধে আবার মৃদু চাপড় মারছেন। স্বামীজীকে যখনই দেখি প্রায় সবসময়ই তিনি গুরুগম্ভীর, ভাবস্থ। সেদিন স্ফূর্তিবান স্বামীজীকে দেখে তাই আমার বিশেষ আনন্দ হয়েছিল।

স্বামীজীর পকেটে একটি সোনার ঘড়ি ছিল, আর সেই ঘড়ির সঙ্গে সংযুক্ত একটি খাঁটি সোনার চেন সেদিন তিনি গলায় পরেছিলেন। আহা! সোনার অঙ্গে সোনার সেই চেনটি যে কী অপূর্ব মানিয়েছিল কি বলবো! একটি ছেলে স্বামীজীর গলায় চেনটিতে হাত দিয়ে বলে উঠলো ঃ 'বাঃ, চেনটি তো ভারী সুন্দর!' ঐ-কথা শোনামাত্রই স্বামীজী পকেট থেকে ঘড়িটি বের করে চেনসুদ্ধ সেটি ছেলেটির হাতে দিলেন। ছেলেটি তো অবাক! কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই সে তার হাতটা স্বামীজীর দিকে বাড়িয়ে দিল। স্বামীজী বললেন ঃ 'তোর যখন পছন্দ—তখন এটা তোর-ই। কিন্তু দেখিস বাবা, বিক্রি করিসনে যেন; স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাছে রাখিস।'

স্বামীজীর কাছ থেকে ঐ উপহার পেয়ে ছেলেটি যে দারুণ খুশি হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। শুধু দামের বিচারেই নয়, স্বামীজীর স্মারক হিসেবেও তো ওটি অমূল্য সম্পদ! কিন্তু এমন অবলীলায় স্বামীজী ওটি দিয়ে দিলেন যে, আমি বিস্মিত না হয়ে পারিনি। একবার আমার সামনেই স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'ত্যাগ মানে প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগ। সবকিছু থাকা সত্ত্বেও যে সবেতেই অনাসক্ত সে-ই ঠিক ঠিক ত্যাগী। যার কিছুই নেই, সে তো ভিখিরি—সে আবার দেবেটা কি?' বড়দিনের ছুটিতে আগ্রা থেকে কয়েকজন পণ্ডিত মঠে এলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। তখন বেলা প্রায় ন-টা। মঠের চাতালে গুটিকয়েক সাধারণ বেঞ্চ পাতা ছিল। তাতেই ওঁরা বসলেন। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্বামীজীও তাঁদের সামনে বসলেন। তারপর অধ্যাপকেরা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দর্শন বিষয়ে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন এবং স্বামীজীও যথাযথ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একের পর এক সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষ হলে অধ্যাপকবৃন্দ সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিলেন।

এতক্ষণ আমি একটু দূরে বসে খুব মন দিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনার ধারাটি বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। কথার ফাঁকে ফাঁকে স্বামীজী যখন এক-একবার আমার দিকে চাইছিলেন তখন আমিও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম; আমার জড়তাটা কেটে যাচ্ছিল।

তখন প্রায় দুপুর বারোটা। স্বামীজী হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'হ্যাঁরে, এলাহাবাদে সাধু অমূল্য থাকে; তুই কি তাকে চিনিস? সে কেমন আছে, কি বৃত্তান্ত? তার সব কথা আমায় বল।' বললাম ঃ 'স্বামীজী, তাঁকে তো আমি বহু বছর ধরেই চিনি। তিনি নিঃস্বার্থভাবে সকলের সেবা করতেন। তাঁর সাহস

ও সেবার মনোভাবের দরুন তিনি ধনী, দরিদ্র সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। একবার ওখানে খুব কলেরার মড়ক লাগে। সে সময় প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি দীনদুঃখী ও আর্তের খুব সেবা করেন। সেইজন্য কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই মনে করতো তিনি তাঁদের ব্যথার ব্যথী, পরমাত্মীয়।

অমূল্য প্রথমদিকে ব্রহ্মচারীদের মতো সাদা কাপড়ই পরতেন। কিন্তু পরে তাঁকে স্থানীয় লোকেরা 'সাধুজী' বলে ডাকতে শুরু করলে তিনি গেরুয়া ধরেন। সেই সময় থেকেই কেউ কেউ আবার তাঁকে 'গুরুজী' বলেও সম্বোধন করতো। এইভাবে তাঁর চারপাশে ছোটখাট একটা ভক্তগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তবে তাঁর বেশিরভাগ চেলাই গাঁজা, চরস, ভাঙের প্রতি আসক্ত ছিল। তারা এসব নেশার জিনিস জোগাড় করে এনে প্রথমে তাদের 'গুরুজী'-কে দিত। 'গুরুজী' একটু সুখটান দেওয়ার পর তারা সকলে মিলে তাঁর 'প্রসাদ' পেত। ক্রমে অমূল্য মদ ধরলেন এবং নষ্ট মেয়েরাও তাঁর কাছে আনাগোনা করতে লাগলো। আরও কিছুদিন পরে তিনি নাগা সন্ন্যাসীদের মতো দিগম্বর হয়ে থাকতেন। শেষবার যখন তাঁকে দেখি তখন তাঁর পতনের আর কিছু বাকি নেই।

অমূল্যর এই দুর্ভাগ্যের কথায় স্বামীজী বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ঃ 'আহা, কত মহৎ একটা প্রাণ রে!' একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন ঃ 'এ জীবনটা ওর বৃথাই গেল। কিন্তু দেখিস, পরের জন্মে ও নিশ্চিত মুক্ত হয়ে যাবে। অমূল্য আমার সঙ্গে কলেজে পড়তো। পড়াশুনায় ভালোই ছিল। দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল উদার। ও ছিল জ্ঞানমার্গী।... তবে সাধু অমূল্যের কোনও দীক্ষাগুরু ছিল না। শিষ্য যখন কোনও ভুল করে বসে তার পতন ডেকে আনে, তখন গুরুই তাকে রক্ষা করেন এবং গুরুকৃপাতেই শিষ্য আবার নিজেকে সামলে নেয়।'

স্বামীজীর কথা শুনে বুঝলাম সাধু অমূল্যের পতনের সংবাদে তিনি মর্মাহত। স্বামীজীকে বাইরে থেকে খুব কঠোর মনে হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন কুসুম-কোমল। ভীষণ নরম মনের মানুষ। সকলের প্রতিই তাঁর সমবেদনা। সকলের জন্যই তাঁর প্রাণ কাঁদতো। আমিও জানতাম নীতির ব্যাপারে স্বামীজী আপোষহীন। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে আর তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম এই ভেবে যে, একজন পথভ্রষ্ট সাধুর জন্য তাঁর প্রাণ এমন করে কাঁদে!

স্বামীজী বললেন ঃ 'মন্মথ, এবার যখন এলাহাবাদে ফিরবি, তখন তুই অমূল্যর সঙ্গে দেখা করে বলিস, আমিই তোকে পাঠিয়েছি। তার কোনওকিছুর

প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞেস করিস। আর, সে তোকে যেমন যেমন বলে, তুই সেই জিনিসগুলো জোগাড় করে তাকে অবশ্যই দিয়ে আসবি। দেখিস বাবা, যেন ভুল না হয়।'

এলাহাবাদে ফিরে দিনকয়েকের মধ্যেই স্বামীজীর নির্দেশমতো 'গুরুজী'-র কাছে গিয়ে বললাম ঃ 'স্বামীজী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি। নইলে কখনোই এ-মুখো হতাম না। সে যাই হোক, আপনার যদি কোনওকিছুর প্রয়োজন থাকে তো আমায় বলতে পারেন।'

আশ্চর্য! আমার খোঁচাটা তিনি গায়েই মাখলেন না; অথচ স্বামীজীর নাম শোনামাত্রই আনন্দে তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অবাক হয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'কি বললে, স্বামীজী? স্বামীজী তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন? তিনি আমার কথা কি বলেছেন—বলো ভাই বলো।' স্বামীজীর মুখ থেকে যা শুনেছি সব বললাম। সব শুনে তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। প্রচণ্ড আবেগে মানুষ যেমন নির্বাক হয় তেমনি। এও দেখলাম তিনি আবেগ চাপতে চেষ্টা করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন ঃ 'চার সের গাওয়া-ঘি আর কিছু ফল এনে দিও।'

কয়েকদিনের মধ্যেই জিনিসগুলো তাঁকে দিয়ে এলাম। খুব খুশি হলেন। তাঁর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম। খুব সম্ভব সাধু অমূল্য প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে 'রাজযোগী' এবং অঘোরপন্থী তান্ত্রিকের এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার পর থেকে স্বামীজীর নাম করে দেওয়া ঐ কটি জিনিস ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই তিনি মুখে তোলেননি।

সাধু অমূল্যর কথা শেষ করে স্বামীজী আমাকে বললেন ঃ 'আমার কাছে তুই কি জানতে চাস? তোর যা ইচ্ছে প্রশ্ন কর।' বললাম ঃ 'আপনার মায়ার ওপর বক্তৃতাগুলি সব পড়েছি। যদিও বুঝিনি, কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। মায়া জিনিসটা কি, কৃপা করে যদি একটু বুঝিয়ে দেন।' কিছুক্ষণ মৌন থেকে স্বামীজী বললেন ঃ 'তোর যদি অন্য কিছু জানার থাকে তো বল।'

বললাম ঃ 'না স্বামীজী, আমার আর অন্য কোনও জিজ্ঞাস্য নেই। তবে কি—আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে কাছে পেয়েও যদি আমি মায়ার স্বরূপ না বুঝতে পারি, তাহলে তো ব্যাপারটা এ জীবনে চির-অজানা, চিররহস্যাবৃতই থেকে যাবে।'

এই কথা শুনে স্বামীজী 'মায়ার' ব্যাখ্যা শুরু করলেন। তিনি খুব দ্রুত বলছিলেন আর আমি তাঁর যুক্তিসহায়ে তত্ত্বের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করছিলাম। শুনতে শুনতে ক্রমে মন স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে উঠে গেল। যেন এক সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করেছি আমি। লেলিহান অগ্নিশিখার উপরের দিকে তাকালে যেমন একটা স্পন্দন চোখে পড়ে, দেখলাম আমার খোলা দুচোখের সামনেও তেমনি মঠ, মঠের গাছপালা, সবকিছুই অনুরূপভাবে বিলোড়িত, প্রকম্পিত হচ্ছে। সে এক অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা! সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই সেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম—'এ আমি কি দেখছি?' নিজের চারপাশটা ভালো করে চেয়ে দেখলাম—সর্বত্রই সেই কম্পন, সর্বত্রই সেই স্পন্দন। ধীরে ধীরে স্বামীজীও আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। তখনো তাঁর কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি; কিন্তু যা বলছেন তার কিছুমাত্র বোধগম্য হচ্ছে না। হঠাৎ নিজের মস্তিষ্কের ভেতরেও সেই সর্বগ্রাসী স্পন্দন অনুভব করলাম। বোধ হলো সেখানেও শূন্য, শুধুমাত্র শূন্যই বিরাজমান।

কিছুক্ষণ পর আবার আমি পূর্ব অবস্থায় ফিরে এলাম। স্বামীজীকে দেখতে পেলাম। তাঁর কথার অর্থও অনুধাবন করতে লাগলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম 'আমি' যেন আর সেই আগের আমি নেই। অনেক বদলে গেছি। সম্পূর্ণভাবে অহং-মুক্ত না হলেও আগের যে-আমিত্ব তার দাপট যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

আগে কখনো স্বামীজীর সামনে মুখ খুলতে সাহসই হয়নি। কিন্তু গভীর অনুভবের সেই চরম মুহূর্তে মনে হলো, আমিও যা, স্বামীজীও তো তাই—মায়াসমুদ্রের বুকে ছোট দুটি বুদ্বুদ বই তো নয়! বোধ হলো আমাদের মধ্যে সত্যিকারের কোনও প্রভেদ নেই। স্বামীজীর সেই গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব, অপ্রমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি, সবকিছুই মায়া-মহার্ণবের বুকে যেন নিছক এক আকস্মিক ঘটনা। একটা Coincidence। স্বরূপত অখণ্ড, অনন্ত চৈতন্য ব্যতীত অন্য কোনও সত্তা নেই। এক চৈতন্যই আছেন। তাই নির্দ্বিধায় বলে উঠলাম ঃ 'স্বামীজী আপনিও তো মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। আপনার এই মঠ-মিশনের কাজকর্ম, স্কুল, হাসপাতাল, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা—এ সবকিছুই তো মায়া। এসবের কি প্রয়োজন? আপনি পর্যন্ত মায়ার জালে পড়েছেন।' আমার এই মন্তব্যে স্বামীজী মৃদু হাসলেন। চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ।

আসলে স্বামীজীর কৃপায় স্বল্পকালের জন্য মায়ার সঙ্গে আমি অভিন্ন বোধ করেছিলাম। আর সেই হেতুই ঐ মন্তব্য করে বসেছিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলাম। নিজের ক্ষুদ্র, খণ্ড জীবসত্তায় প্রবেশ করলাম। তখন আবার মঠ, স্বামীজী এবং চারপাশের সবকিছুকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে পূর্ববৎ প্রতিভাত হলো। আর স্বাভাবিক হওয়ামাত্রই সে কী লজ্জা! ছি, ছি, ছি! একটু আগেই কিনা স্বামীজীর সঙ্গে গলা চড়িয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলেছি! কোথায় স্বামীজী আর কোথায় আমি! তাঁর সঙ্গে যে আমার আকাশ পাতাল ফারাক!—কেবল এইসব কথাই মনে হতে লাগলো।

আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে দেখে স্বামীজী বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস। আমি মায়াব মধ্যে রয়েছি; তবে কি জানিস—আমি মায়ার সঙ্গে খেলছি, এই যা! তোর যদি এই মায়ার খেলা পছন্দ না হয় তো চলে যা হিমালয়ের কোনও গুহায়। সেখানে গিয়ে জোর তপস্যায় ডুবে যা।'

দুপুরে প্রসাদ পাবার সময় হয়ে গেছে এবং সকলেই অপেক্ষা করছেন দেখে স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। আহা, যেন সাক্ষাৎ শিব! সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পদস্পর্শ করে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম।

এই সময় স্বামীজীর প্রসাদ পাবার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল হলো। কিন্তু মুখে কিছু বললাম না। ওদিকে তখন স্বামীজী ভাঁড়ারঘরের সামনের খোলা বারান্দায় পায়চারি শুরু করেছেন। হঠাৎ কি হলো, তিনি ভাঁড়ারে ঢুকে একটা আপেল নিয়ে এলেন। তারপর একজন ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে ছুরি চেয়ে নিয়ে নিজেই ধীরে ধীরে আপেলটা ছাড়িয়ে, সেটাকে দু-টুকরো করে, একটি টুকরো আমাকে দিলেন আর বাকিটা নিজে নিলেন। এই রকম অহেতুকী কৃপায় আমি যেন ধন্য হয়ে গেলাম।

কিন্তু একটু পরেই আবার মনে হলো, আহা, যদি স্বামীজীর অন্নপ্রসাদও পেতাম তো বেশ হতো! কিছুক্ষণ বাদে সকলে দুপুরের প্রসাদ পেতে বসেছি, এমন সময়ে স্বামীজী একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে নিজের পাত থেকে একটু অন্নপ্রসাদ তুলে দিয়ে বললেন ঃ 'মন্মথকে এটা দিয়ে আয় তো।' ওটি ছিল ঠাকুরকে নিবেদিত বিশেষ অন্নপ্রসাদ।

দুপুরের প্রসাদ পেয়ে সকলেই যে-যার ঘরে চলে গেলেন। স্বামীজীও। কিন্তু তখনো তাঁর বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। কারণ তিনি তখন মঠের নিয়মাবলী রচনায় খুব ব্যস্ত। যে কোনও ভাবেই হোক, স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর

দেহ আর বেশিদিন থাকবে না। তাই তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের জন্য কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন করে যেতে চাইছিলেন যাতে ভবিষ্যতে তাঁদের চলতে সুবিধা হয়।

সেদিনটা মঠেই কাটালাম। পরদিন ভোরে স্বামীজীকে প্রণাম করতে গেছি, দেখি তিনি তাঁর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রণাম করে উঠতেই বললেন ঃ 'যা বাবা, চট্ করে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আয়।' চেয়ে দেখি তাঁর জ্যোতির্ঘন মুখখানি করুণায় ঢল ঢল করছে। বুঝলাম তিনি আজ কৃপা করে দীক্ষা দেবেন; গঙ্গাস্নান করতে বলাটা তারই ইঙ্গিত। ওঃ, সে যে কী উত্তেজনা! বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। আনন্দের আতিশয্যে আমি তখন উন্মত্ত অধীর কিশোর। একরকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই গঙ্গায় গেলাম।

গুরুভাবে পূর্ণ না হলে—যাকে তাঁরা ঠাকুরের ভাব বলতেন—স্বামীজী কখনো কাউকে দীক্ষা দিতেন না। স্নান সেরে এসে দেখি তিনি সোফায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। আমায় দেখে নিজের ডান হাতটা আলতোভাবে ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'আমার হাতটা ধরে থাক দেখি।' তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর বসে তাঁর কব্জির কাছটা ধরলাম। শরীর ভেঙ্গে গেলেও স্বামীজীর কব্জি তখনো যথেষ্ট চওড়া। আমি বেড় দিয়ে পুরোটা ধরতে পারলাম না—আধ আঙুল মতো ফাঁক থেকেই গেল। যাই হোক, স্বামীজী তো চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে গেলেন। আমিও শিশুর মতো তাঁর হাতটি ধরে বসে রইলাম। একটু একটু করে সময় বয়ে যাচ্ছে আর অনুভব করছি, তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন ক্রমশই আমাকে গ্রাস করে ফেলছে। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক যে মুহূর্তে চেতনা হারিয়ে ফেললাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই স্বামীজী উঠে বসলেন।

সোফা ছেড়ে স্বামীজী এবার ঘরের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মেঝেতে পাশাপাশি দুটি আসন পাতা ছিল, তার একটিতে আমাকে বসতে বলে নিজে অন্য আসনটিতে বসলেন। তাঁর কথামতো বসতেই স্বামীজী বলতে লাগলেন ঃ 'স্বপ্নে তুই মায়ের কুমারীরূপ দর্শন করেছিস; কিন্তু এখন থেকে মায়ের—এই ষোড়শী মূর্তিই ধ্যান করবি।' তিনি এইকথা বলার সঙ্গেই সঙ্গেই মায়ের ঐ দিব্য মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কিন্তু এতে আমি এতটুকু অবাক হলাম না। কারণ আমার স্বপ্নের কথা কাউকে না বলা সত্ত্বেও যখন স্বামীজী তা টের পেয়েছেন তখন আমি ধরেই নিয়েছি তিনি আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন।

বহু বছর আগে স্বপ্নে একবার আমি সপ্ত-কুমারীর দর্শন পাই। প্রত্যেকেই

সালংকারা, অপরূপ বেশে ভূষিতা, প্রত্যেকেরই মাথায় স্বর্ণমুকুট। অত্যুজ্জ্বলা দিব্য কান্তিমতী মূর্তি। যিনি সবচেয়ে দীর্ঘকায়া তাঁর বয়স বছর এগারো। আর সর্বকনিষ্ঠা যিনি তাঁর বয়স পাঁচ। বয়স এবং উচ্চতার ক্রম অনুযায়ী তাঁরা একদিক থেকে একের পর এক আবির্ভূতা হয়ে আমার সামনে দিয়ে কিছুদূর গিয়েই মিলিয়ে গেলেন। এত স্পষ্ট দর্শন যে, সে-দৃশ্য আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে। স্বামীজী বললেন ঃ 'এই স্বপ্নের বেশ কিছুদিন পর তুই ত্রিশূলধারী মহাদেবকে স্বপ্নে দেখিস। এবং তিনি তোকে—মন্ত্র দেন। সেই থেকেই তুই মন্ত্রটি জপে আসছিস। কিন্তু আজ থেকে তোর এই—মন্ত্র।' (বাস্তবিক, প্রথম স্বপ্নটি দেখার অনেক বছর বাদে আমি স্বপ্নে মহাদেবের দর্শন পাই।) বেশ জোরে জোরে তিনবার মায়ের বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করলেন স্বামীজী, আর সঙ্গে সঙ্গে লোলজিহ্বা মায়ের পূর্ণাবয়ব একটি ধ্রুপদী মূর্তি আমার সামনে আবির্ভূতা হলেন। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'স্বামীজী, মায়ের এই মূর্তিই কি ধ্যান করবো?' মৃদু হেসে স্বামীজী বললেন ঃ 'ইচ্ছে হলে মায়ের জিভটা ভেতরে আছে এ রকমও ভাবতে পারিস।' তারপর তিনি আমাকে দীক্ষা এবং সাধনপ্রণালী সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিলেন, গুরুপূজার মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন এবং ন্যাসের স্থান দেখিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'প্রথমে গুরুকে মানসপূজা করবি তারপর যত স্পষ্টভাবে পারিস তাঁর শ্রীমূর্তি চিন্তা করবি। সহস্রারে গুরুর ধ্যান করাই সবচেয়ে ভালো। গুরুর ধ্যান হয়ে গেলে ধীরে ধীরে তোর ইষ্টমন্ত্র জপ করতে থাকবি এবং একই সঙ্গে হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির ধ্যানও করবি।'

স্বামীজী আরও বললেন ঃ 'মানসপূজার সময় প্রথমে তাঁর শ্রীচরণদুটির ধ্যান করবি। তারপর ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বাঙ্গের এবং সবশেষে তাঁর শ্রীমুখের ধ্যান। ধ্যান গভীর হলে আর হাত-পা দেখা যায় না। জানবি, যতক্ষণ মূর্তির চিন্তা থাকে ততক্ষণ নির্বিকল্প সমাধি হয় না। তবে অনর্থক তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই। ধীরে ধীরে, একটার পর একটা ধাপ পেরোতে হয়। নচেৎ সময় বেশি লেগে যায়।'

এইভাবে আমার দীক্ষাপর্ব শেষ হলে স্বামীজী বললেন ঃ 'এইবার এইখানে, আমার পাশে বসে ধ্যান কর। আর শোন, হাজার ব্যস্ত থাকলেও নিত্য ধ্যান করবি। যদি অল্প কয়েক মিনিটের জন্যও হয়, সেও ভালো। রোজ ধ্যান করা চাই-ই চাই। কোনওদিন একেবারেই যদি সময় না পাস তো বাথরুমেই ধ্যান সেরে নিবি। তাহলেও চলবে।'

মহাপ্রয়াণের মাসকয়েক আগে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। দীক্ষার পর থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত বহুবার মঠে গেছি। তবে দিনক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে লিখে না রাখায় প্রতিটি দিনের সঠিক বর্ণনা দিতে পারবো না। কিন্তু তাহলেও তাঁর শ্রীমুখ থেকে শোনা কিছু কিছু কথা এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করবো।

একবার তিনি বললেন ঃ 'এ শরীর আর সারবে না। এই খোলটা ছেড়ে আবার একটা নতুন শরীর নিয়ে আসতে হবে। এখনো বহু কাজ বাকি রয়ে গেল।'

আরও আগে একদিন ভাবস্থ অবস্থায় তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমি মুক্তি-ফুক্তি চাই না। যতক্ষণ পর্যন্ত সকলে মুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ আমার নিস্তার নেই। বারবার আসতে হবে।'

সেই সময় চীনে ঘোর রাজনৈতিক সঙ্কট চলছে। একদিকে ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলো চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে উদগ্রীব। অন্যদিকে জাপানও সেই শোষণনীতিকে সমর্থন জানিয়ে চীনকে আক্রমণ করে বসলো। একদিন স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'চীনের মতো এমন একটা প্রাচীন সভ্য দেশ কি এইভাবে শেষ হয়ে যাবে?' কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি কি দেখছি জানিস? দেখছি—প্রকাণ্ড এক হাতি যেন আমার সামনে রয়েছে। আর সেই হাতির পেটে একটা বাচ্চা। কিন্তু যখন প্রসব হলো দেখা গেল সেটা একটা সিংহ শাবক। এই বাচ্চাটা ভবিষ্যতে বড় হবে, সেই চীন আরও বড় ও শক্তিশালী হবে।'

ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমাদের দেশ স্বাধীন হবেই হবে। তবে রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে নয়। আর স্বাধীনতার পর ভারতের জন্য অপেক্ষা করছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।' কতদিনে দেশ স্বাধীন হবে সে কথা সেদিন না বললেও পরে এক গুরুভাইয়ের মুখে শুনেছিলাম স্বামীজী বলেছেন ঃ আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীন হবে।

একবার স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'আপনার উপদেশ না মেনে যদি কখনো আমার পতন হয়, তাহলে কি হবে?' দৃঢ়স্বরে উত্তর এল ঃ 'যদি নরকেও যাস, তাহলেও সেখান থেকে আমিই টিকি ধরে তোকে টেনে তুলবো। জগতে এমন কোনও শক্তি নেই যা তোর পতন ঘটাতে পারে।'

এক সময় কথাচ্ছলে তিনি বলেছিলেন ঃ 'ভবিষ্যতে এমন বহু মানুষ আসবে যারা জন্ম থেকেই মুক্ত। আবার এমন কিছু মানুষও আসবে যারা শ্রীরামকৃষ্ণের পতিতপাবন নামটি শুধু কানে শুনেই জন্ম-মৃত্যু চক্রের পারে গিয়ে চিরমুক্তি লাভ করবে।'

স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'আমার কাজের জন্য একদল সন্ন্যাসী চাই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কিছু আদর্শ পিতা-মাতা যাঁরা হবেন সমাজের মধ্যমণি। তাঁদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে জন্ম নেবে এমন এক সমাজ যা অতীত ভারতবর্ষের সব গৌরবকে উৎকর্ষে ছাপিয়ে যাবে।'

নারী-মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ 'মেয়েদের অগ্রগতির জন্য কোনও বাঁধাধরা কর্মসূচীর প্রয়োজন নেই। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও, স্বাধীনতা দাও; দেখবে নিজেদের সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই করে নেবে।'...

স্বামীজীর মুখে শোনা একটি ঘটনার কথা এখন আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করবো। অন্যান্য সূত্রেও ঘটনাটির বিবরণ আমরা পাই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু ঘটনাটি স্বামীজীর মুখ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শোনা, সেইহেতু তার স্বতন্ত্র মূল্য আছে বলে আমি মনে করি। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'তখন আমি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করছি। বেশির ভাগ সময় ধ্যান-জপের মধ্যেই ডুবে থাকতাম। খিদে পেলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে যা জোটে তাই দিয়েই উদরপূর্তি করতাম। কিন্তু অধিকাংশ সময় যা পেতাম তাতে পেটও ভরতো না, মনও না। এতটাই নিকৃষ্ট সেগুলির স্বাদ! একদিন মনে হলো—ধিক্ এ জীবন! এই গরিব পাহাড়ী লোকগুলো নিজেরাই পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের ছোটছোট ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের খাবার থেকে বাঁচিয়ে আমার জন্য কিছু না কিছু রেখে দেয়। এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ? এর চেয়ে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করাই ভালো। যেই একথা মনে হলো, অমনি মাধুকরীতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এইভাবে দু-দুটো দিন না খেয়েই কেটে গেল। তেষ্টা পেলে আঁজলা ভরে ঝরনার জল খেতুম। তিনদিনের দিন এক গভীর জঙ্গলে ঢুকে একটা পাথরের ওপর বসে ধ্যান করতে লাগলুম। চোখ খোলাই ছিল। হঠাৎ কেমন যেন গা-টা ছম্‌ছম্ করে উঠলো। দেখলাম ডোরাকাটা বিশাল একটা বাঘ আমার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। ভাবলুম, 'যাক বাঁচা গেল! এতদিন পর আমি নিজেও একটু শান্তি পাবো, আর এই বাঘটারও পেট ভরবে। এ তুচ্ছ দেহটা যে একটা জীবের কিছুমাত্র সেবাতেও

লাগবে তাতেই আমি ধন্য। চোখ বন্ধ করে বাঘটার ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করছি আর মনে মনে চিন্তা করছি—কয়েক মুহূর্ত তো কেটে গেল; কিন্তু কই, এখনো তো বাঘটা আমাকে আক্রমণ করলো না! একটু অবাকই হলাম! তখন চোখ খুলে দেখি বাঘবাবাজী জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। প্রথমটা দুঃখই হলো। কিন্তু তারপরে অত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। বুঝলাম—গুরুদেব আমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন; তাই তিনিই আমাকে রক্ষা করছেন।'

ভারতবর্ষ এবং আমেরিকা প্রায়শই স্বামীজীর আলোচনায় স্থান পেত। বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথাবার্তা এবং সহজ আলাপচারীতাতে দুটি দেশের জাতীয় চরিত্রের ওপর তিনি যে আলোকপাত করেছেন সেটি তাঁর দু-একটি মন্তব্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো।

স্বামীজী একদিন বললেন ঃ 'আমেরিকায় দেখলাম সব রজোগুণে ফুটছে। তবে এখন তাদের প্রয়াস হবে রজঃ থেকে সত্ত্বের দিকে যাওয়ার। গোটা ইউরোপটাই বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধির পিছনে হন্যে হয়ে ছুটছে, তবে এ ব্যাপারে আমেরিকা সবার পুরোভাগে।'

স্বামীজী আরও বললেন ঃ 'মুনিঋষিদের আমলে ভারত ছিল সত্ত্বপ্রধান দেশ। আজও ভারতবাসীর হাড়-মজ্জায় সত্ত্বগুণের ফল্গুধারা বয়ে চলেছে। যে কোনও দেশের চাইতে ভারত আজও অনেক বেশি সাত্ত্বিক। কিন্তু বাইরটা দেখলে স্বভাবতই মনে হয়—এ দেশের মানুষ ঘোর তমোয় ডুবে আছে। কত দীর্ঘ দুর্ভাগ্যের ঝড় যে এদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। এদের দুর্দিন এখনো ঘোচেনি। না খেয়ে, তিলে তিলে গোটা জাতটা একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে! এদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়া আর শিক্ষা দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

আর একবার তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমেরিকায় যে বিছানাগুলোয় ওরা শোয় তা যেমন নরম তেমনি আরামদায়ক। ও রকম বিছানা তোরা এদেশে চোখেই দেখিসনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের দীনদুঃখীদের কথা ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম আসতো না। রাতের পর রাত দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। মেঝেতে শুয়ে ছট্‌ফট্ করেছি। ভারতবর্ষের উন্নতি করতে গেলে এদেশের মানুষকে পেট ভরে খেতে দিতে হবে, তাদের অঙ্গে পরিধানের বস্ত্র তুলে দিতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে। দরিদ্ররাই জীবন্ত নারায়ণ রে। এখন এই জাগ্রত নারায়ণকে অন্ন দিয়ে সেবা করা একান্ত দরকার। ধর্ম ভারতবাসীর

রক্তে। অন্নবস্ত্রের অভাবে আধ্যাত্মিকতার আগুন স্তিমিত। সে অভাব মিটলে এবং শিক্ষার অধিকারী হলে আধ্যাত্মিকতার আগুন আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে।' স্বামীজী বললেন ঃ 'বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ—ওসব নিয়ে বেশি মাতামাতি করো না। উপযুক্ত শিক্ষার আলো পেলে মেয়েরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে নেবে।' ব্রহ্মচর্যের ওপর স্বামীজী অত্যন্ত জোর দিতেন। তিনি বলতেন ব্রহ্মচর্যের সাথে 'মেধা-নাড়ীর' যোগ। পরোক্ষভাবে নিজের আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একবার তাঁকে বলতে শুনেছিলাম ঃ 'কেউ যদি বারো বছর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে সে অসাধারণ মেধার অধিকারী হবে। তবে তার জন্য বারো বছরের নির্ভেজাল কৌমার্য চাই-ই চাই। এমনকি স্বপ্নেও সেই ব্রত থেকে এতটুকু বিচ্যুত হওয়া চলবে না।'

একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন ঃ 'জানবি, সন্ন্যাসীই ঠিক ঠিক গৃহস্থের গুরু হতে পারে। গেরুয়া দেখলেই মনে মনে প্রণাম করবি। এবং তিনি যোগ্য কি অযোগ্য সে বিচার না করে আপন গুরুর কথা স্মরণ করেই তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখাবি। ত্যাগের আদর্শটা সর্বাবস্থায়, সর্বদাই মনের ভিতর জাগিয়ে রাখা চাই এবং 'গেরুয়া'-ই তোকে মহত্তম ত্যাগ ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের সেই আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আমাকে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন ঃ 'একটা পথ বেছে নে। দু নৌকায় পা দিয়ে চলিস নি।' অর্থাৎ স্বামীজী চেয়েছিলেন হয় আমি সন্ন্যাসী হবো, নয়তো গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবো। স্বামীজীর এই উপদেশের কথা মনে রেখে আপন অভিরুচি অনুসারে আমি পরে সংসার আশ্রমকেই বেছে নিই।

একদিন গঙ্গার মুখোমুখি, যাকে গানের ঘর বলা হতো, মঠের সেই ডান দিকের ঘরটায় আমরা বসে আছি, এমন সময় সাধু নাগ মহাশয় সেখানে এলেন। পরনে আধময়লা ধুতি ও শার্ট। উস্কোখুস্কো চুল। ঈষৎ রক্তাভ চোখ দুটিতে কেমন এক শূন্য, ফ্যালফেলে দৃষ্টি। দেখে মনে হবে যেন নেশা করেছেন। ঘরের ভেতরে দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে জোড়হাতে তিনি বলতে লাগলেন ঃ 'আপনি নারায়ণ—মনুষ্য শরীর ধারণ করে এসেছেন। স্বয়ং ঠাকুরই একথা বলে গেছেন। আপনি আমার প্রণাম নিন।' এই বলে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আমাদের দিকে চেয়ে স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ 'দ্যাখ, দ্যাখ। দু-চোখ ভরে দেখে নে। আজকের এই ছবিটা স্মৃতিপটে গেঁথে নে। এ-দৃশ্য আর কখনো

দেখতে পাবি নে।' এখন মনে হয় সেদিন স্বামীজীকে দেখে নাগ মহাশয় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। নাগ মহাশয় চোখ মেলে তাকালে স্বামীজী তাঁকে বললেন ঃ 'দয়া করে এদের ঠাকুরের কথা কিছু বলুন।'

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, নাগ মহাশয়কে দেখে স্বামীজী নিজেও উঠে দাঁড়ালেন না, আবার তাঁকেও বসতে বললেন না। কারণ, তাতে নাগ মহাশয় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হতেন এবং তার ফলে তাঁর তখনকার ঐ অতি উচ্চভাবেরও হানি হতো। স্বামীজীর কথা শুনে বিদ্যুৎ চমকের মতো এক দিব্য হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। এ-হাসি একমাত্র তিনিই হাসতে পারেন যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। ডান হাতটি সামান্য তুলে নাগ মহাশয় বললেন ঃ 'এই তো তিনি, এই তো তিনি।' আর কি আশ্চর্য! ঐ কথাকটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত আমাদের সকলের প্রাণেই এক উচ্চ অধ্যাত্মশক্তির স্ফুরণ হলো; এক দিব্য স্পন্দন, এক দিব্য ভাবের তরঙ্গে সমস্ত ঘরের পরিমণ্ডলটাই যেন আচ্ছন্ন হলো। শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম-জাগানো অখণ্ড নীরবতায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে নাগ মহাশয়ও চলে গেলেন, যেমনটি এসেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই।

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি, এপ্রিল ১৯৬০)

মিসেস এস. কে. ব্লজেট

উজ্জ্বল, দ্রুতগামী, অবিস্মরণীয় সেই শীতের দিনগুলি যা আমাদের জীবনে সহজ আনন্দ ও অনায়াস মুক্তির স্বাদ বয়ে এনেছিল, তারা আজও থেকে থেকেই আমার স্মৃতিকে ছুঁয়ে যায়। ভালো না হয়ে, সুখী না হয়ে তখন আমাদের আর কোনও উপায়ই ছিল না। আর আজ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে, যাঁরা তাঁকে জানতেন, যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁদের মতো আমিও প্রিয়জনকে চিরদিনের জন্য হারাবার বেদনায় গভীরভাবে আচ্ছন্ন। কিন্তু নিজের দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে ভাবছি, তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকেই তাঁকে এত ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং তোমাদের সঙ্গে তাঁর এমন নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল যে, নিজের দুঃখ দিয়ে তোমাদের বেদনা ও ক্ষতির গভীরতা মাপতে যাওয়া আমার পক্ষে একরকম ধৃষ্টতা। ঠিক কথা, আমিও তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম; কিন্তু সে পরিচয় অল্পদিনের। কিন্তু ঐ সীমিত অবকাশের মধ্যেই স্বামীজীর চরিত্রের শিশুসুলভ দিকটি শতরূপে আমার চোখে ধরা পড়েছে, শুভসংস্কারসম্পন্ন যে-কোনও মহিলার মাতৃ-হৃদয়ের কাছে যার আকর্ষণ ও আবেদন চিরন্তন। কাছাকাছি যাঁরা থাকতেন তাঁদের ওপর স্বামীজী এমন নির্ভর করতেন যে তাঁরা তাঁকে ভাল না বেসে পারতেন না। আমার ধারণা, 'মীড' বোনেরাও (Mead sisters) স্বামীজীর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করেছেন।

তিনি ঋষি ও দার্শনিক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; যা-কিছু শাশ্বত ও সনাতন, সে বিষয়ে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞান ছিল—তাও ঠিক। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের মানুষের মতো ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জ্ঞান তাঁর একেবারেই ছিল না। দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনের ছোটখাট ব্যাপারেও তুমি তাঁকে প্রতিনিয়তই সামলেছ, সাহায্য করেছ—তা আপাতদৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ মনে হোক না কেন। তোমার ঐ সামান্য সেবা আর সাহায্যটুকু দিয়ে তাঁর ছোটখাট ভুলচুকগুলি শুধরে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। মায়েরা এমন স্বভাবেরই; আমাদের স্নেহের ধরনটাই এমন যে, যাদের আমরা ভালবাসি, ছোটখাট আপাততুচ্ছ অজস্র সেবার মধ্য দিয়ে তাদের চারপাশে ভালবাসার এক কোমল, মৃদু জগৎ গড়ে তুলি, তারপর হঠাৎই একদিন বুকে শেল বেঁধে। তখন আমাদের

অবস্থা হয় সন্তানহারা দুঃখিনী 'র‍্যাচেল'-এর মতো যখন দেখি আমাদের ভালবাসার পাত্রটি আর নেই, যখন দেখি সপ্রেম সেবা দিয়ে সন্তানকে ভরিয়ে দেওয়ার যে-দুর্লভ সুযোগ ভগবান আমাদের দিয়েছিলেন তা আমাদের নাগালের বাইরে। তাই আমি বুঝতে পারছি, সুন্দর এবং বিরল এক বন্ধুকে হারানোর বেদনা তোমার মনে কী গভীরভাবে বেজেছে। আর এও অনুভব করছি তোমার উদার, অকুণ্ঠ সেবা তাঁকে তোমার কতটা কাছে নিয়ে এসেছিল।

একদিন আমি আমার কাজে ব্যস্ত; স্বামীজীও—তাঁর চাপাটি আর তরকারি নিয়ে। সেই সময় ওঁকে তোমার কথা বললাম। বলামাত্রই তাঁর উত্তর ঃ 'ঠিক বলেছেন, জো-ই আমাদের মধ্যে সব থেকে মধুর।'

[জো, তোমার নিশ্চয় মনে আছে] শ্রোতারা বক্তৃতার পর স্বামীজীকে কেমন করে ছেঁকে ধরতেন। আর তিনিও কিভাবে তাদের হাত এড়িয়ে স্কুল ছুটির পর ছাড়াপাওয়া শিশুর মতো ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে, হুড়মুড় করে রান্নাঘরে ঢুকে বলে উঠতেন ঃ 'এখন আমরা রান্নবান্না করবো।' আশ্চর্য! কোথায় তখন ঋষি বিবেকানন্দ! কোথায় তখন ভবিষ্যদ্বক্তা বিবেকানন্দ! সব তখন উবে গেছে। তার জায়গায় প্রকাশিত সহজ-সরল এক শিশুর মধুর চরিত্র। কিন্তু 'জো'-র চোখ এড়িয়ে যাওয়ার যো ছিল না। সে তক্ষুনি কোথা থেকে ধাঁ করে রান্নাঘরে হাজির হতো, আর মা যেমন দুষ্টুমিতে লিপ্ত চঞ্চল সন্তানকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে, সেও ঠিক তা-ই করতো। বাইরের জামাকাপড় না ছেড়েই স্বামীজী চাটু, খুন্তি নিয়ে কালিঝুলি মাখতে লেগে গেছেন! সর্বদা ফিটফাট ও সতর্ক জো-র চোখে তখন কপট ভর্ৎসনার দৃষ্টি। স্বামীজী আর কি করেন—সুড়সুড় করে বাধ্য ছেলেটির মতো পোশাক পাল্টে আসতেন!

তোমার মনে পড়ে, আমরা সব কেমন এক সঙ্গে বসে চা খেতাম? তুমি বলতে 'টি পার্টি'। আহ্, সেসব কী আনন্দের দিনই না গেছে! কত হাসি, কত মজাই না করতাম আমরা—তাই না? তোমার কি সেই দিনটির কথা মনে আছে যে-দিন স্বামীজী আমায় পাগড়ি বাঁধার কৌশলটি দেখাচ্ছিলেন, আর তুমি অনবরত তাড়া দিচ্ছিলে এই বলে—আপনার বক্তৃতার সময় কিন্তু হয়ে গেছে স্বামীজী? সেকথা শুনে আমি বলেছিলাম—'না, আপনি মোটেই তাড়াহুড়ো করবেন না, স্বামীজী। আপনি সেই ফাঁসির আসামীর মতো যাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদিকে ফাঁসি দেখার জন্য কৌতূহলী লোকদের হুড়োহুড়ি লেগে গেছে; কে কাকে ঠেলেঠুলে এগিয়ে যাবে, সেই চেষ্টা! জনতার ঐ কাণ্ড

দেখে আসামীটি চেঁচিয়ে বলে উঠলো ঃ 'ভাই সব, রোসো রোসো। অত অস্থির হচ্ছ কেন তোমরা? ফাঁসির মঞ্চে আমি যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছি, ততক্ষণ মজার কিছুই ঘটবে না।' আমিও তাই বলি, 'স্বামীজী; আপনি না যাওয়া পর্যন্ত সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটবে না।' কথাটি স্বামীজীর এতই মনঃপূত হয়েছিল যে, পরে মাঝে মাঝেই বলে উঠতেন—'আরে, আমি ওখানে না যাওয়া পর্যন্ত মজার কিছুই ঘটছে না'—আর বালকের মতো হাসিতে ফেটে পড়তেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের আয়নায় একটি ছবি ভেসে উঠছে। সকাল বেলা। বিদগ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা শোনার জন্য আমাদের বাড়িতে সমবেত বেশ কিছু মানুষ সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। স্বামীজীর কিন্তু কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি আত্মস্থ, ধ্যানমগ্ন। দৃষ্টি আনত। মুখে অতীন্দ্রিয়লোকের দুর্ভেদ্য রহস্যের দ্যুতি। ধ্যান ভাঙ্গলে মিসেস লেগেটের দিকে শিশুর মতো তাকালেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কি বিষয়ে বলবো?' ভাবো দেখি! বিদ্বান, বুদ্ধিমান শ্রোতারা যে অধিকারী বাগ্মী ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের কথার দিব্যশক্তিতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান, তিনি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন তিনি কি বিষয়ে বলবেন। সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচনে মিসেস লেগেটের বিচারবুদ্ধির ওপর স্বামীজীর কতটা আস্থা ছিল, এই প্রশ্নই তার প্রমাণ। জোসেফিন! সেদিনের বড় সুন্দর সময়টিতেই তুমি ছিলে না।

খুব ভোরে, যখন তুমি ও তোমার বোন ঘুমোতে, তখন স্বামীজী স্নানে আসতেন। তারপরই তাঁর গম্ভীর, দরাজ কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যেত। মনে হতো তিনি কোনও পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সংস্কৃত না জানলেও মন্ত্রের অন্তর্নিহিত ভাবটি আমি ঠিক ধরতে পারতাম। ভক্তিরসে সিক্ত সেই প্রসন্ন প্রভাতগুলিই আজ স্বামীজী সম্পর্কে আমার মধুরতম স্মৃতি হয়ে রয়েছে। সেকেলে রান্নাঘরের চারদেয়ালের মধ্যে তুমি আর আমি স্বামীজীকে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর মুখ থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তার কী অবাধ স্রোতই না বইতো!

আর সেই কৌতূহলোদ্দীপক, শিক্ষাপ্রদ সকালটির কথা মনে পড়ে, যেদিন স্বামীজী নিজের ভাবে খুব চড়ে ছিলেন? সংবাদপত্রে বধূ-নির্যাতন অথবা শিশু-পীড়নের কোনও একটা খবর পড়ে সেদিন আমি একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিলাম আর কুকুর-বেড়ালের মতো যথেচ্ছ সন্তান জন্ম দেওয়ার হীন সামাজিক প্রথাকে তীব্র ধিক্কার দিচ্ছিলাম। কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকাচারের বিরুদ্ধে সেদিন আমি যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে, অগুনতি ভিখিরি, উন্মাদ এবং সামাজিক অপরাধীর জন্ম

দিলে সমাজেরই ক্ষতি, কারণ কালে তারাই সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং যারা সৌভাগ্য ও সুখে লালিত তাদের ওপর এই বঞ্চিত দুর্ভাগার দল প্রতিহিংসা নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে। সেইজন্য আমি চাইছিলাম এমন একটা আইন করা হোক যাতে এই সমস্ত হতভাগ্য ছেলেমেয়েরা তাদের নেশাখোর বাপেদের কাছ থেকে এবং নির্বোধ মায়েদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে; যাতে একদল অপুষ্ট ও অপরিণত শিশুর বোঝা জগতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, ভগবান 'তাঁর আদলেই' মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এই ধরনের একটা জঘন্য পরিহাস ও ঈশ্বর-নিন্দা থেকে সমাজকে অব্যাহতি দেওয়া যায়।

আমার কথা শেষ হলে স্বামীজী ধীরে ধীরে আমাদের দৃষ্টি সেই ধূসর, সুদূর অতীতের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন যখন মেয়েদের ভাগ্য নির্ভর করতো শুধুমাত্র পুরুষের বাহুবলের ওপর। তারপর ক্রমশ যুগের হাওয়া পালটাতে লাগলো এবং স্ত্রীজাতির অবস্থারও ক্রমোন্নতি হতে থাকলো। চিন্তাশক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুখ ও স্বাধীনতার পরিধিও দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। সেদিন সকালে স্বামীজী যা বলেছিলেন তার সারমর্ম—এই সংস্কার একদিনে করা যায় না; সব মহান পরিবর্তনই ধীরে ধীরে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তা-ই আসবে। এর অন্যথা হলে পৃথিবী তার শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্য দুটিই হারাবে।

এ কথা অবশ্য সত্যি, স্বামীজীর মুখের কথাগুলি ঠিকঠিকভাবে গুছিয়ে তোমার কাছে তুলে ধরতে পারলাম না; তাঁর কথার ভাবটুকুই দিলাম। একটা মজার ব্যাপার কি জানো? স্বামীজীর মুখ থেকে শোনা একটি কথাও আমি ভুলিনি এবং তাঁর বক্তব্য বুঝতে আমার কখনোই কোনও অসুবিধে হয়নি। তবুও লিখতে বসে তাঁর বলা কথাগুলি তোমার কাছে হুবহু তুলে দিতে পারলাম না। আমার কি মনে হয় জানো? তাঁর বলা কথা দ্বিতীয়বার কেউ বলতে পারে না। বলা অসম্ভব। আর বললেও, তিনি যে উদ্দীপনা, যে অনুপ্রেরণা, যে আবেগ তাঁর বাণীর মধ্যে ঢেলে দিতেন, পুনরুদ্ধৃতির মধ্যে সেগুলির অভাব থাকবেই। তিনি যখন বলতেন, সেসব মুহূর্তে শুধু তাঁর কথা শোনার আনন্দেই আমরা বুঁদ হয়ে থাকতাম।

স্বামীজীর বক্তৃতা আমি খুব কমই শুনেছি। আর কেমন করেই বা শুনবো? একে বয়সের ভার, তার ওপর সংসারের ঝক্কি। 'মার্থা'র মতো আমারও তাই কোনও উপায় ছিল না। বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকতে হতো। তাছাড়া, তখনকার সেই সুখের দিনগুলির কথা সবিস্তারে বলতে যাওয়া অনেকটা কিরকম জানো? ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে কাউকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলতে গেলে যেমন হয়,

ঠিক তেমনি। তুমি কি ঐ বক্তৃতায় ছিলে, যেখানে উদ্ভট অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ওস্তাদ মহিলাদের একজন বলেছিলেন ঃ 'আচ্ছা স্বামীজী, আপনাদের দেশে তো শুনেছি প্রচুর সাধু—ওঁদের চলে কি করে?' বিদ্যুদ্বেগে স্বামীজী জবাব দিলেন ঃ 'কেন, ম্যাডাম—যেভাবে আপনাদের ধর্মযাজকদের চলে, সেইভাবেই। মেয়েরাই ওঁদের ভরসা!' স্বামীজীর সমুচিত উত্তর শুনে শ্রোতারা হো হো করে হেসে উঠলেন; আর সেই হাসির তোড়ে তখনকার মতো ভদ্রমহিলা একেবারে চুপ! স্বামীজীও ফের তাঁর ভাষণ শুরু করলেন।

আর একবার শিকাগোর 'ম্যাসোনিক মন্দিরে' তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেছি। সভায় উপস্থিত একজন প্রখ্যাত ধর্মযাজক স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি কি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন?' স্বামীজী বললেন ঃ 'করি বৈকি। অবশ্য ততদিনই, যতদিন সেগুলি আপনার কাজে লাগে। ওক গাছের বীজ পুঁতলে শুয়োর, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর আক্রমণের হাত থেকে চারাগাছটিকে বাঁচাবার জন্য আপনারা তার চারদিকে ছোট একটা বেড়া দেন। কিন্তু ওক চারাটি যখন ডালপালা মেলে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, তখন কি আর সেই ছোট বেড়ার দরকার হয়? হয় না।'

স্বামীজী কোনও পরিস্থিতিতেই ঘাবড়াবার পাত্র ছিলেন না। সব প্রশ্নের উত্তর যেন তাঁর ঠোঁটের ডগায় মজুত থাকতো। কিন্তু আজ ঘাতপ্রতিঘাতময় জীবনের পারে গিয়ে তিনি নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন। এই জগতের কোনও দ্বন্দ্ব, কোনও কোলাহলই আর তাঁকে জাগাতে পারবে না। তাঁর সঙ্গে এ জীবনে আমাদেরও আর কোনওদিন দেখা হবে না। আমার এও বিশ্বাস, এই পৃথিবীতে মনুষ্য'শরীরে তিনি আর কখনো আসবেন না। বরং আশা করবো, বিচ্ছেদ-বেদনায় ক্লিষ্ট এই ধরিত্রীর বহু ঊর্ধ্বে, সুদূর কোনও নক্ষত্রলোক থেকে তাঁর দিব্য আত্মা আবার মোহাচ্ছন্ন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাবে, তাদের বহুভাবে অনুপ্রাণিত করবে। আমেরিকা-মনস্ক এই সন্তানটিকে হারিয়ে ভারত-জননীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাস ও জীবনাদর্শের মূল সুরটিকে ধরে রেখেও ভারতবর্ষের মানুষের উন্নতি ও সুখের জন্য তিনি যে কতটা ভাবতেন তা ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর। আর স্বামীজীর উপস্থিতিই যাঁর কাছে জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা ছিল, সেই নিবেদিতা আজ কি করবে?...[১]

(প্রবুদ্ধ ভারত, জুলাই ১৯৬৩)

---

১ ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর জোসেফিন ম্যাকলাউড-কে লেখা চিঠি থেকে।

ইডা অ্যানসেল

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন জীবন ও ধর্মের সম্পূর্ণ এক অভিনব ধারণা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, সেদিন তাঁকে আমার কেমন লেগেছিল, কোনও বিশেষণ দিয়েই তা বোঝান যাবে না। সেটা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার কথা। তখন আমি সম্পূর্ণ নিজের প্রয়োজনেই তাঁর বক্তৃতাগুলি লিখে রাখতাম। কোনওদিন যে সেগুলি ছাপা হবে ভাবিনি। তবুও স্বামীজীকে আমি কি চোখে দেখেছি তা লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু কেমন করে যে আমার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করবো, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, ঊর্ধ্বলোক থেকে আসা এক জ্যোতির্ময় সত্তা যিনি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, অথচ মানবজীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কেই যাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিক সমবেদনা। মানুষকে তিনি ঠিক ঠিক বুঝতেন, আর সেই কারণেই তাঁর বক্তৃতা, তাঁর রসিকতা, তাঁর অনুকরণক্ষমতা, যে কোনও ধরনের সঙ্কীর্ণতা বা অসহিষ্ণুতার প্রতি নির্মম কশাঘাত এবং তাঁর পরদুঃখকাতরতা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল।

প্রথম যেদিন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনি, সেদিন অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি তাঁর গগনস্পর্শী চিন্তাভাবনা ও জীবনাদর্শের তুলনায় আমাদের জীবনাদর্শ কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ। বক্তৃতাশেষে স্বামীজী যখন উদাত্তস্বরে একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করছেন, তখনই আমরা হল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং উপলব্ধি করলাম বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বামীজী যেন আমাদের হাত ধরে এক নতুন ও বৃহত্তর জীবনের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্লোকের সেই সুর আর তার অন্তর্নিহিত বাণী যেন নবীন যুগের, অনাস্বাদিত জীবনচেতনার আবাহন মন্ত্র। প্রাণের গভীরে সেই সুর আর বাণীর অনুরণন নিয়েই বাড়ি ফিরলাম।

আজ যখন বহুদূরে ফেলে আসা অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকাই তখন দেখি নিজের মূল্যবোধগুলি কিভাবে ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে। বেশ লাগে তখন! এও দেখি আপাততুচ্ছ ছোটখাট ঘটনা আমার জীবনধারাকে কিভাবে সম্পূর্ণ

অন্য খাতে বইয়ে দিয়েছে। হাইস্কুলে ঢোকার ঠিক আগেই যদি আমি স্টেনোগ্রাফি কোর্সে [সাংকেতিক লিপি শিক্ষাক্রমে] ভর্তি না হতাম এবং যদি হাইস্কুলের দ্বিতীয় বছরে স্নায়বিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে আমাকে স্কুল ছাড়তে না হতো, তাহলে হয়তো স্বামীজীর সান্নিধ্যে কখনোই আসা হতো না। আমি হয়তো বড়জোর তাঁর গুটিকয়েক বক্তৃতা শুনতে পেতাম, এই যা। স্কুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পিয়ানোও শিখতাম। কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু রায় দিলেন ঃ 'হয় তুমি স্কুল ছাড়ো, নয়তো পিয়ানো বন্ধ কর। তা না করলে দুটোর কোনওটাই তোমার শেখা হবে না।' তিনিই আমাকে স্যান ফ্রানসিস্কোর 'ক্যালিফর্নিয়া স্ট্রীট হোম অফ ট্রুথ'-এর নেত্রী মিস লিডিয়া বেল-এর কাছে পাঠান। আমি সেই হোমে থাকতাম এবং প্রতিদিন সকালের ক্লাসে মিস বেল যা যা বলতেন সেইগুলি এবং রবিবারের বক্তৃতাগুলি লিখে রাখতাম।

সকালের ক্লাসে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' পড়তাম। [পাশ্চাত্যে প্রথম যখন তিনি আসেন, সেই সময়ে নিউইয়র্ক থেকে এই বইটি প্রকাশিত হয়।] আমি যখন হোমে, স্বামীজী তখন লস এ্যাঞ্জেলেসে ছিলেন। এই সময়ে রেভারেন্ড বি. ফে. মিলস্ ওকল্যান্ডের ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। স্বামীজীও সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে মিস বেল ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে আমিও ওকল্যান্ডে যাই। সেখানে স্বামীজীকে দর্শন করে আমরা যেমন মুগ্ধ, অভিভূত হলাম, তেমনই চমকিত, বিস্মিত হয়ে গেলাম তাঁর ভাষণ শুনে।

বাস্তবিকই, স্বামীজী সাধারণ মানুষ ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃত মহাত্মা বা দেবমানব। অনেকেই হয়তো বাগ্মী হন। কিন্তু তাঁর মতো বক্তৃতায় অনর্গল দেববাণী বর্ষণ করতে আমি কাউকে দেখিনি। আর অধ্যাত্ম বিষয় অমন সরস, উপভোগ্য করে বলা—সেটিও আর কেউ কখনো পেরেছেন বলে শুনিনি। বক্তৃতা দিতে দিতে এমন গল্প বলতেন যা সকলকে সম্মোহিত করে রাখতো। আর অন্যকে নকল করা? তাতেও তিনি সিদ্ধ ছিলেন। যখন তাঁকে প্রথম দেখলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম তখন যেদেশে তাঁর জন্ম সেই দেশের সভ্যতার কী বিকৃত ব্যাখ্যা এযাবৎ আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে সেসব কথা যখন চিন্তা করছিলাম, তখন নিজেকে আমেরিকাবাসী ভাবতে রীতিমতো লজ্জা হচ্ছিল।

মিস বেল-এর সঙ্গেই আমি স্বামীজীর অধিকাংশ বক্তৃতা শুনতে যেতাম। অবশ্য কিছু বক্তৃতা অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গিয়েও শুনেছি। কিন্তু যখনই যাই না

কেন, সর্বদাই দেখেছি তাঁর কথা শোনার জন্য মানুষের কী তীব্র আকুলতা, কী প্রবল উৎসাহ! অবশ্য এ কথা ঠিক, তাঁর শিক্ষা এবং তত্ত্বের চাইতেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাহ্য রূপের প্রতি কেউ কেউ বেশি মনোযোগ দিতেন। এক বিত্তবান ও অভিজাত যুবতীর কথা মনে পড়ছে যিনি আমার শিক্ষিকার কাছে গানবাজনা শিখতেন। একদিন হৃদয়ের আবেগে তিনি [স্বামীজীকে স্মরণ করে] বলে ওঠেন, 'আহা, ঠিক যেন সুন্দর একটি সোনার মূর্তি!'

সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ছাড়াও আগ্রহী জিজ্ঞাসু ছাত্রদের জন্য স্বামীজী মাঝে মাঝে সকালের দিকে বিশেষ ক্লাস নিতেন। তখন তিনি ধ্যান শেখাতেন। টার্ক স্ট্রীটের একটি বাড়ির থাকবার ঘরেই ক্লাস হতো। মিসেস অ্যালিস্ হ্যান্সবরো (শান্তি) এবং মিসেস এমিলি অ্যাস্পিনল (কল্যাণী) স্বামীজীর এই আবাসের তত্ত্বাবধান করতেন এবং স্বামীজীকে প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করতেন। ওখানে আমি অল্প কয়েকটি ক্লাসই করেছি, তবে স্বামীজীর কোনও কথা টুকে রাখিনি।

ক্লাসের শুরুতে একটু ধ্যান হতো। তারপর স্বামীজী কিছু উপদেশ দিতেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবশেষে স্বামীজী ব্যায়াম, বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কিছু কিছু পরামর্শ দিতেন। স্বামীজী সহজপাচ্য খাদ্য এবং পরিমিত আহারের ওপর গুরুত্ব দিতেন। তাঁর একটি নির্দেশ আমার এখনো মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—এক সপ্তাহ তোমরা নুন খেয়ো না, তাতে তোমাদের স্নায়ুর উপকার হবে। নুন জিনিসটা উত্তেজক।

ক্লাসে স্বামীজী আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতেন। আবার যাঁরা ক্লাস আরম্ভ হওয়ার আগে আসতেন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁরা ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগও পেয়ে যেতেন। আমরা কেউ কেউ ঐ রকম আগে গিয়ে পড়লে আমাদের খাওয়ার ঘরে ডাকা হতো। সেখানে গিয়ে বেশ সহজভাবে আমরা স্বামীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে পারতাম। আমরা যারা পাশ্চাত্যের মানুষ, তাদের সর্বদাই ছোটাছুটি আর হড়বড় করা স্বভাব। স্বামীজী তাই নিয়ে খুব মজা করতেন। তাঁর মধ্যে কিন্তু কখনো এই তাড়াহুড়ো ভাব দেখিনি। একটা রাজোচিত প্রশান্তি ও স্থৈর্য তাঁকে নিশিদিন ঘিরে থাকতো। রাস্তায় গাড়ি ধরার জন্য কাউকে দৌড়তে দেখলে তিনি হাসতেন। বলতেন ঃ 'আর কি গাড়ি পাওয়া যাবে না?'

ক্লাস বা বক্তৃতা যা-ই হোক না কেন, তা শুরু করতে দেরি হলেও যেমন

তিনি বিচলিত হতেন না, তেমনি আবার একবার শুরু করলে যতক্ষণ তাঁর বক্তব্য শেষ না হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি থামতেন না—তাতে যদি দ্বিগুণ সময় লাগে, সেও ভালো।

সকালে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এলে স্বামীজীকে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে পাওয়া যেত। ধূসর ফ্লানেলের জামা পরে, হাতল-ওয়ালা আরামকেদারায় পা মুড়ে বসে তামাক খেতে খেতে তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন আর মজার মজার সব কথা বলতেন। ক্লাসের সময় হলে তিনি আরো মিনিট দুই পরে উঠে তাঁর ঘরে যেতেন। তখন তাঁর পরিধানে গেরুয়া আলখাল্লা, চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, মুখের পাইপ অদৃশ্য। সম্পূর্ণ অন্য রূপ! তবুও গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর রসিকতার কোনও বিরাম ছিল না।

ঘরোয়া ক্লাসে যেমন, বাইরে প্রকাশ্য বক্তৃতার বেলাতেও তা-ই। ক্ষিপ্র সরস মন্তব্যের দ্বারা তিনি বক্তব্য বিষয়কে জলবৎ তরল করে দিতেন। একবার কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম বোধ করলে সাধকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার কি দশা হবে? প্রশ্নটি শোনামাত্রই স্বামীজী কৌতুকে ফেটে পড়লেন। আমেরিকানদের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গি নকল করে তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের ঐ এক রোগ। সর্বক্ষণ ভয়ে সিঁটিকে আছো—এই বুঝি তোমাদের in-di-vid-u-al-i-ty নষ্ট হয়ে গেলো! আরে বাপু, তোমরা এখনো নিজেদের পরিচয়টাই জানো না, তায় আবার ব্যক্তিসত্তা! যখন তুমি তোমার অখণ্ড স্বরূপ উপলব্ধি করবে, একমাত্র তখনই তুমি তোমার ব্যক্তিসত্তা লাভ করতে পারো—তার আগে নয়। এটা নিশ্চিত জেনো, ঈশ্বরকে জানলে কোনও কিছু হারাতে হয় না। এদেশে আর একটা কথাও আমি ক্রমাগত শুনে আসছি। সেটা হলো, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে আমাদের চলা উচিত। [কিন্তু কেন?] তোমরা কি জানো না যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যত উন্নতি, প্রকৃতিকে জয় করেই তা সম্ভব হয়েছে? তাই এগিয়ে যেতে হলে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতিকে পরাভূত করতে হবে।'

প্রতিটি বক্তৃতার শেষে স্বামীজী সকলকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করতেন। একবার এই রকম প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়ে একজন সহানুভূতির সঙ্গে বলেন—স্বামীজী আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন করে আপনাকে নিশ্চয় খুব কষ্ট দিচ্ছি! তাঁর মুখের কথা শেষ হওয়া মাত্র স্বামীজী বলে ওঠেন ঃ 'আপনারা প্রশ্ন করে যান, প্রশ্ন যত বেশি হয় ততই মঙ্গল। এইজন্যই তো এখানে আমার আসা। যতক্ষণ

পর্যন্ত বিষয়টা আপনারা ভালোমতো না বুঝছেন ততক্ষণ আমিও আপনাদের ছাড়ছি না, জানবেন। ভারতবর্ষে অনেকে আমাকে বলেন, জনসাধারণকে নির্বিচারে অদ্বৈত বেদান্ত শেখানো উচিত নয়। কিন্তু আমি তাঁদের বলি, একটি শিশুকেও আমি বেদান্ত বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যগুলি মানুষকে যত অল্পবয়সে ধরিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।'

মানসিক সংযম শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজী বলতেন ঃ 'যত কম পড়বে ততই মঙ্গল। গীতা পড়ো, বেদান্ত সম্পর্কে কিছু ভালো বই পড়ো। ব্যস্, এই যথেষ্ট। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তো আগাগোড়াই ভুলে ভরা। কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা করতে শেখার আগেই কতকগুলো তথ্য দিয়ে শিশুদের মনটাকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়। কি করে মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, সেটাই সর্বাগ্রে শেখানো উচিত। আমাকে যদি আবার সবকিছু প্রথম থেকে শিখতে হতো এবং সে ব্যাপারে যদি আমার কোনও স্বাধীনতা থাকতো, তাহলে আমি প্রথমেই মনের ওপর কিভাবে প্রভুত্ব করা যায়, সেটিই শিখতাম। পরে প্রয়োজন মতো তথ্য সংগ্রহ করতাম। কিছু শিখতে আমাদের খুব বেশি সময় লাগে, কারণ আমরা ইচ্ছামতো কোনও বিষয়ের ওপর মনকে একাগ্র করতে পারি না। মেকলে-র ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস (History of England) মুখস্থ করার জন্য আমাকে তিন-তিনবার বইটি পড়তে হয়েছিল। অথচ আমার মা ইচ্ছে করলে মাত্র একবার পড়েই যে কোনও ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলতেন। মানুষ তার মনকে বশে আনতে পারে না বলেই এত কষ্ট পায়। একটা স্থূল উদাহরণ দিয়েই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটি লোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না। শেষে স্ত্রী তাকে ছেড়ে অন্য একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধে। বৌটি মূর্তিমান আতঙ্ক! কিন্তু সব জেনে বুঝেও হতভাগা পূর্বতন স্বামীটি শ্রীমতী ভয়ঙ্করীকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না, আর তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে।'

রবিবারের এক সন্ধ্যায় স্বামীজীর 'হোম অফ ট্রুথ'-এ বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। তাই তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে বললেন ঃ 'আজ রাতে আমার বক্তৃতা আছে, এসো। দেখো, আজ আমি গোটাকতক বোমা ফাটাবো। যে বিষয়ে বলবো, সেটা আশাকরি তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমাদের পক্ষে হিতকরও হবে।'

বক্তৃতাটি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। প্রতিটি কথাই ছিল অকাট্য। কোনরকম ঢাকঢাক-গুড়গুড় না করে, আমাদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তিনি সহজ অথচ জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করলেন। স্বামীজী যা বলেছিলেন সে কথায় আমাদের

আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতো কিছু না থাকলেও তাঁর বক্তব্য ছিল আমাদের নৈতিক পুষ্টির উপযোগী। এবং সেই কারণে আমাদের পক্ষে হিতকর—অবশ্য নিতে পারলে। তবে আমার ধারণা, তাঁর কথা আমরা মেনে নিতে পেরেছিলাম। কারণ, সেদিন যখন বক্তৃতা চলছিল, তখন একজনকেও হল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

পবিত্রতার আদর্শের ওপর খুব জোর দিয়ে স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, মানসিক শক্তি অর্জন করতে হলে গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই ব্রহ্মচর্য পালন করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি হিন্দু ছেলের কথা বলেন। ছেলেটি বেশ কিছুকাল আমেরিকায় ছিল এবং নানা অসুখ-বিসুখে ভুগছিল। একদিন সেই ছেলেটি স্বামীজীকে বলে—ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাটি নিশ্চয় ভুল, কারণ আমেরিকার ডাক্তাররা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন এবং তাকে অন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। স্বামীজী বললেন ঃ 'আমি তাকে বললাম, বাছা, ভারতে ফিরে যাও। তোমার পূর্বপুরুষরা হাজার বছর ধরে ব্রহ্মচর্য পালন করে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই শিক্ষামতো চলার চেষ্টা করো।' ঐ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে যে আমেরিকান চিকিৎসকেরা ছেলেটিকে ভুল পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্বামীজী তাঁদের কঠোর ভর্ৎসনা করেন।

বক্তৃতার আগে মিসেস স্টীল স্বামীজীকে ও আমাদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেদিন তিনি অনেকরকম সুস্বাদু রান্না করেছিলেন। স্বামীজী সকলের সঙ্গেই খুব প্রফুল্ল মেজাজে ও সহজভাবে কথাবার্তা বলছিলেন। খাওয়া-দাওয়া শুরু হওয়ার আগে আমরা সবাই আশা করে বসে আছি স্বামীজী পাশ্চাত্যের রীতি অনুযায়ী ঈশ্বরের প্রতি স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করবেন। কিন্তু ওমা! সকলকে অবাক করে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী খেতে শুরু করে দিলেন। পরে তিনি মন্তব্য করেন, ঈশ্বরের স্তুতি খাওয়ার আগে না করে পরে করাই ভালো। মিসেস স্টীল-কে সম্বোধন করে তিনি আরও বললেন ঃ 'ম্যাডাম, আমি আপনাকেই ধন্যবাদ দেবো কারণ আপনিই খেটেখুটে এত সব করেছেন।' ভোজের শেষ পদ হিসাবে মিসেস স্টীল সুস্বাদু খেজুরের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামীজী খুব তৃপ্তি করে তা খেয়েছিলেন। বক্তৃতার পর মিসেস স্টীল যখন তাঁর ভাষণের প্রশংসা করতে লাগলেন, তখন স্বামীজী বলে উঠলেন, 'ম্যাডাম, এই কৃতিত্ব আসলে আপনার খেজুরের।'

এক সন্ধ্যায় স্বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা

আছে, স্বামীজী সেই প্রসঙ্গ করছিলেন। তিনি বিভিন্ন রকম নরকের বর্ণনা দিলেন। সাধারণত বক্তৃতার পর কয়েকজন ভক্ত স্বামীজীকে হয় স্যান ফ্রানসিস্কোর যে অঞ্চল 'লিটল্ ইটালি' নামে পরিচিত সেই এলাকায় লুই জুলের রেস্তোরাঁয়, নয়তো শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার কোনও কাফেতে নিয়ে যেতেন। স্বামীজীর মন-মেজাজ এবং আবহাওয়া বুঝে প্রথমে স্থির করা হতো গরম গরম খাবার খাওয়া হবে, না আইসক্রীম খাওয়া হবে। তারপর সেইমতো খাওয়ার জায়গা ঠিক করা হতো। যে-দিনের কথা বলছি, সেদিন রাতে কনকনে ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে, ওভারকোট পরেও স্বামীজী ঠকঠক করে কাঁপছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন ঃ 'এই যদি নরক না হয়, তবে নরক কাকে বলে আমি জানি না।' কিন্তু মজার ব্যাপার এই, ঐ সাংঘাতিক শীতেও স্বামীজী আইসক্রীম খেতে চাইলেন। আইসক্রীম তাঁর বড় পছন্দের জিনিস ছিল কিনা! কাফে ছেড়ে বেরোবার কিছু আগে যে-ভক্ত-মহিলা সেদিন সকলকে খাওয়াচ্ছিলেন, তাঁকে একবার টেলিফোন করবার জন্য উঠতে হলো। টেবিল ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। ভদ্রমহিলা কয়েক পা এগোতেই স্বামীজী পিছন থেকে বলে উঠলেন ঃ 'কিন্তু বেশি দেরি করবেন না যেন; দেরি হলে ফিরে এসে দেখবেন, আপনার জন্য শুধু একটুকরো চকোলেট আইসক্রীম পড়ে আছে।'

আর একবার এক রেস্তোরাঁর পরিচারিকা ভুল করে আইসক্রীম সোডা এনে দেয়—যা স্বামীজী পছন্দ করতেন না। তিনি পরিচারিকাটিকে জিজ্ঞাসা করেন, ওটি বদলে দেওয়া সম্ভব কিনা। মেয়েটি স্বামীজীর কথায় রাজি হয়ে চলে গেলে স্বামীজী দূর থেকে লক্ষ্য করলেন, ম্যানেজার পরিচারিকাটির ওপর বেশ বিরক্ত হয়েছেন। তাই স্বামীজী, কে শুনলো না শুনলো চিন্তা না করেই চেঁচিয়ে বললেন ঃ 'দেখুন মশায়, আপনি যদি মেয়েটিকে বকাবকি করেন তাহলে কিন্তু আপনার এখানে যত আইস-ক্রীম সোডা আছে আমি একাই সব সাবাড় করে দেবো।'

খ্রীস্টানদের চার্চে সমবেতভাবে যেসব প্রার্থনা-সঙ্গীত গাওয়া হয়, সেগুলিকে তিনি কৌতুক করে বলতেন ঃ 'বোতল-ভাঙ্গা গান।' 'বিউলা ল্যান্ড' বলে যে প্রার্থনা-সঙ্গীতটি আছে সেটিকে নিয়ে তিনি দারুণ ঠাট্টা করতেন এবং মজার মজার সব কথা বলতেন। ঐ গানটির এক জায়গায় আছে,

শস্য ও সুরার দেশে পৌঁছে গেছি আমি
এখন এসব আমি লুটেপুটে খাবো।

আর একটি ছিল 'মিশনারি হিম।' এটিকে নিয়েও তিনি খুব মজা করতেন। ঐ গানে আছে, 'গ্রীনল্যাণ্ডের তুষারধবল পর্বতগুলি থেকে/ভারতের প্রবালদ্বীপ পর্যন্ত ...' ইত্যাদি। এই গানটি তাঁর সুন্দর গলায় আগাগোড়া গেয়ে স্বামীজী হঠাৎ এক সময় থেমে যেতেন; খুব নাটকীয়ভাবে হেসে তিনি নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠতেন ঃ 'আমিই সেই বিধর্মী যাকে উদ্ধার করতে তাঁরা এসেছিলেন।'

৩০ মার্চ স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখলেন ঃ 'আগামী সপ্তাহে শিকাগো যাচ্ছি।' স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করার জন্য নিউইয়র্কে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হয়। ২৩ এপ্রিল তিনি মেরি হেলকে লিখলেন ঃ 'আজই আমার রওনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাওয়ার আগে ক্যালিফর্নিয়ার বিশাল বিশাল রেড-উড গাছের নিচে বিছানো তাঁবুতে কয়েকদিন কাটানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাই তিন-চারদিনের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলাম।' তিন-চারদিন না বলে তাঁর তিন-চার সপ্তাহই বলা উচিত ছিল, কারণ ২৬ মে-র আগে তিনি 'বে' অঞ্চল ছেড়ে যাননি।

মিস বেল-ই ঐ শিবিরে কটা দিন কাটানোর জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করেন। জায়গাটির মালিক ছিলেন মিস্টার জুল। তিনি গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্য মিস বেলকে জায়গাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মিস বেল মিসেস এলোয়োজ রুরবাক এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন।

বিভিন্ন চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়, ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত স্বামীজী টার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটেই ছিলেন। তারপর উপসাগরের অপরপ্রান্তে অ্যালামেডায় দিনকয়েক কাটান এবং কিছু কাজ করেন। ফলে এটা নিশ্চিত যে, ২ মে-র আগে তিনি রেড-উড ক্যাম্পে যাননি।

২২ এপ্রিল মিস বেলের সঙ্গে মিসেস রুরবাক এবং আমি ক্যাম্প আরভিং[১]-এ গিয়ে বেশ গুছিয়ে বসলাম। জায়গাটা স্যান ফ্রানসিস্কোর কয়েক মাইল উত্তরে। একদিকে রেল লাইন আর অন্যদিকে খাঁড়ি—এই দুয়ের মাঝখানে একফালি সরু জমির উপর আমাদের এই শিবির। ক্যাম্পের এক প্রান্তে সারি সারি গাছ দিয়ে ঘেরা গোলাকার একটি জায়গায় আমাদের ক্লাস হতো। ঐখানে আমরা

১ ম্যারিন কাউন্টির গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের স্থান ক্যাম্প টেলরের প্রান্তভাগে অবস্থিত মিস্টার জুল-এর গ্রীষ্মাবাসের নাম।

ধ্যান এবং প্রার্থনাও করতাম। [প্রকৃতির হাতে তৈরি ঐটিই ছিল আমাদের উপাসনালয়। এ তো গেল ক্যাম্পের এক দিক।] অন্যদিকে ছিল আমাদের রান্নাঘর। রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম বলতে ছিল একটা স্টোভ আর দরকারি টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি একখানা ট্রাঙ্ক। গাছের তলায় চারদিক খোলা ঐ অস্থায়ী রান্নঘরের পাশেই রাখা হয়েছিল তক্তার একটা টেবিল আর তার দুপাশে গোটাকয়েক বেঞ্চ। গাছের গায়ে তাক বসিয়ে তার ওপর প্লেট সাজিয়ে রাখা হতো, আর গাছে পেরেক পুঁতে বাসনপত্র সব ঝুলিয়ে রাখা হতো। ভজনানন্দ ও ভোজনানন্দের এই দুই ব্যবস্থা ছাড়াও আমাদের থাকবার জন্য মাঝের ফাঁকা জমিতে চারটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। থাকার মধ্যে আর ছিল ক্যাম্প-ফায়ার বা তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালার একটা খোলা জায়গা।

স্বামীজী যেদিন ক্যাম্পে এলেন, সেদিন তাঁর সঙ্গে শান্তি-ও এসেছিলেন। বছর কয়েক আগে আমি যখন স্যান ফ্রানসিস্কোতে ছিলাম তখন শান্তির মুখেই শুনেছি কত চেষ্টা এবং প্রতিকূলতার পর স্বামীজী শেষপর্যন্ত শান্তিকে নিয়ে ক্যাম্পে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। ক্যাম্পে যাওয়া নিয়ে প্রথমে শান্তির মনে দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে স্বামীজীর সঙ্গী হয়ে ক্যাম্পে যাওয়ার বাসনা, অন্যদিকে তিনমাস অনুপস্থিতির পর লস এ্যানজেলেসে তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা—এই দুই ইচ্ছার দ্বন্দ্বে তাঁর চিত্ত অশান্ত হয়ে ওঠে। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত স্বামীজী বললেন ঃ 'এখন লস এ্যানজেলেসে যেয়ো না, আমার সঙ্গে ক্যাম্পে চলো। সেখানে তোমাকে ধ্যান শেখাবো।'

অ্যালামেডা থেকে ক্যাম্প আরভিং-এ যেতে হলে দু-জায়গায় খেয়া পার হতে হতো—উপসাগর পার হয়ে যেতে হতো স্যান ফ্রানসিস্কোয়, তারপর সেখান থেকে উত্তরে মেরিন কাউন্টিতে। অ্যালামেডা থেকে ডকে বা জাহাজঘাটায় যাওয়ার জন্য পাশাপাশি দুটি রেললাইন ছিল—একটি ব্রড গেজ, অন্যটি ন্যারো গেজ। স্বামীজী ও শান্তি একটা ট্রেন ধরতে না পেরে অন্য লাইনে যে-ট্রেনটি দাঁড়িয়েছিল, সেটিতে উঠলেন। ট্রেনে বসে তাঁরা সকালের খাওয়াটা অ্যালামেডা থেকে স্যান ফ্রানসিস্কো যাওয়ার স্টিমারেই সারবেন, না স্যান ফ্রানসিস্কো থেকে মেরিন কাউন্টিতে যাওয়ার পথেই সারবেন—এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ঐভাবে কাটানোর পর হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন তাঁদের গাড়িতে কোনও এঞ্জিনই লাগানো নেই! অগত্যা তাঁরা হোমে ফিরে সেখানেই প্রাতরাশ সেরে নিলেন। স্বামীজী শান্তিকে বললেন ঃ

'তোমার মনটা লস এ্যানজেলেসে পড়ে ছিল, সেই কারণেই আমরা ট্রেন ধরতে পারলাম না। জগতে এমন কোনও শক্তি নেই যা মানুষের মনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে পারে।'

শান্তি আমাকে বলেছিলেন দুবছর ধরে স্বামীজীর বই পড়ার পর ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দের শীতে কিভাবে লস এ্যাঞ্জেলেসে তিনি প্রথম স্বামীজীর বক্তৃতা শোনেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অল্পদিনের মধ্যেই একটি সমিতি গড়ে উঠলো, তার প্রথম সম্পাদক হলেন শান্তি। ব্ল্যানচার্ড হল, লস এ্যাঞ্জেলেস হোম অফ ট্রুথ, প্যাসাডেনার শেক্সপীয়ার ক্লাব এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় স্বামীজী বক্তৃতা দেন। স্বামীজী সেই সময়ে মিসেস এস. কে. ব্লজেট-এর বাড়িতে থাকতেন। দক্ষিণ প্যাসাডেনায় মীড ভগ্নীদের গৃহেও তিনি অতিথি হয়েছিলেন। ঐ মীড-ভগ্নীদের অন্যতমা শান্তি; অন্য দুজন হলেন মিসেস ক্যারি মীড ওয়াইকফ্ এবং হেলেন মীড। মিসেস ওয়াইকফ্ পরবর্তী কালে তাঁর হলিউডের বাড়িটি দান করেন। সেখানেই দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কার্যালয় গড়ে ওঠে। আর হেলেন মীড? তিনি লস এ্যাঞ্জেলেসে দেওয়া কিছু বক্তৃতা শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছিলেন। ওকল্যান্ড যাওয়ার সময় স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'তোমরা তিন বোন চিরদিন আমার মন জুড়ে থাকবে।'

শান্তি আমাকে বলেছিলেন ঃ "স্বামীজী এতটাই সরল ছিলেন যে, সকলকেই তিনি নিজের স্তরে টেনে তুলতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ 'তোমার মধ্যে শ্রদ্ধার ভাবটা একেবারেই নেই।' আমি এই কথা পরে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলায় তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। কিন্তু জানবে, তোমার মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব দেখে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। দুজনেই যেখানে সমান, সেখানেই প্রকৃত বিশুদ্ধ ভালবাসার বিনিময় সম্ভব। যেখানে ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই, সেখানেই তো যথার্থ একাত্মতা।' "

ওকল্যান্ডের ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেয়ে স্বামীজী শান্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি উত্তরাঞ্চলে যেতে চান কিনা। বলেছিলেন ঃ 'যদি যেতে চাও তো কারো আপত্তি শুনো না।' শান্তিও বিনা দ্বিধায় স্যান ফ্রানসিস্কোয় গেলেন, সেখান থেকে অবশেষে ক্যাম্প আরভিং-এ। ক্যাম্পে গিয়ে শান্তি খুব কাজকর্ম করতেন। মনপ্রাণ দিয়ে স্বামীজীর দেখাশুনা করতেন। স্বামীজীর কখন কি প্রয়োজন, তাঁকে কিভাবে একটু আরামে রাখা

যায়—এইসব ব্যাপারে খুবই সজাগ থাকতেন। একদিন সকালে ক্লাসের সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু স্বামীজী দেখলেন শান্তি তখনো রান্নায় ব্যস্ত। স্বামীজী প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি ধ্যান করতে যাবে না?' শান্তি উত্তর দিলেন ঃ 'হ্যাঁ যাবো। কিন্তু তার আগে এই স্যুপটুকু ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটে গেলেই ক্লাসে আসবো।'

শান্তির উত্তরে খুশি হয়ে স্বামীজী বললেন ঃ 'বেশ, বেশ। আমাদের গুরুদেব বলতেন—সেবার স্বার্থে তুমি ধ্যানও বাদ দিতে পারো।'

আমার এই দীর্ঘ জীবনে দুটি রাতের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। দুটি রাতের যে কোনও একটির কথা মনে হলেই দুঃখকষ্ট সব কোথায় উবে যায়! প্রথম স্মৃতিটি শান্তি আশ্রমে আমার প্রথম রাত্রি যাপনের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত। ঐ আশ্রমে তখন স্বামী তুরীয়ানন্দ ছিলেন। তাঁর কথা আগেই লিখেছি। দ্বিতীয় স্মৃতি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২ মে রাতের। ক্যাম্প টেলর-এ স্বামীজীর সেই প্রথম রাত্রিযাপন। চোখ বুঁজলে আজও দেখতে পাই, সন্ধ্যার ঘনায়মান স্নিগ্ধ অন্ধকারে স্বামীজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামনে ধুনির জ্বলন্ত কাঠ থেকে স্ফুলিঙ্গ উড়ে উড়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে প্রতিপদের চাঁদ। বহুদিন ধরে ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও সেই মুহূর্তে স্বামীজীকে বেশ নিশ্চিন্ত এবং তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ 'আমাদের জীবনের আরম্ভ অরণ্যে, শেষেও সেই অরণ্যবাস। কিন্তু এই দুই-এর মাঝে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না আমাদের হয়!' স্বামীজীর আরও কিছু কথার পর আমরা যখন রোজকার মতো ধ্যানের জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন তিনি বলে উঠলেন ঃ 'তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো যে কোনও বিষয়ের ওপর ধ্যান করতে পারো, তবে আমি ধ্যানে সিংহের হৃদয়ের কথাই চিন্তা করবো। তাতে শক্তি আসে।' সেদিন ধ্যান করে আমরা যে কী শান্তি, কী আনন্দ, কী শক্তি পেয়েছিলাম, তা বর্ণনার অসাধ্য।

পরের দিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সকালে জলখাবার খেয়ে স্বামীজী মিস বেলের খাটিয়ায় বসে অনেকক্ষণ কথা বললেন। তাঁর গায়ে তখন জ্বর। সে রাতে তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তাঁর গুরুভাইদের নামে সব কিছু লিখে দিয়ে তিনি একটি উইল পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। শান্তি ও কল্যাণী তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেন। এখনো দৃশ্যটি চোখের সামনে ভাসছে—একদিকে মুষলধারে বৃষ্টি, আর অন্যদিকে শান্তি স্বামীজীর তাঁবুর ওপর অতিরিক্ত একটা ত্রিপল বিছিয়ে দিতে ব্যস্ত। বৃষ্টির জলে সে ভিজে একশেষ, কিন্তু কোনওদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই! মিস বেলের সঙ্গে আমি যে-তাঁবুতে থাকতাম ঠিক তার বিপরীত দিকেই স্বামীজীর তাঁবু।

পরদিন, অর্থাৎ শনিবারে মিস বেল এবং আমাকে স্যান ফ্রানসিস্কোয় যেতে হয়। রবিবার বিকেলে ফিরে দেখি স্বামীজী অনেকটা সুস্থ। যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, সেইজন্যই স্বামীজীকে ক্যাম্পে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোথায় বিশ্রাম! প্রতিদিন প্রাতরাশের পাট চুকলেই তিনি মিস বেলের খাটিয়ায় বসে বহুক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, গল্প বলতেন আর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং বোঝাপড়ার উন্নতি হোক—স্বামীজী এটা খুব চাইতেন এবং বলতেন, এতে উভয়েরই মঙ্গল। টমাস আ কেম্পিসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাভক্তির কথা তিনি বলতেন। বলতেন, পরিব্রাজক অবস্থায় যখন তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করছেন তখন তাঁর কাছে দুটি বই সর্বক্ষণ থাকতো। তার একটি হলো 'গীতা', আর অন্যটি কেম্পিসের 'দ্য ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট'। শেষের গ্রন্থটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েই স্যান ফ্রানসিস্কোতে একটি বক্তৃতার তিনি উপসংহার টানেন এই বলে ঃ 'আচার্যরা সব নীরব হন, নীরব হোক সব শাস্ত্র। শুধু তুমি, হে ঈশ্বর, শুধু তুমি আমার অন্তরে থেকে কথা বলো।'

সকালের সৎ প্রসঙ্গ এবং ধ্যানের পর স্বামীজী রান্নাবান্নার তদারকি করতেন; আবার কখনো কখনো নিজেও হাত লাগাতেন। তিনি আমাদের তরকারি রেঁধে খাওয়াতেন; ভারতবর্ষে কেমন করে মশলা বাটা হয় তাও দেখাতেন। নিজের তাঁবুর ভিতর একটা হালকা বাটির মতো পাথর কোলে নিয়ে তিনি মেঝের ওপর থেবড়ে বসতেন; তারপর সেই বাটিতে মশলা রেখে একটা মসৃণ গোল পাথরের সাহায্যে তা পিষে ফেলতেন। আমরা পাত্রে গোটা মশলা রেখে ছুরি দিয়ে যে-ভাবে গুঁড়ো করতাম, স্বামীজীর পেষা মশলা তার চেয়ে অনেক বেশি মিহি হতো। ঐ মশলা দিয়ে রান্না ব্যঞ্জন এমনিতেই আমাদের জিভে বেশ ঝাল লাগতো, কিন্তু স্বামীজীর তাতেও হতো না। খাওয়ার সময় পাতের এক পাশে তিনি ছোট ছোট বিষ-ঝাল লঙ্কা নিয়ে বসতেন। মাঝে মাঝে মাথাটি পিছন দিকে হেলিয়ে, হাতটি গোল করে ঘুরিয়ে লঙ্কাগুলো তিনি টপাটপ মুখের ভিতর চালান করে দিতেন। একবার আমার হাতে একটা লঙ্কা দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'এটা খেয়ে ফেলো দেখি, তোমার উপকার হবে।'

স্বামীজী দিলে লঙ্কা তো দূরের কথা, বিষও খাওয়া যায়। তাই আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর আদেশ পালন করলাম। কিন্তু তারপর প্রাণ যায় আর কি! আমার ঐ অবস্থা দেখে স্বামীজীর তো মহা উল্লাস! থেকে থেকেই সারাটা বিকেল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ঃ 'তোমার উনুন জ্বলছে কেমন?'

আর একবার স্বামীজী আমাদের জন্য মিছরি তৈরি করে বলেছিলেন—মিষ্টির মধ্যে এটাই হচ্ছে সবথেকে শুদ্ধ; ক্রমাগত ফোটানোর ফলে ওর সব অশুদ্ধতা বা দোষ কেটে যায়।

খাওয়ার সময় আমাদের গল্প আর হাসি-ঠাট্টার ফোয়ারা ছুটতো; খুব একটা সহজ, ঘরোয়া, আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হতো। শান্তি আলাস্কায় ছিলেন, তাই কষ্ট সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত, শান্তি সামাজিকতার ব্যাপারেও ছিলেন উদাসীন। এইসব কারণে স্বামীজী তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। একবার প্রাতরাশের আসরে স্বামীজী উঠে গিয়ে শান্তির প্লেট থেকে একটু খাবার তুলে নিতে নিতে বললেন ঃ 'আমরা দুজনেই ভবঘুরে, অতএব এক প্লেট থেকেই আমাদের খাওয়া উচিত।' তিনি শান্তিকে আরও বলেন ঃ 'তুমি আমার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে গিয়েছ—চিরকালের জন্য।' আর কল্যাণীকে বলেন ঃ তুমি যদি অভ্রভেদী পর্বতশিখরেও থাকতে, আমার সেবার জন্য তোমাকে নিচে নেমে আসতে হতোই হতো। উত্তরে কল্যাণী বলেছিলেন ঃ 'আমি তা জানি, স্বামীজী।'

কোনও কিছুই স্বামীজীর দৃষ্টি এড়াত না। আমাদের ক্যাম্পে একটি মেক্সিকান বা রেড ইন্ডিয়ান ছেলে ফাইফরমাশ খাটতো। একদিন প্রাতরাশের সময়ে স্বামীজী লক্ষ্য করলেন ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে আমাদের খাওয়া দেখছে। পরে ছেলেটির সঙ্গে স্বামীজী কথা বললে সে অভিযোগ করে—তাকে কফি দেওয়া হয়নি। সে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল ঃ 'কালা আদমিরা যেমন কফি ভালবাসে, সাদা আদমিরা যেমন কফি ভালবাসে, লাল আদমিরাও ঠিক তেমনি কফি ভালবাসে।' ছেলেটির বলার ধরন দেখে স্বামীজী খুব মজা পেলেন। তিনি তখনই ছেলেটিকে কফি দিতে বললেন। তারপর সারাটা বিকেল তিনি ছেলেটির ঐ মন্তব্য নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলেন।

বিকেলে আমরা অনেকটা পথ হেঁটে আসতাম। আর সারাদিনের কর্মব্যস্ততার চূড়ান্ত পরিণতি হতো সন্ধ্যায়, যখন আগুনের ধারে বসে আমাদের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ চলতো এবং তারপর ধ্যান। সৎপ্রসঙ্গ করার সময়ে স্বামীজী অনেক গল্প বলতেন এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তারপর তিনি স্তোত্র আবৃত্তি করতেন। কিন্তু আবৃত্তির আগে স্বামীজী একটি ধ্যানের বিষয় বলে দিতেন। যেমন, একদিন হয়তো বললেন—তোমরা আজ নিজেদের 'অটল এবং নির্ভীক' ভাবতে চেষ্টা করো। একদিন সকালে তিনি 'পরম সত্য, ঐক্য এবং

মুক্তি' বিষয়ে আলোচনা করে আমাদের উদ্দীপিত করে দিলেন। ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যায় 'আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম'—এই বিষয়ে ধ্যানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ভাবগম্ভীর সকাল, আনন্দোচ্ছল অপরাহ্ণ এবং ধ্যানতন্ময় সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে এইভাবে আমাদের দিনগুলি বড় দ্রুত ফুরিয়ে যেতে লাগলো।

মিস বেল যখন তাঁর সঙ্গে ক্যাম্প আরভিং-এ গ্রীষ্মকালটা কাটানোর জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানান তখন ঠিক হয়েছিল—প্রতি শনিবার সকালে আমি স্যান ফ্রানসিস্কোয় যাবো এবং ঐদিন বিকেলবেলা সেখানে সঙ্গীত শিক্ষাদানের কাজটি করবো। রবিবার মিস বেলের বক্তৃতার পর ফিরে আসবো। মিস বেলের বক্তৃতাটি শর্টহ্যান্ডে লিখে নেওয়ার দায়িত্বও আমার ছিল। ক্যাম্পে থাকাকালীন দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রবার বিকেলে—কি কারণে মনে নেই—মিস বেল একাই স্যান ফ্রানসিস্কো চলে যান; কথা ছিল, শনিবার আমাকে যেতে হবে।

শনিবারের ট্রেন ধরার জন্য যখন আমি তৈরি হচ্ছি, স্বামীজী বললেন ঃ 'তুমি কেন যাচ্ছ?' বললাম ঃ 'আমাকে তো যেতেই হবে, স্বামীজী। আমাকে যে গানের ক্লাস নিতে হবে।' স্বামীজীকে ঐ উত্তর দিতে হয়েছিল বলে আমার মনে বরাবরের জন্য একটা আক্ষেপ থেকে গেছে। আসলে ঐ ক্লাসের দরুণ কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য তো আর আমি স্যান ফ্রানসিস্কো যাইনি; গিয়েছিলাম মিস বেলের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করার তাগিদে।

আমার কথা শুনে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'বেশ যাচ্ছ যাও। তবে রোজগারপত্তর করে লাখ পাঁচেক ডলার ভারতবর্ষে আমার কাজের জন্য পাঠিয়ে দিয়ো।'

সেদিন স্বামীজী উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে রেল লাইন পর্যন্ত আমাকে নিয়ে গেলেন এবং হাত নেড়ে ট্রেন থামান। ওখানে কোনও স্টেশন না থাকায় যাত্রীরা সংকেত দিলে তবেই ট্রেন দাঁড়াতো।

স্বামীজীর চালচলন এবং ব্যবহার ছিল মহিমাব্যঞ্জক। সর্বদাই ঊর্ধ্বদৃষ্টি, তাঁর চোখ আকাশ থেকে মাটিতে নামতো না বললেই হয়। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে একজন রহস্য করে বলেছিলেন, স্বামীজীর দৃষ্টি বড়জোর টেলিগ্রাফ-খুঁটির মাথা পর্যন্ত নামে।

স্বামীজীর সংকেতে ট্রেনের গতি কমে এলো। এঞ্জিনটি যখন আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন শুনলাম ট্রেনের খালাসী ড্রাইভারকে বলছে ঃ 'আরে ভাই,

এই গগনবিহারীটি কে?’ ঐ রকম একটি কথা আগে কখনো শুনিনি। তাই ভেবে পেলাম না লোকটি ঠিক কি বলতে চাইছে। পরে, অনেক ভেবেচিন্তে বুঝলাম কথাটার মানে নিশ্চয় ধর্মগুরু, কারণ যে-কেউই দেখামাত্র বুঝতে পারতেন স্বামীজী একজন ধর্মাচার্য।

সপ্তাহের শেষে আমার ঐ স্যান ফ্রানসিস্কো চলে যাওয়াটা আমার কাছে চিরদিন একটা আক্ষেপের ব্যাপার হয়ে আছে। কারণ ঠিক তার পর-পরই স্বামীজী ক্যাম্প আরভিং থেকে অন্যত্র চলে যান। ভারতবর্ষে তাঁর কাজের জন্য সেই পাঁচ লক্ষ ডলার এখনো অর্জন করা হয়নি বটে, তবে আমার অবোধ মন এখনো আশায় আশায় আছে যে, কোনও এক অলৌকিক উপায়ে হয়তো এই অর্থ সত্যিই একদিন জুটে যাবে। স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায়ই বলতেন ঃ ‘মায়ের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়।’

স্বামীজী ঠিক কত তারিখে ক্যাম্প আরভিং থেকে চলে গিয়েছিলেন তা বলতে পারি না। তবে তাঁর পত্রাবলী থেকে বোঝা যায় ২৬ মে তারিখেও তিনি স্যান ফ্রানসিস্কোয় ডাঃ এম. এইচ. লোগান-এর বাড়িতে ছিলেন এবং ২৬, ২৮ ও ২৯ মে গীতার ওপর তিনটি বক্তৃতা করেছিলেন। লস এ্যাঞ্জেলেস থেকে ১৭ জুন একটি চিঠিতে স্বামীজী লেখেন ঃ ‘দিন কয়েকের মধ্যেই শিকাগো যাচ্ছি।’ ১১ জুলাই স্বামীজী নিউইয়র্কে ছিলেন।

টম অ্যালান (অজয়) এবং তাঁর স্ত্রী এডিথ (বিরজা) আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু। ওঁদের দুজনের মুখ থেকে স্বামীজীর কথা অনেক শুনেছি। স্বামীজীকে প্রথমবার দর্শন করে তাঁদের কি অনুভূতি হয় এবং পরবর্তী কালে তাঁকে কেন্দ্র করে দুজনের নানা অভিজ্ঞতা—বিশেষ করে স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা কতটা উপকৃত হয়েছিলেন—সেইসব কথা তাঁরা আমাকে সবিস্তারে বহুবার বলেছেন।

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী যখন প্রথম ওকল্যান্ডে আসেন তখন এডিথ খুবই অসুস্থ। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল একজন হিন্দু সন্ন্যাসী বক্তৃতা দেবেন। তাই দেখে টম একাই সেখানে যান। বক্তৃতা শুনে যখন ফিরলেন, তখন তিনি তো একেবারে উচ্ছ্বসিত। কোনওমতেই আবেগ চাপতে না পেরে তিনি স্ত্রীকে বললেন ঃ ‘আমি আজ এমন একজনকে দেখে এলাম যিনি মানুষ নন, দেবতা! তিনি যা বললেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য।’ এডিথের প্রশ্ন ঃ তুমি এমন কি শুনে এলে যা তোমাকে এতটা অভিভূত করেছে?

টম জানালেন দুটি কথা তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। এক—ভালো আর মন্দ একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি পাওয়া যায় না। হোম অফ ট্রুথ-এ অবশ্য আমাদের শেখানো হয়েছিল—সবই ভালো, মন্দ বলে কিছুই নেই। দুই—গরু কখনো মিথ্যা বলতে পারে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও গরু গরুই থেকে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে পারে, আবার সে দেবতাও হয়ে উঠতে পারে।

টম অবিলম্বে স্বামীজীর কাজে লেগে গেলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সময় সভায় ঘোষকের কাজটি করতে লাগলেন। সুস্থ হওয়ামাত্রই এডিথও একদিন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে গেলেন। সেদিন বক্তৃতার প্রবেশমূল্য বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল টম তা গুনছিলেন আর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এডিথ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময়ে স্বামীজীর নজর পড়লো এডিথের ওপর। স্বামীজী তাঁকে বললেন ঃ 'ম্যাডাম, আপনি এদিকে আসুন।' এডিথ কাছে যেতে স্বামীজী বলেন ঃ 'আপনি যদি আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চান তো আমার ফ্ল্যাটে আসতে পারেন। ওখানে দেখা করতে গেলে কোনও দক্ষিণা দিতে হয় না।'

'কখন আসবো?' এডিথের প্রশ্ন।

স্বামীজী বললেন ঃ 'আগামী কাল সকাল নটায়।'

পরদিন সকালে স্বামীজীর ফ্ল্যাটে গিয়ে এডিথ দেয়ালের ভিতর দিকে ঢোকানো জানালার একপাশে বসলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামীজী স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ঘরে ঢুকলেন, বসলেন জানালার অপর প্রান্তে। 'বলুন, ম্যাডাম'—স্বামীজীই প্রথম কথা বললেন। কিন্তু কথা বলবেন কি, এডিথের মনের অবস্থা তখন এমন যে তিনি চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। বহুক্ষণ অঝোরে কাঁদবার পর স্বামীজী তাঁকে বললেন ঃ 'আগামী কাল ঠিক এই সময়ে আসুন।'

এরপর আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য এডিথ বেশ কয়েকবার স্বামীজীর কাছে গিয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁকে প্রাণায়ামের কয়েকটি সহজ প্রণালী শিখিয়ে দেন। সেইসঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন তাঁর [স্বামীজীর] অনুপস্থিতিতে যেন ঐগুলির অভ্যাস না করা হয়।

স্বামীজী এডিথকে বলেছিলেন পাশ্চাত্যে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে 'হোম অফ ট্রুথ', তাঁর মতে, সবচেয়ে ভালো কাজ করছে। 'হোম'-এর কর্মীরা যে বিনা পারিশ্রমিকে মানুষকে অধ্যাত্ম ব্যাপারে সাহায্য করছেন, স্বামীজী তারও খুব প্রশংসা করেন।

একবার স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'আমি এমন একজনের শিষ্য যিনি নিজের নাম পর্যন্ত লিখতে পারতেন না। কিন্তু আমি জানি, আমি তাঁর জুতো খোলারও যোগ্য নই। কতবার ভেবেছি, আমার বিদ্যাবুদ্ধির বোঝাটুকু যদি গঙ্গায় বিসর্জন দিতে পারতুম তো বেশ হতো।'

এক ভদ্রমহিলা স্বামীজীর ঐ কথার প্রতিবাদ করে বললেন ঃ 'কিন্তু স্বামীজী, বুদ্ধিমত্তার জন্যই তো আপনাকে আমরা এত পছন্দ করি।' তার উত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ 'হ্যাঁ, তার কারণ আপনি আমারই মতো আহাম্মক, ম্যাডাম।'

শেষদিন ক্লাসের পর এডিথ যখন নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন স্বামীজী উচ্চস্বরে বলে উঠেন ঃ 'ম্যাডাম, যাবেন না। ডাইনিং-রুমে গিয়ে একটু বসুন।' তারপর একে একে সকলকে বিদায় জানিয়ে স্বামীজী ভিতরে এসে এডিথকে বললেন—আজ আপনি এখানেই খেয়ে যান। এই কথা বলে স্বামীজী নিজেই রান্না আরম্ভ করে দিলেন আর এডিথকে আলু, পেঁয়াজ ছাড়ানোর কাজে লাগিয়ে দিলেন। স্বামীজী কাজ করছেন আর গীতার শ্লোক আবৃত্তি করছেন। হঠাৎ এক সময় কাজ বন্ধ করে তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক শ্লোকটি ইংরেজিতে আবৃত্তি করতে লাগলেন, যার অর্থ ঈশ্বর সর্বভূতের অন্তরে বিরাজ করে মায়ার চক্র দ্বারা তাদের যন্ত্রবৎ ঘোরাচ্ছেন। স্বামীজী বললেন ঃ 'অতএব দেখুন, ম্যাডাম, তিনিই আমাদের চাকায় ফেলে ঘোরাচ্ছেন। আমরা কি করতে পারি, বলুন?'

স্বামীজী কিছুদিন অ্যালামেডা হোম অফ ট্রুথ-এ ছিলেন। সে সময়ে এডিথ তাঁকে রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করতেন। সেই দিনগুলির তাৎপর্য এডিথের জীবনে অপরিসীম। ভিতরের ঘরে যখন উপাসনাদি চলতো, স্বামীজী এবং এডিথ তখন রান্নাঘরে খাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীজী তখন খুব হাসিখুশি ও সহজ মেজাজে থাকতেন; কিন্তু তারই মধ্যে এডিথকে সুযোগ মতো ছোটখাট ঘটনার মাধ্যমে তিনি অনেক শিক্ষাও দিয়েছেন। একদিন এডিথ তাঁর ঝকঝকে সুন্দর একটি সবুজ পোশাক পরে রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। পোশাকটি নতুন এবং তাই নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। রান্নার সময়ে হঠাৎ কড়া থেকে মাখন ছিটকে তাঁর ঐ পোশাকের ওপর পড়ায় এডিথ তো হায় হায় করতে লাগলেন, যেন এক মহা সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বামীজী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে তিনি যেমন নিজের কাজ করছিলেন, তেমনই করে যেতে লাগলেন।

একবার ছোট একটি কাঠের প্লেটে কিছু আচার কিনে আনা হয়েছিল। আচারের খানিকটা রস স্বামীজীর হাতে গড়িয়ে পড়ে। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে রসটুকু তুলে নিয়ে সেই আঙুল মুখে পুরে চেটে নেন। ব্যাপারটি এডিথের চোখে অশোভন মনে হওয়ায় তিনি বলে উঠলেন ঃ 'স্বামীজী, ও কি করছেন!' অবিচলিত কণ্ঠে স্বামীজী বললেন ঃ 'ঐ তোমাদের এক দোষ। বাইরের তুচ্ছ ঠাটবাট নিয়ে তোমরা বড্ড বেশি মাথা ঘামাও।'

টমও তাঁর বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সময় তিনি ঘোষকের কাজ করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে শ্রোতাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিতেন। প্রথমবার যখন তিনি স্বামীজীর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়ান তখন তাঁর অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজী যেন প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা আর তাঁর নিজের উচ্চতা মাত্র ছয় ইঞ্চি! এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর থেকে মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়েই টম শ্রোতাদের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করিয়ে দিতেন।

একবার স্বামীজীর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেবার কথা। বক্তৃতা শুরু করার ঠিক আগে তিনি টমকে বলেন ঃ 'ভারত সম্পর্কে বলতে শুরু করলে আমি আর থামতে পারি না। তাই দশটা বাজলে তুমি আমাকে একটু মনে করিয়ে দিয়ো।' স্বামীজীর কথামতো টম সেদিন হলের একেবারে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দশটা বাজতেই স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিজের ঘড়িটা বার করে পেণ্ডুলামের মতো দোলাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে দোদুল্যমান ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ায় স্বামীজী শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'ওঁদের বলে রেখেছিলাম দশটা বাজলে আমাকে যেন থামিয়ে দেওয়া হয়। ওঁরা তাই ঘড়ি দোলাচ্ছেন, অথচ আমার বক্তব্য এখনো শুরুই হয়নি।' যাই হোক, সেদিন স্বামীজী ঐখানেই থামলেন। সেদিন থেকে আমৃত্যু ঐ পুরনো ঘড়িটিই ছিল টম অ্যালান-এর নিত্য সঙ্গী। একদিনের জন্যও ঘড়িটিকে তিনি কাছছাড়া করেননি।

ইস্টারের রবিবার রাতে 'হোম অফ ট্রুথ'-এর বারান্দায় উপবিষ্ট কয়েকজন বন্ধুর কাছে স্বামীজী তাঁর আমেরিকা বাসের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, একবার পায়ের চিকিৎসার জন্য তাঁকে এক মহিলা Chiropodist [পদরোগ বিশেষজ্ঞ]-এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ ডাক্তারের কাছে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা যে খুব একটা সুখকর হয়নি তা বেশ বোঝা গেল তাঁর বার কয়েক 'lady toe-doctor' সম্বোধনে। পরেও

বলতেন ঃ 'ঐ-মহিলাটির কথা মনে হলেই আমার পায়ের আঙুল ব্যথায় ঝনঝন করে ওঠে।'

ঐ সন্ধ্যায় কেউ একজন স্বামীজীকে ত্যাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ 'তোমরা শিশু! তোমরা ত্যাগের কি বোঝ? যদি তোমরা আমার চেলা হতে চাও তো টুঁ-শব্দটি না করে তোপের মুখে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে।'

জাতিতে ইংরেজ টম ছিলেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার। জাহাজ-নির্মাণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সৈনিকোচিত কাঠিন্য ছিল তাঁর চেহারায়। একদিন সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বামীজী টমকে বললেন ঃ 'মিস্টার অ্যালান, আমরা দুজনেই এক জাতের মানুষ—আমরা সৈনিক।' টম জানতে চাইলেন স্বামীজী কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠ-শিষ্যদের পেয়েছেন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ ' ইংল্যাণ্ডে। ওদের খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত; কিন্তু একবার পেলে ওরা চিরকালের জন্য বাঁধা পড়ে।'

স্বামীজী যখন যেখানে যেতেন, সেখানেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটি রাজকীয় আভিজাত্য ছিল যা কারোরই দৃষ্টি এড়াতো না। মার্কেট স্ট্রীট দিয়ে যখন তিনি হেঁটে যেতেন পথচারীরা সসম্ভ্রমে তাঁকে পথ ছেড়ে দিত। আবার কেউ কেউ ঘুরে দাঁড়িয়ে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে প্রশ্ন করতো ঃ 'এই হিন্দু রাজাটি কে?'

স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব কেমন ছিল তা একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে বোঝা যাবে। একবার স্বামীজীর ইচ্ছা হলো জাহাজ ভাসানো দেখবেন। টমের কানে গেল সে-কথা। তিনি তখন স্যান ফ্রানসিস্কোর একটা বড় ইস্পাত কারখানায় কাজ করেন। সুযোগ বুঝে তিনি স্বামীজী-সহ কয়েকজনের ছোট একটি দলকে একদিন একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানায় নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন একটি জাহাজ জলে ভাসানো হবে। ঐ অনুষ্ঠান দেখার জন্য জাহাজ কোম্পানিটি তাঁদের নিজস্ব কিছু বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে টিকিট বিতরণ করেছিলেন। যাঁদের টিকিট ছিল কেবল তাঁদেরই জাহাজ ভাসানোর মঞ্চের কাছাকাছি যেতে দেওয়া হচ্ছিল। বাকিরা সব দূর থেকে অনুষ্ঠানটি দেখবেন—এই ছিল ব্যবস্থা। মঞ্চের প্রবেশপথের মুখে দুই পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর ইচ্ছা সমগ্র অনুষ্ঠানটি তিনি মঞ্চ থেকে ভালোভাবে দেখেন। তাই কোনওকিছুর তোয়াক্কা না করেই ধীর গম্ভীরভাবে পাহারাদারদের

সামনে দিয়ে তিনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আশ্চর্য, পাহারাদাররাও কোনওরকম প্রতিবাদ করলো না। জাহাজ ভাসানো হয়ে গেলে নিচে নেমে এসে তিনি বললেন ঃ 'ঠিক যেন একটি শিশুর জন্ম হলো।'

স্বামীজী দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, অধ্যাত্ম জগতের মানুষরা কখনো ধর্মান্ধ বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হন না। আবার রহস্য করে এও বলতেন ঃ 'তাঁদের মুখাকৃতি লম্বাটে হয় না; চেহারাও রোগা নয়। তাঁরা আমারই মতো নাদুস-নুদুস।'

ক্যাম্প আরভিং-এ মিস বেলের তাঁবুতে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বেল বললেন, এই পৃথিবীটা যেন এক পাঠশালা। আমরা এখানে সব শিখতে আসি। এই কথা শুনে স্বামীজীর প্রশ্ন ঃ 'এই পৃথিবীটা যে একটা পাঠশালা একথা আপনাকে কে বললো?'

মিস বেল চুপ করে গেলেন। স্বামীজী বলতে লাগলেন ঃ 'এই পৃথিবীটা একটা সার্কাস, আর আমরা সব সার্কাসের ভাঁড়—আছাড় খেতেই এখানে আসা।' মিস বেল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আমরা আছাড় খাই কেন, স্বামীজী?' স্বামীজীর উত্তর ঃ 'তার কারণ, আমরা আছাড় খেতে বড়ই ভালোবাসি। ধাক্কা খেতে খেতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই আমাদের বিদায় নিতে হয়।'

স্যান ফ্রানসিস্কোয় টম আর এডিথের একটা ফ্ল্যাট ছিল। সেই আবাসের পরিমণ্ডল যেন স্বামীজীর ভাবে পূর্ণ হয়ে থাকতো। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যেসব সন্ন্যাসী এদেশে আসতেন, তাঁরা স্যান ফ্রানসিস্কোতে এলে সানন্দে এঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন, আবার কেউ কেউ লিখেছেনও যে ঃ 'পাশ্চাত্যে অনেকেই তো আছেন, কিন্তু তোমাদের কাছে এলে স্বামীজীকে আমরা যেমন নিবিড় করে পাই, তেমনটি আর কোথাও নয়।'

বছর কয়েক আগে আমার এক বন্ধু তাঁর ছেলের সঙ্গে অ্যালানদের ওখানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমার বন্ধুটি বলেন, অ্যালানরা এমন আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ করছিলেন, এমন প্রাণবন্ত করে তাঁর কথা বলছিলেন যে, শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, স্বামীজী বুঝি এক্ষুনি ঘরে প্রবেশ করবেন।

অ্যালানদের খাওয়ার ঘরে স্বামীজীর সুন্দর একটি ছবি টাঙানো ছিল। ছবিটির ঠিক মুখোমুখি অতিথিরা বসতেন। খাওয়ার আগে রোজ স্তোত্রাদি গাওয়া হতো এবং খাওয়ার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজী ও তাঁর কর্মের প্রসঙ্গ

ছাড়া অন্য কোনও বিষয় আলোচিত হতো না বললেই চলে। স্বামীজীর সমস্ত বই ওঁদের কাছে ছিল। তা ছাড়া ওঁদের ছিল ছবির এক অসামান্য সংগ্রহ। কোনও অতিথি এলেই সেইসব ছবি দেখিয়ে তাঁরা খুব আনন্দ পেতেন। বাগানের মধ্যে তোলা স্বামীজীর একটি ছবি ওদের বিশেষ প্রিয় ছিল। স্বামীজী একদিন ঘাসের ওপর শুয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। এমন সময়ে একজন এসে তাঁর ছবি তুলতে চাইলেন। স্বামীজী তো প্রথমটায় কিছুতেই উঠলেন না। শেষে সকলের পীড়াপীড়িতে যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় পাগড়ি নেই, গায়ে গেরুয়া নেই, পুষ্পিত আঙ্গুরলতার ঝোপের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। মুখের ভাব এমন, যেন কিছু বলবেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ছবিটি তোলা হয়। দেখা গেল একটি অনবদ্য ছবি (পোর্ট্রেট) হয়েছে।

এডিথের কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং মৃদু। স্বামীজীর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এমন কিছু গান তিনি মাঝে মাঝে গভীর আবেগের সঙ্গে গাইতেন। তাঁর প্রিয় গানগুলির মধ্যে ছিল প্রথমবার আমেরিকায় আসার আগে রাজদরবারে এক বাইজির গলায় যে-গানটি শুনে স্বামীজী খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই গানটি। অবশ্য বাইজির গান হবে শুনেই তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। গানটি তিনি শোনেন বাইরে থেকে এবং শুনেই গানের বাণী এবং দরদী গায়নভঙ্গিতে তিনি এমনই অভিভূত হন যে অবিলম্বে রাজসভাকক্ষে গিয়ে অতীব আন্তরিকতার সঙ্গে গায়িকাটির সঙ্গে কথা বলেন। গায়িকা যে-শিক্ষা তাঁকে দিয়েছেন সেজন্যও স্বামীজী তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। যদি সাত্ত্বিকতার ছিটেফোঁটা অভিমানও তাঁর মধ্যে থেকে থাকে, ঐদিন থেকে তাও বিদূরিত হলো। পাশ্চাত্যের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তিনি যেন ঐভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ করে নিলেন।

স্বামীজী বাইজির গাওয়া ঐ-গানটির যে ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন, এডিথ সেইটি গাইতেন। স্বামীজী যেদিন অসহায় এডিথের প্রয়োজন বুঝে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান, সেইদিন থেকেই তিনি এডিথের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। এরপর একটি দিনের জন্যও এডিথ স্বামীজীকে বিস্মৃত হননি। শেষ বিদায়ের লগ্নে স্বামীজী যে কথাকটি তাঁকে বলেছিলেন, বিগত পঞ্চাশ বছরে এডিথ অনেক, অনেকবার তা স্মরণ করেছেন। স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন ঃ 'যদি কখনো বিপদে পড়ো, আমাকে স্মরণ কোর। যেখানে থাকি না কেন, আমি তোমার ডাক ঠিক শুনতে পাবো।' স্বামীজীর ঐ শেষ প্রতিশ্রুতি বুকে আঁকড়ে ধরে এডিথ নির্ভয়ে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনেক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

স্বামীজী তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ ‘যদি দুঃসময় আসে, তাতেই বা কি? ঘড়ির পেণ্ডুলাম একদিকে দুলে আর একদিকে যাবেই। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। কর্তব্য হচ্ছে পেণ্ডুলামের দোলন থামানো।’ তারপর আমেরিকার ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় দোল থামিয়ে যেমন বলে—‘এবার বুড়ো বেড়ালটা মরুক’—স্বামীজীও ঠিক তেমনি করে ঐ মজার কথাটি বলে উঠলেন।

স্বামীজীকে দেখা, স্বামীজীর মুখের কথা শোনা এবং লেখার মধ্য দিয়ে সেই অগ্নিগর্ভ বাণীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবার অনুভবের মধ্যে পাওয়া আমার জীবনের এক দুর্লভ সুযোগ, বিশেষ করে যখন ভাবি এই লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে এবং সেটি পড়ে অনেকেই সাহস ও প্রেরণা পাবেন। নিজের এই দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা ভাবলে জীবনের কোনও যন্ত্রণা বা অপূর্ণতার দুঃখ আর থাকে না। এই আনন্দের দোলায় দুলতে দুলতে আমারও যেন বলতে ইচ্ছে করে—বুড়ো বেড়ালের মরণ হোক।

(বেদান্ত অ্যান্ড দি ওয়েস্ট, মে-জুন ১৯৫৪)

ক্রিসটিনা অ্যালবার্স

স্বামী বিবেকানন্দকে আমি প্রথম দর্শন করি ক্যালিফর্নিয়ার স্যান ফ্রানসিস্কো শহরে। তিনি একটি বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। সে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের কথা।

বক্তৃতা আরম্ভের মিনিট কুড়ি আগে উপস্থিত হয়ে স্বামীজী তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। স্বামীজীর থেকে কিছু দূরে বসে আমিও গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে দেখছিলাম। গভীর আগ্রহের সঙ্গে—কারণ তখনই আমি অনুভব করছিলাম, তাঁর আমাকে কিছু দেবার আছে। স্বামীজী তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তাই বলছিলেন। কিন্তু ওরই মধ্যে অনুভব করলাম স্বামীজীর ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শক্তি বেরিয়ে আসছে।

স্বামীজীর শরীর তখন বিশেষ ভালো ছিল না। যখন মঞ্চে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন মনে হলো, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। শরীরটাকে যেন কোনওমতে টেনে টেনে নিয়ে গেলেন। এও লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখের পাতা ফোলা-ফোলা এবং চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে।

ভাষণ শুরু করার আগে খানিকক্ষণ তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন; তার পরেই তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। তাঁর মুখখানি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো। মনে হলো, যেন তাঁর চেহারাটাই একেবারে অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী বলতে শুরু করলেন। আশ্চর্য! এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। মহামানবের প্রচণ্ড আত্মশক্তি এবার প্রত্যক্ষ করা গেল। তাঁর বাণীর বিপুল শক্তি আমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করলাম। বুঝলাম তাঁর কথা কেবল কানে শোনার নয়, হৃদয়ে ধারণ করে অনুভব করার বস্তু। তাঁর বাণী আমাকে চৈতন্য-সাগরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নিয়ে যাচ্ছিল উচ্চতর সত্তার অনুভূতির গভীরে। বক্তৃতা শেষে সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্য থেকে ফিরে আসতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল।

আর তাঁর চোখদুটি? আহা! কী অবিশ্বাস্য সুন্দর! যেন দুটি উল্কা—নিরন্তর আলোক বর্ষণ করে চলেছে। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত, কিন্তু আজও সেই দিনের স্মৃতি আমার মনে চিরনবীন এবং তা চিরকালই অম্লান থাকবে।

এই মাটির পৃথিবীতে তিনি কটা বছরই বা ছিলেন? দীর্ঘায়ু তিনি ছিলেন না। কিন্তু যে জীবন তিনি যাপন করে গেছেন, তাঁর মূল্য যদি খতিয়ে দেখি, তাহলে দিন, মাস, বছরের হিসাব সব অর্থহীন হয়ে যায়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে শিকাগো মহানগরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় যখন তিনি উপস্থিত হন, তখন তিনি অজ্ঞাত, উপেক্ষিত। কিন্তু সভাগৃহ থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি সকলের আদরণীয় মহানায়ক। ধর্ম মহাসভায় তিনি যা বলেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট। তার বিরাট হৃদয়ের অতলান্ত গভীরতা থেকে সমুত্থিত বাণীমন্ত্রের কল্পনা সেদিন সমগ্র বিশ্ব অনুভব করেছিল। বাস্তবিক, মাত্র একটি ব্যক্তি পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের চিন্তার স্রোতকে সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইয়ে দিলেন—অবদান যদি বলতে হয়, এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের অবদান।

শরীরের ক্ষয় অনিবার্য, সে কথা ঠিক। কিন্তু অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য বড় তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লো। অবশ্য তাঁর কাজও তখন শেষ। স্থূল শরীরে তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ছিলেন। কিন্তু গুরুত্বের বিচারে এই চল্লিশ বছর বহু শতাব্দীকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এক মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি দেবলোক থেকে মর্তে নেমে এসেছিলেন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে আবার তিনি সেই দেবলোকেই ফিরে গেলেন।

হে মহাত্মা, তোমার গৌরব রবে চিরঅম্লান।
মোদের অনুভব শুধু দূর হতে ছুঁয়েছে তোমায়—
শুকতারার অস্ফুট বাণী, সমুদ্র কল্লোল
অকূলের কূল ছানি করেছিলে দান ॥
শুনেছি তোমার কণ্ঠে জলদ ঝংকার,
তবু তাতে মধুক্ষরা স্বাদ প্রবাহিত
অরণ্যনির্ঝরের সুচারু সঙ্গীত—
যেন সাগর-গুহায় ক্ষুব্ধ ঊর্মি-টঙ্কার ॥
তোমার সগর্জ বাণী নিত্য নিনাদিত—
গায়ক-বিহঙ্গের স্বর, অন্যলোক
বজ্রের তেজ যেন তাহাতে মিলিত ॥
সে গভীর প্রেমের শক্তি তবুও অনুভবে
এখনও খেলা করে শান্ত কাছে এসে,
সাহস জুগিয়ে যায় নিবিড় তামসে
উর্ধ্বলোকের অমৃত আশিস—সকলেরই হবে ॥

(প্রবুদ্ধ ভারত, আগস্ট ১৯৩৮)

ইসাবেল মার্গেসন

আপনারা অনুরোধ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যেন আমি দু-চার কথা লিখি, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে কিভাবে আমার প্রথম বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁকে আমি কি চোখে দেখেছি, সেইসব স্মৃতিকথা। কিন্তু আপনাদের সেই অনুরোধে সাড়া দিতে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, প্রায় চার দশকের ব্যবধানে আগের সেই স্মৃতি এখন অস্পষ্ট, ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হয়তো হয়েছে। তাঁর স্মৃতি আর তাঁর উপদেশাবলী সব মিলেমিশে একাকার হয়ে চিন্তার গভীরে প্রেরণা রূপে এমনই অনুপ্রবিষ্ট যে, আমার প্রাত্যহিক জীবনপ্রবাহ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা আর বুঝি কোনও মতে সম্ভব নয়। তবুও তাঁর সান্নিধ্য আমার মনের ওপর কতখানি রেখাপাত করেছিল, সে কথা যদি বলতে হয় তো প্রথমেই বলবো—স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে আমি এমন এক বিশাল ও গগনচুম্বী সত্যের সংস্পর্শে এসেছিলাম যার ভিতর স্থান পেয়েছে আমার প্রতিটি বিশ্বাস ও আদর্শ। সত্যের সেই বহুবর্ণরঞ্জিত চালচিত্রটিই পরবর্তী কালে সময় ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে আমার মানসিক বিকাশের জন্য যখন যা প্রয়োজন তা জুগিয়ে গেছে।

আমি এখানে আচার্যদেবের এমন কয়েকটি বাণীর উল্লেখ করবো যা আমার চরিত্রকে সুখ-দুঃখ, উদ্বেগ-অসুস্থতা এবং জীবনের পথে চলতে গিয়ে অনিবার্য অজস্র যে জটিলতার সম্মুখীন হতেই হয়, সেইসবের ভিতর দিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে গড়ে তুলেছে।

প্রথমেই বলে রাখি, স্বামীজীর উপদেশাবলীর মধ্যে একটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটি ছাড়া সত্য এবং শান্তির অনুসন্ধানে রত মানুষের অন্তরের প্রকৃত বিকাশ বা ক্রমোন্নতি যে অসম্ভব তা আমি হলফ করে বলতে পারি। আধ্যাত্মিকতার অন্তর্লোকে প্রবেশের সেই চাবিকাঠি হলো প্রাত্যহিক ধ্যান। এই বিষয়ে স্বামীজী যা বলেছেন তা কখনো ভোলার নয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় হিসাবে ধ্যানের অপরিসীম মূল্য আজ সর্বত্র স্বীকৃত হলেও প্রথম যখন স্বামীজীর মুখে ঐ কথা শুনি তখন তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুনই বোধ হয়েছিল।

বিশেষ কয়েকটি তত্ত্ব এবং চিন্তা স্বামীজী আমাদের কাছে বারবার এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সেই শব্দগুলি শোনামাত্র শিষ্যদের মানসলোকে স্বামীজীর দিব্য মূর্তিখানি ভেসে ওঠে। তাঁর সেই ছটফটে মন-বাঁদরের গল্প, ইন্দ্রিয়াদি অশ্বগুলির নিয়ামক সারথির উপমা, গুহায়িত আত্মার প্রশান্তির কথা, অভ্যাস-যোগের প্রয়োজনীয়তা, আত্মার মুক্তি সাধনে স্বাধ্যায়ের গুরুত্ব, নিত্যানিত্য বা সদসৎ বস্তুবিচার—এসব কখনো ভোলার নয়।

স্বামীজীর মুখে ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অন্যান্য যেসব মূল্যবান উপদেশ শুনেছি তা যথাসম্ভব আমার নিজের অক্ষম ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করছি ঃ

(১) তুমি যে চার্চ বা সম্প্রদায়ের অনুগামী তার মধ্যে থেকেই বেড়ে ওঠো; কিন্তু দেখো, সেখানেই যেন মৃত্যু না হয় [অর্থাৎ সেইখানেই যেন আটকে যেয়ো না]। ঠিক ঠিক ভাবে চললে তোমার চার্চই তোমাকে ক্রমশ বোধের উচ্চতর ভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(২) বাড়ি তৈরির বেলাতে যেমন, আধ্যাত্মিক সিদ্ধির জন্যও তেমনই ভাবার একান্ত প্রয়োজন। তোমার নিজের বা অন্য কারও অবলম্বন নষ্ট কোরো না (বাইবেল বলছেন, 'ফসল যতক্ষণ না পাকে ততক্ষণ উভয়েই বেড়ে উঠুক'), বরং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো, সময় হলে তা আপনিই খসে পড়বে।

(৩) মিথ্যাকে সত্য বলে অথবা ভুলকে ঠিক বলে চালানোর চেষ্টা করে তোমার নৈতিক আদর্শকে কখনো নিচে টেনে নামিও না। অন্যায় জেনেও কোনও কাজ তোমার ইচ্ছা হলে তুমি করতে পারো; কিন্তু যা করছো, ভুলেও তাকে ঠিক বলে জাহির করো না, কারণ তা হবে চরম আত্মপ্রবঞ্চনা।

(৪) ছোটখাট কোনও ভুল করে অনুশোচনা এলে মনে মনে নিজেকে বলো ঃ 'ভুল করেছি, এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, কারণ এখন আমার চোখ খুলে গেছে; এমন ভুল আর কখনো করবো না।'

(৫) নিষ্কাম কর্ম এবং পরোপকার করলে নিজেরই মঙ্গল, কারণ তার দ্বারা চরিত্র উন্নত হয়।

(৬) তোমার কোনও মানসিক অবস্থাকেই 'আত্মা' বলে ভুল করো না। [আত্মা স্বতন্ত্র।] দুঃখকষ্টে যখন আমরা ভেঙ্গে পড়ি তখন এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। 'পাকা-আমি'-কে 'কাঁচা-আমি' থেকে পৃথক করতে পারলেই

সব অবস্থায় নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এর চেয়ে সোজা পথ আর নেই।

(৭) বিচ্ছিন্নতাই সত্যের সবচেয়ে বড় বিরুদ্ধাচরণ।

(৮) ধর্ম ও বিজ্ঞান—উভয়েরই লক্ষ্য ঐক্য।

(৯) আমি সে-ই [অহং ব্রহ্মাস্মি]।

স্বামীজীর এই মহান বাণী প্রসঙ্গে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বলা দু-একটি গল্পেরও উল্লেখ করতে চাই, যে গল্পগুলি তাঁর বক্তব্যকে জীবন্ত করে তুলতো। গল্পগুলি যেন অনেকটা বাইবেলের প্রতীকী কাহিনীর মতো দিব্যজ্ঞানের প্রদীপটি জ্বেলে আমাদের যাত্রাপথ আলোকিত করে দেয়।

যাঁরা স্বামীজীর শিষ্য তাঁদের নিশ্চয় সেই সিংহের গল্পটি[১] মনে আছে, সে-সিংহটি ভেড়ার পালের মধ্যে বড় হয়ে নিজেকে ভেড়াই ভাবতো। পরে অবশ্য সে তার প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারলো। মনে পড়বে সেই কাহিনীটিও[২] যেখানে এক ব্যক্তির স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, সহায়-সম্বল যা কিছু ছিল, বন্যায় সব ভেসে যায়। অবশেষে সেই ব্যক্তি কোনওক্রমে ভাসতে ভাসতে [নদীর] তীরে এসে ওঠেন। কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন বন্যা-টন্যা, বিপর্যয়, যা-কিছু তিনি দেখছিলেন, সবই দুঃস্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে বন্যার আগে তিনি যা ছিলেন, এখন বন্যার দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও ঠিক তা-ই আছেন।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯)

---

১ বাণী ও রচনা ৩য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ১৪৯-৫০

২ তদেব, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৬১-৬২

বিরজা দেবী

১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে, স্বামী বিবেকানন্দ 'ভারতীয় আদর্শ' সম্বন্ধে পরপর তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। স্যান ফ্রানসিস্কোর ইউনিয়ন স্কোয়ারে 'রেডমেনস্ হলে' এই বক্তৃতাগুলি হয়েছিল। আমি তখন অসুস্থ— দৈহিকভাবে তো বটেই, মানসিকভাবেও। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রথম বক্তৃতাটি শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। প্রথম দিন হলে যেতে অবশ্য আমার খুব কষ্ট হয়েছিল। তাই হলে বসে আমরা যখন স্বামীজীর প্রতীক্ষা করছি তখন মনে হলো, কি জানি [এত কষ্ট করে] এই বক্তৃতা শুনতে এসে ভুল করিনি তো! কিন্তু স্বামীজীকে দেখামাত্রই সব সন্দেহ নিমেষে উবে গেল। রাজকীয় ভঙ্গিতে তিনি হলে ঢুকলেন এবং ভারতীয় আদর্শের ওপর প্রায় একটানা দু-ঘণ্টা ধরে বললেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আমাদের সবাইকে তাঁর দেশে নিয়ে গেছেন, যাতে তাঁকে এবং যে বিরাট সত্য তিনি আমাদের শেখাতে চাইছিলেন সেই সত্যটিকে আমরা অন্তত সামান্য একটুও বুঝতে পারি। বক্তৃতা শেষ হলে স্বামীজীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলতে পারিনি; সেই বিরাট, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। নীরবে কিছু দূরে বসে থেকে তাঁকে শুধু লক্ষ্য করতে লাগলাম আর আমার যে বন্ধুরা বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁরা হাতের কাজ চুকিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলাম তাঁদের জন্য। দ্বিতীয় বক্তৃতার পরেও প্রথমবারের মতো কিছু দূরে বসে বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে স্বামীজীকে যখন এক মনে দেখছিলাম, তিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; তিনি একটি চেয়ারে বসেছিলেন। আমাকে দেখে বললেন ঃ 'ম্যাডাম, আপনি যদি আমার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে চান, তাহলে আমার টার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে চলে আসুন। টাকা পয়সা লাগবে না; ওখানে ওসব ঝঞ্ঝাট নেই।'

আপনার সঙ্গে দেখা করার তো খুবই ইচ্ছে—একথা তাঁকে বলতেই তিনি

বললেন ঃ 'তাহলে কাল সকালেই চলে আসুন।' স্বামীজীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তো বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু ঠিক কোন্ কোন্ প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো, তা ভাবতে ভাবতেই রাত প্রায় শেষ। আসলে গত কয়েকমাস ধরেই কিছু প্রশ্ন আমাকে উত্ত্যক্ত করছিল। সমাধানের জন্য অনেকের কাছেই গিয়েছি, কিন্তু তাঁরা কেউই আমাকে কোনও সাহায্য করতে পারেননি।

পরদিন সকালে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনলাম, স্বামীজী তখনই বেরবেন, কাজেই কারও সাথে তিনি দেখা করবেন না। বললাম; আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, কারণ তিনি নিজেই আজ আমাকে আসতে বলেছেন। এরপর কেউ আর আমাকে নিষেধ করলেন না। আমিও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সামনের দিকে তাঁর বসার ঘরে গিয়ে বসলাম।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ধীর, মধুর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্বামীজী ঘরে ঢুকে আমার উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসলেন। পরনে লম্বা ওভারকোট, মাথায় ছোট গোল টুপি, আর কণ্ঠে সুললিত স্তোত্রের অতুলনীয় ঝংকার। [দু-এক মুহূর্ত।] তারপরই স্বামীজী বলে উঠলেন ঃ 'বলুন ম্যাডাম!' আমার তখন এমনই মনের অবস্থা, একটা কথাও বলতে পারলাম না। বহুদিনের বন্ধ দরজা যেন আজ সহসা খুলে গেছে, ভেঙে গেছে হৃদয়ের বাঁধ। তাই শুধু কাঁদতে লাগলাম, বহুক্ষণ একভাবে কাঁদতে থাকলাম। স্বামীজী আরও কিছুক্ষণ স্তোত্র আবৃত্তি করে এক সময়ে আমাকে বললেন ঃ 'আগামী কাল এই সময়ে একবার আসুন।'

পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার প্রথম বিশেষ সাক্ষাৎকার এইভাবেই শেষ হলো। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম আমার সব প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়ে গেছি, আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সেই সাক্ষাৎকারের পর চব্বিশ বছরেরও বেশি কেটে গেছে; কিন্তু আজও সেদিনের স্মৃতি, জীবনের মহত্তম আশীর্বাদের মতো আমার মনে সমুজ্জ্বল। এরপর একমাস ধরে রোজই স্বামীজীকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। টার্ক স্ট্রীটে তিনি যে ধ্যানের ক্লাস নিতেন সেখানেও আমি উপস্থিত থেকেছি।

ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরেও আমি থেকে যেতাম। আসলে স্বামীজীই কৃপা করে আমাকে তাঁর সাথে অতিরিক্ত কিছু সময় থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন। কখনো বেদান্তের কথা বলতে বলতে, কখনো বা শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে

স্বামীজী রান্না করতেন। আর আমি তাঁর ছোটখাট ফাইফরমাশ খাটতাম, তাঁকে দুপুরের রান্নার কাজে সাহায্য করতাম। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক শ্লোকটি স্বামীজী প্রায়ই বলতেন ঃ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

—অর্থাৎ হে অর্জুন, অন্তর্যামী ঈশ্বর সমস্ত জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে কলের পুতুলের মতো সকলকেই তাঁর মায়ার দ্বারা চালাচ্ছেন।

স্বামীজী সংস্কৃত শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন আর মাঝে মাঝেই থেমে গিয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। কী আশ্চর্য মানুষই না তিনি ছিলেন! তাঁর চরিত্রের কত দিক! কখনো যেন ছোট্ট একটি শিশু, আবার কখনো বেদান্তকেশরী। কিন্তু আমার কাছে সবসময়েই তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা। আমি তাঁকে 'স্বামীজী' বলে ডাকি—এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি আমাকে 'বাবাজী' বলেই ডাকবে, যেমন ভারতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের বাবাকে ডাকে।

একবার একটি বক্তৃতার পর স্বামীজী রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। সঙ্গে আমিও আছি। হঠাৎ আমার মনে হলো, স্বামীজী আকৃতিতে বিরাট হয়ে গিয়েছেন—সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বড়, অনেক উঁচু; পথচারীদের তখন তাঁর পাশে বামনের মতো দেখাচ্ছে। আর তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনই মহিমময়, এমনই রাজকীয় যে, পথচারীরা তাঁকে দেখামাত্র সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে তাঁকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

একদিন সন্ধ্যায় বক্তৃতার পর আমরা দশ-বারোজন স্বামীজীর সঙ্গে আছি। স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে আমাদের সকলকে আইসক্রীম খাওয়াবেন। সেখানে গিয়ে কেউ কেউ আইসক্রীম খেতে চাইলেন, অন্যরা আইসক্রীম সোডা। স্বামীজী আবার আইসক্রীম-সোডা মোটেই পছন্দ করতেন না, তিনি ভালবাসতেন আইসক্রীম। এখন হলো কি—যে মহিলা কর্মীটি অর্ডার নিয়েছিলেন, তিনি ভুল করে স্বামীজীকে আইসক্রীম-সোডা এনে দিলেন। অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি সোডার বদলে আইসক্রীম এনে দিতে রাজি হলেন। যাহোক, স্বামীজী শুনতে পেলেন রেস্তরাঁর মালিক ঐ বিষয়ে কর্মী মেয়েটিকে কিছু বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী গলা চড়িয়ে উঠলেন ঃ 'দেখুন, ঐ অসহায় মেয়েটিকে আপনি বকবেন না। আপনি যদি ওকে তিরস্কার করেন তাহলে আপনার সব আইসক্রীম-সোডা খেয়ে ফেলবো।'

টার্ক স্ট্রীটে একমাস থেকে স্বামীজী অ্যালামেডায় চলে যান। সেখানে তিনি 'হোম অফ ট্রুথ'-এ থাকতেন। বেশ বড়সড়ো বাড়ি, চারদিক সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা। ধূমপান করতে করতে তিনি ঐ বাগানে পায়চারি করতেন। বাড়ির সামনের বড় ঢাকা-বারান্দায় বসে কখনো কখনো, আমরা যারা তাঁর কাছে জড়ো হতাম, তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন। সেদিন ছিল ইস্টার রবিবারের রাত। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলজ্বল করছে। নিস্টেরিয়া ফুলগুলি যেন তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুটে উঠে বারান্দার দুধারে বাহারী পর্দার মতো ঝুলছে। আর ঐ পরিবেশে বসে তামাক খেতে খেতে স্বামীজী আমাদের অনেক মজার মজার গল্প শুনিয়েছেন। শিকাগোয় থাকার সময় একজন মহিলা ডাক্তার সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেকথাও ঐদিনই তিনি সবিস্তারে আমাদের বলেছিলেন। একনাগাড়ে জুতো পরে থাকার ফলে পা নিয়ে তিনি তখন খুবই ভুগছিলেন। ঐ মহিলা ডাক্তারটি তাঁর পায়ের চিকিৎসা করেছিলেন। এইটুকু বলেই স্বামীজী মন্তব্য করলেন ঃ 'বাপরে! ঐ মহিলা ডাক্তারটির কথা যখনই আমার মনে পড়ে তখনই আমার পায়ের আঙুলগুলো ব্যথায় ঝনঝন করে ওঠে!'

এই প্রসঙ্গের পর আমাদের দলের একজন স্বামীজীকে 'ত্যাগ' সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'ত্যাগ? তোমরা তো শিশু হে, তোমরা ত্যাগের কি বুঝবে?' তখন তাঁকে বলা হলো ঃ 'আমরা কি এতই ছোট যে ত্যাগ সম্পর্কে কিছু শোনারও অধিকার নেই আমাদের?' এই কথা শুনে স্বামীজী কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি বলতে শুরু করলেন শিষ্য কেমন হবে, কেমন ভাবে সে গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করে সম্পূর্ণভাবে তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে ইত্যাদি। তাঁর সেদিনের সেই উদ্দীপনাময় ও প্রাণস্পর্শী কথা পশ্চিমের মানুষদের এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল।

অ্যালামেডায় থাকতে প্রতি রবিবার বিকেলে স্বামীজী নিজের জন্য ভারতীয় রান্না করতেন এবং আমারও সুযোগ হয়ে যেত ঐ সময়ে তাঁর কাছাকাছি থাকবার। পরে তাঁর রান্নাকরা খাবারে ভাগও বসাতাম। যদিও অ্যালামেডা ও স্যান ফ্রানসিস্কো দু-জায়গাতেই স্বামীজীর সব বক্তৃতা আমি শুনেছি, তবুও স্বামীজীকে আমি সবচাইতে কাছে পেতাম তাঁর রান্নাঘরে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সেই স্মৃতি আমার হৃদয়ে পরম যত্নে জাগিয়ে রেখেছি। একবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বলেছিলেন ঃ "ম্যাডাম, মনকে উদার করুন। সর্বদা

মনে রাখবেন সবকিছুরই দুটি দিক আছে। যখন চড়ে থাকি, তখন আমি বলি 'সোঽহং' অর্থাৎ আমি-ই সেই; আবার যখন পেটব্যথায় কাতরাই, তখন বলি—'মাগো, জননী আমার, আমায় রক্ষা কর।' সবসময় দু-দিক দিয়েই দেখবেন।"

অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন ঃ '[সর্বদা] সাক্ষী হওয়ার চেষ্টা করবেন। যদি দুটো কুকুর রাস্তার মধ্যে ঝগড়া করে, আর আমি তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ি, তাহলে আমাকেও তাদের বিবাদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু যখন আমি শান্তভাবে ঘরে বসে জানালা দিয়ে তাদের ঝগড়াটা দেখি, তখন আমি শুধুই দর্শক। তাই বলি—ম্যাডাম, সাক্ষী হতে শিখুন।'

অ্যালামেডায় থাকতে 'টাকার হল'-এ (Tucker Hall) সর্বসাধারণের জন্য স্বামীজী কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে অসাধারণ একটি বক্তৃতার বিষয় ছিল 'The Ultimate Destiny of Man' [মানুষের পরম গতি]। সেই বক্তৃতার শেষে নিজের হাতটি বুকের ওপর রেখে তিনি বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ, 'আমিই ঈশ্বর।' ঐ ঘোষণার পর সভায় নেমে এসেছিল ভয়-মিশ্রিত নীরবতা। অনেকে আবার ভাবলেন—স্বামীজীর পক্ষে এহেন ঈশ্বরনিন্দা কি শোভন হলো!

একবার স্বামীজীর একটি আচরণ আমার চোখে একটু বেখাপ্পা ঠেকেছিল। তাতে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তাই স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'ম্যাডাম, আপনি সর্বদাই চান বাইরেটা খুব ফিটফাট ও সুন্দর থাকুক। কিন্তু জানবেন, ওসবের কানাকড়ি মূল্য নেই। আসল সৌন্দর্য অন্তরে এবং সেটিই আমাদের দরকার।'

স্বামীজীকে আমরা কতটুকুই বা বুঝেছি? তিনি যে কে ছিলেন, কি ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই ছিল না। সময়ে সময়ে তিনি আমাকে কিছু বললে নিদারুণ অজ্ঞতার দরুন তাঁকে বলে বসতাম ঃ আমি কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত নই। হাসতে হাসতে তিনি বলতেন ঃ 'ও, আপনি একমত নন?' তাঁর ভালবাসা এবং সহ্যশক্তি—দুটিই ছিল বিস্ময়কর।

অতিরিক্ত বক্তৃতা দেওয়ার ফলে ইদানীং স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। প্রায়ই তিনি বলতেন, বক্তৃতা তাঁর ধাতে সয় না। বলতেন ঃ "জনসভায় ভাষণ দেওয়া মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল। দেখ, আটটার সময় হয়তো আমাকে 'ভক্তি' প্রসঙ্গে বলতে হবে; অথচ ঐ সময়ে আমার আদৌ ভক্তির উদ্দীপন হচ্ছে না।"

অ্যালামেডায় বক্তৃতার কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বামীজী ক্যাম্প টেলর-এ চলে গেলেন। অল্প কিছুদিন সেখানে থেকে তিনি চলে যান প্রাচ্যে। ক্যালিফর্নিয়ায় আমরা তাঁকে আর পাইনি। তবুও আমরা, যারা তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি, কখনো ভাবতে পারি না তিনি চিরতরে আমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। বস্তুত, তিনি চিরআয়ুষ্মান আমাদের স্মৃতিতে, চিরজাগ্রত তাঁর বাণীর মধ্যে—যে-শিক্ষা আর উপদেশ আমাদের দিয়েছেন, সেই শিক্ষা আর উপদেশাবলীর মধ্যে। বিদায় নেবার আগে স্বামীজী আমাকে বলেছিলেন, আবার যদি কোনও মানসিক বিপর্যয় আসে আমি যেন তাঁকে স্মরণ করি, তাঁকে ডাকি। যেখানে যতদূরেই থাকুন না কেন, আমার ডাক তিনি ঠিক শুনতে পাবেন। সম্ভবত এখনো তা পান।

(বেদান্ত কেশরী, সেপ্টেম্বর ১৯২৪)

রীভস্ ক্যালকিন্স

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার প্রথম দিককার স্মৃতি বড় একটা সুখের নয়। তার কারণ বিশ্বমেলা উপলক্ষ্যে শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় যখন তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে এলেন, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য-পাশ-করা তরুণ এক ধর্মপ্রচারক। স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চমৎকার অনায়াসভঙ্গিতে যেভাবে খ্রীস্টধর্মের ইতিহাসকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন এবং তার জায়গায় প্রাচ্যের আকাশে এক নতুন তারকার সগৌরব আবির্ভাব ঘোষণা করছিলেন, তা আমার খুব একটা মনঃপূত হয়নি। আমার মনে হয় তাঁর ঐ প্রভুত্বব্যঞ্জক আচরণ আমেরিকাবাসী হিসাবে আমার গণতান্ত্রিক চেতনাকে কিছুটা আহত, পীড়িত করেছিল। অথচ আমি জানি তিনি নিজেকে কখনো সকলের চেয়ে বড় বলে জাহির করেননি। শ্রেষ্ঠত্বের খ্যাতিটুকু যেন তিনি মেনেই নিয়েছিলেন। পরে যখন জানলাম, বস্টন প্রভৃতি বেশ কয়েকটি শহরে 'বিবেকানন্দ ক্লাব' গজিয়ে উঠেছে, তখন অনেকের মতো আমারও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল, তাঁর ভাব বা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, ঘরবন্দি বেহায়া আমেরিকান মেয়েগুলো আসলে বিবেকানন্দের চোখদুটি দেখেই ভুলেছে। আমি জানি আমার সে ধারণা কতদূর অসঙ্গত ছিল। সে যাইহোক, তারপর বেশ কয়েকটা বছর আমি আর বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কোনও কথাই শুনিনি।

নেপলস্ থেকে 'রুবাত্তিনো' নামক এক ইতালিয়ান জাহাজে উঠে আমি ভারতবর্ষে পৌঁছাই ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ঘটনাক্রমে খাওয়া-দাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট জাহাজের বড় ঘরটিতে আমার আসন ছিল একটি সেন্টার টেবল্-এর একেবারে শেষপ্রান্তে এবং আজ যে কাহিনীটি আপনাদের শোনাতে বসেছি তার সঙ্গে এই আসনের একটা নিবিড় যোগ আছে। এই টেবিলের ডানদিকের প্রথম আসনটিতে বসতেন মধ্যপ্রদেশের মিস্টার ড্রেক ব্রকম্যান (আই. সি. এস.), আর তাঁর ঠিক উল্টোদিকে আরেকজন ইংরেজ সিভিলিয়ান যাঁর নামটি ভুলে গিয়েছি।

সুয়েজে বেশ কয়েকজন যাত্রী নেমে যাওয়ায় টেবিলের কিছু রদবদল হলো।

জাহাজ লোহিত সাগরে প্রবেশ করার পর প্রথমবার যখন খাওয়ার ডাক পড়লো তখন দেখলাম, এক অদ্ভুতদর্শন ভারতীয় ভদ্রলোক মিস্টার ব্রকম্যানের পাশে বসে আছেন। চুপচাপ বসে একটি জাহাজী বিস্কুট ও সোডা ওয়াটার খেয়ে ভোজনপর্ব সাঙ্গ হওয়ার আগেই তিনি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। উপস্থিত সকলেই তখন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে জানতে চাইলেন—কে এই সম্ভ্রান্ত আগন্তুক? কি তাঁর পরিচয়? কারণ, দেখে তো তাঁকে কোনও সাধারণ ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছে না! সকলের মনেই যখন কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছে, তখন যাত্রীদের মধ্যে থেকেই একজন অত্যুৎসাহী ডাকাবুকো গোছের লোক লজ্জা-সঙ্কোচ ও সৌজন্যের মাথা খেয়ে চীফ স্টুয়ার্ডকে [ভোজনবিভাগের প্রধান পরিদর্শককে] ডেকে পাঠালেন। চীফ স্টুয়ার্ড আসতেই যাত্রীটি বললেন ঃ মদের অর্ডার-স্লিপগুলো একটু দেখান তো।

স্টুয়ার্ড তখনই ফরমাশের চিরকুটগুলো এনে দিলে ভদ্রলোক কাগজগুলি ঘাঁটতে লাগলেন। ভাবখানা এই, যেন নিজের wine card-টি খুঁজছেন! কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই সোডা-ওয়াটারের একটি চিরকুট বের করে তিনি উদ্‌গ্রীব সহযাত্রীদের দিকে সেটি বাড়িয়ে দিলেন। নানান হাত ঘুরে স্লিপটি যখন আমার প্লেটের পাশে এলো, দেখলাম, তাতে পেন্সিলে লেখা রয়েছে—'বিবেকানন্দ'।

বিবেকানন্দ? মুহূর্তে মনে পড়ে গেলো শিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি কী আলোড়নের সৃষ্টিই না করেছিলেন! পূর্বস্মৃতি জেগে উঠতেই আগামী কয়েকদিনের সমুদ্রযাত্রার আকর্ষণ আমার কাছে বেড়ে গেলো।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার আগের বিরূপ ধারণা তখনো পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল; তাই তখনই আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করিনি। খাবার টেবিলে দেখা হতো। কিন্তু তখন মাথা ঝুঁকিয়ে একটু অভিবাদন করলেই কাজ চলে যেতো।

ঘটনাচক্রে একদিন এক যাত্রীকে স্বামী বিবেকানন্দের নাম করে বলতে শুনলাম ঃ 'আমরা ওঁকে [খোলস থেকে] টেনে বার করবই!' বোধহয় নৈতিকতার আদর্শের প্রতি আমার সহজাত আকর্ষণের জন্যই নিজের অজান্তেই আমি আগামী দশদিনের বৌদ্ধিক সংঘর্ষে বিবেকানন্দের মিত্র হয়ে উঠলাম। সম্ভবত স্বামীজীও আমার এই নিরুচ্চার মৈত্রীভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; কারণ তার পরপরই দেখলাম, তিনি নিজে থেকেই আমাকে খুঁজে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি আমেরিকান?'

বললাম—'হ্যাঁ'।

'মিশনারি?'

বললাম—'হ্যাঁ'।

স্বামীজীর প্রশ্ন ঃ 'আমার দেশে আপনি ধর্মপ্রচার করেন কেন?'

আমিও পাল্টা প্রশ্ন করলাম ঃ 'আপনিই বা আমার দেশে ধর্মপ্রচার করেন কেন?'

দুজনের মুখেই এক প্রশ্ন; তাই দুজনের চোখের কোণেই একটা সূক্ষ্ম কৌতুকরেখা ঝিলিক দিয়ে গেল। দুজনাই তখন কথার লড়াই থামিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলাম এবং সহজ হয়ে পরস্পরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলাম।

প্রথম দুই-একদিন খাবার টেবিলে যাত্রীদের কেউ কেউ স্বামীজীকে একটু খোঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ঐ প্ররোচনায় সাড়া না দেওয়ায় তাঁদের ভাষায়, স্বামীজীকে 'টেনে বার করবার' চেষ্টা ব্যর্থ হয়। যখনই কেউ তাঁকে কোনও প্রশ্ন করেছেন, তখনই তাঁর সংক্ষিপ্ত শাণিত উত্তর শোনা গিয়েছে। উত্তর যেন সর্বদাই তাঁর ঠোঁটস্থ থাকতো। আর সে উত্তর বুদ্ধিদীপ্ত, প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এবং উপমার দ্বারা পরিমার্জিত। ফলে অল্পবুদ্ধির যাত্রীরা অচিরেই রণে ভঙ্গ দিলেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মিস্টার ড্রেক ব্রকম্যান। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশীল মন নিয়ে বিবেকানন্দের উপমাগুলি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডন করার নিরন্তর চেষ্টা করতেন। একমাত্র তিনিই স্বামীজীকে একটু বেগ দিয়েছিলেন! অবশিষ্ট সকলের উৎসাহে শীঘ্রই ভাঁটা পড়লো। ফলে তারপর থেকে টেবিলের শেষ প্রান্তে আমাদের ছোট দলটির আলাপ-আলোচনা বা খাওয়া-দাওয়ার সময়ে তাঁরা আর কোনও বিঘ্ন ঘটাতেন না।

একদিন রাতে অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বলতে পারেন, আবিষ্কার করলাম। বিবেকানন্দ কথা বলছেন আর আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি—অপরূপ তাঁর বাক্যের ছটা! কল্লোলিনী গঙ্গার জোয়ারের মতো চিন্তার অত্যুজ্জ্বল অশেষ তরঙ্গ তাঁর মানসলোক থেকে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসছে। কথার সে দুরন্ত স্রোতের মুখে কেউ কোনও প্রশ্ন করেন—সে সাধ্য কি! আর কেউ কোনও প্রশ্ন করলেও কয়েক মুহূর্তের জন্য হয়তো তিনি অন্য প্রসঙ্গে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু উত্তর শেষ হওয়ামাত্রই তিনি আগের চিন্তা প্রবাহে আবার আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সেদিন রাতের সেই অসাধারণ বাঙ্ময় অধিবেশনের পর আমাদের প্রত্যেককে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন

করে শান্তভাবে তিনি ভোজনকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার ব্রকম্যানের বিপরীত দিকে বসে যে সিভিলিয়ান ভদ্রলোক এতক্ষণ স্বামীজীর কথা শুনছিলেন, তিনি এবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে সবিস্ময়ে বললেন ঃ 'আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন, ভারতীয় ভদ্রলোকটি কথা বলার সময়ে বাধা পেলে যেখানে থামেন, কিছুক্ষণ পর ঠিক আবার সেখান থেকেই বলতে শুরু করেন?'

'হ্যাঁ, আমরা দুজনেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি।'

'যাতে আমাদের কল্যাণ হয় সেই হেতু তিনি তাঁর একটি বক্তৃতারই পুনরাবৃত্তি করলেন।'

ব্যাপারটি ঠিক তা-ই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলবো, আশ্চর্যরকম সুন্দর করে সেদিন তিনি তাঁর বক্তব্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সাধারণত জাহাজে যে ধরনের মামুলি খোশগল্প হয় তার সঙ্গে তাঁর কথার উৎকর্ষের কোনও তুলনাই চলে না।

দার্শনিক বিবেকানন্দের চেয়ে দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ অনেক বড় ছিলেন। আমার ব্যাক্তিগত ধারণা, স্বদেশের মানুষকে একসূত্রে বাঁধার জন্য, জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই, তাঁদের দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করবার নিশ্চিত উপায় হিসাবেই তিনি বেদান্ত প্রচারে উৎসাহী হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, এইখানেই তিনি ভুল করেছিলেন।[১] কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ঐ স্বদেশপ্রেম আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে, তাঁর প্রতি আমার প্রথমদিকের বিরূপতা ও অসহিষ্ণু মনোভাব একেবারেই চলে যায়। আমার মনে হয়, ভারতবাসীর চোখেও তিনি দেশপ্রেমিক হিসাবেই চিহ্নিত হতে চেয়েছিলেন। বাস্তবিক, আমি বিবেকানন্দকে

১. ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন স্বামীজীর বেদান্ত প্রচারের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—'একটি বিশ্বকে নাড়া দেওয়া, অন্যটি জাতি-গঠন।' স্বামীজীর নিজের ভাষায়, ভারতে তাঁর ভাবান্দোলনের লক্ষ্য ছিল 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তিভূমিগুলি খুঁজে বার করা এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটানো।' ভারতের অধ্যাত্ম বাণী পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ 'দেওয়া-নেওয়া প্রকৃতির নিয়ম। যে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, বা যে-জাতি এই নিয়ম মেনে চলে না, তারা কখনো উন্নতি করতে পারে না। এই নিয়ম আমাদের মেনে চলতেই হবে। এই জন্যই আমি আমেরিকায় গিয়েছি।...তাদের সম্পদ তারা বহুকাল ধরেই তোমাদের দিয়ে আসছে। এখন তোমাদের অমূল্য সম্পদ তাদের দেবার সময় এসেছে। এই দেওয়া-নেওয়ার ফলে তোমরা দেখতে পাবে ঘৃণার ভাব কত দ্রুত অপসারিত হয়ে, তার জায়গায়, তোমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠছে এবং সম্পূর্ণ অযাচিত হয়েও তারা তোমাদের দেশের কতখানি উপকার করছে।' স্বামীজীর প্রচার-পরিকল্পনা কতখানি নির্ভুল ছিল তা ভারতে এবং ভারতের বাইরে তাঁর কাজের ফলশ্রুতিই বলে দেবে।

যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এইকথাই মনে হয় তিনি ছিলেন ভারত-প্রেমিক যিনি চেয়েছিলেন আর-পাঁচটা দেশের মতো তাঁর দেশও দ্রুত এগিয়ে যাক, যাঁর একান্ত চেষ্টা ছিল জগৎসভায় ভারতের স্থান করে দেওয়া। ভারতবর্ষের সনাতন বাণীর বাহক হিসাবে আমি তাঁকে দেখিনি।

একদিকে তাঁর এই প্রবল স্বদেশানুরাগ আর অন্যদিকে খ্রীস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপের প্রতি অমূলক সন্দেহ—এই দুয়ে মিলেই একদিন বিস্ফোরণ ঘটলো। এক সন্ধ্যায় বাদাম সহযোগে কফি খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। হঠাৎ আলোচনাটা অন্যদিকে মোড় নিলো। প্রশ্ন উঠলো—স্বায়ত্তশাসনের জন্য ভারত কতটা প্রস্তুত ইত্যাদি। (অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বাইশ বছর আগে যখন আমাদের মধ্যে এই আলোচনা চলছিলো তখন মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার বিলটির জন্মই হয়নি। আর আগামী ১২২ বছর ধরেও এই একই আলোচনা ন্যায়সঙ্গতভাবেই চলতে পারে কারণ কোনও জাতিই স্বাধীনতা লাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে কখনো 'প্রস্তুত' থাকে না।)

স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে হঠাৎ বিবেকানন্দ জ্বলে উঠলেন। গর্জে উঠে তিনি বললেন ঃ 'রাষ্ট্র-পরিচালনার সূক্ষ্ম কূটকৌশল ইংরেজরা আমাদের শেখাক না কেন; ঐ বিদ্যায় তো ব্রিটেন সব জাতির ওপরে।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন ঃ 'আর, আমেরিকা আমাদের কৃষিবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সর্বোপরি তাদের বিস্ময়কর কর্ম-মনস্কতার ব্যাপারে শিক্ষা দিতে পারে কারণ ঐ সব বিষয়ে আমরা তাদের কাছে নিতান্তই শিশু।' এই কটি কথা বলার পরই বিবেকানন্দের স্বভাবমধুর কণ্ঠস্বর তিক্ততায় রুক্ষ হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ 'কিন্তু কোনও জাতি যেন ভারতকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার স্পর্ধা না করে, কারণ এক্ষেত্রে ভারতই জগৎকে শেখাবে।'

সেই রাতে জাহাজের ডেকে পায়চারি করতে করতে আমরা উভয়ে অনেক গভীর বিষয় আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনায় মধ্যে না ছিল ব্রিটিশ বা আমেরিকানদের কথা, না ছিল ভারতীয়দের কোনও কথা। আমাদের আলোচনার পুরো বিষয় জুড়ে ছিল শুধু ক্ষুধার্ত, বুভুক্ষু মানুষ এবং ঈশ্বরের সেই পুত্রের কথা যাঁর আত্মবলিদানের রক্তাক্ত সাক্ষর আজও এশিয়ার অস্থির বালুকণায় অক্ষয় হয়ে আছে।

মনে হয়, সেই রাতে আমি স্বামীজীকে বোঝাতে পেরেছিলাম কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনও মিশনারি ধর্মশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে যায় না; ভারতবর্ষের

মানুষ যাতে সেই দেবমানবকে জানতে পারেন এবং তাঁকে ভালবাসতে পারেন সেই ব্যাপারে সাহায্য করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

সমুদ্রযাত্রার শেষ দুই-একটি দিন আমরা পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম এবং আমার বিশ্বাস, আমাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধাও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বিবেকানন্দের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও দর্শনের ব্যাপারটি ছিল আমার কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু কারণ তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না।

আমাদের কথাবার্তা যখন অনিবার্যভাবে 'আত্মা' বিষয়ে কেন্দ্রিত হতো, তখনই লক্ষ্য করেছি স্বামীজীর চোখে একটা ঘোর নেমে আসতো; তাঁর ভারী দুচোখের পাতা ধীরে ধীরে বুঁজে আসতো; তিনি যেন আমারই সামনে উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণভাবে আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে কোনও এক অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করতেন যেখানে আমার প্রবেশাধিকার ছিল না। এইরকম একদিন আলোচনার সময় মন্তব্য করেছিলাম, পরমপুরুষ বা ঈশ্বরের সঙ্গে খ্রীস্টানদের যে অন্তরঙ্গ নৈকট্যবোধ, সেখানে তাঁকে সজাগ, সচেতন থাকতে হয় (সব ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে); সেই দিক দিয়ে হিন্দুর ব্রহ্মচেতনায় লীন হওয়ার সঙ্গে খ্রীস্টানদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুস্পষ্ট মৌল পার্থক্য রয়েছে। আমার কথা শেষ হতেই স্বামীজী চট করে আমাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিলেন, কিন্তু মুখে হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।

'রুবাত্তিনো' বোম্বাই বন্দরে পৌঁছানোর ঠিক আগের দিন রাতে আমরা দুজন সামনের ডেকে দাঁড়িয়ে। বিবেকানন্দের মুখে ছোট সুইট-ব্রিয়ার পাইপ। পাইপে ধূমপান সম্পর্কে তিনি বলতেন—ইংরেজদের এই 'বদ অভ্যাসটি' তাঁর বেশ পছন্দ। একদিকে ঢেউ-এর সুগম্ভীর সংলাপ, অন্যদিকে আগামী কাল যে নতুন জীবন শুরু হতে চলেছে তার চিন্তার, এই দুটি ব্যাপার আমাদের এক নিস্তব্ধতার রাজ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বহুক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা বলিনি। তারপর এক সময়ে বিবেকানন্দ তাঁর একটি হাত আমার কাঁধের ওপর রাখলেন। সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, আমি ভারতে কোনও ক্ষতি করবো না।

বিবেকানন্দ বললেন ঃ 'দেখুন মশায়, লোকে তাঁদের বুদ্ধ, কৃষ্ণ এবং যিশু সম্বন্ধে যা বলে বলুক, কিন্তু আপনি, আমি দুজনেই জানি, আমরা সেই এক পরম সত্তার অংশ বিশেষ।'

তাঁর হাত তখনো আমার কাঁধে। ভালবাসার স্পর্শ-মাখা বন্ধুত্বের সেই

হাতখানি আমি রূঢ়ভাবে সরিয়ে দিতে পারলাম না। তারপর এক সময়ে তিনি নিজেই তা সরিয়ে নিলেন। এবার আমিও আমার হাতখানি তাঁর কাঁধে রেখে বললাম ঃ 'স্বামীজী, আমার কথা ছেড়ে দিন; আপনি আপনার নিজের অনুভূতির কথাই বলুন। যে পরম একের কথা আপনি এইমাত্র বললেন সেই সত্তা নৈর্ব্যক্তিক, সুতরাং অজ্ঞেয়। ভারত মহাসাগরের জলে যেমন এই জাহাজটি অংশত ডুবে আছে, আমরা যদি তাঁর মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবেও ডুবে থাকি, তবুও বলবো তিনি অজ্ঞেয়। কিন্তু আমি যাঁকে জানি, যাঁকে ভালবাসি, তিনি ব্যক্তি এবং অত্যন্ত বাস্তব; আর, স্বামীজী, তাঁর ভিতরেই রয়েছে সকল পূর্ণতা।'

স্বামীজী রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র পাইপটি মুখে দিয়ে তিনি একেবারে অন্তর্মুখ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের পাতাদুটি অর্ধনিমীলিত। বুঝতে পারলাম, বিবেকানন্দের মন এখন বহুদূরের এক অজানা রাজ্যে সত্য অনুসন্ধানে রত। বহু-র মধ্যে এক, না একের মধ্যে বহু? স্বামীজী সেই রাতে ঠিক যে কাকে খুঁজছিলেন তা অবশ্য আমি বলতে পারি না।

(প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯২৩)

স্বামী সদাশিবানন্দ

পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের নাম প্রথম শুনি এক উকিলের মুখে। তিনি বিহারের মফস্বল শহর আরার জেলা-আদালতে ওকালতি করতেন। একদিন একটি সাধারণ পাঠাগারে তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কাছে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর বিস্ময়কর কীর্তির কথা বলছিলেন। বলছিলেন ঃ সেই সন্ন্যাসী বাঙ্গালী, কলকাতায় জন্ম; শিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় সনাতন হিন্দু দর্শনের জয়ধ্বজা উড়িয়ে এসেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর কিছুকাল পরে আমার বড় ভাই আকস্মিকভাবে মারা গেলে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আমাকে কাশীধামে যেতে হলো। তখন সেখানে আমার শোকাতুরা বৃদ্ধা মা সম্পূর্ণ একা থাকতেন।

ইতঃপূর্বেই স্বামী রামস্বরূপাচার্যের কাছে আমার মন্ত্রদীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। স্বামী রামস্বরূপাচার্য ছিলেন স্বামী ভাগবতাচার্যের শিষ্য এবং স্বামী ভাগবতাচার্যের গুরু ছিলেন বৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির এবং মথুরার শ্রীদ্বারকাধীশ মন্দিরের প্রথম মোহন্ত স্বামী রঙ্গাচার্য। স্বামী রামস্বরূপাচার্য আমাকে বিধিমতে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারিরূপে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে সুরেশচন্দ্র দত্তের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশ' (The life and Teachings of Shri Ramakrishna) গ্রন্থটি পড়ে আমি বিশেষ অনুপ্রাণিত হই। বলা যায়, এইভাবেই আমি সেই নির্ঝরের উৎসমুখের খুব কাছে এসে পড়লাম যা অন্য অনেকের মতো আমারও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটাবার চরম ও পরম উপায়রূপে পূর্বনির্ধারিত ছিল।

আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন আমি আর আমার বন্ধু জগৎ দুর্লভ ঘোষ কাশীর দুর্গামন্দিরে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে দুজনে মিলে পূজ্যপাদ স্বামী ভাস্করানন্দজীকে দর্শন ও প্রণাম করার জন্য গেলাম আমেথির মহারাজার বাগানবাড়িতে। ঐখানেই কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দুই সন্ন্যাসীকেও (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ) দেখলাম। তাঁরা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সন্ন্যাসী দুজনের মধ্যে গেরুয়াধারী খুব লম্বা ও বলিষ্ঠ সাধুটিকে

দেখে হঠাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে হলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ততদিনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন।

মনে মনে ভাবলাম, হয়তো ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ! আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক না। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওদিকে সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী লম্বা সাধুটি স্বামী ভাস্করানন্দজীকে দেখামাত্রই 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে সম্ভাষণ করলেন এবং ভাস্করানন্দজীও সঙ্গে সঙ্গে 'নম নারায়ণায়' বলে তাঁকে প্রতিনমস্কার জানালেন। তারপর তাঁরা দুজনে পূর্বপরিচিতের মতো খুব অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। ওঁদের কথার মধ্যে এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উঠলে স্বামী ভাস্করানন্দজীর গম্ভীর মুখখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় কোমল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ 'ভাইয়া, এক মর্তবা স্বামীজীকা দর্শন করাও' (ভাই, যেভাবে পারো, একবার স্বামীজীকে এখানে নিয়ে এস। আমি একটিবার তাঁকে দর্শন করতে চাই)। ঘরে অনেকে ছিলেন, যাঁরা তাঁকে বিরাট পণ্ডিত ও উপলব্ধিবান পুরুষ বলে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। সেই তাঁকে প্রকাশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ঐ রকম শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠতে দেখলে তাঁদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে বিষয়ে ভাস্করানন্দজীকে নির্বিকার মনে হলো।

দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসীটি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, মহারাজ, আমি অবশ্যই স্বামীজীকে লিখবো। তিনি অসুস্থ; তাই বায়ু পরিবর্তনের জন্য এখন দেওঘরে আছেন।' স্বামী ভাস্করানন্দ বললেন ঃ 'তাহলে ভাই দয়া করে সন্ধ্যার পর আবার এসো।'

এই কথার পর তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এতক্ষণ যাঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম সেই লম্বা সাধুটিকে কিন্তু আর দেখতে পেলাম না। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম তাঁর নাম স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। একদিন ধ্যান-জপ সেরে বেরোচ্ছি, এমন সময় চারুচন্দ্র দাসের সঙ্গে দেখা। চারুবাবুই কাশীতে 'রামকৃষ্ণ মিশন হোম অফ সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হলে পরে তাঁর নাম হয় স্বামী শুভানন্দ। সে যা-হোক, আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগেনি। চারুবাবুই মিশন থেকে প্রকাশিত গুটিকয়েক বই আমাকে পড়তে দেন। তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি বইও ছিল। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেদারনাথ মল্লিকের (পরে স্বামী অচলানন্দ) বাড়িতে যে পাঠচক্রের

অধিবেশন বসতো প্রায় দু-বছর ধরে চারুবাবুই সেখানে আমাদের কাছে কর্মযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতেন এবং ঐ যোগের দ্বারা অধ্যাত্মজীবন কিভাবে পরিপুষ্ট হয় সে-তত্ত্বও নিরলসভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। অন্যান্য যোগ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকেও তিনি পড়ে শোনাতেন। আমরা কখনো কেদারবাবুর বাড়িতে, কখনো চারুবাবুর বাড়িতে, আবার কখনো বা আমাদের বাড়িতে মিলিত হতাম। এইভাবেই চারুবাবু একদল যুবক-কর্মী সংগ্রহ করে খুব সাদামাটাভাবে 'হোম অফ সার্ভিস' গড়ে তুলেছিলেন।

ইতোমধ্যে আমরা খবর পেলাম, স্বামী বিবেকানন্দ বায়ু পরিবর্তনের জন্য বেনারসে আসছেন এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দের বিশেষ পরিচিত রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগানবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই খবর পেয়ে 'হোম'-এর ছেলেরা ঠিক করে তাদের তরফ থেকে আমিই ফুল ও মালা দিয়ে স্বামীজীকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করবো। স্বামীজী ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামতেই আমি তাঁর গলায় মালা পরিয়ে শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। তারপর প্রণাম করে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—এ-মুখ তো সেই মুখ! স্বপ্নে দেখা মুখখানির সঙ্গে বাস্তবের এই মুখের সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমি সবিস্ময়ে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব মৃদুস্বরে স্বামীজী একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'ছেলেটি কে?' তারপর আমার সম্পর্কে আরও কিছু প্রশ্ন করেন। তখন যেন আমার প্রায়-বিবশ অঞ্জলিবদ্ধ হাত থেকে ফুলগুলি স্বামীজীর পাদপদ্মে ঝরে পড়লো। আশেপাশে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য স্বামীজী এবার মুখখানি ফেরালেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আবার তাঁর সস্নেহ করুণাঘন দৃষ্টি আমার মুগ্ধ দুচোখের ওপর নিবদ্ধ হলো। এবার তিনি মৃদু হাসলেন। মুহূর্তের কৃপাদৃষ্টি, সন্দেহ নেই! কিন্তু ঐ এক লহমার প্রেম-চাহনির ভিতর দিয়েই তিনি যেন অনেক কথা বলে গেলেন, অজস্র উপদেশ দিয়ে গেলেন। যেন বললেন ঃ 'আত্মীয়স্বজন, বাড়ি-ঘর, নামযশ সব ত্যাগ করো এবং তার বিনিময়ে সম্পূর্ণভাবে আমাকে গ্রহণ করো।' সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার সমগ্র অন্তর যেন বলে উঠলো ঃ 'আপনার কথামতো আপনাকে আমি আমার জীবনে বরণ করে নিলাম।' এ অতীতকে নিয়ে কাব্য করা বা নিছক কল্পনাবিলাস নয়, এ সহজ, সরল সত্য—আমার জীবনের অনুভূত সত্য।

স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন জাপানী শিল্পী মিস্টার ওকাকুরা, যাঁকে আমরা মজা করে 'অক্রূর খুড়ো' বলে ডাকতাম। আর ডাকবো নাই বা কেন? তিনি যে

স্বামীজীকে (আমাদের কৃষ্ণকে) জাপানে (মথুরায়) নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ওকাকুরা ছাড়াও ছিলেন স্বামী নির্ভয়ানন্দ (কানাই), স্বামী বোধানন্দ (হরিপদ) এবং দুই কিশোর—গৌর ও নাদু। স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ আগে থেকেই কাশীতে ছিলেন। স্বামীজী আসায় তাঁরা সকলেই রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের 'সন্ধ্যাবাস'-এ চলে গেলেন।

একদিন সন্ধ্যায় আমি ও চারুবাবু সেখানে গিয়ে দেখি সকলেই চেয়ারে বসে আছেন। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর ভারতভ্রমণ নিয়ে ইংরেজিতে কথাবার্তা চলছে। সকলকে প্রণাম করে বিনীতভাবে আমি কার্পেটমোড়া মেঝেতে বসতেই মাঝপথে কথা থামিয়ে গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজী একবার আমার দিকে তাকালেন। মুখের কথার চেয়েও চোখের সে-ভাষা অনেক বেশি বাঙ্ময় ও অর্থপূর্ণ। বললেন ঃ 'উঠে বস, বাবা, চেয়ারে উঠে বস।' বারবার ঐকথা বলায় আমি তাঁর আদেশ অমান্য করতে পারলাম না; চেয়ারে উঠে বসলাম।

আমাদের 'হোম' থেকে 'সন্ধ্যাবাস'-এর দূরত্ব পাঁচ মাইল। আমরা হোমেই থাকতাম। সেখান থেকে 'সন্ধ্যাবাস'-এ গিয়ে রোজ স্বামীজীকে দর্শন করে আসতাম। কখনো কখনো সেখানে রাত্রিবাস এবং স্বামীজীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করেছি। খেতে বসে যে জিনিসটি স্বামীজীর মুখে ভালো লাগতো, সেটি তিনি নিজের পাত থেকে তুলে আমাদের সবাইকে ভাগ করে দিতেন, আর হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ 'কি রে ভালো লাগছে? খা, খা বাবা, বেশ করে খা। আমার ভালো লাগলো, তাই তোদের দিলুম।'

কিন্তু প্রাণ চাইলেও রোজ সেখানে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। একদিন আমার অনুপস্থিতে স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীকে আমাদের সকলকে দীক্ষা দেবার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী রাজি হলেন, কিন্তু কবে দেবেন সেকথা কিছু বললেন না। চারুবাবু ও হরিদাস চ্যাটার্জি আমাকে স্বামীজীর কাছ থেকে ব্যাপারটি জেনে নিতে অনুরোধ করলেন। ওঁদের কথামতো আমিও স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁকে দীক্ষার জন্য ধরে বসলাম। আমার কথা শুনে একটু হেসে খুব মিষ্টি করে তিনি বললেন ঃ 'কেন রে, তোর তো দীক্ষা হয়েই গেছে! তুই তো রামানুজী বৈষ্ণব! বিষ্ণুর উপাসনা খুব ভালো। তোর আবার দীক্ষা নেবার কোনও কারণ তো দেখছি না।' আমি অনুনয় করে বললাম ঃ 'কিন্তু আমার বড় সাধ আপনার মতো যোগীর কাছে দীক্ষা নিই।' এই কথায় হেসে তিনি সম্মতি জানালেন।

এই কথাবার্তার কয়েকদিনের মধ্যেই আমার ঠিক ওপরের ভাই, যিনি ডাক্তার ছিলেন, হঠাৎই মারা গেলেন। দাদার এই অকালমৃত্যুতে আমি এত গভীর আঘাত পেলাম যে, মনে হলো বুকে যেন শেল বিঁধেছে। কয়েকদিন পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'শুনলাম, তোর দাদা মারা গিয়েছেন। তোর মনের অবস্থা তখন কিরকম হয়েছিল, বল দেখি? মাকেই বা কি বলে সান্ত্বনা দিলি?'

আমার মনের অবস্থার কথা সব খুলে বলায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন ঃ 'যদি আমার কোনও ভাই এইভাবে হঠাৎ মারা যেত, আমি যে নিদারুণ কষ্ট পেতুম তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' বুঝলাম আমার স্বজন-বিয়োগের ব্যথা সেই মুহূর্তে স্বামীজী নিজের বুক দিয়ে গ্রহণ করলেন। আর আশ্চর্য! স্বামীজীর এই সমবেদনায় আমার দুঃখকষ্ট সব নিমেষে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো। মর্মে মর্মে অনুভব করলাম, তিনিই আমার প্রকৃত বন্ধু এবং ভায়েরও অধিক! সেইদিনই তাঁর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করাব সঙ্কল্প করলাম।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত দীক্ষা হয় না। কিন্তু আমার বেলায় স্বামীজী সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটালেন। বললেন ঃ অধিবাসের জন্য আজ রাতটা এখানেই থেকে যা। আগামী কাল তোর দীক্ষা হবে।

পরদিন সকালে স্নান করে, দীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে আমরা স্বামীজীর ঘরের সামনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তার অনেক আগেই কিন্তু দরজা খুলে গেল। চেয়ে দেখি সামনেই স্বামীজী দাঁড়িয়ে। দিব্য দ্যুতিতে মুখখানি উদ্ভাসিত! কিছুটা অদ্ভুত উচ্চারণে এবং সেই সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাদের একের পর এক তাঁর ঘরে যেতে বললেন।

চারুবাবু আমাকেই আগে ঠেলে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে যেতেই স্বামীজী বললেন ঃ 'ও! তুই-ই আগে এলি! বেশ, বেশ! আয়, বাবা, আমার সাথে আয়।' আমরা উভয়ে পাশের ছোট একটি ঘরে গেলাম। সেখানে দেখি, মেঝেতে দুটি আসন পাতা, স্বামীজী একটিতে বসলেন, আমি অন্যটিতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বামীজী গভীর সমাধিতে ডুবে গেলেন—দেহ টানটান, স্থির; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিশ্চল; চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত কিন্তু অতীব উজ্জ্বল; দিব্য ভাব, শক্তি ও প্রেম সমগ্র মুখমণ্ডল থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ; কিন্তু তাঁর সুগভীর প্রশান্তি যেন অন্তরের সমস্ত ভাবাবেগকে সংযত ও সংবৃত করে রেখেছে—

তাই বাইরে তার প্রকাশ নেই। দেখছি আর ভাবছি—যে মানুষটি হাসিমুখে পরম ভালবেসে আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন তিনি, আর যিনি এখন আমার সামনে বসে আছেন, এই দুটি যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব! এখন এই মুহূর্তে যাঁকে দেখছি, তিনি ভালবাসা বা অন্য যে কোনও ভাবাবেগের বহু ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

এইভাবে নিশ্চল হয়ে স্বামীজী বসে রইলেন; কতক্ষণ তা বলতে পারি না। কারণ সময়ের খণ্ড হিসাবের সেখানে কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না। শুধু দেখে মনে হচ্ছিল, স্ফুটনোন্মুখ নিজের দিব্য স্বরূপকে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তিনি। ধীরে ধীরে সেই উত্তুঙ্গ ভাব তিনি সংবরণ করে নিলেন, নিজের ভিতরে টেনে নিলেন। এরপর আমার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত বসে রইলেন এবং ধীরে ধীরে আমার অতীত জীবনের কিছু ঘটনা বলে গেলেন। একবার বললেন ঃ 'স্টীমারে ছাপরা যাওয়ার সময় একজনের কথা শুনে কি অনুভূতি হয়েছিল মনে পড়ে?' সেসব ঘটনা কিছুই মনে নেই বলায় স্বামীজী বললেন—চেষ্টা করেই দেখ মনে করতে পারিস কিনা।

মনে পড়লো, আরায় আমি রামস্বরূপাচার্যের দর্শন পেয়েছিলাম। পরে তিনিই আমাকে বৈষ্ণব মন্ত্র দেন। রামস্বরূপাচার্য রামানুজ-সম্প্রদায়ভুক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি থাকতেন আগমগড় জেলায়।

স্বামীজী বললেন ঃ 'তুই রামস্বরূপাচার্যের চিন্তা কর। তাঁর কথামতো তা-ই করলাম। আবার বললেন ঃ এবার তুই শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান কর এবং মনে কর, আমার রূপ তাঁতে মিশে গেল; ঐ-ভাবে তাঁর রূপটিকেও গণেশের মধ্যে লয় করে দে। গণেশ হচ্ছে সন্ন্যাসের আদর্শ।

স্বামীজীর দিব্য স্পর্শে আমার মন থেকে বাসনা, চিন্তা সব মুহূর্তের মধ্যে উবে গেল। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তখন কিছুই নেই। ইচ্ছা বা আকঙ্ক্ষার লেশমাত্র বোধও নেই তখন। কতক্ষণ ঐভাবে ছিলাম জানি না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার শরীরবোধ ফিরে এলো। তখন আবার আমি ঘরের জিনিসপত্র সব আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজীর কৃপালাভের পর উঠে দাঁড়ালে তিনি আমাকে পরবর্তী দীক্ষার্থীকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চারুবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর হয়ে গেলে হরিদাস চ্যাটার্জি গেলেন।

দীক্ষার পর আমরা একসঙ্গে আহারাদি করলাম। তারপর 'হোম' বা সেবাশ্রমের কাজের জন্য আমাকে চলে আসতে হলো। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত

সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই সেবাশ্রম তিন-বছর আগে গড়ে উঠেছিল। আশ্রমের অধিকাংশ কর্মী তখন গৃহত্যাগ করে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতেন। এতেই তাঁদের শক্তি অনেকখানি ক্ষয় হতো। অথচ সেবাশ্রমের কাজেরও তো ক্ষতি করা যায় না। তাই যে যতটা পারেন প্রাণপাত করেই খাটতেন। ফলে তাঁদের স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। স্বামীজী এটি লক্ষ্য করে বড়ই চিন্তিত ও ব্যথিত হলেন। একদিন তিনি সকলকে ডেকে বললেন—তোরা ভালো করে খাওয়া-দাওয়া কর। পুষ্টিকর খাবার না খেলে শরীর ভালো থাকবে কি করে? অন্যের সেবা করতে হলে আগে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা চাই-ই চাই।

স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, কাজের প্রকৃতি ও কর্মীর শারীরিক গঠনের কথা মাথায় রেখে তারা কি খাবে না খাবে তা ঠিক করা দরকার। সেবাশ্রমের কর্মীদের মধ্যে আমরা অনেকেই তখন ব্রহ্মচারী। স্বভাবতই কিছু কিছু খাদ্য এবং সুস্বাদু মিষ্টি ইত্যাদি আমরা মুখেই দিতাম না। স্বামীজী সেটা লক্ষ্য করে বলেছিলেন—তোদের মূল লক্ষ্য যে সেবা, সেকথাটা ভুলিসনি। মনে রাখবি অন্যের সেবা করতে গেলে সুস্থ, সবল শরীর চাই। যে প্রকৃত কর্মী ও কর্মযোগী, তাকে খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার তত করতে হয় না; ব্যক্তিগত সংস্কারের মূল্যও তার কাছে সামান্যই।

আমরা তাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি কিনা দেখবার জন্য স্বামীজী তাঁর সঙ্গে আমাদের খেতে বলেন। মুশকিল হলো এই, আমরা কেউ কেউ তখন নিজের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বামীজীর পীড়াপীড়িতে যখনই সম্ভব হতো তাঁর সঙ্গে খেতাম।

আমাদের মধ্যে একজন তরুণ কর্মী অত্যন্ত রোগা ছিল—স্বামীজী তাকে ঠিক লক্ষ্য করেছেন। আমাদের তিনি কতখানি ভালবাসতেন তা এই ছেলেটির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে। ছেলেটি বাংলাদেশের এক সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে কাশীতে এসে সেখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয় এবং নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরেই সেবাশ্রমের কর্মী হিসাবে যোগ দেয়। কিন্তু দিলে কি হবে? সে যেমন রুগ্ণ তেমনি পলকা। একদিন সে স্বামীজীকে দর্শন করতে গেলে তিনি তার সব খোঁজখবর নেন এবং তাকে রোজ তাঁর সঙ্গে খেতে বলেন। স্বামীজী বললেনঃ 'বাবা, তোমাকে কাজ করতে হবে, কিন্তু তুমি দেখছি, বড় দুর্বল। তোমার ভালো খাওয়া দরকার। তুমি দুবেলা এখানে এসে আমার সঙ্গে খাবে; আর তা যদি না পারো, অন্তত দুপুরবেলা এখানে আমার সঙ্গে খেও।'

সেবাশ্রমের কাজের চাপে অনেক সময় ছেলেটির আসতে বেশ দেরি হয়ে যেত। এদিকে স্বামীজী তখন ডায়াবেটিস-এ ভুগছেন। ডাক্তার ও গুরুভাইরা তাঁর খাওয়া-দাওয়ার সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। যাতে স্বামীজীর খাওয়া-দাওয়ার এতটুকু নড়চড় না হয় সেদিকে তাঁদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি। কারণ তাঁদের আশঙ্কা, অনিয়ম করলে রোগ বাড়তে পারে। ডাক্তার ও গুরুভাইদের সেই সস্নেহ অনুরোধ স্বামীজীও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেটির প্রতি জননীসুলভ স্নেহে স্বামীজী তাঁদের সব অনুরোধ-উপরোধ এবং নিজের অসুস্থতার কথা সব ভুলে যেতেন। খাওয়ার সময় হলেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেটির খোঁজখবর শুরু করতেন। কিছু সময় যেতে না যেতেই অধৈর্য হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিতেন, আর কখনো রাস্তার দিকে, কখনো বা দরজার দিকে এমনভাবে তাকাতেন যেন যে কোনও মুহূর্তেই সে এসে পড়বে। কাউকে চোখে পড়লেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন ঃ 'ছেলেটি কি এলো? আজ এত দেরি কচ্চে কেন? আহা বেচারী! একে দুর্বল শরীর, তায় আবার এত বেলা পর্যন্ত কিছুই খায়নি। কতই বা বয়স! তার ওপর এই খাটুনি!'

অবশেষে যখন ছেলেটি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকতো, তখন স্বামীজীর মুখের চেহারাই পাল্টে যেত। বহুদিন পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলে, ছেলেকে কাছে পেয়ে মায়ের যে রকম মুখের ভাব হয়, সেইরকম তৃপ্তি, সেইরকম আনন্দে স্বামীজীর মুখখানি জ্বলজ্বল করতো। স্মিতমুখে তিনি ছেলেটিকে প্রশ্ন করতেন ঃ 'হ্যাঁরে, এত দেরি হলো কেন? জানি, আজ তোর বড্ড কাজের চাপ ছিল। তা, হ্যাঁ রে, সকালে কিছু খেয়েছিলি তো? দ্যাখ, তোর জন্যে এখনো আমি না খেয়ে বসে আছি। আয় বাবা, চটপট হাত-পা ধুয়ে নে, আমরা খেতে যাই। এমনিতেই আজ অনেক বেলা হয়েছে। আর জানিস তো, বাবা, আমার শরীর বড় একটা ভালো নয়। সময়মতো খাওয়া-দাওয়া না করলে অসুখ বেড়ে যাবে। তাই একটু সকাল সকাল আসতে চেষ্টা করিস। তবে তুই বা কি করবি, কাজের চাপে তোর দেরি হয়ে যায়! বুঝি রে, আমি বুঝি!'

অতঃপর স্বামীজীকে অনুসরণ করতো ছেলেটি। তাকে নিয়ে স্বামীজী অন্যদের সঙ্গে খেতে বসতেন। খাওয়ার সময়ে সর্বদা ছেলেটির প্রতি নজর রাখতেন আর যখনই কোনও কিছু ভালো বা সুস্বাদু জিনিস তাঁর থালায় দেওয়া হতো, সেটি তিনি নিজের থালা থেকে তুলে ছেলেটির পাতে চালান করে দিতেন। স্বামীজীর সঙ্গে অন্যান্য যাঁরা খেতেন, তাঁরা দেখতেন, স্বামীজী নিজে

প্রায় কিছুই খাচ্ছেন না, পরম স্নেহে শুধু ছেলেটির খাওয়া দেখছেন। তখন তাঁরা কখনো কখনো স্বামীজীকে অনুনয়ের সুরে বলতেন : 'স্বামীজী, আপনি তো আজ কিছুই মুখে দিচ্ছেন না। একটু কিছু অন্তত খান।' কিন্তু কে কার কথা শোনে? স্বামীজী নিজের কথা তখন বেমালুম ভুলে গেছেন। ভুলবেন না? তিনি যে তখন তাঁর প্রাণের গোপালকে খাওয়াচ্ছেন!

একদিন সন্ধ্যাবেলা স্বামীজী একটি ছোট খাটে বসে আছেন, স্বামী শিবানন্দ আর একটিতে। দুজনের মধ্যে রঙ্গ-রসিকতা হচ্ছে। ঘরে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত। তাঁরাও নীরবে ঐ কৌতুক উপভোগ করছেন। খুশিতে ডগমগ স্বামীজীর সরল নিটোল বালকোপম মুখখানিতে যেন দেবদূতের শ্রী ফুটে উঠেছে। উদ্বেল আনন্দ আর কৌতুক তাঁর দুটি চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে তরঙ্গাকারে সারা ঘরের মধ্যে যেন ছড়িয়ে পড়ছে।

স্বামী শিবানন্দকে উদ্দেশ করে স্বামীজী বলছেন : 'কি বলেন মহাপুরুষ, তাহলে আপনার মতে আমি হচ্ছি শুক্রাচার্য—দৈত্যদের গুরু! কি, তাই না? বলুন, আপনি তো তাই বলতে চাইছেন? ঠিক কিনা?' এই বলে স্বামীজী আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন। ক্রমে তাঁর হাসির মাত্রা যেমন বাড়তে লাগলো, আওয়াজও তেমনি চড়তে লাগলো; তার সঙ্গে এবার তিনি শুরু করলেন নানান মুখভঙ্গি! মনে হলো একটা আনন্দের ঢেউ যেন সমস্ত ঘরটাকে তোলপাড় করছে। যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে আমরা স্বামীজীর সেই আনন্দময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কোনও কারণে স্বামীজীর একটি চোখের স্নায়ু কমজোরি হয়ে পড়ায় তাঁর তখন দেখতে কিছুটা অসুবিধা হতো। এই কারণেই এক-চক্ষু-বিশিষ্ট শুক্রাচার্যের উপমা! আবার শুক্রাচার্য যেমন দৈত্যদের গুরু ছিলেন, স্বামীজীও বিদেশে ধর্মপ্রচার করে বিদেশীদের চেলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যাই হোক, স্বামী শিবানন্দও 'আজ্ঞে, তা তো বটেই; তাতে আর সন্দেহ কি?'—এই বলে স্বামীজীর খুশির মেজাজটাকে আরো উস্কে দিচ্ছিলেন। ফলে ঘরে যেন ফুর্তির ফোয়ারা ছুটছিলো। হাসি জিনিসটা ছোঁয়াচে। তাই স্বামীজীর হাসি দেখে আমরাও মেতে উঠলাম। তাঁর হাসির সোনার-কাঠির ছোঁয়া আমাদের অন্তরকেও আনন্দের দোলায় দুলিয়ে দিল। আমরাও যেন অমৃতরসে নিষিক্ত হলাম।

সাধারণত আমরা ভাবি যাঁরা ধর্মপথে চলেন—ধূলিধূসরিত মলিন চেহারা, চোখে-কালি-পড়া বিষণ্ণতা এবং চিমসে শরীর—এই তিনটে বিভূতি তাঁদের

থাকবেই থাকবে! আরও একটা মহৎ গুণ যা তাঁদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক বলে আমরা মনে করি তা হলো একটা হাঁড়িপানা গোমড়া মুখ, যে-মুখে হাসির নামগন্ধও থাকবে না এবং যেখান থেকে মাঝে মাঝে গম্ভীর শাস্ত্রীয়বচন নিক্ষিপ্ত হবে! কিন্তু স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন, হাস্য-পরিহাসের দিকটিও চরিত্রের একটি বড় দিক। তারও যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ 'রসিকতা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।' কাজে-কর্মে সকলের সঙ্গে আনন্দ করে, মজার মজার কথা বলে স্বামীজী তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন স্বামীজীর ঐ দমকে দমকে হাসি দেখে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁকে যখন প্রণাম করতে যাই তখনো সেই হাসির রেশ চলছে। হো-হো করে হাসতে হাসতে তিনি বললেন ঃ 'আরে বোষ্টম যে! বেশ, বেশ! দেখি, তুই আজ কেমন রামানুজী ঢঙে প্রণাম করতে পারিস!' আশ্চর্য! অন্য দিন কিন্তু প্রণাম করতে গেলে তিনি বলতেন, 'থাক, থাক বাবা, থাক। এসবের দরকার নেই।' কিন্তু আজ তিনি সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে। স্বামী শিবানন্দ মধ্যস্থতা করে বললেন ঃ 'স্বামীজী ওর বাতের শরীর, গাঁট সব শক্ত হয়ে আছে। ওকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে বললে নিষ্ঠুরতা হবে—ওকে ঐ রকম করে প্রণাম করতে দেবেন না।' স্বামীজী সেকথায় কর্ণপাতও করলেন না। বললেন ঃ 'না দাদা, ওতে কিছু ক্ষতি হবে না। ওতে বরং ওর ভালোই হবে। রোগ সেরে যাবে।' তারপর আমাকে বললেন ঃ 'আয় বাবা আয়, তুই নির্দ্বিধায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর।' সঙ্গে সঙ্গে সেইভাবে আমি প্রণাম করলাম। আমার বহুদিনের একটি সাধ স্বামীজী এইভাবেই পূর্ণ করে দিলেন। আগে ইচ্ছে হলেও স্বামীজী বিরক্ত হতে পারেন ভেবে সাষ্টাঙ্গ হইনি। আজ তাঁর কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে গেলো।

ঘরে যখন এইরকম আনন্দের হাট জমে উঠেছে তখনই এক ব্রহ্মচারী এসে খবর দিলেন—কেদারনাথ মন্দিরের মোহন্ত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এই কথা শোনামাত্র স্বামীজীর মুখখানি প্রশান্ত হয়ে উঠলো এবং ব্যক্তিত্ব মহিমময়। মোহন্তজী তখন অন্য একটি ঘরে ছিলেন। স্বামী শিবানন্দকে নিয়ে স্বামীজী সেই ঘরে ঢুকলেন, আমরাও তাঁদের পিছনে পিছনে গেলাম।

স্বামীজীকে দেখে মোহন্তজী সসম্ভ্রমে 'নমো নারায়ণায়' বলে সম্ভাষণ করলেন এবং সংস্কৃতে ভক্তি-রসাত্মক একটি স্তোত্র গেয়ে তাঁকে বন্দনা করেন। এরপর মোহন্তজী দক্ষিণী ভাষায় যা বলতে থাকলেন, জনৈক সিংহলী সন্ন্যাসী তার

ইংরেজি তর্জমা করে যেতে লাগলেন। স্বামীজীও সেসবের যথাযথ উত্তর দিয়ে গেলেন। মোহন্তজী বললেন ঃ ' স্বামীজী, আপনি শিবের অবতার, জীবোদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় আপনি যে বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সভ্যতার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব ঘটনা। পাশ্চাত্যের মানুষের সামনে আপনি যেভাবে প্রাচ্যের জয়পতাকা তুলে ধরেছেন তাতে প্রতিটি হিন্দু এবং প্রত্যেক সন্ন্যাসীই গৌরবান্বিত। বেদের মহান শিক্ষা ও সত্যগুলি আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই সত্যগুলি সঠিক রূপায়ণের যে-পথনির্দেশ আপনি দিয়েছেন তার জন্য সাধুসম্প্রদায় এবং সকল স্তরের হিন্দু আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

জ্ঞানী এবং উপলব্ধিবান সেই অশীতিপর পলিতকেশ মোহন্তজী এইভাবে স্বামীজীর প্রশংসা করলে তিনি ভাবাবেগে আপ্লুত হলেন। সবিনয়ে স্বামীজী বললেন ঃ 'মহারাজ, আমি বেশি কিছু করতে পারিনি। সামান্য যা কিছু করেছি তা সমস্তই ঈশ্বরের কৃপায় সম্ভব হয়েছে। তাঁর মহিমা তিনিই স্বেচ্ছায় প্রকাশ করেছেন, এতে আমার বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব নেই। এই শরীরটাকে তাঁর কাজের যন্ত্ররূপে তিনি ব্যবহার করেছেন। এই মাত্র। আপনি প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী এবং মহাজ্ঞানী; সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহক। আপনাদের মতো মহাপুরুষের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পেলে এইরকম এবং আরও অনেক কাজ করা সম্ভব। তাছাড়া আপনি কেদারনাথের মোহন্ত, আপনি নিজেই শিবের অবতার। সে তুলনায় আমি কিছুই নই। সামান্য এক দুর্বল মানুষ মাত্র।'

স্বামীজীর এই কথার পর মোহন্তজী বললেন ঃ 'আপনি যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরম থেকে যাত্রা করে উত্তরে ভ্রমণ করছিলেন তখন আমাদের স্থানীয় প্রধান মঠ থেকে আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একখানা পালকি, লোকজন ও কয়েকজন সন্ন্যাসীকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আপনাকে দর্শন করার জন্য তখন জনসমুদ্র। আপনিও এত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তখন আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমাদের মঠের সাধু-মহাত্মাদের সেজন্য বড় দুঃখ। সেই দুঃখমোচনের জন্য তাঁরা তারবার্তায় আমাকে জানিয়েছেন যে, আমাদের কাশীর মঠ এবং মন্দিরে যেন আপনাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁদের আরও ইচ্ছা আপনি আপনার অনুগামীদের নিয়ে অন্তত একদিন আমাদের মন্দিরে ভিক্ষা গ্রহণ করেন।'

সর্বজনশ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ মোহন্তজীর এই বিনীত প্রার্থনায় স্বামীজী যেন একেবারে

বালকবৎ হয়ে গেলেন। অত্যন্ত বিনীত হয়ে তিনি বললেন ঃ 'আপনার যদি এই ইচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনি আদেশ করলে বা কোনও একজনকে দিয়ে বলে পাঠালেই আমি সানন্দে আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতাম। শুধু এইজন্য আপনার এত কষ্ট করে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, আমি অবশ্যই যাবো।' পরদিন সকাল দশটা এগারোটা নাগাদ স্বামীজী, স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সাধুরা কেদারনাথ মন্দিরের মোহন্ত মহারাজের মঠে গেলেন।

সিংহল থেকে আগত এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তখন ঐ মঠেই বাস করছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'আচ্ছা, পৃথিবীর সব ধর্মেই কি সিদ্ধ-পুরুষ জন্মেছেন?' এই কথার উত্তরে স্বামীজী শুধু যে 'হ্যাঁ' বললেন তা-ই নয়, বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সব বলার পর স্বামীজী জোরের সঙ্গে একথাও বললেন ঃ 'এমনকি বহুনিন্দিত বামাচার তন্ত্র সাধন করেও অনেকে সিদ্ধ হয়েছেন। তবে কি জানেন? আমাদের গুরুমহারাজ (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলতেন, ঐ পথ বড় নোংরা।' মনে হলো বৌদ্ধ ভিক্ষুটি স্বামীজীর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এইসব কথাবার্তার পর মোহন্ত মহারাজ স্বামীজী ও উপস্থিত অন্য সকলকেই ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন।

বিকেলে মোহন্তজী স্বামীজীকে অন্য একটি ঘরে নিয়ে গেলেন; সেখানে তাঁর গুরু ও তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যদের ছবি ছিল। তিনি স্বামীজীকে ছবিগুলি দেখিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের নাম ও গুণপরিচয় বলে যেতে লাগলেন। এই পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হলে তিনি দুটি গেরুয়া কাপড় এনে একটি স্বামীজীর কোমরে, আর অন্যটি তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। মোহন্তজীকে খুবই প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ 'আজ আমি একজন প্রকৃত দণ্ডী (বেদান্তবাদী) সন্ন্যাসীর সেবা করে ধন্য হলাম।'

তারপর মোহন্তজীর অনুরোধে স্বামীজী এবং তাঁর সঙ্গীরা কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করেন। যদিও তখন আরতির সময় নয়, তবুও স্বামীজীর সম্মানার্থে শ্রীকেদারনাথের বিশেষ আরতি হলো। কিন্তু গর্ভমন্দিরের ঠিক বাইরে যেখানে নন্দী গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন শিবলিঙ্গের বিপরীত দিকে, সেইখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী সমাধিস্থ। স্থির, নিস্পন্দ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এক পা যে এগোবেন, সে সামর্থ্যও তাঁর তখন ছিল না। পাথরের মূর্তির মতো তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পায়ের মোজাদুটি জলে ভিজে যাচ্ছে, অথচ কারো সাধ্য ছিল না মোজাদুটি খুলে

দেওয়ার। কারণ উপস্থিত সকলেরই তখন অন্তর্মুখ অবস্থা, সকলেই তন্ময়; তাঁদের সেই অন্তর্লোকের সঙ্গে বাইরের জগৎ এবং পার্থিব ক্রিয়াকর্মের কোনও যোগ ছিল না তখন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ 'নরেনের ভিতর শিব আছেন।' তিনি আরও বলেছিলেন—স্বামীজী সপ্তর্ষির এক ঋষি; তাঁর আহ্বানেই এই মাটির পৃথিবীতে অবতীর্ণ। স্বামীজীর সেই আন্তর মহিমার অভিব্যক্তি দেখে আমরা যথার্থই ধন্য হলাম। যাঁরা সেদিন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেই সেই দিব্য সত্তার সান্নিধ্য অনুভব করেছেন।

মন্দির থেকে আমরা যখন বেরিয়ে আসছি স্বামীজী তখনো ভাবাবিষ্ট। তাই ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে আমরা বাইরে এলাম। পাছে স্বামীজী পড়ে গিয়ে আঘাত পান সেইজন্য স্বামী শিবানন্দ খুব সাবধানে, যত্ন করে তাঁকে ধরে একটা খোলা গাড়িতে বসিয়ে দিলেন। গাড়ি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলে স্বামীজীও ক্রমশ বাহ্যভূমিতে নেমে এলেন। গাড়ি যখন একটি ছত্রের (সাধুদের যেখানে খাবার দেওয়া হয়) পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তিনি তখন হঠাৎ ভাঙা ভাঙা তামিলে শিশুর মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন ঃ 'নট-কট-চেট্টি।'

এক ডাক্তার মাঝে মাঝে ওখানে স্বামীজীকে দেখতে আসতেন। এদেশে সদ্য-প্রবর্তিত একটি ধর্মমতের প্রতি ডাক্তারবাবুর বিশেষ ঝোঁক ছিল। একদিন তিনি স্বামীজীকে ঐ ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে এবং কিভাবে ঐ সম্প্রদায় এদেশের অশেষ কল্যাণ করছেন সে বিষয়ে পরম উৎসাহে বলে যাচ্ছিলেন। তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এমন কথাও বললেন যে, ভারতে যথার্থ যুক্তিবাদী ধর্ম প্রতিষ্ঠান বলতে ঐ একটিই। স্বামীজী চুপচাপ শুনতে লাগলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না বা ডাক্তারের কথায় বাধাও দিলেন না। তাতে ডাক্তারবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর একপেশে মতের সমর্থনে অজস্র যুক্তি দেখাতে লাগলেন।

ডাক্তারের বাগাড়ম্বর বেশ কিছুক্ষণ চলার পর স্বামীজীর মুখের রং বদলাতে লাগলো; তাঁর চেহারার মধ্যে একটা দৃঢ়তার ভাব ফুটে উঠলো। সহসা দমকা হাওয়ার মতো তাঁর মুখ থেকে কথার তড়িৎপ্রবাহ ছুটে এলো। গলার স্বর গমগম করতে লাগলো—তাতে শাসনের নির্ভুল ব্যঞ্জনা। বক্তা স্বামীজী তখন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ! অবাক বিস্ময়ে ডাক্তারবাবু তাঁকে বলতে শুনলেন ঃ 'বিদেশীরা তো সর্বক্ষেত্রেই এদেশের শিক্ষক। বাকি ছিল একমাত্র ধর্ম। তা আপনি সেখানেও তাদের প্রভুত্ব করতে দিতে চান! ইউরোপকে আপনারা গুরু বানিয়েছেন, আর তাদের ভাবে সম্মোহিত হয়ে নিজেরা তাদের গোলাম

বনেছেন। ভারত কি এতটাই অধঃপাতে গেছে বলে আপনারা মনে করেন যে বিদেশ থেকে এখন তাকে ধর্মগুরু আমদানি করতে হবে? এটা কি খুব গর্বের কথা, না চরম লজ্জার কথা? শুনুন—আমি এখানে বক্তৃতা দিতে আসিনি। আমি অসুস্থ। নির্জনে কটাদিন বিশ্রাম নেব বলেই এখানে এসেছি।'

তিনি এবার গলা চড়িয়ে, আয়ত, আরক্তিম, দীপ্তিমান চোখদুটি তাঁর সমালোচকের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ রেখে বলতে থাকেন ঃ 'দেখুন, আমি যদি চাই তো আজ এই রাতেই আপনার প্রিয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা তামাম কাশীর লোককে আমার এই পায়ের কাছে এনে জড়ো করতে পারি। কিন্তু এভাবে ঐশী শক্তির অপচয় আমি পছন্দ করি না। আর সেই কারণে তা আমি করিওনি।'

ডাক্তারটির ধারণা ছিল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে স্বামীজী অসাধারণ কিছু নন। তাই বেশ মুরুব্বি চালে কিছুক্ষণ আগে স্বামীজীকে বলেছিলেন ঃ 'তাইতো, মশাই, অমুক অমুক ব্যক্তি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলেন না, এ বড়ই দুঃখের কথা।' স্বামীজী তাঁর কথার ভাব-ভঙ্গিতে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন; তাই ঐভাবে তাঁর ভুলটা শুধরে দিলেন।

এরপর ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গান্তরে গেলেন এবং স্বামীজীও মুহূর্তের মধ্যে পূর্ববৎ শান্ত হয়ে গেলেন। আবার আমরা সেই প্রশান্ত, সমাহিত সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম, যাঁর চারপাশে শান্তির পরিমণ্ডল। মনে হচ্ছিল, কিছুই যেন ঘটেনি।

বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক শ্রীকেলকার সেই সময়ে কাশীতে ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন। শরীর বেশ অসুস্থ, তাই স্বামীজী বিছানায় শুয়েছিলেন। নিজের গুরু বা কোনও মহাপুরুষের কাছে মানুষ যেভাবে যায়, শ্রীকেলকারও সেইরকম সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে স্বামীজীর ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে মেঝেতে পাতা আসনের ওপর বসলেন। ইংরেজিতেই তাঁরা কথা বলতে লাগলেন। আমরা একটু দূরে বসে ছিলাম, তাই সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে দেখলাম স্বামীজী প্রথমে শুয়ে শুয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছেন। কিন্তু কথা বলার উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি খাটে সোজা হয়ে বসলেন এবং সুস্থ মানুষের মতো কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর কথাবার্তায় আবেগ প্রকাশ পেতে থাকলো এবং চোখদুটিও ভাবে রক্তকমলের মতো বিকশিত হয়ে উঠলো। ঠোঁটদুটি দৃঢ়সংবদ্ধ অথচ সামান্য আকুঞ্চিত হয়ে কাঁপতে লাগলো। ভ্রূ-কুঞ্চিত হওয়ায় প্রশান্ত ললাটে কয়েকটি ভাঁজ পড়লো আর মুখখানি হয়ে উঠলো আরক্তিম। অন্তরের সুপ্তশক্তি পরিপূর্ণভাবে জেগে ওঠায় তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক

মধুর সুরেলা আওয়াজও উত্তরোত্তর গম্ভীর হয়ে উচ্চগ্রামে চড়তে লাগলো। শ্রীকেলকারের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা! স্বামীজীর চেহারার এই আমূল পরিবর্তনে তিনি শুধু যে বিস্মিত হলেন, তা-ই নয়, তিনি একেবারে বিমোহিত। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তিনি স্বামীজীর ওজস্বী বাণী শুনতে লাগলেন। ভারতবর্ষ এবং তার দুঃখদুর্দশা নিয়ে কথা হচ্ছিল। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার এবং অন্যান্য প্রসঙ্গও বাদ যায়নি।

স্বামীজীর বজ্রকণ্ঠ গর্জে উঠলো ঃ 'এই চরম দারিদ্র্য এবং অবক্ষয়ের মধ্যে ভারতের আর বেঁচে থেকে লাভ কি? প্রতি মুহূর্তে সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই; থাকার মধ্যে আছে শুধু লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগ। কোনওরকমে শ্বাস টানছে—জীবনের লক্ষণ বলতে তো এই। সাক্ষাৎ নরকের আগুনে সে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে। পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে যাওয়া কি এর চাইতে ঢের ভালো নয়?'

বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে এইভাবে স্বামীজী বলে চলেছেন আর আমরা সব দমবন্ধ করে শুনছি। অবাক হয়ে ভাবছি, দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে স্বামীজী কী অসহ্য যন্ত্রণাই না ভোগ করছেন! প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলতে যা বোঝায় স্বামীজী ছিলেন তা-ই। তিনি ছিলেন প্রকৃত মহাত্মা। তিনি কি বলেননি—'আমি তাকেই মহাত্মা বলি দরিদ্রের দুঃখে যার হৃদয় বিদীর্ণ হয়?' তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। কারণ এই যন্ত্রণা এত তীক্ষ্ণ এবং তীব্রভাবে তাঁকে বিদ্ধ করছিল যে, তিনি তাঁর স্বাভাবিক আত্মস্থ ভাব এবং অসুস্থতার কথা সব ভুলে গেলেন। শ্রীকেলকারকে তিনি বললেন, কেবল রাজনীতি এবং বিদেশের অনুকরণ করে আন্দোলন করে কোনও লাভ হবে না। অন্যান্য দেশের নিষ্ঠুর রাজনীতিও আমাদের কোনও উপকারে আসবে না। একমাত্র সনাতন ভারতীয় ধারায় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যন্তরীণ বিকাশের মধ্য দিয়েই এ দেশ আবার উঠতে পারে। শেষের কথাটির ওপর স্বামীজী খুব জোর দিলেন এবং শ্রীকেলকারকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি এও বললেন, নতুন পরীক্ষানিরীক্ষার চেয়ে ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি অনেক সহজে হবে। কিন্তু ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে কেবল রাজনীতি অথবা সমাজ-সংস্কারের দ্বারা ভারতবর্ষের স্থায়ী কল্যাণ করা যাবে না এবং তা খুব ফলপ্রসূও হবে না। মনে হলো, স্বামীজীর কথায় শ্রীকেলকার বিশেষ মুগ্ধ হয়েছেন। করজোড়ে বিনীত নমস্কার জানিয়ে তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

স্বামীজী ছিলেন পুরুষসিংহ। একদিকে অন্যায়, অবিচার দেখলে যেমন তিনি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা করতেন, অন্যদিকে তাঁর হৃদয় ছিল কুসুমকোমল। একবার তিনি বলেছিলেন ঃ 'সদ্য-দোয়া দুধের ফেনায় কি তোমার আঙুল কাটে? আমি বলি—তা-ও হয়তো সম্ভব। কিন্তু শ্রীরাধার অন্তর ফেনিল সেই দুধের চেয়েও পেলব।'

একদিন সকালে জলযোগের পর কয়েকজনের সঙ্গে স্বামীজী দার্জিলিং-এর পথে বেড়াতে বেড়াতে পাহাড়ী শোভা উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ মানসনেত্রে তিনি দেখলেন, একটি ভুটিয়া রমণী পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে খুব চোট পেয়েছে। স্বামীজীর সঙ্গীরা কিন্তু কেউই কিছু দেখতে বা বুঝতে পারেননি। অবশ্য সেবকদের বয়সও তখন কম ছিল এবং তাঁরা স্বামীজীর অতিজাগতিক অনুভূতির ব্যাপারেও বিশেষ কিছুই জানতেন না। যা হোক স্বামীজী কিন্তু আর এক পাও এগোতে পারলেন না; দূরের কোনও বস্তুর প্রতি যেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। বিবর্ণ মুখে আর্তনাদ করে বলে উঠলেন তিনি ঃ 'উঃ বড় যন্ত্রণা হচ্ছে! আর হাঁটতে পারছি না।' একজন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে, স্বামীজী?' তিনি শরীরের একটি দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ঃ 'এইখানে। তোরা দেখিসনি, মেয়েটি পড়ে গেলো?' যে-ছেলেটিকে স্বামীজী এ কথা বললেন সে এবং তাঁর সঙ্গীরা তো হতভম্ব! ছেলেটি তো কিছুই বুঝতে পারলো না, ভাবলো—এ আবার কি! স্বামীজীর লাগলোই বা কখন, আর তাঁর ব্যথাই বা কেন হবে? কিন্তু কেউ তাঁকে কিছু বলতে সাহস পেলেন না। পরবর্তী কালে যখন তাঁরা জানলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা অচ্ছেদ্য গভীর সম্পর্ক আছে এবং দেবমানবেরা বহুদূর থেকেও অন্যের দুঃখ-বেদনা নিজেদের অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারেন, তখনই তাঁরা ঐ ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কাশীতে আসার প্রায় তিন বছর আগে চারুবাবু ও অন্য কয়েকজনের সহযোগিতায় আমরা একটি সমিতি গড়ে তুলেছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিষয়ক সাহিত্যচর্চা, ঐ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা এবং কর্মযোগের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা। আমাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন যুবক আবার একসঙ্গে মিলে ধ্যান, ভজন, পূজা এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্ত ও দরিদ্রদের সেবাও শুরু করে দিলো। একটা মহৎ আদর্শ সামনে রেখে সেই ছাঁচে তারা নিজেদের জীবনকে গড়ে

তুলতে চাইছিলো—এই আর কি। সেই সব দেখে, ধীরে ধীরে কাশীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ফলে আমাদের কাজের পরিধিও প্রসারিত হলো। আমরা সমিতির নাম দিয়েছিলাম 'পুওর মেন্‌স রিলিফ এ্যাসোসিয়েশন'।

দু-বছর সংগ্রামের পর তৃতীয় বছরে স্বামীজীর কর্মে পরিণত বেদান্তের (Practical Vedanta) ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সমিতিকে ঢেলে সাজালাম। পুরনো নাম বদল করে সমিতির নতুন নাম দেওয়া হলো 'দরিদ্রনারায়ণ সেবাসমিতি'। এই নতুন পর্যায়ের কাজ আরম্ভ করার এক বছর পরে স্বামীজী কাশীতে আসেন এবং কৃপা করে আমাদের তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। চারুবাবুর মধ্যে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করে স্বামীজী পূর্ণ উদ্যমে তাঁকে এই সেবার কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। স্বামীজী বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঃ "সাধারণ গরিব মানুষের দেওয়া একটা পয়সাকেও নিজের গায়ের এক ফোঁটা রক্ত বলে মনে করবি। কেবলমাত্র রিলিফ সোসাইটি করে গরিবদের কি উদ্ধার করবি। ওসব মিথ্যে প্রবঞ্চনায় ভুলিস না। তোদের সমিতির নাম রাখ 'শ্রীরামকৃষ্ণ হোম অফ সার্ভিস', আর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এটা মিশনের হাতে তুলে দে।" স্বামীজী যেমনটি আদেশ করেছিলেন আমরাও ঠিক তা-ই করেছিলাম। এইভাবে 'সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেক হিন্দুর মধ্যেই বার্ধক্যে কাশীবাসের একটা চল আছে। তাঁরা সঙ্কল্প করে আসেন আমরণ তাঁরা কাশীতেই থাকবেন, ঐ স্থান ছেড়ে কোথাও যাবেন না। বাংলা দেশের ছোট এক জমিদার পণ্ডিত শিবানন্দও অনুরূপ সঙ্কল্প নিয়ে কাশীবাস করতেন। তিনি সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সাধনক্ষেত্রেও বেশ উন্নতি করেছিলেন। একদিকে হৃদয়বত্তা, অন্যদিকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি—এই দুটি গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। কাশীতে আসার সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় এবং প্রথম থেকেই তিনি আমাদের সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

তিনি প্রায়ই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, স্বামীজী যা প্রচার করছেন তা সঠিক এবং শাস্ত্রসম্মত। বলতেন ঃ 'প্রতিজ্ঞা করে বসে আছি কাশীধামের বাইরে যাবো না; ওদিকে স্বামীজী থাকেন কলকাতায়। তিনি কি একটিবারের জন্যেও বিশ্বনাথধামে আসবেন না?'

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের আরম্ভে স্বামীজী কাশী এলে পণ্ডিতজী তাঁকে দর্শন করতে

যান এবং প্রথম দর্শনেই পণ্ডিতজী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তখন থেকেই দুজনের মধ্যে নিবিড় সখ্যতার সূত্রপাত। এরপর দেখাসাক্ষাৎ হলেই তাঁরা অধিকাংশ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর আশ্চর্য দিব্য জীবন নিয়েই আলোচনা করতেন। একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই, ঠাকুরের ভাব সম্পর্কে স্বামীজী যখন কিছু বলতেন তখন সেই ভাব সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁর ভিতর থেকেও ফুটে উঠতো!

কখনো কখনো পণ্ডিতজী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও স্বামীজী তাঁর প্রিয় বিষয় কর্ম ও সেবার কথাই বেশি বলতেন। ফলে এই গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যিনি কাশীর অন্যান্য রক্ষণশীল পণ্ডিতদের মতোই হিন্দুধর্মের ব্যবহারবিধির ওপর খুব বেশি জোর দিতেন, তিনিও ক্রমে স্বামীজীর ভাবধারা ও আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন।

পণ্ডিতজী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে একটি সংস্কৃত অভিনন্দনপত্র রচনা করে কলকাতা থেকে সেটি ছাপিয়ে আনেন। কিন্তু এমন ভাবাপ্লুত হয়ে তিনি স্বামীজীকে দর্শন করতে যেতেন যে, তখন অভিনন্দনপত্রটি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যেতেন। একদিন তিনি ঐ মুদ্রিত অভিনন্দনপত্রটি নিয়ে স্বামীজীকে দর্শন করতে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আছি আমি ও চারুবাবু। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঃ 'পণ্ডিতজী, স্বামীজী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তর এলো ঃ 'তিনি যথার্থ যোগী, আর সেই কারণেই আমি প্রতিদিন তাঁকে দর্শন করতে যাই। বক্তৃতা দিয়ে বা ধর্মপ্রচার করে বিখ্যাত হলেও ঐগুলি তাঁর ঐশী শক্তির সামান্য প্রকাশ—এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। তাঁর ভিতর ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি খেলে বেড়াচ্ছে। সে শক্তির কণামাত্র ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর মহত্ত্ব এবং শক্তির বিচার অসম্ভব—তিনি যেন অপার অকূল সমুদ্র যার সীমার নাগাল পাওয়া যায় না।'

গাড়ি করে কিছুদূর এগোনোর পর দেখি, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী গোবিন্দানন্দ ও অন্য এক সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বামীজী একটি গাড়িতে ভিঙ্গার মহারাজার প্রাসাদের দিকে যাচ্ছেন। দুটি গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়লো। পণ্ডিতজী আমাদের গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা সলজ্জ সঙ্কোচে স্বামীজীর হাতে মানপত্রটি তুলে দিলেন। এক ঝলক দেখেই স্বামীজী বুঝলেন অভিনন্দনপত্রে কি আছে। একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি এবার বললেন ঃ 'পণ্ডিতজী, আপনি এ কি করেছেন! আমি অতি সামান্য, সাধারণ মানুষ। এই প্রশংসা, এই স্তুতি আমার প্রাপ্য নয়। আমি কিছুই

করিনি। যা হয়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। তিনি তাঁর কাজ যাকে খুশি তাকে দিয়েই করিয়ে নিতে পারেন, সাধারণ মানুষকেও তিনি তাঁর কাজের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।'

এই ঘটনার পর পণ্ডিত শিবানন্দকে কাশীর বিদ্বৎসমাজ তথা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে প্রায়ই স্বামীজীর গুণকীর্তন করতে দেখা যেত মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রমুখ অনেক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত এইভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের সান্নিধ্যে আসেন এবং তিনি যে একজন ঐশী পুরুষ এটা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, স্বামীজীও তেমনি পণ্ডিতজীকে টেনেছিলেন। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। পণ্ডিতজী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি কাশী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না বলেই স্বামীজী স্বয়ং কৃপা করে এসে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

ভিঙ্গার রাজার লখনউয়ের কাছাকাছি মস্ত জমিদারি ছিল। তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত—দুটি ভাষাই খুব ভালো জানতেন। তিনি ব্রত নিয়েছিলেন জীবনের শেষ কটা দিন কাশীধামেই কাটাবেন এবং শহরের বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, নিজের বাগানবাড়ি ছেড়েও বেরোবেন না। দুর্গামন্দিরের কাছে ভিঙ্গা-প্রাসাদেই শেষ নিশ্বাস ফেলবেন, এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। তিনি সাধক ছিলেন এবং সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করতেন। স্বামীজী কাশীতে এসেছেন শুনেই তিনি স্বামী গোবিন্দানন্দজীকে ফুল, ফল, মিষ্টি দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন। গোবিন্দানন্দজী যখন স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন তখন স্বামী শিবানন্দও সেখানে উপস্থিত। উভয়কেই 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে গোবিন্দানন্দজী বললেন ঃ 'মহারাজ আপনার দর্শন পাবার জন্য উন্মুখ। আপনি দয়া করে অনুমতি দিলে তিনি তাঁর ব্রত ভঙ্গ করেও এখানে আসবেন।'

স্বামীজী একথা শুনে খুব বিচলিত হয়ে বললেন ঃ 'না না, তা কেন? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে বলা অন্যায়। আমি নিজেই যাবো। রাজাজীর এখানে আসার দরকার নেই।' পরদিন বা তার পরের দিন স্বামী গোবিন্দানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে স্বামীজী রাজার বাগানবাড়িতে গেলেন।

স্বামীজীকে দর্শন করে ভিঙ্গার রাজা বলেন ঃ 'বুদ্ধ ও শঙ্করের মতো আপনিও মহাত্মা।' তাঁর কথাবার্তায় স্বামীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি ঝরে পড়ছিল। শাস্ত্রাদি এবং 'কর্ম' সম্বন্ধেও তিনি কিছু আলোচনা করলেন। জীবনের প্রথম দিকে রাজাজী নিজেও একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাই কাশীতে কিছু

সেবামূলক কাজ শুরু করার জন্য তিনি স্বামীজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললেন—খরচপত্র যা লাগে তা তিনিই দেবেন। স্বামীজীর শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। তাই তিনি কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। শুধু বললেন ঃ 'এখন বেলুড় মঠে ফিরে যাবো। শরীরটা সুস্থ হলে তখন আবার পুরোদমে কাজে লাগবো।' আরও কিছু কথাবার্তার পর স্বামীজী ও স্বামী শিবানন্দ 'সন্ধ্যাবাসে' ফিরে এলেন।

পরের দিনই ভিঙ্গার রাজা এক কর্মচারীর হাত দিয়ে স্বামীজীকে একটি খাম পাঠান। খামের ভিতর ছিল পাঁচশ টাকার একটি চেক এবং একখানি চিঠি। স্বামী শিবানন্দ তখন স্বামীজীর কাছেই ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ 'মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা দিয়ে কাশীতে ঠাকুরের একটি মঠ গড়ে তুলুন।' ঐ বছরের জুলাই মাসে একটা বাগান ভাড়া নিয়ে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়।

একদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ প্রয়াত প্রমদাদাস মিত্রের পুত্র শ্রী কালিদাস মিত্র স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন। প্রমদাদাসবাবু স্বামীজীর বন্ধু ছিলেন। স্বভাবতই পুরনো বন্ধুর ছেলেকে দেখে স্বামীজী খুশি হলেন। কালিদাসবাবু মেঝেতে পাতা গালিচার ওপর বসলেন। স্বামী শিবানন্দ, চারুবাবু, আমি এবং আরও অনেকে তাঁর কাছাকাছি বসলাম। স্বামীজী কথা বলছেন আর কালিদাসবাবু তাঁর প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। তখন আমার বয়স কম; কুড়ির বেশি হবে না। তাই সেদিনের সব কথা এখন আর মনে নেই। কিন্তু অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও সেদিনের সেই ছবিটি আমার স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করে। শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষেরা অনেক সময় জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অনুচ্চারিত প্রশ্নেরও উত্তর দিয়ে দেন। সেদিনের সেই সন্ধ্যায় স্বামীজীও তা-ই করেছিলেন। একবার লণ্ডনে একদিন একটি বক্তৃতা শুরু করার আগে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ 'আপনাদের মনে যাঁর যা কিছু প্রশ্ন আছে সেগুলি একটি কাগজে লিখে নিজের নিজের পকেটে রেখে দিতে পারেন; আমাকে কাগজগুলি দেখাবার দরকার নেই। আমি নিজের থেকেই প্রত্যেকের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাবো।' তাঁরাও সেইমতো প্রশ্ন লিখে রেখে দিলে স্বামীজী ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি এই প্রশ্ন করেছেন।' তারপর বাঁদিকের জনৈক ভদ্রলোক সাগ্রহে নিজের প্রশ্নটি শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন দেখে স্বামীজী সেই দিকে ঘুরে তাঁর প্রশ্নটিও বলে দিলেন। শুধু তা-ই

নয়, তাঁর ঘরের খুঁটিনাটি সবকিছুর বর্ণনা, ঘরের জিনিসপত্র, ঘরের লোকজন, সেই মুহূর্তে তাঁরা কে কি করছেন ইত্যাদি সবকিছু গড়গড় করে বলে যেতে থাকেন। প্রশ্নকর্তা তো বটেই, সব শ্রোতাই স্বামীজীর এই অলৌকিক দর্শনক্ষমতার পরিচয় পেয়ে একেবারে হতবাক হয়ে যান। এইভাবে স্বামীজী সেদিন ছয় কি আটজনের প্রশ্নের উত্তর এবং তাঁদের বাড়ির সামগ্রিক বর্ণনা দিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন।

আর একবার স্বামী সারদানন্দ তখন ইংল্যাণ্ডে। বহুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তাঁর শরীর তখন অত্যন্ত দুর্বল ও শীর্ণ। একদিন তিনি শান্ত হয়ে সরল শিশুটির মতো স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে আছেন। তাঁর চোখে স্বামীজী শুধু গুরুভাই ছিলেন না, ছিলেন অন্য দেহে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্ত, বিনম্র ভাবে স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এইবার চাইলেন তিনি যেন জ্ঞান এবং মুক্তিলাভ করতে পারেন। প্রার্থনার পরমুহূর্তেই সারদানন্দজী একেবারে শান্ত হয়ে যান এবং স্বামীজীর ইচ্ছায় তাঁর শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ ও সবল হয়ে ওঠে। স্বামীজীর এই যোগশক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ। এই ঘটনার আগে তিনি স্বামীজীর এই শক্তির পরিচয় পাননি। অনেকেই হয়তো স্বামীজীর এই সিদ্ধির পরিচয় পেয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনো জীবিত। তবে বিপুল সিদ্ধির অধিকারী হলেও সচরাচর ঐ শক্তির প্রকাশ তাঁর মধ্যে বড় একটা দেখা যেত না। তার কারণ সিদ্ধাই দেখানোর ব্যাপারটি স্বামীজী অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন।

কালিদাসবাবু শিল্পকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং ঐ বিষয়ে তিনি বিস্তর পড়াশোনাও করেছিলেন। একদিন তিনি ঘরে ঢুকে বসামাত্রই তাঁর চিন্তাতরঙ্গ এবং মনের ভাব স্বামীজীর মধ্যে অনুরণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর, দেহের ছন্দ সবকিছুই যেন বদলে যায়। কালিদাসবাবুর মুখের দিকে একবার চেয়েই তিনি চিত্রকলা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলতে থাকেন। এমনকি বিভিন্ন দেশের পোশাক-আশাক, জলহাওয়ার সঙ্গে তাদের কতটা সম্পর্ক এবং তাদের ব্যঞ্জনা—এসবের ওপরও আলোকপাত করলেন। সেদিন এমনভাবে তিনি কথা বলছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি শিল্পীদের সভায় জ্ঞানগর্ভ এবং মনোজ্ঞ একটি বক্তৃতা দিচ্ছেন। বাস্তবিক, তিনি যে শিল্পী এবং চিত্রকর নন, সেই মুহূর্তে কারো সে কথা মনে হচ্ছিল না। বরং এটাই বোধ হচ্ছিল—ছবিই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান সব এবং তিনি যেন জীবনভর রং তুলি নিয়েই কাটিয়েছেন।

রং-এর ঐকতান, বর্ণবিন্যাস, লাবণ্য, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, শারীর সংস্থান, বিভিন্ন দেহভঙ্গিমা ইত্যাদি কোন্ বিষয়েই না তিনি বললেন! আমি তখন অপরিণত। তাই বিষয়গুলি সম্যক্ অনুধাবন করতে পারিনি। তবে এইটুকু বুঝেছিলাম, চারু ও কারুকলার ওপর স্বামীজী সেদিন চমৎকার একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তারপর স্বামীজী ইতালি, ফ্রান্স, চীন, পারস্য, জাপান এবং বৌদ্ধযুগ ও ভারতে মোঘল আমলের চিত্ররীতি ও প্রকরণ নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনাও করেন।

আর একবার স্বামীজী ফ্রান্সের এক নামী রঙ্গালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে নাট্যাভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। ঐ থিয়েটারের ড্রপসিন বা পর্দাগুলি ছিল দেখার মতো, কারণ এক বিখ্যাত শিল্পী ঐগুলি এঁকেছিলেন। সেই শিল্পীর নামডাক এবং কাজের কদর তখন এতই বেশি যে, দলে দলে মানুষ প্যারিসের ঐ অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চে এসে ভিড় করতেন। স্বামীজী ফরাসী ভাষা জানতেন; কাজেই নাটকটি বুঝতে তাঁর কোনওরকম অসুবিধা হচ্ছিল না। অভিনয় দেখতে দেখতে হঠাৎ স্ক্রীনের একটি অংশের দিকে চোখ পড়ায় তিনি দেখলেন সেখানে এমন কতকগুলি কলাকৌশলগত ত্রুটি আছে যা ইচ্ছে করলেই শুধরে নেওয়া যায়। অভিনয় শেষ হলে তিনি ম্যানেজারকে ডেকে পাঠান। ম্যানেজার তো এলেনই, তার সঙ্গে শিল্পীরাও। মাননীয় ও বিখ্যাত অতিথির মতামত জানার জন্য তাঁরাও তখন উদ্‌গ্রীব। স্বামীজী যখন একটি বিশেষ দৃশ্যপটের কোথায় কি ত্রুটি রয়েছে তা বুঝিয়ে দিলেন, শিল্পীরা তো অবাক! কারণ, যে ছবিটির খুঁত তিনি ধরে দেখালেন সকলেরই ধারণা ছিল সেটি একটি অনবদ্য শিল্পকর্ম; অভিজ্ঞ সমঝদারের চোখেও ঐ ত্রুটি ধরা পড়েনি। স্বামীজীর কথায় শিল্পী তাঁর ত্রুটি স্বীকার করলেন এবং পটে চিত্রিত নরনারীর ভাবের সামঞ্জস্য আসার ব্যাপারে স্বামীজীর পরামর্শ শুনে তিনি যারপরনাই খুশি হন। তিনি বুঝলেন, অন্যান্য বিষয়ের মতো অঙ্কনবিদ্যাতেও স্বামীজীর প্রগাঢ় জ্ঞান।

আমরা আরও একটি ঘটনার কথা শুনেছি। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে একদিন স্বামীজী মিস মূলার ও আরও দু-একজনের সঙ্গে তর্কশাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক ভেন্-এর কাছে যান। মিস মূলার ভেন্-এর ছাত্রী ছিলেন। তর্কশাস্ত্র চর্চা করেই অধ্যাপক তাঁর সারা জীবন কাটিয়েছেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র ইউরোপে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর 'লজিক অফ চান্‌স' বইখানিও সেই কারণে বহুসমাদৃত। ভেন্ স্বামীজীর কথা শুনেছিলেন। কিন্তু

অধ্যাত্মবিষয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ না থাকায় তর্কশাস্ত্র নিয়েই দুজনের আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। স্বামীজী যখন ন্যায়ের ওপর বলতে আরম্ভ করলেন তখন বিস্মিত অধ্যাপক ভাবতে লাগলেন—তাঁরই মতো এই ভারতীয় সন্ন্যাসী সারা জীবন শুধু ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাই করেছেন। তাঁর অস্ফুট স্বগতোক্তি শোনা গেলো—'আজ ভারতের একজন নৈয়ায়িক পাশ্চাত্যের আর এক নৈয়ায়িকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

চিত্রকলার প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসি। 'চিত্র' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'চিৎ' থেকে। অর্থাৎ যা আমাদের চিৎকে প্রকাশ করে তাই চিত্র। যে মুহূর্তে স্বামীজীর মনটি অন্তর্মুখ হয়ে চিদাকাশে অর্থাৎ অনন্ত মহাশূন্যে বিলীন হতো, অমনি চিত্রকলার সব তত্ত্ব এবং তার বিচিত্র বহুমুখী অভিব্যক্তি তাঁর মানসপটে ফুটে উঠতো। যেখানে যত ছবি তিনি দেখেছেন, সবই তাঁর মনের আকাশে একে একে ভেসে উঠতো। তিনি প্রায়ই বলতেন ঃ 'কোনও কিছু দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি আমার মনের অবচেতন স্তরে চলে যায়। আবার দরকার মতো তা চেতন স্তরে ফিরে আসে।' তিনি আরও বলতেন ঃ 'আমি যখন শঙ্করের মস্তিষ্কের ধ্যান করি, তখন শঙ্কর হয়ে যাই। আবার যখন বুদ্ধের মস্তিষ্কের ধ্যান করি, তখন বুদ্ধ হয়ে যাই। এমনকি কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে যখন একাগ্র হয়ে মনঃসংযোগ করি, তখন সেই বিষয় সম্পর্কিত আমার অজ্ঞাত তত্ত্ব ও তথ্য এবং যা আগে কখনো ভাবিনি তেমন নতুন ভাবনাও আমার জ্ঞানবুদ্ধির গোচরে এসে পড়ে। তখন আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি যা অনুভব করছি তা-ই অনর্গল বলে যাই। জানোই তো, আমি সাধারণ মানুষ, আমার বিদ্যেবুদ্ধি বিশেষ নেই।' ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি তাঁর এই অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেদিন আমরা সকলে সারাদিন স্বামীজীর আশ্চর্য প্রতিভার এই বিশেষত্বের কথাই শুধু ভেবেছি। কি করে একজন দার্শনিক হয়েও কেবল ছবি আর রং-এর কলাকৌশল নিয়ে তিনি অনর্গল বলে গেলেন, সে রহস্য আমাদের বোধগম্যই হলো না।

আর এক দিন সন্ধ্যায় যখন কালিদাস মিত্র স্বামীজীকে দর্শন করতে এলেন, স্বামীজী তখন সোয়েটার, মোজা পরে, একটা বালিশকে তাকিয়া করে তাতে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। বালিশের ওপর হাতদুটি আলতো করে রাখা ছিল। তাঁর শরীর তখন অসুস্থ, শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমরা তাঁর কাছেই মেঝের ওপর বসেছিলাম। মিত্তির মশাই এসে স্বামীজীকে প্রণাম করলে তিনি বললেন ঃ

'শরীরটা ভেঙে গেছে। বড্ড ভোগাচ্ছে।' কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করলে তিনি মিত্তির মশাইকে বললেন ঃ 'তা ঠিক বলতে পারবো না। তবে প্যারিস ও আমেরিকায় কয়েকজন নামকরা ডাক্তারকে আমি দেখিয়েছি। কিন্তু তাঁরা রোগও ধরতে পারেননি, আর আরোগ্য করা তো দূরের কথা, একটু আরামও দিতে পারেননি।'

এরপর কালিদাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'স্বামীজী, শুনলাম আপনি জাপান যাচ্ছেন। সত্যি?' স্বামীজী বললেন ঃ 'জাপান সরকার ওকাকুরাকে সেইজন্যই পাঠিয়েছেন। জাপান দেশটা অতি সুন্দর। শিল্পকে ওরা কলায় পরিণত করেছে। আর ওখানকার প্রত্যেকটি গৃহই এক-একটি শিল্পকেন্দ্র। আমেরিকা যাওয়ার পথে আমি জাপানে গিয়েছিলুম। দেখলুম বাঁশের তৈরি ছোট ছোট কুটিরে ওরা থাকে। প্রত্যেক বাড়িতেই একটা করে সুন্দর ফুলের বাগান, আর কয়েকটা ফলের গাছ। জাতি হিসাবে ওরা খুবই উন্নত। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি শেষপর্যন্ত আমার জাপান যাওয়া হয় তো তোমাকে নিয়ে যাবো। জাপানীরা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শিল্পটাকে খুব আয়ত্ত করেছে। এমনিতে ধর্মের দিক থেকে ওরা বৌদ্ধ, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ওরা কিছুটা উদাসীন। ভারতের চিন্তা ও আদর্শ যদি ওদের ভেতর একবার ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তো কালে ওরা আরও ধর্মভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। আর যদি ওদের একটু বেদান্তের ভাব দেওয়া যায়, তাহলে তো কথাই নেই; ওরা তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে।'

মিত্তির মশাই প্রশ্ন করলেন ঃ 'তাতে ভারতের কি উপকার হবে?' স্বামীজী বললেন ঃ 'উভয় জাতির মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান হলে উভয়েরই মঙ্গল হবে এবং উভয়েই উন্নতি করবে।' জাপানের অভূতপূর্ব উন্নতির কথা বলতে বলতে তিনি ভারতের চরম দুঃখদৈন্যের প্রসঙ্গে চলে এলেন। তখন কোথায় তাঁর অসুখ, কোথায় শরীরের কষ্ট! তখন সব ভুলে গেছেন। ভারতের দুর্দশা আর আর্থিক দুর্গতির কথা বলতে বলতে দুঃখে, যন্ত্রণায় যেন তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল। মুখ ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হয়ে গেল। আবার এরই মধ্যে ভাবের ঘোরে কখনো কখনো রামপ্রসাদী গান গাইতে লাগলেন। দেখলাম, গানের পর তিনি একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর ঐ গানের মধ্যে আমরাও যেন ভারতবর্ষের মর্মবেদনা ও আবেগকে প্রত্যক্ষ করলাম এবং দেশের জন্য দুঃখে আমাদের মনও উদ্বেল হয়ে উঠলো।

সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে সামান্য, সাধারণ অবস্থা থেকে কিভাবে জাপান

নিজের উন্নতিসাধন করেছে, কিভাবে আত্মপ্রত্যয়শীল হয়ে ওঠে দেশের প্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে সেই বিষয়ে স্বামীজী সেদিন আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের কথাও তিনি বললেন। তিনি বলেন, একমাত্র চরিত্র ও আত্মবিশ্বাসের জোরেই সামান্য এক সৈনিক থেকে নেপোলিয়ন গৌরব ও সাফল্যের উচ্চতম শিখরে উঠেছিলেন। নেপোলিয়নের প্রসঙ্গ ওঠায় স্বামীজীর চেহারা ও ব্যক্তিত্বের যেন আবার রূপান্তর ঘটলো। তখন তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ! দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন নেপোলিয়নের যুগে ফিরে গেছেন।

উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তিনি যেন টগবগ করে ফুটতে লাগলেন। মুখের প্রতিটি রেখা উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্কল্পে অটল, গম্ভীর ও তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর, বিস্ফারিত চোখে ইস্পাতশাণিত দৃষ্টি। কথা বলতে বলতে তিনি এতই উত্তেজিত যে, কখনো তাকিয়ার ওপর হাঁটু গেড়ে বসছেন, কখনো কার্পেটে বসছেন, আবার কখনো বা বসে বসেই লাফিয়ে উঠছেন। নেপোলিয়নের কথা বলতে বলতে তিনি নিজেই যেন নেপোলিয়ন হয়ে উঠেছেন। মনে হচ্ছিল তিনিই বুঝি 'জেনা' এবং 'অস্টারলিৎস্'-এর যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন ঃ 'ঐ যে দূরে, বহুদূরে, দেখছো না শত্রুরা পালাচ্ছে—যেমন করে পারো ওদের আটকাও! ইস্টার্ন ব্রিগেডের সেনারা, তোমরা ভীম বিক্রমে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো—দেখো, একজনও যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জ্যান্ত ফিরতে না পারে!...' তারপর কখনো এক হাত শূন্যে তুলে, কখনো দু-হাত উঁচিয়ে ধরে কল্পিত জয়ের উল্লাসে স্বামীজী চিৎকার করে বলছেন ঃ 'আমরা যুদ্ধে জিতেছি—শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছি।' এই বলে স্বামীজী ফরাসীদের বিজয় সঙ্গীত গেয়ে উঠলেন।

স্বামীজী এমনই উত্তেজিত ও রূপান্তরিত যে আমরা সকলেই—স্বামী শিবানন্দ, চারুবাবু, আমি এবং উপস্থিত সকলেই—একেবারে স্তম্ভিত! এমনকি চাকরবাকর, মালি এবং ওখানে আর যাঁরা ছিলেন—তাঁরা সকলেই বিমোহিত, মন্ত্রমুগ্ধ। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে বা বসে রইলেন। এতটুকু নড়বার শক্তি কারো ছিল না স্বামীজীর শরীর থেকে একটা তেজ এবং জ্যোতি বেরিয়ে এসে ঘরের সমস্ত পরিমণ্ডলকে এমন তপ্ত করে তুলেছিল যে, আমরাও যেন আর আমাদের মধ্যে ছিলাম না—আমরাও বুঝি তখন 'অস্টারলিৎস্' বা 'জেনা'-র যুদ্ধক্ষেত্রে! স্পষ্ট দেখছিলাম যেন বাজপাখির মতো ক্ষিপ্র দৃষ্টি হেনে নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্যদলকে আদেশ দিচ্ছেন।

নেপোলিয়নের ভূমিকায় স্বামীজীকে দেখে আমাদের মধ্যেও বীরত্ব ও সাহস যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো—আমরাও যেন এক একজন মার্শাল নে, সুল্ট, ভিক্টর, মারমন্ট, ম্যাকডোনাল্ড হয়ে উঠলাম। নেপোলিয়নের শৌর্য, বীর্য ও আত্মবিশ্বাস আমাদের অন্তরে তখন এমনভাবে জেগে উঠেছে যে, আমাদের মনে হলো সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমরাও গোটা পৃথিবীটাকে জয় করে নিতে পারি। স্বামী শিবানন্দ আমাদের বললেন ঃ "এই হলো স্বামীজীর 'জ্বালাময়ী বক্তৃতা'। এইরকম অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় বক্তৃতা দিতেন।"

নেপোলিয়ন প্রসঙ্গের পর স্বামীজী 'ললিতবিস্তর' থেকে বোধিলাভের আগে বুদ্ধদেবের বিখ্যাত সেই সঙ্কল্পবাণীটি আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং নিজের ভিতর যেন সেই ভাবটিকে জাগিয়ে তুললেন এই বলে ঃ

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

—অর্থাৎ শরীর শুকিয়ে যায় যাক। মাংস, হাড় সব ধ্বংস হয় হোক। কিন্তু সুদুর্লভ সেই জ্ঞানলাভ না করা পর্যন্ত আমি এই ধ্যানের আসন ছেড়ে উঠবো না।

গুরুভাইদের ও তাঁর গৃহি-ভক্তদের স্বামীজী প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। কারো অসুখ করলে বা কারো কোনও দুঃসংবাদ পেলে তিনি তাঁর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অসুস্থ ব্যক্তি একটু ভালো আছেন এই খবর স্বামীজী না পেতেন ততক্ষণ তিনি ছটফট করতেন। তাঁর জীবনের এইরকম বহু ঘটনা পুঁথিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এখানে সেগুলির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

স্বামীজীর শরীর শেষদিকে একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। তিনি স্বামী শিবানন্দকে বলতেন ঃ 'এই শরীরটা একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে। কতদিন আর একে জোড়াতালি দিয়ে চালাবেন? আর দেহ যদি চলেই যায়, তবুও নিবেদিতা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আর ওরা সকলে আমার কথামতো ঠিকই চলবে। জীবন দিয়েও ওরা আমার আদেশ পালন করবে। ওরাই আমার একমাত্র আশা-ভরসা।' এইসব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করতেন, ঢেলে দিতেন তাঁর আশীর্বাদ।

এই সময়ে তাঁর ভালবাসা ও আকর্ষণী শক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর শরীরকে আর স্থূল শরীর বলে মনে হতো না; মনে হতো ভাব, প্রেম, সহানুভূতির জমাট বাঁধা এক দিব্য বিগ্রহ। তাঁর শ্রীমুখ থেকে অপার্থিব ভালবাসা ও আশীর্বাণীর ধারা নিরন্তর প্রবাহিত হতো।

স্বামীজীর কাছে আমরা যখন যেতাম তখন জ্ঞান কাকে বলে, ভক্তি জিনিসটা কি, অথবা জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়—এসব কিছুই বুঝতাম না। আমরা তখন নেহাতই ছোট, আবার অনভিজ্ঞও বটে। কিন্তু আমরা তাঁর ভালবাসাটি বুঝতাম, সেটি ঠিক অনুভব করতাম। বুঝতে পারতাম, তাঁর ভালবাসা এ জগতের নয়। বাস্তবিক, তিনি তাঁর অপার ভালবাসা দিয়েই আমাদের কাছে টেনেছিলেন। জীবনে একটিবারও যিনি স্বামীজীকে দর্শন করেছেন তিনিই স্বীকার করবেন, এমন একজনকে তিনি দেখেছেন যিনি সত্যিই ভালবাসতে জানতেন এবং জগৎকে যিনি প্রেমের দিব্যমন্ত্রে উজ্জীবিত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু স্বামীজীর অনুপম দিব্য প্রেমের টানেই কত যুবক যে সর্বস্ব ছেড়ে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই! সেই প্রেমের শক্তি আজও জীবসেবায় আত্মবলি দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রবুদ্ধ করছে।

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি—নভেম্বর ১৯৫৪,
জুলাই এবং আগস্ট ১৯৫৬)

কেট স্যানবর্ন

বিগত গ্রীষ্মে যখন বিস্ময়কর বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন, বাগ্মী এবং লোকহিতৈষী এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য হলো আমার, তখন থেকেই উত্তেজনা চরমে উঠলো।

তাঁকে প্রথম দেখি 'ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক' [ট্রেনের] পর্যবেক্ষণকক্ষে যেটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিকাগোগামী যাত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের মধ্যে যেমন ভারতীয় পার্শিরা ছিলেন, তেমনি ছিলেন ক্যানটন-এর বিত্তবান ব্যবসায়ী, নিউজিল্যাণ্ডের মানুষ, পর্তুগীজ এবং স্পেনীয় ব্যবসায়ীদের সুন্দরী ফিলিপিনো গৃহিণীরা, রুচিসম্পন্না স্ত্রী এবং কলেজ-পড়ুয়া পুত্রসহ অভিজাত ও সম্মানিত জাপানী পুরুষেরা। এই অচেনা-অজানা সহযাত্রীরা আমাকে এতটাই আকর্ষণ করছিলেন যে, চারপাশের বিশাল পর্বতমালা, গিরিসঙ্কট, হিমবাহ এবং 'গ্রেট ডিভাইড'-এর অনুপম সৌন্দর্যের দিকেও সম্পূর্ণ মনটা দিতে পারছিলাম না। বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল ওঁদেরই দিকে।

সকলের সঙ্গেই আমি কথা বলেছিলাম। তাঁরাও আন্তরিকভাবে আমাকে তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। আমিও কোনওরকম লজ্জা-সঙ্কোচ না করেই দশমুখে আমার গ্রামের বাড়ির প্রশস্তি করলাম এবং প্রত্যেককেই আমার স্থায়ী ঠিকানা "মেটকাফ, ম্যাসাচুসেটস্"-সমন্বিত একখানি করে কার্ড দিয়েছিলাম। পরোক্ষভাবে আমি বস্টন ও সন্নিহিত এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে, তাঁরা সকলে প্রায়ই আমার খামার-বাড়িতে অতিথি হয়ে আসেন। অতএব তাঁদেরও সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

কিন্তু আমার মনে সবচেয়ে বেশি ছাপ ফেলেছিলেন ঐ সন্ন্যাসী, যাঁকে দেখে মনে হয়েছিল পুরুষত্বের চমৎকার দৃষ্টান্ত। উচ্চতায় ছ-ফিট দুই ইঞ্চি; স্যালভিনি-র পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সর্বাঙ্গে। চালচলন রাজকীয় ও মহিমাব্যঞ্জক—যেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর তিনি। চোখদুটি কোমল এবং কালো; কিন্তু ক্রুদ্ধ হলে তারা অগ্নিবর্ষণে সক্ষম। আবার মজার আলোচনায় আনন্দে তারা নেচে উঠতেও জানে।

তাঁর মাথায় ছিল উজ্জ্বল হলুদ পাগড়ি, লম্বায় যা বেশ কয়েক হাত হবে; গায়ে সন্ন্যাসীর অভিজ্ঞান—রক্তাভ গৈরিক—যা চওড়া, কাজকরা গোলাপি উত্তরীয় দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। তার সঙ্গে ছিল নস্যি রঙের ফুলপ্যান্ট, আর পায়ে পিঙ্গলবর্ণের জুতো। এই তাঁর বেশবাস।

আমার থেকেও তিনি ভালো ইংরেজি বলতেন। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শেকস্পীয়র, লংফেলো, টেনিসন, ডারউইন, মূলার এবং টিণ্ডাল থেকে তিনি যেমন অনর্গল উদ্ধৃতি দিতে পারতেন, তেমনি আমাদের বাইবেল থেকেও পাতার পর পাতা মুখে মুখে বলে যেতে পারতেন। সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল এবং তাঁদের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাঁকে দর্শন করাই ছিল এক মস্ত শিক্ষা। তাঁর সান্নিধ্যে আসার অর্থই ছিল আলোকিত হওয়া, অজ্ঞান-অন্ধকারকে চিরতরে বিদায় জানানো। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে বলেছিলাম, তিনি যদি দৈবাৎ কখনও বস্টনে আসেন তো আমি খুব খুশি হব এবং কিছু জ্ঞানি-গুণী ও কৃষ্টিবান নারী-পুরুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবো।

তারপর মেতে উঠলাম [কলাম্বিয়ান] প্রদর্শনী [বা বিশ্বমেলা] উপলক্ষে নানান কাজে। দৈহিক ও মানসিক প্রচণ্ড ধকল বইবার ফলে কার্যত আমি ক্লান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ি। শয্যাশায়ী অবস্থায় বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত বিভিন্ন মনের মানুষদের কথা মনে হতো, স্মরণে আসত হরেকরকম জনসমাবেশের কথাও—সব যেন কেমন অতীতের বর্ণাঢ্য স্বপ্ন বলেই বোধ হতো, মনে হতো সব বুঝি উদ্ভট কল্পনা।

সবে একটু সুস্থ হয়ে উঠেছি, এমন সময় পঁয়তাল্লিশ শব্দের একটি টেলিগ্রাম পেলাম। জানতে পারলাম ট্রেনের পর্যবেক্ষণ কক্ষের সেই সাধু বন্ধুটি বস্টনের 'কুইনসি হাউস'-এ আছেন। আমার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন। তখন স্পষ্ট মনে পড়লো আমিই তাঁকে বলেছিলাম যদি তিনি কখনও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেন বা যদি কখনও সাহায্যের প্রায়োজন হয়, তাহলে যেন তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে, কনকর্ড দার্শনিকদের সঙ্গে, নিউইয়র্কের বিত্তবান মানুষদের সঙ্গে এবং যশস্বী, প্রতিষ্ঠিত ও সঙ্গতিসম্পন্না বলিয়ে-কইয়ে লেখিকাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন আগস্টের মাঝামাঝি—শহর ফাঁকা। কাছেপিঠে কেউ নেই। তাই চিন্তা হলো, কেমন করে আমি এই উজ্জ্বল পোশাকে

সজ্জিত পণ্ডিতকে যত্নআত্তি করবো? আতঙ্কিত হলাম। তবুও সাহসে ভর করে তার করলাম ঃ "আপনার (বার্তা) পেয়েছি। আজই চলে আসুন। ৪ টে ২০-র ট্রেন, বস্টন, এ্যালবানি।"

বিকট হুইস্‌ল বাজিয়ে ট্রেন থামলো—সে ধ্বনিতেও যেন পরিহাসের সুর। ভারতীয় সন্ন্যাসীকে দেখে ট্রেনের জন্য অপেক্ষমান জনতার মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা ভাবতে আমিও কেঁপে উঠলাম। কিন্তু তিনি যখন ট্রেন থেকে নামলেন তখন সকলে এতটাই অবাক হলো যে, তাকে রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না!

[শিকাগো ধর্মমহাসভায়] বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে যদি তাঁকে রাজকীয় অথচ অদ্ভুত বলা যেত, এই গুস্‌ভিলে (Gooseville) রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁকে সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। তিনি এত মালপত্র সঙ্গে এনেছিলেন যে, পরবর্তী স্টেশনে ট্রেনটি দশমিনিট দেরিতে পৌঁছেছিল। গোটা বোদলেয়ান লাইব্রেরীটিকেই যেন তিনি বয়ে এনেছিলেন—দুর্বোধ্য, দুর্লভ ভারী ভারী সব বই, সব অর্থেই ভারী।

এবার পাগড়িটি দেখলাম আগের থেকে আরো উজ্জ্বল হলুদ। বেগুনী কোমরবন্ধনীটি লাল জোব্বার সঙ্গে নিতান্তই বেমানান। অনাড়ম্বর, সাদামাটা, শান্ত পরিবেশটি দেখে তিনি কিঞ্চিৎ অবাকই হয়েছেন মনে হলো। কিন্তু তিনি এতই ভদ্র ছিলেন, এ ব্যাপারে একটি কথাও বললেন না।

[তাঁকে কেন্দ্র করে] বিদ্রুপের হাসি এবং কটাক্ষ তিনি লক্ষ্য না করলেও আমি অবশ্যই করেছি; কিন্তু ঐসব তিনি গ্রাহ্যই করতেন না। বললেন ঃ "আমাকে পূর্বপুরুষদের পোশাক-আশাক বর্জন করতে হবে নাকি? আপনি ভারতে গেলে কি আপনার পোশাক ছেড়ে আমাদের ভারতীয় মেয়েদের পাক-দেওয়া বেশভূষা পরবেন?" খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। বাস্তবিক, শিষ্টাচারের অভাব ও অজ্ঞতা থেকেই আমরা ভেবে বসি, যা-কিছু আমাদের ধরন-ধারণ থেকে পৃথক তা-ই সন্দেহজনক, হাস্যকর ও ভুল। রোজ টেরী কুক (Rose Terry Cooke) আমাকে বলেছিলেন, যে শহরে একদা তিনি থাকতেন, সেখানে প্রত্যেক বহিরাগত ব্যক্তিকেই বলা হত "ফারিনার" ("furriner")। শব্দটি উচ্চারণের সময় অপছন্দ ও ঘৃণার সুর ঝরে পড়তো। আমার "ফারিনার"-এর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হলো।

অবস্থা চরমে ওঠে পরদিন সকালে। স্বামীজী তখন বারান্দায় বসে সম্ভবত

গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন। অথবা এও হতে পারে তিনি তখন মনকে চিন্তাশূন্য করার চেষ্টা করছিলেন যাতে দিব্য আলো ও ভাবতরঙ্গ সেখানে প্রবেশ করতে পারে। তিনি নিষ্পন্দ হয়ে বসেছিলেন, দৃষ্টি ফ্যালফেলে এবং স্থির—যেন নির্বাণোপম এক অবস্থালাভের জন্য সচেষ্ট। সেই দৃশ্য দেখে বিল হ্যানসন (Bill Hanson) ঘুরপথে আমার স্বামীর কাছে এসে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বলে ওঠে ঃ "হায় ভগবান! ম্যাডাম এ-বস্তুটি কোথা থেকে পেলেন, কিভাবে তৈরি করলেন?" তার চোখে কিছুটা উৎকণ্ঠা কিছুটা কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছিল।

তার ধারণা হয়েছিল ওটি নির্ঘাৎ মোমের তৈরি কোনও পূর্ণাবয়ব মূর্তি, আর নয়তো কাপড়ের বিশাল পুতুল। আমিই ওটি তৈরি করে, রং করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য বোধ হয় ওখানে রেখে দিয়েছি।

ও যে এমনটি ভাববে, আমি কি করে তা কল্পনা করবো? অতএব আমি যে সত্য কাহিনী বলতে বসেছি, আশা করি আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। যেদিন আমার প্রাচ্যদেশীয় অতিথি মধুর বিষণ্ণ এবং কিছুটা সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলেন, "আপনি যেসব প্রভাবশালী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের কথা আমাকে বলেছিলেন, তাঁরা কোথায়? আমি অবশ্যই তাঁদের দেখতে চাই এবং স্বদেশের দরিদ্র মানুষদের জন্য কাজ শুরু করতে চাই"। সেদিন আমাকে সত্যিই ভীষণ বিব্রত হতে হয়েছিল, সম্মুখীন হয়েছিলাম এক কঠিন পরীক্ষার।

পরদিন সকালেই চটপট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে চিঠিপত্র ডাকে দেওয়া গেল এবং গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমার বন্ধুবান্ধবেরা যাঁরা কেউ সমুদ্র-সৈকতে, কেউ বা পাহাড়ে, কেউ বা কোনও হ্রদের ধারে ছুটি কাটাচ্ছিলেন, তাঁরা সকলেই উদার হৃদয়ে অনতিবিলম্বে আমার পাশে এসে জড়ো হলেন; বিশেষ চিন্তাভাবনা না করে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তাঁদের মাধ্যমে তা অভূতপূর্বভাবে রূপায়িত হয়েছিল।

এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়লে আজও আপন মনে আমি না হেসে পারি না। সেদিন জনা-বারো মহিলা আমার মহামান্য অতিথির চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মমত ও দর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন। পাশ্চাত্যের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থ উপার্জনের দ্বারা ভারতের চরম দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষকে দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দেওয়ার যে পরিকল্পনার কথা তিনি ভাবছিলেন, তাও সবিস্তারে বললেন। আমার বন্ধুরা তাঁর কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন এবং মাঝেমাঝেই সায় দিচ্ছিলেন। তারপর একসময় তিনি আমাদের

বললেন ঃ "আত্মা একটি বৃত্ত যার পরিধি বলে কিছু নেই, অথচ যার কেন্দ্র সর্বত্র; এবং এই মহাবিশ্ব অনন্ত দ্বারা রচিত এক শক্তি—পৃথক পৃথক লোকগুলি স্বতন্ত্র এক একটি ছন্দমাত্র।

আমার ক্লান্ত মন তখন অস্থিরভাবে দুলতে শুরু করেছে। এক সময়ে দেখলাম আমি চেয়ারের একধারে বসে আছি; বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের কথা একমনে শুনতে শুনতে চোখদুটি টনটন করছে আর মুখটি ঈষৎ মুক্ত...। উদ্দীপ্ত ও আনন্দবিহ্বল ভঙ্গিতে তিনি বলেই চলেছেন এবং আমি ...গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর সেসব অপূর্ব কথা শুনছি...। এক সময় আমি উঠে আড়ালে গিয়ে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়লাম—হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো একলাই হেসে চলেছি। [এ হাসি এই ভেবে যে,] আমি শেষপর্যন্ত সফল হয়েছি (যা করতে চেয়েছিলাম, তা করতে পেরেছি)। কিন্তু আমাকেও তার জন্য "সংগ্রাম" করতে হয়েছে।

বিদায় নেওয়ার সময় তিনি আমাকে "মা" বলে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, যে-কোনও ভারতীয় নারীর কাছে এই সম্বোধন বিশেষ সম্মানের। এই সৌজন্যে আমিও প্রীত হয়েছিলাম, এমন সন্তানের জন্য সেদিন প্রকৃতই আমি গর্ববোধ করেছিলাম...।

[মিস কেট স্যানবর্ন (১৮৩৯-১৯১৭) পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যক্তি যিনি কানাডার ভ্যাঙ্কুভার-এ স্বামীজীর পদার্পণের অব্যবহিত পরেই তাঁকে দর্শন করেন। 'ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক' নামক ট্রেনের বিশেষ পর্যবেক্ষণ কক্ষেই ভ্যাঙ্কুভার থেকে শিকাগো যাওয়ার সময়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তার আগে স্বামীজীর সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। বিশেষ মুগ্ধ হয়ে তিনি স্বামীজীকে তাঁর নাম-ঠিকানা দেন এবং বলেন, বস্টনের কাছাকাছি ব্রীজি মেডোস, মেটকাফ (Breezy Meadows, Metcalf) নামক খামারবাড়িতে স্বামীজী তাঁর অতিথি হলে তিনি খুব খুশি হবেন। তিনি স্বামীজীর সঙ্গে বিশিষ্ট জ্ঞানি-গুণীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। একথা সুবিদিত যে, স্বামীজী তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ রাইট-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং অবশেষে শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি অংশগ্রহণ করেন। উপরের স্মৃতিকথাটি কেট স্যানবর্ন রচিত Abandoning an Adopted farm (নিউইয়র্ক, ১৮৯৪, পৃঃ ৭-১৪) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।]

কে. এস. ঘোষ

'বেদান্ত কেশরী'-র সম্পাদক অনুরোধ করেছেন, তাই আমার জীবনের যে ঘটনাটিকে বিগত চল্লিশ বছর ধরে আমি আমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করে এসেছি, তা কুণ্ঠিতচিত্তে বলার চেষ্টা করবো। প্রকৃতপক্ষে কবি কামিনী রায় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'নব্যভারত' নামক মাসিকপত্রে ঘটনাটি অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হলেও অন্য কোথাও তা প্রকাশিত হয়নি।

অবশ্য আমার এখন যে বয়স তাতে কৈশোরের লজ্জা-সংকোচ বেমানান। [তাই যা ঘটেছিল তা অকপটেই বলছি।] ক্ষণকালীন হলেও ছাপার অক্ষরে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ঘটনাটির মূল্য থাকলেও থাকতে পারে, কারণ এর থেকে বোঝা যাবে ছোটখাট ব্যাপারেও তিনি কতদূর মহৎ হতে পারতেন, অল্পবয়সী স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গেও কেমন সহজ-সরলভাবে মিশতে পারতেন। স্মৃতিতে ঘটনাটি যতখানি ধরা আছে তার যথাসম্ভব বর্ণনা আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি শুধু এই আশায় যে, এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা মহান স্বামীজীর জীবনের সবকিছুই জানতে আগ্রহী।

এদেশে জীবনী রচনাশৈলীর শৈশবদশা এখনও কাটেনি। আমাদের দেশের বিশিষ্ট কিছু মানুষের বেশ কয়েকটি সুন্দর জীবনী লেখা হয়েছে, ঠিকই; কিন্তু সেসব গ্রন্থে আমরা তাঁদের সাফল্য ও কৃতিত্বের কথাই শুধু পাই। ব্যর্থতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি যা কমবেশি সব মানুষের জীবনেই আসে, যা তাদের পার্থিব জীবনকে বিচিত্র বর্ণ ও স্বাদের মানবীয় মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলে, এই সব গ্রন্থে তাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি তা এই পত্রিকার পাঠকদের ভালো লাগতে পারে কারণ তার মাধ্যমে স্বামীজীর চরিত্রের একটি আকর্ষণীয় মানবীয় দিক উন্মোচিত হয়েছে।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। তখন আমি বৈদ্যনাথ দেওঘর হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন-এর ছাত্র। সে বছরই নভেম্বর মাসে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই স্বর্গত কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু (যিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত-র জীবনীকার) সকলকে জানান যে, শিকাগো ধর্মমহাসভার বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য দেওঘরে এসেছেন। তিনি এও বলেন, স্বামীজী তাঁর সহপাঠী;

সুতরাং যদি ছাত্রদের কেউ এই অসাধারণ মানুষটিকে দর্শন করতে চায় তো এই মস্ত সুযোগ।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার ঢেউ ভারতবর্ষেও আছড়ে পড়ে সর্বত্র এক উন্মাদনা জাগায় এবং ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। ভারতীয় সন্ন্যাসীর যশগৌরব আমাদের মতো স্কুলের তরুণ ছাত্রদেরও কানে এসেছিল এবং তাতে আমাদের বুক দশ হাত হয়ে গিয়েছিল। 'বেদান্ত', 'গীতা' এবং 'অদ্বৈতবাদ'-এর মতো শব্দগুলিও তখন আমরা শুনেছি; কিন্তু ঐ বয়সে সে সবের মর্ম উপলব্ধি করার সাধ্য আমাদের ছিল না। সে যাই হোক, আমাদের মতো স্কুলের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় যে স্বামী বিবেকানন্দের নেই, সে দুশ্চিন্তা যে আমাদের মনে ওঠেনি তা নয়; কিন্তু আশঙ্কা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। আমার বন্ধু সতীশচন্দ্র মজুমদার, যিনি এখন কর্মসূত্রে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারিয়েট-এর সঙ্গে যুক্ত এবং আমি ঠিক করে ফেললাম—যা থাকে কপালে, একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক। সেই মতো এক বিকেলে পাহাড়ী নদী দুরওয়া-র দিকে রওনা হই। দুরওয়া সাঁওতাল পরগণার সুন্দর দেওঘর শহরের পশ্চিমপ্রান্তে। স্বামীজী তার কাছেই তাঁর কলকাতার এক শিষ্যের বাড়িতে তখন অবস্থান করছিলেন।

দুরুদুরু বক্ষে আমরা গৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে সেবক-গোছের এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। স্বামীজীর খোঁজ করতেই তিনি নীরবে ইঙ্গিত করলেন—ঐ যে। দেখলাম গৈরিক পোশাক পরিহিত রাজকীয় চেহারার এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে বেরিয়ে আসছেন। হাতে তাঁর ছাতা। মানুষটি যে কে, তা বুঝতে আমাদের কোনও অসুবিধাই হলো না। সাহসে বুক বেঁধে দ্রুত এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর চরণ স্পর্শ করার জন্য নিচু হলাম। কিন্তু স্বামীজী চট্ করে দু-একপা পিছিয়ে গেলেন। আমাদের প্রণাম করতে না দিয়ে প্রশ্ন করলেন আমরা কে, কি উদ্দেশ্যে এসেছি, ইত্যাদি।

বললাম, আমরা স্থানীয় হাই-স্কুলে পড়ি। তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতেই এসেছি। তিনি তাঁর সঙ্গে আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন। রাস্তাটি সোজা চলে গেছে দুরওয়া-র দিকে। স্বামীজীকে এভাবে একান্তে পেয়ে এবং তাঁর সঙ্গে চুপচাপ হাঁটতে পারার দুর্লভ সুযোগ পাওয়ায় আমরা দুই বন্ধুই মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলাম।

স্বামীজী যে বাড়িটিতে ছিলেন, সেটি ছিল শহরের অতি সুরম্য এলাকায়। আধ মাইল দূরেই পাহাড়ী নদী দুরওয়া। বাড়ির সামনে দিয়েই বাঁধানো রাস্তা নদী পর্যন্ত চলে গেছে। নদীর ওপার থেকে শুরু হয়ে রাস্তাটি ফের এঁকেবেঁকে দূরের উঁচু পাহাড়গুলিতে মিলিয়ে গিয়েছে। শীতের পড়ন্ত বেলা—ভারী চমৎকার! আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। শ্যামল বনানী শোভিত দূরের শৈলশ্রেণি নিচের সমতলভূমির দিকে যেন প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমরা আস্তে আস্তেই হাঁটছিলাম, কিন্তু মনে হলো স্বামীজীর যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতেই জানালেন, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না, সেই কারণেই কয়েকটা দিন বিশ্রামের জন্য এই স্বাস্থ্যকর স্থানে আসা। তিনি মনে করতেন তাঁর হার্ট ঠিকই আছে; গোলমাল যা কিছু, তা মনে হয় ফুসফুসটার।

এই ধারণা নিয়ে আমরা এসেছিলাম যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র স্বামীজী আমাদের সঙ্গে বেদান্ত বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু আমাদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি তাঁর ধার-পাশ দিয়েও গেলেন না। যেন সেন্ট পল-এর 'যে যেমন, তার কাছে তেমন' নীতি অনুযায়ী বেদান্তের আলোচনা উপযুক্ত অধিকারীর জন্য আপাতত শিকেয় তুলে রেখে তিনি হাজার হাজার ছাত্রের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ নিয়েই কথা বলতে লাগলেন। এটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল কারণ 'শিক্ষা' নামক প্রহসনের কবলে পড়ে ছাত্রসমাজ তখন ক্রমশ হীনবল হয়ে পড়ছিল। পশ্চিম দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দূরের সমুন্নত পাহাড়গুলির দিকে দৃষ্টি মেলে তিনি জানতে চাইলেন আমরা ঐ পাহাড়গুলিতে কখনও গিয়েছি কিনা। অতদূর যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি শুনে তিনি অবাক হলেন। তিনি তখন বুঝিয়ে বললেন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে মাঝে মাঝে দূরে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে হয়। তিনি এও বললেন, আমাদের পক্ষে রবিবারের ছুটির দুপুরগুলো কাজে লাগানোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, কিছু খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে দূরের ঐ পাহাড়গুলোয় চলে যাওয়া এবং সারাটা দিন প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটিয়ে সন্ধ্যায় নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসা।

আমরা কেমন পড়াশুনা করছি, হস্টেলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কিরকম—এসব খবরও তিনি নিলেন। আমরা রোজই কিছুটা ঘি খাই শুনে তিনি বললেন, বেশি ঘি খাওয়া ভালো নয়, কারণ ঘি হজম করা কষ্টকর। ওটি দুষ্পাচ্য — 'দুষ্পাচ্য' শব্দটি তিনি বেশ জোর দিয়েই উচ্চারণ করলেন। বললেন, বরং মাখন

খাওয়া ভালো। আজ মনে হয়, পাশ্চাত্যে যাওয়ার ফলেই খাদ্য হিসাবে ঘি-এর চাইতে মাখনের উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন। এদেশে ঘি-এর চলনই বেশি। তাই পাশ্চাত্য জীবনধারায় অনভ্যস্ত স্বাস্থ্যবান দশজন মানুষের মধ্যে নয় জন ভারতীয়ই ঘি ফেলে কখনোই মাখন খেতে চাইবেন না।

কথাপ্রসঙ্গে আমরা পূর্ববাংলার মানুষ জানতে পেরে স্বামীজী বললেন, বেশ কয়েকবছর আগে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং দেখেছেন সেখানকার লোক খুব মাছ খায়। এটা খুব ভালো, তিনি বললেন। বাস্তব দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট সাধারণ ব্যাপারস্যাপার যা সাধারণ সন্ন্যাসীর নজর এড়িয়ে যায়, দেখলাম, সেসব বিষয়েও তাঁর সমান কৌতূহল, বিশেষ করে যদি তাদের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সম্পর্ক থাকে।

এইভাবে কিছুক্ষণ কথা বলতে বলতে আমরা দুরওয়া নদীর কাছে পৌঁছে গেলাম। নদীর ধারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবার আমরা ফিরতি পথে। চুপচাপ হাঁটছি আর লক্ষ্য করছি একনাগাড়ে কথা বলার দরুন স্বামীজী ক্লান্ত হয়েছেন, তাঁর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে। অমিত শক্তিধর আত্মা যেন সংগ্রাম করে চলেছে রক্ত মাংসের একটি শরীরের সঙ্গে, যে তেজঃপূর্ণ শরীর নিরন্তর কর্মের প্রচণ্ড বেগ ধারণ করে করে আজ ক্লান্ত, কর্মের ভারে আজ যেন সে নুয়ে পড়তে চায়। এইটুকুই যেন আমরা সেদিন উপলব্ধি করলাম। কিন্তু তখন ভাবতেও পারিনি তাঁর দেহ ছেড়ে দেওয়ার দিন আগতপ্রায়, তাঁর আত্মা আর দেহপিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না।

হালকা এবং গম্ভীর বহুধরনের চিন্তাই আমাদের তরুণ মনে তখন খেলে যাচ্ছিল। মহাত্মার আকর্ষণ ইতোমধ্যেই আমাদের মন দুটিকে মুগ্ধ করেছে। তাই সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে দেওঘরে তিনি কোনও বক্তৃতা দেবেন কিনা জানতে চাইলাম। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসতে পারি কিনা, সে-কথাও জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। তাছাড়া এই শহরে কতদিন তিনি থাকবেন, তাও অনিশ্চিত।

এসব কথা বলার পর স্বামীজী রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। তাঁর শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মহিমাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার পা-দুটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তিনি তাকাতে লাগলেন। বস্তুত যেভাবে আমি জুতোর ফিতে বেঁধেছিলাম তার

মধ্যে তিনি ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন। প্রত্যেক ফিতের মাথা দুটি একই দিকে ঘোরানো ছিল। তিনি আমাকে ঠিক মতো ফিতেগুলি বাঁধতে বললেন। পূর্ব বাংলার অজ পাড়াগাঁয়ে আমার জন্ম। সেখানেই বড় হয়েছি। তাই তিনি ঠিক কি বলতে চাচ্ছেন তা আমি ধরতেই পারিনি, জুতোর দিকে তাকালাম বটে, কিন্তু স্বামীজীর অস্বস্তির কারণটা ঠিক কি, তা মাথাতেই এলো না। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ আমার কাছে বাস্তবিকই দুর্বোধ্য ঠেকলো। (কিন্তু পরে বুঝেছিলাম) সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদের যথাযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনা কেবল তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিরই পরিচায়ক নয়, বস্তুত তার মধ্যে আধুনিক জীবনশৈলীর শোভনতা বিষয়ে তাঁর মনোভঙ্গিটিও অভিব্যক্ত। আমার বন্ধুরা পোশাকের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কখনও আমাকে সাধুবাদ দেয়নি। কখনও কখনও এসব ব্যাপারে উদাসীনতার ফলেও এক ধরনের অগোছালভাব গড়ে উঠে থাকবে। বর্তমানক্ষেত্রে অবশ্য আমার ত্রুটি হয়েছিল এই, যদিও স্বামীজীর পুণ্য দর্শন উপলক্ষে এক জোড়া নতুন জুতো পরেছিলাম, ফিতেগুলো ঠিকমতো বাঁধিনি। ফিতের মাথাগুলো বাঁধার পর বিপরীত দিকে থাকার কথা। সেটিই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এক্ষেত্রে সেগুলো ছিল একমুখী। ব্যাপারটা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন স্বামীজীর নজর এড়ায়নি।

স্বামীজীর সামনে আমি বোকার মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। (আমার অবস্থা দেখে) স্বামীজী ফিতেগুলো ঠিক করে বাঁধতে বললেন। এতে আমার অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল। তিনি তখন একটি আঙুল দিয়ে জুতোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে আমি আরো ভড়কে গেলাম। আমার দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে ঝুঁকে পড়ে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "তাহলে আমাকেই করতে হচ্ছে।" আমিও যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে যন্ত্রচালিতের মতো ডান পাটি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি ঠিকমতো ফিতেটি বেঁধে দিয়ে অন্য জুতোর ফিতেটি আমাকে বাঁধতে বললেন। তাঁর সমস্ত আচরণটি এমন স্বাভাবিক অথচ এত বিস্ময়কর, এত স্বতঃস্ফূর্ত অথচ এমন তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। আমার বোধ-বুদ্ধি সব যেন উবে গিয়েছিল। ফলে তাঁর আদেশ আমি পালন করতে পারিনি। আজ এত দিন পরও যখন সেদিনের সেই ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে, তখন খুবই অস্বস্তি হয়। আমার জায়গায় কোনও শহুরে ছেলে হলে অনায়াসেই সে পরিস্থিতিটা সামলে নিতে পারতো এবং স্বামীজী তাকে তারিফ করতেন। কিন্তু আমার ব্যাধিটা যে কি, সে সম্বন্ধে আমার

কোনও ধারণাই ছিল না। তাই স্বামীজী ওষুধ বাতলে দিলেও সে ওষুধ আমি গ্রহণ করতে পারিনি। আমার সৌভাগ্য স্বামীজী আমার ঘাবড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সহজেই ধরতে পেরে ঐ ব্যাপারে আর কিছু বলেননি। সংবিৎ ফিরে পেতেই আমি অবশ্য আমার অজানিত ও আপাত-অবাধ্য আচরণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে গেলাম, কিন্তু তিনি পা সরিয়ে নিলেন; সনাতন হিন্দুদের রীতি অনুযায়ী পায়ের ধুলো নিতে দিলেন না।

সে যাই হোক, আমি ভাবী স্বামীজীর মহানুভবতার কথা। কী গভীর তাঁর মানবিকতা, কী নিরভিমানতা! নির্দ্বিধায় এক অজানা, অচেনা স্কুলের ছাত্রের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছেন! অথচ স্বদেশের ও বিদেশের কত শিক্ষিত মহিলা ও পুরুষ একবার তাঁর চরণ স্পর্শ করতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। তাঁর এই চরম আত্মবিলুপ্তি ও আত্মাভিমানশূন্যতা এতই মধুর, উদার ও করুণাপূর্ণ যে, তা আর কোনও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই তাৎক্ষণিক ঘটনাটিতে তাঁর ভাবমূর্তিখানি আমাদের অন্তরে সুবিশাল হয়ে আঁকা হয়ে গিয়েছিল; চিরকালের জন্য তাঁর পবিত্র নামটি আমাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিদায় নেওয়ার সময় হলে আমরা তৃতীয়বার তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এবারও তিনি নিরস্ত করলেন।

আমরা যখন হস্টেলে ফিরি তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই ঘটনাটির কথা ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়ায় বন্ধুর দল স্বামীজীর স্পর্শপূত জুতোর ফিতাটি দেখার জন্য ভিড় করে এলো। তারা কিছুতেই আমাকে জুতো খুলতে দেবে না! শেষে অনেক রাতে শঙ্কিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জুতো জোড়া খুলতে পেরেছিলাম।

সেই অবিস্মরণীয় দিনটি আজ অতীত, কিন্তু তার স্মৃতি-সৌরভ এখনও আমাকে ঘিরে আছে; থাকবেও তাই, যতদিন আমি জীবিত আছি। ঘটনাটির মধ্য দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি স্বামীজীর গভীর মানবিকতা, প্রত্যক্ষ করেছি এমন শিশুসুলভ সারল্য যা কেবল তাঁর মতো মহামানবেই থাকা সম্ভব। উচ্চতম চিন্তার রাজ্যে তাঁর মন বিচরণ করলেও, সামাজিক দুঃখ-দারিদ্র্য নিবারণের হাজারো পরিকল্পনায় তাঁর মন নিমগ্ন থাকলেও শিশু, সাধারণ মানুষ এবং অধঃপতিতদের কেমন করে ভালবাসতে হয়, তা তিনি জানতেন। —'তৃণাদপি সুনীচেন'—ছোটর থেকেও ছোট হয়ে।

দ্বিতীয় ও শেষবার স্বামীজীকে দর্শন করি দেওঘর স্টেশনে, ট্রেনের কামরায়।

তাঁর পাশে ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁরা কলকাতায় ফিরছিলেন। স্বামীজীর পরিধানে ছিল হাফ প্যান্ট, গায়ে কোট। পান চিবুতে চিবুতে ভারতীয় কায়দায় তামাক খাচ্ছিলেন। সাধারণ কোনও সন্ন্যাসী এ রকম বেপরোয়া পোশাকে প্রকাশ্যে ভ্রমণ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন, পাছে সনাতনপন্থীরা মর্মাহত হন। কিন্তু স্বামীজী ঐসব সামাজিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা করতেন না। এটা একদিকে যেমন তাঁর শক্তির উৎস ছিল, অন্যদিকে একই কারণে তিনি স্বদেশের এক শ্রেণীর মানুষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'নিষ্কাম কর্মী'। তাই উভয়ক্ষেত্রেই তিনি উদাসীন থাকতেন।

আর একটি কথা বলে শেষ করবো। এমার্সন কোথাও এক সন্ন্যাসিনীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সন্ন্যাসিনীর সম্পর্কে খবর ছড়িয়েছিল যে, তিনি রোমের কাছেই থাকেন এবং নানারকম 'মির‍্যাকল্স' বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখান। এই সংবাদে পোপ বিচলিত হন। নেরির সেন্ট ফিলিপ-কে তিনি এই বিষয়ে বিশদ খোঁজখবর নেওয়ার জন্য পাঠান। সন্ন্যাসিনী যে-মঠে থাকতেন, সেন্ট ফিলিপ সেখানে গিয়ে সঙ্ঘাধ্যক্ষার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন যে, তিনি উক্ত সন্ন্যাসিনীর দর্শনপ্রার্থী। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হলে তিনি একটি ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি ধূলিধূসরিত ভারী জুতো জোড়া সমেত পা-দুটি কাছের একটি চেয়ারে তুলে দিলেন এবং সন্ন্যাসিনীটিকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাঁর জুতো জোড়া খুলে দেন। অপমানিত হয়ে সন্ন্যাসিনী তখনই ঘর ছেড়ে চলে যান। সেন্ট ফিলিপও সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পোপের কাছে আসেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভয়ের কোনও কারণ নেই, কারণ সন্ন্যাসিনীটির ভিতর কোনও দীনতার ভাব নেই। যেখানে দীনতা নেই, সেখানে দিব্যতার কোনও প্রকাশ ঘটতে পারে না।

বাস্তবিক, স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় অবিশ্বাস্য দিব্যশক্তির উৎস ছিল তাঁর নীরব নিরভিমানতা।

(বেদান্ত কেশরী, জানুয়ারি, ১৯৩৮)

ফ্র্যাঙ্ক রোডহ্যামেল

দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল স্বামীজী ক্যালিফর্ণিয়ার শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা করেছিলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা! অন্যত্র যেমন হয়েছিল, এখানেও তা-ই। প্রথম দিন থেকেই শ্রোতারা তাঁর আপন হয়ে গিয়েছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেনও তা-ই। বিনা প্রতিরোধে স্বামীজীর চিন্তার দুরন্ত স্রোতে তাঁরা ভেসে গিয়েছিলেন। এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা কোনও বাধার সৃষ্টি করতে চাননি; তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন অলোকসামান্য দিব্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে থেকে তাঁদের মনের নিভৃত ফাঁক ফোঁকরগুলি আলোয় ভরিয়ে নিতে—তাতেই ছিল তাঁদের আনন্দ, সেটিই ছিল তাঁদের অভিনবত্ব। অবশ্য এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের প্রতিরোধ করার প্রবণতা ছিল, কিন্তু তাঁদের সেই প্রতিরোধক্ষমতা মহান আচার্যের দুর্দমনীয় যুক্তি, সূক্ষ্মবিচারশক্তি এবং শিশুসুলভ সারল্যের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। বাস্তবিক, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই ছিলেন যাঁরা কখনও সখনও প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়াতেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটু হেসে মৌনসম্মতি জানিয়ে নয়তো বা নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আবার নিজের নিজের আসনে তাঁরা বসে পড়তেন।

স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাঁর বাঙ্ময় দৃষ্টি, মুখের নানা অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গি, গম্ভীর অথচ মধুর সুরেলা কণ্ঠে সংস্কৃত স্তোত্রের আবৃত্তি এবং সস্মিত প্রত্যয়ে তার যুগপৎ তর্জমা এবং সর্বোপরি সেই হিন্দু সন্ন্যাসীর নয়নাভিরাম বেশভূষা—তা কে ভুলতে পারে?

বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন অনুপম। অধিকাংশ বক্তাদের মতো তিনি কখনও 'নোটস্' বা চিরকুট দেখতেন না। শ্রোতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে একই বিষয়ে একাধিকবার বক্তৃতা করলেও সেগুলি নিছক পুনরাবৃত্তি ছিল না। তিনি যখন বলতেন, তখন নিজের অনুভূতি, নিজের সত্তা যেন তাতে ঢেলে দিতেন। সর্বদা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্তর থেকে কথা বলতেন। বেদান্তের দুর্বোধ্য বিষয়গুলি কেবলমাত্র বৌদ্ধিক অনুমানের বিষয় হয়েই থাকতো না, তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতির

স্পর্শে তা আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠতো। কোনও আলোচনা শুরু করার আগে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ধীরেসুস্থে শ্রোতাদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতেন; এটাই ছিল তাঁর রীতি। তারপর এমন সহজভাবে তিনি আরম্ভ করতেন যেন মনে হতো তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলছেন। স্বরগ্রাম ধীরে ধীরে চড়তে থাকতো, আবেগের ওঠাপড়ায় কণ্ঠস্বরও বিভিন্ন স্তরে কম্পিত হতো। তাঁর এই বাচনশৈলী কাছের শ্রোতাদের খুবই উপভোগ্য হতো, কিন্তু যাঁরা হল-এর পিছনসারিতে বসতেন, তাঁদের পক্ষে অবশ্যই অস্বস্তির কারণ ছিল, কারণ প্রায়ই শোনা যেত পিছন দিক থেকে আওয়াজ উঠতো—"আর একটু জোরে!" তাঁর কথাগুলির মধ্যে শক্তি থাকতো; সেগুলি ছিল সর্বদাই গঠনমূলক যা চিন্তার খোরাক জোগাতো এবং তাকে পূর্ণাঙ্গতার পথে পরিচালিত করতো। তাই তিনি শুধু বক্তা ছিলেন না, ছিলেন সর্বোচ্চশ্রেণীর এক মহান আচার্য।

প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে তিনি সকলকে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতেন এবং প্রশ্নকর্তাকে বিষয়টি সম্যকভাবে বুঝিয়ে তবেই ছাড়তেন। একবার অনেকেই তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, প্রশ্নগুলি কিছুটা আক্রমণাত্মক ছিল। অন্তত উপস্থিত একজনের তাই মনে হয়েছিল। তিনি সে-কথা প্রকাশ্যে বলেও ফেলেন। তাতে সদাশয় স্বামীজী মন্তব্য করেন ঃ "আপনাদের যত খুশি প্রশ্ন করুন—প্রশ্ন যত বেশি হয় ততই ভালো। আমি তো সেইজন্যই এখানে আছি, আর যতক্ষণ না আপনারা নিঃসংশয় হচ্ছেন ততক্ষণ আমি আপনাদের ছাড়ছি না।" একথার পর শ্রোতারা এত দীর্ঘ করতালি দিয়ে ধন্য ধন্য করে ওঠেন যে, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তবেই আবার তিনি বলা শুরু করতে পারেন। কখনও কখনও আক্ষরিক অর্থেই তিনি মানুষকে এমন চমকে দিতেন যে, তাঁর কথা বিশ্বাস না করে কারও উপায় ছিল না। 'পুনর্জন্মবাদ' সম্পর্কে একটি বক্তৃতার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "স্বামীজী, অতীত জীবনের কথা কি আপনার মনে পড়ে?" গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি চটপট উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, পরিষ্কার, শৈশব থেকেই।"

প্রয়োজনমতো চটজলদি সরস জবাব দিতে পারতেন তিনি। তাঁর মহদুদার প্রকৃতি এবং হৃদয়ের সহজাত আনন্দ নিয়েই তিনি প্রতিপক্ষের সকল বিরোধিতার মুখোমুখি হতেন। তাঁর কাজই ছিল দুর্বোধ্য জটিল বিষয়গুলি শ্রোতাদের সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং এ ব্যাপারে আর কোন বক্তাই

সম্ভবত তাঁর মতো সফল হননি। বিমূর্ত তত্ত্বগুলি এমনকি সাধারণ শ্রোতার কাছেও আদরণীয় ও বোধগম্য করে তোলাতেই ছিল তাঁর মহৎ কীর্তি। তিনি সকলের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার বলেছিলেন, "ভারতবর্ষে ওঁরা আমাকে বলেন—যাকে তাকে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। কিন্তু আমি বলি, একটি শিশুকেও আমি বেদান্ত বুঝিয়ে দিতে পারি। মহৎ অধ্যাত্ম সত্যগুলি যত অল্প বয়সে শেখানো যায়, ততই ভালো।"

একবার একটি বক্তৃতার শেষে পরবর্তী বক্তৃতার ঘোষণাটি তিনি এইভাবে করেছিলেন ঃ "আগামী কাল সন্ধ্যায় আমি 'মন ঃ তার শক্তি ও সম্ভাবনা' বিষয়ে বলবো। আপনারা সবাই আসবেন কিন্তু; আপনাদের কাছে বিশেষ কিছু বলার আছে। একটু-আধটু বোমা ছুঁড়বো আর কি!" এই বলে সহাস্যে তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকালেন, তারপর হাত দুলিয়ে বলে উঠলেন, "আসবেন! তাতে আপনাদের কল্যাণই হবে।"

পরদিন সভাগৃহে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত ছিল না—শ্রোতায় পরিপূর্ণ। এবং তিনি তাঁর কথামতো বেশ কয়েকটি বোমাও ফাটিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কেমন করে বোমা ছুঁড়লে তা কাজের হয়। ব্রহ্মচর্য কেমনভাবে মানসিকশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হয়, এই বক্তৃতায় তা তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাখ্যা করেন। চরিত্রে পবিত্র ভাবের বিকাশের জন্য তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে বললেন। এই আবেদনের পিছনে যে-গূঢ় তত্ত্ব লুকিয়ে আছে তা ব্যাখ্যা করে তিনি একটু থামলেন। তারপর যেন শ্রোতাদের কোনও অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন ঃ "হ্যাঁ, এটি অবশ্যই একটি সিদ্ধান্ত এবং এই মহান সিদ্ধান্তের উপর আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। একথা অনস্বীকার্য, আমি যখন আমার নিজের মার কথা চিন্তা করি, তখন অন্যান্য সব মহিলাদের থেকে তাঁকে পৃথক বলেই ভাবি। বাহ্যত এক মহিলার সঙ্গে আর এক মহিলার পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেকথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, তার কারণ আমরা নিজেদের দেহ বলেই মনে করি। ধ্যানের ভিতর দিয়েই এই তত্ত্বটিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হয়। এই সত্যগুলিকে প্রথমে শুনতে হয়, পরে তাদের উপর ধ্যান করতে হয়।"

পবিত্র হওয়া, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলের পক্ষেই একান্ত প্রয়োজন এবং এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি বললেন ঃ

"এই সেদিন এক হিন্দু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি এদেশে দু-বছর আছেন; কিছুদিন ধরে তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ এদেশের ডাক্তাররা তাঁকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে নিষেধ করেছেন। ডাক্তাররা তাঁকে বলেছেন, ব্রহ্মচর্যপালন মানে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা। সেকথা শুনে তাঁকে তাঁর স্বদেশ ভারতবর্ষে ফিরে যেতে বললুম এবং যাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে ব্রহ্মচর্য অভ্যাস করেছেন সেইসব পূর্বপুরুষদের শিক্ষা অনুসরণ করতে পরামর্শ দিলুম।" তারপর চোখে-মুখে নিদারুণ বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে গর্জে উঠলেন তিনি ঃ "আপনারা, এই চিকিৎসকরা , যাঁরা বলেন ব্রহ্মচর্যপালন মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, তাঁরা কি বলছেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। আপনারা পবিত্রতা শব্দের অর্থই জানেন না। আপনারা পশু! পশু! আপনাদের নৈতিকতার সাথে হুলো বেড়ালের নৈতিকতার কোনও প্রভেদ নেই!" এই বলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তিনি শ্রোতাদের দিকে তাকালেন, যেন বিরোধীদের তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন, এমন একটা ভাব। যদিও সেখানে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক তখন উপস্থিত ছিলেন, কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেননি।

সব বক্তৃতাতেই তিনি বোমাবর্ষণ করতেন। আকস্মিক ঝাঁকি দিয়ে চিরাচরিত একঘেয়ে পথের বাইরে শ্রোতাদের টেনে বার করতেন। বিশেষ করে 'নিউ থট্' বা 'নব্য চিন্তা'-র অনুগামীদের তিনি কঠোর ভর্ৎসনা করতেন, যদিও সে সমালোচনা ছিল নিতান্তই গঠনমূলক ও ইতিবাচক। খ্রীস্টানদের ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ক চিরাচরিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যায় এমন সব বিস্ময়কর বৈদান্তিক ধারণাগুলি তিনি অম্লানবদনে সর্বসমক্ষে পেশ করে এক মুহূর্ত থেমে যেতেন, এবং দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করতেন। কতবার, কতবার যে তিনি এমন করেছেন তা বলার নয়! এবং বলা বাহুল্য সর্বদাই তার শুভ প্রভাব শ্রোতাদের আবিষ্ট করতো। একদিন স্বামীজী বললেন ঃ "অনুতাপ করো না! কখনও অনুতাপ করো না! ...এগিয়ে চল! হাহুতাশ করে নিজেকে অবসন্ন করো না! পাপ বলে যদি কিছু থেকেও থাকে, সে-পাপের বোঝা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে নিজেদের সত্য পরিচয়টি জানো। স্বরূপত তোমরা শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নিত্যমুক্ত। যিনি তোমাদের পাপী বলেন, একমাত্র তিনিই ঈশ্বর-নিন্দুক...।" খ্রীস্টীয় জগতের পরম্পরাগত যে-শিক্ষা তার বিরুদ্ধে এর চাইতে তীব্রতর আঘাত আর কি হতে পারে, একবার কল্পনা করে

দেখুন। স্বামীজী বলেছেন ঃ "এ জগৎটাই একটা ঘোর কুসংস্কার। আমরা সম্মোহিত হয়ে আছি, তাই এটাকে সত্যি বলে মনে করি। এই মোহজাল ছিন্ন করে ফেলতে পারলেই আমরা মুক্ত...। এই বিশ্বসংসার প্রভুর খেলা বই কিছু নয়। এ-সবকিছুই তাঁর মজার জন্য। কারণের বশীভূত হয়ে তিনি কোনও কিছু করেন না। ঈশ্বরের লীলা বুঝতে হলে তাঁকে আগে জানো। তাঁর খেলার সঙ্গী হও, তাহলে তিনিই সব বলে দেবেন...। আর আপনারা যাঁরা দার্শনিক, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি বলি—এই বিশ্বের অস্তিত্বের কোনও হেতু খুঁজতে যাওয়া অযৌক্তিক, কারণ তাতে ঈশ্বরকে সীমিত করে ফেলা হয়, যা আপনারা মোটেই চান না।" এই বলে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অপূর্ব ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন।

এই ধরনের বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই যে প্রশ্নোত্তরপর্ব শুরু হতো, তাতে একটি প্রশ্ন উঠতোই উঠতো ঃ "আচ্ছা স্বামীজী, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলে আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কি হবে?" এই প্রশ্ন শুনলেই তিনি হেসে উঠতেন এবং পরিহাসছলে বলতেন, "তোমরা এদেশের লোকেরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়ে সর্বদাই এত ভীত যে কি বলবো!" রঙ্গ করার জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা 'ইনডিভিডিউয়্যালিটি' শব্দটি এই সময়ে তিনি একটু বেশি টেনে টেনে উচ্চারণ করতেন এই ভাবে—ইন-ডি-ভিড-য়্যু-অ্যাল-ই-টি। বলতেন, "এখনই তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? তোমরা তো এখনও ব্যক্তিত্বই অর্জন করনি। আগে ভগবানকে জানো, তবে তো তোমরা ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে। যখন তোমরা নিজেদের পরিপূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করবে, কেবল তখনই ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে, তার আগে নয়। বাস্তবিক, ভগবানকে জানলে তোমাদের হারাবার কিছুই থাকবে না...। এদেশে আর একটা কথা ক্রমাগতই শুনে আসছি—"প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলাই" নাকি আমাদের কর্তব্য! কেন, তোমরা কি জান না যে, জগতের যাবতীয় উন্নতি প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ফলেই সম্ভব হয়েছে? কোথাও এর ব্যতিক্রম হয়নি।" বিদ্রূপ করে তিনি বললেন, "গাছপালা প্রকৃতির লয়ে লয় দিয়ে চলে। তাই সেখানে নিখুঁত সংহতি; কোথাও কোনও বিরোধ নেই—উন্নতিও নেই। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে পদে পদে আমাদের লড়তে হয়, অবশ্য উন্নতি যদি লক্ষ্য হয়, তবেই। মজার কিছু ঘটে, অমনি প্রকৃতি বলে 'হাসো'—আমরাও হাসি। কোনও প্রিয়জন মারা গেলে প্রকৃতি বলে 'কাঁদো'—আমরাও কাঁদি।"

একথা শুনে শ্রোতাদের ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা বলে উঠলেন, "যাদের ভালবাসি তাদের জন্য শোক না করে থাকতে পারা খুব কঠিন এবং আমার মনে হয়, শোক না করাটাও অত্যন্ত হৃদয়হীনতার কাজ হবে।" তার উত্তরে স্বামীজী বললেন, "হ্যাঁ, ম্যাডাম, কাজটা যে শক্ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কি? সব মহৎ কর্মই কঠিন। মূল্যবান কিছুই সহজে আয়ত্তে আসে না। কিন্তু কঠিন বলেই আদর্শকে নিচে টেনে নামাবেন না। স্বাধীনতার পতাকাটিকে উঁচুকরে ধরে থাকুন। আপনি কাঁদতে চান বলেই যে কাঁদেন, তা নয় ম্যাডাম; আপনি কাঁদেন কারণ প্রকৃতি আপনাকে কাঁদতে বাধ্য করে। তাই প্রকৃতি যখন বলবে, 'কাঁদো!', বলবেন, 'না! আমি কিছুতেই কাঁদবো না!' শক্তি! শক্তি! শক্তি!—দিবারাত্র নিজেকে এই কথা বলুন। আপনি শক্তিমান! শুদ্ধ! মুক্ত! আপনার মধ্যে কোনও দুর্বলতা নেই, কোনও পাপ নেই, কোনও দুঃখ নেই!"

এই ধরনের মহাবাক্য অসাধারণ ব্যক্তিত্বের তেজে স্ফুরিত হয়ে জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আচার্যদের মধ্যে তাঁর স্থান করে দিয়েছে। এইসব বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতাদের মন অধ্যাত্মরাজ্যের এক অতি উচ্চভূমিতে উঠে যেত; এমন এক মহাত্মার সান্নিধ্যে তখন তাঁরা থাকতেন যাঁর কাছে এই জগৎ-সংসার একটা নিছক তামাসা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যাঁর কাছে শুদ্ধচৈতন্যই ছিল এক ও অদ্বিতীয় সত্তা।

তাঁর ছিল অদম্য রসবোধ যা তাঁর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলিকে সজীব করে তুলতো এবং যা সময়ে সময়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির গুমোট থেকে সকলকে অব্যাহতি দিত। এক বক্তৃতার শেষে অভাবিতভাবে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো ঃ "স্বামীজী, আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?" সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি সে-প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি; শুধু তাঁর আবেগপূর্ণ কণ্ঠের সহাস্য বিস্ফোরণ থেকে ঈশ্বরচেতনার মহিমা ফুটে উঠলো। তাঁর মুখ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললেন, "বলেন কি! আমার মতো মোটাসোটা মানুষকে দেখে কি তাই মনে হয়?"

অন্য আর একবার যখন তিনি অদ্বৈত দর্শন ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন সামনের সারি থেকে এক বৃদ্ধ নিজের থেকেই উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেঝেতে সশব্দে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে হলের বাইরে বেরিয়ে যান। তাঁর চোখ-মুখে একরাশ বিরক্তি যা সরল ভাষায় বললে এইরকম দাঁড়ায়—"এই স্থান যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল!" মনে হচ্ছিল স্বামীজী ব্যাপারটা খুবই উপভোগ

করেছেন, কারণ কথা থামিয়ে তিনি বৃদ্ধকে দেখতে লাগলেন এবং সে সময় তাঁর সর্বাঙ্গে কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছিল। শ্রোতারা তখন একবার সহাস্য ও কৌতুকপ্রিয় স্বামীজীকে দেখছেন, আর একবার স্বামীজীর ওপর তিতিবিরক্ত পলায়মান বৃদ্ধকে।

স্বামীজীর চরিত্রের খেয়ালী ও রঙ্গরসপ্রিয় দিকটি কখন যে প্রকাশ পাবে, তার কোনও ঠিক ছিল না; যে-কোন মুহূর্তেই তা প্রকট হতে পারতো। তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কিছু থিওজফিস্টস্ এবং 'নব্য-চিন্তা'-র অনুরাগী ছিলেন যাঁরা মূলত অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তাঁদের কেউ একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "স্বামীজী, আপনি কখনও ভূত দেখেছেন?" চট্ করে স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই। ভারতে ওগুলোই তো আমরা সকালে খাই।" নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতেও তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। একবার কোনও শিল্প-প্রদর্শনীতে গিয়ে মোটাসোটা কয়েকটি সাধুর ছবি দেখে মন্তব্য করলেন, "ধর্মজগতের মানুষরা মোটা হয়। দেখছ না আমি কিরকম মোটা!" মহাপুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, "তখন আমি খুব ছোট; রাস্তায় খেলছিলাম। এক সাধু পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বাছা, একদিন তুমি খুব বড় হবে।' আজ দেখ, আমি কী হয়েছি!" নিজেকে নিয়ে সামান্য এই আত্মতৃপ্তিটুকু প্রকাশ করার সময় কৌতুকে তাঁর মুখখানি চকচক করে উঠেছিল। এইসব মন্তব্যে তাঁর কোনও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেত না। তাঁর সরল কৌতুকপ্রিয়তা শ্রোতাদের খুবই অনুপ্রাণিত করতো; তাঁর রসিকতা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হতো না। অন্য একবার তিনি এই বলে মজা করেছিলেন ঃ "খ্রীস্টানদের নরকের ধারণা আমার মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। দান্তে-র 'ইনফার্ণো' (Inferno) আমি তিনবার পড়েছি; কিন্তু তাতে কোন বিভীষিকা দেখিনি। হিন্দুদেরও নানারকম নরক আছে। যেমন ধরুন, পেটুক মরার পর দেখে তার চারধারে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট সব খাবার রয়েছে। তার পেটটাও তখন এক হাজার মাইল লম্বা হয়েছে, যদিও পেটের তুলনায় মুখটা এক রত্তি—একটা আলপিনের মাথার মতো! ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন!" এই বক্তৃতার সময় তিনি খুব ঘামছিলেন, কারণ বক্তৃতাগৃহে হাওয়া-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা ভালো ছিল না। হল থেকে বাইরে বেরোতেই উত্তুরে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় তিনি গায়ের কোটটা ভালোমতো চেপেচুপে নিয়ে জোরের সঙ্গে বললেন, "এটা যদি নরক না হয়, জানি না নরক আর কি!"

গৃহস্থের জীবনের সঙ্গে সন্ন্যাসীর জীবনের তুলনা প্রসঙ্গে একদা তিনি বলেন, "আমি কখনও বিয়ে করেছি কিনা, একথা একজন জানতে চেয়েছিলেন।" একথা বলে তিনি একটু থামলেন এবং হাসি মুখে শ্রোতাদের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র চাপা হাসির একটা ঢেউ সর্বত্র খেলে গেল। স্বামীজীর মুখের মৃদু হাসি এবার সংবৃত, তার জায়গায় ফুটে ওঠে আতঙ্ক। তিনি আবার শুরু করেন ঃ "বিয়ে করবো কোন্ দুঃখে। ওটা হলো শয়তানের কারসাজি।" একথা বলে আবার তিনি থামলেন, যেন কথাগুলি শ্রোতাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দিলেন। তারপর শ্রোতাদের প্রশংসার গুঞ্জন থামাতে হাত তুলে বেশ গম্ভীরভাব ধারণ করে বললেন, "সন্ন্যাস-আশ্রমের বিরুদ্ধে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে এবং তা হলো"—(আবার একটু থেমে)—"সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে (এই আশ্রম) টেনে নেয়।" একথায় আবার তুমুল হর্ষধ্বনি শুরু হলো। এবার আর তিনি শ্রোতাদের থামাবার চেষ্টা করলেন না, কারণ তিনি ছোট্ট একটু মজা করেছেন এবং নিজেও তা উপভোগ করেছেন।

আর একবার গভীর কোনও প্রসঙ্গ করতে গিয়ে হঠাৎই তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং বললেন, "মানুষের যেই একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হলো, অমনি সে মরে যায়। যখন সে জীবন শুরু করে, তখন তার ইয়া পেট—মাথা পেছনে পড়ে থাকে, পেট চলে আগে আগে। আবার যখন তার জ্ঞান হয়, তখন পেট প্রায় উবে যায়। মাথাটিই কেবল নজরে পড়ে। আর তারপরই তার ভবলীলা সাঙ্গ!"

বিশ্বের পরিণত ধর্মচিন্তাগুলি তিনি এমনভাবে হজম করেছিলেন এবং এমন নিখুঁতভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে পারতেন যে, তাঁর প্রকৃত বয়স কত তা নিয়ে জল্পনাকল্পনার অন্ত ছিল না। তাঁর দেহের তারুণ্য এবং প্রজ্ঞার প্রবীণতা—এই দুয়ের মধ্যে দারুণ অমিল শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করতো। তিনিও নিশ্চয় সেকথা জানতেন। একদিন তাই এই নিয়ে একটু মজা করার সুযোগ ছাড়লেন না এবং যথারীতি সকলকে বোকা বানালেন। বক্তব্য বিষয়ে অনুষঙ্গ ধরে পরোক্ষভাবে নিজের বয়সের ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, "আমার বয়স—" (এই বলে থামলেন এবং সকলকে অনুমান করতে দিয়ে বললেন)—"মাত্র কয়েক বছর" শেষের কথাগুলি উচ্চারণের সময় তাঁর মুখে দুষ্টুমির হাসি। সেকথা শুনে শ্রোতারা হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্বামীজী তখন সকলের দিকে চেয়ে হাততালির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, কারণ তিনি জানতেন হল এবার ফেটে পড়বে।

মজা করে স্বামীজী নিজে যেমন আনন্দ পেতেন, তাঁর শ্রোতারাও তেমনি সমানভাবে তা উপভোগ করতেন। একদিন তিনি একটি সূক্ষ্ম কৌতুক করে নিজেই পুরোদস্তুর হেসে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে হলের সকলেই উচ্চস্বরে সে হাসিতে যোগ দিলেন। সমবেত সেই হাসির বন্যায় মজার কথাগুলিই হারিয়ে গেল; তাদের আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কী দুঃখের ব্যাপার!

'ভারতের আদর্শ'—বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলি তাঁর গল্পবলার অসাধারণ ক্ষমতার নজির হয়ে রয়েছে। সম্ভবত এখানেই তিনি শ্রেষ্ঠ। অতি আকর্ষণীয় মধুর বিচিত্র মুখভঙ্গি, অনতিক্রম্য ব্যাখ্যাশৈলী এবং অননুকরণীয় বাচনভঙ্গি সহায়ে প্রাচীন গল্পগুলিতে তিনি যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতেন। বলতেন, "এসব গল্প বলতে আমি ভালবাসি। এগুলিই ভারতের প্রাণসম্পদ। শৈশব থেকেই এই সব গল্প আমি শুনে আসছি। এগুলি বলতে আমার কখনও ক্লান্তি আসে না।"

স্বামীজীর মন এক এক সময়ে অতিজাগতিক অনুভূতির ভাবতরঙ্গে এমন সমাহিত হয়ে থাকতো যে, শ্রোতাদের সামনেও সেই ভাব উদ্বেলিত হয়ে পড়তো এবং তা তিনি চাপার চেষ্টাও করতেন না। সেই মহিমময় মূর্তি দর্শনে সকলেরই সম্ভ্রম জাগতো। যেমন একদিন তিনি বলেছিলেন, "সব মুখই আমার প্রিয়।...'এথিঅপ-এর মুখ দেখলে যেমন হেলেন-কে মনে পড়ে যায়', তেমনি সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখার অভ্যাস আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সকলেই, এমনকি যে চরম অধঃপতিত, সেও জগন্মাতার সন্তান। এই বিশ্বের সবকিছুই, তা সে ভালো অথবা মন্দ যাই হোক, ঈশ্বরের খেলা।"

তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতে গেলে তিনি যেন তখন আদর্শ গৃহস্বামী—প্রাণখুলে, আনন্দের সঙ্গে কথা বলতেন, তর্ক করতেন অথবা গল্প বলতেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন দেখা করতে যাই, সেদিন এমন আনন্দ হয়েছিল, এমন একটা নাড়া খেয়েছিলাম যার ঘোর আজও কাটেনি। ধূসর রং-এর আটপৌরে একটা গাউন পরে, চেয়ারে পা-দুটি মুড়ে পাইপে তামাক খাচ্ছিলেন। মাথার লম্বা চুলগুলি এলোমেলোভাবে কাঁধের ওপর ছড়িয়ে ছিল। তাঁর দিকে এগোতেই তিনি পরম সৌজন্যে একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে বসতে অনুরোধ করলেন। সেইসব সাক্ষাতের টুকরো-টাকরাই কেবল মনে আছে। কিন্তু সেই মহান সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য, যে-প্রেরণা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, তার স্মৃতি আজও অতি উজ্জ্বল। সেগুলিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য মনকে কিভাবে বশে আনতে হয়, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “যত কম পড়বে, ততই ভালো। বইপত্র অন্য মনের উদ্বমন ছাড়া আর কি? যেসব বস্তুর হাত থেকে তোমাকে রেহাই পেতে হবে, সেসব জঞ্জালে মন পরিপূর্ণ করা কেন? ‘গীতা’ এবং বেদান্তের অন্যান্য ভালো বই পড়। ওতেই যথেষ্ট হবে।” আরও বলেছিলেন, “বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ভুলে ভরা। কিভাবে চিন্তা করতে হয়, তা শেখার আগেই মনের মধ্যে গুচ্ছের তথ্য ঠেসে দেওয়া হয়। মনকে কিভাবে সংযত করতে হয়। তা-ই সর্বপ্রথম শেখানো উচিত। আমাকে যদি আবার নতুন করে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় এবং যদি আমার সে ব্যাপারে মতামত প্রকাশের কোনও স্বাধীনতা থাকে তো আমি প্রথমেই শিখবো মনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়; তারপর প্রয়োজন মতো তথ্য আহরণ করবো। কোনও জিনিস শিখতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ সময় লাগে, কারণ সে ইচ্ছামাত্র মনকে একাগ্র করতে পারে না।... মেকলের লেখা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস (‘History of England’) মুখস্থ করতে আমাকে তিন-তিনবার পড়তে হয়েছিল, কিন্তু আমার মা যে-কোনও ধর্মগ্রন্থ একবার পড়েই মনে রাখতে পারতেন।... মানুষ সর্বদা এত কষ্ট পায়, তার একটাই কারণ—মন তার বশে নেই। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে না সে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যদিও দৃষ্টান্তটি একটু স্থূল ধরনের ঃ একটি লোকের সঙ্গে তার স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না। ফলে স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে অন্য আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। মহিলাটি ঘোর দজ্জাল! কিন্তু তা সত্ত্বেও হতভাগা স্বামীটি তার স্ত্রীর চিন্তা মন থেকে সরাতে পারে না। ফলে কষ্ট পায়।”

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—সাধুদের ভিক্ষা করা, ত্যাগের আদর্শের বিরোধী নয় কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ “এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। মনের মধ্যে যদি কোনও প্রত্যাশা থাকে এবং ফলের দ্বারা দোলায়িত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা খারাপ। ভিক্ষা দেওয়া বা নেওয়া, দুটিই স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। নাহলে সেটা ত্যাগ হলো না। তুমি যদি একশো ডলার টেবিলে রেখে দিয়ে প্রত্যাশা কর আমি তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেবো, তাহলে ও ডলার তুমি নিয়ে যেতে পারো, আমি তা স্পর্শও করবো না। এখানে আসার আগেও আমার জীবন চলেছে, জন্মাবার আগে থেকেই যা যা আমার প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে। তা নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। মানুষের যা কপালে আছে, তা সে পাবেই। তার জন্মের আগে থেকেই সব বন্দোবস্ত হয়ে আছে।”

"যিশুর অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?"—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ "ওটি একটি পুরনো দাবি। ভারতবর্ষেও অনেকে ঐ দাবি করেছেন। এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমার কথা শুধু আমি বলতে পারি। তা হলো এই—স্বাভাবিক বাবা-মা পেয়েই আমি তুষ্ট।" বললাম, "এই সব (অলৌকিক) জন্ম-তত্ত্ব কি প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী নয়?" আমার প্রশ্ন শুনে চটির গোড়ালিতে পাইপটি ঠুকে ছাই ঝাড়লেন তিনি—মেঝেতে পাতা কার্পেটের কোনও তোয়াক্কাই করলেন না। তারপর পাইপের নলটি ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে বলতে লাগলেন, "দেখো, আমরা হচ্ছি প্রকৃতির দাস। কিন্তু ভগবান প্রকৃতির নিয়ামক। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। ইচ্ছে করলে তিনি একটি বা একই সঙ্গে এক ডজন শরীর ধারণ করতে পারেন। তাঁর যা খুশি তাই হতে পারেন। তাঁকে কি আমরা সীমিত করতে পারি?"

অনেকক্ষণ ধরে রাজযোগ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর তিনি বন্ধুর হাসি হেসে বললেন, "রাজ-যোগ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? অন্যান্য পথও তো রয়েছে।"

এই সাক্ষাৎকারের দিনই তাঁর রাজযোগের ক্লাস ছিল। বাড়ির সামনের ঘরেই ক্লাস নেবেন। কথা বলতে বলতে ক্লাসের সময় পনেরো মিনিট অতিক্রান্ত। যিনি ক্লাস-এর তত্ত্বাবধান করতেন, সেই মহিলা দ্রুত ঘরে ঢুকে বললেন, "কি হলো, স্বামীজী, আপনি যোগের ক্লাস-এর কথা ভুলেই গেছেন! পনেরো মিনিট আগে ক্লাস আরম্ভ হওয়ার কথা, ঘর লোকে পরিপূর্ণ।" এই কথা শোনামাত্র স্বামীজী দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং আমাকে বললেন, "দুঃখিত! আমাদের এখন সামনের ঘরে যেতে হবে।"

হলের মধ্য দিয়ে আমি সামনের ঘরে গেলাম; স্বামীজী গেলেন তাঁর শয়নঘরের ভিতর দিয়ে। শয়নঘরটি হল এবং সামনের ঘরের ঠিক মধ্যিখানে। কিন্তু কী আশ্চর্য! আমি সামনের ঘরে গিয়ে আসন গ্রহণ করার আগেই দেখি স্বামীজী তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন—চুল তাঁর পরিপাটি করে আঁচড়ানো (আগের মতো অবিন্যস্ত নয়) এবং পরিধানে সন্ন্যাসীর গৈরিক! অথচ এই এক মিনিট আগেও তাঁর চুল এলোমেলো দেখেছি; পোশাক ছিলো আটপৌরে। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ধীরেসুস্থে সামনের ঘরে এসে হাজির হয়েছেন—বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত! বুঝলাম, গতি এবং নিখুঁত কর্মক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। অবশ্য চলার আপন ছন্দ থেকে তাঁকে নড়ানো সময়ে সময়ে খুব কঠিন হতো

বৈকি। বক্তৃতার দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁকে গাড়ি ধরার জন্য তাড়া দিয়েও কখনও কখনও কাজ হতো না। তাড়াতাড়ি করার জন্য অনুরোধ করলে তিনি টেনে টেনে বলতেন, "অত তাড়া দিচ্ছ কেন বাপু? ঐ গাড়িটা ধরতে না পারলে পরের গাড়ি তো আছেই।

বক্তৃতার হলের চাইতেও যোগের ক্লাসগুলিতে ব্যক্তি ও আচার্য বিবেকানন্দের অনেক কাছাকাছি আসা যেত। তাতে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা এবং প্রভাব দুই-ই নিবিড়তর হতো। পবিত্রতা, সারল্য এবং প্রজ্ঞার ঘনীভূত মূর্তি হয়ে সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসহায়ে তিনি তখন এমনভাবে কথা বলতেন যাতে শিক্ষার্থীদের মন যোগাভ্যাসের দক্ষতার চাইতেও ঈশ্বর ও ত্যাগের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হতো।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার পর তিনি ডিভানের উপর পদ্মাসনে বসতেন এবং সমবেত শিক্ষার্থীদের ধ্যান সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিতেন। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল রাজযোগ এবং নির্দেশাদি ছিল সরল প্রাণায়াম সম্পর্কিত। তিনি যা বলতেন, তার কিছু কথা এইরকম ঃ "প্রথমে অবশ্যই সোজা হয়ে বসার অভ্যাস করবে; তারপর সঠিকভাবে যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস বয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। এতে মন একাগ্র হবে; একাগ্রতা এলেই ধ্যান হবে।... যখন শ্বাস নেবে বা ফেলবে, মনে করবে তোমার শরীরটি জ্যোতির্ময়।... মাথার একদম ওপর (সহস্রার) থেকে শিরদাঁড়ার নিচ (মূলাধার) পর্যন্ত সমগ্র মেরুদণ্ডটিকে মানসচক্ষে দেখার চেষ্টা কর। কল্পনা কর, মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, তার ভিতর দিয়ে তুমি কুণ্ডলিনীকে দেখতে পাচ্ছ। এরপর কল্পনায় দেখ, কুণ্ডলিনী শক্তি নিচ থেকে মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে।... ধৈর্য ধর। খুব ধৈর্যের প্রয়োজন।"

কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে এবং ভীত হলে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলতেন, "আমি এখন তোমাদের সঙ্গেই আছি। আমার ওপর একটু বিশ্বাস রাখার চেষ্টা কর।" তাঁর প্রত্যয় জাগানোর শক্তিতে কেউ মুগ্ধ হওয়ায় তিনি বলেছিলেন ঃ "যাতে আমরা ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারি, সেই জন্যই আমাদের ধ্যান অভ্যাস করা। উদ্দেশ্য সেইটিই, রাজযোগ তার একটা উপায় মাত্র। রাজযোগ প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি সেই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে কখনও ভোলেননি। তোমরা যারা এখন নবীন, তাদেরই [সাধন করার] খুব সুযোগ; এটাই উপযুক্ত সময়। ঈশ্বরচিন্তার জন্য বৃদ্ধ বয়সের অপেক্ষা রেখো না। কারণ, তখন আর তা সম্ভব হবে না। ঈশ্বরচিন্তার শক্তি যৌবনেই গড়ে তুলতে হয়।"

ডিভানের ওপর পদ্মাসনে বসে থাকা গেরুয়া-পরিহিত স্বামীজী—হাত দুটি বদ্ধাঞ্জলি অবস্থায় কোলের ওপর রাখা—চোখ অর্ধনিমীলিত—শরীর স্থির। তাঁকে দেখে মনে হতো যেন ব্রোঞ্জের মূর্তি! সত্যিকারের যোগিপুরুষ বলতে যা বোঝায়, তা-ই ছিলেন তিনি! কেবল অতীন্দ্রিয় চেতনার ভূমিতে সদাজাগ্রত তাঁকে দেখে আমার মনে হয়েছে তিনিই আদর্শ যাঁর পদপ্রান্তে স্বভাবতই সকলের শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং ভক্তি ঝরে পড়ে।

(প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৫; এবং Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples, vol. 2, 7th edition, 2001, p.516)

পরিশিষ্ট

জোসেফিন ম্যাকলাউড-এর পত্রাবলীর দর্পণে স্বামীজী

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা জোসেফিন ম্যাকলাউড-এর কথা ভালোভাবেই জানেন। স্বামীজী তাঁকে 'জো' বলে ডাকতেন, আর তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীরা তাঁকে 'য়্যুম', 'জয়া' বা 'ট্যান্টিন' বলেও সম্বোধন করতেন।

জোসেফিনের বাবা জন ডেভিড ম্যাকলাউড ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে মেরি এ্যান লেনন-কে বিয়ে করেন। কালে তাঁদের দুই পুত্র ও তিন কন্যা হয়। জন ডেভিড ম্যাকলাউডের পূর্বপুরুষ স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। শিকাগোয় পাকাপাকিভাবে বসবাস করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে তিনি থেকেছেন। তাঁর তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা, অর্থাৎ বেস বা বেটী (১৮৫২-১৯৩১) এবং জোসেফিন (১৮৫৮-১৯৪৯), স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ-বেদান্ত আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন।

বেটীর প্রথম বিয়ে হয় ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে, শিকাগোর মিস্টার উইলিয়াম স্টার্জেস-এর সঙ্গে। তাঁদের এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলের নাম হলিস্টার, মেয়ের নাম অ্যালবার্টা। জোসেফিন বরাবর বেটীর সঙ্গেই থাকতেন, এমনকি বেটীর বিয়ের পরেও। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে মিস্টার উইলিয়াম স্টার্জেস-এর মৃত্যু হলে পরের বছর ১৮৯৫-এর সেপ্টেম্বরে, বেটী নিউইয়র্কের এক প্রসিদ্ধ বিত্তবান ব্যবসায়ী মিস্টার ফ্রান্সিস্ লেগেট-কে বিয়ে করেন। ইতোমধ্যে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হওয়ায় প্যারিসে তাঁদের বিয়েতে স্বামীজীও উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, জোসেফিন, হলিস্টার এবং অ্যালবার্টা, এই তিনজনই নিউইয়র্কে বেটীর নতুন সংসারের অন্তর্ভুক্ত হলেন। স্টোন রিজের কাছে 'রিজলী'তেও তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন। রিজলী নিউইয়র্কের উলস্টার কাউন্টির অন্তর্গত। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি জোসেফিনের জীবনের এক স্মরণীয় দিন কারণ ঐ দিনই তিনি বেটীর সঙ্গে নিউইয়র্কে স্বামীজীর বেদান্ত ক্লাসে প্রথম

আসেন। দুই বোনই স্বামীজীর বাণী এবং ব্যক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ। ফলে, ওঁদের মাধ্যমে মিস্টার লেগেট, অ্যালবার্টা এবং হলিস্টারও স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হন। গোটা পরিবারটি স্বামীজীকে ভালবাসতেন। স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাজে তো বটেই, তাঁর অন্যান্য কর্মের বিস্তারেও তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন।

আলাপ হওয়ার প্রথম দিন থেকেই জোসেফিনের চোখে স্বামীজী এক ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। আনুষ্ঠানিক অর্থে তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার না করলেও তিনি হয়ে ওঠেন স্বামীজীর একনিষ্ঠ অনুরাগী ও বন্ধু। স্বামীজীর প্রতি তাঁর এতটাই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল যে স্বামীজী রহস্য করে তাঁকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহিলা প্রচারক বা 'লেডি মিশনারি' বলতেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পরেও রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রীতির সম্পর্ক বজায় ছিল। প্রায়ই তিনি সঙ্ঘের প্রাণকেন্দ্র বেলুড় মঠে এসে বেশ কিছুদিন বাস করতেন।

ভারতবর্ষের প্রতি জোসেফিনের একটা বিশেষ টান ছিল। এই দেশ এবং এদেশের মানুষের উন্নতির জন্য তিনি অনেক সময়ে তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষ যখন ইংরেজদের অধীনে তখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনেকের সঙ্গে বিশেষ আলাপ-পরিচয় থাকায় তিনি ঐ-সব সমস্যার সমাধানের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

দেশভ্রমণ ছিল তাঁর নেশা। কিন্তু তা সত্ত্বেও জোসেফিন তাঁর বোনঝি অ্যালবার্টার সঙ্গে চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে অষ্টম আর্ল অফ স্যাণ্ডউইচ জর্জ মন্টেগু-র সঙ্গে অ্যালবার্টার বিবাহ হয়। স্বামীজীকে, রামকৃষ্ণসঙ্ঘকে এবং ভারতবর্ষকে জোসেফিন এত গভীরভাবে ভালবাসতেন যে অ্যালবার্টাকে লেখা তাঁর এইসব চিঠির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে স্বামীজীর, তাঁর গুরুভাইদের এবং মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের স্মৃতি; অভিব্যক্ত হয়েছে ভারতের প্রতি তাঁর সুনিবিড় ভালবাসার কথা। এই দেশের জন্য তিনি কি করছেন তার বিবরণও চিঠিতে থাকতো। স্বামীজীর দেহান্তের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন জোসেফিন। স্বভাবতই অ্যালবার্টাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলি যেমনই সুখপাঠ্য তেমনই তথ্যে সমৃদ্ধ। মহামূল্যবান এই চিঠির ঝাঁপি অ্যালবার্টা তাঁর কন্যা ব্রিডপোর্ট-এর লেডি ফেথ ক্যুম-সেমুরকে দিয়ে যান। ব্রিডপোর্ট ইংল্যাণ্ডের ডরসেট অঞ্চলের একটি জায়গার নাম। চিঠিগুলি সব

১৯১১ থেকে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা। লেডি ফেথ ক্যুম-সেমুরের বদান্যতায় সাময়িক ভাবে ঐ পত্রগুচ্ছ ইংল্যাণ্ডের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দের হাতে আসে। স্বামী ভব্যানন্দের তৎকালীন সহকারী স্বামী যোগেশানন্দ প্রভূত পরিশ্রম করে চিঠিগুলির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ কপি করে নেন। পরে আবার সাইক্লোস্টাইল করে ঐসব অংশের প্রতিলিপি তাঁরা কয়েকবছর আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কিছু সন্ন্যাসী ও ভক্তের কাছে পাঠান। পত্রগুচ্ছের এক সেট প্রতিলিপি তাঁরা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষের কাছেও পাঠিয়ে দেন—যাতে অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সেগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এ ছাপতে পারেন।

'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদকের অনুরোধে চিঠিগুলির উদ্ধৃত অংশবিশেষ আমি[১] ভালো করে পড়ে সেগুলিকে বিষয় অনুযায়ী সাধ্যমতো সাজিয়েছি যাতে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত ও অনুরাগীরা নতুন আলোর সন্ধান পান। সত্যিই, চিঠিগুলি থেকে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব তো বটেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কেও অনেক নতুন তথ্য আমরা জানতে পারি। উদ্ধৃতিচিহ্ন দেওয়া অংশগুলি যেগুলি এই রচনায় ব্যবহার করেছি, সেগুলি হুবহু মূল চিঠিগুলি থেকে নেওয়া; আর যেখানে উদ্ধৃতিচিহ্ন নেই, সেখানে আমার নিজের ভাষায় চিঠির বক্তব্যবিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং তা করেছি পারম্পর্য রক্ষার জন্যই। চিঠির সাল-তারিখ উদ্ধৃতিচিহ্নের পর বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড নিউইয়র্কে স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করেন। দিনটি ছিল ২৯ জানুয়ারি, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দ। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন ঃ "স্বামীজীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রতিটি পর্বই স্পষ্ট মনে আছে। কারণ আমার বিগত আটচল্লিশ বছরের যে জীবন, তার আরম্ভ ঐ-দিনটি থেকেই। তখন আমরা ডবস্‌ফেরীতে মিসেস ডেভিডসনের কাছে আছি। একদিন নিউইয়র্কে ডোরা রোয়েৎলেসবার্জারের বাড়িতে দুপুরে আমাদের খাওয়ার কথা। সেখানে গিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি পেলাম। চিঠিতে ছিল—'৫৪ নং ওয়েস্ট, ৩৩ নং স্ট্রীটে চলে এসো। স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতা শুনে আমরা একসঙ্গে ফিরে লাঞ্চ খাবো।' সেই নির্দেশমতো 'মা' [বেটী লেগেট] আর আমি স্বামীজীর বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। গিয়ে দেখি, কুড়িজন মহিলা

---

১ শ্রীসৌতির কিশোর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং দু-তিনজন ভদ্রলোক সেখানে সমবেত হয়েছেন। স্বামীজী মেঝেতে বসে আছেন। তাঁর প্রথম বাক্যটি শোনামাত্র মনে হলো—আমি আজ একটি পরম সত্য শুনলাম, এমন সত্য যা মানুষকে চিরতরে মুক্তি দেয়" (৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৩)।

'একচল্লিশ বছর আগে, ২৯ জানুয়ারি, স্বামীজীকে প্রথমবার দেখে এবং তাঁর কথা শুনে আমার ঠিক ঐ রকম অনুভূতিই হয়েছিল। দেহ থেকে মন একেবারেই উঠে গিয়েছিল এবং স্থান-কাল-পাত্র সবই যেন ভুলে গিয়েছিলাম (২ জানুয়ারি, ১৯৩৬)।

এরপর থেকে জোসেফিন মনে করতেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারিই তাঁর প্রকৃত জন্মদিন, তাঁর অধ্যাত্মজীবনের জন্মলগ্ন, কারণ সেইদিন 'তিনি তাঁর আত্মাকে' আবিষ্কার করেছিলেন। এই প্রত্যয় থেকেই তিনি লিখেছিলেন ঃ 'আগামী ২৯ জানুয়ারি আমার বয়স আটচল্লিশ হবে! অবশ্য আমার এই দেহের বয়স হবে চুরাশি' (২১ জানুয়ারি, ১৯৪৩)। 'সত্যি মনে হয় যেন ঐ দিনের ঘটনা থেকেই আমার সমগ্র জীবনের শুরু। আর তাঁকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমার জন্ম, নতুন বুদ্ধকে চিনে নেওয়ার সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হলো (৯ মে, ১৯২২)।

প্রথম পরিচয়ের এই বিস্ময়ের ঘোর তাঁর পরবর্তী জীবনেও কিছুমাত্র ফিকে হয়নি। যখনই সেই দিনটির স্মৃতি মন্থন করেছেন তখনই তিনি আনন্দে, পুলকে চমৎকৃত হয়েছেন, কারণ বিশ্বাস করতেন তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হওয়াটা পূর্বনির্দিষ্ট। তিনি লিখছেন ঃ 'ওঃ, দেখামাত্রই সংশয়াতীতভাবে স্বামীজীকে চিনে নিতে পারার যে কী আনন্দ! সেই আবিষ্কারের উল্লাসেই জীবনের গত চল্লিশটি বছর কেটে গেলো' (১৩ মার্চ, ১৯৩৯)। "তুমি যে পনেরো বছর বয়সে এবং আমি যে পঁয়ত্রিশে স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে তাঁর ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলাম—ভেবোনা সেটি আকস্মিক একটি ঘটনা মাত্র। নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন অতীত তিন হাজার বছরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন', স্বামীজীও তেমনি 'পরবর্তী তিন হাজার বছরের নেতৃত্ব দেবেন' " (৪ অক্টোবর, ১৯২৩)।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই জোসেফিন এবং তাঁর বোন দুজনেই নিয়মিত স্বামীজীর বক্তৃতায় আসতে লাগলেন। কিন্তু প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাঁরা বন্ধুবান্ধবদের কাছেও এই আসা যাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ '[তোমার] মা এবং আমি সপ্তাহে তিনদিন

নিউইয়র্কে আসতাম এবং তোমাকে ও হলি-কে[১] প্রতি শনিবার নিয়ে আসতাম। ঐ সময়ে তাঁর (স্বামীজীর) কথা আমরা কারো কাছে মুখ ফুটে বলিনি—তিনি আমাদের চোখে এতটাই পবিত্র ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে পেটার[২] একদিন আমাদের ওয়ালডর্ফ এ্যাস্টোরিয়ায় (স্বামীজী যেখানে ক্লাস নিতেন তার ঠিক বিপরীত দিকের হোটেল) নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেন। আমরা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এও বললাম—সন্ধ্যেটা কিন্তু আমরা তাঁর সঙ্গে কাটাতে পারব না। ঘড়িতে যখন আটটা, তখন আমরা উঠে পড়লাম। লেকচারে যেতে হবে। আমাদের উঠতে দেখে মিস্টার লেগেট বললেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?' আমরা বললাম, 'একটি বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'আমিও কি যেতে পারি?' আমরা বললাম, 'চলুন না।' বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্র পেটার স্বামীজীর কাছে গিয়ে তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন আর ঐ নৈশভোজের আসরেই স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের আনুষ্ঠানিক পরিচয় হলো। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীজীকে নিয়ে আমরা সকলে—তোমরা দুজনও ছিলে—ছ-দিনের জন্য রিজলী ম্যানর-এ বেড়াতে গেলাম। ...তারপর সেখান থেকে স্বামীজীকে নিয়ে [তোমার] মা ও আমি লেক ক্রিস্টিন, পার্সি কুস্ কোং, নিউ হ্যাম্পশায়ার-এ যাই; উদ্দেশ্য পেটারের সঙ্গে দেখা করা। সেখানেই ওরা দুজন (বেটী এবং মিস্টার ফ্রান্সিস্ লেগেট) পরস্পরকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পেটার স্বামীজীকে তাঁদের মধুচন্দ্রিমায় সাক্ষী থাকার অনুরোধ করেন। পরদিনই স্বামীজী ইংল্যাণ্ডে মিস্টার স্টার্ডির কাছে চলে যান এবং লণ্ডনে (সেন্ট জেমস্ হলে)[৩] পর্যায়ক্রমে বড় মাপের বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। লণ্ডনের সব পত্র-পত্রিকাই স্বামীজীকে "যোগী" বলে উল্লেখ করে। কাগজের এইসব রিপোর্ট পড়ে ইসাবেল[৪] স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে তাঁর লন্ডনের বাড়িটি বেদান্ত সোসাইটিকে ভাড়া দেন। তাঁর দুই সন্তান কিটি ও ডেভিডকেও ইসাবেল স্বামীজীর কাছে নিয়ে যান এবং স্বামীজী তাঁদের আশীর্বাদ করেন। তাহলেই দেখ, ইসাবেল আর আমার মধ্যে যে বন্ধুত্ব তাও অনন্তকে

১ হলিস্টার স্টার্জেস, মিসেস বেটী লেগেটের প্রথম পক্ষের ছেলে।

২ বেটীর দ্বিতীয় স্বামী মিস্টার ফ্রান্সিস্ লেগেট।

৩ মিস ম্যাকলাউড বোধ হয় এখানে প্রিন্সেস হল-এর কথাই বলতে চাইছেন, কারণ সেখানেই স্বামীজী তাঁর প্রথমবার ইংল্যাণ্ড সফরের সময় বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

৪ লেডি ইসাবেল মার্গেসন। ইনি জাতিতে ইংরেজ, শিক্ষাবিদ এবং মিস ম্যাকলাউডের বান্ধবী ছিলেন। পরে তিনি স্বামীজীর গুণে মুগ্ধ হন এবং তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ড সফরের সময় স্বামীজী তাঁর লণ্ডনের বাড়িতে ছিলেন।

ভিত্তি করেই, সেই অনন্ত যার স্পর্শে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই ধন্য হয়েছে (৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৩)।

এই চিঠিগুলি থেকে স্বামীজীর সঙ্গে জোসেফিন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কটি বোঝা যায়। জোসেফিন লিখছেন ঃ 'আমাদের বাড়ির সকলেই তাঁকে তার খেয়ালখুশিমতো থাকার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই স্বামীজী আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের এত কাছাকাছি ছিলেন। দিনের পর দিন গিয়েছে যখন আমাদের কারো সঙ্গে তাঁর কোনও কথাবার্তাই হয়নি। আবার এমনও হয়েছে, দিনভর, রাতভর শুধু কথা আর কথা। আমরা সর্বদা তাঁর মেজাজ বুঝে চলতাম এবং তাঁকে যখন কাছে পাওয়া যেতনা সেই সময়ে আমরা যে-যার নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকতাম। তাতেই আমরা খুশি ছিলাম। আমরা আমাদের দাবি নিয়ে কখনো স্বামীজীর মনকে ভারাক্রান্ত করিনি' (১৯ ডিসেম্বর, ১৯১৩)।

স্বামীজীর প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধা যেন তাঁদের একই সূত্রে বেঁধে রেখেছিল ঃ 'আমরা সকলেই স্বামীজীকে বিশেষ মান্য করতাম এবং ভালবাসতাম। তুমি আর হলি যেমন, ঠিক তেমনই [তোমার] মা, বড় ফ্রান্সি[১] এবং আমিও। সম্ভবত আর কোনও ব্যাপারে আমাদের মধ্যে এত আন্তরিক মতৈক্য ছিল না। আর অন্য কোনও কিছুই আমাদের সকলকে এমন গভীরভাবে সমন্বিত করেনি। [তোমার] মা, তুমি এবং আমি—আমরা তিনজনেই যে-যার গুণ এবং প্রবণতা অনুযায়ী এক-এক দিকে এগিয়ে গেছি। কিন্তু তবুও বলবো, আমাদের কেউই সেই অফুরান অধ্যাত্মশক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষ করতে পারিনি, পারিনি তার দিগন্তহীন প্রান্তটিকে স্পর্শ করতে' (১৫ নভেম্বর, ১৯২৬)।

স্বামীজীকে জোসেফিন কি চোখে দেখতেন তা তাঁর চিঠিপত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে স্বামীজী অনুপম। একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, স্বামীজীর মতো এতবড় অধ্যাত্মশক্তি পৃথিবীতে আর কখনো আবির্ভূত হননি।' (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। জোসেফিনের কাছে স্বামীজী ছিলেন বর্তমান যুগের [মহত্তম আচার্য,] ঈশ্বরপ্রেরিত আধিকারিক পুরুষ। 'হ্যাঁ, আমরা নতুন বুদ্ধকে এই চোখেই দেখেছি' (২২ জুন, ১৯৩৯)। আবার লিখছেন ঃ 'সেন্ট জন-এর গস্‌পেল [সুসমাচার] আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছি—পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ হচ্ছে। ঠিক স্বামীজীর মতো। কী প্রচণ্ড দিব্যশক্তি! এ

১. মিস্টার ফ্রান্সিস্ লেগেট

জলকে মদে রূপান্তরিত করা বা ঝাড়-ফুঁক করে কোনও রোগ সারিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া নয়; এ অলৌকিকত্ব নিহিত কেবলমাত্র নিজের দিব্য উপস্থিতি দিয়ে অন্যের জীবনে রূপান্তর এনে দেওয়ায়। ঈশ্বরের বাণী নিয়ে যখন নতুন কোনও আচার্য আমাদের মধ্যে আসেন, তখন তিনি অনেক নতুন উপহারও নিয়ে আসেন, তা-ই না?' (১১ জুন, ১৯৪১)।

স্বামীজীর [অধ্যাত্মশক্তির] কূল-কিনারা না পেয়ে জোসেফিন প্রতিনিয়ত অবাক হয়েছেন আর মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর সীমাহীন ব্যাপ্তি দেখে ঃ 'স্বামীজীর যে জিনিসটি দেখে আমি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছি তা হলো তাঁর অন্তহীন প্রসারতা, অতলস্পর্শ গভীরতার। সে গভীরতা ওপর, নিচ বা পাশ কোনওটাই আমি কখনো ছুঁতে পারিনি! তিনি এতটাই বিরাট ছিলেন, এবং আমার ধারণা নিবেদিতারও একই অনুভব হয়েছিল' (১২ মার্চ, ১৯২৩)।

জোসেফিনের অন্তর্লোকে কখনো কখনো স্বামীজী একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের বস্তু হয়ে উঠেছেন। তিনি মনে করতেন স্বামীজীর ওপর তাঁর বিশেষ দাবি আছে। বলতেন ঃ 'আমাকে মুক্তি দেবার জন্যেই স্বামীজী এসেছিলেন। নিবেদিতাকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করা বা মিসেস সেভিয়ারকে একত্বের উপলব্ধিতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার মতো এটাও তাঁর একটা ব্রত ছিল বৈকি' (১২ মার্চ, ১৯২৩)। আবার ঃ 'স্বামীজী কেবল আমার বন্ধুই ছিলেন, কিন্তু এমন এক বন্ধু যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং আমার ভিতরেও সেই দিব্যচেতনা সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন। স্বামীজীকে দেখামাত্রই আমার জীবন বদলে গেলো। হ্যাঁ, একেবারে চোখের পলকে' (২ জুলাই, ১৯৪১)!

স্বামীজীর বিরাটত্বে বারবার বিস্মিত হয়েছেন জোসেফিন। বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এবং সাধারণভাবে বিশ্বের উন্নতিসাধনে স্বামীজীর ভূমিকাও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে কখনো ভোলেননি। তিনি লিখছেন ঃ 'আমাদের জীবনে বিবেকানন্দ-অধ্যায়টির মূল্য শাশ্বত। অতএব এসো, আমরা সেই নিত্য আনন্দের ঝর্ণাধারায় স্নান করে ধন্য হই' (৪ অক্টোবর, ১৯২৩)। পরবর্তী একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ 'সাত সাতটা বছর আমি এক অপার্থিব শক্তির সান্নিধ্যে কাটিয়েছি এবং তাঁকে জেনেছি। আমার সমগ্র চেতনা, সেই শক্তির তড়িৎপ্রবাহে পরিপ্লাবিত হয়ে আছে' (২৩ অক্টোবর, ১৯২৩)। 'স্বামীজীকে যে একটুখানিও জেনেছে এবং তাঁর বিপুল সত্তার অণুমাত্র আপন জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে, আমি মনে করি, সেটিও সামান্য পাওয়া নয়' (৭ এপ্রিল, ১৯২৪)।

স্বামীজীর কাছে এসে জোসেফিন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন ঃ 'যেভাবেই হোক, স্বামীজী আমাদের সকলেরই পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন' (৫ মার্চ, ১৯১৪)। 'আমাদের জীবনতরণী মোটেই অনিশ্চিত, এলোমেলো হাওয়ায় দোদুল্যমান নয়। আমাদের নৌকার হাল ধরে আছেন একজন কর্ণধার। অতএব আমরা সুরক্ষিত। কোনও-না-কোনও ভাবে হয়তো আমরা কথাটা বিশ্বাস করি; কিন্তু এই সত্যটি যদি আমরা একবার ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারতাম তাহলে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ একমুহূর্তের জন্যও আমাদের ছায়া মাড়াতে সাহস করতো না' (১২ জুলাই, ১৯১৬)। 'আমি বিশ্বাস করি, স্বামীজী যেন অটল হিমালয়, আর আমরা তার ওপর নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছি—অন্তত আমার জীবনে তাঁর ঐ ভূমিকাই ছিল। তাঁকে আমি পূজা বা স্তব কোনওটাই করিনি, তবু তিনিই ছিলেন আমার পায়ের তলার শক্ত মাটি যার ওপর অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমি পথ চলেছি' (১২ মার্চ, ১৯২৩)!

স্বামীজী জোসেফিনকে দিয়েছিলেন জ্বলন্ত বিশ্বাস। লিখছেন জো ঃ 'আমাদের আসল কাজ এখনো শুরু হয়নি। কোথায় বা কখন যে তা আরম্ভ হবে তা-ও আমার জানা নেই; আর সত্যি বলতে কি, তা জানার কোনও কৌতূহলও নেই। আমরা অকারণে স্বামীজীর সঙ্গ করিনি, অকারণে ভালবাসিনি তাঁকে। [অতএব নিশ্চিত থেকো]—আশানুরূপ ফল ফলবেই, ফলতে বাধ্য। আর ধর যদি তা নাও ফলে—তবুও বলবো, শুধু স্বামীজীকে দর্শন করেই আমার ইহজন্ম, পরজন্ম ধন্য হয়ে গেছে' (১৫ জুন, ১৯১৪)।

স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে অনেকের জীবনেই যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল সেসব অনেক কথা জোসেফিন জানতেন। এ-সম্পর্কে চিঠিপত্রে তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন ঃ 'মিস্টার (হোমার) লেন বলেন, স্বামীজী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এমন বদলে দিয়েছেন যে, জগৎ ও জীবনের সবকিছুই তাঁর কাছে এখন পবিত্র বলে মনে হয়। কাজকর্ম, খেলাধূলা, প্রার্থনা—এককথায় জীবনের মুখ্য এবং আনুষঙ্গিক সবকিছুর ভিতরেই যে এক পারমার্থিক ব্যঞ্জনা, সেটি তাঁর কাছে স্পষ্ট' (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। আর একটি চিঠিতে জোসেফিন লিখছেন ঃ "গত চোদ্দবছর ধরে স্বামীজীর একান্ত অনুরাগী যে-তিন বোন, তাঁদেরই একজন, মিসেস হ্যান্সবরো[১], গতকাল আমাকে বলেন, এখানে (লস

১ দক্ষিণ প্যাসাডেনার (ক্যালিফর্নিয়া) মিড ভগ্নীত্রয়ের একজন হলেন মিসেস এ্যালিস মিড হ্যান্সবরো। স্বামীজী যখন পশ্চিম উপকূলে তখন বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেওয়া, থাকার বন্দোবস্ত করে দিয়ে এবং দেখাশোনা করে ইনি স্বামীজীকে খুব সাহায্য করেছিলেন।

এ্যাঞ্জেলেসে) স্বামীজীর একটি অনবদ্য বক্তৃতার পর এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'তাহলে, স্বামী—আপনি কি এই কথা বলতে চাচ্ছেন যে সবই ভালো?' এর উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন—'মোটেই না আমি বলতে চেয়েছি, একমাত্র ঈশ্বরই ভালো। আপনি যা বুঝেছেন আর আমি যা বলতে চেয়েছি, দুয়ের মধ্যে এইটুকুই যা তফাত।'... মিসেস হ্যান্সবরো বলেন, ঐ একটি কথার ওপর ভিত্তি করেই তিনি এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলেন" (১৬ মার্চ, ১৯১৪)। আবার ঃ "রোমের সেন্ট পিটারস্-এ জমকালো ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি দেখে স্বামীজী তোমাকে কি বলেছিলেন সেটা মনে কর—'ব্যক্তি-ঈশ্বরে যদি তোমার বিশ্বাস থাকে তবে তুমি যে তোমার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি তাঁকে দেবে, এতে আর আশ্চর্য কি' " (৫ নভেম্বর, ১৯২৩)!

"আজ (আবার) আলোয়ারের মহারাজাকে স্বামীজীর জন্মোৎসবে আসতে লিখলাম। উৎসব ১৭ জানুয়ারি।...মনে হয় উনি স্বামীজীর ভাবে 'তপ্ত' হয়ে আছেন। ওঁর বাবাই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আচ্ছা, এইসব মূর্তি আর প্রতিমা পূজা করে কি লাভ হয় বলুন তো?' স্বামীজী এর উত্তরে রাজার মহামাত্যের দিকে ফিরে বললেন, 'মহারাজের ঐ ছবিটা নিয়ে তার ওপর থুতু ফেলুন দেখি।' মহামাত্য বললেন, 'তা কি করে করি, বলুন? ছবিতে মহারাজ স্বয়ং বসে আছেন—এ-কাজ কখনো করা যায়?' কিন্তু স্বামীজীও ছাড়বেন না আর মহামাত্যেরও আপত্তি। তখন স্বামীজী বললেন, 'আপত্তি কিসের? ছবিটাই তো আর আপনার মহারাজ নন। ঐটি মহারাজার প্রতিকৃতি মাত্র।' এই কথায় রাজার চোখ খুলে গেলো। তিনি বুঝতে পারলেন, সব দেবমূর্তিই পবিত্র কারণ তা পরমেশ্বরকে মনে করিয়ে দেয়" (৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪)।

জোসেফিন লিখছেন ঃ "যে সনাতন হিন্দুধর্মের মহৎ ও উদার ঐতিহ্য রামকৃষ্ণ নিজের জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়ে গেছেন, স্বামীজী সেই পরম্পরাটিকে ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আবার তুলে ধরেছেন। সেই পরম্পরাগত এক নব্যশক্তির তরঙ্গ সমগ্র ভারতকে পরিপ্লাবিত করে আজ বিশ্বের দিকে ধাবমান। গীতা এই ধর্মকেই 'শাশ্বত, সার্বভৌম ও প্রাণপ্রদ' বলেছেন। এই সপ্তাহে তুমি যে চিঠিটি দিয়েছ সেখানেও দেখছি সেই শক্তির ছোঁয়া লেগেছে। [তুমি লিখেছ] ঃ 'স্বামীজী আমাকে বৃথাই আশীর্বাদ করেননি, অথবা চুপচাপ বসে চোখের জল ফেলবার শিক্ষা দেননি। বিনা প্রতিবাদে আমি এখন সব সয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এর মোকাবিলা আমি করবো' " (১৫ নভেম্বর, ১৯২৬)।

"স্বামী শিবানন্দের কৃপাপ্রাপ্ত এক পার্শী তরুণ (কে—) স্বামীজী সম্পর্কে একটি অপূর্ব কাহিনী আমাকে শুনিয়েছেন। কাহিনীটি তিনি নিজে এক মাস আগে আজমীরে গিয়ে শুনেছেন। শুনেছেন আবার দুই আমেরিকানের মুখ থেকে। ভারতে স্বামীজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মিশনারিরা ঐ দুই ভদ্রলোককে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। স্বামীজীর কাছে যখন ওঁরা যান, স্বামীজী তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে শেষপর্যন্ত স্বামীজী যখন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সমস্ত মুখখানি অন্তর জ্যোতিতে জ্বলজ্বল করছে। এই দৃশ্যে বিমোহিত ঐ দুই ব্যক্তি তখন স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে শুধু একটি প্রশ্নই করলেন, 'কোথায় গেলে আমরা সত্য লাভ করবো। বলতে পারেন?' স্বামীজীর উত্তর ঃ 'কেন—সত্য তো সর্বদা আপনাদের সঙ্গেই রয়েছে।' ঐ একটি কথাতেই তাঁরা স্বামীজীর চেলা বনে গেলেন। সেই আমেরিকান দুজন এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু ভারত ছেড়ে যাননি" (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)।

যাঁরাই কোনও-না-কোনও সময়ে স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসেছেন অথবা স্বামীজীকে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, জোসেফিনের হৃদয়ে তাঁদের জন্য পাতা ছিল বিশেষ আসন। যেমন ঃ 'আজ মিসেস রাইট আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। মিসেস রাইট হচ্ছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক মিস্টার রাইট-এর স্ত্রী। মিস্টার রাইট স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় পাঠিয়েছিলেন। এবার সত্যি সত্যিই আমাকে তাঁর ছড়ি এবং জল খাওয়ার পাত্রটির খোঁজ করতে হবে' (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২)। আর একটি চিঠিতে জোসেফিন লিখছেন ঃ 'মেরি হেল ম্যাটেইনি-কে[১] লিখেছি—যদি তাঁর ইংল্যাণ্ড থেকে নিয়ে যাওয়ার কেউ থাকে তো তাঁর হাত দিয়ে স্ফটিকের তৈরি স্বামীজীর একটি মূর্তি আমি পাঠাতে পারি। হেল-পরিবারকে এই উপহারটুকু দিতে পারলে আমার খুব আনন্দ হবে। কারণ, টানা একটা বছর তাঁরা স্বামীজীর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ না করলে স্বামীজীকে আমরা আমাদের মধ্যে পেতাম কি না সন্দেহ। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো—স্বামীজীর ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই যেন একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। তাই না? হেলরা তাঁকে একটা গোটা বছর কাছে পেয়েছিলেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁদের [আদরযত্ন ও

---

১. প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে স্বামীজী শিকাগোয় যাঁর গৃহে অতিথি হয়ে বহুদিন ছিলেন, সেই জি.ডব্লু. হেল-এর কন্যাই মেরি হেল। মেরিকে স্বামীজী 'বোন' বলে ডাকতেন এবং তাঁকে বহু চিঠিও লেখেন। পরে ইতালীয়ান ধনকুবের মিস্টার ম্যাটেইনির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

আচার-ব্যবহারের] মধ্যে স্বামীজী এমন কিছু দেখেছিলেন যা তাঁর মনে আমেরিকান নারীদের সম্পর্কে একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল—যার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর স্বভাবেরও অঙ্গ। সে যাই হোক, এর পর হেলদের সঙ্গে স্বামীজীর দেখাসাক্ষাৎ বা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান খুব বেশি হয়নি। এবার এলো 'আমাদের' পালা। সাত-সাতটা বছর আমরা তাঁর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত থেকেছি, একেবারে শেষ পর্যন্ত' (২৪ এপ্রিল, ১৯২২)। [মেরি হেল প্রসঙ্গে জোসেফিন আরও লিখেছেন] 'মা, বোন, স্বামীকে নিয়ে মেরি হেল ম্যাটেইনির এখন টইটম্বুর ভালবাসায় ভরা সুখের সংসার। সে শান্ত, বিচক্ষণ এবং সকলের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। কিন্তু এসব কিছুর মধ্যেও জীবনের যে-উচ্চাঙ্গ সুরটি স্বামীজী তাঁদের সকলকেই শিখিয়েছিলেন, সেটি সে ভোলেনি। তা সত্ত্বেও বলবো, স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার মানসিকতা তার নেই। অবশ্য মঠের জন্য মেরি আমাকে পাঁচ পাউন্ড দিয়েছে এবং আরও পাঁচ পাউন্ড দিয়েছে স্বামীজীর বই কিনে পাঠানোর জন্য। আমার অনুমান, এই প্রথম বোধ হয় সে মঠকে কিছু দিল। অথচ কী বিলাসবহুল জীবন। সুন্দর সাজানো ঝকঝকে সব ঘর। দুজন পরিচারিকা। মিসেস হেলের জন্য আবার সর্বক্ষণের একজন সঙ্গী। মোটর গাড়ি। কি নেই! হাবভাবে মেরি এখন পাক্কা ইতালীয়ান; স্থানীয় লোকজনদের দানধ্যানও করে। আমি ওকে ভালবাসি, ওর সব কিছু নিয়েই ওকে ভালবাসি' (১৫ ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

'ডেভিড মার্গেসন-এর appointment যে প্রিয় বান্ধবী ইসাবেলকে[১] খুশি করবে, সে আমি জানি। আহা, ইসাবেল-এর কাছে আমি বড় ঋণী—বিশেষত এই কারণে যে, সে স্বামীজীকে ঠিক ঠিক চিনেছিল' (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০)। মালভিনা হফ্‌ম্যান-এর প্রসঙ্গে জো লিখছেন ঃ 'তার যখন আট কি ন-বছর বয়স, তখন ৩৮নং স্ট্রীটের একটি বোর্ডিং হাউসে সে স্বামীজীকে দেখে। ঐ সূত্রেই আমরা পরস্পরের অতি আপনজন হয়ে গেলাম। ভাবতেও অবাক লাগে' (৯ মে, ১৯৪১)!

স্বামীজীর প্রতি কারো অনুরাগ দেখলেই জোসেফিন তাঁর প্রতি অতি প্রসন্ন হতেন। সেই অনুরাগ তাঁর হৃদয়বাণীতেও ঝঙ্কার তুলতো। [১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে লেখা এক চিঠিতে পাই] ঃ ''অনেকদিন তোমার কোনও চিঠি না পাওয়ার দরুন

১ মিসেস ইসাবেল মার্গেসন।

একটা অভাব বোধ করছি। তিনদিন আগে এফ-এর একটি চিঠিতে তার জীবনের সব কথা জানলাম।...যদিও তার বয়স এখন চুয়াল্লিশ, তবুও সুখের কথা এই—সে স্বামীজীকে শেষপর্যন্ত ধরতে পেরেছে। এখন সে স্বামীজীর জীবনী পড়ছে। সে লিখেছে, '১৮৯৩-এ শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর যোগদানের ঘটনাটি কী দারুণ রোমাঞ্চকর, তাই না?' মনে হচ্ছে, এখন থেকে তার সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্কটা আবার নতুন খাতে বইবে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই কী বিস্ময়, নয় কি?" (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

জোসেফিন তাঁর বহু চিঠিতে স্বামীজীর বাণী থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে তেমন কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ " 'সব কিছুর পিছনেই একটি কারণ আছে; সেই কারণটি তোমরা খুঁজে বার করো'—আমার ধারণা, এইটিই স্বামীজীর শিক্ষার মূল ভিত্তি" (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)। আবার ঃ "আমার মনে হয় 'স্বাধীনতার অটুট বিশ্বাস থেকেই বিচারবুদ্ধি জেগে ওঠে'—স্বামীজী যেমন জোর দিয়ে বলতেন" (৪ অক্টোবর, ১৯২৩)। "আমাদের স্বামীজী বলতেন, 'স্বরূপত আমরা নিত্য মুক্ত, কিন্তু দেহ আর মনের কাছে আমরা বাঁধা পড়ে আছি, আর সেই কারণেই এত সংগ্রাম' " (২৫ মার্চ, ১৯২৫)। "স্বামীজী একদা বলেছিলেন, 'তোমার তিতিক্ষার কথা খুলে বল দেখি, আমি বলে দেব তুমি কত বড় মাপের মানুষ' (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬)। স্বামীজী যেমন বলতেন, "[অষ্টপ্রহর] নিজের দোষক্রটি নিয়ে খুঁত খুঁত না করে অন্য কিছু [সদ্‌গুণ] দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে ফেলো দেখি, তাহলেই দেখবে ইন্ধন না পেয়ে তোমার ভেতরের বদগুণগুলো [শুকনো পাতার মতো] খসে পড়ছে' " (২৭ মার্চ, ১৯৩৯)। স্বামীজী বলছেন ঃ "জেনো, হৃদয় হলো তোমার জীবননদী, আর মস্তিষ্ক সেই নদীর ওপরের সাঁকোটি। সর্বাবস্থায় তোমার হৃদয়কেই অনুসরণ করবে' " (৫ ডিসেম্বর, ১৯২৩)। 'স্বামীজীর ভাষায় বলতে গেলে, আগে ঈশ্বররূপ খুঁটি পাকড়াও; তারপর প্রাণ যা চায় সেই খেলায় মেতো। ঐ খুঁটিটি [ঈশ্বর] আসল বস্তু' (২৯ জানুয়ারি, ১৯২৫)। "স্বামীজী বলতেন, 'যেখানেই মলিনতা, হীনতা, অবনতি অথবা অজ্ঞতা চোখে পড়ে, সেখানেই আমি একাত্ম হয়ে যাই' " (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩)। জোসেফিন লিখছেন ঃ "মানুষের ওপর যার বিশ্বাস নেই, আমার মনে হয়, সে বেশিদূর এগোতে পারে না। স্বামীজী সেই বিশ্বাসে ভরপুর ছিলেন। তিনি জানতেন আমরা প্রত্যেকেই অমৃতের সন্তান। সেই কারণেই তিনি হাঁক মেরে বলতে পেরেছিলেন 'প্রত্যেকটি মানুষকে ব্রাহ্মণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করো। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ তৈরি হোক। জাতকে জাত সব ব্রাহ্মণ হয়ে যাক—তাহলেই দেখবে

মানবজাতি উঠবেই উঠবে' " (৬ এপ্রিল, ১৯২৮)। 'দেহত্যাগের আগের দিন স্বামীজী সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন—দেখো, এই বেলুড় মঠ কালে কী বিরাট হবে! সেই কথা শুনে সেদিন [হয়তো] তাঁরা হেসেছিলেন। [কিন্তু] স্বামীজী ঘোষণা করেছিলেন, 'এই মঠের শক্তি ন-শো বছর অব্যাহত থাকবে। দুনিয়ার কোনও কিছুই এই শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না' " (২৯ জুন, ১৯২২)।

জোসেফিন ভগিনী নিবেদিতার মতো সর্বত্যাগী ছিলেন না। আবার সিস্টার ক্রিস্টিনের মতো একটি আদর্শ আঁকড়ে ধরে অনন্যব্রতা হয়ে জীবন যাপন করার মতো নিষ্ঠাও তাঁর ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বামীজীর চিন্তাধারা ও আদর্শের প্রচার ও রূপায়ণকেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা চিঠিগুলি পড়লে এ ব্যাপারে তিনি কতটা দায়িত্ব-সচেতন ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়।

যুগপৎ কয়েকটি ঘটনা বেলুড় মঠের নির্বিঘ্ন ভবিষ্যতের শুভসূচনা করলে আনন্দে উৎফুল্ল জোসেফিন লেখেন ঃ 'ব্যাপারটি কি খুব মজার নয়? মনে করো, অনেকের সঙ্গে তুমিও একটি সুতো বেশ টান্‌টান্ করে ধরে আছো যাতে তা জড়িয়ে না যায়, কোনওমতে গেরো না লাগে, এবং এটুকুই তোমার দায়িত্ব; আর তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি সুন্দর নকশা ফুটে উঠছে' (৩ মার্চ, ১৯২৬)। আর একবার তিনি লেখেন ঃ 'একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ—স্বামীজী যা ছিলেন—কালের অনন্ত প্রবাহে ভাসমান অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেন; দেখতে পান আগামী দিনে পৃথিবীতে কি ঘটবে না ঘটবে। ধরতে পারেন পরিবর্তনের অনিবার্য রূপরেখাটিও। স্বামীজীর সব কথাই যে ফলেছে সেটা আমার পক্ষে পরম আনন্দদায়ক। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, আমাদের সব দায়িত্ব চুকে গেছে। বরং বলবো—তাঁর বাণীর সত্যতা আজকের অনেক সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ততর করে দিয়েছে' (২ জুলাই, ১৯৪১)।

দীর্ঘ জীবনে জোসেফিন বহুধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁদের অনেককেই তিনি স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের কিছু কিছু প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত তাঁর পত্রগুচ্ছের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

'যে আদর্শের ঐশ্বর্য স্বামীজী আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন আজ আবার সেইসবই হৃদয় উজাড় করে তাঁর (ধনগোপাল মুখার্জির) কাছে মেলে ধরতে

পেরে মনে হচ্ছে আমার কাজ শেষ; নিজেকে অদ্ভুত রকমের হালকা লাগছে' (১৭ জুন, ১৯২২)। 'বার্নার্ড শ-দম্পতির কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র পেলাম না—তুমি কি কিছু পেয়েছ? লালিক-এর তৈরি স্বামীজীর স্ফটিক মূর্তিগুলি ওঁদের পাঠিয়েছিলাম—পেলেন কিনা কে জানে! দু-মাস আগে শ্রীমতী শ-কে আমি এই ব্যাপারে লিখেছিলাম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনও উত্তর নেই' (৭ নভেম্বর, ১৯২২)!

'বার্নার্ড শ-এর অষ্টাশিতম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক টাইমস্ তাঁর একটি ছবি ছাপে। ছবিতে দেখা যায় করাত দিয়ে শ কাঠ চেরাই করছেন। সেই ছবিটি দেখে তাঁকে লিখলাম—দুজনাই আমরা আশির কোঠায়, কিন্তু আপনি এখনো কত কর্মঠ, আর আমার ব্যায়াম-ট্যায়ামের কোনও বালাই নেই। চিঠি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা একটি পোস্টকার্ড পেলাম। তাতে লেখা ঃ 'প্রিয় জোসেফিন, আপনার চিঠি পেয়ে কী খুশিই না হয়েছি। গত ১২ সেপ্টেম্বর শ্রীমতী শ দেহ রেখেছেন। তার ঠিক কয়েকদিন আগেই আমরা দুজন আপনার কথা বলাবলি করছিলাম; ভাবছিলাম—আপনার কি হলো! আপনি বরাবরই আমাদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। এখনো তা-ই আছেন। আমাদের আশা ছিল হুলসক্রফট[১]-এ আমরা আবার একসঙ্গে মিলিত হব কিন্তু সবার চোখের আড়ালে এখন আমি অপেক্ষাকৃত ভালই আছি। ভয়ঙ্কর বুড়ো হয়ে গেছি—জি. বার্নার্ড শ।' বলা বাহুল্য, চিঠি পাওয়ামাত্রই জবাব দিলাম। লিখলাম—'এই নতুন পৃথিবীতে আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। এই প্রসঙ্গে উইলকক[২] বাংলা দেশের সেচ প্রকল্প নিয়ে কেমন মেতে গেছেন, সেই কথাও তাঁকে জানালাম' (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)। ২৬ ফেব্রুয়ারি লর্ড লিটন[৩] লিখে জানিয়েছেন ঃ 'বেলুড় মঠে গিয়ে আমরা অপার আনন্দ পেয়েছি। সেখানে যেন স্বর্গের শান্তি জমাট বেঁধে আছে। সেই আনন্দের স্মৃতি বহুদিন আমার মনে থাকবে। লালিকের তৈরি বিবেকানন্দের ছোট মূর্তিটি আমার লেখার টেবিলে রেখে দিয়েছি। প্রতিদিন বিকেলে অস্তগামী সূর্যের আলো যখন ঐ মূর্তির ওপর পড়ে জ্বলজ্বল করে তখন মনে হয়, বুঝি বা মূর্তির ভিতর থেকে এক পবিত্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে' (৫ মার্চ, ১৯২৪)।

---

১ স্ট্রাটফোর্ড-অন-এ্যাভন (ইংল্যাণ্ড)-এর একটি সুপরিচিত বাড়ি।

২ অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ার স্যার আলফ্রেড উইলকক মিস ম্যাকলাউডের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা দেশের সেচ ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলেন।

৩. বাংলার তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর।

'স্বামীজীর স্ফটিক মূর্তিটি পেয়ে লেডি ওয়াভেল ইসাবেলকে [মার্গেসন] ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। ওঁকে আমি স্বামীজীর ছোট ছোট চারখানি বই পাঠিয়েছিলাম, তাই আমাকেও ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন। আমার এখন পঁচাশি চলছে। এই বয়সেও যে মহামূল্যবান এই সত্যগুলিকে ছড়িয়ে দিতে পারছি—এই আমার মহা তৃপ্তি' (১৯ জুন, ১৯৪৪)। " 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) সংখ্যায় ইসাবেল মার্গেসন স্বামীজীর উজ্জ্বল স্মৃতিকথা লিখেছেন। ভবিষ্যতে হয়তো তুমিও লিখবে—তাই না?" (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)। "তোমার কাছে কি শঙ্করাচার্যের 'চূড়ামণি'[১২] আছে? যদি না থাকে একখানা চেয়ো। আমি চারখানা বই পাঠিয়েছি। তুমি বোধহয় জানো, স্বামীজী বলেছিলেন তিনিই শঙ্কর! আটশো বছর পর আবার ফিরে এসেছেন" (১০ এপ্রিল, ১৯৪৪)।

[২৭ নভেম্বরের একটি সুদীর্ঘ পত্রে জোসেফিনের অন্তর্জগতের এক অনবদ্য ছবি ফুটে উঠেছে। জো লিখছেন ঃ] "গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে-ছটায় সবেমাত্র মশারির ভেতর ঢুকেছি, এমন সময় দেখি দুই ভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দুজনের মধ্যে যে ছোট, তার বয়স আটাশ (ন-মাস হলো ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠের সদস্য;) আঠারো শতকের অর্ডিনান্স বলে ধৃত বাহাত্তর জন নতুন বন্দির অন্যতম সে। ২৪ অক্টোবর থেকে সে ঢাকা জেলে ছিল। আজ তার ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্টের কাছে অতি অবশ্যই হাজিরা দেওয়ার কথা; কর্তৃপক্ষের আদেশে এখন কিছুদিন তাকে বাংলা দেশের হারোয়া গ্রামে নজরবন্দি থাকতে হবে।...তার কথা শুনে, এই যে এত কিছু কাণ্ড ঘটেছে, তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বললাম—ভারতের জন্য, স্বামীজীর [স্বপ্নের] ভারতবর্ষের জন্য তার অনেক কিছু করবার আছে। স্বামীজী মনেপ্রাণে চাইতেন, ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে (যার সংখ্যা সাত লক্ষের ওপর) একটি করে কেন্দ্র গড়ে উঠবে এবং আলোকপ্রাপ্ত একজন প্রকৃত শিক্ষকের নেতৃত্বে সেই গ্রামের সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ চলবে। তার হাতে আমি স্বামীজীর রচনাবলীর পাঁচটি খণ্ড তুলে দিয়ে বললাম সে যেন জেনে রাখে যে, গভর্নর এবং 'কাউন্সিল'—এ সবই নিমিত্ত মাত্র। ওঁদের মাধ্যমে "জগজ্জননী" তাঁর কাজের যন্ত্ররূপে তাকে বেছে নিয়েছেন। ...ডার্লিং, তুমি যদি সেই মুহূর্তে দুই ভাইয়ের মুখের ভাবটি একবার দেখতে! নৈরাশ্যের অন্ধকার সরে গিয়ে

---

১২. আচার্য শঙ্করের বেদান্ত-বিষয়ক গ্রন্থ 'বিবেকচূড়ামণি'।

সহসা যেন আশার দীপ্তি ফুটে উঠলো ওদের মুখে! বুঝলাম, তারা মায়ের যন্ত্র হতে প্রস্তুত! তারা বললো, 'আমরা তো কখনো এভাবে ভেবে দেখিনি। "জগজ্জননী" যে এইভাবে তাঁর কর্ম সিদ্ধ করেন তা তো জানা ছিল না।' আহা, ছেলে দুটি কী সরল! ওদের বললাম—তোমরা স্বামীজীর একান্ত নিজস্ব ধর্মের সংজ্ঞাটি জানো কি? স্বামীজীর ধর্মের সংজ্ঞা হলো 'জানা' বা 'শেখা'। সেই শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়েই তুমি হারোয়ায় যাও। সেখানে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভাবের কথা জানার চেষ্টা কর। সেইসঙ্গে তাদের স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন, ইংরেজি শেখাও। তাদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শ ছড়িয়ে দাও এবং নিজেও সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তোলো" (২৭ নভেম্বর, ১৯২৭)।

জোসেফিন মনে করতেন পাশ্চত্যে স্বামীজীর বাণী প্রচার করার তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাই যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলো তখন তিনি লিখলেন ঃ "যেসব জায়গায় যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে, সে ভারতেই হোক আর ইউরোপেই হোক, সেই সব অঞ্চলে আমি বাবা যাচ্ছি না। আমার যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। তাছাড়া, স্বামীজীর মতো আমিও বলি, 'পাশ্চাত্যেই আমাকে বেশি কাজ করতে হবে এবং সেই কাজের প্রভাব সেখান থেকে ক্রমে ভারতে ছড়িয়ে পড়বে।' ভারতবর্ষে গিয়ে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করতে পারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসে। এখন আমেরিকার শতশত মানুষ ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কালে তাদের সংখ্যা বেড়ে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ হবে। আর আমেরিকা যেভাবে বিশ্বের প্রধান দেশ হিসাবে এগোচ্ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই তার প্রভাব ক্রমশ দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে" (৬ মার্চ, ১৯৪০)।

যখনই কোথাও কোনও বিশেষ পূজা, উৎসব-অনুষ্ঠান বা নতুন কোনও কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়েছে, জোসেফিন তাতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কারণ তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, তাঁর উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সকলেই স্বামীজীর একটি স্পর্শ অনুভব করবেন। তিনি লিখছেন ঃ 'ধীরে ধীরে স্বামীজীর বাণী প্রচারের ক্ষেত্রটি এদেশে প্রসারিত হচ্ছে। গতকালই আমরা তিনজন মিস স্পেন্সার-এর বাড়ির নিচের তলায় একটি ধ্যানঘরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছিলাম। এর কিছু মূল্য থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে। সে যাই হোক, মূল কথাটি হলো—সব মানুষই যে দেবতা—স্বামীজীর এই বাণীটি

আমাদের কোনও অবস্থাতেই ভুললে চলবে না' (১৬ মার্চ, ১৯১৪)। [অন্য এক চিঠিতে ঃ] " 'নিখিলানন্দের সেন্টারে [বেদান্ত কেন্দ্রে] আজ একঘণ্টা কালীপুজো দেখলাম। আমরা প্রায় কুড়িজন ছিলাম। যেহেতু আমি স্বামীজীকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম সেই কারণে আমি গেলে ওঁরা খুব খুশি হন' (৮ অক্টোবর, ১৯৪০)। 'স্বামীজীকে যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে, ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, বোধহয়, তাঁদের মধ্যে একমাত্র আমিই এখনো জীবিত। এ বছর স্বামীজীর প্রথম আমেরিকায় আসার [শিকাগো, জুলাই ১৮৯৩] পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষ্যে এখানকার প্রত্যেক বেদান্ত কেন্দ্রেই কিছু-না-কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান হবে। নিখিলানন্দের ইচ্ছা, তাঁর কেন্দ্রে (১৭, ৯৪ নং স্ট্রীট) ঐ সময়ে আমি কিছু বলি। বেলুড় মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ তাঁর শেষ এক চিঠিতে লিখেছেন, 'গত আটচল্লিশ বছর ধরে ট্যান্টিন [জোসেফিন] যে স্বামীজীর স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছেন তার থেকে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তির কিছুটা আঁচ করা যায়' " (৬ অক্টোবর, ১৯৪৩)।

পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজীর বই প্রকাশের ব্যাপারে জোসেফিনের এমনই অদম্য উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল যে তিনি কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করতেন না। খরচপত্রের ব্যাপারেও কখনো কার্পণ্য করেননি। জোসেফিন লিখছেন ঃ "এডগার লী মাস্টারস্ ম্যাকমিলানকে (যে প্রকাশক স্বামীজীর যোগের ওপর চারটি বই ছাপতে রাজি হননি) লিখেছেন—'আমার বিশ্বাস, বইগুলির অন্তর্নিহিত সত্যের আত্তীকরণের ওপরেই জগতের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।' এই চিঠি পেয়েই ম্যাকমিলান স্বামীজীর বইগুলি তাঁদের পুনর্বিবেচনার জন্য আমাকে পাঠাতে বলেছেন। অবশ্য সেকথা ওঁরা আমার কাছে খুলে বলেননি। ওঁদের কথামতো আমি আজই বইগুলি পাঠিয়ে দিলাম। জীবনের পদে পদে কী বিস্ময়, কী রোমাঞ্চ, তাই ভাবি! এবং এই জীবনেই আমাদের এক বিরাট ভূমিকা আছে, তাই না? (৯ জুন, ১৯১৯)।

[১৯৪১ সালের একটি চিঠিতে জোসেফিন লিখেছেন ঃ] "আজই টোনি সুস্মানকে 'ইনস্পায়ারড টকস্' [Inspired Talks]-এর পাণ্ডুলিপিখানি বিমান-ডাকে পাঠালাম। পাণ্ডুলিপিখানি ভালো করে পড়ে, দেখেশুনে, যদি কিছু অদলবদল করার থাকে তো সেসব করে, টাইপ করে সে জ্ঞানযোগের অনুবাদখানি যেখানে পাঠিয়েছিল এটিও সেখানেই পাঠাক—এই আমার একান্ত ইচ্ছা। বইটি জার্মান ভাষায় ছাপার জন্য ইতোমধ্যেই জাঁ হার্বার্টকে আমি

টাকাকড়ি যা দেবার দিয়ে দিয়েছি। এই বইটি ছাপা হয়ে গেলে স্বামীজীর চারটি ছোট বই প্রকাশের কাজ সমাপ্ত হবে। কেমন করে, কোথায় ছাপার কাজটি হবে তা অবশ্য আমি ঠিক জানি না। তবে এটুকু বলতে পারি জাঁ হার্বার্ট স্বামীজীর এই বইগুলি জার্মান ভাষায় প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সে-বাবদ তিনি যা চেয়েছেন, অর্থাৎ ১৬০০ ডলার, তা আমি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি। টোনি জানতে চেয়েছে সে আর কিভাবে স্বামীজীর কাজে সাহায্য করতে পারে। তা, আমি তাকে বলেছি—তুমি এই কাজটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে দাও। মিসেস বার্লিনার যদিও বইটির অনুবাদ করেছেন, কিন্তু তাঁর ধারণা টোনির 'জ্ঞান-যোগের' অনুবাদ আরও সুন্দর হয়েছিল। যাই হোক, খুব উঠে পড়ে লাগো, এই আমার ইচ্ছা'' (৪ এপ্রিল, ১৯৪১)।

[জুলাই মাসের আর একটি চিঠিতে বই-এর প্রসঙ্গই আবার এসেছে। জো লিখছেন ঃ] ''আজ তুমি হলস্ক্রফট যাচ্ছ। ২৫ জুলাই টোনিও সেখানেই উইক-এন্ড [সপ্তাহান্তিক বিশ্রামের সময়] কাটাতে যাচ্ছে। সেদিন তার কাছ থেকে একখানা অতি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। সেটি তোমাকে পাঠাবো বলেই এই চিঠি। টোনিকেও আলাদা একটি চিঠি দিচ্ছি এবং তাকে 'ইনস্পায়ারড টক্‌স'-এর একখানা আমেরিকান পকেট সংস্করণও পাঠাচ্ছি। আমি এই সংস্করণেরই হুবহু একটি জার্মান অনুবাদ চাই যাতে মূল বইটির প্রতিটি শব্দ, ছবি এবং কবিতা থাকবে। বইটি পড়লে স্বামীজী সম্পর্কে, তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট, সামগ্রিক ধারণা হয়'' (২১ জুলাই, ১৯৪১)।

নারী-প্রগতি, বিশেষত ভারতীয় নারীর উন্নতির কথা জোসেফিন খুব ভাবতেন। [সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর চিঠিপত্রে। একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ] 'ভারতে শিক্ষিকা পাওয়া দুষ্কর।... সিস্টার ক্রিস্টিন যেসব মেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের পরিণত হয়ে উঠতে সময় নেবে। যদিও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি নিখুঁত, তবুও মেয়েরা যতক্ষণ সাবালিকা হয়ে, দায়িত্ব নিয়ে, হাতেকলমে কাজ না করছে ততক্ষণ তাদের অভিজ্ঞতা এবং সম্মান কোনওটাই জুটবে না।...এখন থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় মেয়েদের জন্য বেশ কয়েকটি মহিলা-পরিচালিত কেন্দ্র গড়ে উঠা দরকার এবং আমাদের কর্তব্য উপযুক্ত মেয়েদের খুঁজে বার করার কাজে সাহায্য করা। বস্তুত, সবকিছুই তাদের ওপর নির্ভর করছে' (২০ মার্চ, ১৯১৬)। [আর একটি চিঠিতে লিখছেন ঃ] 'সিস্টার গায়ত্রীর তুলনা নেই। তিনি ষোলো বছর আমেরিকায় আছেন। সংস্কৃত

জানেন। গত তেরো বছর যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা, ক্যালিফর্নিয়ার সেনেটর জোনস্-এর কন্যা, সিস্টার দয়ার সঙ্গে ক্যালিফর্নিয়া ও এখানে স্বামী পরমানন্দের কাজটি চালিয়ে যান। ভাবতে খুব আনন্দ হচ্ছে, স্বামীজী মেয়েদের জন্য আলাদা মঠের যে-স্বপ্ন দেখতেন, সেই মঠ গড়ে তোলার মতো উপযুক্ত মেয়ে এখন আমাদের মধ্যেই আছে!' (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০)।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের পরিধি যখন কোনও-না-কোনওভাবে প্রসারিত হয়েছে, যখন কোনও নতুন কর্মোদ্যোগ বা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তখনই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন জোসেফিন। এই আন্দোলনের সঙ্গে জোসেফিনের কতখানি হৃদয়ের যোগ ছিল, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তী কয়েকটি উদ্ধৃতিতে। [একটি চিঠিতে জোসেফিন লিখছেন ঃ] " 'এই তরুণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের জীবন ও কার্যকলাপ একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কিভাবে পরিপুষ্ট হবে। আমার কাছে এটা বিরাট একটা আশার কথা যে ওঁরা এবার চাষবাসেও হাত দিচ্ছেন। আজ সরকারি বিশেষজ্ঞের আসার কথা। তিনটে থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সাধুরা তাঁর কাছ থেকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করতে হয় সেসবের তালিম নেবেন। তারপর সেই শিক্ষার ভিত্তিতে মিশনের বাইরের কেন্দ্রগুলিতে কাজ শুরু হবে। কাজ আরম্ভ হতে এবং তার ফল পেতে অবশ্যই কিছু দেরি হবে; কিন্তু কাজের ভিত যে খুব শক্ত ও মজবুত হতে চলেছে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই! হাতের কাছে ছোটখাট যেসব সমস্যা তার সমাধান না করে দুরূহ বিষয়ের প্রতিকার করতে যাওয়া অবশ্যই নিরর্থক। আর সে কথা স্বামীজীর বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া আলোতে উদ্দীপিত মঠের এই তরুণ সাধুরা খুব ভালো করেই জানেন। ...স্বামীজী একবার কি বলেছিলেন, মনে আছে? বলেছিলেন ঃ 'এ্যালবার্টা, তোমার জীবনের কোনও ঘটনাই তোমার কল্পনার তুল্য হতে পারে না' " (২ জুন, ১৯২৬)। [আর একটি চিঠিতে দেখি তিনি লিখছেন ঃ] 'মনে পড়ে, স্বামীজী বলেছিলেন বেলুড় মঠ একদিন ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক মহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে? আমাদের জীবৎ কালেই হয়তো স্বামীজীর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয়ে উঠবে এবং আমরা তা দেখে যেতে পারবো' (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)। "আমি মঠে এঁদের [কর্তৃপক্ষকে] অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলছি, দয়া করে আপনারা নবীন সাধুদের বাইরে পাঠিয়ে দিন। স্বামীজীর মতো তাঁরাও পায়ে হেঁটে চতুর্দিক ঘুরে ফিরে দেখুন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন, আর ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করুন। বাবা,

স্বামীজী তো 'স্বামীজী' হয়েই আকাশ থেকে পড়েননি! তাঁর নিজের জীবন নিজেকেই গড়ে তুলতে হয়েছে। আর সেই কারণে তাঁর অনুগামী সাধুদেরও ঐ একই পথ অনুসরণ করতে হবে। নাহলে তাঁরা নরম, ভ্যাদভ্যাদে এবং মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়বেন। না থাকবে তাঁদের প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই-এর শক্তি, না থাকবে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলার মনোবল" (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭)। [অন্যত্র জোসেফিন লিখছেন ঃ] 'মিতব্যয়ী হয়ে আমি আধ্যাত্মিক কর্মের আনন্দ পাই; কারণ ঐভাবে যেটুকু অর্থ বাঁচাতে পারি তা প্রিয়জনদের অধ্যাত্মপথে সাহায্য করার জন্য খরচ করি; ফলে তাঁদের সাহস অটুট থাকে। টাকার তো ঐটুকুই সার্থকতা' (২৩ অক্টোবর, ১৯৩৯)।

[বেলুড় মঠে স্বামীজীর জন্মোৎসবের ছবি আঁকছেন তাঁর একটি চিঠিতে ঃ] 'হাজার হাজার ভক্ত নিচে (মঠ-প্রাঙ্গণে) বসে আছেন। তাঁরা সকলেই স্বামীজী নামক সেই মহাজীবনের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্যই আজ এখানে সমবেত হয়েছেন। স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব! আমি শুধু বসে বসে দেখছি আর আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি! বশী সেন আসছেন। স্বামীজী যা যা পছন্দ করতেন সেই পদগুলি তিনি আজ রাঁধবেন। আর আমি চকোলেট আইসক্রীম খাওয়াচ্ছি। সকলে সানন্দে তার ভাগ নিচ্ছেন। ব্যাপারটির মধ্যে যে খুব একটা ছেলেমানুষি আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ সরল ছেলেমানুষিটুকুই তো তাঁকে তরুণ, তরতাজা ও প্রাণবন্ত করে রাখে' (২৫ জানুয়ারি, ১৯২৭)।

জোসেফিনের চিঠিগুলির উদ্ধৃত অংশবিশেষ থেকে তাঁর মানসলোকের কোন্ ছবিটি ফুটে ওঠে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে জিনিসটি আমাদের মুগ্ধ করে এবং ভাবায় তা হলো তাঁর সর্বতোমুখী উৎসাহ আর গ্রহণশীলতা। উদাহরণস্বরূপ তিনি লিখছেন ঃ "কোনও একটি জায়গায় ফিরে আসা—এ আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। কথায় আছে না—'জীবন সুন্দর, কিন্তু ভবিষ্যৎ মঙ্গলময়।' সেই জন্যই নানা ধরনের অভিজ্ঞতা এবং নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আমার এত ভালো লাগে। স্বামীজী ছিলেন চিরনবীন, প্রতিদিনই তাঁকে নতুন, তরুণ মনে হতো। তাঁর এই সতেজ ভাবটিই সকলকে আকর্ষণ করতো। আমরাও যদি তাঁর মতো প্রত্যহ কিছু না কিছু শিখি তাহলে আমরাও বুড়িয়ে যাবো না। আমাদের জীবনটাও একঘেয়ে ও বিস্বাদ হবে না। জীবন মানেই প্রত্যাশা, জীবন মানেই বিস্ময়! পরমেশ্বরও কি তা-ই নন?" (৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮)।

'আমার সর্বদা মনে হয় জীবনটা যেন এই সবে শুরু হলো। পাঁচ বছরের কোনও শিশুও আমার চেয়ে বেশি এটি কখনো অনুভব করেনি। আর সেই পাঁচ বছর বয়সে যেমন ডেট্রয়েটে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম বাগান খুঁড়লে আমি ঠিক সোনা পেয়ে যাবো (আর, তা পেয়েও গিয়েছিলাম—কানের দুলের এক চিলতে সোনা!), সেই মন নিয়ে আমি এখন জগৎকে যতই দেখছি, জীবনভূমি যতই খুঁড়ছি ততই বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছি। এই বিস্ময়-অনুভূতি আরও সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, দেহভাবনা আর আমাকে পীড়িত করে না। ...আমার মধ্যে তপশ্চর্যার ভাব নেই—সে আমি ভালোমতোই জানি। কিন্তু যেখানে যা কিছু ভালো দেখি তাকে স্বাগত জানানোর মনোভাবটি আমার আছে। যা কিছু মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, কখনো যদি এমন কিছুর সম্মুখীন হই তবে তাকে স্বীকার করে নিতে আমি কুণ্ঠিত হই না। আমি অবাক হই যখন দেখি মানুষ মুখ বুঁজে কতই না সহ্য করে। স্বভাবতই তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়। [একটি জিনিস আমি বুঝেছি—] মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারলে, তার হৃদয়ের কাছাকাছি যেতে পারলে, তবেই তার কাছ থেকে কিছু শেখা যায়। সেই কারণেই আমি সকলের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠতে চাই, ভালবাসি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে, যা কেবল অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যেই গড়ে ওঠে। ...আমি যদি কখনো নিউইয়র্কে যাই তো সেই অজানার টানেই যাই! অজানা ঈশ্বর কত অজস্র নাম আর রূপের মধ্যেই যে নিজেকে ব্যক্ত করেন! ফলে, অনুমান আর বিস্ময়ের দোলায় আমরা নিয়ত দুলতে থাকি!' (২১ মার্চ, ১৯৩৯)।

আর একটি চিঠিতে পাই ঃ 'এই বিস্ময়ই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যের কাছ থেকে কতটা পাওয়া বা শেখা যেতে পারে তার ওপরই আমি বেশি গুরুত্ব দিই। আমি কি দিতে পারলাম না পারলাম তা নিয়ে তত ভাবি না। যাঁরা আমার থেকে একটু অন্য ধরনের—সেইসব মানুষকে আমার ভালো লাগে। অবশ্য যাঁর যা ভাব সেই ভাবেই তাঁকে গ্রহণ করে কাজে লাগাতে (সুযোগ নিতে নয়) আমি ভালবাসি। এতে আমার নিজের দিগন্তের বিস্তার হয়। প্রসারিত হয় দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তা গভীরতর হয় না কারণ আমি স্বামীজীর সঙ্গ করেছি। তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি' (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)। 'আমি যেন অন্যের মধ্যেই [সার্থক ভাবে] বাঁচি। নতুন নতুন চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমি ক্রমাগত বেড়ে চলেছি' (২৭ নভেম্বর, ১৯৩৮)।

''আমার সমাধির ওপর যদি আদৌ কখনো কোনও স্মৃতিফলক বসানো হয়

তবে তাতে যেন এই কথা লেখা থাকে 'আগ্রহ এবং প্রস্তুত হয়ে থাকাটাই আসল জিনিস।' ...ঘটনাক্রমে এমন একটি পরিবারে জন্মেছিলাম যেখানে আমি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি। আবার, পঁয়ত্রিশ বছর যখন আমার বয়স, তখন স্বামীজী আমাকে দিলেন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। অতএব, আমি যে সুখী তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এবং আমি শিখেই চলেছি!" (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯)। 'মানুষ হয়ে জন্মানোর একটা মস্ত সুবিধা এই, অনেককিছু এখানে শেখা যায়। শেখো, শেখো, দিনরাত শেখো, কারণ যা শিখবে তা কখনো নষ্ট হবে না। তা অন্যত্র, সর্বত্র কাজে লাগবে—কারণ আত্মা অবিনাশী' (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। " 'গত সোমবার যখন আমি টাউন হল ক্লাবের সদস্য হলাম তখন ওঁরা আমার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি লিখে দিলাম ঃ 'আমার জীবিকা শেখা' " (৩০ অক্টোবর, ১৯৪০)। [একই সুর ধ্বনিত পরের বছর লেখা একটি চিঠিতে। জোসেফিন লিখছেন ঃ] 'যদি বলো আমার ধর্ম কি—তাহলে বলবো, শেখা; প্রত্যেকের কাছ থেকেই কিছু না কিছু শেখা। কারণ এটি ঈশ্বরের জগৎ এবং শেখবার ও তাঁকে ডাকবার জন্যই তিনি আমাকে এখানে রেখেছেন!' (১৪ মে, ১৯৪১)।

জোসেফিন নিজেই বলেছেন ঃ 'ত্যাগ-বৈরাগ্য আমার কিছু নেই। কিন্তু আমার স্বাধীনতা আছে—ভারতের উন্নতি দেখার এবং সেই উন্নতিতে আমার দিক থেকে সাহায্য করার স্বাধীনতা। এটাই আমার কাজ এবং এখন এই কাজ করতেই ভালো লাগে। ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত আদর্শবাদী যুবকের দল জীবন-অরণ্যের মধ্যে থেকে চলার নতুন পথ খুঁজে বার করছে, এটি দেখা আর দেখে আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠা [—এই আমার কাজ]' (১২ মার্চ, ১৯২৩)।

জোসেফিনের এই উৎসাহ ও উদ্যমের মূলে ছিল গভীর জ্ঞান এবং প্রত্যয়। সর্বোপরি এক অনাসক্ত ভাব। [তিনি লিখছেন ঃ] 'এখন দেখতে পাচ্ছি বর্তমানের গভীরে যেতে পারলে অনন্তের মধ্যে, চিরন্তনের মধ্যে গিয়ে পড়া যায়। আইনস্টাইনের ভাষায় বললে বলতে হয়—এ যেন এক নতুন মাত্রা' (৪ অক্টোবর, ১৯২৩)। [বছর দুই পরে একটি চিঠিতে তাই লিখছেন ঃ] 'এখনকার এই জীবন—এ-যেন এক বর্ণাঢ্য। সুন্দর শোভাযাত্রা; খুবই উপভোগ্য। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জানি বিশাল সাম্রাজ্যও নশ্বর; একমাত্র ঈশ্বরই অবিনশ্বর, নিত্যবস্তু' (২৯ জানুয়ারি, ১৯২৫)। আবার ঃ "তুমি জানতে চেয়েছো আমি

সংশয়াতীতভাবে চরম তত্ত্বটি ধরতে পেরেছি কি-না। তার উত্তর—হ্যাঁ, সম্পূর্ণভাবে, এবং সেটি হলো 'সত্য', যে সত্যের সঙ্গে আমি অভিন্ন। স্বামীজীর মধ্যেই সেই 'সত্য'-কে প্রত্যক্ষ করে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। মানুষ যে ভুলচুক করে বসে—সেগুলো নিতান্ত তুচ্ছ; ওগুলো ধরতেও নেই। মনেও রাখতে নেই। কেন মনে রাখবো—যখন দেখছি সত্য-সমুদ্রই আমাদের ক্রীড়াভূমি?" (১২ মার্চ, ১৯২৩)।

কিন্তু মনে রেখো আমাদের জীবন জলেরই মতো তরল। প্রতিনিয়তই তার রূপ, রঙ, স্বাদ, আকার বদলে যাচ্ছে। আমরা যদি শুধু এর তারল্যকে স্বীকার করে নিয়ে অবশিষ্ট যা-কিছু, অর্থাৎ রূপ, রং আর স্বাদ [মনে মনে] বর্জন করতে পারি, তাহলেই আমাদের ভূমিকাটি হবে দ্রষ্টার। দুঃখকষ্ট আর নিরন্তর পরিবর্তনের শিকার না হয়ে তখন এই আমরাই সাক্ষী হয়ে যাবো' (৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩৮)। 'আমরা নিজেদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না, তাই নয় কি? আমাদের চাহিদাগুলো [সম্পর্কেও কি আমরা ওয়াকিবহাল নই]? [তার উত্তর এই,] আমাদের সত্তার বড়জোর একটি ছোট জানালা আমাদের সামনে খোলা; কিন্তু সেই ফাঁকটুকু দিয়েই যখন ভিতরের দিকে তাকাই তখন তার গভীরতা, উচ্চতা আর ব্যাপ্তি আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। সেই উচ্চতা, গভীরতা এবং ব্যাপ্তি কখনো মাপা যায়নি কারণ তা অপরিমেয়। শুধু অনুমানটুকুই করা চলে—এই যা। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা জানি বা বুঝি তার চাইতেও আমরা বহুগুণ সূক্ষ্ম এবং মহৎ। এক এক সময় নিজেদের ক্ষমতা দেখে আমরা নিজেরাই আশ্চর্য হয়ে যাই!' (১১ আগস্ট, ১৯২৮)।

পরবর্তী এই কয়েক ছত্র থেকে জোসেফিনের জীবন-দর্শন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যায় ঃ 'যখন কেউ কেউ বলেন অহংটাকে একেবারে নাশ করতে হবে, তখন আমার মন তাতে সায় দেয় না। কারণ আত্মার ওপরই প্রতিটি জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। আর এই যে আত্মা, তা প্রচ্ছন্ন পাকা—আমি ছাড়া আর কি? অহং-এর চতুর্দিকের আবরণটি সরিয়ে দাও, তাহলেই দেখবে আত্মা তাঁর আপন মহিমায় জ্বলজ্বল করছেন' (২২ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। "বিশ্বের হাজারো সমস্যা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি আমার ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, পরিচিত গণ্ডির মধ্যে আমার নৈতিক, আধ্যাত্মিক বোধবুদ্ধি ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু করতে পারলেই সুখী। ঠিক এই কারণেই স্বামীজীকে

আমি বলেছিলাম, 'স্বার্থপরের মতো কোনও কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি।' স্বামীজী সেকথা শুনে বলেছিলেন, 'তা সত্যি। কিন্তু ছোট-আমি যেমন আছে, তেমনি বড়-আমিও আছে।' তাঁর কথা সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছি। সকলকে ভালবেসে যতই আমার এই ক্ষুদ্র 'আমি'-র বিস্তার ঘটবে ততই তার মধ্যে একম্, অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম প্রতিভাত হবেন" (২২ মার্চ, ১৯৪০)।

দুর্বলতা, ভীরুতা—এসব কি জোসেফিনকে কখনো আচ্ছন্ন করেছে? [তিনি লিখছেন ঃ] 'মানুষ যে মরতে এত ভয় পায় কেন বুঝি না। কোথায় এটি আনন্দের, গৌরবের ব্যাপার হবে, তা নয়, কেবল ভয়েই মরে! এই হতচ্ছাড়া শোক আর ভয়ের মেঘ মৃত্যুর যথার্থ মহিমাটিকে, তার তত্ত্বটিকে আড়াল করে রাখে। আমরা ভাবি মৃত্যু এক অভিশাপ। কিন্তু তা নয়। মৃত্যু পরম আশীর্বাদ। আত্মা যে নিত্য, দেহ যে তার দাস, এই ধ্রুব সত্যটিকে উদ্ঘাটন করার সুযোগ মৃত্যুই আমাদের কাছে এনে দেয়' (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)। [দুই দশকেরও বেশি পরের কোনও একটি চিঠিতে দেহের এই অনিত্যতা প্রসঙ্গ ঘুরে এসেছে। জোসেফিন লিখেছেন ঃ] 'তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জেনো। দীর্ঘায়ু হও। অন্তত আমার মৃত্যুর আগে তোমার শরীর যেন না যায়। কিন্তু শরীর শরীর করেই বা অত ভেবে মরা কেন? আত্মা তো শাশ্বত' (২৯ আগস্ট, ১৯৪৩)।

চরিত্রের স্বাভাবিক দৃঢ়তা কিন্তু জোসেফিনের ভক্তিমতী-রূপটিকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর চিঠিতে মাঝে মাঝেই তা ফুটে উঠেছে। [জোসেফিন লিখছেন ঃ] '—র দয়া ও ভালবাসার মনোভাব দেখে আমি আনন্দিত। সর্বত্র দেখছি ক্রোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে আর অন্যের সমালোচনা! তাতে না হচ্ছে জগতের কোনও পরিবর্তন, না হচ্ছে হৃদয়মন্দিরে দেবতার আসনটি পাতা। ক্রোধ আর ঈশ্বরপ্রেম কি করে একই সঙ্গে চলতে পারে!' (৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৯)। 'আমার মনে হয়, প্রত্যেক প্রজন্মেই একজন অবতারের প্রয়োজন যাঁর পুণ্য পদসঞ্চারে পৃথিবীর মুমূর্ষু মানুষ আবার প্রাণ ফিরে পাবে, যাঁর দিব্য অনুপ্রেরণায় হতোদ্যম মানুষ উপলব্ধি করবে দেবত্বে তার জন্মগত অধিকার। তুমি কি বলো? আমার তো মনে হয়, অবতারপুরুষেরা মাঝে মাঝেই আসেন। অন্তত একজন দেবমানবের কথা আমি সুনিশ্চিত জানি। স্বামীজীর ভাষায় বলতে হয়—এইসব প্রেমঘন অবতারাদির কৃপাতেই আমরা 'মায়ের করুণাধারায় ভাসতে পারি।' সবকিছু আঁকড়ে ধরার প্রবৃত্তিকে বিসর্জন

দিয়ে আমরা যদি এই ভেসে থাকার কৌশলটি একবার আয়ত্ত করতে পারতাম, তাহলে অনেক কিছু দেখবার ও শেখবার আরও বেশি সময় ও শক্তি আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যেত। অবশ্য এ কথা ঠিক—আমার কথায় জগৎ চলে না" (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।

(প্রবুদ্ধ ভারত, জানুয়ারি ১৯৭৯)